কুন্তলীন গল্প-শতক

বারিদবরণ ঘোষ
সম্পাদিত

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট : কলিকাতা-১৩

অমলদার স্মৃতির উদ্দেশে

ও

আমার সোনাদিকে

বারিদ

॥ সূচীপত্র ॥

ভূমিকা

গ্রামেব নামটিই এমন যে জয় এবং সিদ্ধি উভয়প্রকার লাভ অবশ্যই ঘটবে জীবনে। ময়মনসিংহ জেলার সেই জয়সিদ্ধি গ্রামের অবস্থাপন্ন পরিবারের কর্তা পদ্মলোচন বসু। জেলা আদালতের সরকারী চাকুরিয়া বেশ গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর জেলায়। তিনটি সন্তান। হরমোহন, আনন্দমোহন, মোহিনীমোহন। তিনটি রত্ন। মধ্যমপুত্রের নাম জানেন না ভূভারতে এমন লোকের সংখ্যা গণনার জন্য কাগজকলমের দরকার হয় না। প্রথম ভারতীয় ব্যাঙ্গলার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম, ভাবতীয় সংবিধানের জনককল্প আনন্দমোহন বসুর কথাই আমি বলছি। কনিষ্ঠ মোহিনীমোহনের কথা বোধকরি অনেকের স্মরণে আসবে না। লন্ডনে আর আমেরিকায় শিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে তিনি নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের M.D. উপাধি পান এবং ফিরে কলকাতায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ কবেন। এই প্রসঙ্গে একটা উল্লেখযোগ্য সংবাদ হল ইনিই ভারতবর্ষে প্রথম ব্যক্তি যিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার জন্য প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। জ্যেষ্ঠ হরমোহনও কম যান না। সরকারী আদালতের মুন্সেফ হরমোহন তাঁর ধর্মজীবনের জন্য তৎকালে বহুখ্যাত ছিলেন। তাঁর ভক্তিপ্রাণতার জন্য লোকে তাঁকে বলত ভক্তহরমোহন। সত্যানুরাগী ব্যক্তির পক্ষে ওকালতি ব্যবসাটা খুব একটা উন্নতিব উপায় নয়। সুতরাং মুন্সেফী গ্রহণটাই শ্রেয় মনে হয়েছিল তাঁর কাছে। কর্মসূত্রে বিভিন্ন স্থানে তাঁকে যেতে হত। সর্বত্রই তিনি 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির' সম্মানে অভিহিত হতেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বিলেত থেকে দেশে ফেরার তিন দিনের মধ্যে হরমোহন হঠাৎ-ই মারা গেলেন। রেখে গেলেন চারটি পুত্র সন্তান—হেমেন্দ্রমোহন, যতীন্দ্রমোহন, সুরেন্দ্রমোহন এবং সত্যেন্দ্রমোহন বসু। জ্যেষ্ঠ হেমেন্দ্রমোহনের বয়স তখন তেত্রিশ—পূর্ণবয়স্ক যুবক। আমরা এই হেমেন্দ্রমোহন বসুর জীবনকেই এক পরমাশ্চর্য জীবন বলে বিবৃত করতে চলেছি। কুন্তলীন পুরস্কারেরও ইনিই প্রবর্তক।

॥ ২ ॥

হেমেন্দ্রমোহন ছিলেন এক ধরণের স্বয়ংসৃষ্ট মানুষ। পৈতৃক সচ্ছলতা অবশ্য তাঁর খেয়ালী পথের পাথেয় জুগিয়েছিল। কিন্তু সে সূচনায়। তাব নিজের চিত্ত ভরে বিত্ত অর্জনের ইতিহাসে তিনি একক সারথি—উদ্যম ও উৎসাহেব অশ্বে তার বাসনার রথ তীব্র বেগে ধাবমান। পড়াশুনোয় যাকে বলে ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র। স্কুলের গণ্ডী সাফল্যের কড়িতে পার হয়ে এলেন কলেজে পড়তে। বি-এ পর্যন্ত পডা সাঙ্গ করে এলেন মেডিকেল কলেজে পড়তে। উৎসাহ জোগালেন নিকটাত্মীয় জগদীশচন্দ্র বসু (পরে বিশ্ববিশ্রুত পদার্থবিদ ও জীবনবিজ্ঞানী)। এক সময়ে জগদীশচন্দ্রেরই ইচ্ছে ছিল মেডিকেল কলেজে পড়ার। ম্যালেরিয়া সে ইচ্ছাপূরণে বাদ সেধেছিল। বয়োকনিষ্ঠ হেমেন্দ্রমোহনকে তিনি বললেন

ডাক্তারী পড়তে। ইতিমধ্যে জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক হয়েছেন। হেমেন্দ্রমোহন সেই কলেজের ল্যাবরেটরীতে আসেন বোটানির কিছু গবেষণা করতে। অসাবধানে কোন রাসায়নিক দ্রব্য হেমেন্দ্রমোহনের চোখে পড়ে গেল। তারপর দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ মাস চোখে বাঁধা থাকল ব্যান্ডেজ। একেবারে অন্ধ হবার জোগাড়। মেডিকেল পড়া সাঙ্গ হয়ে গেল মাঝপথে। ইতি হল বিধিবদ্ধ পাঠগ্রহণের উদ্যোগে।

কিন্তু গতানুগতিক ছকে ফেলা জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না হেমেন্দ্রমোহনের। তাঁর প্রতিভা অন্য পথের সন্ধান করছিল—নব নব বস্তু নির্মাণের পথ। রসায়নের একনিষ্ঠ ছাত্র হেমেন্দ্রমোহন এদেশে প্রসাধন দ্রব্যের একটা চাহিদা আছে একথা বুঝতে পেরেছিলেন। বিশেষ করে সুগন্ধি কেশতৈলের। তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল তাঁর স্বদেশপ্রীতি। বিদেশাগত বিচিত্র প্রসাধনী সামগ্রীর মধ্যে শুধু সুগন্ধই থাকে না, অপমানের একটা ক্ষীণ জ্বালাও থাকে, হেমেন্দ্রমোহন যেন একথা নাড়ী টিপে বুঝতে পেরেছিলেন। এদিক থেকে তিনি বন্ধুবর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের চিন্তার সমভাক্। স্বাবলম্বন শক্তি হেমেন্দ্রমোহনকে উৎসাহ দিয়ে বলল—বাংলার বুকে নতুন বাজার চালু কর।

সে বাজার শুধু প্রসাধনী দ্রব্যেরই হবে না, একথা আশ্চর্যভাবে হেমেন্দ্রমোহন বুঝতে পেরেছিলেন। ইংরাজী সভ্যতার প্রসার ও জীবনধারণের বিচিত্র উপকরণের প্রসার্যমান অবস্থাকে তিনি ব্যবসায়িক পরীক্ষার কাজে লাগালেন। একের পর এক নতুন নতুন ব্যবসায় তিনি নিজেকে জড়িয়ে দিলেন। ধুলোমুঠো করেন, সোনামুঠো হয়ে যায়। সর্ব ব্যাপারে প্রথম, সর্ববিষয়ে অভাবনীয় সাফল্য। কলকাতায় তখন মোটর গাড়ীর সংখ্যা আঙুলে গুণে রাখা যায়। অথচ সাহেব-সুবোরা এবং তাঁদের দেখাদেখি এদেশীয় অবস্থাপন্নেরা মোটরের চাহিদা দেখাচ্ছেন। তখন তো এদেশে মোটর তৈরীর কোনো ব্যবস্থা ছিল না। মওকা বুঝে হেমেন্দ্রমোহন (এইচ বসু নামেই তিনি অধিক পরিচিত, এবার থেকে আমরা মাঝে মাঝে এই নামেই উল্লেখ করবো) 'দি গ্রেট ইস্টার্ন মোটর ওয়ার্কস' নাম দিয়ে মোটরের ব্যবসা খুলে বসলেন ৪৪নং ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের এক প্রকাণ্ড বাড়ীতে। সেটা হল ১৯১২ সালের কথা। বাড়ির সামনের দিকে বিলিতি কায়দায় 'শোকেস', পিছনের দিকে যন্ত্রপাতি সারাই-এর ঢালাও ব্যবস্থা। ইংলণ্ড থেকে পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার জনৈক মিঃ প্রিসটন হলেন কারখানার সুপারভাইজিং ইঞ্জিনীয়ার। গাড়ির ক্যারাক্টার সার্টিফিকেটে তিনি 'অলরাইট' বলে সই দিতেন। স্টোনলে সিডলে ডেজি আর জানাচেনা অস্টিন গাড়ির এজেন্সি নিলেন এইচ বসু। আর নিলেন পিছনের ছাতার মতো ভাঁজকরা সুদর্শন ল্যান্ডলেট গাড়ীর এজেন্সি। আমেরিকায় তখন ফোর্ড গাড়ি চালু হয়েছে। মালিকরা লিখে পাঠালেন ফোর্ড গাড়ির এজেন্সী নিতে। এখন এর বিশ্বজোড়া নাম। তখন একেবারে বাজে কুদর্শন গাড়ি। এইচ বসু বললেন, না না, কেউ কিনবে না। ওটা একটা 'আগলী অ্যানিমেল'। সাহেবরা ঝটাঝট গাড়ি কিনে ফেলেন। বাঙালীদের মধ্যে প্রথম যিনি কিনলেন, তিনি কলকাতার বিখ্যাত ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী। তিনি যে গাড়ীটি কিনলেন সেটি জার্মানি দেশের তৈরি—নাম ডারকাপ। ১৯২০ সাল পর্যন্ত চলে ব্যবসাটা বন্ধ হয়ে গেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের বাজারে তখন আগুন লেগেছে।

মোটরের কথাটা আগেই ইচ্ছে করে বললাম। নইলে মোটরের আগে সাইকেলের ব্যবসাতেই হেমেন্দ্রমোহন বুদ্ধি ও হাত পাকিয়েছিলেন আগেই। মোটরের ব্যবসাটি যেমন ছিল এদেশে ভারতীয় মালিকানায় প্রথম অটোমোবাইল কারখানা, তেমনি এইচ বোস সাইকেল কোম্পানী হল ভারতীয় মালিকানায় প্রথম সাইকেলের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। এর

দোকানটি স্থাপিত হল হ্যারিসন রোডে (বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড) প্রেসিডেন্সী কলেজের সন্নিকটে ডাঃ নীলরতন সরকারের বাড়ির কাছে। এই বাড়ির একতলায় সামনের দিকে ছিল 'শো-রুম', পিছনে দেশী সাইকেল তৈরির কারখানা। এখানে ফ্যাক্টরীতে সাইকেল রং করার জন্যে স্প্রে পেন্টিং-এর ব্যবস্থা পর্যন্ত ছিল। ইংলন্ড নির্মিত 'রোভার' সাইকেলের 'সোল এজেন্সী' নিলেন হেমেন্দ্রমোহন। আপনারা তো সেন-র‍্যালে কোম্পানির নাম শুনেছেন। এই কোম্পানির 'সেন' হলেন সুধীরকুমার সেন মশাই। তিনি তাঁর প্রথম রোভার সাইকেলটি কিনেছিলেন এই এইচ বোস-এর সাইকেলের দোকান থেকেই। আরও চমকপ্রদ খবর শুনবেন ? এইচ বোসের কাছে কে কে সাইকেল চড়া শিখেছিলেন জানেন ? জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং নীলরতন সরকার। আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকদ্বয় এবং চিকিৎসক। তাঁরা শিখেছিলেন 'ডারকাপ' সাইকেলে (এঁদের মোটরও ছিল)। এই কোম্পানিরও সোল 'এজেন্সী' নিয়েছিলেন এইচ বসু।

বিশ্বে তখন ফনোগ্রাফের সবে প্রবর্তন ঘটেছে এডিসনের যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে। সে সংবাদ এসে পৌঁছেচে এইচ বসুর কানে। নিত্যনতুনের আকর্ষণে তাঁর মন নেচে ওঠে। ব্যবস্থা করলেন বিদেশ থেকে যন্ত্র আনাবার। এখন লোকে বলে গ্রামোফোন। তখন বলতো ফোনোগ্রাফ ; বাংলা করে বলত কলের গান। হ্যাঁ, সেই ছাতার মত চোঙা লাগানো। সেই ছাতার সামনে আকুল প্রত্যাশায় কেটেছে আমাদের বাল্যাবস্থা, কখন গায়ক মানুষটি সেই সুড়ঙ্গ পথে আবির্ভূত হবেন ! ছাতাটা আমরা অনেকেই দেখেছি বটে তবে ফনোগ্রাফটি কি দেখেছি ? এখনকার রেকর্ডগুলো চ্যাপ্টা, রুটির আকারের। তখন ছিল গোল চোঙার মত—ইংরেজিতে যাকে বলে সিলিণ্ড্রিক্যাল। বাজাবার ব্যবস্থাটাও তাই ছিল গোলাকৃতি আধারে। এইচ বসু এই যন্ত্র আনিয়ে ধর্মতলায় তৎকালীন প্রখ্যাত জহুরী লাভোচাঁদ-মতিচাঁদদের দোকানের গা লাগাও বাড়িতে খুলে বসলেন 'দি টকিং মেশিন হল'। যন্ত্র আর রেকর্ডের ব্যবসামাত্র নয়, রেকর্ড তৈরি করা পর্যন্ত। কি বিস্ময়কর প্রতিভা আর অত্যাশ্চর্য উদ্যোগ ! সিলিনডার রেকর্ডকে আবার প্যারিসের বিখ্যাত চার্লস প্যাথি কোম্পানি থেকে ডিস্‌ক রেকর্ডে পরিণত করিয়ে ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম 'প্যাথেফোন' যন্ত্রের প্রবর্তন করলেন। ধর্মতলার এই বাড়ির দোতলাতেই ছিল রেকর্ড রুম। বাড়ির নাম ছিল মার্বেল হাউস। এখানে কার কার রেকর্ড করানো হয়েছিল ? কি কি গানের ? নামগুলো বলি, পরে একটা তালিকা দেবো। রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছিলেন এখানে প্যাথিফোনে রেকর্ড করাতে। এনেছিলেন এইচ বসু। কবি এসেছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন বসুজার অন্তরঙ্গ বন্ধু। বন্ধু ছিলেন ডি এল রায়ও। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তাঁর গানও রেকর্ড করানো হল। হাসির গান। শুধু ডি এল রায়ের নয় প্রমদারঞ্জন রায়ের নিজের গলার হাসির গান। দাঁত-হাঁটু ভাঙ্গা ডাকসাইটে ক্রিকেট খেলোয়াড় প্রমদারঞ্জন রায়। লালচাঁদ বড়ালের—আমাদের অতি পরিচিত রাইচাঁদ বড়ালের বাবার রেকর্ড। এই সুন্দর টকটকে সুদর্শন পুরুষটিকে দিয়েই হেমেন্দ্রমোহন তাঁর নতুন করা রেকর্ড রিলিজ করতেন রীতিমতো জলসা বসিয়ে। লালচাঁদ ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আর আসতেন মানদাসুন্দরী। সেকালের এই গায়িকাটির বয়সই বা কত তখন। আসতেন ঘেরাটোপ গাড়িতে, উঠতেন ঘোমটা দিয়ে। রেকর্ডরুমে ঢুকে মাথাব ঘোমটা খসিয়ে গান শুরু করতেন। তখন তো আজকালকার মতো নীডল-প্রথায় রেকর্ড বাজানো শুরু হয়নি। একটা ছোট সরিষার মতো চেহারার হীরে দিয়ে বাজানো হত—বলা হত স্টাইলাস-প্রথা। এতে অবশ্য রেকর্ডের পরমায়ু যেতো কমে।

ও হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথের গাওয়া অনেক রেকর্ড-এর মধ্যে একটা রেকর্ড অবশ্য এখনও আছে। ১৯০৮ (?) সালে প্রকাশিত প্যাথিফোন রেকর্ড-এর ক্যাটালগের ভূমিকা থেকে এর বিবরণ তুলে দিই :

36.369 সোনার তরী (স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি) ইহার মাধুর্য রবিবাবু স্বকণ্ঠে কত সুন্দরভাবে প্রতিফলিত করিয়াছেন তাহা স্বকর্ণে না শুনিলে ভাষায় বর্ণনার অতীত।

36.250 বন্দেমাতরম্
বঙ্গের গৌরব অমর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণোন্মত্তকারী জাতীয় সংগীত। এতদুপরি স্বয়ং রবিবাবু তাহার গায়ক।

শুনেছি এটি রবীন্দ্রভারতীর সংগ্রহশালায় বর্তমান আছে। যে যন্ত্রটিতে রেকর্ড করা হত, তার ভগ্নাবশেষও সংরক্ষিত আছে। কত যে রেকর্ড এখান থেকে হয়েছিল, তার হিসেব দেওয়া কঠিন। কারণ কবিকণ্ঠের অনেক গান সবে রেকর্ড মাত্র করা হয়েছে, এখনও বাজারে ছাড়া হয়নি—এসব সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঢেউ উঠল। সেই ঢেউয়ে পুলিস এল ৫নং শিবনারায়নণ দাস লেনে এইচ বসুর বাড়ী। স্বদেশী গান ভেবে সমঝদার পুলিস সেই সব মূল্যবান রেকর্ড ভেঙ্গে দিল। আর একবার প্রেগের সময় কলিকাতা কর্পোরেশন ঘর জীবাণুমুক্ত করতে এসে গৃহ সংগীতমুক্ত করে গেল!

ইতিমধ্যে ডিস্ক্ রেকর্ড বাজারে চালু হয়ে গেছে। তার সঙ্গে সিলিণ্ড্রিক্যাল পাল্লা দিয়ে পারে না। এইচ্ বসু প্যাথিদের দিয়ে ডিস্ক করাতে চাইলেন। কিন্তু প্যাথিরা এখন রেকর্ড ছেড়ে সিনেমার ব্যবসায় নেমেছে। ওডেন রেকর্ড বাজারে এসে পড়েছে। সিলিনডারের মর্যাদা গেল। এইচ বসু কারখানা তুলে দিলেন।

ব্যবসার আর দু-একটি টুকিটাকি সংবাদ দিই। দিয়ে একটু অন্দরের কথা বলবো। ছবি তোলার প্রচণ্ড সখ ছিল। বিদেশ থেকে একাধিক ক্যামেরা আনিয়ে নিজের ঘরেই ডার্করুমে ডেভোলাপের ব্যবস্থা করেছিলেন। ছবিতে থ্রি ডাইমেনসনের ভাবনাও তাঁর প্রথম এদেশে। তাঁর কাছে হাতে খড়ি পেয়েই প্রখ্যাত সিনেমা-পরিচালক নীতীন বসুর 'ভাত জলে'র ব্যবস্থা হয়েছে। রঙীন ফিল্মের ব্যবস্থাও তাঁর প্রথম। অবশ্য তখন অ্যাডিটিভ প্রসেসে কাজ হত ; এখনকার মত সাবট্রাকটিভ উপায়ে নয়। প্রেস খুলেছিলেন কুন্তলীন প্রেস নামে ৬২নং বৌবাজার স্ট্রীটের বাড়ীতে। সেখান থেকে ছাপানো বাঁধানো দু-একখানা বই আমি দেখেছি। কবি সুরমাসুন্দরী ঘোষের 'রঞ্জিনী', 'সঙ্গিনী', রবীন্দ্রনাথের 'শারদোৎসবে'র বিশেষ সংস্করণ। সে যে কত মনোহর, চাক্ষুষ না করলে বোঝানো দায়। এই প্রেসের রোটারি মেশিনে তিনিই ভারতবর্ষে প্রথম মনোটাইপ ও লাইনোটাইপ প্রথা প্রবর্তনের উদ্যোগ করেন (আমার সুরেশচন্দ্র মজুমদারের কথা অবশ্য অবশ্য মনে আছে)। তবে ব্লক তৈরি করতেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী—ইউ রায় অ্যান্ড সন্স থেকে। এখানে মাত্র ছাপার কাজটুকু সম্পন্ন হত। এই প্রেসের কথা পরে আবার আসবে। বহনযোগ্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির একটা দোকানও খুলেছিলেন এইচ বসু ৬২নং বৌবাজার স্ট্রীটে। আর এদেশে চৌকোণা পকেট টর্চ লাইটের প্রবর্তনও তাঁর প্রথম। প্রথম প্রথম, সর্ববিষয়ে প্রথম এইচ বসু। কী করে যে ভুলে গেলাম! সম্প্রতি সিদ্ধার্থ ঘোষ 'যন্ত্ররসিক এইচ বোস' নামে তাঁর একটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ-জীবন চরিত রচনা করেছেন 'এক্ষণ' পত্রিকার শারদীয় ১৩৯০ সংখ্যায় যথেষ্ট মুন্সীয়ানার সঙ্গে। এই ভূমিকার পরিপূরক হিসাবে সেটি অবশ্যপাঠ্য বলে মনে করি।

ব্যবসার ব্যাপারেই মাত্র উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না হেমেন্দ্রমোহনের। উভয়ে আত্মীয়তার বন্ধনেও ছিলেন আবদ্ধ। দুই পরিবারের এই মিলন দুই উদ্যোগের সম্মিলনে পর্যবসিত হয়েছিল। বিবাহ হয়েছিল উপেন্দ্রকিশোরের ছোট বোন মৃণালিনীর (পুণ্যলতা চক্রবর্তী, লীলা মজুমদারের সোনা পিসিমা) সঙ্গে। এমন মহিয়সী মহিলার কথা স্মরণ করতে গিয়ে বার বার চোখ মুছেছিলেন তৃতীয় পুত্র স্বনামখ্যাত নীতিন বসু। অতগুলি সন্তানের জননী : কিন্তু প্রত্যেকের প্রতি আশ্চর্য স্নেহশীলা। স্বামীর সমস্ত কর্মোদ্যোগের নীরব সহচারিণী। ছেলেদের নিয়ে মাঝে মাঝে স্বামীর ড্যারাক (ফরাসী দেশে নির্মিত—১৯০৩ সালে প্রথমে ১ সিলিনডার ও ১৯০৫ সালে ২ সিলিনডারের বড় গাড়িটি ভারতবর্ষে ইনিই প্রথম কেনেন—ড্রাইভার রেখেছিলেন এজন্যে) গাড়ি চড়ে বেড়াতে যেতেন। চা-খাওয়ার ফ্যাসানদুরস্ত রীতি প্রবর্তনেও হেমেন্দ্রমোহনকে স্মরণ করা যেতে পারে। চা খাবেন বলে চীন থেকে সরাসরি চায়ের বাসনপত্র আনিয়েছিলেন। এর কিছু কিছু আমি দেখেছি কনিষ্ঠা কন্যা ললিতা দাসের যোধপুর পার্কের বাড়িতে। চায়ের ব্যাপারে একটা মজার সাক্ষ্য তুলে দিই। তাঁর বাড়ির চায়ের আড্ডার প্রসঙ্গে বরিশালের প্রবীণ ব্রাহ্ম ও রসিক কবি চন্দ্রনাথ দাস মশায়ের একটি চিঠি (২৪ শ্রাবণ ১৩২২ তারিখে লেখা) আমার 'সাক্ষী' :

'১৯০৫ সালে আমি বরিসাল হইতে আলিপুরের এডিসনাল সবজজের সেরেস্তাদার হইয়া প্রায় এক বৎসর-কাল কলিকাতায় ছিলাম।...এই শেষ অংশে, শিবনারায়ণ দাসের লেনে, কুন্তলীন ফ্যাক্টরীতে শ্রীযুক্ত এইচ বসু মহাশয়ের বাড়ীতে প্রত্যহ চা খাইয়া, আমাকে এমনই চা-রোগে ধরিয়াছিল যে, একবেলা না খাইলেই কষ্ট হইত।' পানও মাঝে মাঝে খেতেন, তবে জর্দার নেশা প্রায় একেবারেই ছিল না। সুগঠিত স্বাস্থ্য, পাঞ্জাবির ফাঁকে ডাম্বেলভাজা পেশী উঁকিঝুঁকি মারত। সর্বদাই ধুতি-পাঞ্জাবির পুরোদস্তুর বাঙালী। বিকেলে প্রায় নিয়মিতভাবে প্রিন্সেপ ঘাট পর্যন্ত ভ্রমণ। খেলাধুলোয় ছিলেন বিস্ময়কর রকমের আগ্রহী। এখনকার ক্রীড়াবিদেরা ক'জন জানেন জানি না যে তিনি এবং তাঁর খুড়তুতো ভাই ডাঃ অজিতমোহন বসুর (এবং শুনেছি বিনয়েন্দ্রনাথ সেনও) উদ্যোগেই কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় আজকের স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব। ৫২নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের পারিবারিক ক্রিকেট খেলার কথা অনেকেরই স্মরণে থাকার কথা। সব কিছুর পিছনে হেমেন্দ্রমোহনের সক্রিয় সমর্থন। অভিনয়ে প্রবল আগ্রহ। গিরিডিতে এইচ বসুর রোজভিলা নামক বাড়ী ও বাগানের বিশালতার কথা (ছেচল্লিশ বিঘা) এবং সেখানের 'পূর্ণিমা সম্মিলনে'র কথা স্মরণ করে কবি সুনির্মল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

> '...প্রতি বছর শারদীয়া পূজার পর কোজাগরী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় বারগণ্ডার তরুণেরা পূর্ণিমা-সম্মেলন করতো। সে সময়ে কলকাতা থেকে বহু বিশিষ্ট-লোক গিরিডিতে হাওয়া বদলাতে যেতেন। এই সম্মেলনে তাঁদের মধ্যে আবার অনেক গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিও এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন।
>
> খোলা জায়গায় পর্দা টানিয়ে মঞ্চ তৈরি করা হোত। সন্ধ্যার আগেই আমরা সবাই ভীড় করে জুটতাম, কী আনন্দই যে হোত তা আর কী বলব।
>
> দু-একবার এই আসরে যোগীন্দ্রনাথ সরকার, শশীবাবু, এইচ বসু প্রভৃতিকে যোগদান করতে দেখেছি। তাঁরা মঞ্চে উঠে ছেলে মানুষের মত ধেই ধেই করে

নেচেছেন,—আমরা হেসে গড়াগড়ি দিয়েছি।...'

বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে কলকাতায় এসে হেমেন্দ্রমোহন প্রথমে ওঠেন কার্তিক বসু লেনের সংলগ্ন মুসলমান পাড়া লেনে। এখানেই তেল-সেন্টের ব্যবসার প্রথম প্রবর্তন। কিন্তু ছোট বাড়িতে সুবিধে না হওয়ায় উঠে এলেন ৫ এবং ৬নং শিবনারায়ণ দাস লেনের প্রকাণ্ড তেতলা বাড়িতে। এর নীচের তলায় খোলা হল সুগন্ধি দ্রব্যের কারখানা। প্রায় জলের দরে বিক্রি করে দিয়ে শেষে উঠে এলেন ১৭০ নং বৌবাজার স্ট্রীটে। এ বাড়িও ছেড়ে দিয়ে উঠে এলেন মৃত্যুর ঠিক আগে ৫২নং আমহার্স্ট স্ট্রীটে। বাড়ীই করলেন, ভোগ করা হল না বেশিদিন।

পান খেয়ে দাঁতে ছোপ পড়েছিল। পয়লা নম্বরের সৌখীন পুরুষ হেমেন্দ্রমোহনের এটা ভাল লাগেনি। বিলেত থেকে যিনি পিক্‌ফ্রীন বিস্কুট আর প্যারিস থেকে ক্যাড্‌বেরি ফ্রাই আনিয়ে খান তাঁর দাঁতে কালো ছোপ নিতান্তই বেমানান। নিজের দার্জিলিং টী এস্টেট থেকে আনা চা চীনের শ্বেতশুভ্র কাপডিসে চুমুক দিতে দিতে অশোভন দন্তপঙ্‌ক্তিতে বিস্বাদ ঠেকেছিল হেমেন্দ্রমোহনের। তাই বিলিতি প্রথায় দাঁতে স্ক্রেপ করিয়েছিলেন পূর্ণ একান্ন বছরে (বাহান্নতে সবে পা দিয়েছিলেন এইচ বসু ছাব্বিশে আগস্ট শনিবার) এর ঠিক দুদিন পরেই ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের আঠাশে আগস্ট সোমবার এল শেষ মুহূর্ত। দাঁত দিয়ে রক্ত পড়া আর বন্ধ হল না। অসহ্য যন্ত্রণা, প্রচণ্ড জ্বর আর বেহুঁশ অবস্থা। ভুল বকতে লাগলেন। ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, ডাঃ দ্বিজেন্দ্র মৈত্র ঘন ঘন আসেন যান। দুপুর বারোটা নাগাদ চেতনালোপ হয়ে গেল। ডাঃ প্রাণধন বসু নাড়ী ধরে বসে আছেন, দ্বিজেন্দ্র মৈত্রকে ইঙ্গিতে আহ্বান করলেন। মৃণালিনী দেবী অস্ফুটে ঈশ্বরের প্রার্থনায় মগ্ন। নাড়ী ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ডাঃ প্রাণধন বসু। সামনে মর্টন ইন্‌সটিটিউশনের স্কুলের ঘড়িতে তখন চারটে বাজল ঢং ঢং করে। খবর পেয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এলেন। ভিড় ঠেলে মুখের দিকে একবার তাকিয়ে সোজা নীচে নেমে এলেন। তারপর গাড়ি-বারান্দায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন এক ঘণ্টারও বেশি।...

Indian Messenger সংবাদ পেয়ে লিখলেন— "Though noted for business talents he was not at all a money-making machine .With a warm heart and an eye of the beautiful he would open his purse-string for whatever artistic and abtruistic undertakings interested him. He was very keen about the extension of Brahmo Mandir which fails to accommodate worshipper on Utsav occasions. He was a Sunday School worker for years. He would be found assisting the choir. A genial soul, earnest and unostentatious, has passed away only. He was only 52. May his soul rest in peace......'

পাখোয়াজে সঙ্গত করে ব্রহ্মমন্দিরে গান করার স্মৃতি প্রাচীন ব্রাহ্মের কারও স্মৃতিতে হয়তো থেকে থাকতে পারে। আর উদ্যান সম্মিলনে স্টিমার পার্টিতে গিয়ে আনন্দোৎসবের মধ্যে ধর্মসাধনার সমস্ত ব্যয় বহনের ভূমিকা ছিল হেমেন্দ্রমোহনেরই।

॥ ৪ ॥

কুন্তলীন তেলের কথা তেমন কিছু বলা হয়নি, অথচ এটাই আমার মূলধন। এর কথা বলতে গিয়ে পুণ্যলতা চক্রবর্তী ভারী চমৎকার করে লিখেছেন :

ছোট পিসিমারা আমাদের কাছেই একটা বাড়িতে থাকতেন।...সে বাড়ির তিন-তলায় লম্বা একটি ঘরে পিসেমশাই হেমেন্দ্রমোহন বসু (এইচ বোস) তাঁর লেবরেটরি করেছিলেন ; সেখানে বসে তিনি নানা রকম সুগন্ধি তৈরীর পরীক্ষা করতেন। ঘরটার দিকে গেলেই সুগন্ধ ভুরভুর করত। কত রকমের শিশি বোতল, রাশি রাশি ফুল, চোলাই করবার যন্ত্র, বড় বড় পাথরের খল ও হামানদিস্তা ; এককোণে একটা সোডা তৈরীর কল, সে রকম আমরা আগে কখনও দেখিনি। হাতল টিপলেই ভুসভুস করে নল দিয়ে সোডা ওয়াটার বেরোত, সিরাপ মিশিয়ে আমাদের খেতে দিতেন, রুমালে জামায় সুগন্ধ এসেন্স দিয়ে দিতেন।'

তিনি আরও সংবাদ দিয়েছেন, আত্মীয় পরিজনদের মধ্যেও গন্ধদ্রব্য বিতরিত হত। এই সংবাদ নিতান্ত জলো মনে হচ্ছে, কারণ ঐ আসল সংবাদ। ঐ যে আসল ফুল থেকে আসল গন্ধ ! ভাবতে পারেন একথা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে। আমাব বাড়ির কাছে একটা আইসক্রীম কল আছে। তাঁরা সারা মাসে পাঁচ কেজি চিনি কেনেন। তা-ও শুনেছি সেটা চায়ের প্রয়োজনে। আমরা সব্বাই এখন অশ্বত্থামা—পিটুলি গোলা খেয়ে দুধ খেয়েছি বলে নাচি !

কুন্তলীন কেশতৈলের কারখানা হেমেন্দ্রমোহন খোলেন ১২৮৭ বঙ্গাব্দে—ইংরেজি ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে—ছাব্বিশ বছর বয়সে। তারপর একটানা প্রায় সত্তর বছরের সাফল্যপূর্ণ ব্যবসার ইতিহাস। জানি না এই সাফল্যের আকর্ষণেই এইচ বসুর অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রফুল্লচন্দ্র রায় বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠার পর প্রসাধনী দ্রব্য নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছিলেন কি না ! সমসাময়িককালে কবিরাজ নগেন্দ্র সেনগুপ্তের কেশরঞ্জিনী তেলের কথা আমার এখন মনে পড়ছে। এঁর ব্যবসাও দীর্ঘদিন চলেছিল। এঁর কথা আরও একবার বলতে হবে।

॥ ৫ ॥

কুন্তলীন হল গিয়ে মাথার তেল, শুদ্ধভাষায় কেশতৈল। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের একটি বিজ্ঞাপন থেকে দেখতে পাচ্ছি এই তেলের অন্তত সাত রকমের রকমফের ঘটানো হয়েছিল—সুবাসিত, পদ্মগন্ধ, গোলাপ, যুঁই, চন্দন, বোকে এবং ভায়োলেট কুন্তলীন। ১৩২৩ সালে চন্দন এবং বোকে গন্ধ ছিল না। কেশতৈল ছাড়া এদেব আতরিন, ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার, মৃগনাভি ল্যাভেণ্ডার, অ-ডি-কোলোন, রোজ ও সুপিরিয়র পমেটমস, মিল্ক অফ রোজ, টয়লেট পাউডার, রোজ কার্বলিক টুথ পাউডার প্রভৃতি হরেকরকম্বা ব্যবহার্য দ্রব্যাদিও নির্মিত হত। মূল্যের কথা সবিস্তারে উল্লেখ করতে ভরসা হল না বর্তমানের ব্যবসায়ীদের অপ্রসন্নতার কথা ভেবে। নইলে বড় বোতল ভায়োলেট কুন্তলীনের সর্বোচ্চ মূল্য ছিল তিন টাকা (১৩২৩ সালে আড়াই টাকা) এবং এখনকার আড়াইশো গ্রামের মত পরিমাণের দাঁতের মাজনের দাম ছিল সর্ব নিম্ন—সাকুল্যে তিন আনা ! এগুলি ছাড়া পানে খাবার মশলা তাম্বুলীন, ক্যাস্টর অয়েল—ক্যাস্টারীন, অপরাজিতা সেন্ট, স্পেশাল এসেন্স, কোকোলীন সাবান, সিরাপ, গোলাপ দন্তমঞ্জন, ফ্লোরিডা—যাকে বলে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—সকালের দাঁতের মাজন থেকে রাতে খেয়ে শোবার কোষ্ঠকাঠিন্যের ওষুধ—এক এইচ বসুর ৬১ নং বৌবাজারে গেলেই হাজির।

কিন্তু বলিনি দেলখোসের কথা। কুন্তলীনের পরেই যার জন্যে এইচ বসুর সৌরভ। বৌবাজারের বাড়িটার নামই হয়ে গিয়েছিল দেলখোস হাউস : ১০৮১ নং টেলিফোনের

টেলিগ্রামই ছিল DELKHOSH। একটা ছড়া উদ্ধার করি ১৩৫২ বঙ্গাব্দের প্রবাসীর বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা থেকে :

"কেশে মাখ 'কুন্তলীন'
রুমালেতে 'দেলখোস'
পানে খাও 'তাম্বুলীন'
ধন্য হোক্ এইচ বোস ॥"

এর ভিন্ন পাঠও আছে। শুনেছি এটির মূল রচয়িতা জনৈক কবি। বিজ্ঞাপনের কথা যদি উঠল তবে বলি, কুন্তলীনের অনেক বিচিত্র রকমের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হত। বিজ্ঞাপনের ভাষার রকমফেরই বা কত বিচিত্র! পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাহিনী' পত্রিকার প্রথম বর্ষের পঞ্চম সংখ্যা (১লা ফাল্গুন ১৩২০—অন্য এক তৈল প্রতিষ্ঠান লক্ষ্মীবিলাস প্রেস থেকে প্রকাশিত) আমার হাতের কাছে রয়েছে। এর বিশালকায় প্রচ্ছদের চতুর্থ পৃষ্ঠা জোড়া বিজ্ঞাপনদাতা—এইচ বসু, মান্যুফাকচারিং পারফিউমার ৬১নং বহুবাজার স্ট্রীট। উপরে

"আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ
তোমারই সুগন্ধ ভরি"

মাঝখানে দুই সখী পরিবৃতা নৌকালীনা স্বপ্নের রাজকন্যা। আর তার নীচে—
বসন্তের জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে কুসুম কাননে শত সহস্র জাতীয় কুসুমের সুরভিশ্বাস সুমন্দ পবনে মিশিয়া আসিয়া নরনারীর প্রাণে আনন্দের উৎস আনয়ন করে তখন কি সকলেরই মনে হয় না এই আনন্দ যদি চিরস্থায়ী হইত!"
আমরা সেইজন্যই বলি এই সুখের আবেশ ও আনন্দ

এসেন্স
দেলখোস

ব্যবহার করিয়া চিরস্থায়ী করুন।...

—এমনি এক বিজ্ঞাপন দেখেই কবি সুনির্মল বসু স্মৃতিচারণা করেছেন : 'সন্দেশ' নিয়ে মেতে উঠলাম। বিজ্ঞাপনের প্রথম পাতা থেকে মলাটের শেষ পাতা পর্যন্ত আকুল আগ্রহে পড়ি। মনে পড়ে মলাটের শেষ পাতায় গন্ধ-দ্রব্য বিক্রেতা 'এইচ বসু'র ছবিওয়ালা বিজ্ঞাপন। একজন লোক রুমাল নেড়ে বলছে, "বহুৎ আচ্ছা দিল খোস্ হো গিয়া—" কিংবা একটি ছোট মেয়ে জলে নৌকা ভাসিয়ে যাচ্ছে, উপরে লেখা 'মৃদুমন্দপবন হিল্লোলে' ইত্যাদি।

বিলিতি ঢঙে বিজ্ঞাপন প্রকাশের সৌকর্য এদেশে প্রথম আয়ত্ত করেছিলেন এইচ বসুই। শুধু তাই নয়, তিনিই প্রথম উদ্যোগী, যাঁর বিজ্ঞাপন বিলেতের ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশিত হত। বিজ্ঞাপন হল বিজ্ঞাপনদাতার উৎপন্ন দ্রব্য কাটাবার ফিকির বিশেষ। কিন্তু আমাদের কৌতূহল বলছে, লোকে কিভাবে নিয়েছিলেন এগুলোকে। এর সাক্ষ্য অবশ্য দিচ্ছে মহাকাল—সত্তর বছরের স্থির একাধিপত্য। আচ্ছা তৎকালীন বিখ্যাত ব্যক্তিরা এই তেল নিয়ে কি মাথায় মাখতেন? নীতিনবাবু বলেছেন, তিনি দিল্লীতে তৎকালীন অ্যাডভোকেট জেনারেল এন এন সরকারের বাথরুমে কুন্তলীন তেল মেখেছেন : ত্রিপুরার জঙ্গলে ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে 'হাতী খেদা'র ছবি তুলতে গিয়ে ত্রিপুরার মহারাজার বাড়িতে এই তেল

দেখেছেন ; দেখেছেন কুচবিহারের রাজার বাড়িতেও। কয়েকটি মুদ্রিত অভিমত তুলে দিই।

এক। "পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে কুন্তলীন সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ কেশ তৈল, ইহাতে কোনরূপ ভেজাল নাই ও ইহার গন্ধ মনোরম। আমি নিঃসঙ্কোচে সকলকে ইহা সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া অনুমোদন করি।"

—স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

দুই। "আহ্লাদের সহিত ১৪ বোতল কুন্তলীনের মূল্য ১৪৲ টাকা পাঠাইতেছি। ইহা যে অতি উৎকৃষ্ট কেশ তৈল তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি।"

—ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট
মাননীয় স্যার কে জি গুপ্ত।

তিন। "ইহার সুমিষ্ট সৌরভ ও কেশবর্ধন করিবার ক্ষমতা দেখিয়া আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। কেশতৈল মধ্যে ইহা সর্বোৎকৃষ্ট।"

—নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ।

চার। "আমি এসেন্সগুলি নিজে ব্যবহার করিয়াছি ; যেরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে আমি নিঃসঙ্কোচে সাধারণকে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতে পারি।"

—সুবিখ্যাত বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাঁচ। "আমি এইচ বসুর এসেন্স ব্যবহার করিয়াছি এবং ঐগুলি অতি উত্তম জিনিষ মনে করি। বিলাতী জিনিষ অপেক্ষা কোনও অংশে হীন মনে করি না।"

—লালা লাজপত রায়।

ছয়। "ভারতবর্ষে প্রস্তুত যাবতীয় সুগন্ধি-দ্রব্যের মধ্যে এইচ বসুর সুগন্ধিগুলি নিঃসন্দেহে সর্বোৎকৃষ্ট এবং ইংলন্ডের ও ফরাসী দেশের উৎকৃষ্টতম সুগন্ধিগুলির সমকক্ষ।"

স্বাঃ মতিলাল নেহরু।
—৪ঠা জানুয়ারি, ১৯২৯।

সাত। "কুন্তলীন তৈল আমরা দুইমাস কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার কোন আত্মীয়ের বহু দিন হইতে চুল উঠিয়া যাইতেছিল। কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া এক মাসের মধ্যে তাঁহার নূতন কেশোদ্গম হইয়াছে। এই তৈল সুবাসিত, এবং ব্যবহার করিলে ইহার গন্ধ ক্রমে দুর্গন্ধে পরিণত হয় না।"

শেষোক্ত প্রশংসাপত্রটির রচয়িতা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। অপূর্ব এবং অনবদ্য। শ্রীরবীন্দ্রনাথর্মতম্ ইদম্, তত্রাদরৌ ন পরম্।

॥ ৬ ॥

কুন্তলীন ব্যবসায়িক সাফল্য ঘোষণা আমার একমাত্র ও অন্যতম উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এই সাফল্যের চাবিকাঠিটি কোথায়, তার সন্ধান করতে গিয়ে আমরা একটা ভিন্নতর পূর্বশ্রুত উপাখ্যানের আপাদমস্তক হদিশ পেয়েছি এবং এটিই আমার ভূমিকার প্রধান আলোচ্য বিষয়। ধান ভানতে শিবের গীত অনেকটা গাইলাম বটে ; তবে শিবের এই গীতটা না গাইলে ধানভানার মেহনতটা সহজ হত না।

এখন আমাদের তেলের সঙ্গে জলের মিশ খাওয়াতে হবে। আকাশবাণী কলকাতা থেকে একদা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রসিয়ে বসিয়ে বলেছিলেন—'তেলে-জলে কখনও মেশে না, কিন্তু তবুও একথা মানতেই হয় যে অন্তত একটি তেল আমাদের সাহিত্যরূপ জলের সঙ্গে নিতান্ত নিগূঢ় ভাবেই মিশে আছে। সেটি কুন্তলীন।'

ইংরেজি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কুন্তলীন তেলের আবির্ভাব (দেলখোসের সৃষ্টি ১২৯৮ বঙ্গাব্দ নাগাদ)। সাধারণের মধ্যে এর প্রচারের জন্য প্রদত্ত বিজ্ঞাপনের বিষয়টি আমরা কিছু আগে আলোচনা করে এসেছি। কিন্তু এক অভিনব বিজ্ঞাপন প্রচারের দিকে এইচ বসুর মন সন্নিবিষ্ট হল। এ বিষয়েও তিনি প্রথম।'তিনি বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। কুন্তলীন পুরস্কার নাম দিয়া তিনি প্রতি বৎসর কয়েকটি গল্পের একখানি করিয়া পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিতেন এবং এই সকল গল্প লেখককে নগদ টাকা বা তাঁহার গন্ধদ্রব্য পুরস্কার দিতেন। বিক্রেয় পণ্যের সংশ্রবে পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করিয়া সাহিত্য-চর্চায় উৎসাহ দানের প্রথা বোধ হয় তিনিই সর্ব প্রথম বঙ্গদেশে প্রবর্তিত করেন।'(ভারতবর্ষ, কার্তিক ১৩২৩)।

এই গল্পগুলি হত ফরমায়েসী রচনা। বিজ্ঞাপন ছিল 'গল্পের সৌন্দর্য কিছুমাত্র নষ্ট না করিয়া কৌশলে কুন্তলীন এবং এসেন্স দেলখোসের অবতারণা করিতে হইবে, অথচ কোন প্রকারে ইহাদের বিজ্ঞাপন বিবেচিত না হয়।' এটাই ছিল গল্প লেখার প্রধান শর্ত।

রীতিমতো বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর ১৩০৩ বঙ্গাব্দ থেকে এই গল্প-পুস্তিকা প্রকাশের আয়োজন হল ('বাংলা ছোট গল্প' নামক ডঃ শ্রীশিশিরকুমার দাশ মহাশয়ের গবেষণা গ্রন্থে ১৩০০ সাল থেকে এই প্রতিযোগিতা আরব্ধ এবং ১৩০১ বঙ্গাব্দে কারও কারও পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ ঘোষণা দেখে বিস্মিত হয়েছি ; এ বিষয়ে ডক্টর শ্রীসুকুমার সেনের সততা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য)। ১৩০৩ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত এই প্রকাশনধারা প্রায় অব্যাহত ছিল। 'প্রায়' শব্দটি ব্যবহার করতে হল এই জন্য যে ১৩৩৪-এর আগে কয়েক বছর পত্রিকার (পত্রিকা বলাই সংগত মনে করি, কারণ এটি এক হিসেবে সমকালীন ছোট গল্পের বার্ষিক সংখ্যার মত ছিল : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই পত্রিকার বিশিষ্ট ভূমিকা অবশ্য স্মরণযোগ্য) প্রকাশ স্থগিত ছিল।

প্রতিযোগিতা শুরু হয় ১৩০৩ সালে—এর ফলাফলসহ পত্রিকা প্রকাশিত হয় ঐ ১৩০৩ সালেই 'কুন্তলীন পুরস্কার' নামে। ১৩০৩ সালের প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পান যিনি—সংকলনে লেখক হিসাবে তাঁর নামোল্লেখ ছিল না। গল্পের নাম নিরুদ্দেশের কাহিনী। গল্পের শেষে পাদটীকায় মুদ্রিত আছে :

'এই উৎকৃষ্ট গল্পের লেখক নাম প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তাহার ইচ্ছানুসারে পুরস্কার (৫০ টাকা) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ে দেওয়া হইয়াছিল। সেই বৎসরের নিয়মাবলীতে রচনাকারীর নামোল্লেখ সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিয়ম না থাকায় আমরা বাধ্য হইয়া এই পুরস্কার দিয়াছিলাম।'

পাঠক মার্জনা করবেন আমাকে। বার বার আমাকে অন্যদের গ্রন্থের ত্রুটি প্রদর্শনের শুষ্ক কর্তব্যটুকু পালন করতে হচ্ছে। রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রদ্ধাস্পদ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ সংস্করণে (১৯৭৬) কুন্তলীন পুরস্কার সম্পর্কে কিছু তথ্য সংযুক্ত করেছেন (পৃঃ ১৩৫-৩৬)। তাঁর গ্রন্থে তথ্যগত ত্রুটি তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। সুতরাং সেই ভরসায় অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সন্নিবেশে আগ্রহী হয়েছি। এখানে পুরস্কারের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমাণ পঁচিশ (পরে তিরিশ) থেকে পাঁচ টাকা বলে

উল্লিখিত হয়েছে। এইমাত্র আমরা দেখেছি প্রথম বর্ষের প্রথম পুরস্কারপ্রাপক পেয়েছেন সর্বোচ্চ পঞ্চাশ টাকা। তিনি আরও লিখেছেন, '১৩০৩ সাল হইতে ১৩৩৭ সালের মধ্যে কুন্তলীন-পুরস্কারের প্রকাশ অব্যাহত ছিল' এই সংবাদ সম্পূর্ণ নয়। ১৩৩৪ সনের 'কুন্তলীন পুরস্কার'-এর প্রকাশকের নিবেদনে প্রকাশক শ্রীহিতেন্দ্রমোহন বসু (হেমেন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র) লিখেছেন, 'কয়েক বৎসর ধরিয়া কুন্তলীন পুরস্কার বাহির না হওয়ার দরুণ কুন্তলীনের গ্রাহক-গ্রাহিকার মধ্যে অনেকেই কুন্তলীন পুরস্কারের পুনঃ-প্রচলন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে আমরা এ বৎসরে, কুন্তলীন পুরস্কার বাহির করিতেছি—কারণ এ উপহার প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্যই হইল কুন্তলীনের গ্রাহক-গ্রাহিকাদের মনোরঞ্জন করা।' রবীন্দ্র-জীবনীকার আরও লিখেছেন, 'ইহাব মধ্যে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়—জগদীশচন্দ্র বসু 'পলাতক তুফান' নামে গল্প লিখিয়া প্রথম বর্ষের প্রথম পুরস্কার পান।' প্রথম বর্ষের প্রথম পুরস্কারপ্রাপক জগদীশচন্দ্র বসু ঠিকই, কিন্তু তাঁর গল্পের নাম ছিল 'নিরুদ্দেশের কাহিনী'। জগদীশচন্দ্রের 'অব্যক্ত' গ্রন্থে এই গল্পটিই পরে 'পলাতক তুফান' নামে মুদ্রিত হয়।

অবশ্য কুন্তলীনের গল্পটিই 'অব্যক্ত' গ্রন্থে (প্রথম প্রকাশ ১৩২৮ বঙ্গাব্দ) হুবহু উদ্ধৃত হয়নি। হয়েছে অনেক পরিবর্জন ও পরিমার্জনার পর। জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক ছিলেন (এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্যকরী সভ্যও ছিলেন)। সুতরাং তাঁর গল্পে বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের অবতারণা সংগত কারণেই উপস্থিত। গল্পটি না বলে গল্পের শেষাংশটুকু সবিস্তারে তুলে দিচ্ছি। এই শেষাংশটুকু ইংরেজিতে রচিত। এটুকু পড়লেই মূল গল্পটি পাঠক অনুধাবন করতে পারবেন :

THE SOLUTION OF A MYSTERY

The vanished cyclone of Calcutta remained so long a mystery to vex the soul of meteorologists. We are now glad to be able to offer an explanation of this seeming departure from all known laws that govern atmospheric disturbances.

It would appear that a passenger on board the Chusan threw overboard a bottle of KUNTALINE while the vessel was in the Bay of Bengal, and the storm was at its height. The film of oil, spread rapidly over the troubled waters, and produced a wave of condensation, thus counteracting the wave of rarefaction to which the cyclone was due. The superincumbent atmosphere being released from its dangerous tension, subsided into a state of calm. Thus by the merest chance, a catastrophe was averted .—Scientific American'.

তথ্যটুকু সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণেও যে, জগদীশচন্দ্রের সাহিত্যিক পরিচয় আমাদের অনেকের অবগত হলেও মুখ্যত গল্প-সংকলন পত্রিকা 'কুন্তলীন পুরস্কারের' প্রথম বছরের প্রথম পুরস্কারপ্রাপক যে জগদীশচন্দ্র বসু, এই তথ্য ছোট গল্পের ইতিহাসে অবশ্য মুদ্রণযোগ্য তথ্যবিশেষ। প্রশ্ন করতে পারেন পাঠক, এই কুন্তলীন তৈল জাহাজযাত্রী হঠাৎ নিয়ে গিয়েছিলেন কেন? প্রায় টাকমাথা ঐ যাত্রী বায়ু পরিবর্তনের জন্য সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়েছিলেন। কন্যা তাঁর ব্যাগে এক শিশি 'কুন্তলীন' তেল দিয়ে দিয়েছিলেন—'নতুবা নোনা জল লাগিয়া এই দু-একটি দ্বীপের চিহ্নও থাকিবে না।'

এবছরে বিশেষ পুরস্কার ১৫ টাকা পেলেন মানকুমারী বসু 'রাজলক্ষ্মী' গল্প লিখে।

প্রথম বৎসরের সংখ্যাটি ১৩০৩ বঙ্গাব্দের পুজোর আগেই প্রকাশিত হয়ে কুন্তলীন গ্রাহকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হল। এই সংখ্যার শেষে মুদ্রিত নিয়মাবলীতে আগামী সংখ্যার জন্য নির্দিষ্ট বিষয় ছিল পূজার চিঠি—'স্ত্রী যেন প্রবাসী স্বামীকে বাড়ি আসিবার জন্য পত্র লিখিতেছে, এটা ওটা জিনিসের সহিত এক বোতল কুন্তলীন আনিতেও অনুরোধ করিতেছে—এইরূপ পত্র রচনা করিতে হইবে।' এই বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে বহু লেখক তাঁদের রচনা কুন্তলীন দপ্তরে পাঠিয়ে দিলেন। প্রথম বারের মত এবারেও দশটি মূল পুরস্কারের ঘোষণা ছিল। ১৩০৪ সালের জন্য নির্দিষ্ট প্রথম পুরস্কারটি পেলেন যিনি, তাঁর নাম 'শ্রীমতী রাধামণি দেবী।' ঠিকানা জামালপুর। 'পত্র' রচনার তারিখ ৬ই অক্টোবর ১৮৯৬। গল্পের নাম 'পূজার চিঠি।' 'রাধামণি দেবী', নামে এঁর দু-একটি রচনা ইতিপূর্বে অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছিল। কুন্তলীন পুরস্কারের প্রবর্তন ও ঘোষণা তাঁর মধ্যে জোগাল অপ্রত্যাশিত অনুপ্রেরণা। তিনি 'পূজোর চিঠি' লিখে পাঠিয়ে দিলেন। পেয়ে গেলেন প্রথম পুরস্কার। অজস্র মনোরম ছোটগল্পের রচয়িতা এই 'রাধামণি দেবী' আর কেউ নন, স্বয়ং গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম। এ বিষয়ে স্বয়ং প্রভাতকুমার লিখেছেন—

> …'কিন্তু তখন আমি ছিলাম 'কবি', সুতরাং গল্পে নিজের নাম না দিয়া শ্রীরাধামণি দেবী একটি কাল্পনিক নাম সহি করিয়া দিয়াছিলাম। এই কাল্পনিক নামটির একটু ইতিহাস আছে। তাহার পূর্ব বৎসর কুন্তলীনের বাৎসরিক পুরস্কারের বিষয় ছিল 'পূজার চিঠি'…শ্রীমতী রাধামণি দেবীর বেনামিতে আমি একখানি রচনা করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলাম ; উহা প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়। সেইজন্য ওই নামটির উপর কেমন মায়া হইয়া যায় ; গল্পের ছদ্মনাম স্বরূপ উহাই ব্যবহার করি। কুন্তলীনেরা কেমন করিয়া জানিতে পারেন, পত্রখানি আমার লেখা। সেই অবধি উহারা পুরস্কার ঘোষণার সময় লিখিয়া দেন, কেহ আসল নাম গোপন করিয়া ছদ্মনাম ব্যবহার করিলে পুরস্কার পাইবেন না।'…

রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাতকুমার ২২ ফাল্গুন ১৩০৩ সালে লিখিত পত্রে লিখেছিলেন—'আপনার মনে আছে কিনা বলিতে পারি না, সেদিন পার্ক স্ট্রীট-এ যাইবার সময় গাড়িতে আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, আমার একটি রচনা (ছদ্মনাম—রাধামণি দেবী) কুন্তলীনের প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত হইয়াছে। সে বহি বাহির হইয়াছে ; এই ডাকে পাঠাইলাম…'।

একই সংখ্যায় প্রভাতকুমারের আরও একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল 'শশিভূষণ' ছদ্মনামে। সে প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার আরও লিখেছেন—'ষষ্ঠ পত্রখানিও আমার লেখা (ছদ্মনাম—শশিভূষণ)। অন্তত আমার দুইটি পড়িবেন। ষষ্ঠখানির ভিতর আপনাকেও টানিয়া আনিয়াছি, দেখিয়া হাসিবেন না।'

প্রসঙ্গত বলি, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'রাধামণি দেবী' প্রভাতকুমারের শ্যালিকার নাম ছিল বলে যে মন্তব্য করেছেন, তা ঠিক নয়। সেকালে অবশ্য একটা অদ্ভুত প্রবণতা পুরুষ লেখকদের মধ্যে পেয়ে বসেছিল। তাঁদের ধারণা ছিল স্ত্রীলোকের নামে প্রেরিত হলে গল্পটি প্রকাশের জন্য সম্পাদকের সহানুভূতি আকর্ষণ করবে। উল্টোটাও যে ঘটত না, এমন নয়। কামিনী রায়ের বন্ধু অবলা বসু কামিনী রায়ের কবিতা ঢাকার 'বান্ধব' পত্রিকায় পাঠিয়ে

দিয়েছিলেন 'সুশীলকুমার গুপ্ত' নাম দিয়ে। ছাপা অবিশ্যি হয়নি। বেনামীতে গল্প পাঠানো কুন্তলীন পুরস্কারে যেন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুধীরচন্দ্র সরকার লিখেছিলেন তার ন'দাদা সুবোধচন্দ্র সরকার প্রসঙ্গে 'আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি বেনামীতে একটি গল্প লিখে কুন্তলীন পুরস্কার পান।' আর মামার নামের অন্তরালে ভাগ্নের আত্মপ্রকাশের ইতিহাস তো আমাদের বহুশ্রুত।

কুন্তলীনের বিজয়-রথ এগিয়ে চলল। তৃতীয় বর্ষ ১৩০৫-এর সংখ্যার জন্য ১৩০৪-এর বিজ্ঞাপনে শুধু গল্প নয়, 'ছড়া'র জন্যও পুরস্কার ঘোষিত হল। এ বছরের প্রথম পুরস্কার পেলেন বোয়ালিয়া রাজসাহীব দীনেন্দ্রকুমার রায়। গল্পের নাম 'বিধবা'। ত্রিশ টাকার পুরস্কাব (পুরস্কারের অর্থ পরিমাণ নিয়ে পরে আলোচনা করবো)। গল্প বিভাগে পুরস্কারের সংখ্যা দশ। সপ্তম পুরস্কার পেলেন সাগরদাঁড়ি, যশোরের মানকুমাবী বসু। অন্যান্য প্রাপকগণ—প্রসন্নকুমার ঘোষাল (কলিকাতা), শশিভূষণ দত্ত (ভবানীপুর), সুমতিবালা দেবী (সাঁওতাল পরগনা), বিপিনবিহাবী চক্রবর্তী (কলিকাতা) বিনয়ভূষণ সরকার (ভাগলপুর), শ্যামাচরণ সিংহ (মেদিনীপুর), ব্রজকালী সুর (কাশিপুব) এবং হরকুমারী সেন (কলিকাতা)।

'ছেলেভুলানো' ছড়া বিভাগে প্রচুর ছড়া জমা হল। এর মধ্যে মুদ্রিত হল সাতচল্লিশটি। পুরস্কৃত হলেন পাঁচজন, সৌদামিনী দেবী, মৃণালিনী দাসী, প্রফুল্লকুমাবী দেবী, শান্তমণি দেবী এবং বিন্দুবাসিনী সরকার। পাঁচজনেই মহিলা। প্রথমজন পেলেন দশ টাকা, বাকীরা পাঁচ টাকা হিসেবে। এই ছড়াগুলির পাঠবৈচিত্র্য নিয়ে তুলনামূলক আলোচনার অবকাশ আছে। এদের মধ্যে পরিচিতগুলি হল—আয় আয় চাঁদমামা, চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে, মাসীপিসি বনকাপাসী, ইকিড়িমিকিড়ি চামচিকিড়ি, আগডুম বাগডুম, আয়রে আয় টিয়ে, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান, ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল।

১৩০৬ ॥ বারোটি পুরস্কার ছাড়া অতিরিক্ত একটি কবিতা 'বুদ্ধিমান রাজার স্বর্গযাত্রা' (রচয়িতা পুরী, উড়িষ্যা থেকে অম্বুজসুন্দরী দাস) এতে মুদ্রিত। প্রথম পুরস্কারপ্রাপক শ্রীহট্ট বেজুড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক রজনীনাথ দত্ত। গল্পের নাম 'অদ্ভুত-হত্যা'। জানাচেনাদের মধ্যে পুরস্কার পেয়েছেন দীনেন্দ্রকুমার রায় (বরোদা), মানকুমারী বসু (যশোর), জগদানন্দ রায় (নদীয়া), সরলাবালা দাসী (কলিকাতা)।

১৩০৭ ॥ প্রথম পুরস্কার—সুরেন্দ্রলাল গুপ্ত, ৮ নং বিন্দু পালিতের গলি, জোড়াসাঁকো কলিকাতা। উল্লেখযোগ্য পুরস্কারপ্রাপক বাকী ন'জনের মধ্যে সরলাবালা দাসী। লাল, কাল, সবুজ কালিতে ছাপা এই সংখ্যাব গল্পগুলি নির্বাচন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ('এবারকার পুরস্কারগুলি পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া নির্বাচন করিয়া দিয়াছেন'—প্রকাশকের নিবেদন)। প্রথম পুরস্কারেব মূল্য ৩০ টাকা থেকে কমে হয়েছে ২৫ টাকা।

১৩০৮ ॥ মোট পুরস্কারের সংখ্যা এগারো। 'মেয়ে' গল্প লিখে পঁচিশ টাকার প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন সরোজনাথ ঘোষ। সরলাবালা সরকারের 'মেয়ের বিয়ে' এবং বারীন্দ্রকুমাব ঘোষের 'পরিণয় রহস্য' যথাক্রমে দ্বিতীয় ও সপ্তম পুরস্কার বিজয়ী হয়েছে। গল্পগুলি নির্বাচন করে দিয়েছেন 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

এ বছরের শেষে পুরস্কারের নিয়মাবলী যা মুদ্রিত হয়েছিল সেটি এবারে তুলে দিই। এই নিয়মই মোটামুটি সর্বক্ষেত্রে মানা হয়েছে।

পুরস্কারের নিয়মাবলী।

১। রচনা যাহাতে সাধারণ চিঠির কাগজের ১৩। ১৪ পৃষ্ঠা অথবা আড়াই হাজার

শব্দের অধিক না হয় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

২। পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক যাঁহার ইচ্ছা রচনা পাঠাইতে পারেন। কিন্তু কোন পুরুষ স্ত্রীলোকের নাম দিয়া রচনা পাঠাইলে সেই রচনা পুরস্কার যোগ্য হইবে না।

৩। কোন রচনার প্রাপ্তি স্বীকার করা অথবা পুরস্কার সম্বন্ধে কোন চিঠির উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে এজন্য কেহ রিপ্লাই পোস্ট কার্ড অথবা ডাকটিকিট পাঠাইবেন না। যাঁহারা রচনা পৌঁছান সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে চাহেন তাঁহারা রেজেষ্টারী করিয়া পাঠাইবেন।

৪। পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক ও লেখিকাদিগের নাম আগামী বৈশাখ মাসের মধ্যভাগে সঞ্জীবনী সময় ও প্রতিবাসী পত্রিকায় ও স্বতন্ত্র লিষ্টাকারে প্রকাশিত হইবে। পুরস্কার সমুদয় রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। অপুরস্কৃত রচনা ফেরত দেওয়া হইবে না অথবা কোন প্রকারে ব্যবহৃত হইবে না।

৫। রচনা আগামী ২৯শে পৌষের মধ্যে "কুন্তলীন আফিসে" পৌঁছান আবশ্যক। তৎপরে কাহারও রচনা গৃহীত হইবে না।

এইচ বসু
৬২ নং বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

এই সংখ্যার প্রকাশকের নিবেদনে অবশ্য আরও অতিরিক্ত ঘোষণা ছিল—'উৎকৃষ্ট রচনার সংখ্যা অধিক হইলে আমরা পুরস্কারের সংখ্যা আহ্লাদের সহিত বাড়াইয়া দিব।'

১৩০৯ ॥ সেইমত ৭ম বর্ষের কুন্তলীনে মোট পুরস্কারের সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল চৌদ্দ। প্রথম দশটি নির্বাচন করে দিয়েছিলেন 'বসুমতী পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়।' আকারে বড়, দুর্লভ মূল্যবান 'এন্টিক' কাগজে মুদ্রিত এই সংখ্যার প্রথম গল্পটির লেখক সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—ঠিকানা বাঙালিটোলা, ভাগলপুর। গল্পের নাম 'মন্দির'। আজ্ঞে হ্যাঁ—এটিই মামার নামে প্রকাশিত ভাগ্নে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম মুদ্রিত রচনা। এ সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছিলেন যে ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি শরৎচন্দ্র গল্প লিখে শেষ মুহূর্তে (নিয়মানুযায়ী ২৯-এ পৌষ) এইচ বসুর হাতে দিয়ে আসেন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে গিয়েছিলেন গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎ পরিচয়' গ্রন্থে (পৃ ১৩৬) লিখেছেন'...পরে আমাকে সঙ্গে নিয়ে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরদের বাড়ী যাচ্ছি বলে পথে গিয়ে বলেন যে, কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য আমার নামে একটি গল্প দিয়ে গেছেন 'মন্দির' নামে। গল্পের প্লট বলেন এবং বলেন, প্রাইজ পেলে মোহিত সেন প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কাব্য গ্রন্থাবলী যেন তাঁকে দেওয়া হয়। এ সমস্ত কথা আমি সৌরীন মুখোপাধ্যায়কে বলি।'

এ সম্পর্কে শ্রীগোপালচন্দ্র রায় তাঁর 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিখেছেন (পৃ ৬২) 'মন্দির গল্প প্রথম স্থান অধিকার করায়, মন্দিরের লেখক হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামেই এইচ বসু মশায় পুরস্কারের পঁচিশ টাকা পাঠিয়ে দেন। সুরেনবাবু পরে সেই টাকায় শরৎচন্দ্রের ইচ্ছানুযায়ী রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী কিনে শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।'

তা হয়তো দিয়েছিলেন, কিন্তু সুরেনবাবুর গল্পটিতে কালাতিক্রম দোষ ঘটে গেছে। রাম জন্মাবার আগেই রামায়ণ লেখা হল। শরৎচন্দ্র সুরেনবাবুকে ১৯০৩ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে যদি মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলী উপহারের কথা বলে থাকেন তো, সেটা সুরেনবাবুর নিতান্ত বানানো কথা। কারণ মোহিতচন্দ্র সেন তখনও পর্যন্ত

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী সম্পাদনাপূর্বক প্রকাশ করেন নি। এর পরিকল্পনাই গৃহীত হয় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস নাগাদ। ১৬ই বৈশাখ (এপ্রিল ১৯০৩) রবীন্দ্রনাথ কন্যা রেণুকাকে নিয়ে হাজারিবাগে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখান থেকে মোহিতচন্দ্রকে লেখা চিঠিতে কবি এক স্থানে লিখেছেন—'যখন ছুটি পাইবেন তখন যদি পারেন ত আসিবার চেষ্টা করিবেন। এখানে আসিয়া নির্জনে আপনার নূতন সংস্করণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন—শালিক কোকিল বুলবুল ছাড়া আর কেহ কোন গোলমাল করিবে না।'

পরে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ থেকে 'কাব্যগ্রন্থে'র বিভিন্ন খণ্ড প্রকাশিত হতে থাকে।

এ বছরের অন্য পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—সরলাবালা দাসী (দ্বিতীয় পুরস্কার—'স্মৃতিচিহ্ন'), বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (৫ম পুরস্কার—('উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে'), ইন্দিরা দেবী (একাদশ পুরস্কার—('ভুল') এবং সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (দ্বাদশ পুরস্কার—('বৌদির কাণ্ড')।

এ সংখ্যার প্রকাশকের নিবেদনে পুরস্কারহীন রচনার অনেকগুলি তিরস্কার · 'এবারে যে গল্পগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি গল্প কোন কোন খ্যাতনামা লেখক রচিত গল্পের অবিকল নকল মাত্র।' আরও জানতে পেরেছি 'প্রকাশিত গল্পগুলির অংশ বিশেষ পরিবর্তন বা পরিবর্জন করা হইয়াছে।' শরৎচন্দ্রেব 'মন্দির' গল্পেও কি পরিবর্তন পরিবর্জনের ছাপ রয়ে গেছে?

১৩১০ ॥ এ বছরের পঞ্চদশটি পুরস্কৃত রচনা বাছাই করে দিয়েছিলেন দীনেন্দ্রকুমাব রায়। একদা যিনি নিজেই এই পুরস্কারের প্রাপক ছিলেন। প্রথম পুরস্কার ত্রিশ টাকা (পরিমাণ বাড়ল) 'সন্ন্যাস' গল্প লিখে পান বিন্দুবাসিনী দেবী। 'এবার পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্পগুলির মধ্যে মহিলাগণের প্রাধান্য' লক্ষ্য করা যাচ্ছে—পনেরটির মধ্যে তেরোটিই। খুশীতে ডগোমগো হয়ে প্রকাশক নিবেদন করেছেন—'বরং মহিলাগণ অন্তঃপুরবাসিনী হইয়াও যে পুরুষ লেখকগণের সহিত প্রতিযোগিতায় এবারের পঞ্চদশটি পুরস্কারের মধ্যে দুইটি ভিন্ন সমস্তই গ্রহণ করিতে সমর্থ্য হইয়াছেন, ইহা আমাদের অতীব আনন্দের বিষয়।' তথ্যটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এবারে বিচিত্র ধরনের সব গল্প এসেছিল—'নন্দী-ভৃঙ্গি সংবাদ' থেকে 'ছাবপোকার আত্মকাহিনী', এমনকি 'একজন লেখক গীতা ও দর্শন লইয়া একটি সুদীর্ঘ দার্শনিক প্রবন্ধ' পর্যন্ত লিখেছিলেন। কেউ কেউ 'কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া অর্ধরাজ্য ও এক রাজকন্যা লাভ হইল, কিম্বা দেলখোসের আঘ্রাণে মৃতপ্রায় রোগী উঠিয়া দৌড়িতে লাগিল' এমন আষাঢ়ে গল্পও ফেঁদেছিলেন। ব্যবসা করতে নেমেছিলেন বটে এইচ বসু—তা বলে সাহিত্যের অপমৃত্যু ঘটিয়ে নয়। একজন ব্যবসায়ীর এই দৃষ্টিভঙ্গী নিতান্তই শ্লাঘনীয়।

এই সংখ্যার শেষে সংযুক্ত নিয়মাবলীর দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধারা দুটিতে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছদ্মনামে গল্প প্রকাশের ব্যাপারটিতে যে গোলমাল হয়েছিল, তার যেন গন্ধ পাচ্ছি।

২। পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক যাঁহার ইচ্ছা রচনা পাঠাইতে পারেন কিন্তু নাম গোপন রাখিলে অথবা অন্য নামে রচনা পাঠাইলে তাহা পুরস্কৃত হইবে না। যদি কেহ প্রমাণ করিতে পারেন যে রচয়িতা স্বীয় নাম গোপন করিয়া অন্য নামে রচনা পাঠাইয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছেন, তাহা হইলে সে পুরস্কার উক্ত প্রমাণকারীকে দেওয়া হইবে।'
৪। ...পুরস্কার ঘোষণার একমাস পরে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে, লেখিকাগণ কর্তৃপক্ষের বা আত্মীয়ের অনুমোদনপত্র দেখাইয়া টাকা লইবেন।'

এ বছরের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য আরও একটি সংবাদ আমরা রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে পরে নিবেদন করব।

১৩১১ ॥ এবারের মোট পুরস্কারের সংখ্যা ১৫। প্রথম পুরস্কার পেলেন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 'শাস্তি' গল্প লিখে। অন্যদের মধ্যে ইন্দিরা দেবী, জগদানন্দ রায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং হরিহর শেঠ। শেষোক্ত ব্যক্তি আমাদের কাছে ইতিহাস-প্রিয় মানুষ হিসেবেই পরিচিত—তিনিও যে 'অমৃতে গরল' গল্প লিখে অষ্টম পুরস্কার জিতেছিলেন—এ সংবাদ আমাদের অনেকেরই কাছে অজানা।

এ বছরের প্রকাশকের নিবেদনে যে একটি উক্তি আছে, তার সঙ্গে আমরা একমত—'ত্রিশ টাকা পুরস্কার একটি ছোট গল্পের বিনিময়ে—অন্তত বঙ্গভাষায় নিতান্ত অল্প নহে।'

১৩১২ ॥ এতদিন ধরে 'কুন্তলীন পুরস্কার' প্রকাশিত হচ্ছিল ৫নং শিবনাবায়ণ দাস লেন থেকে। এ বছরের বই প্রকাশিত হল ৬২নং বৌবাজারের অফিস থেকে। প্রায় বারো শোর বেশি গল্প এবারে এসেছিল। কাজেই এগুলি পরীক্ষা করতে সময় লেগেছিল বেশি—ফল প্রকাশে বিলম্বও হয়েছে সে কারণে। গত বছরের বিজ্ঞাপন ছিল ১৫টি গল্প পুরস্কৃত হবে, কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে দশটি গল্প। প্রথমটি হল ভাগলপুরের সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের। অন্যদের মধ্যে ইন্দিরা দেবী ও সরোজকুমারী দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য।

একটা ছোট্ট তিরস্কার আছে এবারের প্রকাশকের নিবেদনে। এ থেকে গল্পে মূল রস সম্পর্কে প্রকাশকের রুচিবোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে:

'গল্পের মধ্যে গল্পের সৌন্দর্য নষ্ট না করিয়া কুন্তলীন ও দেলখোসের অবতারণা করা হয়, ইহাই আমাদের অভিপ্রায়; কিন্তু কোন কোন লেখক গল্প জমাইবার জন্য এই দুইটি পার্থিব পদার্থকে স্বর্গের অমৃত অপেক্ষাও বাড়াইয়া তুলিয়াছেন···এইরূপ স্তুতিবাদের অবতারণায় কোন সুপাঠ্য গল্প রচিত হইতে পারে না, এবং এরূপ অতিরিক্ত প্রশংসা সংবলিত গল্প পাঠ করিতে আমাদেরও সঙ্কোচ বোধ হয়।'

১৩১৩ ॥ একাদশ বর্ষের এই পুরস্কার পত্রিকাতে লক্ষ্য করছি পনেরোটির মধ্যে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন যোগেশচন্দ্র মজুমদার 'রাখী বন্ধন' গল্প লিখে। এবারের প্রকাশকের নিবেদন থেকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য জানতে পেরেছি। যদিও গল্পগুলির নির্বাচন (বারোশ' গল্প থেকে) করে দিয়েছেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, তবুও তার নির্বাচনে প্রকাশক সন্তুষ্ট হতে পারেননি—'এবার পুরস্কৃত গল্পগুলির মধ্যে কোনও গল্প অসঙ্গতি দোষপুষ্ট ও অস্বাভাবিক হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে, কিন্তু সুবিজ্ঞ পরীক্ষক মহাশয় যখন তাহাকে পুরস্কারের যোগ্য মনে করিয়াছেন, তখন এ সম্বন্ধে আমাদের কোনও কথা বলিবার অধিকার নেই।' বাংলা সাহিত্যে যাতে ভাল গল্প নির্বাচিত হয় সেজন্য প্রকাশক শুধুমাত্র নির্বাচকের উপর দায়িত্ব না দিয়ে, নিজেও যে দায়িত্ব পালন করতেন—এ সংবাদ যথার্থই আনন্দের। তাছাড়া আশানুরূপ গল্প পাচ্ছেন না বলে তাঁর যে নতুনতর আহ্বান তাও উল্লেখ্য: 'যে সকল গল্প লেখক পাঁচ টাকা বা দশ টাকা পারিশ্রমিকের পরিবর্তে মাসিক পত্রিকায় গল্প লিখিয়া থাকেন, তাঁহারা একটু চেষ্টা করিলেই কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য ভাল গল্প লিখিয়া পাঠাইতে পারেন।' আসলে ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য গল্প প্রচার উদ্দেশ্য হলেও এঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 'বঙ্গীয় গল্প লেখকগণকে উৎসাহিত ও পাঠকগণকে আমোদিত' করা। এজন্যই এতো বিপুল অর্থ ব্যয় এবং বিনামূল্যে সাহিত্য প্রচারের তুলনাহীন উদ্যোগ।

আগামী বছরের জন্য বিজ্ঞাপন থেকে জানা যাচ্ছে পুনশ্চ 'পূজার চিঠি' (প্রথম দ্বিতীয় বছরের মত) বিভাগে প্রবর্তিত হতে চলেছে এবং কবিতাও আহ্বান করা হয়েছে। এজন্য সর্বমোট দুইশত টাকা পুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে।

১৩১৫ ॥ এখানে একটা সংবাদ দেওয়া দরকার। প্রথম বর্ষ বা দ্বিতীয় বর্ষের সংখ্যাগুলি যেমন সেই সেই বছরেই প্রকাশিত হত, পরবর্তী সংখ্যাগুলি যেমন '১৩০৮ সালের কুন্তলীন পুরস্কার' (ষষ্ঠ বৎসরের) প্রকাশিত হয়েছে ১৩০৯ সনের ভাদ্র মাসে পূজার ঠিক আগে। সেই হিসেবে 'দ্বাদশ বৎসরের পুরস্কার-এর নামপত্রে '১৩১৪' উল্লিখিত হওয়া উচিত ছিল। তা হয়নি। এটির নামপত্রে উল্লিখিত আছে 'কুন্তলীন পুরস্কার ১৩১৫ সন'। এটা কেন হল স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে। তবে কি ছাপার ভুল? না তা নয়। ১৩১৪-এর সংখ্যা ১৩১৫-তে প্রকাশিত হয়। সে কারণে প্রকাশক প্রকাশ-বৎসর অনুসারে এটিকে ১৩১৫-এব কুন্তলীন পুরস্কার (দ্বাদশ বৎসর) হিসাবে প্রকাশ করেছেন। প্রকাশকের নিবেদনে প্রকাশ-তারিখ দেখছি 'দেলখোস হাউস, কলিকাতা ২২শে ভাদ্র ১৩১৫'।

এ বছরের প্রথম পুরস্কারটি পেয়েছেন বাঙালীটোলা, ভাগলপুরের ভূপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ইনি পেলেন ছোট গল্পের পুরস্কার 'পূজার চিঠি' বিভাগে ৪টি নিয়মিত পুরস্কারের প্রথমটি (২০ টাকার) পেয়েছেন 'আলিপুর সাবজজ বাবু মহিমচন্দ্র সরকারের বাসা'র ঠিকানা থেকে শ্রীমতী নিরুপমা দাসী। এ ছাড়াও দুটি অতিরিক্ত পুরস্কারও প্রদত্ত হয়েছে। চিঠিগুলির সম্বোধন বেশ আনন্দপ্রদ—প্রিয়তমেষু, শ্রীচরণেষু ছাড়া আছে দেব, হৃদয়েশ এবং বন্দেমাতরং সম্বোধন। নিবেদিকারা সই করেছেন 'তোমার রানী' 'তোমারই কমলা'-র গতানুগতিকতা ছাড়া 'তোমার ভাঙ্গা ঘরের চাঁদের আলো শৈল।' কবিতা বিভাগে পুরস্কারের সংখ্যা একটি অতিরিক্ত পুরস্কার সমেত পাঁচটি। প্রথম পুরস্কারের কুড়ি টাকা পেয়েছেন কুঞ্জবালা দাসী (৬৯ নং সারপেন্টাইন লেন) 'মন্দির দ্বারে' কবিতাটি লিখে।

এ বছরের 'প্রকাশকের নিবেদন' দীর্ঘতম। সাতটি নিবেদনে প্রকাশক আমাদের কাছে যে তথ্য নিবেদন করেছেন, তার মধ্যে কোন কোনটি নিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ আলোচনা করেননি। অথচ বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে এটা একটা উল্লেখযোগ্য সংবাদ। আগে আগে পুরস্কারের ঘোষণা সম্বলিত তালিকা স্বতন্ত্র প্রকাশিত হত। এ বছর প্রথমে বইয়ের সঙ্গেই তা প্রকাশিত হয়েছে। 'কবিতা ও পূজার চিঠির তুলনায় গল্পগুলি তেমন উৎকৃষ্ট হয়নি বলে প্রকাশকের মনে হয়েছিল। এ-সব হল নিয়মমাফিক সংবাদ। কিন্তু ৪ সংখ্যক ঘোষণাটি এতোই উল্লেখযোগ্য যে আমি হুবহু না তুলে পারলাম না। কারণ 'আগামী বর্ষে পুরস্কার সম্বন্ধে' কিছু নতুন বিষয়ের অবতারণা এতে করা হয়েছে।

'বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টি বিধানের জন্য আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু পারিয়াছি চেষ্টার ত্রুটি করি নাই ; কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের একটি গুরুতর অভাবের কথা আমরা কোন মতেই বিস্মৃত হইতে পারি না। কাহিনী, উপকথা বা রূপকথা নামক এক শ্রেণীর গল্প বহুকাল হইতে এদেশের নরনারীগণের চিত্তরঞ্জন করিয়া আসিয়াছে। সত্য বটে, আজ বঙ্গসাহিত্য বিপুল গল্পভারে ভারাক্রান্ত, নিত্যনূতন উপন্যাস ও গল্প পুস্তকাদি প্রকাশিত হইতেছে কিন্তু বাঙ্গালা দেশের যাহা প্রাণের সামগ্রী, বাঙ্গালার জল বাঙ্গালার মাটির মত আমাদের চিত্তরঞ্জক ও অপরিহার্য—যে সকল কাহিনী ও উপকথা পুরুষ পরম্পরা ধরিয়া মাতৃস্তন্যের ন্যায় শৈশবে আমাদের হৃদয়ের অব্যক্ত ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিয়াছে—আমাদের শিশু-হৃদয়ের নবজাগ্রত কল্পনাকে মুখরিত ও অপূর্ব পুলকালোকে সুরঞ্জিত করিয়াছে—একালে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতেছে। ...এ

সকল উপকথা, এ সকল কাহিনী,—সেই রাক্ষস রাক্ষসী ও ভূতপ্রেতের কাহিনী—সেই তালপত্রের সিপাই, পক্ষীরাজ ঘোড়া প্রভৃতির গল্প আজ যেন স্বপ্নের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে—এবং আধুনিক উৎকৃষ্ট উপন্যাসগুলি অসঙ্কোচে আমাদের বালকবালিকাগণের চিত্তের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতেছে। কিন্তু এখনও ঐ বিপুল গল্প-উপন্যাসের মধ্যেও আমাদের এই কর্মশ্রান্ত জীবন মধ্যাহ্নে—

মনে পড়ে সুয়োরাণী দুয়োরাণীর কথা,
মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর ব্যথা,
—সেই সঙ্গে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান,
'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান্।'

—ইহা কোনক্রমে উপেক্ষার যোগ্য নহে। সেইজন্য আমরা স্থির করিয়াছি আগামী বর্ষে প্রাচীন বাঙ্গালার এই সকল কাহিনী ও উপকথা সুন্দররূপে ছাপাইয়া সুন্দর সুন্দর চিত্র সংযোগে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিব। এজন্য বঙ্গদেশের সর্বস্থানের লেখক লেখিকাগণের সহায়তা আবশ্যক। কিন্তু আমরা বিশেষভাবে দেশের বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-ছাত্রীগণকেও অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা তাহাদের পিতামহী বা মাতামহীগণের নিকট এই সকল উপকথা শুনিয়া বা গ্রামের যে সকল পল্লীবৃদ্ধ এই সকল গল্পের জাহাজ বলিলেও চলে—তাহাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া অনতিরঞ্জিত ভাষায় যথাযথভাবে লিখিয়া পাঠাইবেন। গল্পের মাধুর্য ও ঘটনা বৈচিত্র্যের উপর পুরস্কারের পরিমাণ নির্ভর করিবে। এবং যাহার যতগুলি গল্প উপযুক্ত বিবেচিত হইবে সেই সকল গল্পই পুরস্কৃত হইবে; সুতরাং গল্পের পরিমাণানুসারে একজনেই চারি পাঁচ বা ততোধিক পুরস্কারও লাভ করিতে পারিবেন।

যে সকল গল্প পাঠাইতে হইবে তাহাদিগকে প্রধানতঃ আমরা সাত ভাগে বিভক্ত করিলাম,—(১) দিগ্‌দেশে যাত্রা ও নানা বিপদ হইতে উদ্ধার বিষয়ক (২) প্রণয়-সম্বন্ধীয় (৩) রাক্ষস-রাক্ষসী ও ভূতপ্রেত-সম্বন্ধীয় (৪) ঠগ ও জুয়োচোর বাটপাড়-সম্বন্ধীয় (৫) বুদ্ধিকৌশলের পরিচায়ক (৬) হাস্যকৌতুকপূর্ণ (৭) বিবিধ।'

'অন্যূন দুই শত টাকা' মূল্যের এই পুরস্কার ঘোষণা করে প্রকাশক সতর্ক করে দিয়েছেন, 'আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, কথা সরিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্র বা বিলাতী পরীর উপন্যাস হইতে কোনো গল্প নকল বা অনুবাদ করিয়া দিলে তাহা পুরস্কৃত হইবে না।' এ কারণে 'প্রত্যেক লেখক-লেখিকাকে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতে হইবে—তিনি তাঁহার প্রেরিত গল্প (১) কোন বিদেশী গল্প পুস্তক হইতে অনুবাদ করেন নাই (২) কোন পত্রিকা বা পুস্তক হইতে সংগ্রহ করেন নাই।'

১৩১৬ ॥ ত্রয়োদশ বর্ষ।

এই বিজ্ঞাপন মত রচনা নিয়ে ত্রয়োদশ বর্ষের সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করল ১৩১৭ সনের আশ্বিনের গোড়াতে। প্রকাশক ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন 'পুরস্কার অথবা প্রকাশের উপযুক্ত গল্প অতি সামান্য এসেছে।' প্রথম শ্রেণীতে প্রথম পুরস্কার কুড়ি টাকা পেলেন শ্রীমতী নির্ঝরিণী দাসী (১২১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট) 'রাজপুত্র দুঃখহরণ' রচনার জন্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম পুরস্কার শ্রীমতী রমারাণী দেবী, রচনা—'বীরবল'। তৃতীয় শ্রেণীর প্রথম পুরস্কার 'নীলপদ্ম'-এর রচয়িতা শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী। প্রতিটি রচনা (সর্বমোট ন'টি) পরিবর্তন ও সংশোধনের পর প্রকাশিত। এ সংখ্যার মূল্যবান ছবিগুলি এঁকেছেন পূর্ণচন্দ্র ঘোষ (এই প্রথম সচিত্র সংখ্যা পেলাম ১৩১০ সালে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যাটি ছাড়া); ছবিগুলির ব্লক তৈরি করে দিয়েছেন U. Roy & Sons. লেখকদের কাছে 'বিলুপ্ত প্রায় প্রাচীন কাহিনীগুলি

সংগ্রহে যত্নবান হইয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধনে' সাহায্যের আবেদন জানিয়ে পুনশ্চ তিনশো টাকার মোট পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে।

বাংলার নিজস্ব উপকথা সংগ্রহের প্রথম সংগ্রহ আমরা পেয়েছিলাম লালবিহারী দে-র কাছে। রবীন্দ্রনাথ সাধনা, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ভারতী পত্রিকায় এই লোকসাহিত্য সংগ্রহে এর পর উল্লেখযোগ্য নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন। 'ছেলেভুলানো ছড়া' (সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১) প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—

"'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর, নদী এল বান' এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহমন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনো আমি ভুলিতে পারি নাই। আমি আমার মনের সেই মুগ্ধ অবস্থা স্মরণ করিয়া না দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব না ছড়ার মাধুর্য এবং উপযোগিতা কী।"

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার এরপর একক প্রচেষ্টায় বাংলার এই লুপ্তরত্নোদ্ধার ব্রতে ব্রতী হয়ে ঠাকুরমার ঝুলি এবং দাদামশায়ের থলে বঙ্গীয় পাঠককুলকে উপহার দেন। কিন্তু পত্রিকা মাধ্যমে বঙ্গদেশের সর্বত্র লেখকদের উদ্যোগী হয়ে গোষ্ঠীচেতনার দ্বারা লোককথা সংগ্রহের এই যে উদ্যোগ—তার ইতিহাস বোধকরি তুলনারহিত। কুন্তলীন পুরস্কারের এই সংখ্যাগুলিতে ধৃত এবং রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থান্তর্ভুক্ত লোককবিতাগুলির পাঠ নিয়ে এখনও তুলনামূলক আলোচনার অবকাশ আছে বলে মনে করি। কাজেই 'কুন্তলীন'কে এখন শুধুমাত্র 'গল্প পত্রিকা' বলা সঙ্গত হবে কিনা ভাববার অবকাশ দিলাম।

॥ ৮ ॥

১৩১৭ ॥ এই ১৩১৭ সনেই কুন্তলীন একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন। সেটির নাম 'কুন্তলীন পুরস্কারের দ্বাদশ প্রথম (১৩০৩—১৩১৫)।' ১৩১৭ সনের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত বিগত বারো বছরের প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্পগুলির সংকলন গ্রন্থ এটি। এখনও এই ধরনের একটি গল্পগ্রন্থ—কুন্তলীন পুরস্কার থেকে নির্বাচন করে—প্রকাশ করার অবকাশ আছে বলে মনে করি।

কেন জানি না এরপর কুন্তলীন কিছুকালের জন্য অল্প একটু অনিয়মিত হয়ে পড়ে। এমনকি অবস্থায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে হেমেন্দ্রমোহন বসুর মৃত্যু হয়।

'অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বিগত ২৮শে আগস্ট আমহার্স্ট স্ট্রীটস্থ বাড়িতে বাবু হেমেন্দ্রমোহন বসু পরলোকগমন করিয়াছেন। হেমেন্দ্রবাবু বি-এ পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন ; কিছুদিন মেডিকেল কলেজেও পড়িয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার প্রতিভা অন্যদিকে ধাবিত হইল ; কুন্তলীন, দেলখোস প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া স্বাবলম্বন শক্তি বলে তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় উন্নত ছিল ; স্বদেশের সেবাতে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল ; কলাবিদ্যাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন ; তাঁহার অমায়িক ভাবে সকলেই আকৃষ্ট হইত।...' (তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই ভাদ্র, ১৩২৩ সংখ্যা)

স্বভাবতই তাঁর ন্যস্ত ভার এসে পড়ল জ্যেষ্ঠপুত্র হিতেন্দ্রমোহনের উপর। এখানে আমাকে একটু প্রসঙ্গান্তরে যাবার অনুমতি দিন পাঠক। ঠাকুর পরিবার,রায়চৌধুরী পরিবারের মত বসু পরিবারের বিস্তারিত বিবরণ লেখা থেকে কেউই সংযত হতে পারবেন না। হেমেন্দ্রমোহনের পুত্রকন্যা চৌদ্দটি। নয়টি পুত্রের মধ্যে আজ কেউ বেঁচে নেই। তৃতীয় পুত্র স্বনামধন্য চিত্র-পরিচালক নীতীন্দ্রমোহন (ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে এঁর কাছেই বহু সংবাদ

জেনেছি—এমন সজ্জন ব্যক্তি আমি কদাচিৎ দেখেছি) পঞ্চম পুত্র প্রখ্যাত আলোকিচিত্রশিল্পী মণীন্দ্রমোহন ('মুকুল বোস' নামেই খ্যাত), সপ্তম পুত্র নৃপেন্দ্রমোহন প্রখ্যাত ক্রিকেটবিদ ('কার্তিক বসু' নামে পরিচিত) ; কন্যাদের মধ্যে প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত গায়িকা রবীন্দ্রস্নেহধন্যা মালতী ঘোষাল (এঁর সৌজন্যের কথা স্মরণ করি) এবং শ্রীমতী ললিতা দাস (সংগীতপ্রিয় এই দিদিটির প্রত্যক্ষ সাহায্য না পেলে এই প্রবন্ধের একাংশ রচনাতেও উৎসাহী হতাম না) সুপরিচিত। কিন্তু এখানে তা অপ্রাসঙ্গিক হবে। হিতেন্দ্রমোহন বসু, হেমেন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠ সন্তান, তাঁর প্রসঙ্গে দু-চার কথা জানানো একান্ত প্রাসঙ্গিক হবে। পিতার মত ইনিও প্রতিভাধর সন্তান ছিলেন। হিতেন্দ্রমোহনের ('মুস্কিল' ডাকনাম, জন্ম ২৪ কার্তিক ১৩০০, মৃত্যু ১৫ মাঘ ১৩৬৯) চরিত্রে পিতা এবং মাতুল (উপেন্দ্রকিশোর) উভয়েরই গভীর প্রভাব পড়েছিল, তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল জ্যেষ্ঠ মাতুল সারদারঞ্জনের ক্রীড়াপ্রীতি। মার্কাস স্কোয়ারের ক্রিকেট-মাঠের তিনি ছিলেন স্রষ্টাকর্তা। তেমনি প্রাচীন ইতিকথা, ফার্সী-উর্দু-আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ছিল গভীর অনুরাগ। সংগীতের ক্ষেত্রে তাঁর অধিকারের কথা স্মরণ করে বর্তমানের সংগীতজ্ঞ শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ স্বীকার করেছেন 'হিতেনদা হলেন আমার সে পথের দিশারী।' তাঁর রেকর্ড ভাণ্ডারে থাকত দুষ্প্রাপ্য দেশি-বিদেশি রেকর্ডের সংগ্রহ। বহু জায়গায় তিনি সঙ্গীতের পরীক্ষক হয়ে যেতেন। ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কিত দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সংগ্রহ ছিল তাঁর। গোপনচারী ছিল তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা। মৌলভী রেখে তিনি উর্দু-ফার্সী এবং আরবী শিখেছিলেন। ফলে একজন প্রকৃত 'রইস' বা অভিজাতে পরিণত হয়েছিলেন। মূল ফারসী থেকে হাফেজ ওমর খৈয়াম অনুবাদও তাঁর ভারতবর্ষে প্রথম। আমার সংগ্রহে এর একটি কপি রয়েছে। মূল্যবান কাগজে নয়নমনোহর মুদ্রণ। আদিতে একটি বহুমূল্যবান ভূমিকা। ফিটজেরাল্ডের ইংরাজি অনুবাদ থেকেই বাংলাদেশের অপরাপর অনুবাদকেরা বাংলায় এই কবিতার অনুবাদ করেছেন। কিন্তু সরাসরি মূল থেকে বাংলায় অনুবাদ এই প্রথম (১৩৩৪)। আমি একটি রুবাই-এর অনুবাদ না তুলে দিয়ে পারছি ন :

> শাস্ত্র ধর্মতত্ত্ব লইয়া কেহ বা খুঁজিতে মানে ;
> সন্দেহ বিশ্বাসের দ্বন্দ্বে কেহ বিস্ময় মানে,
> সহসা গোপন মুয়োজ্জিনের কণ্ঠ ফুকরি' উঠে—
> 'ওরে নির্বোধ ! রাস্তা তোদের না এখানে, না ওখানে !'

—উল্লেখযোগ্য, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'ওমর-গীতি' এঁদের কুন্তলীন প্রেস থেকেই ছাপা হয়। প্রবাসী পত্রিকাও প্রথম দিকে ৬১, ৬২ নং বৌবাজার স্ট্রীট, কুন্তলীন প্রেস থেকে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। হিতেন্দ্রমোহন নিজেই তাঁর এই বইটির ছবিগুলি এঁকেছেন। বালিকা ভগ্নী ললিতাকে (সোনাদি) বসিয়ে তিনি এগুলি আঁকতেন। শ্রদ্ধেয় লীলা মজুমদার (এই ভূমিকার উদ্যোগপর্বে তাঁর সহযোগিতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি) লিখেছেন 'প্রথম যখন জেনেছিলাম হিতেনদা ছবি আঁকে, মনটা আনন্দে নেচে উঠেছিল। বই illustrate করে, শুধু ঘর সাজানো ছবি আঁকে না, গল্পের মানুষের জলজ্যান্ত ছবি আঁকে...'। কুলদারঞ্জন রায়ের তখনকার বইয়ের প্রায় সবগুলি ছবিরই চিত্রকর ছিলেন হিতেন্দ্রমোহন। চিত্রশিল্পী পূর্ণচন্দ্র ঘোষের কাছে তিনি ছবি আঁকা শিখেছিলেন। এমনকি গহনার প্যাটার্ন এমব্রয়ডারির ডিজাইন পর্যন্ত আঁকায় ছিল তাঁর গভীর উৎসাহ।

৫২ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ি লাগোয়া ছোট মাঠটি ছিল আদি যুগের বঙ্গীয় ক্রিকেট

খেলোয়াড়দের সৃতিকাগার স্বরূপ। স্পোর্টিং ইউনিয়নের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই খেলার আগে এখানে জমায়েত হতেন। তারপরে মার্কাস স্কোয়ারে অভিযান।

সাহিত্যপ্রেমী প্রকাশক সুধীরচন্দ্র সরকার মশায়ের আড্ডায় হিতেনবাবাবুর ছিল নিয়মিত গতায়াত। হ্যারিসন রোডে Y M C A বিল্ডিংয়ের নীচের এই আড্ডায় আসতেন শরৎচন্দ্র, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, চারু রায়দের সঙ্গে হিতেন্দ্রমোহনও। শুনেছি সুধীরচন্দ্রে আগ্রহে তিনি ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসের উপর রচিত একটি গ্রন্থ রচনার জন্য পাণ্ডুলিপি রচনা করে তাঁর কাছে জমা দেন। জানি না সেটি আজও রক্ষিত আছে কিনা?

মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকেই হিতেন্দ্রমোহন গাইতেন—'মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্ত দ্বারে।' মৃত্যুর দিন স্ত্রীকে ডেকে বললেন 'আজ আমার জন্মদিন'। স্ত্রী লীলা বসু প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, 'সে ত' হলো ২৪শে কার্তিক।' হিতেন্দ্রমোহন বললেন, 'আজ আমার পুনর্জন্ম Re-birth.'

পিতার মৃত্যুর পর হিতেন্দ্রমোহন যখন দায়িত্বভার নিলেন তখন তাঁর বয়স সবে বাইশ উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু খুব আগ্রহ ও বিচক্ষণতার সঙ্গে এই দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে হেমেন্দ্রমোহনের দ্বিতীয় পুত্র জিতেন্দ্রমোহন ('আসান' নামে পরিচিত) ব্যবসায়িক দায়িত্ব সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তাঁর তত্ত্বাবধান কালেই কুন্তলীনের ব্যবসায়ে ঘাটতি পড়ে এবং ক্রমে এটি রহিত হয়। যাই হোক, পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ১৩২৩ সালে 'কুন্তলীন পুরস্কারের' একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করলেন হিতেন্দ্রমোহন স্বর্গত পিতার স্মৃতির উদ্দেশে। দামী কাগজে, বোর্ড বাঁধাই—সোনার জলে ছাপা। এমন মূল্যবান সংখ্যাটি পূর্ববর্তী সমস্ত সংখ্যাগুলির মত (একটি সংখ্যায় পূর্বে মূল্যেব উল্লেখ দেখেছি আট আনা—এবং সেটি দ্বাদশ প্রথম সংখ্যাটি) বিনামূল্যে যে কি ভাবে বিতরিত হয়েছিল একথা ভেবে আজও বিস্ময় লাগে।

সে সময়ে 'কুন্তলীন পুরস্কার'গুলির এক এক বর্ষেই কোন কোন সময়ে একাধিক মুদ্রণ প্রকাশিত হত। এ এক উল্লেখ করার মতো ঘটনা। কোনো কোনো সংখ্যা দশ হাজারেরও বেশি ছাপা হত। আমরা কোনো কোনো খণ্ডের মুদ্রণসংখ্যা পাঠকদের কাছে নিবেদন করছি। বন্ধুবর শ্রীঅশোক উপাধ্যায় আমাকে অনুগ্রহ করে এই তথ্যগুলি সরবরাহ করেছেন।

সপ্তম বৎসরের কুন্তলীন পুরস্কার : প্রথম সংস্করণ : ৮০০০।
অষ্টম বৎসরের কুন্তলীন পুরস্কার : প্রথম সংস্করণ : ৫০০০।
একাদশ বৎসরের কুন্তলীন পুরস্কার : প্রথম সংস্করণ : ৬৫০০।
দ্বাদশ বৎসরের কুন্তলীন পুরস্কার : প্রথম সংস্করণ : ৫৫০০।

যেহেতু পূর্ববর্তী সংখ্যায় কোনো বিজ্ঞাপন প্রকাশের সুযোগ ছিল না, সুতরাং এই সংখ্যায় পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত গল্পাদি থেকে ৪টি রচনা (দুটি গল্প এবং দুটি কবিতা) পুনর্মুদ্রিত হল। এগুলি হল রবীন্দ্রনাথের 'কর্মফল', দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'অদল বদল', কুঞ্জবালা দাসীর 'মন্দির দ্বারে' এবং অম্বুজা সুন্দরী দাসীর 'বুদ্ধিমান রাজার স্বর্গযাত্রা'।

সতর্ক পাঠক এখানে আমাকে আক্রমণের জন্য হয়ত এই মুহূর্তে উদ্যত হবেন। পূর্ববর্তী কোন সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের কোন রচনা প্রকাশের কথা তালিকাগুলি থেকে জানা যাচ্ছে

না, তবুও কেন আমি বলছি রবীন্দ্রনাথেব 'কর্মফল' গল্পটি 'কুন্তলীনের' পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে পুনরুদ্ধৃত হয়েছে। সবিনয়ে এখন এর ইতিহাস নিবেদন করি।

১৩১০ সনে কুন্তলীন-প্রকাশক একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের কর্মফল গল্পটি গ্রন্থভুক্ত করে। এর আখ্যা পত্র নিম্নরূপ : কর্মফল।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ প্রণীত।/ কুন্তলীন অফিস হইতে/ শ্রী এইচ বসু কর্তৃক/ প্রকাশিত।/ কলিকাতা/ ১৩১০ সন।/

অপর পৃষ্ঠায় কুন্তলীন প্রেস হইতে/ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত/ মূল্য ॥ আট আনা মাত্র।/

নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য এই সংখ্যাটিও দেখছি মূল্যেব বিনিময়ে বিক্রিত।

পর পৃষ্ঠায় 'গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন' নিম্নরূপ :

'আমার রচিত এই ক্ষুদ্র গল্পটি গ্রহণ করিয়া/ কুন্তলীনের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন বসু/ মহাশয় বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সাহায্যার্থে তিনশত/ টাকা দান করিয়াছেন।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

তৎপরবর্তী পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের এক অপূর্ব আলোকচিত্র (ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্স কর্তৃক) আর্ট প্লেট-এ মুদ্রিত। এছাড়াও ভিতরে গল্পের সঙ্গে সুন্দর ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ছবি আছে পি সি ঘোষ অঙ্কিত। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩১০ সনের পৌষ মাসে। গল্পটি (একে নাটক বলাই সংগত—পরে এটি নিয়েই শোধ বোধ নাটক রচিত) অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই বন্ধুবর হেমেন্দ্রমোহনকে ছাপার জন্য দিয়েছিলেন। এক পত্রে তার প্রমাণ উপস্থিত—আমার কর্মফল গল্পটা কুন্তলীনরা ছাপাচ্ছে কি না জানেন ? তারা দেখচি শৈলেশকেও হারিয়ে দেবে।' পত্রটি কবি লিখেছিলেন ২৩ শ্রাবণ ১৩১০ সালে।

একটি উল্লেখ করার মত খবর হল—১৩১০ সালে যখন কর্মফল প্রকাশিত হয়, তখন গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরের পাশে কোন সাল তারিখের উল্লেখ ছিল না। পরে ১৩২৩ সনে যখন রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হল তখন দেখি পাশে লেখা 'কলিকাতা।/ সন ১৩১০ সাল/ আমি মূলপত্রটির সন্ধান করি। এবং জানতে পাবি ররীন্দ্রনাথ সহ, তাবৎ লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগের চিঠিপত্রাদি সমস্তই পরবর্তীকালে অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করা হয়েছে। এব চেয়ে আক্ষেপেব বিষয় আর কি হতে পারে !

ডক্টর সুকুমাব সেন প্রসঙ্গত একটি তথ্য আমাকে জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শারদোৎসব নাটকটিরও একটি মুদ্রণ কুন্তলীন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। কেন জানি না, এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ঠাকুরবাড়িব আব কারও রচনা 'কুন্তলীন' প্রতিযোগিতায় মুদ্রিত দেখি না।

১৩২০ বঙ্গাব্দে 'কুন্তলীন পুরস্কারে'র কোনো খণ্ড প্রকাশিত না হলেও গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকদের জন্য এইচ বসু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্পগ্রন্থ 'বরণডালা' প্রকাশ করেন। এটিও তথ্য হিসাবে নিবেদনযোগ্য। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে ভেবেই বইটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করছি না।

পুনশ্চ পুরাতন প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

১৩২৪ ॥ ১৩২৩ বঙ্গাব্দের সংখ্যাটির শেষে (এবার থেকে আর বর্ষের উল্লেখ নেই) বিজ্ঞাপন ছিল পুনশ্চ পুরস্কার-প্রদানের এবং হিতেন্দ্রমোহন বসু প্রকাশক হিসাবে নিয়মাবলীও ছেপে দিয়েছিলেন। (একটা কাকতলীয় যোগের কথা আমার মনে পড়ছে—হেমেন্দ্রমোহন বসুর পুত্র হিতেন্দ্রমোহন, এবং হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র

হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সাদৃশ্যের) এই নিয়মাবলীতে নতুন কোন সংবাদ নেই। শুধু জানা গেল পরবর্তী পুরস্কারের মোট মূল্য হবে নগদ একশত টাকা এবং প্রথম পুরস্কারের মূল্য এখন ২৫্ টাকা। ১৩২৪ সনের পুরস্কারে মোট দশটি গল্প মুদ্রিত হয়েছে। প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন প্রতিভা দেবী 'ভিখারীর দান' গল্পের জন্য। লক্ষ্য করার বিষয় এই সংখ্যায় এবং পরবর্তী সংখ্যার গল্পগুলির সঙ্গে পুরস্কারের পরিমাণ মুদ্রিত হয়নি (যেমন আগে হত)। মানকুমারী বসুও এই সংখ্যায় 'অদ্ভুত মিলন' গল্প লিখে ৭ম পুরস্কার পেয়েছেন।

এবারের গল্পগুলি নির্বাচন করে দিয়েছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

এই সংখ্যার শেষে ১৩২৫ সনের জন্যও পুরস্কারের বিজ্ঞাপন ছিল, সম্ভবত তা আর প্রকাশিত হয়নি। অন্তত বহু সন্ধানে আমি দেখতে পাইনি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, চৈতন্য লাইব্রেরী, শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র ভবন, বড়া বয়েজ ক্লাব, রামমোহন লাইব্রেরী প্রভৃতি ছাড়া (জাতীয় গ্রন্থাগারে একটিও কপি নেই।) বহু ব্যক্তিগত সংগ্রহেরও আমি দ্বারস্থ হয়েছিলাম। যেমন যদুনাথ সরকারের পারিবারিক সংগ্রহ।

এই প্রসঙ্গে 'কুন্তলীন পুরস্কারে'র বইগুলি সংগ্রহে যাঁদের আনুকূল্য পেয়েছি তাঁদের নাম সানন্দে উল্লেখ করার সুযোগ নিচ্ছি। এঁদের কেউ কেউ অবশ্য আমাকে পরবর্তীকালে নানা দুঃখও দিয়েছেন। কিন্তু আজকের দিনে সেকথা নাই বা স্মরণে রাখলাম। অনেকে আবার বহুবার বহু প্রসঙ্গে আমাকে সাহায্য করেছেন। সে কথাটাই বড় করে মনে রাখছি।

যাঁরা বই দিয়ে সাহায্য করেছেন	**যাঁরা অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন**	**যাঁবা তথ্য প্রদান ও অন্যভাবে সাহায্য করেছেন**
অমিয়নাথ সরকার	দেবব্রত বসু	নীতিন বসু
অশোক উপাধ্যায়	দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	মালতী ঘোষাল
অমরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী	সৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	লীলা মজুমদার
আরতি মিত্র	ভূপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	মালবিকা কানন
তরলিকা দেবী	তুষার গঙ্গোপাধ্যায়	বীরেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়
বিশ্বজিৎ রায়	বিমলচন্দ্র নাগ	সুভাষচন্দ্র ঘোষ
মায়া দে	রাধারাণী দেবী	প্রবোধ সান্যাল
ললিতা দাস	মাখনলাল কুণ্ডু	সুষমা দাস
শৈলেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	মনোবঞ্জন শেঠ	যোগানন্দ দাস
সত্যজিৎ রায়	দরদিন্দ্রকুমার রায়	আনন্দবাজার, যুগান্তর,
সুকুমার সেন	ও	Amrita Bazar
	আরও অনেকে	Patrika, দৈনিক বসুমতী
		পত্রিকা, দেশ

যাঁরা লিপিকরণে সাহায্য করেছেন :
অরবিন্দ সরকার, শীলা দে, শ্যামলবরণ সাহা, সুভাষ মণ্ডল।

যাঁদের নামোল্লেখ করা গেল না, তা ঘটেছে আমার বিস্মৃতিবশতঃ। সকলকেই শ্রদ্ধা-প্রীতি নিবেদন করি এই সুযোগে।

কুন্তলীন পুরস্কারের অন্ত্যলীলায় আমরা পৌঁছে যাচ্ছি।

১৩৩৪ ॥ 'কুন্তলীন পুরস্কার' পুনশ্চ প্রকাশিত হল ১৩৩৪ সনে। এই বিলম্বের কারণ স্বরূপ প্রকাশকের নিবেদন আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি সপ্তম অধ্যায়ে। এবারের গল্পগুলি সংগ্রহের দায়িত্ব পেয়েছিলেন সুধীরচন্দ্র সরকার এবং সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। কোন গল্পই অবশ্য পুরস্কৃত নয়। বস্তুতপক্ষে পরবর্তী সংখ্যাগুলির কোন রচনাই পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা নয়—যদিও সম্মান মূল্য প্রদত্ত। 'এ বৎসর কোনরূপ প্রতিযোগিতা ছিল না এবং সেই জন্য এবারের উপহারের নামটি (পুরস্কার) অর্থশূন্য হইয়াছে। বরাবরের নামটি এবারও রাখিয়াছি বলিয়া আশা করি কেহ কিছু মনে করিবেন না।'

ভাদ্র ১৩৩৪ সনে প্রকাশিত এই সংখ্যাটিতে ১০টি গল্প প্রকাশিত হয়েছে—প্রত্যেকেই খ্যাতিমান। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, রাধারাণী দত্ত (ইনিই পরে রাধারাণী দেবী), হেমেন্দ্রকুমার রায়, নগেন্দ্রনাথ মিত্র, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এস ওয়াজেদ আলি এবং অনুরূপা দেবী।

ছ'টি চিত্র সম্বলিত সংখ্যাটি চিত্রিত করেছেন' পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।

১৩৩৫ ॥ ১৩৩৪ সনের গ্রন্থে ১৩৩৫ সনের জন্য পুরস্কারের ঘোষণা ছিল মোট একশত টাকাব। কিন্তু পরের বছরে 'এমন একটি গল্পও আসে নাই, যাহা,···পুরস্কার পাইতে পারে।' সুতরাং বাংলার প্রখ্যাতনামা কথা সাহিত্যিকেরা ১৩৩৫ সনের গ্রন্থটি অলঙ্কৃত করেছেন। সংকলিত আটটি গল্পের রচয়িতারা হলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, তমাললতা বসু, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং হেমেন্দ্রকুমার রায।

এই সংখ্যার ন'টি ছবিই এঁকেছেন পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।

১৩৩৬ ॥ শারদীয়ার আনন্দ কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিবার আশায় এবারেও 'কুন্তলীন পুরস্কার' প্রকাশ করেছেন হিতেন্দ্রমোহন। মোট ন'টি গল্পের রচয়িতারা হলেন—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, পূর্ণশশী দেবী, শিবসুন্দর শর্মা, তমাললতা বসু, মণীন্দ্রলাল বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং সজনীকান্ত দাস। পঞ্চম ব্যক্তির পরিচয় কি ছদ্মনামের আড়ালে সংগুপ্ত?

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। তাঁর কাগজপত্র খুঁজতে খুঁজতে 'বাইজি' গল্পটির সন্ধান পেয়ে পুত্র মোহনলাল প্রকাশেব জন্য হিতেন্দ্রবাবুকে দেন। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এটি উদ্যোগী হয়ে সংগ্রহ করেন।

শিল্পী পূর্ণচন্দ্র ঘোষ অসুস্থতার কারণে ছবি আঁকতে পারেন নি।

১৩৩৭ ॥ সর্বশেষ সংখ্যাটির কথা এবারে আমাকে বলতে হবে। আশ্বিন ১৩৩৭ সনে কুন্তলীন পুরস্কারের সর্বশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হল পরশুরাম, নরেন্দ্র দেব, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মণীন্দ্রলাল বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের গল্প সপ্তক নিয়ে।

রাজশেখর বসুর (পরশুরাম) গল্প প্রসঙ্গে প্রকাশক জানিয়েছেন 'কুন্তলীন পুরস্কারটিকে তিনি কি চক্ষে দেখেন, সে-বিষয়ে শুধু এইটুকু বলিলেই চলিবে যে, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গল্প দিয়াছেন।' এইসব গল্প সংগ্রহে সহায়তা করেছেন পূর্ববৎ সুধীরচন্দ্র সরকার এবং সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

পূর্ণচন্দ্র ঘোষ অসুস্থ। সে কারণে পরশুরামের বিখ্যাত হনুমানের গল্পটি বিচিত্রিত করে

দিয়েছেন বন্ধুশিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন।

১১

১৩০৩ থেকে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত কুন্তলীন পুরস্কারের ইতিহাস আমরা এইভাবে বিবৃত করলাম। এবারে এই সংকলন সমূহের বৈশিষ্ট্য নিয়ে দু চার কথা নিবেদনযোগ্য মনে করি :

কুন্তলীন পুরস্কার প্রধানত পুরস্কৃত রচনার সংকলন। বাংলা সাহিত্যে পুরস্কার প্রদানের এটি অবশ্য প্রথম ইতিহাস নয়। তার সন্ধান করতে গেলে অবশ্য রংপুর কুণ্ডীর জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরীর নাম করতে হয়। সেসব কথা উল্লেখ না করাই ভাল। তবে ছোট গল্প বচনা এবং বাংলার গ্রামগঞ্জ থেকে রূপকথা সংকলনের উদ্যোগে কুন্তলীনের ভূমিকাকে প্রথম বলা যেতে পারে। এই পুরস্কারের অর্থ পরিমাণ বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে—কখনও বেড়েছে, কখনও বা কমেছে। পুরস্কৃত রচনার সংখ্যারও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেছে। ১৩২০ বঙ্গাব্দের সংখ্যায় প্রকাশক অবশ্য ঠিকই দাবী করেছেন—'কুন্তলীনের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকদিগকে প্রীতি-উপহার দিয়া প্রীত করা মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও আমার আব একটি গৌণ উদ্দেশ্যও ছিল—তাহা বঙ্গসাহিত্যের কথঞ্চিৎ পুষ্টি সাধন করা।'

কাজেই হয়তো কেউ ভাবতে পারেন প্রদত্ত পুরস্কারের অর্থ পরিমাণ নগণ্য। পরিমাণ নগণ্য কিনা আর্থনীতিকেরা বিচার করতে পারেন ১৩০৫ সালের অর্থসূচকের দ্বারা। নব্বই বছর পার হয়ে গেল সে কথা স্মরণে রেখে ৩০্ টাকার পুরস্কারের মূল্য ভাবতে হবে। অবশ্য অর্থ পরিমাণ দিয়ে কোনো কালেই লেখক বা লেখা, কারো বিচার হয় না। তাছাড়া 'পুরস্কার' শব্দের একটা তৃতীয় অর্থও আছে। এবং সেটাই মুখ্য। তা হল এগিয়ে দেওয়া। কুন্তলীন সেই এগিয়ে দেওয়ার ভূমিকা যেভাবে পালন করেছে, তা ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য বিষয়। বহু লেখকের জীবন পথ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। বহু মহিলা লেখক তৎকালীন বাধানিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে আত্মপ্রকাশের পথ পেয়েছেন। বহু বিখ্যাত লেখকের প্রথম রচনার প্রকাশক কুন্তলীন, যেমন শরৎচন্দ্র। আরও একজনের নাম করতে পারি। তিনি সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

তাছাড়া প্রতি পাঠকই বোধকরি পুরস্কৃত হতেন। কারণ কুন্তলীন নির্মিত দ্রব্যাদি যাঁরা কিনতেন তাঁরা বিনামূল্যে এই বইগুলি পেতেন। সে যে কী অপূর্ব ব্যাপাব, তা ভাবতেও পারা যায় না। এক একটি সংখ্যা ছাপা হত সহস্রাধিক কপি। পাঠকদের মধ্যে সাহিত্যে রুচি গঠনেব যজ্ঞে নেমে ছিল কুন্তলীন। একি শুধু ব্যবসা বুদ্ধিরই পরিচায়ক ? বিনামূল্যে প্রদত্ত হওয়াতে একটা ক্ষতিও বোধকরি হয়েছিল—এতো শীঘ্র এর সংখ্যাগুলি এমন দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে।

ব্যবসা ক্ষেত্রে একটা তুলনাচিত্র এখানে তুলে ধরি। ১৩২৩ সনে হেমেন্দ্রমোহনের মৃত্যু হল। ঐ বছর থেকে শর্মা ব্যানার্জি অ্যাণ্ড কোং নামক কেশ তৈল প্রস্তুতকারক একটি সংস্থা প্রকাশ করতে লাগলেন একটি বার্ষিক গল্প সংখ্যা। নাম 'নিরুপমা বর্ষস্মৃতি'। ছাপা হত আব একটি কেশ তৈল উৎপাদক সংস্থা লক্ষ্মীবিলাস প্রেস, ১৪ জগন্নাথ দত্ত লেন থেকে। প্রতি বর্ষে এঁরা সাহিত্যের মন্দিরে····মণিদীপমালা জ্বালিবাব জন্য খনির অন্ধকার হইতে মণি কুড়াইয়া····মালা গড়িয়াছেন।' প্রতিষ্ঠিত লেখকরা ছাড়া 'নবীন রচযিতাগণের রচনাও প্রকাশার্থ বিবেচনা করা' হত। অষ্টম বর্ষ (১৩৩১) নিরুপমা বর্ষস্মৃতির পক্ষে জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিবেদন করেছেন, 'সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্য সেবীগণ বিনামূল্যে তাঁহাদের মস্তিষ্কপ্রসূত রত্নরাজী সাধারণের করে উপহার দিবার সৌভাগ্য আমাদিগকে দিয়া যে অপূর্ব

বদান্যতা ও সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন তাহা যে কোন দেশের সাহিত্য জগতে দুর্লভ।'

তৎকালীন প্রখ্যাত গল্প লেখকরা সকলেই এতে লিখেছেন। তবে এক হিসাবে এঁরা উদার ছিলেন, কারণ এঁদের গল্প বা কবিতাগুলির ভিতর তেলের বিজ্ঞাপন—এমন কি উহার নাম পর্যন্ত নাই।' তবুও কোনকালেই এর সংখ্যাগুলি (তুলনায় অবশ্যই মূল্যবান এবং নয়নমনোহর) বিনামূল্যে বিতরিত হত না। প্রথম ছয় বছর এগুলি এক টাকা মূল্যে এবং সপ্তম বৎসর থেকে এক টাকা চার আনা দামে বিক্রিত হত। অবশ্য ২৫টি কুপন পাঠালে (প্রস্তুত গন্ধদ্রব্য ক্রয়ের) বর্ষস্মৃতি বিনামূল্যে প্রদত্ত হত। এর চমৎকার ছবিগুলি আঁকতেন হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতিরা।

প্রাসঙ্গিক হবে মনে করে সমসাময়িক দুটি পত্রিকা থেকে দুটি সমালোচনা এখানে তুলে দিলাম। তা থেকে এখনকার পাঠক সে সময়ের পাঠকদের প্রতিক্রিয়া জানতে পারবেন। প্রথমটি 'রঙ্গ-দর্শন' পত্রিকার ১ম বর্ষ ১১শ সপ্তাহ, ২৩শে কার্তিক ১৩৩২ সংখ্যা থেকে গৃহীত [সাহিত্য প্রসঙ্গ বিভাগে]। পরেরটি গৃহীত হয়েছে 'ভারত মহিলা' পত্রিকার চৈত্র ১৩১৭ সংখ্যা থেকে। এটি 'বাঙ্গালা সাহিত্যে ছোট গল্প' শিরোনামে লিখেছিলেন কবি-সমালোচক নলিনীকান্ত ভট্টশালী। এর প্রয়োজনীয় অংশগুলি মাত্র চয়িত হল।

[১]

বর্ষে বর্ষে পূজার সময় এখন আর 'কুন্তলীন-পুরস্কার' নব নব সুমিষ্ট গল্পসম্ভার বুকে করিয়া বাজারে বাহির হয় না। আজকাল যাহা বাহির হয়, তাহার আকার দেখিয়া অবশ্য বলিতে পারা যায়,—'পতঙ্গের বদলে মাতঙ্গ' পাইতেছি, কিন্তু তাহার ভিতর দেখিলে বলিতে ইচ্ছা করে—"বাহিরে কেবল চাকুম্-চুকুম্, ভিতরে শুধু খ্যাড়।"—'কুন্তলীন পুরস্কারে'র বাহির-চটক না থাকিলেও, ভিতরে যাহা থাকিত, তাহা আধুনিক কোনও বার্ষিকীতেই পাওয়া যায় না।

★ ★ ★

'কুন্তলীন পুরস্কার' গল্পের গুণানুসারে গল্প-লেখকগণকে পয়সা দিত, এবং বিনা পয়সায় পাঠক-সমাজে তাহা বিলি করিত। এখনকার পাঠকেরা পয়সা খরচ করিয়া আবর্জনা ঘরে তুলিতেছেন। 'নিরুপমা-বর্ষ-স্মৃতি' বা 'শরতের ফুল' প্রভৃতি ওজনে ভারী হইলেও ইহাদের মধ্যে পাঠযোগ্য রচনা কয়টা থাকে? এই জাতীয় পুস্তক ও পত্রিকা হাতে করিলেই ঠাকুরদাস বাবুর সেই কথাটা মনে পড়ে যে, "কবির অভাবে অনর্থক আপনাদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি না করিয়া, কুলেখকের কদর্য রুচি ও জঘন্য রচনা না ছাপাইয়া, বরং রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, নাটক, নভেল—নিদেন পাঁচালী, পীরের গান, ছেপে দেওয়াই শ্রেয়। তাহাতে পুরাতন গ্রাহক রক্ষা ও নূতন গ্রাহকও কিছু কিছু আমদানী হইতে পারে।" —বাস্তবিক, বাসি হইলেও মিষ্ট লাগে, এমন যে সকল সামগ্রী গুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় অবস্থায় বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে, তাহাদিগকে আবার নূতন করিয়া ছাপিতে পারিলে, এখনকার পনের আনা তিন পাই পাঠকের নিকট তাহা আন্‌কোরা নূতন বলিয়াই বোধ হইবে। শুধু তাহাই নহে,—আধুনিক অনেক লেখকের কলমও তাহা হইলে গোঁত্তা খাইয়া পড়িবে। তবে কথা এই যে, পুরাতনের পর্দা তুলিয়া তাহার ভিতর হইতে মূল্যবান সামগ্রী খুঁজিয়া বাহির করিবে কে? সাময়িক-সাহিত্য-ক্ষেত্রে কাঁচির সদ্ব্যবহার করিতে জানাও একটা বিশেষ গুণ। —তাহাতে বিদ্যা ও বুদ্ধি দুয়েরই দরকার হয়। কিন্তু সে বিদ্যা ও বুদ্ধি

আধুনিক সম্পাদকদের মধ্যে কয়জনের আছে ? তেল জল অবলম্বনে পয়সা করিয়া তাহারই জোরে যাহারা সম্পাদক সাজিতেছে, তাহাদের নিকট এ সব আশা করাই দুরাশা মাত্র।

[২]

'১৩০৩ সনে শ্রীযুক্ত এইচ বসু মহাশয় নূতন লেখক-লেখিকাদিগকে সাহিত্য চর্চায় কতক পরিমাণে উৎসাহিত করিতে, "গৌণভাবে কুন্তলীন ও দেলখোসের প্রচার" করিবার জন্য কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য প্রভূত পরিমাণে সফল হইলেও প্রধান উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে ঠিক বলিতে পারিতেছি না। ১৩০৩ হইতে ১৩১৫ পর্যন্ত বার বৎসরে আমরা বারখানা উৎকৃষ্ট গল্পপুস্তক পাইয়াছি। কিন্তু একান্ত দুঃখের বিষয় যে, অনেক ক্ষমতাশালী নূতন লেখক একবার মাত্রই কুন্তলীন পুরস্কারের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া, বঙ্গসাহিত্যের বিপুল আসরে বারেক চমকিয়া আবার অন্ধকারে হারাইয়া গিয়াছেন। এমন কি, অনেকবার দেখিয়াছি, যিনি প্রথম পুরস্কারও পাইয়াছেন তাঁহারও ভবিষ্যতে আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় নাই। ইহার কারণ কি ঠিক করা দুষ্কর।....

এই কুন্তলীন পুরস্কার রচনার পুস্তকগুলি প্রত্যেক বৎসর এক একবার মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে। ফিরিয়া আর এগুলি মুদ্রিত হইবার সম্ভাবনা নাই ; কাজেই এগুলিকে সাময়িক সাহিত্য বলিলে অন্যায় হয় না।....

এই কুন্তলীন পুরস্কার রচনাগুলি পড়িতে পড়িতে আমরা আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি। এক এক বৎসরে এক এক সাহিত্যিকের উপর রচনা নির্বাচনের ভার ছিল, এবং একটু মনোযোগ দিয়া পড়িলে সহজেই দেখা যায়—পরীক্ষকগণের বিভিন্ন রুচি অনুসারে বৎসরে বৎসরে গল্পগুলি কেমন বিভিন্ন প্রকৃতির হইয়াছে।....চতুর্থ বৎসরের পরীক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়। সকলেই জানেন নগেন্দ্রবাবু সুন্দর সুখপাঠ্য তরল চমকপ্রদ ঘটনাপূর্ণ গল্প লিখিবার জন্য বিখ্যাত। তাঁহার নির্বাচিত গল্পগুলিও সেই রকম তরল, সুখপাঠ্য ও চমকপ্রদ ঘটনাপূর্ণ।....সপ্তম বৎসরের কুন্তলীন পুরস্কারের প্রধান গল্প "মন্দির" শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ভাগলপুর হইতে লিখিয়াছিলেন। ইনি কি বিখ্যাত চিত্রকর স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ? যদি তাহাই হয় তবে আমরা একজন শ্রেষ্ঠ উদীয়মান লেখক হারাইয়াছি। যদি তাহা না হয়—ভগবান তাই করুন, তবে যিনি এমন সুন্দর গল্প লিখিতে পারেন তাঁহার চুপ করিয়া থাকা ভাল হয় না। আশা করি তিনি বঙ্গসাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন। এই বৎসরের পঞ্চম গল্পটির নাম "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে" ; লেখকের নাম দেখিতেছি শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ। ইনি বোমার মোকদ্দমায় নির্বাসিত বারীন্দ্র হইলে আমরা এক শক্তিশালী লেখক হারাইয়াছি। তাঁহার অন্য কোনও রচনা কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই প্রথম রচনাতেই তিনি যে মুন্সীয়ানা দেখাইয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালা ভাষায় খুব বেশী দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।....

এই দ্বাদশ বৎসরের কুন্তলীন পুরস্কারে অধিকাংশ গল্পই নিতান্ত কাঁচা হাতের লেখা হইলেও প্রায় প্রত্যেক বৎসরের পুস্তকেই দুই তিনটি করিয়া এমন গল্প আছে যাহা বঙ্গভাষার স্থায়ী সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে এবং এই কারণে সযত্নে রক্ষার যোগ্য। এইগুলি পুনর্মুদ্রিত হইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই অথচ কুন্তলীন পুরস্কার পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে এইগুলি লুপ্ত হইয়া গেলে বড়ই দুঃখের বিষয় হইবে। এই অবস্থায় কোন প্রকাশক যদি

উপযুক্ত নির্বাচক দ্বারা নির্বাচন করাইয়া এই দ্বাদশ বৎসরের গল্প পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন তবে বাঙ্গালা ভাষার একখানা উৎকৃষ্ট সুখপাঠ্য গল্পপুস্তকের সৃষ্টি হইতে পারে।.....কোন সুযোগ্য ব্যক্তির উপর এই ভার দিলেই চলিবে।'....

সমালোচক যে সমালোচনা করেছেন তা তাঁর দূরদর্শিতারই পরিচয়। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ওরফে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর উক্তি কালের নিরিখে প্রমাণিত হয়ে গেছে। 'কুন্তলীনে'র সব গল্পই সুপাঠ্য ছিল না—সেজন্যই আমাদের গল্প নির্বাচন করতে হয়েছে। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে মূল্যবান গল্পগুলি হারিয়ে যাবে। হারিয়ে যেতেই বসেছিল। দীর্ঘ প্রায় ৬০ বছর পরে পুনশ্চ নির্বাচিত গল্পগুলি প্রকাশ করা হল। নির্বাচক 'উপযুক্ত এবং সুযোগ্য' কিনা সে বিষয়ে একালের পাঠক বিচার-বিবেচনা করবেন। তবে এই হারানো মানিক প্রকাশে দুজনের ভূমিকা সবচেয়ে স্মরণযোগ্য। দেশ-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীসাগরময় ঘোষ যদি আমার প্রবন্ধ 'কুন্তলীন পুরস্কার ও এইচ্ বোস' দেশ পত্রিকার ১৩৮৩ সালের বিনোদন সংখ্যায় প্রকাশ না করতেন—তবে হয়তো আর এগোনোই যেত না। আর আনন্দ পাবলিশার্স-এর সুযোগ্য প্রকাশক শ্রীবাদল বসু যদি সাহসভরে এগিয়ে এসে এই বিশাল বই প্রকাশ না করতেন তবে এ বই কখনই সূর্যের আলো দেখতো না। আমি দুজনের কাছে বিশেষ করে তাই কৃতজ্ঞ।

আরও একটি কেশতৈল সংস্থা কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। এঁর একটি ছাপাখানাও ছিল। এঁর নগেন্দ্র স্টীম কোম্পানি থেকে হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের প্রচুর উপন্যাস ছাপা হত। সেগুলি বিনামূল্যে বিতরিতও হত।

কুন্তলীনের উদ্যোক্তা এইসব উদ্যোগকে অভিনন্দিত করে লিখেছিলেন— '....দেখিতেছি অনেক নূতন ব্যবসায়ী আমাদের প্রবর্তিত পন্থার অনুসরণ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প রচনার জন্য লেখকগণকে পুরস্কৃত করিতেছে, আমরা যে পথে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলাম—এখন অনেকেই সেই পথে অগ্রসর—ইহা গল্প লেখকগণের পক্ষে যথেষ্ট উৎসাহ ও আমাদের পক্ষে বিশেষ আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই।'—২২ ভাদ্র ১৩১৫।

বস্তুত এঁদের উদ্দেশ্যও ছিল মহৎ। কিন্তু উপায়, লক্ষ্য এবং জনপ্রিয়তায় এঁরা কুন্তলীনের ধারে-পাশেও যেতে পারেন নি।

যাঁরা খ্যাতিমান, প্রবন্ধ মধ্যে তাঁদের উল্লেখ করেছি। এঁদের সাহিত্যকৃতি পুনঃপরিচয় প্রদানের অপেক্ষা রাখে না। অনেকেই আছেন, যাঁরা আজকের দিনে অখ্যাত; কিন্তু প্রথম শ্রেণীর গল্প রচয়িতার সামর্থ্য তাঁদের ছিল। এঁদের অনেকের পরিচয় হারিয়ে গেছে। অনেক সন্ধান করেছি কিন্তু জানতে পারিনি। দু একজনের পরিচয় দিই :

বিনয়ভূষণ সরকার—(১৩০৫, ১৩০৮ ও ১৩০৯-এর গল্প বিজয়ী)—ইনি ছিলেন ভাগলপুর জেলা স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক। কবিতা গল্পাদি লিখলেও ছোটদের জন্যে লেখার হাত ছিল। কলকাতা থেকে প্রকাশিত প্রকৃতি মাসিক পত্রের সঙ্গে একদা সংযুক্ত ছিলেন। ভাগলপুরের বাঙালি টোলার কাছে রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণ রোডে বামাচরণ ঘোষের বাড়ীতে তিনি ভাড়া থাকতেন।

যোগেশচন্দ্র মজুমদার (১৩১১, ১৩১২, ১৩১৩-এর পুরস্কার বিজয়ী) শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। ভাগলপুর থেকে শরৎচন্দ্র ও অন্যান্যেরা 'ছায়া' নামে যে হাতের লেখা পত্রিকাটি প্রকাশ করতেন তার সম্পাদক ছিলেন। প্রবাসী সংহতি, ভারতবর্ষ, সন্দেশ প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। 'দাদুবাণী', 'কবির বাণী' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক।

ভূপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (জন্ম ১লা জানুয়ারি ১৮৯২, মৃত্যু ২৯এ মার্চ ১৯২০)। ইনি

সমস্তিপুরে ওকালতি করতেন। অভিজ্ঞতার মূল্য নামে একটি উপন্যাসের রচয়িতা। ভারতবর্ষ পত্রিকায় ছোট গল্প লিখতেন। শেষ জীবনে সাহিত্য চর্চা ছেড়ে অধ্যাত্ম চর্চায় মনোনিবেশ করেন।

কুন্তলীন পুরস্কারের প্রথম পর্যায়ে (১৩২৪ সন পর্যন্ত) মুদ্রিত রচনাগুলিতে লেখকের নামের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ঠিকানাও সংযুক্ত থাকতো। এই ঠিকানাগুলি দেখে এমন একটি সিদ্ধান্ত গড়তে চলেছি, বাংলা ছোট গল্পের ইতিহাসে কেন, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পক্ষে যা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে আমার বিশ্বাস। শুধু বাংলা দেশ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী বাঙালী সাহিত্যিকেরা এই পুরস্কারে অংশ গ্রহণ করে এর ভূ-পরিধিকে বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন। এমনটি আর কখনও ঘটেনি। আমি কয়েকটি বছরের স্থানের তালিকা উদাহরণ স্বরূপ নিবেদন করি।

১৩০৫ ॥ কলিকাতা, হাওড়া, পাকুড় (সাঁওতাল পরগনা), ভাগলপুর, যশোর, মেদিনীপুর, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ।

১৩০৬ ॥ শ্রীহট্ট, বরোদা (গায়কাড় রাজ্য), রাজসাহী, মজঃফরপুর, কৃষ্ণনগর (নদীয়া), কুচবিহার, পুরী (উড়িষ্যা)।

১৩০৭ ॥ রাজশাহী, যশোহর, মৃজাপুর।

১৩০৮ ॥ বৈদ্যনাথ দেওঘর, মুঙ্গের, ফরিদপুর, বালিয়া।

১৩০৯ ॥ ভাগলপুর, মালদহ, বৈদ্যনাথ দেওঘর, গাজিপুর, বালিয়া, রাজশাহী, চুঁচুড়া, ঢাকা।

১৩১০ ॥ গাজীপুর, পাঞ্জাব, কুচবিহার, নেপাল, হাবড়া।

১৩১১ ॥ রাওয়ালপিণ্ডি, শিয়ালদহ, চন্দননগর, মজঃফরপুর, করিমগঞ্জ, হুগলী।

১৩১২ ॥ ভাগলপুর, সম্বলপুর, যুক্তপ্রদেশ, বীরভূম।

১৩২৪ ॥ হুগলী, বরিশাল, দিল্লী, নদীয়া, রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ, শাহাবাদ।

কলকাতার নাম বার বার উল্লেখ করিনি। অন্য স্থানসমূহের মধ্যে সিংহভাগ কেড়ে নিয়েছে ভাগলপুর। শরৎ সাহিত্যের সূতিকাগার ভাগলপুরের এটা যোগ্য মর্যাদা বটে।

কুন্তলীন পুরস্কার প্রথমে সচিত্র ছিল না। পরে উপকথা প্রতিযোগিতা প্রসঙ্গে এটি প্রথম সচিত্র হয়। এর পূর্বে 'কর্মফল' গ্রন্থটি অবশ্য সচিত্র ছিল। হেমেন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর থেকে পুরস্কারগ্রন্থগুলি 'সচিত্র কুন্তলীন পুরস্কার' নামে প্রকাশিত হতে থাকে (প্রথমাবধি কুন্তলীনের যে আকৃতি ছিল পরে তা পরিবর্তিত হয়)। অবশ্য কুন্তলীনের সংখ্যাগুলি 'নিরুপমা বর্ষ স্মৃতি'র মত মহার্ঘ চিত্রে শোভিত হয়নি কখনও। কুন্তলীনে ছবি আঁকতেন পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, পি. ঘোষ নামেই সমধিক পরিচিত। খুব ওয়াকিবহালরা ছাড়া এঁর পরিচয় অনেকেই জানেন না। ১২৯২ বঙ্গাব্দে জন্ম। পিতা হালিশহর কোনা নিবাসী কালীনাথ ঘোষ। শৈশবে গাজিপুরে থাকতেই তাঁর চিত্রপ্রতিভার স্ফুরণ লক্ষিত হয়। কলকাতায় পিতৃহীন অবস্থায় এসে বিদ্যাসাগর ইন্সটিটিউশনে ভর্তি হন। পাঠ অসমাপ্ত রেখে ভর্তি হন সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ে। চিত্রবিদ্যার পাঠ গ্রহণ করেন প্রথমে হ্যাভেল এবং পরে অবনীন্দ্রনাথের কাছে। অবশ্য অবনীন্দ্রনাথের নব্য ভারতীয় কলার অনুশীলন ও প্রচারকে অনুসরণ না করে তিনি বাস্তবানুগ সৌন্দর্যসৃষ্টির দিকে ঝোঁকেন।

চিত্রবিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে তিনি নামলেন জীবন সংগ্রামে। আমাদের দেশে পুস্তকাদির চিত্রাঙ্কন তখন ছিল নিম্নস্তরের। পূর্ণচন্দ্র পুস্তকাদি, বিশেষ করে শিশুসাহিত্যে নিপুণ চিত্রকলার প্রবর্তন করেন এবং এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ চিত্রকর সমসাময়িক কালে কমই

দেখা গিয়েছে। কমার্শিয়াল আর্টের এই দিকের তিনি ছিলেন অন্যতম পথপ্রদর্শক। এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস-এর ক্রমোলিথো প্রিন্টেড চিত্র তিনিই প্রকাশ করেন। পরে স্টেট্‌সম্যানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে প্রায় পঁচিশ বছর অতিবাহিত করেন। এই সঙ্গে শিক্ষকতা করতেন ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ-এও। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি তিনিই প্রথম পান।

এই পূর্ণচন্দ্রের আঁকা বেশ কয়েকটি ছবি কুন্তলীন পুরস্কারের বিভিন্ন সংখ্যায় মুদ্রিত আছে। এঁরই কাছে হিতেন্দ্রমোহন চিত্রবিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। অবশ্য মাসিক পত্রিকা ও পুস্তকের প্রচ্ছদ আঁকার ব্যাপারে চারু রায়ের জুড়ি ছিল না সেকালে।

পাঠকেরা লক্ষ্য করবেন 'কুন্তলীন পুরস্কার' নাম থাকলেও শেষের দিকের কোন রচনাই পুরস্কৃত ছিল না। পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং ফরমায়েসী রচনা—উভয় প্রকার গল্পের লেখকরা কেউ কেউ আজও নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে বর্তমান আছেন। ১৯২০ সালেও যোগেশচন্দ্র মজুমদার জীবিত ছিলেন। আমার না জানার মধ্যেও কেউ কেউ থাকতে পারেন। তাঁদের কাছ থেকে তাঁদের অভিজ্ঞতা জানতে চাই। আমার জানা-চেনার মধ্যে এখনও অন্ততঃ একজন জীবিত আছেন। ইনি হলেন মাতৃকল্প শ্রীমতী রাধারাণী দেবী।

এবারে এই সংকলন সম্পর্কে কিছু কথা নিবেদন করে এই দীর্ঘ ভূমিকা রচনার কাজ সমাপ্ত করবো। কোনো কালেই কোনো সংকলন সমস্ত পাঠককে তুষ্ট করতে পারে না। আমাদের নানা কারণে কুন্তলীনের প্রায় দুশো গল্প থেকে একশো গল্প বাছাই করতে হয়েছে। প্রথমত, সব গল্প ছাপার প্রয়োজন ছিল না। দ্বিতীয়ত তাতে গ্রন্থের কলেবর মাত্র বৃদ্ধি পেতো। তবুও পাঠকের চাহিদা যদি প্রমাণিত হয়, তখন হয়তো দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করে গ্রন্থের পূর্ণতা প্রদান করা যাবে। চেষ্টা করেছি 'গল্প শতকে' সবচেয়ে সেরা গল্পগুলিকে স্থান দিতে। তাতে একেবারেই যে কোনো ফাঁক থেকে যায়নি—এমন দাবী করি না। বিশেষ করে 'ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ'। আসলে কুন্তলীন পুরস্কারের সমস্ত খণ্ড দেখেছেন—এমন লোক খুব কমই আছেন। কোনো গ্রন্থাগারেই এর সম্পূর্ণ সংগ্রহ নেই। কোনো ব্যক্তিগত সংগ্রহেও নেই। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রান্তে অনুসন্ধান করেছি দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে। বহুজনের আনুকূল্যে আমি এগুলি পেয়েছি। তা-ও দ্বিতীয় বর্ষের সন্ধান পাইনি। নিশ্চয়ই কোথাও-না-কোথাও ত্রুটি আছে। এ বই প্রকাশের পর যদি কেউ অনুগ্রহ করে জানান—পরবর্তী সংস্করণ যদি প্রকাশিত হয়, সেখানে একাধিক গল্প 'সংযোজন' হিসাবে স্থান করে দেবো।

বইটিতে একশোটি গল্প ছাড়া নমুনা হিসাবে কিছু ছড়া এবং কবিতা আমরা সংযোজন করেছি। তাতে 'কুন্তলীন পুরস্কারে'র চরিত্রটি পাঠকের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে পড়বে। তবে ১৩২৪ এবং পরবর্তী সংখ্যাগুলি 'কুন্তলীন পুরস্কার' নামে প্রকাশিত হলেও তা বাস্তবিক অর্থে 'পুরস্কৃত' ছিল না। তবুও এই ফরমায়েসী গল্পগুলি থেকে দুটি গল্প একালের পাঠকদের উপহার দিলাম। একটি গল্পের লেখিকা শ্রীমতী বাধারাণী দেবী—তিনি আমাদের মধ্যে জীবিত একমাত্র অগ্রগণ্য লেখিকা। আর ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে যখন শেষবারের মতো 'কুন্তলীন পুরস্কার' আত্মপ্রকাশ করল তার শেষতম গল্পটিকেও আমরা পাঠকদের করায়ত্ত করে দিলাম।

একালের পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আমি গ্রন্থ শেষে ১৩০৪ বঙ্গাব্দ বাদে কুন্তলীনের সমস্ত খণ্ডের সম্পূর্ণ সূচী বর্ষাকারে তালিকাযুক্ত করে দিয়েছি। এ থেকে অসংকলিত রচনাগুলির নাম ও লেখক সম্পর্কে পাঠক সবিশেষ অবহিত হতে পারবেন।

এছাড়া 'নিয়মাবলী' ইত্যাদি থেকেও নানা তথ্য সংগৃহীত হতে পারবে ভেবে অধিকাংশ বৎসবের নিয়মাবলী-ও পরিশিষ্টে মুদ্রিত হল।

দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে এই সংকলনের কাজে যুক্ত ছিলাম। কত পরিচিত-অপরিচিত মানুষ এই সময়ের মধ্যে কতবার আমাকে সহায়তা করেছেন তার তালিকা দেওয়াও অসম্ভব। আমার হৃদয় তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ন্যুব্জ হয়ে আছে। এই সূত্রে আমি বন্ধু পেয়েছি, মা পেয়েছি, শুভানুধ্যায়ী পেয়েছি। এগুলিই আমার স্থায়ী প্রাপ্য। এই বই পেয়ে আমি পুনশ্চ যাঁদের আশীর্বাদ পাবো—তা আমার পাথেয় হয়ে থাকবে। যাঁদের এখনও রচনাস্বত্ব আছে তাঁদের উত্তরাধিকারীরা অনেকেই রচনাপ্রকাশে অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন। বহুজনের লেখক-পরিচয় বহু অনুসন্ধানেও জানতে পারিনি। তা জানতে নানা কাবণে আগ্রহী আছি। এ-বিষয়ে আমাকে কেউ সহায়তা করলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

বইটি এইচ বসুর একমাত্র জীবিত সন্তান শ্রীমতী ললিতা দাস—আমাদের সোনাদিকে উৎসর্গ করে তৃপ্তি অনুভব করছি। প্রতি বছর পুজোর আগে 'কুন্তলীন পুরস্কার' প্রকাশিত হত। এতদিন পরে আমরা একালের পাঠককে 'কুন্তলীন' ও 'দেলখোস' দিতে না পারলেও তাদের সুরভি-সমন্বিত গল্পগুলি উপহার দিলাম।

বারিদবরণ ঘোষ

কুন্তলীন গল্প-শতক

কুন্তলীন পুরস্কার ১৩০৭ বঙ্গাব্দের আখ্যাপত্র

প্রথম পুরস্কার ৪০৲

নিরুদ্দেশের কাহিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

গত বৎসর এই সময়ে এক অত্যাশ্চর্য ভৌতিক কাণ্ড ঘটিয়াছিল। তাহা লইয়া সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগতে আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। এই বিষয় লইয়া বিলাতের Nature, ফরাসী দেশের La Nature এবং মার্কিন দেশের Scientific American-এ অনেক লেখালেখি চলিয়াছে—কিন্তু এ পর্যন্ত কিছু মীমাংসা হয় নাই।

২৮-এ সেপ্টেম্বর তারিখে Englishman কাগজে সিমলা হইতে এক তারের সংবাদ প্রকাশ হয়—

Simla Meteorological Office, ২৭-এ সেপ্টেম্বর।
"বঙ্গোপসাগরে শীঘ্রই ঝড় হইবার সম্ভাবনা।"

২৯-এ তারিখের কাগজে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইল,

Meteorological Office 5, Russel Street.
"দুই দিনের মধ্যেই প্রচণ্ড ঝড় হইবে। ডায়মণ্ডহারবারে Danger-Signal উঠান হইয়াছে।"

৩০-এ তারিখে যে Special Bulletin বাহির হইল তাহা অতি ভীতিজনক—
"আধ ঘণ্টার মধ্যে Barometer দুই ইঞ্চি নামিয়া গিয়াছে; আগামীকল্য ১০ ঘটিকার মধ্যে কলিকাতায় অতি প্রচণ্ড ঝড় হইবে; এরূপ তুফান বহু বৎসর মধ্যে হয় নাই।"

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট হইতে ডায়মণ্ডহারবারের Sub-Divisional Officer-এর নিকট তারে খবর হইল—"Stop all outgoing vessels" এই সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে কলিকাতায় প্রচার হইল।

কলিকাতার অধিবাসীরা সেই রাত্রি কেহই নিদ্রা যায় নাই। আগামীকল্য কি হইবে তাহার জন্য সকলে ভীত চিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

Royter-এর Agent Times-এ Telegraph করিলেন—"The Capital of our Indian Empire in danger."

১লা অক্টোবর আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইল। দুই চার ফোটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

সমস্ত দিন মেঘাবৃত ছিল, কিন্তু বৈকাল ৪ ঘটিকার সময় হঠাৎ আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। ঝড়ের চিহ্নমাত্রও রহিল না।

তারপর দিন Meteorological Office খবরের কাগজে লিখিয়া পাঠাইলেন—

"কলিকাতায় ঝড় হইবার কথা ছিল, বোধ হয় উপসাগরের কূলে প্রতিহত হইয়া ঝড় অন্য অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।"

ঝড় কোন দিকে গিয়াছে তাহার অনুসন্ধানের জন্য দিক্‌দিগান্তরে লোক প্রেরিত হইল কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

তারপর Englishman লিখিলেন—এত দিনে বুঝা গেল যে বিজ্ঞান সর্বৈব মিথ্যা।

Daily News লিখিলেন যদি তাহাই হয় তবে গরিব ট্যাক্সদাতাদিগকে পীড়ন করিয়া Meteorological Office-এর ন্যায় অকর্মণ্য অফিস রাখিয়া লাভ কি?

তখন Pioneer, Civil 9 Mlitaray Gazette, Statesman, তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন—উঠাইয়া দেও।

গবর্ণমেন্ট বিভ্রাটে পড়িলেন। অল্প দিন পূর্বে Meteorological Office-এর জন্য লক্ষাধিক টাকার ব্যারোমিটার থার্মোমিটার আনান হইয়াছে। সেগুলি এখন ভাঙ্গা শিশি বোতলের মূল্যেও বিক্রয় হইবে না। আর Meteorological Office-এর বড় সাহেবকে অন্য কি কার্যে নিয়োগ করা যাইতে পারে?

গবর্ণমেন্ট নিরুপায় হইয়া কলিকাতা Medical College-এ লিখিয়া পাঠাইলেন 'আমরা ইচ্ছা করি Medical College-এ একটি নূতন chair স্থাপিত হয়। নিম্নলিখিত বিষয়ে Lecture দেওয়া হইবে—'On the effect of variation of Barometric Pressure on the Human System.'

Medical College-এর Principal লিখিয়া পাঠাইলেন—"উত্তম কথা, বায়ুর চাপ কমিলে ধমনী স্ফীত হইয়া উঠে, তাহাতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি হয়। তাহাতে সচরাচব আমাদের যে স্বাস্থ্য ভগ্ন হইতে পারে তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে কলিকাতাবাসীরা আপাততঃ বহুবিধ চাপের নীচে আছে :—

প্রথম চাপ	বায়ু	প্রতিবর্গ ইঞ্চি	১৫ পাউণ্ড
২য়	ম্যালেরিয়া	,,	২০ ,,
৩য়	পেটেন্ট ঔষধ	,,	৩০ ,,
৪র্থ	ইউনিভার্সিটি	,,	৫০ ,,
৫ম	ইন্‌কমট্যাক্স	,,	৮০ ,,
৬ষ্ঠ	মিউনিসিপাল ট্যাক্স	,,	১ টন

বায়ুর ২/১ ইঞ্চি চাপের ইতর বৃদ্ধি 'বোঝার উপর শাকের আটি' স্বরূপ হইবে। সুতবাং কলিকাতায় এই chair স্থাপন করিলে বিশেষ উপকার যে হইবে এরূপ বোধ হয় না।

তবে সিমলা পাহাড়ে বায়ুর চাপ ও অন্যান্য চাপ অপেক্ষাকৃত কম। সেখানে উক্ত chair স্থাপন হইলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।"

ইহার পর গবর্ণমেন্ট নিরুত্তর হইলেন। Meteorological আফিস এবারকার মত অব্যাহতি পাইলেন।

কিন্তু যে সমস্যা লইয়া এত গোল হইল, তাহা পূরণ হইল না।

একবার এক বৈজ্ঞানিক Nature-এ লিখিয়াছিলেন বটে ; তাঁহার Theory এই যে কোন অদৃশ্য ধূমকেতুর আকর্ষণে বায়ুমণ্ডল আকৃষ্ট হইয়া উর্ধ্বে চলিয়া গিয়াছে।

কেহ কেহ বলিলেন যে, সেই সময় ছোট লাট ডায়মণ্ডহারবার পরিদর্শন করিতে যান। তাঁহার দোর্দণ্ড প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। তাঁহার ভয়ে ঝড় পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে।

এসব অনুমান মাত্র। এখনও এ বিষয় লইয়া বৈজ্ঞানিক জগতে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। এবার Oxford British Association-এ Herr Stiirm F. R. S. "On a vanished Typhoon" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। তাহা লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইবার সম্ভাবনা।

এই ঘটনার প্রকৃত তত্ত্ব পৃথিবীর মধ্যে একজন মাত্র জানে, সে আমি।

পরের অধ্যায়ে ইহা বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গত বৎসর আমার ভয়ানক জ্বর হইয়াছিল। প্রায় একমাস কাল শয্যাগত ছিলাম।

ডাক্তার বলিলেন সমুদ্র যাত্রা করিতে হইবে, নতুবা পুনরায় জ্বর হইলে বাঁচিবাব সম্ভাবনা নাই। আমি জাহাজে Ceylon যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলাম।

এতদিন জ্বরের পর আমার মস্তকের ঘন কুন্তলরাশি, একান্ত বিরল হইয়াছিল। একদিন আমার অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা দ্বীপ কাহাকে বলে ?" আমার কন্যা ভূগোল-তত্ত্ব পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমার উত্তর পাইবার পূর্বেই বলিয়া উঠিল "এই দ্বীপ" ইহা বলিয়া প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় আমার বিবল-কেশ মসৃণ মস্তকে দু এক গোছা কেশের মণ্ডলী দেখাইয়া দিল।

তারপর বলিল "তোমার ব্যাগে এক শিশি 'কুন্তলীন' দিয়াছি জাহাজে প্রত্যহ ব্যবহার করিও, নতুবা নোনা জল লাগিয়া এই দু একটি দ্বীপেরও চিহ্ন থাকিবে না।"

২৮-এ তারিখে আমি Chusan জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করিলাম। প্রথম দুদিন ভালরূপেই গেল। ১লা তারিখ প্রত্যুষে সমুদ্র এক অস্বাভাবিক মূর্তি ধারণ করিল, বাতাস একেবারে বন্ধ হইয়া গেল, সমুদ্রের জল পর্য্যন্ত সীসার রঙ্গের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গেল।

জাহাজের কাপ্তানের বিমর্ষ মুখ দেখিয়া আমরা ভীত হইলাম। কাপ্তান বলিলেন যে রূপ লক্ষণ দেখিতেছি, অতি সত্বরই প্রচণ্ড ঝড় হইবে। আমরা কূল হইতে বহু দূর—এখন ঈশ্বরের ইচ্ছা।

এই সংবাদ শুনিয়া জাহাজে যেরূপ ঘোর শোক ও ভীতিসূচক কলরব হইল তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

দেখিতে দেখিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল। চারিদিক মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকার হইল। এবং দূর হইতে এক এক ঝাপটা আসিয়া জাহাজখানাকে আন্দোলিত করিতে লাগিল।

তারপর মুহূর্তমধ্যে যাহা ঘটিল তাহার সম্বন্ধে আমার কেবল এক অপরিষ্কার ধারণা আছে—পাতালপুরী হইতে যেন রুদ্ধ দৈত্যগণ একেবারে নির্মুক্ত হইয়া পৃথিবী সংহারে উদ্যত হইল

সমুদ্র, বায়ুর গর্জনের সহিত স্বীয় মহাগর্জনের সুর মিলাইয়া সংহার মূর্তি ধারণ করিল।

তারপর অনন্ত উর্মি রাশি, একের উপর অন্যে আসিয়া একেবাবে জাহাজ আক্রমণ করিল।

এক মহাউর্মি আসিয়া জাহাজের উপর দিয়া চলিয়া গেল—মাস্তুল, Life Boat ভাঙ্গিয়া ভাসাইয়া লইয়া গেল।

আমাদের অন্তিম কাল উপস্থিত। মুমূর্ষু সময়ে লোকে যেরূপ জীবনের প্রিয় বস্তু স্মরণ করে, সেইরূপ আমার প্রিয়জনের কথা মনে হইল। আশ্চর্য্য এই আমার কন্যা আমার বিরল কেশ লইয়া যে উপহাস করিয়াছিল, এ সময়ে তাহা পর্যন্তও স্মরণ হইল—

"বাবা এক শিশি কুন্তলীন তোমার ব্যাগে দিয়াছি।"

হঠাৎ এক কথায় আর এক কথা মনে পড়িল। বৈজ্ঞানিক কাগজে ঢেউয়ের উপর তৈলের প্রভাব সম্প্রতি পড়িয়াছিলাম। তৈল যে চঞ্চল জলরাশিকে মসৃণ করে এ বিষয়ে অনেক ঘটনা মনে হইল।

অমনি আমার ব্যাগ হইতে কুন্তলীনের শিশি খুলিলাম। তাহা লইয়া অতি কষ্টে ডেকের উপর উঠিলাম! জাহাজ টলমল করিতেছিল।

উপরে উঠিয়া দেখি সাক্ষাৎ কৃতান্তসম পর্বত প্রমাণ ফেণিল এক মহাউর্মি জাহাজ গ্রাস করিবার জন্য আসিতেছে।

আমি 'জীব আশা পরিহরি' সমুদ্র লক্ষ্য করিয়া কুন্তলীন-বাণ নিক্ষেপ করিলাম। ছিপি খুলিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, মুহূর্তমধ্যে তৈল সমুদ্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

ইন্দ্রজালের প্রভাবের ন্যায় মুহূর্ত মধ্যে সমুদ্র প্রশান্ত মূর্তি ধারণ করিল। কমনীয় তৈল স্পর্শে বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত শান্ত হইল। ক্ষণ পরেই সূর্য দেখা দিল।

এইরূপে আমরা নিশ্চিত মরণ হইতে উদ্ধার পাই। এবং এই কারণেই সেই ঘোর বাত্যা কলিকাতা স্পর্শ করে নাই। কত সহস্র সহস্র প্রাণী যে এই সামান্য এক বোতল কুন্তলীনের সাহায্যে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে?

শ্রী—

পুঃ :—প্রায় ছয় মাস পরে Scientific American-এ উপরোক্ত ঘটনার নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির হইয়াছিল—THE SOLUTION OF A MYSTERY

The vanished cyclone of Calcutta remained so long a mystery to vex the soul of meteorologists. We are now glad to be able to offer an explanation of this seeming departure from all known laws that govern atmospheric disturbances.

It would appear that a passenger on board the Chusan threw overboard a bottle of KUNTALINE while the vessel was in the Bay of Bengal, and the storm was at its height. The film of Oil, spread rapidly over the troubled waters, and produced a wave of condensation, thuscounteracting the wave of rarefaction to which the cyclone was due. The superincumbent atmosphere being raleased from its dangerous tension, subsided into a state of calm. Thus by the merest chance, a catastrophe was averted.—*Scientific American.*

দ্বিতীয় পুরস্কার ২০৲

পূজার-বাজার

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমাদের বাড়ী কিঞ্চিৎ ধূমধামে দুর্গোৎসব হয় ; প্রতি বৎসরই পূজা আরম্ভ হইবার আট দশ দিন আগে আমাদের বাড়ী হইতে একজন না একজন কলিকাতায় পূজার বাজার করিতে যান। গত বৎসর বড় দাদা বলিলেন "এবার তুই কলিকাতায় যা"—আমি বলিলাম "আমি যাইলেই কতকগুলা বাজে খরচপত্র বাড়িয়া যাইবে, আর কাহাকেও পাঠান, আমি কৈফিয়তের মধ্যে নাই",—দাদা স্নেহ মধুর হাস্যে অভয়দান করিলেন সুতরাং আমার আর আপত্তি রহিল না, মধ্যে আর আটদিন মাত্র সময় আছে, সময় অতি সংক্ষেপ, অতএব পরদিনই কলিকাতা রওনা হওয়া স্থির করিলাম।

রাত্রির ট্রেনেই আমাদের কলিকাতা যাওয়া সুবিধা, কিন্তু কলিকাতা যাইতে যে স্টেসনে আমরা ট্রেনে চাপি, তাহা আমাদের গ্রাম হইতে অনেক দূরে, প্রায় দশ ক্রোশ হইবে ; তাহার পর এই দীর্ঘপথ গো-শকটে অতিক্রম করিতে হয়, সুতরাং বেলা একটা দুইটার সময় রওনা না হইলে রাত্রি বারটার ট্রেন পাওয়া কঠিন।

আহারাদির পর বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আমার গৃহলক্ষ্মী আমার সঙ্গে যাইবার উপযোগী দ্রব্যাদি ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন ; আমি তাঁহার কাছে বিদায় লইয়া গৃহের বাহির হইব এমন সময় তিনি তাঁহার সেই কুসুমস্তবক তুল্য সুকোমল দেহখানি রুদ্ধ দ্বারের উপর সংস্থাপিত করিয়া হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন, অভিপ্রায় আমাকে ঘরের বাহির হইতে দিবেন না।

বুঝিলাম তাঁহার কিছু নালিশ আছে, অতএব অবিলম্বে আরজি পেশ করিতে বলিলাম, তখন তিনি দ্বার ছাড়িয়া উপাধানের নীচ হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া আমার স্কন্ধাবলম্ব করিয়া দাঁড়াইলেন, না জানি কাগজে কি লেখা আছে ভাবিয়া একটু বিস্মিত হইয়াছিলাম, কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে একটু দেখিয়াই বুঝিলাম এ কোন স্টেসনারী দোকানের বিক্রেয় জিনিসের ফর্দ। শ্রীমতীর দিকে চাহিয়া একটু বিদ্রূপের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম "এত জিনিস কি হবে, মনোহারীর দোকান খুলবে মতলব করেছ নাকি ?"—দারুণ অভিমানে মুখচন্দ্রমা অন্ধকার হইয়া আসিল "কথার শ্রী দেখ, কালে ভদ্রে যদি কখন কলিকাতায় যান ত দুটো জিনিসের বরাত দিলে এমনিতর ব্যাখ্যানা হয়" বলিয়া ফর্দখানি কাড়িয়া লইবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু পারিলেন না ; বুঝিলাম এই সকল জিনিস তাঁহার ব্যবহারের জন্য আনিতে হইবে।

উচ্চবাচ্য করিয়া আবার কি বিপদে পড়িব, কাজেই ফর্দটা একবার ভাল করিয়া দেখিয়া পকেটে পুরিলাম। খবরের কাগজগুলি বঙ্গান্তঃপুরে বিশেষ রূপে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে, ইহাতে আর যাহাই হউক, বিলাস-দ্রব্যের কোন বিজ্ঞাপন থাকিলে বিলাসিনীগণ যেমন তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন এমন আর কিছুতেই নহে ; দেখিলাম শ্রীমতী ফর্দ মধ্যে লিখিয়াছেন "কুন্তলীন তৈল ২ বোতল" পড়িয়াই চক্ষুস্থির। প্রায় সকল কাগজেই "কুন্তলীনের" নাম পড়িয়াছি বটে—কিন্তু জিনিসটি এ পর্যন্ত কোন দিন দৃষ্টিগোচর হয় নাই, তাহার ফরমাইসও

এই প্রথম পাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম "এ তৈলের কথা তোমাকে কে বলিল ? তুমিত বরাবর-ই ব্যবহার করিতে ?" উত্তর পাইলাম "তা হোক, এখন আমি এই তেলটাই পছন্দ করিয়াছি, খবরের কাগজে মস্ত মস্ত লোকের প্রশংসাপত্রগুলিতে কি চোক বুলান হয় নাই ?"

তর্কে আমারই পরাজয় ; এ নূতন বিধান নয়, চিরকালই এরূপ হইয়া আসিতেছে, অতএব তাঁহার মতই শিরোধার্য করিয়া বাহিরে আসিলাম।

কে জানিত দ্বারে কর্ণসংযোগ করিয়া ভগিনী প্রভা আমাদের এই প্রেমালাপ শুনিতেছে। আমি বাহিরে আসিতেই সে হাসিয়া অস্থির হইয়া পড়িল, কিন্তু কাজ ভুলিল না—বলিল "দাদা বৌদিদির ফর্দ লইলে আর আমরা এত কি অপরাধ করিলাম ? সব শুনেছি, তা কুন্তলীন মাথায় দিলে কি আমাদে চুল উঠে যায়, না মাথায় আঠা পড়ে ?"

আমি বলিলাম "লক্ষ্মী আমার, আমাদের ঝগড়া শুনেছ অতি উত্তম কাজ করেছ, এখন তোমার ফর্দটা কি নিয়ে এস, আমার এক একদণ্ড দেরী করবার যো নেই।"

"আর বৌদিদি যদি আরো দুদণ্ড কয়েদ ক'রে রাখতো ?" "তাতে তোর কি রাক্ষুসী,—এখন যা বলিলাম তা না করিস যদি"—প্রবল মুষ্টিযোগ প্রাপ্তির আশু সম্ভাবনা দেখিয়া প্রভা ছুটিয়া পলায়ন করিল, তাহার পর হাসিতে হাসিতে ফর্দ আনিয়া দিল।

"এবার দেখছি দাদার কাছে খরচের নিকেশ দিতে প্রাণ যাবে" বলিয়া বাহিরে আসিলাম, দ্বারদেশে গাড়ী প্রস্তুত ছিল, দাদাকে প্রণাম করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম, গাড়োয়ান গাড়ী ছাড়িয়া দিল ; তখন বেলা দুইটা।

গরুর গাড়ীতে চড়া এক ভয়ানক ব্যাপার, যাঁহারা সেই বিচিত্র যানে চড়িয়াছেন তাঁহাদের তাহা বুঝান নিষ্প্রয়োজন, যাঁহারা চড়েন নাই তাঁহাদের সে সুখ বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, অতএব সে কষ্টসাধ্য অনুষ্ঠানে প্রয়োজন নাই। বলদ দুটি কিছু স্থূলকায়, গাড়োয়ানের করস্পর্শ মাত্রে তাহারা আমাদের গ্রামের সংকীর্ণ পথ দিয়া সবেগে চলিতে লাগিল, তথাপি গাড়োয়ানের "বাঁ, আর বাঁ বাঁ" রবেব বিরাম নাই, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর হড় হড় শব্দ আর আমাব সর্বশরীরের উত্থানপতন মনে হইল দেহ হইতে প্রাণটা বুঝি আছড়াইয়া বাহির হয়। মুসলমানের মৃত্যুর পর শুনয়াছি যমদূত সমাধি মধ্যে প্রবেশ পূর্বক শরীরের হাড়গুলি মাংসের ভিতর হইতে টানিয়া তফাৎ করিয়া ফেলে, কিন্তু গরুর গাড়ীতে হিন্দু-মুসলমান প্রভেদ করে না, জীবন্ত অবস্থাতে সকলেরই 'হাড় ও মাংস' পৃথক করিবার চেষ্টা করে।

অন্যের পক্ষে যাহাই হউক আমাদের ইহাতে বিরক্তি বা সঙ্কোচ নাই, কারণ বাল্যকাল হইতেই আমরা এ বিদ্যায় অভ্যস্ত অতএব গাড়ীর মধ্যে লম্বা হইয়া পড়িয়া একটি নিদ্রার সুবন্দোবস্ত করা গেল।

সন্ধ্যার পূর্বে প্রায় ছয়টার সময় জাগিলাম। গাড়ী মেঠো রাস্তা ধরিয়া চলিতেছে ; দুই দিকে শ্যামল শস্যক্ষেত্র, অশ্বত্থ ও বটের সুবৃহৎ বৃক্ষগুলি উন্নতমস্তকে দাঁড়াইয়া আছে, শরৎ সন্ধ্যার হেমাভ সূর্যকিরণে এই সকল বৃক্ষের শিরোদেশস্থ নিবিড় হরিৎ পত্রাবলী অনুপম মাধুর্য ধারণ করিয়াছে। আমি সেই প্রান্তর-শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম, যতদূর দৃষ্টি যায় উন্মুক্ত প্রান্তর, শীতল বায়ুর অবারিত গতি।

ক্রমে আমরা পথপ্রান্তস্থ একখানি পল্লীগ্রামের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, সূর্য তখন অস্ত গিয়াছে, কিন্তু পশ্চিম গগন তখনও আভাময়, দুই একখানি মেঘ তখনও তপন কিরণানুরঞ্জিত, মুহূর্তে মুহূর্তে তাহাতে কত বর্ণেরই সমাবেশ হইতেছে, কবির কল্পনা সে মাধুরী বর্ণনা করিতে অক্ষম, চিত্রকরের বর্ণে এবং তুলিকায় তাহার প্রতিকৃতি অঙ্কিত হয় না।

গ্রামের নিকটেই দুই চারি ঝাড় বাঁশ, নানা প্রকার পক্ষী তাহার ভিতর বসিয়া কলরব

করিতেছে, একজন রাখাল এক পাল গরু লইয়া মাঠ হইতে গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহার মেঠো সুরে গান কেমন মিষ্ট! গ্রাম অতিক্রম করিলেও তাহর কণ্ঠস্বর এবং বিহঙ্গকুলের সন্ধ্যাকাকলি দূর হইতে বায়ুস্রোতে ভাসিয়া আসিয়া কর্ণে মধু বর্ষণ করিতে লাগিল, এবং গ্রাম্যমহিলাগণের বিচিত্র কলধ্বনি তখনও শুনিতে পাইলাম ; ইহাদের ক্ষুদ্র সুখ ক্ষুদ্র আশা ; কিন্তু ইহা লইয়াই ইহারা সন্তুষ্ট। ক্রমে আমার মনে একটি দার্শনিক তত্ত্বের উদয় হইল, ভাবিলাম, সুখদুঃখে এইরূপে সময়ক্ষেপ করা সুখকর, না বিপুল আশা এবং জগৎগ্রাসিনী আকাঙ্ক্ষা লইয়া তাহার সাফল্য বা নিষ্ফলতা অধিক সুখের। কিছুই বুঝিলাম না, কেবল মনে হইল, দুর্য্যোধন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও একদিন পঞ্চপাণ্ডবকে পাঁচখানি গ্রামও ছাড়িয়া দিতে পারেন নাই, অবশেষে অগণ্য ভ্রাতি ও হিতৈষী আত্মীয়গণের রক্তস্রোতে পঙ্কিল, শ্মশানতুল্য সমরক্ষেত্রে যখন উরুভঙ্গ হইয়া পড়িলেন—তখনও আশা দূর হয় নাই, পাণ্ডব পুত্রগণের ছিন্ন মুণ্ড দেখিয়া পঞ্চপাণ্ডবের মস্তক বলিয়া তখনও মনে আশার সঞ্চার। যে বিশ্ববিজয়িনী শক্তি রণকৌশলে সমস্ত য়ুরোপ স্তম্ভিত করিয়াছিল, যাঁহার সামান্য অঙ্গুলিসঙ্কেতে প্রবলক্ষমতাপন্ন সম্রাটের মস্তক হইতে রত্ন মুকুট খসিয়া পড়িযাছে, সাধনার সীমান্তে গিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই, পৃথিবী জয়ের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা বোনাপার্টির বীরহৃদয়ের সুখ শান্তি বিনষ্ট করিতে লাগিল ; তখন কি সেই অদৃষ্টবাদী মহাপুরুষ জানিতেন সুদূর আফ্রিকার একটি বিজন দ্বীপে ইংরেজের নির্জন কারাগারে ইহজীবনের অবসানই তাঁহার অদৃষ্টের অন্তিম লিখন? ইহাই যদি আশার পরিণাম, তবে জীবন সংগ্রামের এ গভীর কল্লোল, কর্মক্ষেত্রের এ অবিরাম দ্বন্দ্ব কোলাহল, কুটিলতা ও চাপল্য এ সমস্ত কেন? কেন কে বলিবে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অন্ধকার পূর্ণ বিজন প্রান্তরের ঘুমন্ত বক্ষের উপর দিয়া পূর্ব্ববঙ্গ রেল পথ ধাবিত হইয়াছে, সমস্ত প্রকৃতি সুষুপ্ত এবং দূরে দূরে নিদ্রামগ্ন বৃক্ষ শ্রেণীর নিবিড় পত্র নৈশ বায়ুর কোমল হিল্লোল শর শর কাঁপিয়া উঠায় তাহা নিশ্বাসের মত শুনা যাইতেছে ; আকাশে নক্ষত্রকুল মিটিমিটি চাহিতেছে, এই নিদ্রিত জগতের মধ্যে শুধু তাহারাই সচেতন, কে বলিবে কি রহস্য তাহাদের কৌতূহল চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত? মৃদু আলোকবশ্মি বুকে ধরিয়া আমাদের ট্রেন দ্রুতবেগে ছুটিতেছে ; আমি নিদ্রালস নেত্রে গাড়ীর গবাক্ষপথে এই নৈশ শোভা দেখিতেছিলাম।

আর অধিক রাত্রি নাই, ক্রমে পূর্বদিক পরিষ্কৃত হইল। চন্দ্রের অতি ক্ষীণ অংশ পূর্বাকাশে প্রকাশিত হইল, সুবৃহৎ বৃক্ষ শ্রেণীর অন্তরাল হইতে তাহা এমন সুন্দর বোধ হইতে লাগিল যেন তাহা কল্পনার মনোরম চিত্র ; চক্ষের সম্মুখে একটি রহস্যাবৃত স্বপ্ন জগৎ তাহার সমস্ত সৌন্দর্য লইয়া প্রতিভাত হইল, আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

জাগিয়া দেখিলাম লোকাকুলিত শিয়ালদহ স্টেসনে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, প্রাতঃভ্রমণশীল প্রাভাতিক পরিচ্ছদধারী কয়েকটি শ্বেত পুরুষ আসিয়া আমাদের ইংরেজ সহযাত্রীদিগের সহিত হাস্যমুখে আলাপ করিতেছেন, গার্ড সাহেব নীল আলোকের লণ্ঠন দুলাইতে দুলাইতে গজেন্দ্র গমনে চলিয়া যাইতেছেন এবং "চাই কুলি" রবে চীৎকার করিয়া কুলির দল কিছু উপার্জনের চেষ্টায় ছুটাছুটি করিতেছে।

গাড়ী হইতে নামিয়া ভাবিলাম, কোথায় যাই?—আমাদের একজন আলিপুরে থাকেন

কিন্তু আলিপুর হইতে কলিকাতায় বাজার করিতে আসা অত্যন্ত অসুবিধাজনক, শিয়ালদহে সারকুল্যার রোডের উপরই বন্ধু অতুলচন্দ্রের বাসা আছে, তাঁহার স্কন্ধদেশে ভর করাই সিদ্ধান্ত করিলাম—দশ মিনিটের মধ্যে বন্ধুবর আমার ন্যায় আকাঙ্ক্ষিত বন্ধুর হঠাৎ আবির্ভাবে বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন।

সেই প্রভাতেই হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া বাজারে বাহির হইলাম, বন্ধুবরকেও সঙ্গে লইলাম , তিনি একজন ডাক্তার, সেদিন কয়েকটি রোগী তাঁহার হাতে মরিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাঁহার প্রাভাতিক দর্শনের পথে সহসা অসম্ভাবিত পূর্ব-বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় তাহারা এক বেলা প্রাণরক্ষার ভরসা করিল।

পরিশ্রান্ত হইয়া বেলা প্রায় ১১টার সময় দুই বন্ধুতে বাসার দিকে ফিরিলাম, বাসার প্রায় নিকটে আসিয়া বন্ধু বলিলেন "তোমার কুন্তলীনের বরাত আছে বলিতেছিল, নিকটেই তার আফিস, চল লইয়া যাই।"

আমি বলিলাম, "এখন থাক ভাই, ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ যায় বাসার কাছেইত, বৈকালে আসিলেই চলিবে।" বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

বৈকালে প্রথমে 'কুন্তলীনের' আফিসে যাওয়া গেল। অতুলচন্দ্র ম্যানেজার বাবুর সহিত সুপরিচিত, তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়া দিলেন।

কথাবার্তা চলিতেছে এমন সময় কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক আসিয়া এইস্থানে প্রস্তুত, সকল প্রকার সুগন্ধি কুন্তলীন ও এসেন্স দেখিতে চাহিলেন, আমি উঠিতেছিলাম ম্যানেজার বাবু আমাকে বসিতে বলিয়া নানা প্রকার উপকরণে প্রস্তুত বিবিধ প্রকার কুন্তলীন এবং তাঁহাদের প্রস্তুত এসেন্স, ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার ইত্যাদি দেখাইলেন।

অনন্তর তিনি কয়েক প্রকার কুসুমবাসিত 'কুন্তলীন' লইয়া প্রস্থান করিলেন ; গন্ধভেদে 'কুন্তলীন' আরো তিন চারি প্রকারের আছে পূর্বে তাহা জানিতাম না। প্রভার কথা মনে ছিল, কয়েক বোতল 'কুন্তলীন' এবং প্রভার জন্য এক বোতল 'গোলাপ গন্ধ কুন্তলীন' ক্রয় করিলাম।

নূতন করিয়া তামাক সাজা হইল, তাম্রকূটেব প্রেমে বন্ধুবর আশৈশব মুগ্ধ, আমাব উঠিবার ইচ্ছা থাকিলেও তিনি হুকা টানিতে টানিতে ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে গল্পের জমাট বাঁধিয়া ফেলিলেন, অধিক কথা কহা আমার অভ্যাস নহে সুতরাং গল্পে বিশেষ যোগ না দিয়া টেবিলের উপর হইতে কলম লইয়া সেই 'গোলাপ গন্ধ কুন্তলীনের' উপর মোটা মোটা অক্ষরে পরিষ্কার করিয়া লিখিলাম "প্রভার জন্য", এরূপ লিখিবার যে বিশেষ আবশ্যক ছিল তাহা নহে, এবং সম্মুখে এরূপ অনাহুত দোয়াত কলম পড়িয়া না থাকিলে তাহা সংগ্রহ করিযা যে ইহা লিখিতাম তাহাও বোধ হয় না। এই ক্ষুদ্র, সুন্দর উপহার দ্রব্যটি পাইয়া প্রভা কত আনন্দিত হইবে এবং এই সুগন্ধি তৈল নিশিক্ত তরঙ্গায়িত ঘনকৃষ্ণ চুলে একটি কবরী বাঁধিয়া সে যখন সন্ধ্যার আলো অন্ধকারের ছায়ায় ধীরে ধীরে আমার কাছে আসিয়া হাসি মুখে বলিবে 'দাদা, দেখ কেমন তেল' তখন সেই বালিকার সরল হৃদয়ের কোমল স্নেহ মাধুরী এবং তাহার হর্ষোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠধ্বনি আমাকে কিরূপ অভিভূত করিয়া ফেলিবে. তাহাই ভাবিতেছিলাম বলিয়াই হয়ত এরূপ লিখিলাম। ইতিমধ্যে বোধকরি হুকায় তাম্রকূট এবং অগ্নি উভয়েরই মেয়াদ ফুরাইয়াছিল, সুতরাং বন্ধুবর হুকা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন ; সন্ধ্যার পর আমরা দুই বন্ধুতে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন শনিবার। সেদিনও কতকগুলি জিনিসপত্র ক্রয় করা হইল। রাত্রে আহারাদির পর অতুলের সহিত থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলাম, সেদিন "ষ্টারে" সরলা অভিনয় হইতেছিল ; থিয়েটার দেখিয়া যখন ফিরিলাম তখন আর অধিক রাত্রি ছিল না, নিস্তব্ধ রাজপথে কদাচিৎ দুই একখানি গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ, এবং পথের দুইধারে উজ্জ্বল গ্যাসালোক অকম্পিত শিখায় জ্বলিতেছে এবং সেই সকল আলোকস্তম্ভের পাশে বৃহৎ অট্টালিকাগুলি যেন দাঁড়াইয়া নিদ্রা যাইতেছে! দুই একটি অট্টালিক কক্ষ হইতে নির্বাণ প্রায় দ্বীপের ম্লান আলো মধ্যে মধ্যে দেখা যাইতেছিল।

বাসায় আসিয়া শয়ন মাত্রেই নিদ্রাভিভূত হইলাম, পরদিন শয্যাত্যাগ করিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল ; উঠিয়া স্নান ও আহার শেষ করিতে দশটা বাজিল। বাজারে যাইতে হইবে, পোর্টম্যাণ্ট হইতে টাকা বাহির করিতে গিয়া দেখি পোর্টম্যাণ্টের চাবি ভাঙ্গা! বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল, বাক্‌স খুলিয়া দেখিলাম জিনিসপত্র যেমন সাজান ছিল, তেমনি আছে কোরিয়ার ব্যাগের মধ্যে কতকগুলি নোট ও কুড়িটি টাকা ছিল দেখিলাম টাকা কুড়িটি নাই এবং নোটের তাড়া হইতে একখানি নোট অপহৃত হইয়াছে, প্রভার জন্য 'গোলাপগন্ধ কুন্তলীনের' বোতলটি কিনিয়াছিলাম, তাহাও দেখিতে পাইলাম না।

অত্যন্ত আশ্চর্য হইলাম, কিঞ্চিৎ আনন্দ বোধও করিলাম ; সৌভাগ্যবশতঃ আমার সমস্ত নোটগুলি অপহৃত হয় নাই। কিন্তু এ চুরির রহস্য বুঝিতে পারিলাম না, যেই চুরি করুক প্রায় চারিশত টাকার মধ্য হইতে মোটে একশত কুড়ি টাকা চুরি যাইবার অর্থ কি?

প্রতুলকে অবিলম্বে ডাকিয়া সমস্ত বলিলাম। তিনিও আমার অপেক্ষা অল্প আশ্চর্য্য হইলেন না, কিন্তু কাহার প্রতি সন্দেহ করিবেন বুঝিলেন না। চোর যে বাহির হইতে আসে নাই তাহা কতকটা অনুমান হইল, কারণ তাহা হইলে টাকা কড়ি নিঃশেষেই চুরি যাইত।

কিন্তু বাসায় এমন কেহ নাই যে চুরি করিতে পারে, পাচক ব্রাহ্মণ রাঁধিয়া দিয়াই তাহার নিজের বাসায় চলিয়া যায় ; তাহাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন সদুত্তর পাওয়া গেল না, একবার অপ্রসন্নভাবে বলিল, "কে বাবু চুরি করেছে তার ঠিক নেই, দোষ হতে হয় আর পাঁচজনের।" অতুলের ১৬/১৭ বৎসর বয়স্ক একটি চাকর ছিল, তাহার নাম বিপিন, বিপিনকে একথা জিজ্ঞাসা করা গেল, সেও কোন কথা বলিতে পারিল না, সুতরাং অগত্যা আমরা পুলিশে খবর দিলাম।

পুলিশ অবিলম্বে আসিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিল এবং বাসার সকলের জবানবন্দী লইল ; পাচক বিশ্বনাথ আমাদের কাছে কোন কথা বলে নাই। কিন্তু পুলিশের কাছে তাহার জবানবন্দীতে প্রকাশ হইল অতুলের চাকর বিপিনকে সে চুরি করিতে দেখিয়াছে, আমরা থিয়েটার দেখিতে যাওয়ার পর বিশ্বনাথ আহারাদি শেষ করিয়া বাড়ী যাইবার সময় সে উপর ঘরে বিপিনের কাছে ভাল তামাক চাহিতে যায় ; উপরে উঠিয়া দেখিল বিপিন তাহার বাবুর ঘরে প্রবেশ করিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিল, ইহাতে বিশ্বনাথের মনে কিছু কৌতূহলের সঞ্চার হইল, দ্বারের নিকট ধীরে ধীরে আসিয়া দ্বারের ফাঁক দিয়া দেখিল ঘরে ল্যাম্প জ্বলিতেছে, বিপিন এক মনে পোর্টম্যাণ্টের চাবি ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে, ইহা দেখিয়া বিশ্বনাথের মনে অত্যন্ত ভয় হওয়ায় সে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। বিপিনের বাক্স খুঁজিলে যে চোরা জিনিসের কিছু কিছু অংশ পাওয়া যাইতে পারে ইহাও তাহার কথার আভাসে বোধ হইল।

"একে মনসা তায় ধুনার গন্ধ" বিপিনের বাক্স পরীক্ষা করিতে আর পুলিশের বিলম্ব হইল না। একটা সামান্য কুলুপ লাগান ক্ষুদ্র টিনের প্যাঁটরা বিপিনের সম্পত্তি, সে তাহার বাবুর কাছে কখন একখানি পুরাতন কাপড় কিম্বা একটি অব্যবহার্য পিরাণ পাইলে মহাসমাদরে তাহা এই বাক্সের মধ্যে পুরিয়া তাহাদের প্রতি দীর্ঘ পেনসনের ব্যবস্থা করিত। পুলিশ যমদূতের ন্যায় তাহর নিকট হইতে চাবি কাড়িয়া লইয়া বাক্স খুলিয়া ফেলিল, বালক স্তম্ভিত হইয়া তাহাদের কার্য দেখিতে লাগিল। বাক্সের ভিতর হইতে বস্ত্রাদি নামাইতেই প্রভার জন্য যে 'কুন্তলীনের' বোতল লইয়াছিলাম তাহা বাহির হইয়া পড়িল, অল্প অনুসন্ধানেই দেখা গেল একখানি রুমালে কুড়ি টাকা বাঁধা আছে, এতদ্ভিন্ন একটি পুরাতন মণিব্যাগের মধ্যে তিনটি শিকি ও দুইটি দুয়ানী পাওয়া গেল। কিন্তু নোটের কোন সন্ধান হইল না। একজন কনেস্টবল চোক ঘুরাইয়া বলিল "নোটখানা কোথায় রাখিয়াছিস বল।" বিপিন কাঁদিতে কাঁদিতে অতুলকে বলিল "বাবু আমাকে রক্ষা করুন, আমি কিছুই জানি না, ঐ সিকি দুয়ানি আমার বটে কিন্তু এ টাকা কুড়িটা আমার নয়, আমার বাক্সে ঐ টাকা ও তেলের বোতল কেমন করিয়া আসিল তাহাও জানি না।" বালক অতুলের পা জড়াইয়া ধরিল।

ভয় দেখাইয়া যখন কোন ফল হইল না, তখন সব-ইনেস্পেক্টর বাবু তাহাকে অনেক লোভ দেখাইলেন, বলিলেন নোট খানি বাহির করিয়া দিলে তাহকে তাঁহারা ছাড়িয়া দিয়া যাইবেন, আর কোন বিপদ ঘটিবে না, কিন্তু বালক পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিল "আমি এ সকল কিছুই জানি না, আমাকে দয়া করিয়া ছাড়িয়া দেন, নোট লইলে তাহা এখনি আমি দিতাম।" কিছুতেই যখন কোন ফল হইল না, তখন তাঁহারা জিনিষপত্র সহ বিপিনকে চালান দিলেন ; সবইনেস্পেক্টর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি এই খোয়া নোটের নম্বর মনে আছে ?" আমার নোট বুকে তাহার নম্বর লেখা ছিল, তাঁহাকে তাহা দেখাইলাম, দেখিয়া তিনি বলিলেন "শীঘ্রই আমরা এ নোটের সন্ধান করিব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" তাঁহারা বিদায় লইলেন।

তিন দিন পরে মর্কদ্দমা, কাজেই আমাকে এ কয়দিন কলিকাতায় থাকিতে হইল। বাড়ীতে পত্র লিখিলাম কোন বিশেষ কারণে আমার কলিকাতায় কিছু বিলম্ব হইবে, চুরি সম্বন্ধে কোন কথা লিখিলাম না, অনর্থক সকলকে উদ্বিগ্ন করিয়া কোন ফল নাই ভাবিয়াই লিখিলাম না।

বিপিন উকিল দিয়াছিল। তাহার দাদা পুলিশকোর্টের কোন প্রধান উকিলের বাসায় কাজ করিত, তাহারই অনুরোধে উকিল বাবু বিপিনের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে বেলা দশটার সময় আমরা পুলিশকোর্টে উপস্থিত হইলাম ; দেখিলাম পাহারাওয়ালারা বিপিনের হাতে হাতকড়া লাগাইয়া তাহাকে নিকটে বসাইয়া রাখিয়াছে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চক্ষু ফুলিয়া উঠিয়াছে। অতুলকে দেখিয়া তাহার চক্ষু দিয়া বেগে জল পড়িতে লাগিল, তাহাকে এরূপ অসহায় ভাবে কাঁদিতে দেখিয়া আমরা উভয়েই কাতর হইলাম ; বাস্তবিক তাহার মুখে এমন সরলতা অঙ্কিত ছিল যে তাহার দুঃখ দেখিয়া তাহাকে কিছুতেই দোষী বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু তথাপি যদি সে অপরাধী হয় তাহা হইলে ইহা নিশ্চয় যে মুখ দেখিয়া কোন কালেই মানুষ চেনা যায় না।

একটার সময় মর্কদ্দমা উঠিল। সর্ব প্রথমে আমার ডাক পড়িল, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল আমি তাহা খুলিয়া বলিলাম ; দ্বিতীয় সাক্ষী অতুলচন্দ্র, বিপিন কত দিন তাঁহার কাছে কাজ করিতেছে, তাহার স্বভাব চরিত্র কেমন ইত্যাদি অনেক কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল ; তিনি সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন, তাঁহার কথায় বিপিনের চরিত্র উত্তম বলিয়াই

প্রমাণিত হইল।

অবশেষে আমাদের পাচক ব্রাহ্মণ বিশ্বনাথ পাহাড়ীর ডাক পড়িল ; বিশ্বনাথ পিরাণের ফাঁক দিয়া একগোছা পৈতা বাহির করিয়া গম্ভীর মুখে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে সাক্ষীর কাটরার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিশ্বনাথ পাহাড়ী নাম এবং নিবাস মেদিনীপুর এইমাত্র শুনিয়াই বিপিনের উকিল সবিস্ময়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুই একবার তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, অনন্তর তাহার জবানবন্দী আরম্ভ হইল। জবানবন্দী শেষ হইলে হঠাৎ উকিল বাবু আদালতের অনুমতি লইয়া পাঁচ মিনিটের জন্য উঠিয়া গেলেন এবং শীঘ্রই কয়েকখানি কাগজ লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

উকিল বাবু আসিয়াই বিশ্বনাথকে জেরা করিতে লাগিলেন "বিপিনকে তোমার মনিবের বন্ধুর বাক্স হইতে টাকা চুরি করিতে দেখিয়াছ বলিয়া পুলিশে তুমি যে সাক্ষী দিয়াছ তাহা কি সত্য ?"

বিশ্বনাথ—"টাকা চুরি করিতে দেখি নাই, তবে দোরের ফাঁক দিয়া দেখিয়াছিলাম বাবুর ঘরে ঢুকিয়া সে নূতন বাবুর বাক্স ভাঙ্গিতেছে।"

"সেই বাক্স যে নূতন বাবুর তাহা তুমি কিরূপে জানিলে ?"

বিশ্বনাথ "আগে জানিতাম না, পরে জানিতে পারিলাম।"

উকিল—"পুলিশ ডাকিবার আগে তুমি এই চুরির কথা কাহারো নিকট প্রকাশ করিয়াছিলে ?"

বিশ্বনাথ—"না।"

উকিল—"কেন বল নাই ?"

বিশ্বনাথ—"তখন পর্যন্ত আমি ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই যে বিপিনকে ধরাইয়া দেওয়া উচিত কি না।"

উকিল—"পুলিশ আসিলে বুঝি তোমার দিব্যজ্ঞান হইল ?"

"দেখিলাম ব্যাপার সহজে মিটিবার নয়, বিশেষ যে অপরাধ করিয়াছে তার দণ্ড পাওয়াই উচিত, এক জনের জন্য পাঁচজনের বদনাম হওয়া ভাল নয়, তাই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পুলিশের কাছে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম।" বিজ্ঞের ন্যায় মাথা নাড়িয়া এই কথা বলিয়া বিশ্বনাথ উকিলের মুখের দিকে সগর্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

উকিল—"আচ্ছা বলিতে পার এই 'কুন্তলীন' চুরি করিবার তাহার কি বিশেষ আবশ্যক ছিল, নোট ও টাকা চুরি করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেই ত পারিত।"

বিশ্বনাথ বলিল "এ কথার উত্তর আমার অপেক্ষা বিপিন বোধ করি ভাল দিতে পারিবে, কে কি মতলবে কোন্ জিনিস চুরি করিল তা অন্য লোকের বলা সহজ নয়, তবে অনুমান হয় ছোঁড়াটার স্বভাব চরিত্র যখন খারাপ ছিল তখন এমন একটা ভাল খোসবো তেলের লোভ সামলান তার পক্ষে সহজ হয় নাই।"

মাথা গুঁজিয়া উকিল বাবু কিয়ৎক্ষণ কাগজ পত্র দেখিলেন, তাহার পর বিশ্বনাথের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কত দিন অতুল বাবুর বাসায় কাজ করিতেছ ?"

উত্তর—"প্রায় ছয় মাস হইবে।"

উ—"মাসে কত মাহিয়ানা পাও ?"

বি—"ছয় টাকা।"

উ—"মাহিয়ানা প্রতি মাসে লও ?"

বি—"হ্যাঁ।"

উ—"টাকা লইয়া কি কর ?"

বিশ্বনাথের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল: ভয়ানক চটিয়া বলিল "টাকা লইয়া ফেলিয়া দিই, আপনারা মুঠো মুঠো টাকা লইয়া ঘরে যান, কোন দিক দিয়া খরচ হইয়া যায় ঠিক নাই, আর আমি ছ টাকা মাহিনা পাই তা খরচ হবে না ?"

উকিলবাবু পূর্ব্ববৎ অচঞ্চল ভাবে বলিলেন "তুমি ফেলিয়া দেও কি না তাহা জানিতে চাহি নাই, আমি জানিতে চাহি তুমি সমস্ত টাকা নিজে খরচ কর কি বাড়ীতে কিছু পাঠাও ?"

"খরচপত্র করিয়া যাহা বাঁচে পাঠাই।"

উকিল—"বিপিনকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিবার জন্য ইচ্ছা করিলে তোমার বেতনের টাকা হইতে ২০ টাকা বাঁচাইয়া তাহার বাক্সে রাখিতে পার কি না।"

বিশ্বনাথ একবার চারিদিকে চাহিল, রাগ প্রকাশ করিয়া বলিল "এমন কথা আমাকে কেন বলিতেছেন ? বিপিন আমার এমন কি ক্ষতি করিয়াছে যে তাহার শত্রুতা করিব ; আমরা গরিব লোক তাই আপনি এতটা অপমান করিতে সাহস করিলেন।"

উকিলবাবু বলিলেন, "যা জিজ্ঞাসা করি উত্তর দেও, বাজে কথা বলিয়া কোন লাভ নাই। তুমি তাহার বাক্সে টাকা রাখ নাই ?"

বিশ্বনাথ—"না, আমার কি গরজ তার বাক্সে টাকা রাখিব ? টাকা ত আর কামড়ায় না।"

একটা রাঁধুনী বামনের এই প্রকার ধৃষ্টতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম, পল্লীগ্রামের কোন চাকর ভদ্রলোকের সঙ্গে বিশেষতঃ মনিব ও হাকিমের সাক্ষাতে এরূপ ভাষায় কথাবার্তা কহিতে পারে না, কিন্তু কলিকাতার কথা স্বতন্ত্র। যাহা হউক সাক্ষীদের এরূপ উত্তর বোধ হয় উকিল বাবুর অভ্যস্ত ছিল ; তিনি বিদ্রূপের স্বরে উত্তর করিলেন "কামড়ায় কি না পরে টের পাবে। কতদিন তুমি বাড়ীতে টাকা পাঠাও নাই ?"

বিশ্বনাথ—"তা ঠিক বলিতে পারি না, মাসখানেক হবে।"

উকিলবাবু বলিলেন "আর যদি প্রমাণ হয় তিন দিন আগে তুমি কোন লোকের মারফৎ একশত টাকার নোট পাঠাইয়াছ ?"

বিশ্বনাথ যেন একটু থতমত খাইয়া গেল, এবং কোন উত্তর না দিয়া মাটির দিকে চাহিল।

তখন উকিলবাবু অতুলের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ইহাকে বেতন দিবার সময় আপনি অবশ্য রসিদ লইয়াছেন, সেই রসিদ দুই একখানি আমার দরকার।"

অতুল তৎক্ষণাৎ বাসায় আসিলেন, এবং চারিখানি রসিদ লইয়া উকিলের হাতে দিলেন। দেখিলাম রসিদগুলি মোটা মোটা অপরিষ্কার অক্ষরে লেখা।

অনন্তর উকিলবাবু বিশ্বনাথের দিকে ফিরিয়া বসিলেন "রবিবারের দিন তুমি তোমার ভাগিনেয় ফটিকের মারফৎ এক শত টাকার একখানি নোট মেদিনীপুরে তোমার দাদার কাছে পাঠাইতেছিলে কি না ?"

সেই মুহূর্তে বিচারালয়ে বজ্রাঘাত হইলেও হয়ত বিশ্বনাথ অধিকতর বিস্মিত হইত না, তাহার মুখ শুষ্ক ও বিবর্ণ হইয়া গেল, বলিল "একশ টাকার নোট, কৈ আমিত কোথাও পাঠাই নাই।"

উকিল বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "পাঠাইয়াছ ; স্বীকার করিবে না তাহা জানি কিন্তু সেজন্য আমি প্রস্তুত আছি।" অনন্তর আদালতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "রবিবারের দিন সকালবেলা ফটিক চক্রবর্ত্তী নামক একটি যুবা বৌবাজারে ভগবান মল্লিকের কাপড়ের দোকানে একখানি একশত টাকার নোট ভাঙাইতে যায়, দোকানদার তাহাকে ঐ নোটের

পৃষ্ঠে নাম স্বাক্ষর করিয়া টাকা লইতে বলে, ফটিক তাহাতে অসম্মত হয়। ঐ সময়ে ডিটেকটিভ বিভাগের সুযোগ্য কর্মচারীবাবু, কতকগুলি বস্ত্রাদি কিনিতে ঐ দোকানে আসিয়াছিলেন, ফটিকের ব্যবহারে তিনি সন্দিগ্ধ হইয়া উক্ত নোট তাহাকে কে ভাঙাইতে দিয়াছে এ সম্বন্ধে তাহাকে প্রশ্ন করেন, কিন্তু সে কোন প্রকার সদুত্তর করিতে না পারায় তাঁহার সন্দেহ বাড়িয়া যায়, তিনি ফটিককে আটক করিলেন। তাহার পর তাহার পরিচ্ছদাদি অনুসন্ধান করায় তাহার পকেট হইতে একখানি পত্র পাওয়া যায়। ফটিককে পুলিশের হাতে দেওয়া হইয়াছে ; সেই পত্র আমি দেখিয়াছি, সেই পত্রের লেখক বিশ্বনাথ পাহাড়ী, পুলিশ বিশ্বনাথ পাহাড়ীর অনুসন্ধান করিতেছে, এই মকদ্দমা হাতে লইবার সময় আমি একবারও মনে ভাবি নাই এই সেই বিশ্বনাথ পাহাড়ী ; তাহার নাম ও বাসস্থান শুনিয়া হঠাৎ সেই পত্রের কথা মনে হইল, পুলিশের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ পূর্বে পত্রখানি লইয়া আসিয়াছি।" পত্রখানি তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তে প্রদান করিলেন, আমরাও তাহা দেখিলাম, তাহাতে লেখা ছিল—

শ্রীচরণকোমলেসু—

দাদা মহাশয়, এদানি অনেক দিবসাবদি আপনার কোন সোম্বাদ না পাওয়াতে ভাবিতেছি, উত্তর লিখিয়া সন্তোসিবেন। সমপ্রোতি শ্রীমান ফটিক বাবাজিউ মেদিনীপুর জাইতেছে, তাহার ১০আ বড়ই মন্দ, এখানে তাহার কম্মকাজের কিছু সুবিদে হইল না। আমি তাহার মারফোতে একশত টাকার এক কিতা নোট পাঠাইতেছি, কি জানি যদি মেদিনীপুরে নোট ভাঙানর সুবিদে না হয় তাই ফটিককে বলিয়া দিয়াছি ঐ নোট সে এখান হইতে ভাঙাইআ লইয়া জাইবে, টাকাগুলি ১আ১০ই ঠাকুরের দোকানে জমা রাখিবেন। এখানে চুরি জাইবার ভয়ে টাকাগুলি রাখিতে পারিলাম না। অপর লোকের কাছে এ টাকার কথা প্রকাশ করিবেন না। আর আর কথা পরে লিখিব আমি ভাল আছি, ৫কড়ি কেমন আছেন লিখিবেন। ইতি।

সেবক শ্রীবিশ্বনাথ পাহাড়ী।

খামের উপরে লেখা "পরোম পুজনীঅ শ্রীজুৎ পতিতপাবন পাহাড়ী দাদামহাশয় শ্রীচরণ কোমলেসু।"

ম্যাজিস্ট্রেট পূর্বোল্লিখিত রসিদের নাম ও পত্রে 'বিশ্বনাথ পাহাড়ী' এই, স্বাক্ষর মিলাইয়া দেখিলেন, উভয় লেখাই যে এক হাতের তাহাতে সন্দেহ রহিল না। সুতরাং ফটিক যে বিশ্বনাথের আত্মীয় এবং বিশ্বনাথ তাহার মারফৎ টাকা পাঠাইতেছিল ইহা এক প্রকার প্রমাণ হইয়া গেল ; ফটিকের কাছে যে নোট পাওয়া গিয়াছিল, আদালতের আদেশ অনুসারে পুলিশ কর্মচারী তাহা সেখানে লইয়া আসিলে দেখা গেল আমার নোটবুকের নম্বরের সহিত ঐ নোটের নম্বর মিলিয়া গেল।

অবশেষে ফটিককে হাজির করা হইল, পুলিসের নিকট সকল কথা স্বীকার করিলেও এতদিন সে বিশ্বনাথের ঠিকানা তাহাদিগের অজ্ঞাত রাখিয়াছিল, আজ বিচারালয়ে ফটিক তাহার মাতুলকে দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

ফটিক পুলিশের নিকট যাহা স্বীকার করিয়াছিল এখানে আসিয়া তাহা অস্বীকার করিল না ; দেশে সে অল্প লেখাপড়া শিখিয়াছিল, এবং পাচকব্রাহ্মণের কার্য করিতে তাহার কিছু মাত্র প্রবৃত্তি ছিল না, তাই কলিকাতায় অন্য কোন কাজকর্মের চেষ্টায় আসিয়াছিল, কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ, কোনরূপে কৃতকার্য না হওয়াতে দেশে ফিরিয়া যাইতেছিল। রবিবারের দিন বেলা দশটার সময় সে হোরমীলার কোম্পানীর স্টিমারে মেদিনীপুর রওনা হইবে, রবিবারের সকালে বিশ্বনাথ তাহার দাদাকে দিবার জন্য এই নোট ও পত্র ফটিককে আনিয়া দেয় এবং

তাহা কলিকাতা হইতে ভাঙ্গাইয়া লইয়া যাইতে বলে। এ যে চোরাই নোট তাহা ফটিক জানিত না।

ম্যাজিষ্ট্রেট সমস্ত শুনিয়া বিশ্বনাথের আর কোন জবাব আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশ্বনাথ অধোমুখে নিরুত্তর হইয়া নখ খুঁটিতে লাগিল।

নির্দোষী বিপিন অব্যাহতি লাভ করিল, পুলিস কর্মচারীগণ তাহার পরিবর্তে বিশ্বনাথকে সাক্ষীর কাটরা হইতে নামাইয়া তাহার হাতে হাতকড়ি লাগাইতে লাগিল।

দুই দিন পরেই বিশ্বনাথ ও ফটিকের বিচার হইয়া গেল। বিচারে বিশ্বনাথের কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক বৎসর কারাদণ্ড হইল। ফটিক ইচ্ছাপূর্বক বিশ্বনাথের ঠিকানা পুলিশের অজ্ঞাত রাখায় এবং চোরাই নোট ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করায় তাহার প্রতি তিন মাস মাত্র সপরিশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। আমি আমার নোট ও টাকা ফিরিয়া পাইলাম এবং পূজার পূর্ব দিন বৈকালে দারজিলিং মেলে কলিকাতা হইতে বাড়ী রওনা হইলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রভাত সূর্যের কণক-কান্তি পূর্বাকাশে ফুটিয়া উঠিলে, আমার গো-শকট আমাদের গ্রামের বহিঃপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময় নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিলাম আকাশ অত্যন্ত পরিষ্কার, বৃক্ষপত্র হইতে মুক্তাফলের ন্যায় শিশিরবিন্দু ঝরিতেছে এবং তাহার উপর শরতের এই উজ্জ্বল প্রভাতের পীত রৌদ্র পড়িয়া একটি কোমল মাধুরী ফুটাইয়া তুলিতেছে। চতুর্দিক প্রফুল্ল; বিহঙ্গের প্রভাতকাকলি মুক্তপ্রান্তরে গোবৎসের আনন্দ নৃত্য,—এই স্নিগ্ধপ্রভাতে বোধ হইতে লাগিল শোক ও সন্তাপ পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছে, প্রভাতসূর্যের এই কনককিরণে জীবজগতে যেন শান্তি ও আনন্দ বর্ষিত হইতেছে!

গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতেই পূজাবাড়ীর সানাইয়ের শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। আজ সপ্তমীর প্রভাত, সানাই মধুর স্বরে আজ সেই কথা ঘোষণা করিতেছে, সে স্বরে কি উৎসাহ, কি আনন্দ এবং প্রীতির উৎস প্রবাহিত। বাঁশী যেন হাসিয়া হাসিয়া গাইতেছে "সারা বরষ পরে আজি পোহাল দুঃখ রজনী"—তাই এত হর্ষ এবং তাহার প্রত্যেক স্বর কম্পনে তাই এত উচ্ছ্বাস ঝরিয়া পড়িতেছে, কিন্তু তথাপি কে জানে কেন তাহার করুণ তান প্রাণের মধ্যে এক একবার অতৃপ্তি ও বিষাদ জাগাইয়া দিতেছিল, মনে হইতেছিল এমন উৎসব জীবনে কতবার আসিয়াছিল, কিন্তু সেই সকল শুভ মুহূর্ত দেখিতে দেখিতে চলিয়া গিয়াছে, আজিকার এত আনন্দ, এ উৎসাহ তিনদিন পরে কোথায় যাইবে?

বেলা আটটার সময় বাড়ী পৌঁছিলাম। কলিকাতা হইতে পূজার বাজার করিয়া আসিতেছি, বড় সাধারণ কথা নয়, বড় দাদার ছোট ছেলেটি একখানি এক হস্ত দীর্ঘ আখ চিবাইতে চিবাইতে রসসিক্ত উদরে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কাকা আমার আঙ্গা কাপল।" দেখিতে দেখিতে তার দিদি কাল কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি দুলাইয়া আমার পাশে ছুটিয়া আসিয়া বলিল "কাকা আমার সেই রকম বাঁশী পেয়েছ ত?" মেজবৌ বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন "কি ঠাকুরপো, কলিকাতায় গিয়ে কি আর ফিরে আস্‌তে ইচ্ছা হয় না?" ঠাকুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন "হারে, আমার 'হরেকৃষ্ণ' নাম লেখা হরিনামের ঝোলা পেয়েছিস্ ত?" নিরাশজনক উত্তর দেওয়াতে ঠাকুরমা বড়ই রাগিয়া উঠিলেন বলিলেন "তা এখন পাবি কেন, ঘোর কলি কি না বুড়ীদের হরিনামের ঝুলি উঠে গিয়েছে তার বদল হয়েছে ছুঁড়িদের বডি পাউডার আর সাবান ভ্যারান্দা" (ঠাকুরমা

ল্যাভেণ্ডারকে ভ্যারান্দা বলিতেন, অপিচ তাঁহার পৌত্রবধূ তাঁহার অপ্রীতিকর এই ভ্যারান্দার কিছু পক্ষপাতী বলিয়া তাঁহার এ কটাক্ষ)। প্রভা এতক্ষণ এক কোণে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার 'কুন্তলীন' আনিলাম কি না তাহাই জানিতে তাহার অধিক আগ্রহ, কিন্তু সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করিতেছিল না, কারণ যদি আমি বলি 'না, আনিতে সময় পাই নাই।' নিরাশা অপেক্ষা সংশয় ভাল। আমি তাহার মনের ভাব বুঝিলাম, হাসিয়া বলিলাম "প্রভা, তোর জন্যে যে 'কুন্তলীন' এনেছি, অমন তেল তোর চুল কোন জন্মে দেখেনি।" শরতের সেই প্রভাতরৌদ্রের মত তাহার মুখে স্নিগ্ধ, সুন্দর হাসি ফুটিয়া উঠিল, আমি বলিলাম, "তোর কুন্তলীনের অনেক গুণ, সুগন্ধ, ঠাণ্ডা এবং চুলের গোড়া শক্ত করা সম্বন্ধে ত তার খুব সুখ্যাতি আছেই, কিন্তু এ সকল ছাড়াও তার একটা বড় গুণ আছে।"

এতক্ষণ পরে প্রভার মুখ ফুটিল, সে কথা কহিতে আরম্ভ করিলে আর কথায় তাঁহাকে আঁটিয়া উঠা যায় না, সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "কি গুণ দাদা, বৌ বশ করা যায় বুঝি"।

আমি হাসিয়া বলিলাম "তা বলিতে পারি না, তোর বৌদিদি দিনকতক ব্যবহার করার পর সে কথা তাকে জিজ্ঞাসা করিস, এর গুণ হচ্ছে এতে চোর ধরা যায়।"

প্রভার বৌদিদি নিকটেই ছিলেন, কথাটা বোধ করি তাঁহার অসহ্য হইয়া থাকিবে, তিনি মৃদু হাসিয়া প্রভাকে বলিলেন "ঠাকুরঝি তোর দাদাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি ভাই, কোন চোর ধরা যায়, মনচোর নয়ত? তাহলে এ তেল মেয়েমহলে খুব বিক্রি হবে।"

এই কথা শুনিয়া প্রভা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল ; আমাকে শুধু বলিল "সত্যি দাদা তুমি ঠাট্টা ক'রোনা, আজকাল সব তেলে যেমন টাকা হতে আরম্ভ ক'রে হারান গরু পর্যন্ত সকল জিনিসের কিনারা হয়, এওকি তেমনি নাকি?"

আমি বলিলাম "না বোন, সত্য সত্যই তোর তেলের জন্য চোর ধরা পড়েছে : সেই চুরির গণ্ডগোলেই ত কলিকাতায় আমার এত বেশী দেরী হইল।" অনন্তর আমার টাকা, নোট এবং কুন্তলীনের বোতল চুরির গল্প বলিলাম ; প্রভা শুনিয়া বলিল "তোমার তেলে চোর আর ধরিল কৈ? সাধুকে নিয়াই ত টানাটানি করিল।"

সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর আরতির কিছু পূর্বে ঘরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় প্রভা কুন্তলীনে কবরী বাঁধিয়া হাসিতে হাসিতে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, সহসা যেন সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপের সৌরভে গৃহ আমোদিত হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম "খবর কি প্রভা? কেমন তেল?"

প্রভা উত্তর দিল "তোমার তেলের চোর ধরা বিদ্যা থাক্ না থাক্, হাসিখুসি মুখখানি কিন্তু বেশ আঁধার করে দিতে পারে!"

জিজ্ঞাসা করিলাম "এ কথা বলছিস্ কেন?"

প্রভা গম্ভীর হইয়া বলিল "যখন তুমি এলে তখন ত বেশ, তারপর যখন আমি তোমার তেল দিয়ে চুল বাঁধলাম, তখন হ'তে বৌদিদির মুখটা আঁধার হয়ে গেল, তাঁর জন্যে যে তেল এনেছ, তাতে বুঝি তাঁর মন উঠেনি, তাই বল্‌ছি তোমার তেলে হাসি মুখ বেশ আঁধার ক'রে দিতে পারে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম "দূর পাগ্‌লি, হাসি ফিরিয়ে আন্‌তে কি বেশী সময় লাগে?"

প্রভা বলিল "তাকি শীঘ্র ফেরে, দাদা?"

"বিষে বিষক্ষয় তা জানিস্. তো? আমি শীঘ্রই আরো কয়েক বোতল 'কুসুমগন্ধী' 'কুন্তলীন' আন্‌তে দিচ্ছি, গোলাপ ছাড়াও তাতে অন্যান্য গন্ধ আছে।"

"ওঃ—তাহলে দাদা, তুমি ওসুদ্ ঠিক ক'রে ফেলেছ" এই বলিয়া প্রভা হাসিতে হাসিতে

চলিয়া গেল ; আমি ভাবিলাম এই কথোপকথনের মধ্যে ভাগ্যে প্রভার বৌদিদি এখানে আসিয়া পড়েন নাই, তিনি আসিয়া ভ্রাতাভগিনীর এই কথোপকথন শুনিলে যে তুমুল সংগ্রামের অবতারণা করিতেন তাহা বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত হইত।

আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিল, ধীরে ধীরে গৃহের বাহিরে আসিলাম, শুভ্র চন্দ্রালোকে চতুর্দ্দিক ভাসিতেছিল, প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে একবার এই শান্তিপূর্ণ পরম রমণীয় নৈশশোভা নিরীক্ষণ করিয়া লোক ও আলোকপূর্ণ বহির্ব্বাটীর জনতার মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

রামপুর বোয়ালিয়া, বড় কুঠী
রাজসাহী, ১৯এ শ্রাবণ ১৮৯৪

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

লীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

উন্মুক্ত বাতায়ন পথে সান্ধ্য-রাগ-রঞ্জিত আকাশের পানে চাহিয়া বসিয়া আছি। স্নিগ্ধ প্রদোষ বায়ু ললাটের স্বেদবিন্দু বিদূরিত করিতেছে। এমন সময় "ফণি দাদা, আমার মাকেসার তৈল আনিয়াছ" বলিয়া হাস্যময়ী লীলা আমার নিকটে আসিল। লীলা আমার পিতার বন্ধু কন্যা, তাহার পিতা মৃত্যুর সময় তাহাকে আমার পিতার করে সমর্পণ করিয়া যান, তদবধি লীলা আমাদের গৃহেই অবস্থান করিতেছে। এ সংসারে বালিকার আর কেহ নাই। বলা বাহুল্য আমরা লীলাকে অত্যন্ত স্নেহ করি, লীলাও আমাদের বড় ভালবাসে। তাহার অন্তঃকরণ সরল মধুরতাময়। মুখখানি হাসি মাখা, পদবিক্ষেপ এত লঘু যে নিকটে আগমন পর্যন্ত কেহ শুনিতে পাইত না। লীলা চপলার ন্যায় আমাদের গৃহে খেলা করিয়া বেড়াইত। কখন আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে জানিতে পারি নাই। তাহার কথা শুনিয়া আমার চমক ভাঙ্গিল, বলিলাম "আনিয়াছি লীলা, কিন্তু মাকেসার নয়, অপর একটি তৈল, নাম "কুন্তলীন", মাকেসার অপেক্ষা সুগন্ধ এবং বোধ হয় উপকারীও হইবে। তৈলটি সুগন্ধ এবং আমাদের দেশে প্রস্তুত বলিয়া আমার পছন্দ হইল ; পরীক্ষা করিয়া দেখ।" লীলা আমার হাত হইতে শিশিটা লইল এবং তৈলের গন্ধে অত্যন্ত প্রীত হইল ও বলিল "হাঁ ফণি দাদা মাকেসার অপেক্ষা গন্ধ ভাল, তোমার বেশ পছন্দ।" এই বলিয়া লীলা যাইতে উদ্যত হইল। আমি বলিলাম "চঞ্চলা, একটু দাঁড়াও, একটা কথা আছে।" (লীলা) "কি কথা ফণি দাদা" (আমি) "আমি কল্য এক জায়গায় যাইব।" (লীলা) "কোথা ?" (আমি) "অনেক দূর, এদেশ ছাড়িয়া।" (লীলা) "সে কি ! কোথা যাইবে, কেন সন্ন্যাসী হইবে নাকি ?" মনে মনে বলিলাম তুমি থাকিতে ত পারিব না, প্রকাশ্যে হাসিয়া বলিলাম "না লীলা, চাকুরী করিতে, একটা চাকুরী উপস্থিত হইয়াছে, কল্যই রওনা হইতে হইবে।" লীলার মুখ বিবর্ণ হইল, কম্পিত স্বরে বলিল, "কোন্ দেশে যাইবে ফণি দাদা, সে কি অনেক দূর ?" (আমি) "ব্রহ্মদেশ—দূর বটে, যাইতে ১২ দিন লাগিবে।" লীলা কাতর নয়নে আমার মুখ পানে চাহিয়া বলিল "না ফণি দাদা অতদূরে যাইও না, তোমার কোন মতেই যাওয়া হইবে না, মা

যাইতে দিবেন না।" লীলার আগ্রহপূর্ণ কাতরতা দেখিয়া আমার মনে যুগপৎ আনন্দ ও ক্লেশের উদয় হইল। কৌতুক দেখিবার জন্য বলিলাম "তা আমি বিদেশে গেলামই বা লীলা, তোমার তাহাতে ক্ষতি কি ? অস্ফুট আলোকে দেখিলাম, লীলার মুখ গম্ভীর হইল, চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল, টেবিলের উপর ছোট ছোট হাত দুখানি পাতিয়া তাহাতে মুখ লুকাইল ও কম্পিত স্বরে বলিল, "আমি মরিয়া যাইব।" আমার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল, কেন বালিকাকে ওকথা জিজ্ঞাসা করিয়া কষ্ট দিলাম। কিন্তু বালিকা করিল কি ! সন্ধ্যার অন্ধকারে লজ্জার আবরণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখাইল ! উভয়েই ক্ষণকাল নির্ব্বাক নিস্পন্দ। সম্মুখে দেখিলাম হর্ষ বিষাদ আশা, ভালবাসার অনন্ত সমুদ্র। আমি স্তম্ভিত। ক্ষণকাল পরে আস্তে আস্তে লীলার নিকটে গেলাম ও হাত হইতে তাহার মুখখানি তুলিলাম, দেখিলাম হাত দুটি অশ্রুসিক্ত। পাঠক মহাশয় বলিতে লজ্জা করে বালিকার অশ্রুতে আমার কয়েকবিন্দু অশ্রু মিলাইলাম। তাহার পর বালিকার হাত দুটি ধরিয়া বলিলাম "লীলা স্থির সংকল্প করিয়াছি যাইব, হৃদয় বাঁধিয়াছি, আর কাঁদাইও না ; আবার আসিব, আজি যে আশা হৃদয়ে স্থান দিয়াছি তাহা যেন ফলবতী হয়।" লীলা নিরুত্তর, ভূমি সংলগ্ন দৃষ্টি। আরও কি বলিলাম এক্ষণে স্মরণ নাই, কিন্তু কিছুতেই লীলা আর কথা কহিল না, ধীরে ধীরে আমার হস্ত হইতে হাত দুটি অপসারিত করিয়া আস্তে আস্তে আমার গৃহত্যাগ করিল। আমার বোধ হইল যেন সে তাহার অভ্যস্ত লঘুপাদবিক্ষেপ এক মুহূর্তে বিস্মৃত হইয়াছে ; মুহূর্ত মধ্যে বালিকা লীলা লজ্জাশীলা যুবতী।

★ ★ ★

এক বৎসর অতীত হইয়াছে আমি মাতৃঠাকুরাণীর অশ্রুধারা পরিসিক্ত হইয়া জন্মভূমির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। আসিবার সময় লীলা আমার সম্মুখে আসে নাই ; বোধ হয় বালিকা তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের বলের উপর অধিক বিশ্বাস করিত না। বাটী হইতে বহির্গমনের সময় দেখিয়াছিলাম মুক্ত বাতায়ন পথে দুইটি অশ্রুপূর্ণ আকর্ণবিশ্রান্ত নয়ন অনিমেষে আমার পানে চাহিয়া আছে। সে নয়ন হৃদয়ের কত গোপনীয় কথা আমায় বলিয়া দিয়াছিল। তাহার পর এই এক বৎসরের মধ্যে আমি আর বাটীর কোন সংবাদ জানি না, কারণ আমাকে সর্বদা কর্মোপলক্ষে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে হইত ; আমার কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা ছিল না। মধ্যে মধ্যে আমি কিন্তু বাটীতে পত্র দিতাম। এই এক বৎসর পরে অদ্য আমি ছুটি পাইয়া বাটী রওনা হইলাম।

★ ★ ★

অদ্য আমি বাটী পৌঁছিব। কত আশা, কত ভয়, কত সন্দেহ, হৃদয় তরঙ্গায়িত করিতেছে, তাহা এই রূপ অবস্থায় পতিত ব্যক্তি ভিন্ন অপরে উপলব্ধি করিতে পারে না। কম্পিত পদে কম্পিত হৃদয়ে গ্রামের সমীপবর্তী হইলাম। গ্রামের প্রান্ত দেশেই আমাদের বাটী, ক্রমে বাটীর নিকটস্থ হইলাম। ধৈর্য্যের বাঁধ টুটিল, দ্রুতপদে বাটী প্রবেশ করিয়া একেবারে নিজগৃহে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু কি দেখিলাম ! লীলা পীড়িতা, শীর্ণা সংজ্ঞাহীনা, শয্যার পার্শ্বদেশে মাতৃঠাকুরাণী লীলার মুখের দিকে চাহিয়া উপবিষ্টা। আমাকে দেখিয়া মাতৃঠাকুরাণী দৌড়িয়া আসিয়া আলিঙ্গন করিলেন, হৃদয়ের আবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে লীলার পীড়ার কথা

সমস্ত বলিলেন। আমি আস্তে ২ লীলার শয্যায় উপবেশন করিয়া তাহার গায়ে হাত দিলাম, লীলা চক্ষু উন্মীলিত করিল। তাহার শুষ্ক অধর প্রান্তে একটু ক্ষীণ হাসি দেখা দিল। ধীরে ধীরে দুই একটা কথা কহিল, কিন্তু তাহা অসংলগ্ন প্রলাপ মাত্র। আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল পরে লীলা আবার চাহিল, কত কি বলিল, তাহার মধ্যে একবার চুপি ২ বলিল "ফণি দাদা ত এলো না।" আমার ধমনীতে তড়িৎ প্রবাহ ছুটিল, লীলার সম্মুখীন হইলাম। লীলা অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল যেন চিনিতে পারিতেছে না। পরে চুপি চুপি বলিল "ফণি দাদা আসিবে" আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। এবার বালিকা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। নিদ্রিতাবস্থায় তাহার শুষ্ক মুখখানিতে এবার প্রফুল্লতার চিহ্ন প্রকাশ পাইল। আমার হৃদয়ে একটু আশার সঞ্চার হইল। প্রায় ৪ ঘণ্টা পরে লীলার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নয়ন উন্মীলন করিয়াই আমায় দেখিতে পাইল ও বলিল "ফণি দাদা আসিয়াছে" "হাঁ লীলা তোমার ফণি দাদা আসিয়াছে চিনিতে পারিয়াছ ?" বলিয়া লীলার শুষ্ক অধরের একটি চুম্বন চুরি করিলাম। লীলা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। এই সময়ে মা গৃহান্তরে গিয়াছিলেন। লীলার হাস্য শুনিয়া মা আসিলেন লীলা মাকে বলিল "মা ফণি দাদা আমার চুম খাইল কেন ?" আমি ত লজ্জায় অধোবদন, বুঝিলাম লীলার বিকার এখনও সম্পূর্ণ রূপে কাটে নাই। পর দিবস লীলা অনেক প্রকৃতিস্থ হইল। ৮/৯ দিবসের মধ্যে লীলা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল।

★ ★ ★

আমার বিবাহ। লীলার সঙ্গে। লীলারা আমাদের 'পালটি' ঘর নয় কিন্তু মা'র ইচ্ছা লীলাকে গৃহেতেই রাখিবেন। বলিতে পারি না লীলার বিকারের সময় লীলা মা'র নিকট আমার নামে যে অভিযোগ করিয়াছিল তাহা শুনিয়া মা এ সংকল্প করিয়াছিলেন কি না। আমার কিন্তু সেই সন্দেহই হয়। যাহা হউক আমার "পাথরে পাঁচ কিল"। লীলারও পায়ে চখে মুখে চপলার আবির্ভাব হইয়াছে। বাটীময় লীলা যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু আমার কাছে আর আসে না।

★ ★ ★

অদ্য বিবাহ। আমি আপনার ঘরে এক প্রান্তে বসিয়া আছি। লীলা আমায় দেখিতে পায় নাই, গুন গুন করিতে করিতে প্রবেশ করিয়া গৃহের অপর প্রান্তে গিয়া একটা বাক্স খুলিল। বাক্সর ভিতর হইতে একটা শিশি লইয়া বাক্স বন্ধ করিল। পরে শিশিটাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "আজ দেড় বৎসর পরে তোমায় ব্যবহারের দিন উপস্থিত হইয়াছে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম এই দিন উপস্থিত না হইলে তোমায় ব্যবহার করিব না, আজ সেই দিন উপস্থিত ; আজ আর একটি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যত দিন বাঁচিব অন্য তৈল ব্যবহার করিব না।" আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম লীলা এক শিশি 'কুন্তলীন' তৈলের উপর মনুষ্যত্ব আরোপ করিয়া তাহার সহিত পাগলের মত বকিতেছে ! দেড় বৎসর পূর্বে আমি তাহাকে ঐ তৈল শিশিটা আনিয়া দিয়াছিলাম। লীলার পাগলামির ভিতর হৃদয়ের গভীরতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। আমার অজ্ঞাতসারে আমার হাত হইতে একটা পেনসিল ভূমে পতিত হইল। সেই শব্দে লীলার চমক ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখিল আমি সস্মিত মুখে তাহার কার্যকলাপ

দেখিতেছি। লজ্জায় আরক্তমুখী হইয়া জিব কাটিয়া ছুটিয়া পলাইল। আমি ডাকিলাম "লীলা শোন, শোন"—আর শোন!

*　　　　*　　　　*

পাঠক মহাশয় ক্ষমা করিবেন আর আমার লেখা হইল না। এখন লীলা ঠাকুরাণী না ডাকিতেই আসিতেছেন। আমার লিখিত বিষয়ের মর্ম যদি ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন, বিশেষ তাঁহার যে বিদ্যা বাহির করিয়া দিয়াছি এরূপ সন্দেহ হইলে, আমার এত শ্রম পণ্ড হইবে। কাগজগুলা হয় শতাংশে বিভক্ত হইয়া গৃহপ্রাঙ্গণ শোভা করিবে, না হয় বর্তুলাকার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সরীসৃপানুরূপ-গামী সর্বভুক শিশুর খাদ্যান্তরে পরিণত হইবে। অতএব এইখানে ফুলস্টপ দিলাম।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় এম, এ
বাঁশবেড়িয়া, হুগলী

বিশেষ পুরস্কার ১৫্

রাজলক্ষ্মী

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রভাত হইতেছে মাত্র। এখনও ভাল করিয়া আলো হয় নাই; উষার প্রথম কিরণ চন্দ্রালোকের মত দেখা যাইতেছে; একটি মুক্ত বাতায়ন পথে সেই আলোক, একজন নিদ্রিত নবযুবকের মুখের উপরে পড়িয়া তাহার সুন্দর মুখখানি অধিকতর সুন্দর করিয়া হাসিতেছে।

সহসা একজন প্রবীণা মহিলা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "বাবা পূর্ণচন্দ্র! জেগেছ কি?"

পূর্ণচন্দ্র পাশ ফিরিয়া মুখ চোখ রগড়াইতে লাগিলেন, তখন রমণী বলিলেন "সেই ডেপুটী বাবু লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন; আজ তোমার সেখানে না গেলে হবে না। উনিও যেতে বলেছেন।"

এই পূর্ণচন্দ্র রাম নগরের রাজার দেওয়ানের ছেলে। বয়স একুশ বাইশ বৎসর, দেখিতে বেশ সুশ্রী। এবার প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি, এ পাশ করিয়াছেন; এবং এতদিন অবিবাহিত থাকায় কন্যাদায়গ্রস্ত মাতাপিতাদের বিশেষ "মনোযোগের পাত্র" হইয়াছেন। ক্ষমতাপন্ন রাজ-কর্মচারিদিগের প্রসন্নতা লাভের জন্য বেকার উমেদারেরা যেমন আত্ম-সম্ভ্রম গুণটি অনায়াসে বলিদান করেন, পূর্ণচন্দ্রের পিতা দেওয়ান নবীনচন্দ্র মহাশয়ের প্রসন্নতা লাভের জন্য অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিও সেইরূপ কাজ করিতে সর্বদাই প্রস্তুত আছেন। তাঁহাদের কেহ "নগদ তিন হাজার টাকা হাঁকিলেন; কেহ বিষয় সম্পত্তি লিখিয়া দিতে উদ্যত হইলেন; কেহ পূর্ণচন্দ্রকে বড় চাকরী দিবার লোভ দেখাইলেন; ইহাতে অন্য কোনও ফল

হইল না বটে, তবে দেওয়ান বাবুর শ্রীচরণে সুগন্ধি তৈল প্রদান করিয়াই অনেকের মানব জন্ম সার্থক হইল। এদেশে সুযোগ্য পাত্রের পিতার পদধূলিও কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে "পারিজাত-রেণু" হইয়া উঠিয়াছে।

দেওয়ান বাবুর ইচ্ছা যেমনই হউক, দেওয়ানপত্নীর কিন্তু পুত্রবধূর সোনামুখ দেখিবার সাধটি বড় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি কি করিবেন, এদেশের ভাব গতি দেখিয়াই হউক, আর নিজের গৌরবেব জন্যই হউক, নবীন বাবু খাঁটি দেওয়ানী ভাষায় বলিতেছেন "আমার ছেলে আমি দু হাজার, চার হাজার, টাকায় কখনই ছাড়িয়া দিব না।" পক্ষান্তরে পূর্ণচন্দ্র কলেজে পড়া এবং সম্প্রতি বি, এ পাশ করা ছেলের উপযুক্ত সাধা গলায় বলিতেছেন "আমার মনোমত পাত্রী না পেলে আমি বিবাহ কখনই করিব না।"—সুতরাং বাপ বেটার এই রকম দুই ভাবের প্রতিজ্ঞা মিশিয়া দুই জাতীয় তাড়িত সংমিশ্রণের মত অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিণত হইল। সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অন্য কাহারও ক্ষতি না করুক, দেওয়ান গৃহিণীর পুত্রবধূর মুখ দেখা লালসা আর পূর্ণচন্দ্র-লোভী কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোকদিগের কপাল, নিষ্ঠুর ভাবে পোড়াইতে লাগিল।

যাহা হউক সম্প্রতি ডেপুটী বাবুর কন্যার সহিত পূর্ণচন্দ্রের বিবাহের কথা হইতেছে। হাল আইন অনুসারে কন্যা দেখিবার ভার স্বয়ং পূর্ণচন্দ্রের উপরে। তাই তাঁহার মা এত ভোরে নিদ্রিত পুত্রকে জাগাইতে আসিয়াছেন।

মা'র স্নেহ সম্ভাষণে ছেলে উঠিয়া বসিলেন। এবং বিকালে কন্যা দেখিতে যাইবেন বলিলেন। মা তখন পুলকিতা হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ডাকিলেন "হে ঠাকুর! হে সুবচনি আমার বাছার যেন শীঘ্র বিয়ে হয়; বৌ যেন ভাল হয়; রাজার মেয়ে আমার বৌ হয়; তোমাদের পুজো দেব।"

পূর্ণচন্দ্রের মাতার প্রার্থনা ভগবানের চরণে পৌঁছিল কি না, কে বলিবে? আর এই রকম প্রার্থনার জন্য এক দিন এই মাতা পুত্রকে বিশেষ অনুতপ্ত হইতে হইবে কি না তাহাই বা আজি কে বলিয়া দিবে? মানবের অদৃষ্ট লিপি পাঠ করিতে কাহার সাধ্য?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মা চলিয়া গেলে পূর্ণচন্দ্র ধীরে ধীরে শয্যা ছাড়িয়া উঠিলেন। প্রাতঃক্রিয়া সমাপনের জন্য, টুথ পাউডার (Tooth-Powder) অথবা ঐ রকম কোনও কিছু, দাঁতন দিয়া দাঁত ঘষিতে ঘষিতে পুষ্করিণী তীরে উপস্থিত হইলেন। এ পুষ্করিণীর নাম "রাজার পুকুর"; রামনগরের রাজা নিজ ব্যয়ে এই সুন্দর জলাশয় খনন কাইয়াছেন। এই রাজার পুকুরে প্রধানতঃ স্ত্রীলোকদিগেরই অধিকার। পুরুষ এখানে কদাচিত আইসে। পুকুরের নীল নির্মল জলরাশি উষার মৃদুপবনে তর তর করিয়া বহিয়া যাইতেছে; ঘাটের ইষ্টক নির্মিত সোপান শ্রেণীর উপরে বসিয়া হিন্দু মহিলাগণ প্রাতঃসন্ধ্যা ও শিবপূজা করিতেছেন; চারিপাশে আম, জাম, কাঁঠাল, নিচু প্রভৃতি ফলের গাছ, অশোক কদম্ব, কামিনী, বকুল প্রভৃতি ফুলের গাছ, এবং দেবদারু ঝাউ প্রভৃতি সুদৃশ্য গাছ সকল উন্নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; কদম্ব ফুল ফুটিয়া গাছ আলো করিয়া ধরিয়াছে; কামিনীফুল তাহার দেহ-সৌরভ দিগ্‌দিগন্তে ছুটাইতেছে;—গাছের উপরে সুকণ্ঠ বিহঙ্গকুল মধুর সঙ্গীতে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিতেছে; কিন্তু সকল মধুরতার উপর একটি মধুমাখা, বালিকা-কণ্ঠে শিবস্তোত্র গীত হইতেছে—জড় প্রকৃতিও যেন সেই মধুর উচ্ছ্বাসে ভাসিয়া যাইতেছে! চকিতনেত্রে পূর্ণচন্দ্র

চারিদিকে চাহিলেন ; শেষে দেখিলেন দেবদারুতলে নবপল্লবের আসনে বসিয়া, অর্দ্ধস্ফুট গোলাপ ফুলের মত একটি সুন্দরী বালিকা গান গাহিতেছে—যেন বনদেবী বালিকামূর্তি ধারণ করিয়া মর-মানবের কানে স্বর্গীয় সঙ্গীতসুধা ঢালিয়া দিতেছেন ! বিস্মিত ও সোৎসুকনেত্রে পূর্ণচন্দ্র দূর হইতে বালিকার প্রতি চাহিয়া রহিলেন : চাহিয়া চাহিয়া শেষে চিনিলেন, বালিকা তাঁহাদের এক গ্রামবাসিনী প্রফুল্লবালা। প্রফুল্লবালার পৈতৃক ভূমি এখানে নহে, কেন এখানে আসিয়াছে তাহা বলিতেছি।

প্রফুল্লের পিতা রামগোপাল বসু, হুগলী জেলাব নিকটে কোনও গ্রামে বাস করিতেন। একদিন ধন, মান, কুল, শীল প্রভৃতির জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু শেষ বযসে প্রজা বিদ্রোহ এবং সরিকী মামলায় হৃতসর্বস্ব হইয়া যান। এমনি সময়ে স্নেহের ধন সন্তানগুলিও অকালে কালগ্রাসে পড়িয়া দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের সীমা অধিকতর সম্প্রসারিত করিল। তখন উপায়ান্তর অভাবে রামগোপালবাবু, সস্ত্রীক, একমাত্র শিশুকন্যা প্রফুল্লবালাকে লইয়া, তাঁহার মাতুলালয়ে গোবিন্দপুরে বাস করিতে আইসেন। দেওয়ান নবীনচন্দ্র মিত্রও এই গোবিন্দপুর নিবাসী। তিনি প্রতিবাসীরূপে সময়ে সময়ে বামগোপাল বাবুদিগকে অনুগ্রহ করিতেন। পূর্ণচন্দ্র ও প্রফুল্লবালার এক গ্রামে বাস করিবার কারণ ইহাই।

যাহা হউক নিগ্রহ বা অনুগ্রহ ভোগ করিবার জন্য আজি বাম বাবু এ জগতে নাই। একদিন মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে জন্মের মত অব্যাহতি প্রদান করিল। তাঁহাব অভাবে তাঁহার অনাথা স্ত্রী কন্যা অকূল দুঃখসাগরে ভাসিতে লাগিল। তাহাদের "আপনার জন" কেহই রহিল না।

যখন প্রফুল্লের মা'র অবস্থা ভাল ছিল, তখন তিনি লেখাপড়া, শিল্প, ছবি আঁকা, হারমোনিয়ম, পিয়ানো বাজানো এবং সুন্দর গান করা প্রভৃতি সুকুমার বিদ্যা শিখিয়াছিলেন। প্রফুল্লের পিতা এই সকল বিষয়ে অনুরাগী বলিয়া নিজে শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া ভার্যাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। যখন প্রফুল্লের পিতা পত্নী ও কন্যাকে দরিদ্রতাব মধ্যে ফেলিয়া জন্মের মত চলিয়া গেলেন, তখন তাঁহার শোকাকুলা পত্নী তাঁহার বালিকা প্রফুল্লের অবস্থা ভাবিয়া অধিকতর আকুলা হইয়া পড়িলেন। একবার ইচ্ছা হইল ধনীর গৃহে পাচিকা হইয়া মায়ে ঝিয়েব অন্নবস্ত্র সংস্থান করিবেন। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহার জীবনের সহিত তাঁহার সর্বস্বধন প্রফুল্লবালার সুকুমার জীবনও নির্মম পরাধীনতায় দাসত্বচক্রে নিষ্পেষিত হইবে কুসুম কোমল বালিকাহৃদয় অসহনীয় বেদনায ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এই সব ভাবিয়া তাহাতে প্রবৃত্তি রহিল না। শেষে অনেক ভাবনার চিন্তার পরে যৎকিঞ্চিৎ মূলধন সংগ্রহ করিয়া, মায়ে ঝিয়ে উলের কাজ, সূচের কাজ ও ছবি আঁকা আরম্ভ করিলেন। এই সকল শিল্প ও চিত্র হইতে ধীরে ধীরে কিছু লাভ হইতে লাগিল। এতভিন্ন পুরাতন পিয়ানো যন্ত্রটি তাঁহাদের কাছে ছিল। প্রফুল্ল মা'র কাছে এত সুন্দর বাজনা ও গান করিতে শিখিল যে স্ত্রীলোকের গানের উপর যাদের অপ্রবৃত্তি, তাহাদের অনেকেও প্রফুল্লের মধুর কণ্ঠ-নিঃসৃত গীতি শুনিয়া মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। স্বয়ং রামনগরের গুণগ্রাহী রাজা একদিন গোবিন্দপুরে আসিয়া ঘটনাক্রমে এই বালিকার সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দের চিহ্নস্বরূপ পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। এই জন্যই পূর্ণচন্দ্র আজি এই বালিকার সঙ্গীত শুনিয়া এরকম মুগ্ধ হইলেন !

সহসা পূর্ণচন্দ্রের প্রতি প্রফুল্লের চক্ষু পড়িল, তার ছিড়িলে বীণার শব্দ যেমন সহসা থামিয়া যায়, পূর্ণচন্দ্রকে দেখিয়া সে সঙ্গীতও সেইরূপ সহসা নীরব হইল। প্রফুল্ল এখন ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা, একজন পুরুষ মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহার প্রতি চাহিয়া আছে, দেখিয়া সে সসম্ভ্রমে, আনতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল, আর গান গাহিল না।

তখন অপেক্ষাকৃত সংযতভাবে, মৃদুপাদবিক্ষেপে পূর্ণচন্দ্র পুষ্করিণীর ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এদিকে প্রফুল্লের মা পূজা সমাপন করিয়া প্রফুল্লকে ডাকিলেন "প্রফুল্ল ! এস মা, বাড়ী যাই।" প্রফুল্ল মুখে প্রফুল্ল, মা'র অনুবর্তিনী হইল।

যতক্ষণ বালিকাকে দেখা গেল, পূর্ণচন্দ্রের অশাসিত দৃষ্টি ততক্ষণ সেই পথেই রহিল। কেন ?—সেকথা আমরা জানি না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিকালে পূর্ণচন্দ্র, প্রিয়বন্ধু যতীশচন্দ্রের সহিত ডেপুটী বাবুর বাড়িতে চলিলেন। পথে উঠিয়াই পূর্ণচন্দ্র যতীশকে বলিলেন "বাবা পুনঃ পুনঃ বলছেন, আর ভদ্রলোককে কথা দিয়েছি, কাজেই যেতে হচ্ছে ; নয় তো আমার যেতে ইচ্ছা ছিল না" হাসিয়া যতীশচন্দ্র উত্তর করিলেন "এরপরে হয়তো উঠে আস্‌তেই ইচ্ছা হবে না !"

কথায় কথায় দুই বন্ধু ডেপুটী বাবুর ভবনে উপস্থিত হইলেন। পূর্ণচন্দ্রের শুভাগমনে ডেপুটী বাবুর জীবন প্রায় কৃত কৃতার্থ হইল। বাড়ী ঘর পূর্ব হইতেই সুসজ্জিত করা হইয়াছে। এখন পূর্ণচন্দ্রকে ও যতীশচন্দ্রকে (প্রথম শিষ্টালাপের পরে) কার্পেটের আসনে বসাইয়া রূপাব থালায় মূল্যবান ও রসনা তৃপ্তিকর খাদ্য সকল প্রদান করিলেন। তাঁহারা নিতান্ত অনিচ্ছুকভাবে, (কেবলই পুনঃ পুনঃ বিনীত অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য) সেই বহুতর উপাদেয় আহার্যের মধ্য হইতে যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলে ডেপুটী বাবু যারপর নাই অনুগৃহীত হইয়া পড়িলেন। পাখা টানিতে টানিতে অনন্তরাম বেহারাই মনে মনে বিরক্ত হইল।

এখন অন্তঃপুরে "কনে সাজানীরা" আসিয়া ডেপুটী বাবুর কন্যাকে বিধিমতে বেশভূষা করাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দত্তের বাড়ীর পুঁটী, মেয়ের মাথায় "প্রজাপতি" খোঁপা বাঁধিতে চাহিতেছেন, পশ্চিমের বাড়ীর ক্ষেমার মা "টেক্কা" খোঁপাই উপযুক্ত বলিতেছেন। কমলা পিসী, মেয়েকে বাণারসী শাড়ী পরাইতে আদেশ করিতেছেন ; বিনোদিনী তাহাতে বাধা দিয়া "ক্রেপের শাড়ী পরাইলে মেয়েকে খুব ভাল মানাইবে" একথা বিধিমত প্রমাণ করিতেছেন। এদিকে কন্যা দেখাইবার বড় বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া পূর্ণচন্দ্র মনে মনে বিশেষ বিরক্ত হইতে লাগিলেন ; ইঙ্গিতে বন্ধু শীঘ্র কন্যা দেখাইতে, কর্তৃপক্ষদিগকে এক একবার "তাগিদ" করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ডেপুটী বাবু যে মূর্ত্তি ধরিয়া এজলাসে মঞ্চের উপরে বিরাজ করেন, সে সাধারণের ভীতিপ্রদ হাকিমি উগ্রমূর্তি আর নাই, এখন "নিরীহ, শান্ত, অতি ভালমানুষ" রূপে ভাবী জামাতার সন্তোষ সাধনে নিয়োজিত আছেন।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পূর্বে "কনে দেখান" হইল।—অর্থাৎ বিবাহার্থিনী কন্যাকে জীবন্ত জড়পদার্থবৎ, স্বর্ণ রৌপ্যাদি জড়াইয়া ভাবী বরের চক্ষের সম্মুখে রাখা হইল। পূর্ণচন্দ্র নিস্তব্ধ ; গম্ভীরভাবে নিজের বি, এ, পাশ করা মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন, প্রতিনিধিরূপে (?) যতীশচন্দ্র, কন্যাকে তাহার নাম, তাহার পাঠ্যপুস্তকের নাম ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তখন ধীরে ধীরে সেই জড়বৎ পদার্থ হইতে শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল ; কম্পিত-হৃদয়া, স্বেদসিক্তা বালিকা কোনও রূপে সে প্রশ্নের উত্তর করিয়া দ্বিতীয় "যমদণ্ড" হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। পুনশ্চ ডেপুটী বাবুর নিকট হইতে উপযুক্ত আদর অভ্যর্থনা গ্রহণ করিয়া বন্ধু-যুগল বাড়ী ফিরিলেন।

পথে আসিতে আসিতে যতীশ, পূর্ণচন্দ্রের বর্তমান মনের ভাব জানিবার জন্য বিবিধ প্রশ্ন

করিলেন ; কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর পাইলেন না। কেননা তখন একটি মধুর কণ্ঠ নিঃসৃত মধুমাখা সঙ্গীত পূর্ণচন্দ্রের প্রাণের প্রাণে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, আর একখানি সুন্দর, কুসুম সুকুমার মুখের পবিত্র সৌন্দর্যালোক পূর্ণচন্দ্রের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইতেছিল ; সেখানে ডেপুটী বাবুর কন্যার স্থান হইল না। বলা বাহুল্য সে গান, সে মুখ, দরিদ্র বালিকা সেই প্রফুল্লের।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আষাঢ় মাস ; এই মাত্র মুষল ধারায় বৃষ্টি হইয়া জগৎকে যেন স্নান করাইয়া দিয়াছে। এখন আকাশ গাঢ় নীল, পৃথিবী গাঢ় সবুজ। এমন সময়ে বালিকা প্রফুল্ল, পূর্ণচন্দ্রদিগের বাটীতে প্রবেশ করিল। আজি দশ দিন হইল পূর্ণচন্দ্রের মা প্রফুল্লের মায়ের নিকট হইতে একখানি পশমের আসন, এবং একটি পশমের ফলফুলের সাজি কিনিয়া লইয়াছেন ; মূল্য কিছু দিয়াছেন ; কতক বাকি রহিয়াছে—ইহা বড় মানুষী রোগ, পল্লীগ্রামে যেখানে গরিব বিক্রেতা এবং বড়লোক ক্রেতা, সেখানে গরিবের ভাগ্যে প্রায়ই কিছু হাঁটাহাঁটি করিতে হয়।

আজি দেওয়ান বাড়ীতে বড় সমারোহ ; রামনগরের রাজকুমার ভূপতিনাথ রায়, অনাথ নিবাস স্থাপন করিতে গোবিন্দপুরে আসিয়াছেন, আজি তিনি দেওয়ান বাটীতে নিমন্ত্রিত।—কুমার, পূর্ণচন্দ্রের সমবয়স্ক। রাজার ছেলে হইলেও লেখাপড়ায় একান্ত অনুরাগী ; তাই এবারে এম্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। রাজা বাহাদুর পুত্রের বিবাহ দিতে অনেকবার ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু রাজকুমার স্বদেশ হিতৈষণার প্রবলতায় বিবাহ করিতে বিশেষ অনিচ্ছুক ; রাজা রাণী সেজন্য অতিশয় দুঃখিত হইলেও ভূপতিনাথের মত বিনয়ী, ভক্তিমান, চরিত্রবান সুসন্তানের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য করিতে তাঁহারা অশক্ত।

যাহা হউক, পূর্ণচন্দ্রের মা যখন পাচক ঠাকুরকে দিয়া পোলাও-এর চাউল প্রস্তুত করাইতেছিলেন, তখন তাঁহার পিছন দিক হইতে প্রফুল্ল মৃদুভাবে ডাকিল, "কাকী মা ! মা আপনার কাছে টাকা কয়টির জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।" গ্রাম সম্পর্কে পূর্ণচন্দ্রের মা'কে প্রফুল্লবালা "কাকী মা" বলিয়া ডাকে।

প্রফুল্লের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া গৃহিণী কিছু রুক্ষভাবে বলিলেন, "তোমাদের সময়ও নেই, অসময়ও নেই ; টাকা নিয়ে আমরা কি পালিয়ে যাচ্ছি বাছা !" প্রফুল্লের মুখ শুকাইয়া একবিন্দু হইয়া গেল, সে বাড়ীর দিকে যাইতে উদ্যত হইল। তখন গৃহিণী অপেক্ষাকৃত মিষ্টভাবে বলিলেন "তুমি ডাগর মেয়ে, পথ দিয়ে এসেছ কেন ; আমি ঝি'কে দিয়ে তোমার মা'কে টাকা পাঠিয়ে দিতুম।—তা দাঁড়াও, টাকা দিচ্ছি।" প্রফুল্ল আনতমুখে দাঁড়াইল।

প্রফুল্লবালার সরল সুন্দর মুখখানি দেখিলে মানুষের মন সহজে আকৃষ্ট হয়। তবে পূর্ণচন্দ্রের মাতার এরূপ বিরক্তিভাব প্রকাশ করিবার কারণ ছিল। কথা কি, সম্প্রতি পূর্ণচন্দ্র মাতার নিকটে অতি গোপনে বলিয়াছেন, যে তিনি দরিদ্র কন্যা প্রফুল্লবালাকে বিবাহ করিতে একান্ত ইচ্ছুক হইয়াছেন ; অন্য কোনও পাত্রী তাঁহার মনোনীতা নহে। মা'র কানে এরকম কথা বড় বিশ্রি, বড় অপ্রীতিকর বোধ হইল। কোথায় বড়লোকের কন্যা পুত্রবধূ আসিবে, সোনা, রূপা, হীরা, মুক্তার গহনায় ঘর ভরিবে, বেহাই বাড়ীর "তত্ত্বের" জিনিসে উঠান পুরিয়া যাইবে, দাস দাসীর কোলাহলে বাড়ী উৎসবময় হইবে, লোকে দেখিয়া "ছেলের বিবাহ সার্থক হইয়াছে" বলিবে ; তাহা না হইয়া কিনা অনাথা বিধবা কন্যা প্রফুল্লকে "বধূ" রূপে গ্রহণ করিতে হইবে, যাহারা সেলাই বেচিয়া খায়, তাহারা কিনা দেওয়ান মহাশয়ের আত্মীয়া

হইবে, ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা ঘৃণার কথা পূর্ণচন্দ্রের মা'র পক্ষে আর কি হইতে পারে ? বিশেষতঃ প্রফুল্লবালা ভাল গান করিতে পারে বলিয়া পাড়ার মেয়েদের কাছে তাহার বিলক্ষণ একটু "অখ্যাতি"ও হইয়াছে ; ঘোষের বাড়ীর অক্ষয়ের স্ত্রী প্রফুল্লকে "বাইজী" বলিয়া ঠাট্টা করে ; ভট্টাচায্যদিগের কুসুম "কানের মেয়ে" বলিয়া হাসে ।—সেই প্রফুল্ল রাজবাটীর দেওয়ানের পুত্রবধূ হইবে ! পোড়া কপাল ! তার চেয়ে ছেলের বিবাহ না হয়, সেও ভাল !

এই কারণে মাতা-পুত্রে মনান্তর হইয়াছে । আজি প্রফুল্লের মুখপানে চাহিয়া গৃহিণীর মনে হইল "পোড়া কপালীর মেয়ের এত রূপ, এই জন্যই তো বাছা আমার ভুলে গিয়েছে ! তা এ আপদটা এ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়াই ভাল" তাই রুক্ষভাবে প্রফুল্লের মনে বেদনা দিলেন ।

প্রফুল্ল খিড়কির পথে এ বাড়ী আসিয়াছিল, কিন্তু গৃহিণী তাহার টাকা গণিয়া দিয়া তাহাকে ফুলবাগানের পথে যাইতে আদেশ দিলেন । গৃহিণী জানিতেন এখনই পূর্ণচন্দ্র রাজকুমারের সহিত খিড়কির পুকুরে মাছের খেলা দেখিতে যাইবেন । তাই সে পথে যাইতে প্রফুল্লকে মানা করিলেন । সরলা বালিকা কিছুই, বুঝিল না । নতশিরে গৃহিণীর আজ্ঞা পালন করিল ।

কিন্তু এ জগতে অদৃষ্টলিপি পাঠ করিতে কাহার সাধ্য ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পথের পাশেই ফুলবাগান ; এজন্য লোকে বলে "ফুলবাগানের পথ ।" রাজকুমার ভূপতি বাহাদুর সেই ফুলবাগানে একাকী বসিয়া, প্রস্ফুট কুসুমের শোভা দেখিতেছিলেন ; বয়স্য পূর্ণচন্দ্র কার্যোপলক্ষে স্থানান্তরে ছিলেন । সহসা শত সহস্র গোলাপ ফুল নিষ্প্রভ করিয়া, জীবন্ত, পবিত্র, প্রফুল্ল কুসুম সেই পথ আলো করিল । দেখিয়া রাজকুমার মুগ্ধনেত্রে, অজ্ঞাতে, তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন । ভরসা করি ইহাতে কেহ রাজকুমারের অপরাধ ঠাওরাইবেন না । সুন্দর ফুলটি ফুটিলে কে না চাহিয়া দেখে ? সুন্দর চাঁদটি হাসিলে কাহার দেখিতে ইচ্ছা না হয় ? ভাল জিনিস কার না ভাল লাগে ?

প্রফুল্ল কোনও দিকে না চাহিয়া আনত মুখে চলিতেছিল ; সহসা দেখিল একজন বৃদ্ধ, অন্ধ, ভিখারী সেই পথে আসিতেছে, একজন বালক তাহার হাত ধরিয়া আনিতেছে । বৃদ্ধকে নিতান্ত কৃশ ও দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হইল ।

দেখিয়া বালিকার করুণ হৃদয় দ্রব হইল । বালিকা থমকিয়া দাঁড়াইল । জিজ্ঞাসায় জানিল বালকটি অন্ধের পুত্র ; আর তাহাদের এ জগতে আত্মীয় কেহ নাই । ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করে । সকল কথা বলিয়া অন্ধ বলিল, "মা, শুনেছি রাজা বাবুর ছেলে, দেওয়ান বাবুর বাড়ীতে এসেছেন ; কাঙ্গাল গরীবের উপর তাঁর নাকি বড় দয়া । আমার মা, দারুণ রোগ হয়েছে ; তাই রাজার ছেলের কাছে যাচ্ছি । আমা অভাবে আমার বাচ্ছাটিকে তিনি যদি এক মুঠো খেতে দেন !" অন্ধের কাতরোক্তি শুনিয়া প্রফুল্লের নীলোৎপল সদৃশ চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া গেল ; বালিকা ধীরে ধীরে বলিল "দেখ রাজকুমার হয়তো কোনও কাজে আছেন, তোমার সঙ্গে তাঁহার এখন দেখা হইবে কিনা কে বলিতে পারে ? তুমি আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে চল ; আমার মা দয়াময়ী, তিনি তোমাদিগকে চিরকালই প্রতিপালন করিবেন ।"

"আমার মা দয়াময়ী, তিনি চিরকালই প্রতিপালন করিবেন" একথা বৃদ্ধের কর্ণে দেবতার

আশীর্বাদের মত বোধ হইল ; এমন করুণা-মাখা কথা, এমন সরলতাপূর্ণ সহানুভূতি, তাহার কপালে কখনও জুটে নাই ! তাই বুড়ো কাঁদিয়া ফেলিল, তাই বুড়ো হাত তুলিয়া বলিয়া উঠিল "মা, তুমি রাজরাণী হও ; মা, তুমি কোন্ দেবতা, তা তুমিই জান ! ঠাকুর তোমাকে রাজ-রাজেশ্বরী করুন !"

আর একজন এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিতেছিলেন। সে রাজকুমার ভূপতিনাথ। প্রফুল্ল অপরিচিতা হইলেও হৃদয়ের পূর্ণোচ্ছ্বাস ভরে, তিনি ফুলবাগানের প্রান্ত ভাগে দাঁড়াইয়া, প্রফুল্লকে বিশেষ ধন্যবাদ দিলেন ; তারপরে অন্ধকে বলিলেন— "দেখ, এই গোবিন্দপুরে অনাথ নিবাস স্থাপিত হইয়াছে ; আজি হইতে তুমি ও তোমার পুত্র সেখানে থাকিবে ; তোমাদিগের যাবজ্জীবনের ভার আমার উপরই রহিল।"

প্রফুল্ল চমৎকৃতা হইল। পুলকে পূর্ণ হইয়া বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কে বাবা ?" ভূপতিনাথ নম্রমুখে উত্তর করিলেন "তুমি যাহাকে খুঁজিতেছিলে আমি সেই রাজা বাহাদুরের ছেলে।"

ভূপতি বাহাদুরকে দেখিয়া একজন অসাধারণ লোক বলিয়া প্রফুল্লের ধারণা হইয়াছিল। এখন পরিচয় পাইয়া তাহার হৃদয় রাজকুমারের মহত্বে মুগ্ধ হইল। সসঙ্কোচে, ভক্তিভাবে রাজকুমারকে এক প্রণাম করিল ; তারপরে বাড়ীর দিকে চলিল। অন্ধও রাজকুমারকে সহস্র আশীর্বাদ করিয়া তাহার আদেশে অনাথনিবাসের দিকে গেল।

সহসা পূর্ণচন্দ্র সেই উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। ভূপতিনাথ অনতিদূরগামিনী প্রফুল্লকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ও মেয়েটি কে, পূর্ণবাবু ?" দেখিয়া পূর্ণচন্দ্র অন্যমনস্কভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "একজন অনাথা বিধবার মেয়ে।" ভূপতি বাহাদুর আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন "এ গোবিন্দপুরের সবই সুন্দর ! এমন মেয়ে আমি বোধহয় এ জীবনে দেখি নাই !"

ইহা শুনিয়া পূর্ণচন্দ্র হর্ষোৎফুল্ল মুখে প্রফুল্লের সবিশেষ পরিচয় দিলেন। শুনিয়া ভূপতি সাগ্রহে বলিলেন "সেই যে—বাবা যার গানের সুখ্যাতি করেন, বাবা যাঁকে পঞ্চাশ টাকা প্রাইজ দিয়েছিলেন, সেই মেয়েটি, বটে ?" পূর্ণচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "সেই, রাজকুমার" ভূপতি অকপটে বলিলেন "বেশ বেশ। দেখ পূর্ণবাবু, মেয়েটি যাহাতে একটি সুপাত্রে অর্পিত হয়, আমি যথাসাধ্য সে বিষয়ে চেষ্টা করবো। তুমি ওঁর মাকে বলবে, অর্থাভাবে এমন মেয়ে যেন কোনও অপাত্রকে না দেন।"

শুনিয়া পূর্ণচন্দ্র পরম সুখী হইলেন। দারুণ ঝড় বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল দেখিয়া দুজনে বাড়ীতে চলিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রাবণ মাস। রাত্রি দ্বিপ্রহর ; টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে ; একে কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি ; তাহাতে মেঘের অন্ধকার—সে অন্ধকার, সে ভীষণ অন্ধকার অনুভব করা যায়, কিন্তু লিখিতে পারা যায় না। তাহার উপরে ডোবার জলে বেঙগুলা বিকট চীৎকার করিয়া ভীষণা যামিনীকে অধিকতর ভয়ঙ্করী করিয়া তুলিতেছে ! এমনি রাত্রে প্রফুল্লের মা তাঁহার রোগক্লিষ্টা সন্তানের সম্মুখে প্রদীপ জ্বালিয়া মুখের উপরে পড়িয়া ডাকিতেছেন "মা, প্রফুল্ল !" সেই দেওয়ান-বাড়ী হইতে আসিয়া অবধি প্রফুল্ল দারুণ জ্বরবিকারে অচেতন। আজি বাইশ দিন, মা যথাসর্বস্ব পণ করিয়া তাঁহার সর্বস্ব ধন স্নেহের প্রতিমাকে চিকিৎসা করাইতেছেন।

মা'র ডাক শুনিয়া প্রফুল্ল ধীরে ধীরে উত্তর দিল "মা !" আজি দশ দিন পরে প্রফুল্ল কথা কহিল। আর যে প্রফুল্ল কথা কহিবে মা'র সে আশা বড় ছিল না।

তখন মা' আনন্দাশ্রু মুছিয়া, ভগবানের চরণে প্রণাম করিয়া প্রফুল্লকে বলিলেন "একবার ওষুধটা খাও দেখি, মা !"

মা মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিলেন, প্রফুল্ল ঔষধ খাইল। মা' স্নেহের হস্ত মেয়ের গায়ে বুলাইতে লাগিলেন।

সহসা প্রফুল্ল নিজের মাথায় হাত দিয়া চমকিয়া উঠিল। মা'র মুখ পানে চাহিয়া বলিল "আমার চুল কি হ'ল মা ?" স্নেহার্দ্র-স্বরে বলিলেন "তোমার চুল ডাক্তারে কেটে ফেলেছে ; তার জন্য দুঃখ কি মা ? —যদি ভগবান্ তোমায় বাঁচিয়ে দেন, তাহলে আবার চুল পাওয়া যাবে।"

প্রফুল্ল কাঁদিতে লাগিল। চুলের শোকে কোন্ বালিকা বা মহিলা কাতর না হইয়া পারেন ?

তখন মা প্রফুল্লকে বিবিধ আদর ও সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে ডাক্তার আসিলেন ; কিন্তু আজি ডাক্তার একা আইসেন নাই। তাঁহার সহিত দেওয়ান বাবুর পুত্র পূর্ণচন্দ্রকেও দেখিয়া প্রফুল্লের মা মনে করিলেন "পূর্ণচন্দ্র প্রতিবাসী, অনুগ্রহ করিয়া প্রফুল্লকে দেখিতে আসিয়াছেন। প্রফুল্লের মা কৃতজ্ঞ চিত্তে যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন।

ডাক্তারবাবু রোগীকে পরীক্ষা করিয়া অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিলেন। মা' কৃতকৃতার্থা হইলেন।

পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, সে প্রফুল্ল আর নাই! আর সে নবনীরদ-বিনিন্দিত ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশরাশিও নাই, আর সে চম্পককুসুমবৎ "দুধে-আল্‌তায়" বর্ণও নাই, আর সে মনোমোহন রূপরাশিও নাই! নিষ্ঠুর রোগ যেন প্রফুল্লের সারাংশ গ্রহণ করিয়া, তাহার সোনার সৌন্দর্য পদ-দলিত করিয়া, ঘৃণা পূর্বক ফেলিয়া যাইতেছে! ডাক্তার বাবু যতক্ষণ ছিলেন, ততক্ষণ পূর্ণচন্দ্র তাহাই দেখিতে লাগিলেন। অবশ্য সেখানে অন্য কেহই কিছু বুঝিতে পারিল না।

বাড়ী আসিয়া পূর্ণচন্দ্র নিভৃতে তাঁহার মা'র কাছে বলিলেন "বাবার কাছে কিছু না বলিয়া মা, ভালই করিয়াছ, আমি সে মেয়ে বিবাহ করিতে চাহি না।" দেওয়ান-গৃহিণী আজিকার ঘটনা, পূর্ণচন্দ্রে আকস্মিক অনিচ্ছার কারণ, না জানিলেও আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন ; বলিলেন "আমি তো তখনি তোমায় বলেছি! ছি! ছি! ছোটলোক, সেলাই বেচে খায় ; তোমার শত্রু গিয়ে ও মেয়ে বে করুক! ভাগ্যে আমি কর্ত্তার কাছে বলিনি!"

ইহার পরে মাতা, পুত্রের নিকটে নিজের বুদ্ধিমত্তার এবং পরিণামদর্শিতার বিশেষ সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দিনে দিনে প্রফুল্ল আরোগ্য লাভ করিল। মা' যেন তাঁহার হারাধনকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু সে সুখ অনুভব করিতে না করিতে একটা দারুণ বিপদ ঘটিল।

রাজকুমার ভূপতিনাথ নিজ অঙ্গীকার রক্ষা করিতে অর্থাৎ প্রফুল্লের জন্য সুপাত্র খুঁজিতে বিশেষ চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু যে সকল পাত্রের অভিভাবকগণ গোবিন্দপুরে মেয়ে দেখিতে

আসিল, তাহারা কেহই নেড়া-মাথা, কৃশাঙ্গী প্রফুল্লকে পছন্দ করিল না ; সুতরাং প্রফুল্লের শীঘ্র ভাল বর জুটিবার কোনও সম্ভাবনা রহিল না। প্রফুল্লের অভাগিনী মা অকূল ভাবনাসাগরে পড়িলেন।

যে চিকিৎসক প্রফুল্লকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তিনি এই মায়ে ঝিয়ের সদগুণে ইঁহাদিগকে একান্ত ভক্তি ও স্নেহ করেন। একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া প্রফুল্লের মা বলিলেন "মেয়ের চুল না ফেলিয়া দিলে, মেয়ের প্রাণ পাওয়া যাইত না, এখন নেড়া-মাথা দেখিয়া বরপক্ষীয়েরা মনোনীত করে না। হিন্দু ঘরের মেয়ে বেশী দিন রাখিবার যো নাই ; এখন বাবা উপায় কি ?"

এ রকম বিপদ সাধারণের নিকটে বিশেষ উল্লেখযোগ্য না হইলেও প্রফুল্লের মা'র পক্ষে যে বড় ভয়ানক বিপদ, এ কথা বিচক্ষণ ডাক্তারবাবু বুঝিলেন। বুঝিয়া কিছুক্ষণ ভাবিলেন ; সহসা চিকিৎসকের চক্ষু উজ্জ্বল হইল, মুখকান্তি প্রদীপ্ত হইল ; তিনি বলিতে লাগিলেন "মা ! একটা কথা মনে পড়েছে অল্পদিন হইল "কুন্তলীন" বলিয়া একটি সুগন্ধি তৈল উঠিয়াছে। এ তৈলের উপকারিতা বিষয়ে এ দেশের অনেক সম্ভ্রান্ত ও খ্যাতনামা ব্যক্তি, সকলেই সন্তোষজনক মত প্রকাশ করিয়াছেন,—এই তৈলকে ইঁহারা সকলেই বিশুদ্ধ সুগন্ধ এবং কেশপোষক বলিয়াছেন। আমারও দুই একজন আত্মীয়াকে এই তৈল ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি ; এই তৈল মাখিলে চুল উঠিয়া যাইতে লাগিলে তাহা নিবারণ হয় ; শীঘ্র নূতন চুল জন্মে এবং চুল প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। আমি আগামী কল্য বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ কলিকাতায় যাইব ; যদি আপনার অভিমত হয়, তবে প্রফুল্লের জন্য এক বোতল কুন্তলীন তৈল পাঠাইয়া দিব। ব্যবহার করিয়া দেখিতে পারেন।"

ডাক্তারবাবুর কথা শুনিয়া প্রফুল্লের মা' পুলকিতা হইযা বলিলেন "বাবা ! আপনার কল্যাণেই বুঝি আমি রক্ষা পাইব। যদি এই রকম তৈল থাকে, তাহা হইলেই আমাব সকল বিপদ কাটিবে ! আপনি কলিকাতায় পৌঁছিয়াই এক বোতল কুন্তলীন ডাকে পাঠাইবেন।"

কুন্তলীন তৈল পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ডাক্তারবাবুর কথা সত্য হইল ; কুন্তলীন তৈল যথানিয়মে ব্যবহার করিতে করিতে, অল্পদিনের মধ্যে প্রফুল্লের মাথা ঘন কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশরাশিতে পূরিয়া গেল। পাঁচ ছয় মাসেব মধ্যে প্রফুল্লের কেশরাশি পূর্ব হইতে দ্বিগুণিত হইল। বর্ষার ঘন মেঘস্তর কাটিলে, শরতে চন্দ্রমার জ্যোতিঃ যেমন দ্বিগুণ পরিস্ফুট হয়, দারুণ রোগ হইতে অব্যাহতি পাইয়া প্রফুল্লের ভুবনমোহন সৌন্দর্য-তরঙ্গও সেইরূপ দ্বিগুণ বেগে উথলিয়া উঠিতে লাগিল।

সহসা একদিন প্রফুল্লের মা সংবাদ পাইলেন, রামনগরাধিপতি রাজা বাহাদুর প্রফুল্লকে দেখিতে আসিতেছেন ; কেন তাহা সে লোক বলিতে পারিল না। শুনিয়া প্রফুল্লের মা বিস্মিতা হইলেন, তদধিক ব্যতিব্যস্তা হইয়া পড়িলেন। এ "কুটীরের" কোনখানে রাজা বাহাদুরকে বসিতে দিবেন ? এই ক্ষুদ্রতম শক্তিতেই বা তাঁহাকে কি করিয়া অভ্যর্থনা করিবেন ? যাহা হউক মায়ে ঝিয়ে যথাশক্তি ক্ষুদ্র গৃহ সুসজ্জিত করিলেন ; ঘরের মেজে প্রফুল্লের কৃত সুন্দর গালিচা দ্বারা মুড়িয়া দিলেন ; প্রফুল্লের কৃত উলের লিচু গাছ, গোলাপ গাছ, ফুলের ঝাড় প্রভৃতি দিয়া ঘরখানি মনের মত করিয়া সাজাইলেন। প্রফুল্লের মা'র কৃত উলের অতি সুন্দর মোড়াটিও অনাবৃত দেহে রাজাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

যথাসময়ে রাজা বাহাদুর উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে লোকজন অধিক নহে ; কেবল তাঁহার দেওয়ান নবীনচন্দ্র মিত্র আর ঈশান চাকর মাত্র। প্রফুল্ল সসম্ভ্রমে রাজাকে এবং দেওয়ানকে প্রণাম করিয়া অবনত-মস্তকে দাঁড়াইল ; প্রফুল্লের মা হিন্দু মহিলা, তাই রাজার সম্মুখীনা হইতে পারিলেন না।

দরিদ্রের গৃহ হইলেও সে গৃহের পরিচ্ছন্নতা, পারিপাট্য এবং সুরুচিযুক্ত সুসজ্জা দেখিয়া রাজা মহোদয় মোহিত হইলেন ; আর দরিদ্র বালিকা হইলেও প্রফুল্লের—নবনীরোদতুল্য-নিবিড় কেশকলাপশোভিতা প্রফুল্লের অতুলনীয় পবিত্র রূপরাশি দেখিয়া রাজা আরও মোহিত হইলেন। বালিকার সহিত দুই একটি কথা বলিয়া তাহার মা'কে নিকটে অথচ অন্তরালে দাঁড়াইতে অনুরোধ করিলেন।

তাহাই হইল। তখন রাজা সেই দরজার অন্তরাল-বাসিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "রূপে গুণে আপনার কন্যা রাজলক্ষ্মীসদৃশী ; রাজসিংহাসনই আপনার কন্যার উপযুক্ত স্থান। অতএব আপনার যদি অভিমত হয়, তাহা হইলে আমার পুত্র কুমার ভূপতিনাথের সহিত আপনার কন্যার শুভ বিবাহ দিন।"

অবাক্!—দেওয়ান অবাক্। চাকর অবাক্! প্রফুল্লের মা অবাক্! লজ্জানম্রমুখী প্রফুল্ল অবাক! কিন্তু প্রফুল্লের মা'র আত্মসম্ভ্রম-জ্ঞান যথেষ্ট। রাজার ঘরে মেয়ের বিবাহ দেওয়া, বিশেষতঃ ভূপতির মত রূপবান, গুণবান, চরিত্রবান, ধার্মিকপুরুষ-রত্নের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া, অনাথা দুঃখিনী মা'র যে অপরিসীম সৌভাগ্য একথা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াও প্রফুল্লের মা নিজের অবস্থা স্মরণ করিলেন। প্রফুল্ল রাজবধূ হইয়াও যদি শ্বশুর-বাড়ীতে "দরিদ্রের কন্যা" বলিয়া অনাদৃতা কি উপেক্ষিতা হয়, তবে তাহা হইতে কোন দরিদ্র সুপাত্রে কন্যাদান করা মাতার অধিকতর প্রার্থনীয়। প্রফুল্লের মা অন্তরাল হইতে রাজাকে সকল কথা জানাইলেন ; তারপরে বলিলেন "আমি অতি ক্ষুদ্রতম ব্যক্তি ; যদি রাজা বাহাদুর দয়া করিয়া কোনও দরিদ্রের গৃহ হইতে প্রফুল্লের জন্য একটি সুপাত্র দেখিয়া দেন, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইতে পারি। ইহার অধিক আশা আমার অকর্তব্য।"

শুনিয়া রাজা অধিকতর সন্তুষ্ট হইলেন। প্রফুল্লের মাতার বুদ্ধিমত্তা ও আত্মশাসনের সহস্র সুখ্যাতি করিলেন। তার পরে বলিলেন, "আপনি সেজন্য ভাবিবেন না ; ইহাই যদি আপনার একমাত্র আপত্তি হয়, তবে আপনি অসঙ্কোচে সম্মতি দান করুন। আমার ভূপতির মনের ভাব জানিয়াই, আমি এ সম্বন্ধ করিতেছি। আপনি জানেন, আমরা হিন্দু ; আমাদের শাস্ত্রে বলে "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি", প্রফুল্ল তো পরম সদ্বংশজাতা। রামনগরের রাজবাড়ীতে রাজলক্ষ্মীর মত সমাদৃতা, রাজলক্ষ্মীর মত পূজিতা হইবেন। প্রফুল্লের মত কন্যা যাঁহার পুত্রবধূ, আমার বিশ্বাস জগতে তিনিই প্রকৃত ভাগ্যবান।"

সে অমৃতময় বাক্যাবলী শুনিয়া প্রফুল্লের মা'র হৃদয় যুগপৎ আনন্দ, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল। সেই দিনই প্রফুল্লের শুভ সম্বন্ধ, কুমার ভূপতিনাথের সহিত পাকাপাকি হইয়া গেল।

উপসংহার।

মহা সমারোহে ভূপতি ও প্রফুল্লের শুভ বিবাহ হইল। কন্যা-পক্ষের সমস্ত খরচই রাজা দিলেন। এ বিবাহে সকলে যে সুখী হইল, তাহা নহে। গ্রামের অনেকেই, অনাথা বালিকা ভবিষ্যৎ রাজরাণী হওয়াতে দারুণ দুঃখিত হইল। অনেকে এই ঘটনার বড় নীতিবিরুদ্ধ

সমালোচনাও করিল। কিন্তু সকলেই প্রফুল্লের উপরে বড় স্নেহ, মমতা, বড় আদর, যত্ন দেখাইল ! যে "বাইজী" বলিয়া হাসিত, যে দেবতার চবণে "এ বিবাহ না হউক" বলিয়াছিল, তাহারা সকলেই আজি প্রফুল্লের মা'র বড় "আপনার জন" হইয়া পড়িল।

রামনগরের রাজরাণী পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া এত আনন্দিত হইলেন যে, "রিদ্র বালিকা" বলিয়া প্রফুল্লের জন্য তাঁহার এক বিন্দু ক্ষোভও হইল না। বিবাহেরই সময়ে রাজা প্রফুল্লের নাম "রাজলক্ষ্মী" রাখিলেন।

অল্প দিনের মধ্যে রামনগরের রাজপরিবারের সকলেই প্রফুল্লের গুণে একান্ত বশীভূত হইল। সে রাজলক্ষ্মী সকলেরই হৃদয়ে আধিপত্য করিতে সক্ষমা হইলেন। একদিন ভূপতি বাহাদুর বয়স্য পূর্ণচন্দ্রকে অতি গোপনে বলিলেন "আমার জীবনে দুইটি সৌভাগ্য। প্রথম সৌভাগ্য, আমি এমন মাতা পিতার পুত্র হইয়াছি ; দ্বিতীয় সৌভাগ্য, প্রফুল্লকে সহধর্মিণীরূপে পাইয়াছি। ভগবানের কৃপায় আমি যদি মাতা-পিতার উপযুক্ত সন্তান, আর প্রফুল্লের উপযুক্ত স্বামী হইতে পারি, তাহা হইলেই আমার জীবন সার্থক হইবে।"

শ্রীমানকুমারী বসু
সাগরদাঁড়ি, যশোহর

একতাড়া চিঠি

আমি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন পুরাতন সহরেব একজন চিকিৎসা ব্যবসায়ী। আমাব নাম অ—। স্থানীয় অনেকগুলি ভদ্র অধিবাসীব সহিত আমার বেশ সৌহৃদ্য আছে। প্রতিদিন প্রভাতে আমার গৃহ বহু সংখ্যক রুগ্ন ব্যক্তিতে পূর্ণ থাকে। একদিন আমার নিম্নে আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে, এমন সময় বেহারা দ্রুতপদে উপরে আসিয়া বলিল "একটি ভদ্রলোক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আপনার বিলম্ব হইলে তাঁহার নাকি প্রাণনাশের সম্ভাবনা।" বেহারার মুখে এই কথা অবগত হইয়া আমি যথাসম্ভব শীঘ্র সাজগোজ করিয়া আমার আফিস ঘরে তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। বেহারা ভদ্রলোকটিকে লইয়া সেস্থানে উপস্থিত হইল। আমি দেখিলাম, আগন্তুক আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কখন তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। তাঁহার মুখখানি অতিশয় মলিন—সেই মলিন মুখে কঠিন ব্যাধিক্লিষ্ট দেহমনের সমুদায় চিহ্নই প্রকাশিত। দক্ষিণ হস্তে একটি ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, এবং তাহা ফিতার সাহায্যে গলদেশে লম্বিত। তাঁহাব সাজগোজ আচার ব্যবহার বেশ ভদ্রলোকের মত। আগন্তুক বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার বেদনা-ব্যঞ্জক ঘন দীর্ঘশ্বাস ঢাকিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া শেষে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি ডাত্‌কার অ— ?"

"আজ্ঞে আমারই নাম অ—। আপনার কি প্রয়োজন ?"

"মহাশয় সপ্তাহাধিক কাল হইতে আমি একটী অতি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছি। আমার দক্ষিণ হস্তের এক স্থানে ভয়ানক বেদনা অনুভব করিতেছি। এই বেদনা সময় সময় এতদূর বর্দ্ধিত হয় যে, আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবলই বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে থাকি। প্রথম প্রথম যন্ত্রণার আধিক্য তেমন অনুভব করি নাই, কিন্তু যতই দিন যাইতেছে ততই যেন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। আমার সজীব হস্তখানি সবলে টানিয়া লইয়া কে যেন জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে দগ্ধ করিতেছে। মহাশয়, আর ত সহ্য হয় না। আপনি এ

যম-যন্ত্রণা হইতে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে নিষ্কৃতি দান করুন।"

আগন্তুকের কথাবার্তা শ্রবণ করিয়া আমার প্রাণে যথেষ্ট কষ্ট হইল। তাঁহার ক্ষীণ কম্পিত পদযুগল অধিকক্ষণ দেহের ভারবহনে অসমর্থ দেখিয়া তাঁহাকে চেয়ারে উপবেশন করিতে বলিলাম এবং তাঁহার হস্তে ব্যাণ্ডেজটি উন্মুক্ত করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহাতে তাঁহার যাতনা অতিশয় বৰ্দ্ধিত হইল ; দুই চক্ষু দিয়া দর দর ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। আমি যথাসম্ভব সাবধানে ব্যাণ্ডেজটি উন্মুক্ত করিলাম, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, হস্তের ব্যাধির কোন লক্ষণই দেখিতে পাইলাম না। কোন স্থানে স্ফোটক অথবা অন্য কিছুই নাই। যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, শিরা উপশিরার মধ্য দিয়া রক্ত বেশ স্বাভাবিকভাবেই প্রবাহিত হইতেছে। তখন আমি নিতান্ত বিস্ময়ের সহিত তাঁহাকে বলিলাম, "কই আপনার হস্তে কিছুই ত হয় নাই ! আমি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলাম, কোন প্রকার ব্যাধি হইলে অবশ্যই বুঝিতে পারিতাম ; তবে আপনি কি জন্য এত যন্ত্রণা অনুভব করিতেছেন ?"

"মহাশয় ব্যাধির কোন বহির্লক্ষণ আমিও দেখিতে পাই না। কিন্তু আমার কি যে অন্তর্দা- হইতেছে, তাহা একমাত্র বিধাতাই জানেন। এ অবস্থায় আত্মহত্যা কবাও আমার প-ক্ষ অসম্ভব নহে। মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া আমার হস্তের ঐ স্থানটি চিরিয়া দিন—দিয়া আমা- প্রাণ রক্ষা করুন।"

"সেকি মহাশয়, কোন স্থানটি চিরিব ?"

"ঐ যে হস্তের পশ্চাদ্ভাগে একটি গোলাকার লাল চিহ্ন দেখিতে পাইতেছেন না কি ? ঐ স্থানটি চিরিয়া দিন। ঐ স্থান হইতে আমার সমুদায় যন্ত্রণা উত্থিত হইতেছে। মহাশয়, আব বিলম্ব করিবেন না ; বিলম্বে আমি প্রাণে মরিব !"

তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া আমার মনে বিষম সমস্যার উদয় হইল। ভাবিলাম, এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই উন্মাদ। নচেৎ সুস্থ অঙ্গ চিরিবার জন্য এত আগ্রহ করিবে কেন ? এখন কি করিয়া ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই ? যাহা হউক কিছুক্ষণ চিন্তার পর অপেক্ষাকৃত গম্ভীর স্বরে বলিলাম "না আমি সুস্থ অঙ্গ কোন মতেই চিরিতে পারিব না। বরং কোন প্রলেপের ব্যবস্থা করিতেছি, ইচ্ছা হয়, তাহা ব্যবহার করিবেন। ইহা ভিন্ন আমি আর কিছুই করিতে পারিব না।"

আমার রুক্ষ্ম কথাগুলি শুনিয়া রোগী একেবারে বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল ; এবং করযোড়ে অতি কাতরকণ্ঠে বলিল, "মহাশয় আমাকে পাগল ভাবিবেন না ; অথবা বিদ্রূপ করিবার জন্যেও আমি আপনার এখানে আসি নাই। কোনপ্রকার প্রলেপে আমার কিছুই উপকার হইবে না। আমি আপনাকে সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দিব, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই যাতনা হইতে উদ্ধার করুন।"

আমি অধিকতর রুক্ষ্মভাবে বলিলাম, "সহস্র মুদ্রা কেন, পৃথিবীর সমুদায় সম্পত্তি পাইলেও আমি এই অন্যায় কার্যটি করিতে পারিব না।"

"কেন, তাহাতে আপনার ক্ষতি কি ?"

"ক্ষতি যথেষ্ট আছে। লোকে আমায় বলিবে কি ? যাক, আপনি ওসব পাগলামি পরিত্যাগ করুন। আমি একটি ঔষধ দিতেছি, পান করিতে থাকুন। আর 'কুন্তলীন' অথবা অন্য কোন মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকর তৈল রীতিমত ব্যবহার করুন। এরূপ করিলে অচিরেই আপনি আরোগ্য লাভ করিবেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র জানিনা কেন, অলক্ষিত ভাবে দুই চারি বিন্দু অশ্রু রোগীর কপোলদেশ দিয়া ঝরিয়া পড়িল ; এবং এক অতি ভীষণ যন্ত্রণা-স্রোত যেন তাড়িত বেগে

তাঁহার আপাদ মস্তক আলোড়িত করিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন।

"ভাল মহাশয়, আপনি যদি অস্ত্রচিকিৎসা করিতে একান্তই অসম্মত হন, করিয়া কাজ নাই, আমি নিজে যাহা পারি করিতেছি। আপনার নিকট শেষ অনুরোধ এই, অস্ত্রচিকিৎসার পর অনুগ্রহ করিয়া ব্যাণ্ডেজটি বাঁধিয়া দিবেন।" এই বলিয়া তিনি আপনার পকেট হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিলেন; এবং তাঁহার কল্পিত লাল চিহ্নটির মধ্যস্থানে একেবারে প্রবেশ করিয়ে দিলেন।

এই ব্যাপার দেখিয়া আমি যার পর নাই বিস্মিত হইলাম, এবং পাছে হস্তের কোন আবশ্যকীয় শিরা-উপশিরা নষ্ট হয়, এই ভয়ে তাঁহার হস্ত হইতে ছুরিকা লইয়া আমি ভালরূপে চিরিয়া দিতে চাহিলাম। তিনি আনন্দের সহিত আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং বলিলেন, "আপনি চিরিয়া দিন, আমি দেখি। রক্ত দেখিলেই আমার সকল যন্ত্রণার হ্রাস হইবে।"

বাস্তবিক তিনি মুখে যাহা বলিলেন কাজেও তাহাই হইল। আমি তাঁহার কল্পিত ব্যাধিগ্রস্ত স্থানটি যতই চিরিতে লাগিলাম ততই তাঁহার যন্ত্রণা ক্রমশঃ বিদূরিত হইতে লাগিল। তাঁহার অশ্রুসিক্ত চক্ষু দুটিতে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সমুদায় মুখখানি বেশ প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিল। এমন কি বোধ হইতে লাগিল রোগী যেন নূতন জীবন পাইলেন। অস্ত্রচিকিৎসা শেষ হইলে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "মহাশয় আপনাকে শত ধন্যবাদ। আমি চিরদিন আপনার কেনা হইয়া রহিলাম। আমার সকল যন্ত্রণা দূর হইল। বহুদিন আমি এমন আনন্দ উপভোগ করি নাই। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ক্ষণকাল পরে ব্যাণ্ডেজটি বাঁধিয়া দিবেন ; এখন কিছুক্ষণ রক্ত ঝরিয়া যাক।"

আমি তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া ত্বরায় ক্ষতস্থানে ঔষধ দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলাম। তিনি আনন্দের সহিত আমাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে গৃহে প্রস্থান করিলেন। আমিও এই অভিনব রোগীর অভিনব ব্যাধির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অন্যত্র চলিয়া গেলাম।

২

প্রায় তিন সপ্তাহ কাল পরে একদিন প্রাতঃকালে আবার বেহারা আসিয়া আমাকে এই বিশেষ ব্যক্তির আগমন সংবাদ দিল। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম, তিনি কম্পিত কলেবরে আমার অভ্যর্থনার অপেক্ষা না করিয়াই আমার আফিস গৃহের চেয়ারে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখখানি পূর্বের ন্যায় বিশুষ্ক, কপোলদ্বয় তেমনই বিবর্ণ, চক্ষুদুটি তেমনই প্রভাহীন। পুনরায় তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আবার আপনার কি হইল ? এত দুর্বল হইয়া পড়িলেন কেন ? আবার কি আপনি কোন যন্ত্রণা অনুভব করিতেছেন ?"

"মহাশয় ও কথা আর জিজ্ঞাসা করেন কেন ? মৃত্যু ভিন্ন আমার এ যন্ত্রণা কিছুতেই উপশম হইবে না। আবার এই কয়েক দিন হইতে আমার অবস্থা ঠিক পূর্বের ন্যায় হইয়াছে। আবার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম আপনাকে আর কষ্ট দিব না ; যে কয়েক দিন বাঁচিয়া থাকি নীরবে সকল যন্ত্রণা সহ্য করিব। কিন্তু কিছুতেই তাহা পারিলাম না। সজীব দেহ হইতে মাংস ছিন্ন করিয়া লইলেও বুঝি এমন যন্ত্রণা হয় না। হা ভগবান, আমার অদৃষ্টে আরও কত আছে।"

"তাইত, আবার এরূপ হইল কেন ?"

"মহাশয়, কারণ অনুসন্ধান করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না। আমার যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আপনি নিকটে না থাকিলে এই দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া, আমার সকল যাতনা উপশম করিতাম। এখন অনুগ্রহ করিয়া আমার সেই স্থানটি বেশ গভীররূপে চিরিয়া দিন। কারণ তাহা ভিন্ন আর আমার শান্তি নাই। পূর্ব্বে গভীররূপে চিরিয়া দিলে, বোধ করি দ্বিতীয়বার আমাকে এ মর্মান্তিক যন্ত্রণাভোগ করিতে হইত না।"

এবারে আর আমি দ্বিরুক্তি করিলাম না। অস্ত্র লইয়া তাঁহার ইচ্ছামত চারিদিক বেশ ভাল করিয়া চিরিয়া দিলাম। দর দর ধারে রক্ত ঝরিতে লাগিল ; তিনি ঔৎসুক্যের সহিত তাহা দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার আকৃতিতে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাঁহার মুখের মলিনতা দূর হইয়া স্বাভাবিক প্রফুল্লতা আগমন করিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শরীরও বেশ সবল হইয়া উঠিল। কিন্তু এবারে তিনি বিশেষ কোন আনন্দ প্রকাশ করিলেন না ; অপেক্ষাকৃত গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আপনার অনুগ্রহে আবার আমি মৃত্যুযন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইলাম। এখন আর আমার কোন কষ্ট নাই। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন। আবার যদি দুর্ভাগ্যক্রমে আপনার সাহায্যপ্রার্থী হইতে হয়, আশা করি আপনি বিরক্ত হইবেন না।"

আমি ব্যান্ডেজটি বাঁধিয়া দিয়া বলিলাম, "না মহাশয়, অমন কথা ভাবিবেন না। এবারে আপনি নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবেন।"

রোগী ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

৩

এই ঘটনার পর কয়েক সপ্তাহ চলিয়া গেল, আমি রোগীর কোন সংবাদই পাইলাম না। অবশেষে প্রায় দুই মাস পরে আমি তাঁহার নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলাম। পত্রখানি তাঁহারই নিজের হাতের লেখা। যখন পত্র লিখিতে সক্ষম হইয়াছেন, তখন অবশ্যই তাঁহার হস্তে কোন যাতনা নাই, এই চিন্তা করিয়া আমার মনেও বেশ আনন্দ হইল। পাঠকদিগের অবগতির জন্য পত্রখানি এখানে প্রকাশ করিলাম।

"প্রিয় ডাক্তারবাবু,

"আবার গত সপ্তাহ হইতে আমার হস্তের সেই ভীষণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এবারে আর আপনাকে বিরক্ত করিব না। আমি কার্বলিক এসিড সংযোগে সেই স্থানটি বিশেষভাবে দগ্ধ করিয়া দিয়া আপনাকে আমার হতভাগ্য জীবনের বিষাদময়ী কাহিনী লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। এসিডের যন্ত্রণায় ব্যাধির যন্ত্রণা কতকটা প্রশমিত হইয়াছে বলিয়াই আপনাকে পত্র লিখিতে পারিতেছি।

"আমার ব্যাধির কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হন নাই বলিয়াই, আমি আপনাকে কিম্বা চিকিৎসা বিজ্ঞানকে দোষ দিই না। কারণ তাহা আমি ভিন্ন পৃথিবীর আর কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই। আপনার অবগতির জন্য প্রকৃত কারণ নিম্নে লিখিলাম।

"প্রায় দুই বৎসর পূর্বে আমার প্রতিবেশী এবং বন্ধু কোন জমিদারের একটি পালিত কন্যার সহিত আমার বিবাহ হয়। বন্ধুর নিজের কোন সন্তান সন্ততি না থাকায় এই পালিত কন্যাটিকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া তাঁহার লেখাপড়ার বেশ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না বলিয়া উপযুক্ত

বয়সে আমার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। আমার পিতা মৃত্যুকালে যথেষ্ট ধনসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং আমাদের সুখের দিনগুলি বেশ নির্ভাবনায় কাটিয়া যাইতে লাগিল। আমার স্ত্রীও আমাকে সমুদায় হৃদয় মনের সহিত ভালবাসিতে লাগিলেন। একদণ্ড আমার কাছছাড়া হইলে তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিতেন। কার্যোপলক্ষে আমাকে, এমন কি একটি দিনের জন্যেও, কোন স্থানে যাইতে হইলে, তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবলই আমার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতেন। যে জমিদার বন্ধুটি তাঁহাকে আপনার কন্যার ন্যায় পালন করিয়াছিলেন, আমাকে ছাড়িয়া তাঁহার বাটীতে যাইতেও তাঁহার ইচ্ছা হইত না। যদিই বা কখন যাইতেন, দুই তিন ঘণ্টার বেশী থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার এক প্রকার ভাবগতিক দেখিয়া আমি যারপরনাই বিমোহিত হইয়া যাইতাম। সমুদায় হৃদয় দিয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়াও তবু যেন তাঁহার প্রগাঢ় ভালবাসার উপযুক্ত প্রতিদান দিতে পারিলাম না। ভাবিয়া অনেক সময় লজ্জিত হইতাম। তাঁহার সেই স্বচ্ছ প্রেমপূর্ণ স্নেহপূর্ণ দুইটি চক্ষের দিকে চাহিয়া চাহিয়া এমনি বিভোর হইয়া পড়িতাম যে, তখন নিজের অস্তিত্ব আমার মনে থাকিত না ; জগতের অস্তিত্বও আমি ভুলিয়া যাইতাম। এ বিশ্বসংসারে সেই পবিত্র সুন্দর মুখখানি দেখিবার জন্যই যেন আমি সৃষ্ট হইয়াছি। মুখখানি যতই দেখিতাম, দেখিবার সাধ ততই বাড়িয়া যাইত। আর ততই আগ্রহের সহিত অনন্যমনে তাঁহার দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিতাম। আমার স্ত্রী কেবলই যে সুরূপা ছিলেন তাহা নহে, কারণ শুধু রূপের চমকে আমাকে এরূপ বিভোর করিতে পারিতেন না ; কিন্তু রূপ অপেক্ষা তাঁহার গুণের ভাগই অধিক ছিল। তাঁহার অপেক্ষা সুন্দরী অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহার মত গুণবতী ভার্যা একটিও দেখি নাই। কুটিলতা কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার পবিত্র হৃদয়খানি সর্বদাই যেন তাঁহার স্বচ্ছ চক্ষু দুটিতে ফুটিয়া থাকিত। তিনি অল্প দিনের মধ্যে গৃহের দাসদাসী আত্মীয়স্বজন সকলেরই আরাধ্যা দেবীস্বরূপা হইয়া উঠিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহাকে একান্ত মনে ভক্তি করিত। অধিক আর কি লিখিব, কি রূপে, কি গুণে সকল বিষয়েই তিনি আমাদের পরিবারের সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সকলেব অপেক্ষা উন্নত ছিলেন। কিন্তু তবুও যেন কত সঙ্কুচিত ভাবে, কত ত্রস্ত ভাবে সর্বদা গতিবিধি করিতেন, পাছে তাঁহার কোন ব্যবহারে কেহ দুঃখ পায়। এইরূপে প্রায় দুই বৎসরকাল যারপরনাই সুখে অতিবাহিত করিলাম। একটি দিনের জন্যেও কোন প্রকার কষ্ট অনুভব করি নাই। কিন্তু হায়! আমার এমন সুখে কে বাদ সাধিল! আমাদের সুখ-শতদলে সন্দেহকীট প্রবেশ করিল। কোন দুরন্ত নিষ্ঠুর দৈত্য যেন আমার কানে কানে বলিল, 'এত বিভোর হইও না ; তোমার স্ত্রী বাস্তবিকই তোমাকে ভালবাসেন অথবা কাপট্যের অভিনয় করেন, তাহা ভাল করিয়া ভাবিয়াছ কি?'

"ডাক্তারবাবু, আমি উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলাম। কতবার এই নিদারুণ চিন্তা মন হইতে দূর করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু হায়, কিছুতেই কিছু হইল না। শত্রুকে বিদূবিত করিতে যাইয়া ক্রমে তাহারই অধীন হইয়া পড়িলাম। তখন একটি কথা আমার মনে কেবলই জাগিতে লাগিল। আমার স্ত্রী কোন কথাই আমার নিকট গোপন করেন না ; এমন কি চিন্তাতে কোন অন্যায় কার্যের কথা ভাবিলেও তাহা সরল ভাবে আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলেন, কিন্তু তাঁহার একটি বাক্স আছে, তাহা আমার সম্মুখে কখন উদ্ঘাটন করেন না কেন? অন্যান্য প্রয়োজনীয় চাবিগুলি যথায় তথায় ফেলিয়া রাখিয়াও সেই বাক্সের চাবিটি সর্বদাই সঙ্গে সঙ্গে রাখেন কেন? অবশ্য ইহার মধ্যে কোন গূঢ় রহস্য আছে। এ রহস্য উদ্ঘাটন না করিলে আর আমার শান্তি নাই। আমার মন ভীষণ সন্দেহ দোলায় দুলিতে লাগিল ; কিন্তু

এই সন্দেহের কথা আমি আমার স্ত্রীকে কিছুই বলিলাম না। গোপনে হৃদয় মধ্যে বিষ পোষণ করিতে লাগিলাম। ক্রমে আমি আমাব প্রিয়তমার চক্ষে লজ্জাহীনতা, মুখে অপবিত্রতা এবং হৃদয়ে কপটতা অনুভব করিলাম। কবে একটি বিশেষ সুযোগ ঘটিবে, কেবল তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

"ঘটনাক্রমে একদিন আমার জমিদার বন্ধুর পত্নী আমার স্ত্রীকে লইয়া যাইবার জন্য স্বয়ং আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাকে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা থাকিলেও বন্ধু-পত্নীর অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা চলিয়া যাইলে, আমি বাটীর সমুদায় চাবি একত্র করিয়া গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম, এবং এক একটি করিয়া চাবিগুলি সেই বাক্সে লাগে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। সে সময় আমার মনের অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছিল। এরূপ করা উচিত হইতেছে কি না, এক একবার ভাবিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে চিন্তা আমার পাপ-কলুষিত সন্দিগ্ধ হৃদয়ে স্থান পাইল না। অবশেষে কিছুক্ষণ বিফল চেষ্টার পর একটি চাবি দ্বারা বাক্সটি উদ্ঘাটিত হইল। আমি কম্পিত হস্তে এক এক করিয়া সমুদায় জিনিষপত্র দেখিতে লাগিলাম। শেষে একটি চিঠির তাড়া বাহির হইল।

"চিঠিগুলি লাল ফিতায় বাঁধা। আমার সকল সন্দেহ সেই চিঠিগুলির উপর পড়িল। ফিতাটি খুলিয়া একখানি চিঠি পড়িলাম; উপরে কাহারও নামোল্লেখ নাই, কিন্তু তাহা আগাগোড়া শিষ্টাচার বিরুদ্ধ ভালবাসার কথায় পূর্ণ। শেষ অবধি পড়িয়া দেখিলাম লেখক আমারই একটি বন্ধু। তারিখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমাদের বিবাহের পরে এই চিঠি আসিয়াছে। চিঠিগুলি কেহ যাহাতে না দেখিতে পায়, আবার যেন ফিরাইয়া দেওয়া হয়, এইরূপ সতর্কতাপূর্ণ অনুরোধও চিঠির নানাস্থানে লিখিত রহিয়াছে। আমি সেখানি রাখিয়া আর একখানি তৎপরে আরও একখানি, এইরূপ করিয়া প্রায় সমুদায় চিঠিগুলিই পড়িলাম। সকলগুলিই প্রেমের চিঠি; এবং সকলগুলিই আমাদের বিবাহের পরে আসিয়াছে। পাঠ সাঙ্গ করিয়া চিঠিগুলি আবার পূর্বের ন্যায় গুছাইয়া বাঁধিয়া রাখিলাম। তখন রাগে দুঃখে হিংসায় আমার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। এতদিন হৃদয় দিয়া, হৃদয়ের সমুদায় প্রেম দিয়া কি দুরন্ত ভুজঙ্গই না পুষিতেছিলাম? কে জানে সুবিধা পাইলে এই ভুজঙ্গ বিষম দংশনে আমার জীবনলীলা শেষ করিবে না। আর নয়, বিলম্বে বিপদ ঘটিতে পারে; অচিরাৎ ইহার কোন প্রতিকার করিতে হইবে, এইরূপ ভাবিয়া মনে মনে একটি বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিলাম।

"প্রায় সন্ধ্যা হয় এমন সময় আমার স্ত্রী গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন আমি একাকী ঘরের ভিতরে বসিয়াছিলাম, আমার স্ত্রী ছুটিয়া আমার নিকটে আসিলেন এবং যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইলেন এইরূপ ভাব দেখাইলেন। আমিও অনেক চেষ্টাতে মনের ভাব গোপন করিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিতে লাগিলাম। ক্রমে আহারের সময় উপস্থিত হইল; দুজনে আহার করিলাম। আহারান্তে কিঞ্চিৎকাল কথাবার্তা বলিয়া উভয়ে শয়ন করিলাম। আমার স্ত্রী দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন, আমি ঘুমের ভান করিয়া জাগিয়া রহিলাম। রাত্রি প্রায় ১২টা বাজিয়াছে এমন সময় ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিলাম; এবং একখানি তীক্ষ্ণধার ছোরা লইয়া আমার ঘুমন্ত দেবী সদৃশা স্ত্রীর বক্ষদেশে বিদ্ধ করিয়া দিলাম। অস্ত্রবিদ্ধ করিবার সময় এক ফোঁটা রক্ত আমার দক্ষিণ হস্তের পশ্চাৎপৃষ্ঠে পড়িয়াছিল। আপনি সে স্থানটি বিশেষরূপেই অবগত আছেন। তৎপরে বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেই রাত্রের মধ্যেই লাশ জ্বালাইয়া দিলাম। কিন্তু এতবড় একটা হত্যাকাণ্ড সমাধা করিয়া আমার মনে যে প্রকার ভীষণ ভয় এবং চিন্তার উদয় হওয়া স্বাভাবিক, সেরূপ কিছুই হইল না। আমি যে কোন

অন্যায় কার্য করিয়াছি, তাহা একবারের জন্যেও আমার মনে উদয় হইল না। দোষের উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছি, ইহাতে আবার দুঃখ কি? যতদিন তাহাকে সাধ্বী সতী বলিয়া জানিতাম, হৃদয় দিয়া, হৃদয়ের সমুদায় ভক্তি প্রেম দিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়াছি; যখন তাহাকে বিশ্বাসঘাতিনী বলিয়া বুঝিলাম, তখন তাহাকে হত্যা করিব না কেন?

"পরদিন প্রভাতেই আমার স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইল। বন্ধু বান্ধব অনেকেই আমাকে সান্ত্বনা দিতে আসিলেন। ক্রমে আমার জমিদার বন্ধুর স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে শত ধারে অশ্রু ঝরিতেছিল। আমাকে দেখিয়াই তিনি অধিকতর ব্যথিত হইলেন, কিন্তু অনেক চেষ্টাতে আপনার কষ্ট সম্বরণ করিয়া আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। পরে সকলে চলিয়া যাইলে, তিনি আমাকে নির্জনে ডাকিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনার স্ত্রীর নিকট আমার একটী গুপ্তধন গচ্ছিত ছিল। আমার নিজের কাছে থাকিলে পাছে দেখে, এই ভয়ে আপনার স্ত্রীর নিকট রাখিয়া ছিলাম। কারণ পৃথিবীতে আমি একমাত্র তাহাকেই বিশ্বাস করিতাম। সেই গুপ্তধনটি আর কিছুই না—'একতাড়া চিঠি।' আপনি অনুগ্রহ করিয়া একবার খুঁজিয়া দেখিবেন কি।"

"আমি হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম এবং আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, 'চিঠিতে কি লেখা আছে?'

"সে কথা জানিয়া আপনার কোন আবশ্যক নাই। আপনার স্ত্রীর নিকট চিঠিগুলি রাখিয়া তাহাকে সেগুলি দেখিতে অথবা কাহাকেও দেখাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলাম। তাহার সরলতা ও বিশ্বস্ততা এতই অধিক ছিল যে, একটি দিনের তরেও সে আমাকে চিঠির লিখিত বিষয় জিজ্ঞাসা করে নাই; এবং আমি বিশ্বাস করি সে আমার চিঠির একটি বর্ণও কখন পড়ে নাই।"

"এই সকল কথা শুনিবামাত্র আমার হৃদয় অধিকতর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। শরীরের সমুদায় গ্রন্থিগুলি যেন অকস্মাৎ শিথিল হইয়া পড়িল। শত শত নিদারুণ বজ্র মস্তক ভেদ করিয়া যেন আমার হৃদয়ে গিয়া আঘাত করিল। আমি অনেক কষ্টে সে যন্ত্রণা সম্বরণ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, কি দেখিয়া সেগুলি আপনার চিঠি বলিয়া চিনিতে পারিব?"

"'চিঠিগুলি একটি লাল ফিতায় বাঁধা, তাহার নিজের বাক্সের মধ্যে ছিল। সে বাক্সের চাবি সে কাহারও হাতে দিত না।'

"'ভাল, খুঁজিয়া আসিতেছি, এই বলিয়া আমি চিঠিগুলি আনিতে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে চিঠির তাড়াটি বাহিরে আনিয়া আমি তাঁহাকে দেখাইবামাত্র তিনি আগ্রহের সহিত সেগুলি হস্তে লইলেন। আমি সে স্থানে আর দাঁড়াইতে পারিলাম না; তাড়াতাড়ি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বন্ধু পত্নীও গৃহে প্রস্থান করিলেন।

"ডাক্তারবাবু, আপনাকে আর অধিক লিখিত পারিতেছি না; আপনি বোধ করি সমস্ত ব্যাপারই বুঝিতে পারিতেছেন। এখন আমার কি করা কর্তব্য, তাহা এক প্রকার ঠিক করিয়াছি। বোধ করি ঘণ্টা খানেক পরে পৃথিবীতে আর আমার অস্তিত্ব কেহ খুঁজিয়া পাইবে না।

"কিছুদিন পূর্বে আপনাকে যে লাল চিহ্নটি দেখাইয়াছিলাম তাহাই আমার স্ত্রীর হৃদয়ের রক্তের চিহ্ন। চিহ্নটি এখন মুছিয়া গিয়াছে, কিন্তু যন্ত্রণার একটুও হ্রাস হয় নাই। গত কয়েকদিন হইতে আমার হস্তের যন্ত্রণা আবার অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। চিকিৎসাতে কতকটা আরাম পাইতে পারি বটে, কিন্তু আর নয়, এখন আমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের

প্রয়োজন।

"আর কয়েকটি মাত্র কথা লিখিয়া এই পত্রের উপসংহার করিব। আপনি আমাকে 'কুন্তলীন' ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা শুনিবামাত্র কি যে ভীষণ যন্ত্রণাভোগ আমাকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল তাহা অন্তর্যামী ভগবানই জানেন। কেন এরূপ হইয়াছিল, শুনিবেন কি ? কুন্তলীন আমার স্ত্রীর অতি প্রিয় সামগ্রী ছিল। ইহার সুগন্ধে এবং উপকারিতায় বিমোহিত হইয়া তিনি নিজেই যে কেবল 'কুন্তলীন' ব্যবহার করিতেন, তাহা নহে, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলকেই 'কুন্তলীন' ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিতেন। বিবাহের পর 'কুন্তলীন' ভিন্ন অন্য কোন সুগন্ধি তৈল আমাদের গৃহে স্থান পায় নাই।

"একবার তাঁহার কোন প্রিয়তমা সখীর বিবাহ উপলক্ষে তিনি একশিশি "গোলাপগন্ধ কুন্তলীন" উপহার দিয়াছিলেন। আমি সেই সঙ্গে অন্যান্য দু একটি সুগন্ধী দ্রব্যও উপহার দিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'ইহার সহিত আর কোন সুগন্ধি দ্রব্য উপহার দিবার আবশ্যক নাই।' এখন সেই 'কুন্তলীনের' দিকে চাহিলে আমার বুক কাঁপিয়া উঠে।

"কিন্তু যাক্ ও সব কথায় আর প্রয়োজন নাই। এখন আমি আপনার এবং জগতের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছি। জানি না, পরকালে আমাব যন্ত্রণার হ্রাস হইবে কি না ? তবে ইহা খুব বিশ্বাস কবি, ঈশ্বরের ন্যায়বান হস্ত আমাকে মার্জনা না করিলেও আমার স্ত্রীর প্রেমময় হৃদয় ক্ষমা করিবে! আর আপনি আমার দগ্ধ জীবনের সমুদায় ইতিহাস শুনিলেন, আশা করি আপনিও আমাকে ক্ষমা করিবেন। ঈশ্বর আপনাকে সুখে রাখুন।

আপনার—

স—।"

যে দিন পত্রখানি পাইলাম, তাহার পরদিন সমুদায় সংবাদপত্রে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হইল। তিনি আত্মহত্যা করিয়া সমুদায় জ্বালা যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। কিন্তু আত্মহত্যার প্রকৃত কারণ কেহই উল্লেখ করিতে পারেন নাই। কেহবা তাঁহার প্রিয়তমা স্ত্রী.র বিরহ শোক, কেহ কেহ বা কোন মর্মান্তিক যন্ত্রণার আতিশয্যই এই শোকাবহ ঘটনার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ কবিয়াছিলেন।

শ্রীঅ—

নিরুপমা

১

নবগ্রামের দেবেন্দ্রনাথ রায় বনিয়াদি বড় লোক, ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা তাঁহার চরিত্র আরও অধিক উচ্চতর ছিল ; একটি পুত্র ও একটি কন্যা ব্যতীত আর সন্তানাদি ছিল না। পুত্র শচীন্দ্রনাথ দয়া দাক্ষিণ্যে বুদ্ধি ও বিদ্যায় পিতার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; এই দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ না হইতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম এ পড়িতেছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের কন্যা নিরুপমা সকল বিষয়েই নিরুপমা নামের যোগ্যা ছিল। উপন্যাস বর্ণিতা সুন্দরীদিগের ন্যায় আকর্ণ বিশ্রান্ত চক্ষু, তিলফুল জিনি নাসা, কম্বুকণ্ঠ প্রভৃতি না

থাকিলেও সে সুন্দরী, কারণ সেই শান্ত, সমুজ্জ্বল নয়ন, সুগৌর সুঠাম কান্তি যে একবার দেখিত সে আর সহসা নয়ন ফিরাইতে পারিত না। সে স্বর্গীয় সরলতাময় প্রীতিমাখা মুখখানি যে একবার দেখিয়াছে সে বুঝি ইহ জীবনে তাহা ভুলিবে না।

দেবেন্দ্রনাথ স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন না ; তিনি নিরুপমাকে গৃহে রাখিয়া নানাবিধ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতা করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রী বিমলা দেবী সুগৃহিণী ছিলেন ; কি রন্ধনে কি গৃহকর্মে কি শিল্প বিদ্যায় কি লেখাপড়ায়, নবগ্রামে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতিতে তিনি অতুলনীয়া ছিলেন, সুতরাং তাঁহার কন্যা যে সর্বগুণে গুণবতী হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি ?

নিরুপমা ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা, এখনও বিবাহ হয় নাই। দেবেন্দ্রনাথের অর্থের অভাব নাই তাহাতে একটিমাত্র কন্যা, সুতরাং কন্যাটি যাহাতে কোন বিষয়ে কষ্ট না পায় ইহাই তাঁহার কামনা ; প্রায় তিন চারি বৎসর হইল নানা স্থানে অনুসন্ধান করিতেছেন, কিন্তু এ পর্যন্ত কোথাও তাঁহার আশানুযায়ী বর মিলিতেছে না ; এদিকে কন্যাও ক্রমে বয়স্থা হইয়া উঠিল। বিমলা দেবী বড়ই চিন্তিত হইলেন। নিরুপমা এখন আর নিতান্ত বালিকা নহে, ভাল মন্দ বুঝিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে। সে বুঝিল যে তাহার জন্যই তাহার পিতামাতার এত ভাবনা চিন্তা, আরও বুঝিতে পারিল যে তাহাকে দেখিলে পিতামাতা আর পূর্বের ন্যায় আনন্দ প্রকাশ করেন না বরং তাহার মুখপানে চাহিয়া আরও যেন ব্যাকুল হইয়া উঠেন। পিতামাতার এই ভাব দেখিয়া তাহার প্রফুল্ল শতদলবৎ মলিন হইয়া যাইত ; ধীরে ধীরে এইরূপে দেবেন্দ্রনাথের শান্তির সংসারে একটি অশান্তির ছায়া পড়িল।

২

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল, নিরুপমা ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ কখন মনে করিতেছেন "যাক্ আর খুঁজিব না, যে সম্বন্ধগুলি উপস্থিত আছে ইহারই মধ্যে দেখিয়া শুনিয়া একটি স্থির করিয়া ফেলি ; কিন্তু নিরুপমার মুখের দিকে চাহিলেই তাঁহার সে সঙ্কল্প ভাসিয়া যাইত, ভাবিতেন হায় ! কেমন করিয়া এই স্নেহপুত্তলীকে স্বেচ্ছায় দুঃখ সাগরে ভাসাইব ?

এদিকে আর এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল, বিমলা দেবী স্বভাবতঃই কিছু রুগ্ন ছিলেন তাহার উপর কন্যার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া আরও কাতর হইয়া পড়িলেন, ক্রমে একেবারে শয্যাগত হইলেন। তখন গ্রামে ভাল চিকিৎসক ছিল না, সুতরাং নানা স্থান হইতে ভাল ভাল চিকিৎসক আনাইলেন, রীতিমত চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অবিশ্রান্তভাবে বালিকা মাতার সেবা করিত, দিন রাত্রি নীরবে সেই রুগ্ন শয্যা পার্শ্বে বসিয়া থাকিত ; জননী যখন তাহার মলিন মুখখানির দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন, তখন তাহার বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইত, মনে হইত বুঝি আমিই মাতার সমুদয় যন্ত্রণার মূল কারণ ; কাতর হৃদয়ে বালিকা বিপদ ভঞ্জন হরির নিকটে মাতার আরোগ্য প্রার্থনা করিত। ভক্তবৎসল হরির চরণে সে ব্যাকুল, প্রার্থনা পৌঁছিল।

প্রায় এক মাস পরে বিমলা দেবী আরোগ্য হইলেন, কিন্তু পীড়া সম্পূর্ণরূপে উপশম হইল না। চিকিৎসকগণ জল বায়ু পরিবর্তনের পরামর্শ দিল। এলাহাবাদে দেবেন্দ্রনাথের একজন বন্ধু ছিলেন, তিনি ডাক্তারি করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ এলাহাবাদে যাওয়াই সুবিধাজনক মনে

করিয়া, একটি ভাল বাড়ী ঠিক করিবার জন্য বন্ধুকে পত্র লিখিলেন।

যথা সময়ে পত্রের উত্তর আসিল। বন্ধু লিখিয়াছেন "তোমার স্ত্রী পীড়িতা সংবাদে চিন্তিত হইলাম ; চিকিৎসকগণ জল বায়ু পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়াছেন, তুমি কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে লইয়া রওয়ানা হইবে, আর বাড়ীর জন্য চিন্তা করিও না, এখানে আসিলেই একটা ঠিক করা যাইবে।" পত্র পাইয়া দেবেন্দ্রনাথ যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

৩

প্রায় দুই মাস হইল দেবেন্দ্রবাবু সপরিবারে এলাহাবাদে আসিয়াছেন, বিমলা দেবী পথের অনিয়মে প্রথমে কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এখন সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ এ পর্যন্ত বন্ধুর বাড়ীতেই আছেন, বাসা করার কথা তুলিলেই বন্ধু উমেশচন্দ্র রাগ করেন, বলেন কেন, এখানে কি তোমার কিছু অসুবিধা হচ্ছে, আরও বলেন যে এখান হইতে যাওয়ার আর এক অন্তরায় দেখিতেছি ; তোমার গৃহিণী সবে একটু ভাল হইয়াছেন, এখন তাঁহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার, কিন্তু এখান হইতে গেলে আমি সর্বদা দেখিতে পারিব সে ভরসা কম। যাহা হউক নানা কারণে দেবেন্দ্রনাথের বাসা করা ঘটে নাই।

উমেশচন্দ্র মৈত্র এলাহাবাদে ডাক্তারি করিতেন একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহার বাড়ী বঙ্গদেশে, কলিকাতায় পাঠাভ্যাসকালে দেবেন্দ্রনাথের সহিত বন্ধুত্ব জন্মে, সেই বন্ধুত্ব আত্মীয়তায় পরিণত হয়। দেশে আত্মীয় স্বজন কেহ না থাকায় উমেশবাবু চাকুরীস্থলেই বাড়ী করিয়া সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। সন্তান-সন্ততির মধ্যে একমাত্র কন্যা নলিনী। একটি পুত্র সন্তান ছিল, কিন্তু সেটি তাঁহার ঔরসজাত পুত্র নহে। চাকুরী হওয়ার অব্যবহিত পরেই উমেশবাবু একবার দেশে গিয়াছিলেন, তখন দেশে অত্যন্ত ওলাউঠার প্রকোপ, উমেশবাবুর বাড়ীর সন্নিকটে তাঁহার এক জ্ঞাতির ওলাউঠা হয়। উমেশবাবু অতিশয় সহৃদয় ব্যক্তি, তিনি প্রাণপণে জ্ঞাতির চিকিৎসা করেন, কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়, কয়েক দিন পরে জ্ঞাতির মৃত্যু হইল। পরে জ্ঞাতিপত্নীরও ঐ পীড়া হয়, মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া বিধবা অনাথিনী অন্ধের যষ্টি দরিদ্রের সম্বল একমাত্র পুত্র নির্ম্মলকে ডাক্তারবাবুর হস্তে সমর্পণ করিয়া পতির অনুগমন করিল। পরদুঃখ-কাতর উমেশচন্দ্র নির্মলকে আপনার আলয়ে লইয়া আসিলেন, এবং অপত্য নির্বিশেষে লালন পালন করিতে লাগিলেন। নির্মল, এখন বিংশতি বৎসর বয়স্ক যুবক। অতি শৈশবে নির্মল পিতা মাতা হারাইয়াছে ; শৈশবের স্মৃতি অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায় তাহার মনে ছিল ; কিন্তু ডাক্তারবাবুর স্নেহে সেজন্য তাহার বিশেষ দুঃখ ছিল না। নলিনী নির্মলকে আপন সহোদর ভ্রাতা বলিয়াই জানিত। ডাক্তারবাবু নির্মলের পরিচয় কাহারও নিকট দেন নাই, সুতরাং সকলে নির্মলকে ডাক্তারবাবুর পুত্র বলিয়াই জানিত।

বিদেশে আসিবার আগে নিরুপমার বিশেষ ভাবনা হইয়াছিল, কিন্তু বিদেশে আসিয়া তাহার সে ভ্রম দূর হইল। প্রতিভাময়ী নলিনীর সরলতা মাখা মুখখানি দেখিয়া সে দেশের কথা ভুলিয়া গেল।

৪

উমেশবাবুর বাড়ীখানি বড় সুন্দর, বাড়ীর কর্তা যে একজন সুরুচিসম্পন্ন লোক বাড়ীখানি

দেখিলে তাহা সহজেই অনুমিত হয়।

সন্ধ্যাকালে বৈঠকখানায় বসিয়া দুই বন্ধুতে কথোপকথন হইতেছিল। দেবেন্দ্রনাথ বলিতেছিলেন শীঘ্রই বাড়ী যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে হয়। উপেন্দ্রবাবু বলিলেন "কেন ? এত কি প্রয়োজন পড়িয়াছে যে শীঘ্র না গেলেই চলিবে না।"

দেবেন্দ্র।—দুই মাসের অধিক হইল বাড়ী হইতে আসিয়াছি আসিবার সময় ব্যস্ততা প্রযুক্ত বাড়ীর সেরূপ কোন ভাল বন্দোবস্ত করিয়া আসিতে পারি নাই, সুতরাং শীঘ্রই যাওয়া প্রয়োজন। শুধু তাহাই নহে আমার কন্যাটি এক্ষণে বয়স্থা হইয়াছে, উপযুক্ত পাত্র অভাবে বিবাহে বিলম্ব হইতেছে। চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু কোথাও ইচ্ছানুরূপ বর খুঁজিয়া পাইতেছি না, সে জন্য অতিশয় চিন্তিত আছি। স্ত্রীর পীড়ার জন্য সে কথা এতদিন ভাবিবার অবসর পাই নাই, এখন আর নিশ্চেষ্ট থাকা কর্তব্য নহে।

উমেশ। দেখ, আমার কন্যাটিও বয়স্থা হইয়াছে, কিন্তু আমি তোমার মত চিন্তা করি না ; বস্তুতঃ বলিতে কি, আমার নলিনীর উপযুক্ত বর আমি দেখিতে পাই না, সর্বগুণ সমন্বিত পাত্র না পাইলে আমার নলিনীর বিবাহ দিব না এ বিষয়ে আমি স্থির প্রতিজ্ঞ। সে যাহা হউক তোমার কন্যার বিবাহের কথায় আমার একটি কথা মনে পড়িল ; আমাদের নির্মলের সহিত বিবাহ দাও না কেন ? নির্মল সকল বিষয়েই নিরুপমার যোগ্য বর, আর নিরুপমাও আমার পুত্রবধূ হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। দেখ যথার্থ কথা বলিতে কি এ সম্বন্ধ হইলে আমাদের বন্ধুত্বের মূল দৃঢ়ীকৃত হইবে, সেই জন্যই আমার একান্ত ইচ্ছা।

পূর্বেই বলিয়াছি উমেশবাবু অতিশয় সহৃদয় ব্যক্তি, সরলভাবে বন্ধুর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, যেন তাঁহারই কন্যাদায় উপস্থিত।

দেবেন্দ্রবাবু যেন অকূল পাথারে কূল পাইলেন, বন্ধুর নিঃস্বার্থ সরল অকৃত্রিম ব্যবহারে দেবেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হইলেন, আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু একটি কথা মনে পড়িবামাত্র সে আনন্দরাশি হৃদয়ে বিলীন হইয়া গেল। তাঁহার মনে হইল নির্মল ত উমেশের ঔরসজাত পুত্র নহে, স্নেহ পালিত হইলেও সে সম্পত্তির অধিকারী নহে, আইন অনুসারে নলিনীই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী। নির্মল যে পথের ভিখারী। হায়! শেষে কি তাঁহার স্বর্ণ প্রতিমা নিরুপমা পথের কাঙ্গালিনী হইবে ? একথা ভাবিতেও তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল, তিনি বন্ধুর কথার প্রকৃত উত্তর দিতে পারিলেন না, বলিলেন আমার স্ত্রীর মত জানিয়া তোমাকে বলিব ; সে দিন আর কোন কথা হইল না।

যথাকালে দেবেন্দ্রনাথ বিমালা দেবীকে একথা জানাইলেন। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া বিমলা দেবী বলিলেন "দেখ, নির্মলের ন্যায় রূপ গুণ সম্পন্ন পাত্র মিলা কঠিন। নির্মলের ন্যায় জামাতা পাইতে কাহার না অভিলাষ হয় ? কিন্তু নির্মলের কপর্দকেরও সম্বল নাই। যদি ঈশ্বররাশীর্বাদে আমাদের অর্থের অপ্রতুল নাই, তথাপি সকল দিক ভাবিয়া কাজ করা উচিত। যদি কিছু অর্থ থাকিত তবে একার্যে আপত্তির কোন কারণ ছিল না। সে যাহোক্ কিছু দিন দেখ যদি নিতান্তই না মিলে তখন না হয় এ সম্বন্ধই করা যাইবে। ঘর বর দুই ভাল পাওয়া কঠিন, বিশেষতঃ এমন সুন্দর ছেলে কোথায় পাইবে ?"

পরদিন সন্ধ্যাকালে উমেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ? এ সম্বন্ধে তাঁহার কি মত ?"

"দেবেন্দ্র নির্মলের ন্যায় ছেলের সহিত নিরুপমার বিবাহ দিতে আমার স্ত্রীর কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু"—কিন্তু বলিয়াই একটু থামিলেন।

ঈষৎ হাস্য করিয়া উমেশচন্দ্র বলিলেন "বুঝিয়াছি আর বলিতে হইবে না, নির্মলের অর্থ

নাই এই আপত্তি ! নির্মল আমার ঔরসজাত পুত্র না হইলেও আমি পুত্রাধিক স্নেহে তাহার প্রতিপালন করিয়াছি ; সে স্নেহ মৌখিক নহে, বলিতে বলিতে তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল, তিনি বাক্স খুলিয়া একখানি সযত্ন রক্ষিত কাগজ বাহির করিয়া দেবেন্দ্রনাথের হস্তে দিয়া বলিলেন ইহা দেখাইবার বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না, কেবল তোমার ভ্রম দূর করার জন্যই দেখাইলাম।"

দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন সেখানি উইল। উইলের মর্ম এই—উমেশচন্দ্রর অবর্তমানে অর্দ্ধেক সম্পত্তি নির্মলের, অর্দ্ধাংশ তাঁর স্ত্রীর, স্ত্রীর অবর্তমানে সেই অর্দ্ধাংশ তাঁহার কন্যা নলিনী প্রাপ্ত হইবে।

লজ্জিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ উইলখানি রাখিলেন, উমেশচন্দ্রকে বলিলেন "ভাই, ক্ষমা কর, তোমার হৃদয়ের মহত্ব আমি বুঝি নাই, এ বিবাহে আমার কোনই আপত্তি নাই। নানা কারণে তোমার নিকট চির ঋণী হইলাম, জীবনে কখন ইহার প্রতিদান করিতে পারিব কিনা বিধাতা জানেন।"

উমেশ। শুভকার্যে বিলম্ব করা অনুচিত, এই মাসের ২৭শে তারিখে দিন ভাল আছে, সেই তারিখেই বিবাহ হইবে, তুমি শচীন্‌কে ও তোমার বন্ধুবান্ধবকে পত্র লেখ। শচীন্ আসিলেই একটা ভাল বাড়ী ভাড়া করা যাইবে।

দেবেন্দ্রনাথ আহ্লাদিত চিত্তে বন্ধুর পরামর্শ অনুযায়ী কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

৫

পিতার পত্র পাইয়া শচীন্দ্রনাথ তিন সপ্তাহের ছুটি লইয়া এলাহাবাদে আসিলেন, ভগিনীর বিবাহের জন্য আসিয়া নিজে এক নূতন বিপদে পড়িলেন।

নলিনীর অনিন্দনীয় রূপরাশি দেখিয়া শচীন্দ্রনাথ মোহিত হইলেন। এমন স্নিগ্ধোজ্জ্বল, অপূর্ব মাধুরীময়, অনুপম সৌন্দর্য বুঝি জীবনে আর কখন দেখেন নাই। এ দেবীপ্রতিমা কি তাঁহার হইতে পারে ? শচীন্দ্রনাথ সে পথ তত দুরূহ মনে করিলেন না। সযত্নে আশালতা হৃদয়ে রোপণ করিলেন। কিন্তু হায় ! জগতে মানবের কয়টা আশা ফলবতী হয় ? অলক্ষে অদৃষ্ট নিষ্ঠুর হাসি হাসিল, শচীন্দ্রনাথ তাহা তখন জানিতে পারিলেন না।

নির্দিষ্ট দিবসে মহাসমারোহে নির্মলচন্দ্রের সহিত নিরুপমার বিবাহ হইয়া গেল। উমেশবাবুর বাটীর অনতিদূরে দেবেন্দ্রনাথ একটি বাড়ি ভাড়া করিয়াছিলেন ; আত্মীয় কুটুম্ব কেহ কেহ আসিয়াছিলেন, দূর দেশ বলিয়া সকলে আসিতে পারেন নাই।

বিবাহের কয়েক দিন পরে দেবেন্দ্রনাথ দেশে যাওয়ার উদ্‌যোগ করিতেছেন, এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, গত রাত্র হইতে নলিনীর বড় জ্বর হইয়াছে, ডাক্তারবাবু তাঁহাকে যাইতে বলিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথ কালবিলম্ব না করিয়া তখনই চলিয়া আসিলেন, আসিয়া কি দেখিলেন ? স্বর্ণ প্রতিমা নলিনী অচৈতন্য অবস্থায় শয্যায় পড়িয়া আছে, দেবেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "কাল রাত্রে জ্বর হইয়াছে, কে দেখিতেছে ? উমেশবাবু বলিলেন "কাল রাত্রে জ্বর আসিয়াছে, সেই অবধি অচৈতন্য অবস্থায় আছে, ডাক্তার সাহেবকে ও দুজন বাঙ্গালী ডাক্তার আনিতে লোক পাঠাইয়াছি"। উমেশবাবুর কথা শেষ না হইতেই ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল ডাক্তার আসিয়াছেন। উমেশ বাবুর স্ত্রী শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া গেলেন। রোগের অবস্থা শুনিয়া ও রোগী দেখিয়া ডাক্তার সাহেবের মুখ গম্ভীর হইল, তিনি ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া প্রস্থান করিলেন।

বাঙ্গালী ডাক্তার দুজন রহিলেন। নির্জনে দেবেন্দ্রনাথ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন দেখিলেন মহাশয় ? ডাক্তার বাবু বলিলেন পীড়া কঠিন জীবন সংশয়, তবে বলা যায় না বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। বাঙ্গালায় বিকার জ্বর বলে তাহাই হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিলেন, কম্পিত হৃদয়ে নীচে আসিয়া শচীনকে ও তাঁহার স্ত্রীকে আসিবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন।

প্রাণপণ যত্নে চিকিৎসা চলিতে লাগিল। নলিনীকে কে না ভালবাসে ? দাস দাসী পর্যন্ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে, সেবা শুশ্রূষার কিছুমাত্র ত্রুটি নাই, কিন্তু হায় ! নিয়তি খণ্ডন করে কাহার সাধ্য ?

জননীকে লইয়া শচীন আসিলেন, গৃহে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, কম্পিত হৃদয়ে শয্যাপার্শ্বে বসিলেন। নলিনীর কুসুমসুকুমার দেহখানি নীহার-ক্লিষ্ট পদ্মিনীবৎ শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

তিন দিন পরে উমেশ বাবুর প্রকাণ্ড ভবনে হাহাকার উঠিল। পিতামাতার হৃদয়ে নিদারুণ শেলাঘাত করিয়া, আত্মীয়স্বজনকে অপার শোকসাগরে ভাসাইয়া দেবীপ্রতিমা নলিনী দিব্যধামে চলিয়া গেল : হায় কাল ! তোমার অসাধ্য জগতে কিছুই নাই। ডাক্তারবাবু এবং তাঁহার স্ত্রী কন্যার শোকে উন্মাদিনীর ন্যায় হইলেন। আর শচীন্দ্র ! শচীন্দ্রনাথ সযত্নে হৃদয় উদ্যানে যে আশালতা রোপণ করিয়াছিলেন, নিদারুণ কাল তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিল, নৈরাশ্যের তীব্র যাতনায় শচীন্দ্রনাথের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল।

কয়েক দিন পূর্বে যে ভবন আনন্দ উৎসবে পূর্ণ ছিল, সেই অট্টালিকা এক্ষণে বিষাদের চিত্র স্বরূপ হইল। হায় ! নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভ সংসারে কয়জনের ভাগ্যে ঘটে ?

৬

নলিনীর মৃত্যুর পরে তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, নিরুপমার একটি কন্যা হইয়াছে, মেয়েটি বড় সুন্দর ; কাল কাল কোঁক্‌ড়ান চুলগুলি, কৃষ্ণতার-শোভিত আয়ত চক্ষু দুটিতে মুখখানি বড় সুন্দর দেখাইত। কন্যাটি পাইয়া ডাক্তারবাবু ও তাঁহার স্ত্রী নলিনীর শোক কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইয়াছেন। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী মেয়েটির নাম রাখিয়াছেন সুষমা। তিনি সুষমাকে একদণ্ডও চক্ষুর অন্তরাল করিতেন না, এই নিরুপমার পিত্রালয় আসা বড় ঘটিত না।

প্রায় দুই বৎসর পরে নিরুপমা পিত্রালয় আসিয়াছে, পনের ষোল দিনের বেশী থাকিতে পারিবে না। সংবাদ পাইবামাত্র তাহার প্রাণের সখি বিমলা ছুটিয়া দেখা করিতে আসিল। বিমলাও কিছুদিন পূর্বে পিত্রালয়ে আসিয়াছিল !

কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর নিরুপমা বিমলাকে বলিল "চল ভাই আমার গাছগুলি দেখে আসি," এই বলিয়া নিরুপমা সস্নেহে বিমলার হাতখানি ধরিয়া খিড়কির বাগানের দিকে চলিল। বহুক্ষণ উদ্যান মধ্যে বেড়াইয়া বেড়াইয়া ক্লান্ত ভাবে নিরুপমা বিমলাকে লইয়া তাহাদের সেই পুকুরঘাটের বকুল গাছের তলায় বেদীর উপর আসিয়া বসিল। বিমলার ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি মৃত্তিকা চুম্বন করিতেছিল, সে দৃশ্য নিরুপমার চক্ষে বড় সুন্দর বোধ হইল, সাদরে সেই চুলের রাশি নাড়িয়া নিরুপমা বলিল, "আচ্ছা ভাই, তোর এমন সুন্দর চাঁচর কেশ কোথা হ'তে এ'ল, আগে ত তোর চুল ভারি খারাপ ছিল ?"

মৃদু হাসিয়া বিমলা বলিল, "সত্যি ভাই, আগে আমার এমন চুল ছিল না, তোমাদের

এলাহাবাদ যাওয়ার কিছু দিন পরে আমি অতিশয় পীড়িতা হইয়াছিলাম, সংবাদ পাইয়া আমার স্বামী আসিলেন এবং চিকিৎসার্থে কলিকাতা লইয়া গেলেন। কিছুদিন পরে আমি আরোগ্য হইলাম বটে, কিন্তু আমার চুলগুলি প্রায় সমুদয় উঠিয়া গেল। নানা প্রকার তৈল মাখিলাম, কিছুই হইল না, বরং যা কিছু ছিল তাও গেল, মস্তকটি একেবারে কেশ শূন্য হইয়া গেল।

"একদিন সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া আমার স্বামী "কুন্তলীন" নামক একটি তেল এক বোতল আনিয়া দিলেন, সেই এক বোতল তেলেই অনেকটা উপকার পাইলাম, তারপর ক্রমাগত ছয় মাস উক্ত তেল ব্যবহার করিয়া এই রকম চুল হইয়াছে। এখন আমি 'কুন্তলীন' ছাড়া আর অন্য কোন তেল মাখি না, ইহাতে চুল বেশ পরিষ্কার থাকে—এবং গন্ধও বেশ মিষ্ট।"

নিরুপমা আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ তেল কোথায় পাওয়া যায় বিমলা ? বিমলা বলিলেন, "প্রায় সমস্ত খবরের কাগজেই ইহার বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইবে।"

এমন সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল "খুকী বড় কাঁদছে, মা কিছুতেই থামাইতে পারিতেছেন না, শীঘ্র এস।" নিরুপমা বলিলেন আয় ভাই, বাড়ীর ভিতর যাই। বিমলা বলিলেন, বেলা একেবারে গেছে আজ আমি বাড়ী যাই কাল আবার আসিব।

* * * * *

যথাকালে নিরুপমা এলাহাবাদে চলিয়া গেলেন, এবং স্বামীকে বলিয়া 'কুন্তলীন' আনিয়া ব্যবহার করিতে লাগিলেন। 'কুন্তলীন' তাঁহার এত পছন্দ হইয়াছে যে, এখন তিনি অন্য কোন তৈলের নামও শুনিতে পারেন না।

কোন ধনবানের সুন্দরী কন্যার সহিত শচীন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছে। বিবাহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এলাহাবাদে জীবনের যে শান্তিটুকু হারাইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা আর ফিরিয়া পাইলেন না। সে স্মৃতি সে শোকচিত্র চিরজীবনের তরে তাহার হৃদয় মাঝে অঙ্কিত হইয়া রহিল।

কুলবালা দেবী
ভাগলপুর

প্রথম পুরস্কার ২৫৲

মনে পড়ে

স্বপনের ঘুম-ভাঙা শিথিল প্রাণের পরে,
স্মৃতির দুয়ার খুলি কত ভাব খেলা করে।
মনে পড়ে, বনে বনে লতাপাতা ফুল তোলা,
মনে পড়ে, মনে মনে আমারে তুলিতে বলা।
মনে পড়ে, হাসিমুখে প্রভাতে, সাঁঝের বেলা
অচলে অচলে ছুটি প্রতিধ্বনি ল'য়ে খেলা।
বিহগের বীণারবে, নির্ঝরের কলস্বনে,
মনে পড়ে, গান গাওয়া ফুল্লপ্রাণে বনে বনে।
মনে পড়ে, প্রেমাবেশে হাতে হাতে হাত রাখা,
প্রকৃতি-মাধুরী হেরি অবাক হইয়া থাকা।
মনে পড়ে, কচি হাতে স্নিগ্ধ 'কুন্তলীন' নিয়া,
মাখাইতে এলোচুলে বামে শির হেলাইয়া।
শোভিত সে কেশ-গুচ্ছে 'কুন্তলীন' শোভা পাওয়া,
মনে পড়ে, সুধা-গন্ধে দশদিক ভরে যাওয়া।
মনে পড়ে, বিদায়ের অতিশেষ মুহূর্তের
অতৃপ্ত-বাসনা-ভরা শত ব্যাথা হৃদয়ের।
মনে পড়ে, মোর পানে শুধু অনিমেষে চাওয়া,
বসনে ঢাকিতে আঁখি, আঁখিজলে ভেসে যাওয়া।
সুদূর প্রবাসে আজ আরো কত পড়ে মনে ;
ভাবের উচ্ছ্বাসে তাই ভাসিতেছি দু' নয়নে।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

দ্বিতীয় পুরস্কার ১৫৲

রূপ-তৃষা

"A thing of beauty is a joy for ever"

KEATS

১

কে আছে সংসারে হেন ? রূপ-তৃষা যার
করে নাই হৃদিরাজ্য কভু অধিকার
সৌন্দর্য-কুহক-জালে,

কার আঁখি নাহি ভুলে ?
কেবল এ ধরা মাঝে রূপের সাগরে,
প্রাণ ভয়ে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছা নাহি করে ?

২

সংসারেতে বীতস্পৃহ তুমি হে সন্ন্যাসি !
জানি তুমি ভোগ সুখে নহ অভিলাষী ;
কিন্তু কি তোমার মন,
সৌন্দর্যের প্রলোভন
পারিয়াছে এড়াইতে এত সাধনায় ?
তুমিও ত আকুলিত রূপ-পিপাসায় ।

৩

ভেবে দেখ যোগীবর ! বাবেক অন্তরে,
তোমার এ নিরঞ্জন সাধনা মাঝারে
মূল মন্ত্র রূপ-তৃষা,
সেই সে তোমার আশা ।
তুমিও ত এখনও এই তৃষানলে
পুড়িতেছ দিবানিশি বহিয়া বিরলে ।

৪

তুমিও রূপের মোহে ত্যাজিয়া সংসার,
বিরলে তাহার ধ্যানে মগ্ন নিরন্তব ।
সে অচিন্ত্য বিভুরূপে,
পার যদি কোন রূপে
জ্ঞান-নেত্রে একবার করিতে দর্শন,
হৃদয়ের সব তৃষা হবে নিবারণ ।

৫

হে সংসারি ! মায়াময় সংসার-বন্ধনে
জড়িত হইয়া মোহে থাক অচেতনে ।
নারী-রূপ-স্রোত জলে,
ঝাঁপ দিয়া কুতূহলে,
ভেসে যাও পরিণাম নাক'রে স্মরণ ।
ভাব মনে এই রূপে কাটিবে জীবন ।

৬

আজি যে রূপের ফাঁসে করিতে বন্ধন,
জীবন সর্বস্ব তব প্রেয়সী রতন,
বর্ণের উৎকর্ষ তরে
বাড়াইতে কেশ-ভারে,
দেহের লাবণ্য রাশি করিতে বর্দ্ধন,
"কুন্তলীন" তৈল মাখে করিয়া যতন।

৭

বিনায়ে বিনোদ বেণী ফণিনী আকারে
লম্বিত করিয়া যত্নে রাখে পৃষ্ঠোপরে।
নয়নে অঞ্জন দিয়ে,
ভূষণে ভূষিতা হয়ে,
সাজা'য়ে রূপের ডালি, প্রেম-উপহারে
আজি সেই প্রিয়তমা তুষি'ছে তোমারে ;

৮

হেরি যাব মৃদু হাসি চারু বিম্বাধরে,
আনন্দ-লহরী তব খেলিছে অন্তরে,
যার কেশ-মেঘ পাশে
বদনচন্দ্রমা ভাসে ;
নয়ন-চকোর তব যাহাতে মাতায়,
ভাব কিহে পরিণাম তাহার কোথায় ?

৯

এ রূপের পরিণাম কিছুদিন পরে,
হইবে কি রূপ, চাহি দেখহ অদূরে ;—
ওই যে পলিতা কেশা,
দন্ত হীনা, জীর্ণ দশা
বৃদ্ধা নারী যষ্টি ভরে করিছে গমন,
এরূপ ছিল কি পূর্বে এখন যেমন ?

১০

নহো তাহা, এও ছিল পরমা সুন্দরী ;

খেলিত ইহার (ও) দেহে লাবণ্য-লহরী।
তোমার প্রিয়ার মত,
এও একদিন কত
সাজাইত দেহ-তরী বিবিধ প্রকারে,
জীবনের প্রিয়তম কাণ্ডারীর তরে।

১১

কালরূপ জলধির তরঙ্গের ঘায়
সাজান সে তরীখানি এবে জীর্ণ কায়।
ভীষণ তরঙ্গ যবে
এ তরী ভাঙ্গিয়া দিবে,
সহসা সাগর-তলে হইবে মগন।
জীবনের সব সাধ ফুরা'বে তখন।

১২

পার্থিব সৌন্দর্য-জ্যোতি জল-বিম্ব প্রায়,
সে সৌন্দর্য-তৃষা কভু মিটিবার নয়।
অনলে ঘৃতের মত,
যত ঢাল বাড়ে তত।
তাই বলি এস মন! বিভু-রূপাগুণে
ঝাঁপ দিয়া পড়ি গিয়া তৃষিত পরাণে।

১৩

জগদীশ!
এই আশীর্বাদ মোরে কর কৃপা ক'রে ;—
যেন তব রূপানলে চির দিন তরে
পুড়িয়া মিশিয়া রই ;
ছাই যেন নাহি হই।
তোমার প্রদীপ্ত ওই অনল-শিখায়
আমার অস্তিত্ব যেন সকলি মিশায়।

শরচ্চন্দ্র দত্ত

তৃতীয় পুরস্কার ১০

পুরস্কার প্রলোভন

মজা'তে মহিলাকুল
  এই ঘোর কলিকালে!
জনমিল "কুন্তলীন"
  বিস্তারিয়ে ইন্দ্রজালে।
সুকেশিনী হইবারে
  কত সীমন্তিনীগণ,
পাগলিনী একেবারে
  না পাইবে যতক্ষণ।
খুলিলে তেলের শিশি
  অমনি বেরয় বাস,
বারেক যে শোঁকে তার
  একেবারে সর্বনাশ!
বাসেতে বসে না প্রাণ
  বাসে বধূ উদাসীনী!
কি গুণেতে কুন্তলীন
  হ'লি এত কুহকিনী?
শুনিয়াছি ব্যবহারে
  বর্ষীয়সী হয় বালা,
শাদা ধব্‌ধবে চুল
  একেবারে হয় কালা!
আশ্চর্য্য শকতি বটে
  কুন্তলীন তোর আছে,
শুনেছি সটাক শিরে
  পুনঃ চুল উঠিয়াছে!
গরম মস্তিষ্ক যার
  ঘোরে বাশিচক্রবৎ,
থেমে যায় মর্দনেতে
  তেলের কি কেরামৎ!
একাধারে এত গুণ
  বল কারে শোভে আর?
বিনে সেই কুন্তলীন
  তুলা ভবে মিলা ভার!
তোমার বাসেতে লক্ষ্মী
  গৃহে থাকে বার মাস,

তাই যত গৃহলক্ষ্মী
করে তব সহবাস।
বসু ভায়া বেঁচে থাক
ধন্য পারফিউমার,
করেছ যে কুন্তলীন
এমন কি হবে আর ?
লও ক্ষুদ্র উপহার
গেঁথেছি কবিতাহারে,
রসিকতা নাই মোর
হাসাইব কি প্রকারে ?
কবীন্দ্র কেশরী যত
বরপুত্র ভারতীর,
তাদের সাক্ষাতে আমি
হেঁট মাথা নতশির !
পুরস্কার লোভে পড়ি
একেবারে দিশাহারা !
লেখনী নিয়েছি করে
পেয়ে কল্পনার সাড়া।
সাধের কবিতা মোর
মাঠে বুঝি যায় মারা,
গৃহে নাই গৃহলক্ষ্মী
একেবারে লক্ষ্মীছাড়া !
নহিলে একটা শিশি
অন্ততঃ থাকিত ঘরে,
গৃহিণীর অনুরোধে
কিঞ্চিৎ মাখিয়ে করে,
বাঁধিয়া দিতাম বেণী
সোহাগে হইয়ে ভোর !
সে সাধ পূরিল কই ?
মনেই রহিল মোর।
কুন্তলীন আগে কেন
না আসিলি বঙ্গভূমে ?
এতকাল ছিলি বুঝি
অচেতন ঘোর ঘুমে ?
গৃহিণী থাকিতে ঘরে
বারেক না দিলি দেখা
কুন্তলীন সে কুন্তলে
বারেক না হ'ল মাখা !
কপালেতে লেখা যাহা

কেহ কি খণ্ডাঁতে পারে ?
বার আনি পাকা চুল
কে করিবে কালো তারে ?
কুন্তলীন—অন্তে যেন
এক শিশি লয়ে সাথে,
শান্তিনিকেতনে গিয়ে
দেই সীমন্তিনী হাতে।
দেখে দেবাঙ্গণাগণ
ছাড়িয়ে অমরাপুরী
আসিবেন কলিকাতা
শিশি নিতে ভূরি ভূরি।
বসুজা কৃতার্থ হবে
স্বর্গেতে ফাটিবে নাম,
সুনাম গাইবে কবি
দিবানিশি অবিরাম!
একে ত প্রতিভাহীন
সোম কাছে খদ্যোতিকা,
অবশ্য কবিতা হেরি
বেরুবে টিপ্পনি টীকা।
"হংস মধ্যে বক যথা"
ঘটিবে সে দশা মোর!
পুবস্কাব প্রলোভন—
কি মোহিনী শক্তি তোর !!!

চন্দ্রনাথ দাস

বিশেষ পুরস্কার ৫্

কলিকাল

কলিকালে বলিহারি কি বলিব হায়,
কালে কালে কত হবে কে বলিবে তায়
যে ভারত সত্যযুগে সভ্যতা আলোকে,
প্রধান প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েছিল লোকে।
সে ভারতে জ্ঞান সূর্য অস্তমিত এবে,
মোহ অন্ধকারে অন্ধ হইয়াছে সবে।
ন্যায় পথ ভ্রান্ত হয়ে বিপথেতে যায়
সর্বদা পতিত হয় চক্ষুহীন প্রায়।
বিদ্যাহীন, বলহীন, ধনহীন সবে,
পেয়েছে দরিদ্র, মূর্খ ভীরু নাম এবে।

ম্লেচ্ছ বলি অতি তুচ্ছ করিত যাদের,
এখন দাসের দাস হয়েছে তাদের।
শারীরিক মানসিক শক্তিতে উন্নত,
হয়েছিল এক দিন শ্যামলা ভারত।
এবে তার বিপরীত হ'ল সমুদয়,
সুপথ ছাড়িয়া নর কুপথেতে যায়।
ক্ষণিক সুখের হ'ল প্রয়াসী সবাই,
বিষম বিলাসে মগ্ন কি বলিব ভাই।
আতর গোলাপ মাখা সুসজ্জিত বেশ,
কুন্তলেতে "কুন্তলীন" সুগন্ধি সরেশ।
কেহ আলবর্ট তোলে বিবিয়ানা সাজ,
কারো খোলে পৃষ্ঠে বেণী ফণী পায় লাজ।
কি পুরুষ কিবা নারী সবাই সমান,
হিতাহিত বিবেচনা কিছু নাই জ্ঞান।
গুরুজনে নাহি মানে নাহি করে সেবা,
শ্বশুর শাশুড়ী পিতা মাতা তারা কেবা।
যে দেশেতে পিতৃভক্ত রাম জনমিল,
পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থে অরণ্যে যাইল।
এখন তেমন পিতৃ ভক্ত ছেলে কোথা,
পুত্রের আদেশ পালে বৃদ্ধ পিতা মাতা।
আদর্শ লক্ষ্মণ ভাই জন্মিল যথায়,
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই সদাই তথায়।
কি বলিব কলিকালে সব বিপরীত,
নীচ পেল উচ্চ মান, উচ্চ হ'ল নত।
পূর্বকালে শাশুড়ীরা বৌকে দিত জ্বালা,
শাশুড়ী জ্বালায় এবে কলিকালের বালা।
ননদী—বাঘিনী আখ্যা পূর্বে ছিল যার,
(এবে) বিড়ালরূপে খাচ্চে ছেঁচা দেখ দশা তার
শাশুড়ী রন্ধন করে ননদিনী দাসী,
কাজেতে কসুর হলে গলে দিবে ফাঁসি।
শ্বশুর সরকার, স্বামী যেন পোষা মেষ,
নম্র ভাবে পালেন সদা পত্নীর আদেশ।
পত্নীসেবা কলিকালে পতি সেবায় ছাই,
বৃদ্ধ পিতা মাতা হ'ল আপদ বালাই।
পতি সেবা পূর্বে ছিল নারীর করম,
পতিপদ পূজা ছিল পরম ধরম।
পতিব্রতা আখ্যা পূর্বে ছিল নারীদের,
পত্নীব্রতা আখ্যা এবে হ'ল পুরুষের।
রমণী হলেন রানী কলির সিংহাসনে,

কোটালী করেন কৃষ্ণ কলির বৃন্দাবনে।
ধন্য ধন্য কলিকাল মহিমা তোমার,
রত্নগর্ভে কাঁচ ফলে কত কব আর।
রত্ন গর্ভা ভারত ভূমি রত্ন প্রসবিনী,
কোথায় সে সব রত্ন তোমার জননী।

বিধুমুখী রায়

ফুরালো

বিজলি ঝকিছে ঘন নিঝুম শর্বরী।
মিলি কোটী মেঘবিন্দু বরষিছে মহাসিন্ধু,
প্রলয়-প্রবাহে সারা বিশ্ব গেছে ভরি,
ঝরিছে অসংখ্য বজ্র, বজ্র তদুপরি।

অতিক্রমি জনহীন ভীষণ প্রান্তরে
সন্দেহ-সন্ত্রস্ত আশে, ছুটিয়াছে উর্দ্ধশ্বাসে
যুবা এক, প্রিয়তমা মৃত্যুর বাসরে,
অবসন্না হয়ে যথা, একাকিনী ঘরে।

ঔষধি লইয়া গৃহে প্রবেশি যুবক,
দেখিল সকলি স্তব্ধ, নাহি সাড়া নাহি শব্দ ;
প্রদীপের সাথে তার প্রাণের আলোক
নিভিয়াছে, বুঝি হায় রাখি দুঃখ শোক !

সভয়ে প্রদীপ জ্বালি দেখিল সে হায়,
রুদ্র মরণের করে, সমর্পিয়া আপনারে,
প্রাণের সঙ্গিনী তার অনন্ত নিদ্রায়,
অবশ শিথিল অঙ্গ লুণ্ঠিত শয্যায় !

শিরে হাত দিয়া যুবা পড়িল বসিয়া,
দেখিল না জানিল না, কিছুই সে বুঝিল না,
কেমনে প্রবেশি মৃত্যু, কোন পথ দিয়া
পলাইল, হৃদয়ের সার রত্ন নিয়া !

নিরুদ্ধ নিশ্বাস তার, অশ্রু নাহি ঝরে,
হৃদয় ফাটিয়া হায় প্রাণ বাহিরিতে চায়,
পাষাণ চাপায়ে যেন কে রেখেছে ধরে,
ভীষণ অনলকুণ্ড জ্বলিছে অন্তরে !

কতক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া নীরবে,
ঘোর উন্মত্তের প্রায়, মর্ম্মঘাতী যাতনায়,
কাঁদিয়া উঠিল যুবা হাহাকার রবে,
আলিঙ্গি' কঙ্কাল-সার দুঃখিনীর শবে।

নিশীথ আঁধার ভেদি সে গভীর স্বর
কাননের পথ দিয়া লোকালয়ে প্রবেশিয়া
আতঙ্কে কাঁপাল শত ঘুমন্ত অন্তর,
শোকোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হ'ল নগর প্রান্তর।

প্রকৃতিস্থ হ'ল যুবা কাঁদি কিছুক্ষণ ;
কত অশ্রু, কত হাসি, কত আকাঙ্ক্ষার রাশি
বিচ্ছেদের ব্যথা কত, প্রেম-আলিঙ্গন,
স্বচ্ছস্মৃতিপটে আসি দিল দরশন।

কত সাধ ছিল তার অতৃপ্ত হৃদয়ে,
ব্যাধি ক্লেশ অবসানে, আবার নূতন প্রাণে,
সংসারের মহাভার নিজ স্কন্ধে ল'য়ে
চলিবে প্রফুল্লমনে দুঃখ তাপ স'য়ে।

ব্যাধি-ক্লিষ্ট-কলেবরে, ডাকিয়া নিকটে,
বলেছিলা একদিন "শুনিয়াছি 'কুন্তলীন'
ব্যবহারে সর্ব্বাঙ্গের মলিনতা টুটে,
নবীন সৌন্দর্য নাকি উছলিয়া উঠে।

"রক্ষা যদি পাই কভু বাসনা এ মম
স্নিগ্ধ 'কুন্তলীন' দিয়া রুক্ষকেশ সুশোভিয়া,
করিব বিশুষ্ক শিরে নব কেশোদাম,
ধরিবে মলিন দেহ শোভা মনোরম।"

আর দিন বলেছিলা ভাসি অশ্রুজলে,
"মরি তাতে দুঃখ নাই, যদিগো মরিতে পাই,
তপ্তপ্রাণ রাখি ওই চরণের তলে,
অশান্ত হৃদয় রাখি শান্তিময় কোলে।"

আরো শত স্মৃতি আজ ভুজঙ্গের প্রায়,
বিস্মৃতির বাধা টুটি, স্মরণে গর্জ্জিয়া উঠি,
বিস্তারি অযুত ফণা দংশে অভাগায়,
রুদ্ধ যাতনায় প্রাণ ফেটে বুঝি যায়।

সহসা উঠিল যুবা মুছি অশ্রুধার,
'কুন্তলীন' লয়ে স্নেহে, অভাগীর সর্বদেহে,
মাখাইয়া প্রেমভরে, পুরাইল তার
জীবনের সাধ হায় মৃত্যুর মাঝার।

অঙ্কেতে উঠায়ে পরে প্রিয়ারে যতনে
হৃদয়ে চাপিয়া ধরি, দিলা তার গণ্ডভরি,
শোকের অশ্রুতে আর প্রেমের চুম্বনে ;—
সংজ্ঞাহীন হয়ে যুবা পড়িল বিজনে।

কতক্ষণ পরে পুনঃ অর্দ্ধচেতনায়,
দৃঢ় আলিঙ্গন খুলি' স্কন্ধে শব লয়ে তুলি',
সতীদেহ স্কন্ধে মত্ত মহেশ্বর প্রায়,
সঘনে ছুটিলা যুবা শ্মশান যথায়।

জ্বলিয়া উঠিল চিতা চৌদিক উজলি
দেখিতে দেখিতে হায়, সব ভস্ম হয়ে যায়—
তারি সাথে আশা সাধ ফুরাল সকলি,
ভস্মশেষ মাখি যুবা কোথা গেল চলি।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

কুন্তলীন

নবরঙ্গে নববঙ্গে কামিনী কুন্তলে,
ফেলিয়া সুরভিশত আদর তোমার।
'সৌদামিনী' 'সরলার' শ্রীকরকমলে,
হতমান ল্যাভেণ্ডাব কাঁদে ম্যাকেসার।

'উর্বশী-বিলাস', আর চাহেনা রঙ্গিনী,
'যোজন গন্ধার' গন্ধে অন্ধ নহে প্রাণ।
জবা বেলি মতিয়ায় ভুলে না ভামিনী,
'বসন্ত গোলাপি' পানে নাহি আর টান।

বিরলে বিনোদিবালা, সম্মুখে দর্পণ,
কাহারে আদরে বসি এলাইয়া চুল ?
দাঁড়ায়ে নাগর পাছে নিশ্চল নয়ন—
আপনা ভুলিয়া গেছে সৌরভে আকুল।

মানিনী মৌনিনী হাসে, বিষাদ মলিন,
পাগল করিল বঙ্গ ধন্য কুন্তলীন।

রসিকচন্দ্র বসু

অভিমানিনী

যুবা। প্রিয়তমে, আনমনে বাতায়নে বসি
পূর্ণশশী, হেরিছ কি আকাশের শশী?
খেলিছে চাঁদের আলো ঊর্মিল কুন্তলে,
মিশেছে স্বর্গের আলো ও কপোল তলে!
এস সখি, চোখ'চোখি জাগি সারানিশি—
স্বরগে মরতে যাক্ হয়ে মেশামেশি।

বালা। কেন কাছে এসে মিছে করিছ আকুল?
যখন তখন দেখ প্রতিমা অতুল।
কথায় আনিয়া দাও স্বরগের ফুল,
ভুলিব না মনে করি, হ'য়ে যায় ভুল!
বুঝেছি বুঝেছি সখা তব ভালবাসা
তোমার হৃদয়ে স্থান দুরাশা দুরাশা।

যুবা। দুরাশা!—
আশার আগেতে তব সাধ পূর্ণ সখি,
ভালবাসি—পরীক্ষার অপেক্ষা না রাখি।
প্রাণ মন দেহ সখি দিয়াছি সকলি,
আপনি যাচিয়া দিনু, তবু বল ছলি!

বালা। সকলি দিয়াছ যদি সাধিয়া যাচিয়া
আমি যা' যাচিনু তাহা রহিল পড়িয়া!
হীনমতি জানাইল সামান্য বাসনা,
কই নাথ পুরাইলে তাহার প্রার্থনা?
বাহিরের দু একটি ক্ষণস্থায়ী সাধ
তাও সখা মিটালে না, এত অপরাধ?
তবে কেন কাছে এসে করিছ আকুল
অবলা বালিকা সদা হয়ে যায় ভুল!

যুবা। কি প্রার্থনা প্রিয়তমে বল শুনি ফিরে,
পুরাইব সাধ তব জানিও অচিরে?

বালা। জান নাকি বলিতেছি কত দিন ধরে
এক শিশি 'কুন্তলীন' কেশ-তৈল তরে
শুনিয়াছি বড় নাকি সুন্দর সুবাস
কই বল পুরাইলে এই অভিলাষ ?

যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কামিনী কুন্তল

(১)

মানবজাতির শোভা করিতে বর্দ্ধন,
নর নারী কলেবরে,
লাবণ্য-বিধান তরে
যে কিছু ভূষণ বিধি করেছে অর্পণ,
কুন্তল সে সর্বশ্রেষ্ঠ মস্তক ভূষণ !

(২)

সভ্য জগতের নরনারী সমুদয়
দেশ ভেদে রুচি ভেদে,
মাতিয়া উৎসবামোদে,
সে কুন্তল শোভা বৃদ্ধি করিবার তরে—
বিনাইয়া বেণী, সাজে নানা উপহারে।

(৩)

কোন দেশে দীর্ঘ বেণী পৃষ্ঠে লম্বমান !
পুষ্পগুচ্ছ শিরোপরে,
সুগন্ধ বিস্তার করে,
কোন দেশে কুন্তলের খোঁপা সুশোভন !
চিরুণী জড়িত স্বর্ণ-পুষ্প-আভরণ !

(৪)

বকুল, মালতী, যুঁতি, বেলী, গন্ধরাজ !
কোন রামা সমাদরে,
কবরী উপরে পরে,
কোন দেশে বামাকুল, বলাকা-পালক
সযতনে পরে শিরে ভূষিতে অলক।

(৫)

যে দশে যে প্রথা, কিন্তু স্বদেশে বিদেশে,
কুন্তলের মহাযত্ন, অশেষ বিশেষে ।
গন্ধ-তৈল মেথী, শোঁদা,
টগর গোলাপ গাঁদা,
পরে যত্নে নারীকুল ; পুরুষ হরষে—
কাটে টেরী, আলবার্ট মনের আবেশে ।

(৬)

রক্ষিতে বর্দ্ধিতে সেই শির-আভরণ
"কুন্তলীন" নাম ধরি
মন-প্রাণ-মুগ্ধ-করি
সুবাসিত কেশ-তৈল হয়েছে প্রচার ।
পরীক্ষিয়া দেখ তার শক্তি চমৎকার ।

(৭)

পমেটাম ম্যাকেসার বিদেশীয় তেলে ।
বহু অর্থ ব্যয় হয় কি সুফলে ফলে ?
অল্পকালে "কুন্তলীন"
চর্মরোগ করে লীন,
কেশ গুচ্ছ প্রবর্দ্ধিত হয় দীর্ঘকালে,
তেঁই কুন্তলীনাদর মহিলা মহলে ।

(৮)

"কুন্তলীন" কুন্তলের সর্বোৎকৃষ্ট তৈল"
মৃদুল বাতাস ভরে,
সুগন্ধ বিস্তার করে.
মস্তক শীতল রাখে করিলে মর্দন
রমণীর কেশ-শোভা করে সম্পাদন ।

(৯)

শিশু, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী বঙ্গবাসী,
সকলেই কুন্তলের মঙ্গল প্রয়াসী,
যদি অসুখের তরে,

সে কেশ ঝরিয়া পড়ে,
"কুন্তলীন" কিছুদিন করিলে মর্দন—
সুন্দর নূতন কেশে হয় সুশোভন ॥

(১০)

এত গুণ ধরি এই অত্যাশ্চর্য্য তৈল,
সুন্দর শিশির মাঝে,
ইসদ্ গোলাপী সাজে,
বিবাজিছে, বঙ্গবামা তোমার লাগিযা,
দেখিবে কি একবার কুন্তলে মাখিয়া ॥

শশিভূষণ মজুমদার।

বঙ্গবালা

কে তুমি গো, বসে আছ ছড়ায়ে কুন্তলরাজি ?
প্রাণ মন হরিতেছ, মোহন ভূষণে সাজি ?

আকাশে নির্মল চাঁদে ঢাকে যেন মেঘ এসে,
তেমতি ও মুখ শশী, ঢেকেছে উন্মুক্ত কেশে।

পবন আনন্দ ভবে তব কেশে ক্রীড়া করে,
উড়ায়ে দিলেও তুমি গুছাও কোমল করে।

এমন সুন্দর চুল, কোথায় পাইলে বল ?
বুঝিয়াছি, মাখ তুমি 'কুন্তলীন' কেশ-তৈল।

ছিলে বুঝি কেশ-হীন, মেখে এবে কুন্তলীন,
তোমার অলক জাল বিস্তারিছে দিন দিন।

শুধু কি রূপের তরে কুন্তলীন সিক্ত করে,
বিনায়ে বিনায়ে বেণী বেঁধেছ যতন করে ?

শুনেছি আর্য্যের নারী এ-বেশ মস্তকে ধরি,
স্বদেশ রক্ষার তরে দিয়েছে কর্তন করি।

পারিবে কি হেন কাজ সাধিতে লো বঙ্গবালা ?

পার যদি—'কুন্তলীন' আরো মাখ সুকুন্তলা।

সুরমাসুন্দরী ঘোষ

দম্পতি

কুসুম কোমল দেহ অনুপম রূপ,
কিশোরী রমণী এক বসি জানালায় ;
শান্ত নৈশ সমীরণ পরশ লোলুপ
ধীরে অঙ্গ পরশিয়া কুন্তল দোলায় !
লীলা প্রিয় পতি তার অতি সঙ্গোপনে,
ধীরে অলক্ষিতে আসি পশ্চাতে তাহার,
নয়ন বুজিয়া ধরি ক্ষিপ্র হস্তার্পণে,
"কে আমি ?" বলিয়া করে রহস্য অপার
অলক সরায়ে ধীরে পশ্চাতে চাহিয়া
কিশোরী প্রফুল্ল আঁখি প্রিয় দরশনে ;
তিলেক বিমুগ্ধ দোঁহে উভে নিরখিয়া
মধুময় ধরাধাম শুভ সম্মিলনে।
সুনীল গগনতলে উদি শশধর,
ধরণীর চারু অঙ্গে কৌমুদী ছড়ায় ;
বাতায়নে দম্পতির প্রফুল্ল অন্তর,
ফলিত হয়েছে যেন প্রকৃতির গায় !
সিন্দুর অঙ্কিত চারু ললাট আবরি
বিলম্বিত কেশপাশ করি উন্মোচন,
তরুণী ভার্যার শির 'অঙ্ক' পরে ধরি
কহিল যুবক-ধীরে বিস্মিত নয়ন—
"নারী মাঝে তুমি শ্রেষ্ঠা সুকেশী সুন্দরী,
ঘন কৃষ্ণ পৃষ্ঠ-ব্যাপী কুন্তল সম্ভার
ঋষি মনো মুগ্ধকারী আহা বলিহারি
বিদ্যাধরী বলে ভ্রম জন্মায় আমার।
কেমনে বল না প্রিয়ে, এমন চিক্কণ
লভিয়াছ কেশ-দাম সুদীর্ঘ সরল ?
লজ্জা-নম্র মুখ তুলি কিশোরী তখন
কহিলা "তৈলের গুণে সিদ্ধ এ সকল !
তৈলান্তর পরিহরি, সদা 'কুন্তলীন'
সযতনে মস্তকেতে করি ব্যবহার
লভিয়াছি তাই কেশ, নয়ন রঞ্জন,
এমন উত্তম তৈল নাহি বুঝি আর।
ইহার অশেষ গুণ, আশ্চর্য প্রভাব ;

অন্য কেশ-তৈল নহে যোগ্য তুলনার,
তাই আজ ঘরে ঘরে এর আবির্ভাব ;
সার্থক যতন যার হেন আবিষ্কার।”

রাজমোহন সেন

নব আবিষ্কার

নব আবিষ্কার কত হতেছে নিয়ত,
বিজ্ঞান সাহায্যে আর মস্তিষ্কের বলে।
নিত্য ব্যবহার তরে আছে দ্রব্য যত
তার মধ্যে ‘কুন্তলীন’ বিচিত্র ভূতলে।

কুন্তলীন নামে তৈল অতি পরিপাটি !
সুবর্ণে, সুগন্ধে অন্য সর্ব তৈল জিনে,
কিছুতেই এই তৈলে নাহি দেখি ত্রুটি।
অতুল আনন্দ হয় মস্তকে লেপনে।

নন্দনকাননজাত পারিজাত চয়,
নিষ্পেষিয়া তৈল কেহ করিলে বাহির।
কুন্তলীন সমতুল্য তথাপি না হয়,
কোথা পাবে স্বর্ণবর্ণ, গন্ধ মৃদু ধীর !

কামিনীর কমনীয় সুকেশ কলাপ
অপূর্ব সৌন্দর্য পায় কুন্তলীন মাখি,
একবার এর সহ কবিলে আলাপ
ইহাই মাখিতে হবে সর্ব তৈল রাখি।

কুন্তলীন নহে শুধু বিলাস সাধক,
শুধু বিলাসীর তরে হয়নি সৃজন।
শির স্নিগ্ধকারী আর কেশের পোষক
কুন্তলীনে সকলের নিত্য প্রয়োজন।

অন্য তৈলে কুন্তলীনে অনেক প্রভেদ,
গগণের তারাদলে শশাঙ্কে যেমন।
অন্য তৈলে বস্ত্রে গন্ধ শিরে হয় ক্লেদ,
পদ্মগন্ধ হয় করি এ তৈল ম্রক্ষণ।

‘কুসুমিত কুন্তলীন’ স্বর্গেও দুর্লভ ;

সদ্য স্ফুট পুষ্পগন্ধে করে আমোদিত।
গুণ তুলনায় মূল্য অত্যন্ত সুলভে,
দেব দেবী মাখিলেও হবে আনন্দিত।

অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সই

(১)

ওমা ওমা দেখ্‌বে এস আস্‌তেছে কে ওই!
আধ-ফোটা সে ফুলের মত, মুখটি টিপে হাস্‌চে কত,
শরীর জুড়ে রূপের-আলো ক'চ্চে থই থই!
দেখবে এস মা জননী আস্‌চে আমার সই!

(২)

অবাক হবে দেখলে মাগো স'য়ের সু-বরণ!
গোলাপ-রঙ্গে ননীর-পুতুল, আ'মরে যাই শোভায় অতুল,
দুলছে, পাছে চুলের-রাশি নিবিড় সুচিকণ।
টুক্‌-টুকে মুখখানি তাতে ঢল্‌-ঢ'লে নয়ন!

(৩)

বাহির হ'য়ে বারেক চেয়ে দেখ মা আমার
"ঝাঁকড়া-চুলি" "সুটো"-মেয়ে, ব'লতে যারে, এখন চেয়ে,
দেখ্‌বে এস রূপের-ঝলা কেমন ওগো তার!
"থাক-থোক" গড়ন-খানি লোটায় চুলের-ভার!

(৪)

অঙ্গ-ফুটে বরণ-আভা ছুট্‌ছে যেন ধেয়ে!
প্রাণ জুড়ান কোমল অতি, চক্ষু দুটী দিচ্চে জ্যোতি,
নাম্‌লো যেন মর্ত-লোকে স্বর্গবাসী মেয়ে!
পায়ি পড়ি ওমা তুমি এক্‌বার দেখ চেয়ে!

(৫)

সত্য করে আজকে সই বল দেখে আমায়,

কোন দেবতার বরে এমন,　　　পেলি ও রূপ ভুবন-মোহন,
মন-মাতান প্রাণ-ভুলান সুবাস ব'হে যায়।
আনিস্ বুঝি "কুন্তলীন" মাখিস্ বুঝি গায় ?

নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায

কুন্তলীন কবিতা

আহা! কি সুন্দর গন্ধ কুন্তলীন তেলে।
প্রফুল্লিত করে মন তার গন্ধ পেলে॥
যেখানেতে কুন্তলীন হয় ব্যবহার।
সেখানের গন্ধ ভাই বড় চমৎকার॥
কি সুন্দর অপরূপ দেখিতে বোতল।
প্রাণ মন আকুলিত করে যে কেবল॥
যেমন ধনের মধ্যে বিদ্যা মহা ধন।
তেমনি তেলের মধ্যে কুন্তলীন হন॥
আমরা ত দেখিয়াছি শত শত তেল।
এ তেলের মত কিন্তু দেখিনা ত তেল॥
রূপেতে যেমন তেল গুণেতে তেমন।
ইহার গুণের কথা ঘোষে সর্বজন॥
যে করেছে এই তেল মস্তকে ধাবণ।
সে জানে ইহার গুণ এ তেল কেমন॥
এ তেল মর্দনে যায় মস্তকের রোগ।
এ তেল মর্দনে মন করে সুখ ভোগ॥
এ তেলের গুণ মোরা প্রকাশি কি বলে।
এমন সুগন্ধি তেল দেখি না ভূতলে॥
এই তেল কবেছেন যিনি আবিষ্কার।
ধন্য ধন্য ধন্য বলি বুদ্ধি ত তাঁহাব॥
অনেকে অনেক তেল করিতেছে ভাই।
এ তেলের মত কিন্তু কেহ পারে নাই॥
এ তেল করেতে যেবা কবে একবার।
সে ইহারে করে নিতে চায় বারে বার॥
ছোট বড় যুবা বৃদ্ধ সকলে সমান।
সকলেই সম ভাবে কুন্তলীন চান্॥
মহিলা কুলের কথা কি কহিব আমি।
প্রিয় বস্তু হয় ইহা তাঁহাদের জানি॥
ভূপতি বাবুর পত্নী লিখেছেন তার।
'আপনার কুন্তলীন বড় পরিষ্কার॥
মহাশয় কুন্তলীন করে আবিষ্কার।

মহিলা কুলের করিলেন উপকার ॥'
প্রেসিডেন্সি কলেজের পি কে মহাশয়।
তাঁর পত্নী কুন্তলীনে বড় প্রীত হয় ॥
বারিষ্টার পি সি সেন, তাঁর পত্নী কহে।
'বিলাতী জিনিষ চেয়ে কিছু ন্যূন নহে ॥'
শ্রীযুক্তা সরলা দেবী বি এ মহাশয়া।
বলেন 'হালকা তৈল' পরীক্ষা করিয়া ॥
শ্রীযুক্ত বি এল গুপ্ত জজ মহাশয়।
'বড় পরিষ্কার তেল' তাঁর পত্নী কয় ॥
এই মত শত জনে লিখেন সুখ্যাতি।
প্রকাশি তাঁদের নাম নাহিক শকতি ॥
হে প্রভু করুণাসিন্ধু অখিলের পতি।
তুমিহে করুণা কর বসুর প্রতি ॥

নিকুঞ্জকামিনী দেবী

দ্বিতীয় বৎসর

পূজার চিঠি

ভাগলপুর
৬ই অক্টোবর, ১৮৯৬

প্রাণাধিক,

কালরাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যেন আমি খোকাকে লইয়া জানালায় বসিয়াছি, ঝি আসিয়া তোমার চিঠি দিয়া গেল। চিঠি খুলিয়া পড়িবার আগেই কিন্তু ঘুম ভাঙ্গিল। মনটা ভারি বিষণ্ণ হইল ; আহা, যাহা স্বপ্ন দেখিলাম, তাহা যদি সত্য হইত। অথচ এই সেদিন তোমার চিঠি পাইয়াছি, এত শীঘ্র আবার চিঠি আসিবার কিছু কথা নহে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই মিটে না যে বলে তাহা কিন্তু যথার্থ। স্বপ্নটা মনে বড় বেদনা দিতে লাগিল। বাল্যকালে একটি কবিতা পড়িয়াছিলাম, তাহার কথাগুলি মনে নাই, ভাবটা এই যে, যে ব্যক্তি স্বপ্নে সুখী হয়, সে জাগে কাঁদিবার জন্য,—তাহার পর বিদ্যুতের সঙ্গে একটা তুলনা দেওয়া ছিল, সেটা আমি বিলকুল ভুলিয়া গিয়াছি। আমার স্মরণশক্তির যা তেজ তাহা তোমার কাছে অবিদিত নাই—তুমি অল্প দুঃখে আমাকে লেখাপড়া শিখান হইতে বিরত হও নাই। যাহা হউক, তখন, তিনটা বাজিয়াছে, খোকাকে উঠাইয়া দুধ খাওয়াইলাম, দুধ খাইয়া খোকা ঘুমাইতে লাগিল। একটা কথা আছে, কোন স্বপ্ন দেখিয়া ঘুম ভাঙ্গিলে বাকি রাতটুকু যদি আর ঘুমান না যায় তবে সে স্বপ্ন সফল হইতে পারে ; সুতরাং আর ঘুমাইব না স্থির করিলাম। কি করি ? মনে করিলাম, একখানা বইটই লইয়া পড়ি ; তাহার পর মনে হইল, যদিও না ঘুম পাইত, বই হাতে করিলে ত জাগিয়া থাকা একেবারেই অসম্ভব হইবে। এই ভাবিয়া তোমার কতকগুলি চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে বসিলাম।

এগুলি এবার তোমাব গ্রীষ্মের ছুটির পর কলিকাতায় গিয়া লিখা। এক একখানি করিয়া

চিঠি পড়িতে লাগিলাম, আর আমার অতীত দিনের কথাগুলি একে একে মনে উদয় হইতে লাগিল। এদিনের সঙ্গে সেদিনের কত প্রভেদ। আমি এখন যে অবস্থায় আছি, বোধ হয় প্রেমিক প্রেমিকার এই অবস্থাই সুখের। আজকাল আসিবে, ইহাতে বড়ই আনন্দ। যখন মিলন হয়, তখন কেমন করিয়া কোথা দিয়া যে দিন কাটিয়া যায়, কিছু বোঝা যায় না। তারপর বিরহের ক্রন্দন আরম্ভ হয়। তাহার পর যখন আবার পুনর্মিলনের দিন অত্যন্ত নিকটিয়া আসে, তখন বড় সুখ। সূর্য উঠিবার অনতিপূর্বে যেমন আকাশ বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত হইয়া উঠে, তেমনি এ সময়ও মনটাময় ছবি আঁকিয়া যায়। শুনিতে পাই, স্বর্গে চিরমিলন। তাহা কি তত সুখের ? আমি যদি বিশ্বকর্মা হইতাম (বিশ্বকর্মাই স্বর্গ গড়িয়াছিল, না কে ? কে জানে বাবু, রামায়ণ-টামায়ণ অত আমার মনে নেই) তবে এমন স্বর্গ গড়িতাম, যে প্রতি প্রেমিক প্রেমিকার মনে হইত, আমার হৃদয়নিধি আজি কালি ফিরিয়া আসিবেন। যাহা হউক, তোমার চিঠিগুলি পড়িতে লাগিলাম, আর আমি যত কাঁদিয়াছি, যত নিশ্বাস ফেলিয়াছি সব মনে পড়িতে লাগিল। তুমি যখন কাছে থাক, তখন মনে হয় ছাড়িয়া গেলে নাকি আবার বাঁচিয়া থাকা যায়। সেই তুমি বিদেশে চলিয়া যাও, অথচ বাঁচিয়া থাকি ; কিন্তু দগ্ধ হইয়া বাঁচিয়া থাকি। বাড়ীতে এত লোকজন, ছেলেপিলে, কিন্তু সব যেন খালি খালি বোধ হইত। সমস্ত জিনিষপত্র যাহা তুমি ব্যবহার করিতে, সমস্ত যেন তোমাকে স্মরণ করিয়া কাঁদে মনে হইত। ঐ চেয়ারে তুমি বসিয়া পড়িতে, তোমার চেয়ারখানিতে আমি গিয়া বসিয়া থাকিতাম। মনে মনে অনুভব করিতাম, আমি শ্রীমতী সুরবালা দেবী নহি ; আমি শ্রীযুক্ত অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ—প্রেসিডেন্সি কলেজে এম এ পাঠ করি, এবং সিটি কলেজে আইনের শ্রেণীতে হাজিরা লেখাইয়া অন্যের অলক্ষিতে পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়ি ; আপাততঃ ছুটিতে বাড়ি আসিয়াছি। এই মনে করিয়া "সুরি" "সুরি" করিয়া ডাকিতাম ; নিজেই "সুরি" সাজিয়া তাহার উত্তর দিতাম, কত কথা হইত, গল্প হইত, হাস্য পরিহাস হইত। খোকা যেই কাঁদিয়া উঠিত, আমি ছুটিয়া পালাইয়া গিয়া শয্যায় আরোহণ করিতাম। খোকাকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে তাহার মুখখানি দেখিতাম, ঠিক যেন ছোট তুমি ! মা বলেন, ছেলেবেলায় ঠিক তুমি খোকার মত ছিলে। খোকার পানে চাহিয়া চাহিয়া তবু অনেক পরিমাণে সান্ত্বনা পাইতাম। সকলে বলে, মা মেয়েকে বেশী ভালবাসিবে, কারণ সেই কোমল শিশুর মুখে তাহার প্রিয়তমের মধুমূর্ত্তির আভাস দেখা যায় ; এবং ঠিক এই কারণে বাপ মেয়েকে বেশী ভাল বাসিবে। খোকা যদি না হইত, তবে তোমার বিরহ কেমন করিয়া সহ্য করিতাম কে জানে।

আমার বিরহকালের দ্বিতীয় সঙ্গী ছিল ঐ ঘড়িটি। আমার এ শয়নকক্ষে খোকা ছাড়া ঐ একমাত্র সজীব পদার্থ। অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত : সমস্ত পৃথিবী নিস্তব্ধ, কিন্তু ও বেচারীর নিদ্রা নাই—টক্ টক্ টক্। ভাবিতাম, এ আমাদের কি না জানে ? কি না দেখিয়াছে ? সেই ফুলশয্যা-রাত্রে আমাকে কথা কহাইবার জন্য তোমার সাধাসাধি হইতে আরম্ভ করিয়া, সেই ৪ঠা আষাঢ় ভোররাত্রে তোমার বিদায় গ্রহণের দৃশ্য পর্যন্ত, সব কথারি এ সাক্ষী আছে। ইহাকে কত কথা বলি কিন্তু কোনও কথা কানে তুলে না, এই একটা এর ভারি দোষ। এ যদি আমার সুখে সুখী হয়, দুঃখে দুঃখী হয়, তাহা হইলে আর ভাবনা কি ? তুমি যখন আসিবে তখন ইহাকে বলিতাম, সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র বাজাইয়া দে, তারপর আ—স্তে আ—স্তে আ—স্তে চলিবি। দশটা হইতে এগারোটা আর বাজে না ! এগারোটা বাজিল ত আর বারটা বাজিতে চাহে না। চারিটা বাজিয়া গিয়াছে, তবু আর রাত্রি পোহায় না ? সময় চুরি করিতে তাহাকে বলি না। দিনের বেলায় খুব শীঘ্র শীঘ্র

চলিলেই ত হইল ! চব্বিশ ঘণ্টায় দিনমান ত ? সকাল ছয়টা হইতে রাত্রি দশটা অবধি এই ষোল ঘণ্টা, চারি পাঁচ ঘণ্টায় চলিয়া সমস্ত রাত্রে বাকী সময়টা পোষাইয়া নাওনা বাবু ! আর এখন ? এখন বলি, তোর কাঁটাগুলো বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরাইয়া ২৫শে আশ্বিনের সন্ধ্যা আনিয়া দে। তা সে শুনিবে না—সেই টক্ টক্ টক্ টক্—গা জ্বলে যায় ! একটু জোরে চল না মুখ্পোড়া। খেতে পাও না ? তুমি যে কেব্লা চাকরের বাপ হলে ! তুই তোকারি করিলে, গালি দিলে না শুন, তুমি বলিব. আপনি বলিয়া কথা কহিব ! হাতযোড় করিয়া, গলবস্ত্র হইয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে প্রস্তুত আছি—স্তব করিতেও আপত্তি নাই ! রবিবারে রবিবারে দম পায়, প্রত্যহ স্বহস্তে দুই বেলা দম দিব স্বীকার করিতেছি, এতেও সে শুনে না। কাঁটা দুটা ভাঙ্গিয়া ডায়েলে কালি ঢাকিয়া দিলে তবে রাগ যায়।

এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে চিঠি পড়িতে লাগিলাম। ক্রমে সকাল হইয়া গেল। তখন তুলিয়া রাখিয়া উঠিতে হইল। মনে হইতে লাগিল, আজ আমার চিঠি আসিবেই, কেহই রোধ করিতে পারিবে না। কতবার ভাবিলাম হে ঠাকুর, যদি স্বপ্ন দিলে, তবে আজ আমার একখানি চিঠি আনাইয়া দাও। অনেক কষ্টে বেলা দশটা অবধি কাটিল। সাড়ে দশটার মধ্যে চিঠি আসিবে। আমি তখন রান্না ঘরে ; উৎকণ্ঠায় ডালে দুই তিনবার নুন দিয়া ফেলিয়াছি, মাছগুলো ভাজিতে গিয়া একপিঠ পোড়াইয়া কালো করিয়া দিয়াছি, আনমনে জলের ঘটিটা ফেলিয়া দিয়া ঘরের মেঝেতে আথার পাথার খেলাইয়াছি। মা আসিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিয়া বকুনি ধরিলেন। আমি ছুটিয়া পথের ধারের জানালায় গিয়া বসিলাম ; বকুনি শুনিবার আমার অবসর কোথায় ? চিকের আড়াল হইতে দেখিতে লাগিলাম। কত লোকজন, গাড়ি ঘোড়া, খাবারওয়ালা, জুতো সেলাই বুরুষ, কনেস্টবল, ভিকারী, স্কুলের ছেলে, আপিসের বাবু যাইতেছে, আসিতেছে, কিন্তু ডাকওয়ালার দেখা নাই। রাস্তার যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে, এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে একটা লাল পাগড়ী দেখা গেল। বলিহারী, ইংরাজের কি বুদ্ধিরে ! ডাকওয়ালার মাথায় লাল পাগড়ি কেন ? না অনেক দূর হইতে অনেক লোকের মাঝে সে আসিতেছে দেখা যাইবে বলিয়া। ক্রমে সে নিকটে আসিল, হায় হায়, ডাকওয়ালা নহে, চাপরাশি ! চুলোয় যাউক ! ইংরাজ, যদি এতবুদ্ধি ধর,—তবে ডাকওয়ালা ছাড়া অন্য কাহাকেও লাল পাগড়ি পরিতে দাও কেন ? আইন করিয়া ইহা দমন করা উচিত। ব্যবস্থাপক সভার মাননীয় সভ্যগণ এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন না কেন ? তাঁহাদের কি স্ত্রী নাই ? তাঁহারা কি এমনি করিয়া প্রবাসী স্বামীর পত্রের প্রতীক্ষায় জানালায় বসিয়া থাকিয়া কখনও আমার মত নির্দয়ভাবে প্রতারিত হন নাই ? যাহা হউক ক্রমে ডাকওয়ালা আসিল। দরজায় চাকরের হস্তে "চিঁট্‌ঠি" এই শব্দ করিয়া চিঠিগুলি দিয়া গেল। আমি নিশ্বাস বন্ধ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। দুই তিন মিনিটের পর ঝি আসিয়া আমার হাতে লেফাফা দিল ; গোলাপী রঙ্গের সমচতুষ্কোণ খামখানি, তাহার উপরে তোমার হাতের গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—

শ্রীমতী সুরবালা দেবী

* * * * * *

জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমার জন্য কি আনিতে হইবে ? আমার জন্য আর কি আনিবে ভাই ? আমাদের কি আর এখন সখ্ করিবার বয়স আছে ? খোকাবাবুর জন্য ভাল দেখিয়া পোষাক লইয়া আসিও, পুতুল আনিও, দুই বাক্স বিস্কুট আনিও, আর যাহা যাহা ভাল দেখ

তাহাই আনিও। আর অধীনীর জন্য যদি নিতান্তই কিছু আনিতে হয়, তবে একখানি টিয়ে রঙের কাপড, তাহার জমিটা হইবে টিয়া পাখীর গায়ের মত সবুজ, পাড় হইবে ঠোঁটের মত লাল। এক বোতল কুন্তলীন আনিও—এবার পদ্মগন্ধ আনিও ; গোলাপ গন্ধ সুবাসিত অনেকবার মাখা হইয়াছে। খান দুই লেবুর সাবান, এক বাক্স ভাল সোপ, দুই জোড়া জুবিলি চুড়ি—সরুগুলি আনিবে, মোটাগুলি ভাল দেখিতে নয় ; এক শিশি কুন্তলীনওয়ালাদের এসেন্স দেলখোস্ ; সাদা, কালো, ছাই রঙের তিন বাণ্ডিল পশম, আর পার ত কোন ভাল দোকান হইতে একটি মাথায় পরিবার রূপার প্রজাপতি—এইগুলি আনিবে। অধিক আর কি লিখিব, আমাদের কি আর মানায় ? লোকে নিন্দা করিবে যে। মার জন্য একগাছি আসল রুদ্রাক্ষের মালা, বাবার জন্য একখানি মহানির্বাণতন্ত্র পুস্তক আনিবে। আর আনিবে শ্রীযুক্তবাবু অমলেন্দুকে ; অধিক টাকা না থাকে বরং আর কিছু আনিবার প্রয়োজন নাই : শেষের লিখিত এই ফরমাসটি আনিলেই চলিবে ; কারণ ইহার দাম এক আনা মাত্র। ইতি

তোমার—
সুরো, সুরু-বা সুরি।

রাধামণি দেবী

তৃতীয় বৎসর

বিধবা

১

অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা দান করিলে হিন্দুশাস্ত্র মতে মেয়ের পিতা মাতা গৌরীদানের ফল লাভ করেন বলিয়া, চারুশীলার মা বাপ অনেক অনুসন্ধানে বিষ্ণুপুরে চাটুযোদের মেজছেলে অনীলমাধবের সহিত শুভদিন দেখিয়া আট বৎসর বয়সে চারুর বিবাহ দিয়াছিলেন। অনীলের বয়স তখন চর্তুর্দশ মাত্র ; অনীলের পিতা অম্বিকা বাবুর কিছু জমিদারী ছিল, এবং তাহার মা কাত্যায়নী দেবীর সে বড় আদুরে ছেলে, এই দুটি অনিবার্য কারণে প্রথম বয়সে ছেলেটির লেখা পড়ার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ দেওয়া হয় নাই, এবং গ্রামের মাইনর স্কুল অপেক্ষা গ্রামপ্রান্তে জাম বাগানে অনীলকে মাসে মধ্যে অনেক দিন দেখা যাইত। লেখা পড়া, এমন কি অন্ন বস্ত্রের প্রতিও তাহাব যে পরিমাণে ঔদাসীন্য ছিল, পরের গাছের ফলে ও পরের মুখের গা'লে তাহার সেরূপ অরুচি দেখা যাইত না। এই সংসারবিরাগী, আপন খেয়ালে আপনি বিভোর, অরণ্যচর মানব শিশুটিকে পরিণয়-পাশে আবদ্ধ করিয়া ভবকারাগারে অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য তাহার স্ত্রৈণ পিতা ও মুগ্ধা জননীর এই প্রকার মহৎ উদ্যমের কি ফল ফলিবে তাহা কেহ অনুমান করিতে পারে নাই, কেবল বসন্তের এক সুমধুর মলয় মর্মরিত মনোহর প্রভাতে সর্বদর্শী কাল শানাইয়ের তীব্র করুণসুরে মৃত্যুভরা বিষাদ রাগিনীর মত একটি অনন্ত বিদায়ের ম্লান আভাস মৃদু সমীরণের সহিত বিশ্ব চরাচরে ব্যাপ্ত করিতেছিল।

লাল বেনারসী সাড়ী সমাবৃত অলঙ্কারবিমণ্ডিত আট বৎসরের সেই নোলকপরা বধূটি পাইয়া অনীলমাধবের কি বিপুল আনন্দ! উৎসাহে কয়েক দিনের জন্য সে গাছে চড়া ক্ষান্ত

ছিল, দেশের পক্ষী-শাবকেরা কিছুকালের জন্য আপনাদিগের অটল মাতৃস্নেহ-পূর্ণ ক্ষুদ্র স্নিগ্ধনীড়ে নিরাপদ হইল, এবং অনীলের বন্ধুবান্ধবগণ রাজ্যের সুপক্ক ও অপক্ক ফলের পরিবর্তে সন্দেশ রসগোল্লা প্রভৃতি বিবিধ সুস্বাদু মিষ্টান্নে আপনাদিগের বন্ধুত্ব ঘনীভূত করিয়া তুলিল। তাহাদের মনে হইতে লাগিল, অনীলমাধব যেন তাহাদের সেকালের রাজপুত্র, আর তাহারা কেহ মন্ত্রীপুত্র, কেহ সওদাগর পুত্র, কেহ বা কোতোয়ালের পুত্র ; কোন সোনার জাহাজে চড়িয়া সাগর পারের এক স্বপ্নময় দেশ হইতে যেন একটি সুন্দরী রাজকন্যাকে মধুময়ী বসন্তী নিশায় সুপ্তিঘোর হইতে জাগাইয়া, তাহাদের রাজপুত্রের সহিত বিবাহ দিয়া আনিয়াছে, এবং রাজকন্যার সঙ্গে যে রূপার কাটি ও সোনার কাটি ছিল, তাহাও তাহারা ফেলিয়া আসে নাই।

এই রূপার কাটি নববধূ চারুশীলার মিষ্টহাসি, আর সোনার কাটি তাহার সুমিষ্টতর অশ্রুধারা। মা বাপ ও ভাই বোনের কথা ভাবিয়া যখন তাহার মৃণালবিচ্ছিন্ন পদ্মের মত বিরহম্লান নত নেত্র দুটি হইতে অশ্রু গলিয়া পড়িত, তখন তাহা দুটি কনকধারা বলিয়াই মনে হইত।

২

পাঁচ বৎসর পরে গ্রামের স্কুলের লেখাপড়া শেষ করিয়া অনীল কলিকাতায় পড়িতে গেল। এখন সে সভ্য ভব্য নব্যযুবক, তাহার বাল্যকালের চাপল্য অন্তর্হিত হইয়াছে ; বিলাতী জুতা লেড্‌লর বাড়ীর সার্ট, সুবর্ণ চেন ও সুচারু টেরীশোভিত সেই নবযুবকটিকে দেখিয়া এখন একবার সন্দেহও হয়না, যে, সে কাঁচা পাকা ফল ও পক্ষীশাবকের সন্ধানে, পল্লীগ্রামের দুর্দান্ত ছেলেদের দলপতিরূপে, গাছে গাছে ঘুরিয়া নিরুদ্বেগ শৈশব অতিবাহিত করিয়াছে। চারুর ন[illegible]স্নেষিত প্রেম পুষ্পকেশরের চতুর্দিকে রক্তদল স্তবকের ন্যায় তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়াছে, এবং সেই প্রেমকুসুমের অরুণ আভায় তাহার তরুণ হৃদয় সুরঞ্জিত হইয়াছে।

কলিকাতায় আসিয়া অনীল প্রতি সপ্তাহে চারুকে দুই খানি করিয়া পত্র লিখিত, এবং উপর্য্যুপরি দুই দিন ছুটি পাইলেই সে "দারজিলিং মেলে" বাড়ী ছুটিয়া আসিত। কিন্তু অদৃষ্টের কি বিড়ম্বনা! চারুর প্রতি অনীলের এই স্বাভাবিক প্রেমাকর্ষণকে নিতান্ত অস্বাভাবিক নির্লজ্জতার চিহ্ন ভাবিয়া পল্লীরমণীগণ দত্তবাড়ীর মাধ্যাহ্নিক বৈঠকে এ বিষয়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিল, এবং পাড়ার "ফিমেল এসোসিয়েসনের প্রেসিডেন্ট্" শ্রীমতী রূপো ঠাকুরঝি অনেক নজীর উদ্ধৃত করিয়া অনীলের মাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ছেলেকে এখন হইতে বৌর সঙ্গে বেশী মিশিতে দিলে, ছেলে ক্রমে তাহার গোলাম হইয়া পড়িবে এবং অবশেষে বৌ শাশুড়ীর উপরও কর্ত্তৃত্ব করিতে ছাড়িবে না। সেই হইতে অনীলের মা সাবধান হইতে আরম্ভ করিয়াছেন, ছেলেকে অকারণে মধ্যে মধ্যে বাড়ী আসিতে দেখিলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন ; একদিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার স্বামীকে বলিলেন, "সে কালই ভালছিল, শ্বশুর শাশুড়ী বাঁচিয়া থাকিতে আমি কখন দিনের বেলা তোমার সম্মুখে আসিতেও সাহস করিতাম না, আর একালে বৌগুলো হয়েছে বিবি, দিন নেই, দুপুর নেই, সকল সময়ে একত্রে মুখোমুখী হ'য়ে ইয়ারকি করবে।" সে দিন অনীল বাড়ী ছিল, এবং হঠাৎ কথাটা তাহার কানে প্রবেশ করিয়াছিল, সে বুঝিল তাহাদেরই লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলা। মাতার উদার পুত্রস্নেহও স্বার্থনাশের আশঙ্কায় এমন সঙ্কুচিত হয় ভাবিয়া অনীল কিছু ক্ষুণ্ণ হইল, এবং তাহার সরল উদাসীন, মুক্তহৃদয়টিকে প্রেমরজ্জুদ্বারা

বন্ধন করিয়া, অবশেষে সেই বন্ধনপাশ লইয়া জননীর এই প্রকার হৃদয়হীন যথেচ্ছাচার তাহার নিকট একটা দুর্বোধ্য রহস্য বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল।

তাহার পর হইতে অনীল ক্রমে বাড়ী আসা বন্ধ করিল, অভিমান করিয়া পূজাব ছুটিতেও বাড়ী আসিল না, এবং পত্র লেখা একেবারে কমাইয়া দিল ; এদিকে শাশুড়ীর কটূক্তি ও ননদের ব্যাঙ্গোক্তিতে চারুকেও পত্রের সংখ্যা হ্রাস করিতে হইল, সে মাসের মধ্যে কদাচ একখানা লিখিত, কিন্তু তাহার প্রত্যেক ছত্রে এত অশ্রুমিশান ভালবাসা ঢালা থাকিত, যে অনীল সমস্ত অপরাহ্ন ধরিয়া জন-সঙ্কুল কলিকাতার রথচক্র-মুখরিত সুবৃহৎ রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী এক সমুন্নত অট্টালিকা-চূড়ায় বসিয়া সেই অশুদ্ধ-বর্ণ-বিন্যস্ত পত্রখানি পড়িয়া পড়িয়া মুখস্ত করিয়া ফেলিত, এবং কিছুতেই তাহার পরিতৃপ্তি হইত না ; অবশেষে শ্রান্ত ববি যখন পশ্চিম আকাশ বিচিত্র বর্ণে সুরঞ্জিত করিয়া পৃথিবীর প্রান্তে বিলুপ্ত হইতেন, ও পরিপুষ্ট শশধর আপনার সুবিমল সৌন্দর্যজ্যোতিতে ধরাতলে কুসুম-সুকোমল শুভ্রতা প্রস্ফুটিত করিয়া, মাধবের বক্ষঃবিলম্বিত শ্রেষ্ঠরত্নের ন্যায় পূর্বগগনে সমুদিত হইতেন, তখন সংসারের সকল সুখ ও শোভা, জগতের সমস্ত উচ্ছ্বসিত আনন্দ প্রীতি-কল্লোল অশরীরী আলোকবার্তাময়, অনাবিল, অচঞ্চল জ্যোতির্ময় রূপে অনীলের অনেক দিনের বিষাদান্ধকার মলিন দুঃসহ বিরহ-বেদনাব্যাপ্ত হৃদয়স্তরকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিত। দীর্ঘকালের অনাবৃষ্টির পর বর্ষার নব বারিবর্ষণে শুষ্কপ্রায় শীর্ণ ধান্য গুচ্ছ মুকলিত ও শ্যামল শীর্ষে কণ্টকিত হইয়া উর্দ্ধে যেমন আপনার ব্যগ্রবাহু উৎক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, তেমনি বহুদিনান্তে এক একখানি প্রেমের পত্র চারুর বিরহ-তাপ-বিশুষ্ক-হৃদয় কলিকাটি আশাবারি সিঞ্চনে মুকুলিত করিয়া তুলিত। সে তাহার বলয়বেষ্টিত মৃণাল-কোমল ক্ষীণ বাহুদুটি দ্বারা প্রিয়তমেব কণ্ঠবেষ্টনের ক্ষুধিত আকাঙ্ক্ষাটিকে হৃদয়ের মধ্যে নব নব ভাবে পোষণ করিয়া একদুই কবিয়া দিন গণিতে লাগিল।

৩

উভয়ের হৃদয়ের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা উভয়ে নিভৃত হৃদয়ের অন্তস্থলে সংগুপ্ত রাখিয়া এমনিভাবে তাহারা দূরে দূরে থাকিয়া কাল কাটাইতে লাগিল। শেষে কলিকাতায় অনীলের কঠিন পীড়া হইল, সংবাদ পাইয়া তাহার পিতা তাহাকে শীঘ্র বাড়ী আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন।

কলিকাতার মেসে শুশ্রূষার অভাব, তাহার উপর রোগের যন্ত্রণা, রোগক্লিষ্ট অবসন্ন দেহে অনীল বাডী আসিল ; কতদিন পরে চারুর সঙ্গে তাহার দেখা ! কত সময় তাহার মনে হইত, চারু যদি সমস্ত দিন তাহার শয্যাপ্রান্তে তাহার মাথার কাছে বসিয়া থাকে, তাহার কাছে বসিয়া যদি প্রেমপূর্ণ প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাহার কাতর মুখের দিকে সহানুভূতি-ভরে চাহিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই নয়নামৃত সিঞ্চনেই বুঝি সে শীঘ্র সারিয়া উঠিতে পারে, তাহার মানসিক প্রসন্নতা সমধিক বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু মরিলেও বুঝি অদৃষ্টে সে সুখ ঘটিয়া উঠিবে না ; সর্দ্দার খানসামা বলরাম এবং বুড়ী ঝি কৌশল্যা তাহার সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সেই কবিত্বশূন্য, আরাম-বিরহিত, আন্তরিকতাবর্জ্জিত নিয়মবদ্ধ শুশ্রূষার উৎপীড়নে অনীল একেবারে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, সে ভাবিত পক্ষীকে সোনার খাঁচায় পুরিয়া আদর করাও অনেকটা এই রকম। লোকে দেখে পক্ষীর সুখের, যত্নের, ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, কিন্তু অন্যে কেমন করিয়া জানিবে, যে তাহার আজন্মের আশ্রয়, তরুলতা-পূর্ণ

মারুতহিল্লোলিত বিমুক্ত বনস্থলীতে কত সুখ, কত শোভা, কত আনন্দ ! বলি শত মূর্খ সঙ্গে লইয়া স্বর্গে যাইতেও অসম্মত ছিলেন, তেমনি ইহাদের সেবায় আরোগ্য লাভও তাহার প্রার্থনীয় ছিল না। চারু কখন কখন দিনান্তে একবারমাত্র তাহার কাছে আসিতে পাইত ; স্বাধীনভাবে অসঙ্কোচে পীড়িত পতির সম্মুখে আসিবার তাহার অধিকার ছিল না, কারণ অনেকেই অনীলের এই রোগশয্যায় তাহার সহিত চারুর সাক্ষাৎ হওয়া নিষেধ করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ বহুদর্শী বিচক্ষণ কবিরাজ মহাশয় তাঁহার আয়ুর্ব্বেদ-সমুদ্র আলোড়নপূর্বক এই ব্যবস্থা-সুধা উদ্ধার করিয়াছিলেন, যে রুগ্নাবস্থায় শ্রীমানের নিকট বধূমাতা উপস্থিত থাকিলে সহসা তাহার চিত্তবিকারে প্রাবল্যশবতঃ বায়ু কুপিত হইবে সেই কুপিত বায়ুর আকুঞ্চন ও প্রসারণ জনিত প্রদাহে পিত্তের চঞ্চলতা বৃদ্ধি হইলেই কফের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী, এবং সেই কফ-পিত্ত-বায়ু এই ত্রিদোষাশ্রিত ধাতু মিশ্রিত ও একত্র হইয়া সুষুম্না ও ঈড়ার মধ্যবর্ত্তী যে নাড়ীতে সতেজে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চারিত করিবে, নিদানের মতে "সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা।"

কিন্তু এ সকল চিকিৎসাতত্ত্বে কর্ণপাত করিতে চারুশীলার কিছুমাত্র পরবৃত্তি ছিল না। সে বাতায়ন প্রান্ত হইতে গোপনে অতি দীন নয়নে তাহার রুগ্ন স্বামীর ম্লান মুখখানি অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত নিরীক্ষণ করিত। কতবার তাহার মনে হইত, উষাকালের অস্তগমনোন্মুখ চন্দ্রকলার পাণ্ডুর আভা তাঁহার যে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, অকালে সে মুখ হয়ত তাহার হৃদয়াকাশ হইতে চিরবিলুপ্ত হইবে, এবং প্রদীপ্ত দিবালোকের পরিরর্তে তামসী নিশীথিনীর অনন্ত অন্ধকার ভিন্ন ভবিষ্যতের জন্য তাহার আর কিছুই সম্বল রহিবে না।

অবশেষে অনীলের দিন যখন ফুরাইয়া আসিল, তখন চারু কোন বাধাবিঘ্ন না মানিয়া স্বামীর রোগ-শয্যা-প্রান্তে উপস্থিত হইল, এবং তাহার মুখখানি আপনার অবসন্ন, বিদীর্ণপ্রায় বুকে তুলিয়া লইয়া তাহা অশ্রুবিধৌত করিয়া মাটিতে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল। অনীল তাহার অন্তিমশ্বাস আকর্ষণপূর্বক বলিল, "আমার জীবনের সকল আশাই অপূর্ণ রহিল, আমি অতি হতভাগ্য।" তাহার নিষ্প্রভনেত্রের অশ্রুধারা গড়াইয়া উপাধান সিক্ত করিল, চারুর হৃদয় সেই অশ্রুপ্রবাহে ভাসিয়া গেল, তাহার মুখ হইতে একটাও সান্ত্বনার কথা বাহির হইল না, হতভাগিনী এখন আর কি বলিয়া প্রিয়তমকে সান্ত্বনা দান করিবে ? প্রথম যৌবনে কালের অমোঘ কুঠারে নির্মূলিত জীবনতরু পতনকালে তাহার আশ্রিতা আশালতাকে অবলম্বন করিয়া কোন কালে রক্ষা পাইয়াছে ? চারুর সমস্ত ভাষা তাহার বুকের মধ্যে বাষ্পময় হইয়া তাহার বক্ষঃস্থল স্পন্দিত করিতে লাগিল, তখন অনীল আবেগভরে তাহার বিশীর্ণ বিবর্ণ ওষ্ঠের মৃদু সংস্পর্শে চারুর উদ্বেগম্লান কোমল, বিকম্পিত পুষ্পপুট-তুল্য ওষ্ঠাধর সস্নেহে তেমনি করিয়া চুম্বন করিল, যেমন করিয়া বসন্ত শেষে বসন্তানিল নিশান্তে শিশিরসিক্ত প্রস্পন্দিত শিথিলবৃন্ত রজনীগন্ধার সুমন্দ স্নিগ্ধগন্ধটুকু এক নিশ্বাসে পান করিয়া ধরণীর ক্রোড় হইতে ধীরে ধীরে অপসৃত হয়।

অনীল চারুর হাতে তাহার ষ্টীলের 'ক্যাস্ বাক্সটা'র চাবি দিয়া বলিল, "আমি এতকাল বিদেশে শুধু আমার জীবন মরণের দেবতারই ধ্যান করিয়াছি, অন্তরের অন্তঃপুরে একচিত্তে গৃহ-লক্ষ্মীর আবাহন করিয়াছি, তাই বাহিরের দেবী সরস্বতী বিরাগভরে বাহিরেই বিরাজ করিয়াছেন। আজ আমার সর্বস্ব তোমাকে সমর্পণ করিলাম, ইহাই আমার অন্তিম স্মৃতিচিহ্ন।" ইহার পর চারুর সহিত অনীলের আর কোন কথা হয় নাই।

সেই পনের বৎসর বয়সে সংসারে সুখের মুখ দেখিতে না দেখিতে মন্দ ভাগিনী চারু বিধবা হইল। যে রাত্রি তাহার অনন্ত বিষাদান্ধকারে চারুর সুখ সৌভাগ্যভ্রষ্ট জীবন সমাচ্ছন্ন

করিল, সেই ঘোরা, মেঘাবৃতা অমা নিশীথিনীর আর কখন অবসান হইবে না। মরণের কোন্ অনির্দিষ্ট অদৃশ্য প্রান্তে, নন্দনের কোন্ মন্দার-গন্ধ-বন্দিত আনন্দ কল্লোলিত মন্দাকিনী কূলে, কত কালের দুঃসহ বিরহ অন্তে মিলনের মধুময় সুস্নিগ্ধ আলোকলেখা ফুটিয়া উঠিবে, এবং তাহার কোমল আভায় দেবদম্পতির ন্যায় প্রভান্বিত এই নরদম্পতি আপনাদের অলৌকিক প্রভাতী সঙ্গীতের প্রথম তানে, নবজীবনের মিলন গীতির সুললিত ঝঙ্কারে, সুরকাননে বিমল উষার বিকাশকাহিনী প্রকাশ করিবে, তাহা কবিকল্পনার অতীত।

৪

চারুর দুঃখের সীমা নাই। আহারের কষ্টকে সে কষ্ট বলিয়া মনে করিত না, আমোদ আহ্লাদেরও সে প্রত্যাশিনী ছিল না ; সে যাহাকে প্রাণাধিক ভালবাসিত, সে ত তাহাকে একাকিনী ফেলিয়া তাহার সকল সুখ ও আনন্দ, তাহার হাতের নোয়া, সিঁথির সিঁদুর, তাহার সোনার কঙ্কণ, সাধের কণ্ঠমালা সকলই সঙ্গে লইয়া চলিয়া গিয়াছে, সে শুধু এখন মরিয়া বাঁচিয়া আছে মাত্র। যেন সে তাহার মৃত স্বামীর শোকাশ্রুসিক্ত সজীব সমাধি। তাহার প্রশান্ত প্রসন্ন নির্মল হাসি অপসৃত হইয়াছে, তাহার সে আদর অভিমান কিছু নাই, শাখাভ্রষ্ট ধূলিম্লান সৌরভ গৌরব বিচ্যুত ক্ষুদ্র যূথিকা পুষ্পের ন্যায়, সজল জলদাবৃত নিষ্প্রভ চন্দ্রিকা তুল্য, ধূম্র পরিবৃত সুপবিত্র হোমানল সম এই ধৈর্য্যময়ী সহিষ্ণুতারূপিনীবিকারবিহীনা আশান্তরিতা বিধবার জীবন ও ঐ ক্ষুধিত আকাঙ্ক্ষাতাড়িত স্বার্থপর কঠোর সংসার এই উভয়ের মধ্যে একটা ছায়াময়, রহস্যময় লঘু আবরণ কি দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নির্মাণ কবিযা তুলিয়াছে। তাহার সকলই ফুরাইয়াছে, এখন তাহার

"মরিতে ঝরিতে শুধু বাকি।"

সকল কষ্ট সহ্য হয়, কিন্তু বিধবার পক্ষে কথার খোঁটা বড় মর্মান্তিক। স্বামী বিয়োগের পর হইতে চারু তাহার শাশুড়ীর দুই চক্ষের বিষ হইয়াছে, যেন চারুর সহিত বিবাহ হওয়াই অনীলের মৃত্যুর কারণ। যতদিন অনীল বাঁচিয়াছিল, অনীলের মা মনে করিতেন, বৌটা আমার ছেলেকে পর করিবে ; চারুর বাপ তেমন অবস্থাপন্ন লোক নহেন, আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি অর্থের অনটনবশতঃ সর্বদা তাঁহার প্রিয়তমা কন্যাটির তত্ত্ব তল্লাস লইতে পারিতেন না, কিন্তু এই অক্ষমতা-জনিত ত্রুটিকে চারুর শাশুড়ী স্বেচ্ছাকৃত উপেক্ষা বলিয়া মনে করিতেন, তাই বেয়াই ও বেয়াইনের উপর তাঁহার যত আক্রোশ সমস্ত তিনি তাঁহাদের এই নিরপরাধিনী নিরীহ কন্যাটির অসহায় মস্তকের উপর মুষলধারে বর্ষণ করিতেন। চারু বড় শান্ত মেয়ে, সহস্র অত্যাচার সহ্য করিয়া সে একটিও প্রতিবাদ কবিত না, ইহাতে গৃহিণীর কোপ আরও বর্দ্ধিত হইত, কারণ চারুর এই নিশ্চেষ্ট আত্মত্যাগ তাঁহার চক্ষে অবজ্ঞাপূর্ণ ধৃষ্টতা ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়াই প্রতিভাত হইত না। "বোবার শত্রু নাই" এই সর্বজনবিদিত প্রবাদটিকে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

অনীলের মৃত্যুর পর চারুর শাশুড়ী প্রায়ই বলিতেন, "ও তো বৌ নয়, রাক্ষসী, আমার ছেলেটিকে মারবার জন্যেই এসেছিল, তখনই কত্তাকে বলেছিলাম, আচার্য্যি ঠাকুর গুণে বলেছেন, এ মেয়ের রাক্ষস গণ, বিয়ে দিলে মঙ্গল হবে না, তা উনি বল্লেন আহা খাসা চাঁদপানা মুখ, অমন মুখে নুড়োর আগুন জ্বেলে দিতে হয়।"

এই প্রকার হৃদয়-বিদারক কঠিন মন্তব্যগুলা অনীলের মা যে সকল সময় বিশেষ সাবধান হইয়া এবং চারুর অসাক্ষাতে করিতেন তাহা নহে, বিধবা পুত্রবধূর হৃদয় বেদনার যে কিছুমাত্র তোয়াক্কা রাখা দরকার, তাহ কোন দিন তাহার মনে হয় নাই ; চারু মধ্যে মধ্যে শাশুড়ীর রসনেন্দ্রিয় সমুৎসারিত এই সকল অকারণ প্রযুক্ত কঠোর কথা শুনিয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নির্জ্জন ঘরে বসিয়া একাকী কাঁদিত ; কিন্তু হতভাগিনীর তাহাতেও নিস্তার নাই, তাহার ছোট ননদ রঙ্গিনী, এই উপাদেয় সত্যটি সংগ্রহপূর্ব্বক মায়ের কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিত, "মা, মা, সকলেই বলে, বৌ বড় ভাল, তুমি কি না কি কথা বলেছ তাই শুনে বৌ নাকের জলে চোখের জলে এক করেছে।"—"তা করুক গে, আমিত আর নুকিয়ে বলিনি, ভয় করেও বলিনি, নচ্ছার হাবাতে বেটী, এমনি ক'রে চোখের জল ফেলে ফেলে আমার সংসারে আবার কি একটা অমঙ্গল ডেকে আন্‌বে ; চোখের জল ফেল্‌তে হয়, রাস্তায় গিয়ে ফেলুক না, সম্বন্ধ ত ঘুচে গিয়াছে।" .

চারুর পিত্রালয় হইতে বিষ্ণুপুর মোটে তিন ক্রোশ ; চারুর কষ্টের কথা তাহার মায়ের কাছে গোপন রহিল না। তাহার মা লিখিলেন, "মা চারু, তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া আমি চোখে জল রাখিতে পারিতেছি না, আমার ইচ্ছা দিনকতক তোমাকে এখানে আনাইয়া একটু যত্ন করি। কত পাপই যে করেছিলাম, আমার দুধের মেয়ের এত যাতনার কথাও আমাকে শুনিতে হইতেছে।"—চারু অনেক ভাবিয়া লিখিল, "মা, আমার কষ্টের জন্য তুমি দুঃখিত হইও না, আমি কষ্ট সহিতে শিখিতেছি ; আমার শ্বশুর শাশুড়ী এখন আমাকে তোমাদের কাছে পাঠাইবেন না, তাঁহাদের অমতে যাওয়া উচিত নয়। এ কঠিন প্রাণ শীঘ্র বাহির হইবে না, সময়ান্তরে আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করিব, তুমি ছাড়া তোমার এ দুঃখিনী কন্যার কে আছে মা ?"

চারু গোপনে পত্রখানি মায়ের কাছে পাঠাইয়াছিল, কিন্তু সে পত্রের কথা কাহারো জানিতে বাকি থাকিল না। চারুর মা চারুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা পড়িয়া সে বালিশের নীচে গুঁজিয়া রাখিয়াছিল, কোন সুযোগে চারুর ছোট জা বিনোদিনী সে খানি লইয়া শাশুড়ীর হাতে দিল!—বিনোদিনী খুব সেয়ানা মেয়ে, এই তার মোটে তের বৎসর বয়স,—এরই মধ্যে বুদ্ধিবলে শাশুড়ীকে করতলগত করিয়াছে, শাশুড়ী বলেন, "আমার ছোট বৌমার মত সুবুদ্ধি মেয়ে এ কলিকালে আর দুটি দেখা যায় না।"

চারুর মার চিঠি দেখিয়া চারুর শাশুড়ী তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন ; মুখে যা আসিল তাহাই বলিয়া গালি দিলেন, অবশেষে বলিলেন, "যদি তুই ফের আমাদের "কুচ্ছো" ক'রে বাপের বাড়ী পত্র লিখ্‌বি তো ঝাঁটা মেরে তোকে অন্দরের বা'র করে দেব। হারামজাদীর পেটে পেটে নষ্টামী!"—চারু আত্মদোষ স্খালনের কোন চেষ্টা করিল না, শুধু অবনত মস্তকে নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিল। হায়! হতভাগিনীর এ অশ্রুউৎস কি রুদ্ধ হইবার নহে ?

৫

শ্রাবণ মাসের একদিন দুপুর বেলা চারু একাকিনী নিজের নির্জন ঘরটিতে বসিয়া বাতায়ন অন্তরালে আকাশের দিকে চাহিয়া আপনার অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতেছে। মেঘাবৃত আকাশের মত তাহার হৃদয়াকাশও বিষাদঘন সমাচ্ছন্ন ; কিন্তু আজ মেঘান্তরাল হইতে মধ্যে মধ্যে যেমন এক এক বার সৌরকররাশি দীপ্ত-দিবাকরের সকরুণ উদার হাস্যের মত সিক্ত-ধরণীর যৌবন-শ্রী বিকশিত নিটোল শ্যামাঙ্গে আপনার আলোক তুলিকা বুলাইয়া

আবার দিগন্তে মেঘান্তরালে অন্তর্হিত হইতেছে, তেমনি চারুর মনে আজ এই বর্ষণার্দ্র বর্ষার স্তব্ধমধ্যাহ্নে তাহার অশ্রু জবার মত নয়নপল্লবে অতীত মধুর স্মৃতির সুধালোকরশ্মি এক এক বার ফুটিয়া উঠিয়া আবার তখনি টুটিয়া যাইতেছে ; তাহাতে কি সুখ, কি বেদনা তাহা অন্যে বুঝিতে পারিবে না। অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া আজ কতদিন পরে চারু তাহার হাত বাক্সটি খুলিয়া তাঁহার স্বামীর ডাইরী খানির প্রত্যেক পৃষ্ঠা সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে নিবিষ্টমনে পাঠ করিতে লাগিল ; পড়িতে পড়িতে স্বামীর প্রতি প্রীতিভরা সুগভীর বিশ্বাসে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, সে সুস্পষ্ট অনুভব করিতেছিল, কতদিন পূর্বে অনীলের মকরন্দলোলুপ মনোভৃঙ্গ আপনার অনন্ত অতৃপ্ত মুখর কল্পনাজালে, তাহার গন্ধমাদর-মোদিত হৃদয়ারবিন্দ পরিবেষ্টনপূর্বক প্রবাস হইতে যে নিত্য-নিয়মিত মধুর গুঞ্জন ধ্বনিত করিয়া এই ডাইরীর প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তাহার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে তাহা তাহারই কথা, তাহারই কবিতা ! তাহাবই স্নিগ্ধ প্রেমের প্রতি গভীর বিশ্বাসের অমরবার্তা এই ডাইরির প্রতি ছত্রে তাহার প্রেমপূর্ণ সরল হৃদয়ের উজ্জ্বল ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে ! সকলই আছে কেবল অনীল নাই ! সেই হাসি, সেই মুখ, সেই প্রণয় প্রগল্ভ ধীর বচন, সেই প্রেমাদরপবিপ্লুত অমৃতনিষ্যন্দিনী ভাষা, সেই কোমল মধুর, ভাবময়, হাস্যময়, করুণাময়, অর্দ্ধ প্রস্ফুট অর্দ্ধ মুকুলিত প্রতিভা সমুজ্জ্বল ইন্দীবব বিনিন্দত প্রফুল্ল আঁখিদ্বয় সমস্তই অম্লান চিত্রের ন্যায় তাহার নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছে ! কেবল অনীল নাই !

৬

বাক্সে অনেক জিনিষ ছিল, তন্মধ্যে এক বোতল গোলাপগন্ধ কুন্তলীন আর এক শিশি এসেন্স দেলখোস। অনীল লিখিয়াছিল, সে পূজার ছুটিতে বাড়ী গিয়া এই কুন্তলীন ও এসেন্সে চারুকে চর্চ্চিত করিয়া তৃপ্তনয়নে একবার তাহাকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিবে ; অনীলের বিশ্বাস ছিল, তাহা হইলে চারুর সর্বাঙ্গে সেই সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিবে, যে সৌন্দর্যে বিমুক্ত কুন্তলা, আসনগ্রভূষণা, শুভ্র-বেশিনী বিশ্ব-বিমোহিনী রমা সৃষ্টিব প্রথম প্রভাতে মৃণালকরে মৃত্যুঞ্জয়ী সুধা এবং মণিরত্ন বহনপূর্বক জ্যোতির্ময়ী নির্মল ঊষার সীমন্তমূলে অচঞ্চল শুক্রের ন্যায়, তিমিরাবৃত রসাতল গর্ভ হইতে মন্দরমন্থিত ঘূর্ণমান অনন্ত নীলাম্বুবাশি ঊর্দ্ধে উত্থান করিয়া বিকশিত শতদলের উপর আপনার অলক্তরঞ্জিত কমলগঞ্জিত সুকোমল যুগল চরণ সংস্থাপন করিয়া সিক্তবেশে মুক্তকেশে সুমধুর প্রসন্ন দৃষ্টিতে নাবায়ণের চিত্তবিভ্রম উৎপন্ন করিয়াছিলেন ! মানুষের এত স্পর্দ্ধাতে দেবতার বুঝি অভিশাপ লাগিয়াছে, তাই অনীলের এই কামনা পরিপূর্ণ হয় নাই ; কিন্তু সুন্দর শিশি দুটি তাহার অপূর্ণ বাসনাব সুবাস-স্মৃতি-মণ্ডিত হইয়া সুস্নিগ্ধ ঢলঢল স্নেহে পরিপূর্ণ বক্ষে একটা অনাগত বাঞ্ছনীয় বাসরের জন্য বিধুকরবিধৌত কোন মধুযামিনীর সমাগম প্রতীক্ষায় তাহার বাক্সের মধ্যে অবস্থান করিতেছিল !—চারু একবার শিশি দুটি বাহির করিয়া তৎপ্রতি চাহিয়া চাহিয়া অতৃপ্তমনে তাহা বাক্সে পুনঃ স্থাপিত করিবে, এমন সময় রঙ্গিনী কোথা হইতে আসিযা বলিল, "বৌ, ও কিসের শিশি ?" চারু ব্যগ্রভাবে শিশি দুটি তাড়াতাড়ি বাক্সে পুবিযা ভয়চকিতা হরিণীর ন্যায় তাহার চঞ্চল নলিন-নয়ন রঙ্গিনীর মুখের উপর স্থাপন কবিযা বলিল, "ও কিছু নয়।"

রঙ্গিনী মুহূর্ত্তকাল সেখানে দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, তাহার পর ছুটিয়া মায়ের কাছে গিযা বলিল, "মা বৌর বাক্সে, আতর গোলাপের কেমন ভাল ভাল শিশি, আমাকে দেখে লুকিয়ে

রেখেছে, আমি একটা শিশি নেব।"

তখন চারুর শাশুড়ী চারুর সম্মুখে আসিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, "বৌ, আতর গোলাপে আর তোমার দরকার কি ? রঙ্গিনী আমাকে ধরেছে, ছেলেমানুষ, ওকে একটা শিশি দেও।"

চারু সশঙ্কচিত্তে বলিল, "আমার কাছে ত আতর গোলাপ কিছু নেই।"

শাশুড়ী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "নেই, আমার কাছে মিথ্যা কথা! কপাল পুড়েছে এখনো নুকিয়ে নুকিয়ে আতর গোলাপ মাখিবার সখ! লজ্জা করে না ? হারামজাদী, পোড়ারমুখী, আর কোথাও কি মিথ্যা কথা বল্‌বার জায়গা ছিল না—দেখি বাক্স ?"

চারুর শাশুড়ী চাবী লইয়া জোর করিয়া বাক্স খুলিতেই চারু কুন্তলীন ও দেলখোস দুটি ক্ষিপ্রহস্তে বাক্সের ভিতর হইতে বাহির করিয়া লইল। এবং তাহা নিজের বস্ত্রান্তরালে কাতরকম্পিত বক্ষের উপর দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। গৃহিণীর বিকট চীৎকাবে তখন সেই গৃহদ্বারে পরিবারস্থ রমণীমণ্ডলীর সমাগম হইয়াছিল ; এবং পাড়ার দুই চারি জন রঙ্গপ্রিয়া কুলবধূও এই অসাধারণ কৌতুকদৃশ্য সন্দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। সেই লজ্জাহীনা, নির্বুদ্ধি লুব্ধা বিধবার এই প্রকার ঘৃণিত আচরণ দেখিয়া সকলেই প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া চিবুকে তর্জনী স্পর্শপূর্বক ভাবিতে লাগিল, "কি সর্বনাশ, এ যে ঘোর কলি!"—অবশেষে বিস্ময়ের আবেগ কিছু প্রশমিত হইলে তাহারা একবাক্যে চারুকে ধিক্কার দিতে লাগিল ; কিন্তু অনীলের পরিত্যক্ত পবিত্র স্নেহস্মৃতি সুরভিমণ্ডিত তাহার প্রিয়তম সুনির্মল পুষ্পসার ও সুগন্ধি তেল পরিপূর্ণ স্ফটিকপাত্র দুটি সেই অবগুণ্ঠিতা, ভূম্যবলুণ্ঠিতা, অপমান-কণ্টাকিতা, কুণ্ঠিতা অনাথা বিধবার অসহায় হৃদয়খানিকে সমগ্র পরিবারের তীব্র তিরস্কার তাড়না ও কঠোর ব্যাঙ্গোক্তি হইতে অক্ষয় কবচের ন্যায় সুরক্ষিত করিয়া, আত্মজীবনের প্রতি সুদুঃসহ ঘৃণা হইতে তাহাকে আজীবন অব্যাহত রাখিল।

দীনেন্দ্রকুমার রায়

হতভাগিনী

১

যখন রাজীবলোচনের গৃহিণী বিমলা দেবী নবমবর্ষীয়া কন্যা গিরিবালা ও সপ্তমবর্ষীয়া পুত্র পূর্ণচন্দ্রকে রোদনবিহ্বল করিয়া ইহ সংসার ত্যাগ করিলেন, তখন সকলেই বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া বলিতে লাগিল,—"আজি নায়েববাটী লক্ষ্মীশূন্য হইল—আজকাল এরূপ গুণবতী বধূ বড় একটা ঘরে আসে না। আহা যেমনি দয়াদাক্ষিণ্য তেমনি বুদ্ধি-বিবেচনা!" দীন দুঃখী যে এ সংবাদ শুনিল সেই কাঁদিল। পরদুঃখ-কাতর বিপন্নের বন্ধুকে যে না ভালবাসে, সে নিশ্চয়ই সৃষ্টি-বহির্ভূত কোন অদ্ভুত জীব।

স্ত্রী-বিয়োগান্তে নায়েব রাজীবলোচন পুত্র কন্যার সান্ত্বনা ও তত্ত্বাবধানের ভার পুরাতন বৃদ্ধা পরিচারিকা বিন্দুবাসিনীর হস্তে সমর্পণ করিয়া পুনরায় জমিদার প্রভুর কার্যে দ্বিগুণ অভিনিবেশসহকারে ব্যাপৃত হইলেন। কৃতান্তের অপ্রতিকার্য বিশিখপ্রহারে যখন মানুষের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে তখন সে স্বতঃই সংসারের নিয়মবদ্ধ ও শৃঙ্খলিত কার্যপরম্পরার মধ্যে শোকবিস্মৃতি অন্বেষণ করে এবং অতি সামান্য ঘটনাকেও কল্পনা তুলিকায় চিত্তাভিরামবর্ণে সুরঞ্জিত করিয়া নষ্ট আরাধ্যের স্থানে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে প্রয়াসবান্ হয়। কিন্তু রাজীবলোচন

জানিতেন না, যে ওরূপ প্রেমময়ী সুগৃহিণীর শোক ভুলাইবার ক্ষমতা জমিদারী সেরেস্তার দলিল দস্তাবেজের চৌদ্দপুরুষেরও কোন কালে ছিল না।

পরলোক-গতা পত্নীর অন্তিমশয্যার কাতর প্রার্থনা স্মরণ করিয়া নায়েব মহাশয় অবশিষ্ট জীবন বিপত্নীকভাবেই অতিবাহিত করিবাব সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু সাধারণতঃ স্ত্রী-হীনের মৃতা-পত্নীর স্মৃতি আরাধনার ভীষণ প্রতিজ্ঞা যেমন অচিরেই বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া বন্ধুগণের অনুরোধ অথবা পিতামাতার নির্বন্ধ বা এমনিতর অন্য কোন অকিঞ্চিৎকর সূক্ষ্ম আবরণের পশ্চাতে থাকিয়া আত্মসমর্থনের চেষ্টা করে, রাজীবলোচনের শুভসংকল্প সেই শোচনীয় পরিণামে অবনীত হইয়া পল্লীযুবকগণের হাস্যোৎপাদন করে নাই।

২

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। বালক পূর্ণচন্দ্র ও বালিকা গিরিবালা মাতৃবিয়োগে কিছুদিন বড়ই অশান্ত ও অধীর হইয়া রহিল। কিন্তু বিন্দুব জননীসদৃশী স্নেহমমতায় উহাদের শোকাবেগ ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া পড়িল। জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। নহিলে নিত্য বেদনাময় হাহাকাব-সমাকুল জগতেব ওষ্ঠে ক্ষীণহাস্য-রেখার ক্ষণ-বিকাশ কেহ দেখিতে পাইত কি?

দিনকতক গ্রামের নিষ্কর্ম্মা, পরচর্চ্চী ও উদরপরায়ণ জনকয়েক ব্রাহ্মণ-সন্তান অকৃত্রিম সহানুভূতির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া নায়েব মহাশয়ের বাটীতে ঘনঘন হাঁটাহাটি আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু যখন দ্বিতীয়বার দ্বারপরিগ্রহের অসংখ্য প্রলোভন অগ্রাহ্য করিয়া তিনি দৃঢ়চিত্তে উত্তব করিলেন, "তাই বলিয়া আমি তোমাদিগের কথায় পূর্ণকে জলে ভাসাইয়া দিতে পারি না।" তখন মোদক-খণ্ডিকালোলুপ নায়েব-বাটীর চণ্ডীমণ্ডপ-বিহারী তাম্রকূট-ধ্বংসীব দল দারুণ হতাশে ক্রমেই ক্ষীণবল হইয়া অবশেষে শূন্যাঙ্কে পরিণত হইল।

তাঁহার বিবাহ প্রস্তাবে কর্ণপাত না করার অন্যতম কারণ এই, যে গৃহিণী অভাবে তাঁহার সংসারের বিশেষ কোন অবন্দোবস্ত বা অসুবিধার উৎপত্তি হইল না। পবিচারিকা আয়োজন করিত। কন্যা পাক করিত। পিতা পুত্রে একত্র আহার করিয়া পিতা জমিদারী কাছারি ও পুত্র গ্রাম্য-বিদ্যালয় অভিমুখে গমন করিতেন। আবার অপরাহ্নে উভয়ের ফিরিবার অগ্রেই গিরিবালা নৈশ-ভোজনের উপকরণসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিত। সেই নবমবর্ষীয়া মাতৃহীনা বালিকার ক্ষুদ্র হৃদযে কে জানে কেমন করিয়া একটা গুরুতর দায়িত্ব-জ্ঞান আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। সে মনে মনে ভাবিয়া লইয়াছিল যে, সে এই ক্ষুদ্র সংসারের বর্তমান গৃহিণী ; সে না দেখিলে এবং নিজে রন্ধন না করিলে পিতা এবং ভ্রাতার আহারে তৃপ্তি হইবে না—ইহাই তাহার দৃঢ়সংস্কার ছিল। তাই সে যতক্ষণ উহাদের খাওয়া না হইত ততক্ষণ আপনি ক্ষুধায় মরিয়া গেলেও একবিন্দু জলস্পর্শ করিত না। এ ঘটনা একেবারে বিচিত্র নহে। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, যে পরিণত-বুদ্ধি প্রবীণ-মস্তক উর্ধ্বতন কর্ম্মচারী কোন গুরুকর্তব্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে সেই পদে নবনিয়োজিত, অনভিজ্ঞ যুবকের কার্যোদ্যম ও কর্মনিষ্ঠা প্রথম প্রথম পূর্বগামী অপেক্ষা সবিশেষ প্রবল হইয়া উঠে। যাহা তাহার না করিবার কথা তাহাও সে খুঁটিনাটি বাছিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সম্পাদন করে। নিজের কার্যতৎপরতা প্রদর্শনের লোভ-সম্বরণ মানবের পক্ষে এমনি দুরূহ। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল, তাই গিরিবালা তাহার বালিকা-গৃহিণীত্বের গুরুত্ব কল্পনায় বাস্তব অপেক্ষা বহু পরিমাণে দীর্ঘায়তন করিয়া তুলিল ; এবং তাহার ফলে আপন তারুণ্য-সুলভ

চঞ্চল -প্রকৃতি পরিহার করিয়া এক অস্বাভাবিক গম্ভীরতার আবরণে যেন প্রবীণা গৃহিণীর ঠাট ধারণ করিল। কিন্তু বালিকার এরূপ ব্যবহারে আদৌ কৃত্রিমতা ছিল না। সে আপনার সহজ বুদ্ধিতে যাহা কর্তব্য বিবেচনা করিত তাহাই অকুণ্ঠিত চিত্তে করিবার জন্য ব্যগ্র হইত। দুহিতার ও ভগিনীর স্নেহাতিশয্যে প্রবীণা পরিচালিকাহীন সংসারও পিতা ও ভ্রাতার নিকট সুখময় শান্তি-কুঞ্জ-রূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। উভয়ে যখন দিবসের কঠোর শ্রমান্তে আহারে উপবেশন করিতেন, এবং গিরিবালা যখন তালবৃন্ত-সঞ্চালনে তাঁহাদিগের অঙ্গগ্লানি দূরীকরণের প্রয়াস পাইত এবং "এটা খাও" "ওটা খাও" বলিয়া বারংবার অনুরোধ করিত তখন উভয়েরই হৃদয় এক অনির্বচনীয় মধুর তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিত। এরূপ স্নেহময়ী, সেবাপরায়ণা, কন্যার পিতা এই কুটিল সংসার-চক্রে যে শান্তি-সুখের অধিকারী, কয়জন ভাগ্যবানের গৃহিণী স্বামীর চিন্তা-নিষ্পিষ্ট অন্তরে সেরূপ সুধাবর্ষণ করিতে সমর্থা হন?

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনটি জীবন এক অদৃশ্য, অচ্ছেদ্য স্নেহ-রজ্জুর বন্দনে গ্রথিত হইতে লাগিল। হায় কাল! যদি তোমার মর্মবিদারী উপদ্রব উপর্য্যুপরি জীবের হৃদয় শতখণ্ডে বিচূর্ণ না করিত তাহা হইলে কার সাধ্য বলে, যে এ সংসার গরলময়—এ সংসারে শান্তির স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক একান্ত বিরল? তাহার পর তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, গিরিবালা দেখিতে দেখিতে দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিল। কন্যার বিবাহের জন্য পিতা চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। রাজীবলোচন চট্টোপাধ্যায় নিজে নৈকষ্য কুলীন বলিয়া মনোমধ্যে একটা উৎকট অভিমান পোষণ করিয়া আসিতে ছিলেন এবং তাঁহার অর্থ-সঙ্গতিও যথেষ্ট ছিল, সুতরাং তিনি সদ্বংশজাত সুকুলীন ভিন্ন অন্য পাত্রের হস্তে একমাত্র কন্যাকে অর্পণ করিতে অভিলাষী ছিলেন না;—বহু অনুসন্ধানের পর ভোলাগ্রাম নিবাসী হরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান কালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক যুবককে কন্যা গিরিবালার বর মনোনীত করিলেন। কুলীন সন্তানের বিদ্যাবুদ্ধি বা রূপগুণ সম্বন্ধে কন্যাপক্ষীয়েরা প্রায়ই অনুসন্ধান করেন না। পাত্রটি ফুলিয়ামেল, রামেশ্বরঠাকুরের সন্তান, একেবারে নিখাদ রগ্‌রগে কুলীন! তাঁহার ন্যায় অভিজাত জামাতার শ্বশুর হওয়ার সৌভাগ্য কিছু সকলে করিয়া জন্মে না,—তাই রাজীবলোচন দ্বিরুক্তি না করিয়া বরপক্ষের অসম্ভব উচ্চ দাবীতেও অঙ্গীকৃত হইয়া শীঘ্র বিবাহের দিন নির্দ্ধারণ করিয়া ফেলিলেন।

যথাসময়ে যথানিয়মে গিরিবালার পরিণয় ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেল। বর বধূর পাণিপীড়ন ও যথা কথঞ্চিৎ দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া নিজালয়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু জামাতার সম্মান মূল্য হিসাবে তাঁহার চির-জীবন-সঞ্চিত কার্পণ্যের পোষ্য-পুত্র-রূপী রজতখণ্ডের অনেকগুলিকে পরহস্তান্তরিত করিতে হইল দেখিয়া; রাজীবলোচন জামাতার উপর আন্তরিক কিছু চটিয়াও রহিলেন। কুলীনের কন্যার শ্বশুর কিম্বা স্বামীর আদ্য-শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্য ব্যতীত পতিগৃহে গমন আচার ভ্রষ্ট, সুতরাং বিবাহের পরেও গিরিবালা পিতৃগৃহে চির-কুমারীর ন্যায় বাস করিতে লাগিল। চারিদিন না যাইতে যাইতে দুষ্ট-মেয়ে বিন্দুবাসিনীর স্নেহ-তিরস্কার না শুনিয়া নববধূর বেশভূষা দূরে ফেলিয়া দিল এবং অর্দ্ধ-মলিন-বসনে প্রফুল্লচিত্তে আপনার চিরাভ্যস্ত রন্ধনশালার কর্মে প্রবৃত্ত হইল। বালিকা বুঝিতে পারিত না, উজ্জ্বল বসনভূষণে সজ্জিত হইয়াও, ও বিচিত্র অঙ্গরাগ সম্পাদন করিয়া অলসভাবে সঙ্গিনীগণের সহিত বৃথা হাস্য পরিহাস ও ইতস্ততঃ ভ্রমণের অভ্যন্তরে কোন বিশেষ চিত্তাকর্ষী সুখাস্বাদ লুক্কায়িত রহিয়াছে। কোন্ শান্তদেবতা তাহাকে নিভৃতে শিখাইয়াছিল, যে সংসারের যত কিছু সুখ শান্তি পরিতোষ সকলই তাহার পিতৃসেবায় ও ভ্রাতার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সংবিধানে? ভাই পূর্ণচন্দ্রও ভগিনীর স্নেহযত্নে দিদির একান্ত বশীভূত হইয়া

পড়িল। এ জগতে স্নেহের দাস নয় কে ? স্নেহের প্রবল আকর্ষণে পরও নিতান্ত আপনার হইয়া উঠে, আপনার জন যে অধিকতর আকর্ষিত হইবে ইহাতে বিচিত্র কি ? পূর্ণ প্রতিদিন বাটী আসিয়া প্রথমে দিদিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহার স্বহস্ত হইতে মিষ্টান্ন না লইলে তাহার আহারে রুচি হইত না। যেখানে যে ভাল জিনিসটি দেখিতে পাইত তাহা দিদির জন্য গৃহে আনয়ন করিতে না পারিলে, বালক পূর্ণচন্দ্রের ক্ষোভের সীমা থাকিত না। বাস্তবিক ভ্রাতাভগিনীর প্রেম কি দিব্য সুন্দর নিরুপম চিত্র, কি অতুলনীয় দুর্লভ পদার্থ ! কিন্তু হায় সকল কুসুমেই কীট পশে ;—জগতের সকল সুন্দর জিনিসের পশ্চাতে একটা বাহুরূপী সৌন্দর্য মৎসর দুরন্ত শত্রুর উপস্থিতি যেন প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী কঠোর শাসন।

৪

দেখিতে দেখিতে আরও সাত বৎসর নিত্যোর্মি-চঞ্চল বারিধি-হৃদযে সাতটি সলিল বুদ্বুদের ন্যায় মহাকালেব গর্ভে বিলীন হইয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে কত লোকেব কত বিপুল পরিবর্তন ঘটিল কে গণিতে পারে ?

এখন আমাদের গিরিবালা ঊনবিংশ-বর্ষীয়া যুবতী। পূর্ণচন্দ্রও আর এখন নিতান্ত বালক নহেন ;—সপ্তদশ বর্ষের কৈশোব সৌন্দর্যে সমুজ্জ্বল কান্তিঅঙ্কুরোন্মুখ যৌবনের অলক্ষ্য প্রভাব জনিত উদ্যম ও অধ্যবসায়ের নিত্য সাহচর্য্যে গম্ভীর মূর্ত্তি। একদিন গিবিবালা পিতাকে ভ্রাতাব বিবাহ দিবার জন্য নিতান্তই ধরিয়া বসিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্নেহপ্রবণতা মানবের হৃদয়ের বদ্ধমূল হইতে থাকে। তখন একটি ভালবাসার দ্রব্য লইয়া আর সেরূপ তৃপ্তি হয় না ; নিত্য নূতন নূতন স্নেহভাজনকে আলিঙ্গন করিবাব জন্য সেই স্নেহস্রোত উচ্ছ্বাস প্রবাহে ছুটিতে থাকে। নব-বধূ-রূপে আর একটি কন্যা আসিয়া তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে বিচরণ করিয়া বেড়াইবে এই সৌবর্ণ চিত্র বৃদ্ধের কল্পনায় অনেকটা স্থান অধিকাব করিযা বসিল। অতি অল্প দিনের মধ্যেই রাজীবলোচন কামারখালি গ্রামের একটি পাত্রীর সহিত পুত্রের সম্বন্ধ স্থির কবিলেন। পাত্রীটি দেখিতে শুনিতে মন্দ নহে, 'আহা মরি' না হইলেও নাসিকা কুঞ্চনের যোগ্যা নহে। পাত্রীর সংসারে অভিভাবকের মধ্যে একমাত্র বিধবা জননী উমাসুন্দবী। কন্যার মাতা সহায়সম্পত্তিবিহীনা ; দরিদ্রা জানিয়াও রাজীবলোচন এরূপ স্থলে কুটুম্বিতা স্থাপন করিতে যে স্বীকৃত হইলেন, তাহার প্রধান কারণ, তাঁহার ধারণায় কন্যাপক্ষের আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত মন্দ হইলে তাঁহাদিগের একটু বিনীত অনুগত হইয়া চলার বেশী সম্ভাবনা।

শীঘ্রই সুশৃঙ্খলে কার্যসমাধা হইয়া গেল। গিরিবালা আনন্দোৎফুল্লামনে বধূর মুখচুম্বন করিয়া গৃহে তুলিল।

আমরা শুনিয়াছি প্রতিবেশিনীগণ উৎসবান্তে স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্তা হইলে নির্জনে গিরিবালার নয়নপ্রান্তে দুই এক বিন্দু অশ্রুনির্গম হইয়াছিল। বোধ হয় আজ বহুদিন বিস্মৃত জননীর কথা মনে পড়িয়া লুপ্তপ্রায় শোকের গুপ্ত-বেদনায় দুহিতা হৃদয় ক্ষণেকের জন্য বিলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অন্য কেহ দেখিতে পাইবার অগ্রেই ত্রস্তে নয়ন মার্জন করিয়া সে সকলের সহিত উৎসবরঙ্গে যোগদান করিল।

নিয়মমত আটদিন শ্বশুর গৃহে অবস্থিতির পর নববধূ যথাকালে পিত্রালয়ে ফিরিয়া গেল। ঝটিকান্তে উৎপ্লবমান জলরাশির স্তব্ধতা লাভেব ন্যায় সেই ক্ষুদ্র গ্রামের সঙ্কীর্ণ-বক্ষে সপ্তাহের আনন্দ কোলাহল থামিয়া গিয়া পূর্বতন শান্তনীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল।

সময় কাহারও হাতধরা নহে, আবার দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। সংসারের নানাবিধ সুখ দুঃখের মধ্যে চট্টোপাধ্যায় গৃহে ভ্রাতা ভগিনী পিতার স্নেহ-সার-বক্ষ অধিকতর সান্দ্রবন্ধনে বেষ্টন করিতে লাগিল।

৫

পূর্ণর বিবাহের পর আরও তিন বৎসর অবিরাম-গতিতে ছুটিয়া সময়েব বিপুল আবর্তে গড়াইয়া পড়িয়াছে। নায়েব মহাশয়ের সংসার বেশ সুচারুরূপেই চলিতেছে। যে সংসারের নরনারী এক পরিচালকের নির্দেশনিয়মে পরস্পবের প্রতি অসীম স্নেহে অনুপ্রাণিত ;—সে সংসারের বিশৃঙ্খলতা কোথায় সম্ভবে ?

পূর্ণচন্দ্র দুই বৎসর পূর্বে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জেলার কলেজে অধ্যয়ন করিতে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু পিতা ও ভগিনী তাঁহাকে কিছুতেই নয়নান্তরাল করিয়া দূরে পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। জমিদারের সুপারিশে পূর্ণচন্দ্র গ্রাম্য বিদ্যালয়ে তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইল।

গিরিবালা এখন দ্বাবিংশ বর্ষীয়া পূর্ণবয়স্কা রমণী। কিন্তু এই বিবাহিত জীবনের দশ বৎসরের মধ্যে তাহার ভাগ্যে একাধিক বার স্বামী সন্দর্শন ঘটিয়া উঠে নাই। কুলীন কন্যার ইহা অপেক্ষা অধিক সুখের আশা করাই অসহনীয় ধৃষ্টতার বিষয়। এই একবার সাক্ষাৎও অতি অল্প সময়ের জন্য হইয়াছিল। পূর্ণর বিবাহ উপলক্ষে পাকস্পর্শের দিবস জামাতা মহাশয় শ্বশুরগৃহে শুভপদার্পণ করিয়া তাঁহার দুর্লভ নরজীবন ও তদীয় দুহিতার অশেষ সুখকর কুলীন মহিলাজীবন সমুচিত সার্থক করিয়া পুণ্যশ্লোক প্রাতঃস্মরণীয় কুলগুরু দেবীবরের কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিরক্তিনয়নে পতিত হইতে দুঃসাহসী হইয়াছিলেন, কিন্তু পরদিবস প্রত্যুষেই তিনি গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ভরসা করি বক্ষণশীল সমাজের মাতব্বরগণ কালীকিঙ্করের এই সময়োচিত অনুতাপে তাঁহার পূর্বকৃত অপরাধ মার্জনা করিলেও করিতে পারেন।

স্বামীর এরূপ আকস্মিক প্রয়াণে গিরিবালা প্রথম প্রথম বড়ই ব্যথিত হইয়াছিল কিন্তু মুগ্ধচরিত্রা সাংসারিক কর্মকুশলা রমণী দৈনন্দিন অসংখ্য কর্তব্যেব মধ্যে আপনার ক্ষুদ্রবেদনা শীঘ্রই ভুলিয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পরে ভোলাগ্রাম হইতে একজন সংবাদ লইয়া আসিল, নায়েব মহাশয়ের জামাতা বিসূচিকা রোগে তিনদিন হইল তনু ত্যাগ করিয়াছেন। রাজীবলোচনের গৃহে আবার শোকের করুণ মন্ত্র-ধ্বনি সমুত্থিত হইল। বিন্দুর হৃদয়ভেদী বিলাপ কাহিনী গ্রামান্তখানি অশান্ত উচ্ছ্বাসে দিনকয়েক বেশ কাঁপাইয়া তুলিল। ভগিনীর অদৃষ্টে দৈবের এই নির্মম নিগ্রহে ভ্রাতা মর্মাহত হইলেন। আর গিরিবালা স্বামীসঙ্গসুখে বঞ্চিতা হইয়াও—আজি বিধবা ! এ দৃশ্য দেখিয়া কে বলিতে সাহসী হইবে "শিরো নাস্তি শিরো ব্যথা" ? জীবনে যে স্বামীগৃহ হইতে কখনও কোন লোক একদিনের জন্যও কোন সুখের সংবাদ আনয়ন করে নাই, আজ সেই স্বামীর মৃত্যুতে গিবিবালার পারলৌকিক শুভাকাঙ্ক্ষী শ্বশুর অভাগিনীর শ্রবণতৃপ্তি জন্মাইবার জন্য এই সুমিষ্ট বার্তা এত ব্যগ্র হইয়া বাসুদেবপুরে প্রেরণ করিলেন ! কুলীন মহিলাগণের এই অধম পরিণাম দেখিয়া আপাততঃ এই মনে হয়, যে বিধবাগণ বঙ্গসমাজের একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিতা হন, তাই তাঁহাদের দলপুষ্টির ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য এক পতি কর্তৃক বহু পত্নীর মস্তক চর্বণ ব্যবহার প্রথম প্রবর্তন। গিরিবালা বিধবা হইয়া

বিশেষ অসম্ভব রকম অসুখী হইয়া পড়িল না। কারণ, সধবা জীবনেও সমাজ বিড়ম্বনে তাহাকে অর্দ্ধ বৈধব্যের অতুল আস্বাদ অনেক দিন হইতেই পাইয়া আসিতে হইয়াছিল। কিন্তু বৃদ্ধ রাজীবলোচনের হৃদয় এই স্বপ্নাতীত দুর্ঘটনায় একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রবীণ বয়সে একমাত্র কন্যার মলিন বসন, বিষাদাঙ্কিত অধর ও নিরাভরণ বাহুপাস দর্শন করিলে পিতার হৃদয় যে কিরূপ অস্থির জ্বালাদিগ্ধ ও অশান্তিময় হইয়া উঠে তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের উপলব্ধি বড় সহজ সাধ্য নহে।

একদিন সন্ধ্যার সময় রাজীবলোচন কাছারি হইতে ফিরিয়া আসিয়া "বড় অসুখ করিতেছে" বলিয়া শয্যাতল আশ্রয় করিলেন। বাত্রি মধ্যেই তাঁহার ব্যাধি অসম্ভব রকম বাড়িয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এবার আর তাঁহাকে উঠিতে হইবে না। পুত্রকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন "বাবা পূর্ণ, আমার অসুখ সাংঘাতিক বলিয়া বোধ হইতেছে—এখন সক্ষম হইয়াছ আমার অভাবে, ভগবানেব অনুগ্রহে, বোধ হয় তোমার বিশেষ কোন কষ্ট হইবে না ;—কিন্তু তোমার দিদিকে কখন কোন্ কারণে তিলমাত্র অনাদর বা অপমান কবিও না ;—মনে রাখিও, এখন আর অভাগিনীকে যত্ন করিবার তুমি ভিন্ন কেহ রহিল না।" পিতা নীরব হইলেন। পুত্র কাঁদিতে লাগিলেন। গিরিবালাও একথা শুনিয়া পিতৃচরণে লুণ্ঠিত হইয়া রোদনজলে ভূতল সিক্ত করিতে লাগিল। প্রভাতে বৈদ্য আসিয়া বড বিমর্ষভাবে কহিলেন ;—"রোগীর অবস্থা ভাল বুঝি না ;—উঁহাকে সান্নিপাতিক বিকারে আচ্ছন্ন করিয়াছে"।

ভ্রাতা ভগিনীব প্রাণপণ শুশ্রূষা ও কবিরাজের যথাসাধ্য চিকিৎসাতেও রাজীবলোচন এ যাত্রা বক্ষা পাইলেন না। তৃতীয় দিবসে পুত্রকন্যাকে অনাথ কবিযা তিনি ভববন্ধন ছিন্ন কবিলেন। আজ পূর্ণ ও গিরিবালা নিতান্তই অসহায়, নিরাশ্রয় হইল। যে পিতার অপাব স্নেহে তাহাবা দুর্বিসহ মাতৃবিরহে বিনোদন লাভ করিয়াছিল আজ সেই পিতা তাহাদিগকে চিরজীবনের মত ফেলিয়া গেলেন তাই তাহাবা ভ্রাতা ভগিনীতে বসিয়া, পিতৃবিলাপের করুণ ক্রন্দনে অনেক রাত্রি পর্যন্ত আপনাদিগের সুবৃহৎ ভবনপ্রাচীর প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। বিন্দুবাসিনীব অনিপুণ সান্ত্বনা এই সর্বাতিক্রমী শোক প্রবাহের ভগ্নদ্বার কেমন করিয়া রুদ্ধ করিবে ?

৬

রাজীবলোচনের আদ্যকৃত্যে পূর্ণচন্দ্র স্ত্রীকে গৃহে আনিলেন। সেই সঙ্গে উমাসুন্দবীও জামাই বাটী আসিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধাবসানে অন্য কুটুম্বেরা নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া গেল কিন্তু উমাসুন্দরী গমন বিষয়ে বিশেষ ঔৎসুক্যের চিহ্ন প্রকাশ করিলেন না। বিরজাস্বামী পূর্ণচন্দ্রের নিকট বেশ স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিল, যে তাহার একান্ত অনুরোধে তাহার জননী কিছুদিন তাহার নিকট থাকিতে স্বীকৃতা হইয়াছেন। নহিলে তাঁহার কিসেব অভাব ? তাঁহার কি একদিন গৃহ ছাড়া হইলে চলে ? সরল পূর্ণচন্দ্র ও শ্বাশুড়ীর সন্নিধিতে প্রথমে বিশেষ কোন আপত্তির কারণ দেখিল না। ভাবিল উমাসুন্দরী তাঁহাদিগকে মাতার ন্যায় যত্ন করিবেন তাহা হইলে দিদিরও সাংসারিক পরিশ্রমের অনেকটা লাঘব হইতে পারে। গিরিবালা বিরজা এবং তাহার মাতাকে যথেষ্ট সমাদর করিতে লাগিল। প্রাণসম ভ্রাতার স্ত্রীকে ভগিনী যত্ন করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। তবে উমাসুন্দরীও যে সমান মর্যাদা উপভোগ করিতে লাগিলেন, তাহার কারণ তিনি কুটুম্ব, কোন বিষয়ে ত্রুটি হইলে পাছে ভ্রাতার নিন্দা হয় এই

ভয়ে গিরিবালা সর্বদা সারা হইত।

কিন্তু এত করিয়াও গিরিবালা উমাসুন্দরীর তুষ্টিসাধন করিতে পারিল না। যে কিছুতেই খুসী হইবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া ইষ্টসাধনে ব্রতী হইয়াছে, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব আনিয়া ধরিয়া দিলেও সে তোমার দিকে সকরুণ দৃষ্টে চাহিবে না। বধূও ক্রমে ক্রমে ননদীর কার্যে প্রকাশ্য অসন্তুষ্টি দেখাইতে আরম্ভ করিল। তখন গিরিবালার সকল কার্যেই একটা না একটা খুঁত বাহির হইতে লাগিল। পূর্ণচন্দ্র আহারে বসিলে গিরিবালা আগেকার মত বাতাস করিতে গেলে উমাসুন্দরীর তাহা অসহ্য হইত। তিনি সময়ে সময়ে তাহার হস্ত হইতে পাখা টানিয়া লইয়া রন্ধনশালায় কি হইতেছে দেখিবার জন্য গিরিবালাকে উঠিয়া যাইতে বলিতেন। গিরিবালার রন্ধনপটুতাও এখন তাহার বিপক্ষে গাহিতে আরম্ভ করিল। সে ভাল করিয়া রাঁধিত নিজে ভাল খাইবার জন্য। বিরজা ও উমাসুন্দরীর মহীয়সী বুদ্ধির তীক্ষ্ণধারে গিরিবালার এমনি আরও কত কি গুণগ্রাম দিন দিন প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিন্তু গিরিবালা এমনি অকৃতজ্ঞ দুর্বিনীতা রমণী, যে সে উমাসুন্দরীর নিকট আপনাকে একদিনের জন্যও গভীরঋণে আবদ্ধা মনে করে নাই। অধিকন্তু সে আজ কাল প্রায়ই মধ্যে মধ্যে সংসারের অমঙ্গল বাড়াইয়া বিরলে কাঁদিত। যে, অমন সকল বাস্তব বিপদের প্রবল ঝটিকায় অক্ষুণ্ণ অটল থাকিয়া একলক্ষ্যে আপন কর্তব্যের পদবী অনুসরণ করিয়াছিল, সে আজ কোন্ অপরিজ্ঞাত রহস্য অচিন্তনীয় বেদনায় অধীর হইয়া পড়িল! যে ভ্রাতাকে সে শৈশবে মাতার সমান যত্ন করিয়া লালন করিয়াছে;—যে ভ্রাতাকে সে একদিনের জন্যও দূরে পাঠাইতে হইলে, যেন কোন অতিপ্রিয় ইষ্ট-বিরহে বেদনা-চঞ্চল হইয়া উঠিত;—যে ভ্রাতাকে সে একদিন কাছে বসিয়া যত্নে আহার করাইয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিত, আজি সে তাহার কাছে বসিবারও অধিকারিনী নহে এই জ্বালাময়ী চিন্তা তাহার ললিত কোমল হৃদয়ে খরদংষ্ট্র বৃশ্চিকের ন্যায় তাহাকে দংশন করিতে লাগিল। সে ত বলে নাই, তাঁহার ভ্রাতা তাহাকে স্ত্রী অপেক্ষা অধিক ভাল বাসুক বা স্ত্রীকে অবহেলা করিয়া অভাগিনীকে একটু মোহন প্রবোধে ভুলাইবার জন্য তাহার নিকট দু'দণ্ড বসিয়া থাকুক। দিনান্তে দুইবার ভ্রাতার আহারের সময় সে নিকটে থাকিতে চায়;—সে ত ইহা অপেক্ষা অধিক ক্ষমতার দাবী কখন করে নাই! হইলই বা তাহার সহোদরের সংসার;—হইলই বা তাহার আপন পিতার ভদ্রাসন! সে পূর্ণচন্দ্রের বিধবা ভগিনী ব্যতীত আর ত কিছুই নহে! কাজেই সে আপনার আশা বাসনা এই সঙ্কীর্ণ পরিসর ক্ষেত্রে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিয়াছিল। তবু বিরজে! তুমি স্বামী হৃদয়ের দাম্পত্যপ্রেমে অখণ্ড আধিপত্য বিস্তার করিয়াও ভগিনীর দগ্ধহৃদয় সান্ত্বনার জন্য তোমার উৎকট স্বার্থের কণামাত্র বিসর্জন দিতে পারিলে না! গিরিবালা তাই আজকাল বিন্দুবাসিনীর বিশেষ ঘনিষ্ট হইয়া পড়িল। সেই পরিচারিকাই এখন তাহার সতত সঙ্গিনী—একমাত্র শান্তিদায়িনী। জগতে কেবল সেই অশিক্ষিতা নীচ জাতীয়ার হৃদয়ই এই অভাগিনীর জীবনব্যাপী দুঃখ কতক পরিমাণে বুঝিয়াছিল আর উমাসুন্দরি! তুমি নিজে বিধবা হইয়াও বিধবার দুঃখ বুঝিলে না কেন?

এ দিকে এরূপ চলিতে লাগিল। কিন্তু গিরিবালার কৌশলময়ী আত্মগোপন ক্ষমতায় ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র এই পরিপাকোন্মুখ পারিবারিক বিপ্লবের বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিলেন না।

৭

একদিন কোন প্রকারে "পূজার চিঠি" নাম্নী পুস্তিকাখানি গিরিবালার হস্তে আসিয়া

পড়িল। সে তাহা পাঠ করিয়া জানিল, কলিকাতা নগরে 'কুন্তলীন' নামক এক প্রকার সুগন্ধি কেশ-তৈল ও 'দেলখোস' নামক এক রকম চিত্তহারী পুষ্পসার উঠিয়াছে। পাঠ করা অবধি বধূর জন্য উক্ত বিলাস দ্রব্যদ্বয় আনাইয়া দিতে ভাইকে অনুরোধ করিবে স্থির করিয়া রাখিল। সেই দিনই সে সন্ধ্যার সময়ে ভ্রাতাকে তাহার নব অভিলাষের কথা জানাইল। হতভাগিনীর দুর্ভাগ্যক্রমে তখন উমাসুন্দরী অন্তরালে থাকিয়া সে কথা শুনিয়াছিলেন। কে জানিত এই সুধাবিন্দু হইতে গরল রাশির উৎপত্তি হইবে? পরার্থপরতার পথ এতদূর কণ্টকাকীর্ণ জানিলে সে পথে ভ্রমণ করিতে কে সাহসী হইত?

সেই দিন রাত্রিতে যখন গিরিবালা আহার করিতে যাইবেন তখন উমাসুন্দরী কপাটের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্পষ্টত তাহাকে শুনাইবার জন্যই ব্যঙ্গ-বঙ্কিমকণ্ঠে ছুরিকাতীব্র ভাষায় কি বলিতেছিলেন। যখন মানুষের একটি কথায় সোনার সংসার ছারখার হইয়া যায় তখন কথা কহিবার অগ্রে মানুষ দ্বিতীয়বার চিন্তা করে না কেন? গিরিবালা শব্দ শুনিয়া একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। "মাগীর আবার ঢঙ্ দেখ;—নষ্টামি দেখ্‌লে অঙ্গ জ্বলে যায়। আমাব মেয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজের সাধ মেটানর চেষ্টা। ন্যাকাপনা কেউ যেন আর বুঝ্‌তে পারে না; বিধবা হয়েছেন তবু সখ্ মিট্‌ল না;—তা কল্‌কেতায় গিয়ে বডমানুষ জুটুতে পারলেই কত 'কুন্তলীন' কত 'দেলখোস' চরণে গড়াগড়ি যাবে। ছি! ছি! ছি! ছুড়ীর বিবিয়ানা দেখে ডুবে মর্‌তে ইচ্ছে হচ্চে যে গো!" গিরিবালা শেষ পর্য্যন্ত অচঞ্চল পদে দাঁড়াইয়া শুনিল। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চল থাকিয়া "হা হরি! এ হতভাগিনীর অদৃষ্টে শেষে একি কলঙ্ক রটাইলে।" বলিযা সেই খানেই বসিয়া পড়িল। তাহার আজিকার মত—শুধু আজিকার মত নহে, এই জীবনের মত আহার ঘুচিয়া গেল। কতকক্ষণ এই ভাবে একাকী পড়িয়া থাকিবার পর বিন্দু তাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এ ঘটনা নূতন নহে,—বিন্দু বুঝিয়া লইল, আজ হয় ত আব একবার—"মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" হইয়াছে। কিন্তু কে জানিত, যে আজিকার আঘাত মর্মান্তিক—অভাগিনীর সংহাবোদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র! সে খাইবার জন্য অনেক অনুবোধ কবিতে লাগিল কিন্তু গিরিবালা অসুখের ভাণ করিয়া আপনার কক্ষে গিয়া শয়ন কবিল। বিন্দুও অনাহারে রহিল। আর ওদিকে উমাসুন্দরী দশমীর জলযোগটা দ্বিগুণ উৎসাহে সম্পাদন করিলেন।

গভীর রজনীতে বিন্দু পূর্ণর দ্বারে কম্পিত-কণ্ঠে ডাকিল, "বাবা, একবার শীঘ্র উঠে এস।" পূর্ণ শশব্যস্তে দরজা খুলিয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, ঝি মণি, কি হয়েছে?" বিন্দু তাহার হাত ধরিয়া একটু অন্তরে লইয়া গিয়া আবেগজড়িত স্বরে কহিল, "আর কি বলিব, আমাব মাথা—গিরি বুঝি আফিঙ্ খাইয়াছে;—শীঘ্র ডাক্তার ডাক।" শুনিয়া পূর্ণচন্দ্র সেই বেশেই নৈশ-নীরবতার নিবিড়ক্রোড়ে মিশিয়া বিঘ্ন-সঙ্কুল গ্রাম্যপথের উপর দিয়া বৈদ্যের অন্বেষণে ছুটিলেন। নিদ্রার কোমল অঙ্কে শায়িত শান্তিরসাস্বাদী মানবভ্রাতা, তুমি কি সেই রাত্রিতে এই ভাগ্যহীন একান্ত বিঘুর ভ্রাতৃ-হৃদয়ে দুশ্চিন্তা-জালের ভীম নিষ্পেষণ কল্পনা করিতে পার?

পূর্ণচন্দ্র শীঘ্রই একজন কবিরাজ লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু হায়! তখন সব ফুরাইয়াছে;—বোধ হয় কিছু পূর্বে সতর্ক হইলে গিরিবালার অমূল্য জীবন আরও কিছুদিন ধরণীর পঙ্কিল শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখা যাইত, কিন্তু যখন বৈদ্য আসিল তাহার অনেক অগ্রেই গিরিবালার জীবন-বায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছিল। কবিরাজ বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। পূর্ণচন্দ্র ধূলিধূসরিত হইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

যাও গিরি ! শান্তিময়ের আরামবর্ষী চরণতলে মিশ গিয়া ! যে জগতে উমাসুন্দরী,—যে সংসারে বিরজা,—সে পৃথিবীতে তোমার স্থান কোথায়, দেবি ?

প্রসন্নকুমার ঘোষাল

সন্ধ্যা

১

আজ বিবাহের পর নূতন জামাই আসিয়াছে, তজ্জন্য শালীমহলে বড় একটা ধুম পড়িয়া গিয়াছে ! নূতন জামাই—কত ঠাট্টা করিতে হইবে, কত তামাসা করিতে হইবে সকলে তাহারই আয়োজনে ব্যস্ত ! শাশুড়ী জামাইকে কি করিয়া আদর যত্ন করিবে, আমোদে তাহার একটা কিছু ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না । দিদিশাশুড়ী কেমন করিয়া বাক্যযুদ্ধে নূতন সেনাপতিটিকে পরাস্ত করিবেন, তাহার চেষ্টায় প্রকাণ্ড নথনাড়া দিয়া, গালভরা হাসি লইয়া সোণার নাত্‌নীদের সহিত কল্পনা জল্পনা করিতেছেন । আর সন্ধ্যা কোথায় ?—সে যেন ভয়ভীতা হরিণীর মত লাজে ভয়ে জড়সড় হইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে ! নূতন জামায়ের নাম শুনিয়া সে কোথায় গিয়া লুকাইয়াছে ! আজ যেন তাহার নিকট কি এক্‌টা যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে ! মনে কেমন এক্‌টা সাধ আসিতেছে, যদি কেহ না থাকিত সে আর নূতন জামাই একা থাকিত, তাহা হইলে হয়ত সে কত কথা কহিতে পারিত ! তাই ভাবিয়া যেন সে লজ্জায় মরিয়া যাইতেছে ।

দিদিমা তাহাকে এতক্ষণ ধরিয়া খুঁজিতেছিলেন, শেষে একটা ঘরে খাটের নীচে হইতে চোরকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিলেন । লজ্জায় সন্ধ্যার সুন্দর মুখখানি রক্তাভ হইয়া উঠিল ; তিনি তাহার গাল টিপিয়া বলিলেন, "কিলো, প্রবোধ এসেছে শুনে কি একেবারে এখানে আস্‌তে হয় ? বুঝেছি দেখা ক'ত্তে সাধ্ গিয়েছে—চল্ আমি নিয়ে যাচ্ছি ।" নূতন জামায়ের নাম প্রবোধ ।

দিদিমা সন্ধ্যাকে কিছু না বলিতে দিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া অগ্রসর হইলেন । সে সময় সন্ধ্যার মনে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কত যুদ্ধ করিল কে বলিবে !

সন্ধ্যাকে জোর করিয়া দিদিমা সাজাইয়া দিলেন ; শেষে তাহাকে সারথি করিয়া রণে অগ্রসর হইলেন । সঙ্গে প্রবোধের যত শালী-সামন্ত চলিল ।

এই অবসরে প্রবোধকে বাড়ীর ভিতরে ডাকিয়া আনা হইয়াছিল । সে একাকী শয্যার উপর বসিয়া প্রতিক্ষণে এরূপ একটি ছোট খাট যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতেছিল । ক্রমে মলের রুনুঝুনু, কাপড়ের খস্‌খসানি শব্দে তাহার চমক ভাঙ্গিয়া দিল—চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে দিদিমা সসৈন্যে হাজির । ক্রমে প্রবোধ একে একে সকলের নিকট পরাস্ত হইয়া বন্দী হইল ।

তারপর সকলে সন্ধ্যার পর উভয়কে একগৃহে বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল । নূতন জামাই বড় আদরের জিনিস ।

২

সন্ধ্যা লজ্জায় ভয়ে শয্যার এক প্রান্তে বসিয়া ;—সে যেন প্রবোধকে চিনে না, অথবা কি

কথা কহিতে হইবে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে ; মনে মনে কথা কহিবার কত কথা আসিয়া জুটিতেছে তাই যেন সকলে মিলিয়া একটা গণ্ডগোল করিয়া কথা কহিতে দিতেছে না। লজ্জায় তাহার সুন্দর দেহখানি ঈষৎ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল, কাজেই মুখে কথা আসিয়াও আসিতেছিল না ! প্রবোধ শয্যায় শুইয়া তাহা দেখিতেছিল। হঠাৎ সন্ধ্যা তাহার সুন্দর বড় বড় চোখ তুলিয়া যেমন চাহিবে অমনি ধরা পড়িয়া গেল, প্রবোধের সঙ্গে তাহার চারিচক্ষু মিলিত হইল—সন্ধ্যা সে চাহনীতে যেন সব কথা প্রবোধকে জানাইল। প্রবোধ উঠিয়া তাহার ক্ষুদ্র হস্তখানি ধরিয়া বলিল, "শোবে এস।"

সন্ধ্যা একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। স্বামীর প্রিয় আকর্ষণে মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া সে স্বামীর পাশে গিয়া শুইল। শুইতে গিয়া তাহার মস্তকের কাপড় সরিয়া গেল ;—প্রবোধ সে মুখখানিতে সাদরে একটি চুম্বন করিল। সন্ধ্যা একটু সঙ্কুচিত হইয়া মস্তকের কাপড় টানিয়া দিল। তারপর ক্রমে সন্ধ্যার বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল।

প্রবোধ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমায় চিঠি লিখিতে বলিয়াছিলাম, লিখিলে না কেন ?" সন্ধ্যা কোন উত্তর দিল না ;—কি উত্তর দিবে সে জানে না, কাজেই চুপ করিয়া রহিল। প্রবোধ আবার জিজ্ঞাসা করিল। সন্ধ্যা এবার বালিশের নীচে মুখ লইয়া অস্পষ্টভাবে বলিল "লজ্জা করে।"

"তবে তুমি চিঠি লিখিতে জান. সে দিন মিছে কথা কহিলে কেন ?"

"তখন জানিতাম না।"

"এখন শিখিলে কোথা হইতে ?"

"দিদির নিকট হইতে।"

"তবে লেখ না কেন ?"

সন্ধ্যা অন্য কথা আনিল, জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কবে আসিবে ?"

"পড়িবার সময় বেশী এখানে আসিলে বাবা রাগ করিতে পারেন।"

"তবে আসিও না।"

"সুবিধা পাইলে দেখা করিয়া যাইতে পারি।"

"না, তোমার আসিতে হইবে না—আমি চিঠি লিখিব।"

প্রবোধ আবার চুম্বন করিয়া বলিল, "লিখিও।"

তখন ঘড়িতে দুপুর বাজিল কাজেই কথাবার্তা বন্ধ করিয়া দুজনে একটু ঘুমাইবার চেষ্টা দেখিল।

৩

প্রবোধ কলেজে পড়ে। এবার তাহার এফ-এ পরীক্ষা দিতে হইবে। সে কলেজ হইতে আসিবার পর একদিন বৈকালে তাহার ছোট ভাই দুইখানি চিঠি আনিয়া বলিল, "দাদা তোমার চিঠি।"

প্রবোধ দেখিল বাঁকা বাঁকা অক্ষরে চিঠি দুইখানি তাহাকেই লিখিত হইয়াছে। সে একটু ব্যস্ত ভাবে চিঠি দুইখানি খুলিল ; দেখিল দুইখানিই তাহার শ্বশুরবাড়ীর চিঠি, একখানি লিখিয়াছে সন্ধ্যা, অপর খানি এক ছোট শালীর লিখিত।

সন্ধ্যা লিখিয়াছে ;—প্রথমে কি লিখিয়াছে কে জানে, তাহা মুছিয়াছে ; তারপর 'প্রাণেশ্বর' লিখিয়াছিল, তাহা আবার কাটিয়া দিয়াছে ; তারপর আর কিছু বলিয়া সম্বোধন

করে নাই। সে লিখিয়াছে ;—

"তোমার এখান হইতে যাওয়া অবধি আমার মন কেমন করে ;—তোমায় দেখিতে ইচ্ছা করে, তুমি কবে আসিবে ? তুমি কেমন আছ ? আমি ভাল আছি। মা কেমন আছেন ? পত্রের উত্তর দিও ; (কিন্তু তাহা লিখিয়া আবার কাটিয়া দিয়াছে) ইতি। তোমার "সন্ধ্যা।"

সন্ধ্যার ক্ষুদ্র পত্রখানি এই ভাবে শেষ করিয়াছে ; ইহার ভিতর কত কথা লিখিবে না বলিয়া দশবার কাটিয়াছে। শেষে নামটী লিখিয়া আবার মুছিয়া দিয়াছে। প্রবোধ চিঠিখানি পড়িয়া, তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না ; যেন আরো একটু কিছু থাকিলে ভাল হইত ;—যেন কত কথা জানিবার ছিল, কত কথা বলিতে গিয়া তাহাকে বলে নাই ;—সে কারণে একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তারপর শালীর লিখিত পত্রখানি পড়িল, সে লিখিয়াছে :—

"জামাই বাবু, তুমি আমাদের বাড়ীতে এস না কেন ? দিদি যে তোমার জন্য কত ভাবে। সে দিন তোমাকে পত্র লিখিতে গিয়া কত কাগজ ছিড়িয়াছে। তুমি এখানে রোজ রোজ আসিবে ; তা না হইলে আমি রাগ করিব, আর দিদিকেও রাগ করিতে বলিব। তুমি কবে আসিবে লিখিও—কিন্তু একবার আসা চাই। আমি ভাল আছি, তুমি কেমন আছ ? আমি ভাল লিখিতে জানি না তজ্জন্য ঠাট্টা করিও না ; দিদি বেশ লিখিতে পারে ! আর এক কথা, দিদি বড় "কুন্তলীন" ভালবাসে ;—তাহাকে কুন্তলীন পাঠাইয়া দিবে। আমি বলিলাম, এ কথা দিদি যেন না শোনে। ইতি "নলিনী।"

সন্ধ্যা ও নলিনী দুই এক বৎসরের ছোট বড়। নলিনী সন্ধ্যার মেজ কাকার মেয়ে। প্রবোধ সন্ধ্যার পত্র অপেক্ষা নলিনীর পত্রে অনেক খবর পাইয়াছে, কাজেই তাহার ব্যস্ততা একটু কমিয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যার বয়স তের আর প্রবোধের কুড়ি।

প্রবোধ সবে চিঠিখানি পড়া সমাপ্ত করিয়াছে এমন সময় তাহাকে কে ডাকিল ; কাজেই চিঠিব ভাবনা স্থগিত রাখিয়া এখন উঠিতে হইল। প্রবোধের ভাবনা, কি উত্তর দিবে।

৪

প্রবোধের বিবাহের এক বৎসর পরে কোন কারণ বশতঃ প্রবোধের পিতার সহিত তাহার শ্বশুরের একটু মতভেদ উপস্থিত হয়। ক্রমে সে মতভেদ দুই এক মাস তুষানলের মত বাড়িয়া এখন প্রকৃত বিবাদে দাঁড়াইয়াছে। বিষয় সংক্রান্ত গোলযোগ এ মনোমালিন্যের মূল কারণ ;—অন্য আনুসঙ্গিক কারণও থাকিতে পারে। উপস্থিত বঙ্গসমাজে এরূপ বিবাদের ত অভাব নাই ; আজি কালি বৈবাহিকদিগের পরস্পরে এমন অনেক সূত্রে ঝগড়া বাঁধিয়া থাকে। কেননা যার ছেলে সে ভাবে আমি সাত রাজার ধন অমনি বিলাইয়া দিলাম, আর মেয়ে যার সে যেন চোরদায় ধরা পড়িয়াছে ! হয় ত মেয়ের বিবাহে তাহাকে সর্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী হইতে হইয়াছে ;—তথাপিও বরপক্ষীয়েরা অসন্তুষ্ট।

যাহা হউক বিষয় সংক্রান্ত গোলযোগে উভয় বৈবাহিকে বিশেষ একটু বিবাদ বাঁধিয়াছে। এ বিবাদে দোষ উভয়েরই সমান ;—নতুবা অল্পেই বিবাদ মিটিয়া যাইতে পারিত। একারণ প্রবোধের পিতা পড়িবার সময় ইত্যাদি নানা আপত্তি দেখাইয়া তাহার শ্বশুরবাড়ী নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন ; এবং সে জন্য পুত্রবধূটিকেও নিজের বাটীতে আনয়ন করেন নাই। কাজেই এক বৎসরের অধিক হইল প্রবোধ শ্বশুরবাড়ী যায় নাই। পিতার অমতে সে কেমন করিয়া যাইবে। এ এক বৎসর তাহার সহিত সন্ধ্যার দেখা হয় নাই।

সন্ধ্যা একবার মাত্র দেখা করিবার জন্য কত চিঠি লিখিয়াছে, কত অনুরোধ করিয়াছে,

কিন্তু প্রবোধ কি করিবে ! তাহার অন্তঃকরণে একটা দেবাসুরের যুদ্ধ বাধিয়া উঠিয়াছে। প্রাণে শত ইচ্ছা থাকিলেও একদিনের জন্যও সে সন্ধ্যার সহিত দেখা করিতে যাইতে পায় নাই। কেননা পিতার সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা। যেখানে তাঁহার মুখ দেখাদেখি নাই সেখানে যে তাঁহার পুত্র গিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবে, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে।

প্রবোধের মাতা বৌ আনিবার জন্য দু'চারিবার অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিলেন ; "বৌমা এখন বড় সড় হয়েছে, অমন করিয়া বাপের বাড়ীতে ফেলিয়া রাখিলে যে অকল্যাণ হইবে ? বিবাদ তার বাপের সঙ্গে, তার সঙ্গে ত নয় ? তার দোষ কি ?"

প্রবোধের পিতা তাহাতে রাগ করিয়া অনেকবার বলিয়াছেন, তুমি আমায় ও সব কথা বলিও না, যাদের নাম শুন্‌লে মুখদর্শন করিতে ইচ্ছা করে না, তাদের বাড়ীর মেয়ে আনিয়া আমার বাড়ীতে আবার জায়গা দিব ? আমি প্রবোধের আবার বিবাহ দিবার চেষ্টায় আছি।"

"তুমি যে পাগল হ'লে দেখ্‌ছি ; এমন করিলে লোকে কি বলিবে,—ছি ! ছি ! অত বড় বৌ ঘরে না নিলে সাত জনে তোমার দুর্নাম দিবে যে !"

"দিলে ত আর মরে যাব না ! কোন গোলযোগ হয়, নয় দশ টাকা কোরে মাসাহারা দেওয়া যাবে ; প্রবোধের আবার বিয়ে দিতেই হবে।"

"সে যদি না বিয়ে করে ?"

"তবে আমার বাড়ীতে সে বেটার জায়গা হবে না।"

"বেশ তাই কোরো ; তাতে নাম হবে !"

স্বামী স্ত্রীতে এরূপ বাক্‌বিতণ্ডা প্রায় ঘটিত। প্রবোধ তাহা জানিত। সেজন্য মার ইচ্ছা থাকিলেও সে শ্বশুরবাড়ী যাইতে সাহস করিত না।

প্রবোধের পিতা ও শ্বশুর উভয়ের নিবাস কলিকাতা। উভয়েরই যথেষ্ট অর্থসংস্থান আছে।

৫

আজ প্রায় ছয় মাস ধবিয়া প্রবোধ পীড়িত। দশ দিন ভাল আছে, হয়ত হঠাৎ আবার জ্বর আসিল ; এইরূপে সে ছয় মাস ধরিয়া ভুগিতেছে। কলেজে যাওয়া প্রায় ঘটিয়া উঠিত না। বৈকালবেলা হইলেই প্রায় তাহার মাথা ঘুরিত ও চোক জ্বালা করিত। জ্বর সারিলেও মাথাঘোরা সারিল না, ডাক্তার তাহাকে স্থান-পরিবর্তনের জন্য উপদেশ দিলেন। অগত্যা তাহাই ঠিক হইল। প্রবোধ এখন কিছুদিন দেওঘরে গিয়া থাকিবে। দেওঘরে তাহাদের বাড়ী আছে, কাজেই সেখানে অনেক সুবিধা হইবে ;—দেওঘরে স্থান বেশ।

দেওঘরে যাইবার দুই দিন বাকি আছে, প্রবোধ সন্ধ্যার নিকট হইতে এমন সময় একখানি চিঠি পাইল। প্রবোধ কি জন্য জানি না সন্ধ্যাকে তাহার অসুখের কথা জানিতে দেয় না। সন্ধ্যা লিখিয়াছে ;—

"স্বামীন্,

শুনিলাম তুমি নাকি দেওঘরে যাইবে, কিন্তু কই আজও ত তুমি আমাকে তাহার কিছু খবর দিলে না ; আমি তোমাকে পরে পরে ৩/৪ খানি পত্র লিখিলাম তাহারও উত্তর পাইলাম না কেন ? আর আর যাহারা তোমায় চিঠি লিখিয়াছিল তাহারাত তোমার চিঠি পাইয়াছে। তবে দাসী চরণে এমন কি দোষ করিয়াছে, যে তাহার ভাগ্যে এমন বিমুখ হ'লে ? রোজ তোমার পত্রের জন্য কত আশা কোরে বসে থাকি—কিন্তু রোজ প্রায় সকলে চিঠি

পায়, তবে আমি পাই না কেন ?

কবে দেওঘরে যাইবে অনুগ্রহ করিয়া একবার লিখিও। কাল দাদার নিকট শুনিলাম, তুমি নিশ্চয় দেওঘরে যাইবে। তোমার নাকি রোজই জ্বর হয় ? আমাকে তাহা লেখ নাই কেন ? আমার কি তাহা শুনিতে নাই ? তোমায় দেখিতে পাইব না বলিয়া কি তোমার একখানা চিঠি পাইতেও নাই ?

একবার তোমাকে দেখিতে সাধ করে, কিন্তু হতভাগীর ভাগ্যে এত দিনেও ত তাহা ঘটিয়া উঠিল না। তুমি না খোঁজ করিলে আমার অপমান রাখ্‌বার জায়গা কোথায় ? যদি যাও,—একবার দাসীকে দেখা দিয়ে যাইও ;—আমার নিজের যাইবার পথ থাকিলে নিজে যাইতাম ! যাহা হউক তুমি একবার আসিও ;—আমি তোমায় একবার দেখিব ! আমার বলিবার অনেক কথা আছে ;—একবার আসিও।

তুমি কেমন আছ লিখিবে। অনুগ্রহ করিয়া পত্রের উত্তর দিও। ইতি—

তোমার চরণের দাসী—"সন্ধ্যা।"

প্রবোধ পত্র পড়িয়া কেমন হইয়া গেল ; কিন্তু কি করিবে, কাহাকেও বলিবার পথ নাই ;—মাকে বলিতে লজ্জা করে। কাজেই কেমন হইবার কথা। পত্রের কি উত্তর দিবে তাহাও ঠিক করিতে পারিল না, সে জন্য আর উত্তর দেওয়া হইল না। সে পত্রখানি পড়িয়া বালিশের নীচে ফেলিয়া রাখিল। ক্রমে দেওঘরে যাইবার দিন আসিয়া পড়িল।

প্রবোধ ও বাড়ীর সরকার কেবল দেওঘরে যাইবে। যাইবাব পূর্বে প্রবোধ মাব সহিত দেখা করিতে গেল। মা সেই সময় গোপনে বলিলেন "দেওঘরে যাইবার পূর্বে একবার বৌমার সহিত দেখা করিয়া যাইও। সরকার আগে যাক্‌, তুমি পরে যাইও।"

মাতা আর কিছু না বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। প্রবোধের সন্দেহ হইল,—সে তখন চিঠির খোঁজ করিল,—দেখিল চিঠি বালিশের নীচে নাই ;—তখন আর কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না।

৬

প্রবোধ শ্বশুরবাড়ী পদার্পণ করিতে না করিতেই নলিনী ছুটিয়া সন্ধ্যার নিকট হাজিব ! "দিদি, জামাই বাবু আসিয়াছে।" সন্ধ্যা বিশ্বাস করিল না।

কিসে বিশ্বাস করিবে ! সে জানিত প্রবোধ পিতার অনুমতি ব্যতীত আসিতে পাবে না ; কাজেই নলিনীর কথা অবিশ্বাস কবিল। তাহার সুন্দর মুখখানি যেন কিছু গম্ভীর হইয়া উঠিল আয়ত চক্ষু দুটি যেন একটু ভারাবনত হইল। সে সাহস করিয়া নলিনীর কথায় কোন উত্তব দিতে পারিল না, কেবল তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু নলিনীর নিকট সে কিছু লুকাইতে পারিল না। সম্মুখেব প্রকাণ্ড দর্পণে তাহার সে বিষাদ ভঙ্গি প্রতিবিম্বিত হইল। নলিনী তাহা দেখিল, আবার বলিল,

"আমাকে বিশ্বাস করিবে কেন, এর পর সত্য মিথ্যা আপনিই জানিতে পাবিবে।"

তখন সন্ধ্যা জলভরা বড বড় চক্ষু দুটি তুলিযা বলিল, "যদি সত্য আসিয়া থাকে, তবে বাড়ীতে ফিরিযা যাইতে বল্‌।"

"কেন ?" নলিনী মৃদু হাস্য কবিল।

"আমি জানি না—তুই যা।"

নলিনী এখন বিবাহিতা। সে এখন পূর্বাপেক্ষা অনেক বুঝিতে পারে ; হাসিয়া বলিল,

"যাই বলি গে।" কিন্তু তাহার যাওয়া হইল না।

সে যেমন যাইবে অমনি সম্মুখে দিদিমা নতনাড়া দিতে দিতে হাজির ! রঙ্গ দেখিবার জন্য সে আপাততঃ যাওয়া স্থগিত রাখিল। দিদিমা আসিয়াই সন্ধ্যার হাত ধরিয়া বলিলেন, "কিলো ভাব্‌চিস্ কি ? নাত্‌জামাই এসেছে যে ; আর ভাব্‌তে হবে না,—এত দিনের পর ডাক পড়েছে ;—এখন ওঠ্।"

দিদিমার কথায় সত্য সত্যই তাহার প্রাণে তন্দ্রার মত কি এক্‌টা ভাবের উদয় হইল। তাঁহার সে আকর্ষণে সে মন্ত্রমুগ্ধবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। নলিনী তখন সন্ধ্যার মুখের দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিল,—সে হাসিতে সন্ধ্যার মুখেও একটু ম্লান হাসি জাগিয়া উঠিল। কেননা সন্ধ্যা আজ স্বামীকে দেখিতে পাইবে।

৭

দিদিমার, অনুমতিতে সন্ধ্যা আপনিই প্রবোধের সহিত দেখা করিতে গেল ' সে সময় কেবল নলিনী প্রবোধের নিকট ছিল। সন্ধ্যাকে আসিতে দেখিয়া সে আপনা হইতেই চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা কোন কথা না কহিয়া ঘরের ভিতরে গিয়া বসিল। তখন প্রবোধ একটু জলযোগ করিতেছিল। সে সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাস্য করিয়া আবার নিজ কার্যে ব্যস্ত হইল। আজ এক বৎসর পরে এই তাহাদের প্রথম সম্ভাষণ।

প্রবোধ দেখিল, এ এক বৎসরে সন্ধ্যার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে ; প্রথমে সন্ধ্যাকে দেখিয়া হঠাৎ চিনিয়া উঠিতে পারে নাই।

প্রবোধ জলযোগ সারিয়া উঠিল।

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করিল, "কখন্ এলে ?"

সন্ধ্যার সে করুণস্বরে প্রবোধের হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রে যেন অমৃতের স্রোত বহিয়া গেল। একটু চমকিত হইয়া সন্ধ্যার দিকে চাহিল। সন্ধ্যা আবাব জিজ্ঞাসা করিল, "কখন্ এলে ?"

"এখনই আস্‌চি।"

তার পর কত কথা হইল, কত কথা অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়া গেল ; শেষে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমার চিঠি পেয়েছিলে ?"

"পাইয়াছি—কিন্তু চিঠিখানি কে চুরি করিয়াছে।"

"কে আবার চুরি কবিতে যাইবে ?"

"বৌদিদি"

বৌদিদি প্রবোধের বড় ভায়ের স্ত্রী।

"কি কোরে ?" এবার সন্ধ্যা যেন একটু চমকিয়া উঠিল।

"প'ড়ে চিঠিখানি বালিশের নীচে রাখিয়াছিলাম,—বৌদিদি তা টের পায় যে চিঠি তুমি লিখিয়াছ—তার পরে চুরি করিয়াছে ; বোধ হয় মাও তা দেখেছেন। তাই আজ এখানে আস্‌তে পেরেছি ?"

বোধ হয় সে জন্যই প্রবোধের মাতা প্রবোধকে শ্বশুর বাড়ী আসিতে বলিয়াছিলেন। সন্ধ্যা লজ্জায় দুম্‌ড়াইয়া পড়িল, বলিল, "চিঠি মা দেখেছেন ?—তবে আর কখন চিঠি লিখিব না।"

"কেন ?"

"তুমি কেন পড়িয়া চিঠিখানি তুলিয়া রাখিয়াছিলে ?"

"সে দোষ আমার বটে।"

"আর এতগুলো চিঠি দিলাম তার ত একখানা উত্তর দিতে হয় ! সকলে ত তোমার পত্র পে'ত, তবে আমি পে'তাম না কেন ?"

সন্ধ্যা কি এক কাতরভাবে প্রবোধের দিকে চাহিল,—প্রবোধ দেখিল, সন্ধ্যার বড বড় চোকের নীচে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া আসিতেছে। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, সেই অশ্রুসিক্ত গণ্ডস্থলের নীচে একটি চুম্বন করিল ;—"তখন এতদূর বুঝিতে পারি নাই।"

প্রবোধ অন্য কোন উত্তর তাড়াতাড়ি খুঁজিয়া পাইল না।

"তোমার এত অসুখ করিয়াছিল আমায় একবার কি তার খবর দিতে নাই ? আমার কি তোমার খবর জানিবার একটুকুও ইচ্ছা করে না ?"

"কেন এখন ত জানিলে ?"

"জানিলাম যে তুমি দেওঘরে চলিয়াছ !—অসুখ শরীরে একা অতদূর কেমন করিয়া যাইবে ?" বিশালনেত্রে সন্ধ্যা প্রবোধের দিকে চাহিল।

"কেন, এখন ত প্রায় মাসাবাধি কোন অসুখ নাই তবে বৈকালে কেবল মাথা ঘোরে আর চোক জ্বালা করে ; তাই হাওয়া পরিবর্তনের জন্য পশ্চিমে যাওয়া। ডাক্তার বলেন, তা হ'লে সব সেরে যাবে।"

"আমার কাছে মাথা ঘোরার ওষুধ আছে।"

"কি ?"

নিকটে বাক্স ছিল সন্ধ্যা তাহা খুলিল। খুলিয়া একটা শিশি বাহির করিয়া বলিল, "এর একটু মাথায় দাও দেখি, তা হ'লে মাথা বেশ ঠাণ্ডা হবে এখন।"

"এ যে—কুন্তলীন !—এ যে মেয়েরা মাথার চুলের জন্য মাখে।"

"কেন. আমার যখন মাথা ঘোরে তখন ইহার একটু মাথায় দিলে ত সেরে যায়। মার মাথা ঘোরা এই কুন্তলীন মেখে সেরে গেছে।"

"এর বেশ গন্ধ ত।" প্রবোধ অগত্যা একটু মাখিল।

সে বাক্সে আরও অনেকগুলি শিশি ছিল ; প্রবোধ জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি সব কুন্তলীন নাকি ?"

সন্ধ্যা হাসিল, "সব কেন হবে ; এইচ বোসের চামেলী, মতিয়া, দেল্‌খোস্ আরও কত কি সুগন্ধি আছে, আমি অত নাম জানি না ; তবে এর মধ্যে আমি দেল্‌খোস্ ও কুন্তলীন খুব পছন্দ করি।"

"এত সব আসিল কোথা হতে ?"

"কেন তোমবা দিয়েছিলে।"

"তাই আজও আছে ?"

"এখন আমার ও সবে দরকার নেই, তাই তোমার জন্য রেখেছি।"

"অনেকে ত মাখে ?"

"যাবা মাখে তাদের ত আর আমার মত একখানা চিঠির প্রত্যাশায় ভাবিতে হয় না ! তাবা ত আমার মত আর বাপের বাড়ীতে প'ড়ে নেই ! তুমি নিকটে থাকিলে সব মাখিতে পারিতাম,—একটার স্থানে দশটা কুন্তলীন মাখিয়া ফেলিতাম ; কিন্তু যখন তুমি আমার প্রতি বিমুখ তখন কুন্তলীন মাখিয়া কেমন কবিযা সুখী হইব !" সন্ধ্যা বলিতে বলিতে কাঁপিয়া উঠিতেছিল, চোকেব পাতাব উপর অশ্রুবিন্দু নৃত্য করিতেছিল। প্রবোধ আদরে সন্ধ্যাব

হাতখানি লইয়া বলিল, "থাক, ওসব কথা এখন আর তুলিও না,—ওকথা শুনিলে বড কষ্ট হয়, যখন এতদিন গিয়াছে তখন কিছুদিন অপেক্ষা কব, আমি দেওঘর হইতে আসি, তাব পর যা হোক এক্‌টা স্থির করিব।"

"বাবা নাকি তোমার আবার বিবাহ দিবেন ? তবে কি তোমরা আমায় নিয়ে যাবে না ?" সন্ধ্যার গলা ধরিয়া আসিল সে আর কিছু বলিতে পারিল না।

প্রবোধ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার বিবাহ ?"

"তোমার।"

"আমি বিবাহ করিব তাহা কি বিশ্বাস কর ?"

"না।" 'না' বলিতে সন্ধ্যার চক্ষু দুটি জলে ভবিযা আসিল। প্রবোধ আবাব একটি চুম্বন করিল।

"তবে কেন মিছা ভাবিতেছ ?"

"তাই জিজ্ঞাসা করিলাম।"

তাব পর আরও কত কথা হইল।

৮

তার পব প্রবোধ আজ ৫/৬ মাস দেওঘবে আসিয়াছে, এখন সে বেশ সারিয়াছে। দুই এক সপ্তাহের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে ঠিক করিয়াছে।

আজ ১০/১২ দিন হইল সন্ধ্যা তাহাকে কোন পত্র লেখে নাই। প্রবোধ ২/৩ খানি পত্র লিখিয়া কোন খবর পায় নাই। যে পত্র পাঠমাত্র উত্তর দিতে বিলম্ব করিত না। সে এতদিন পত্র লিখিতেছে না কেন, তাহাই প্রবোধের চিন্তাব বিষয় হইল ;—সেজন্য দেওঘর হইতে আসিবার নিমিত্ত একটু বেশী ব্যস্ত।

আরও ৪/৫ দিন পরে প্রবোধ নলিনীর নিকট হইতে একখানি পত্র পাইল। নলিনী তাহাতে লিখিয়াছে—

"জামাই বাবু, দিদির বড অসুখ করিয়াছিল বলিয়া তোমায় পত্র দিতে পারে নাই,—আজও ভাল সারে নাই ; একটু সারিলে তোমায় পত্র লিখিবে বলিয়াছে। সে আজও পথ্য করে নাই,—তোমার জন্য বড় ভাবে, একা থাকিলেই কেবল কি ভাবে, কখন কখন কাঁদিতে দেখিয়াছি, তুমি কবে আসিবে ? আমি ভাল আছি। তুমি কেমন আছ ? আজ তবে আসি।

"নলিনী।"

প্রবোধ চিঠিখানি পড়িয়া একটু বেশী গম্ভীর হইয়া পড়িল। দেওঘর হইতে আরও শীঘ্র আসিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল।

প্রবোধ বাড়ীতে আসিবে সব ঠিক, কেবল রওনা হইতে বিলম্বমাত্র। যে দিন প্রবোধ চলিয়া আসিবে, কোথাও কিছু খবর নাই, প্রবোধের পিতা সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেন এমন হইল ?

প্রবোধ শুনিল, তাহার নাকি বিবাহ। কলিকাতায় কোন ভদ্রলোক দেওঘরে আসিয়া মেয়ের বিবাহ দিয়া যাইবেন। তাঁহারা প্রবোধের পিতার সহিত এক সঙ্গে আসিয়াছেন। বিবাহের আর ১০/১২ দিন বিলম্ব আছে মাত্র। প্রবোধ খবর শুনিয়া দমিয়া গেল।

কোথায় কতক্ষণে সন্ধ্যার সহিত দেখা করিবে ভাবিতেছে, তা নয় আবার বিবাহ! প্রবোধের মাথায় একেবারে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রবোধ সকলকে বলিল, সে বিবাহ

করিবে না। কিন্তু কেহ সাহস করিয়া তাহার পিতাকে বলিতে পারিল না। মাতা অনেক বলিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে অগত্যা থামিয়া যাইতে হইয়াছে। দেশে হইলে যদি কোন বাধা পড়ে, তাই দেওঘরে বিবাহ হইবে। বিবাহের সব ঠিক কেবল নির্দ্ধারিত দিনের অপেক্ষা মাত্র। কিন্তু কে বিবাহ করিবে ? প্রবোধ ?

প্রবোধ বিবাহ করিবে না। ক্রমে দিন যাইতে লাগিল, বিবাহের দিন আসিল,—তথাপি প্রবোধ আর কিছু বলিল না।

সেই দিন বেলা দশটার সময় প্রবোধের নামে একখানা টেলিগ্রাম আসিল, "সন্ধ্যার পীড়া বড় কঠিন, তুমি শীঘ্র কলিকাতায় আসিবে,—ডাক্তার কোন আশা দিতেছে না।"

টেলিগ্রাম করিয়াছে প্রবোধের এক শালা। সে পিতাকে টেলিগ্রামখানি দেখাইল। তিনি পড়িয়া বিরক্তির সহিত টেলিগ্রাম ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। প্রবোধ অগত্যা চলিয়া আসিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল,—তখনও প্রবোধ বাড়ীতে, সে যেন সত্য সত্য বিবাহ করিবে। মার নিকট একবার টেলিগ্রামের কথা বলিয়াছিল, তিনি বলিলেন, "কি করিব,—কথা শুনিলে দুটো বুঝাইতে পারিতাম, কিন্তু তুমি ত সব জান বাবা ?" প্রবোধ আপনার ঘরে ফিরিল।

বর যাইবার সময় হইল। বর কোথায় ?

কে বলিল, "তাহার পড়িবার ঘরে।"

কিন্তু পড়িবার ঘর শূন্য। শুধু একখানা ছাড়া কাপড় পড়িয়া আছে,—আর কিছু নাই !

"প্রবোধ ! প্রবোধ !" চারিদিকে ডাকাডাকি পড়িয়া গেল, কিন্তু প্রবোধকে কোথায় পাইবে, প্রবোধ তখন ট্রেণে ;—প্রবোধ সন্ধ্যার নিকটে চলিয়াছে।

৯

সন্ধ্যা সারিয়া উঠিবার মুখে শুনিল, প্রবোধের বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে ;—বিবাহ দেওঘরে হইবে। বিবাহের কথা কি কখন গোপন থাকে ? সে পৃথিবী শূন্য দেখিল,—প্রবোধের বিবাহের কথা শুনিয়াই সে যেন কেমন এক রকম অজ্ঞানের মত হইয়া পড়িল,—তাহার পর খুব জোরে জ্বর আসিল।

নলিনী সর্বদা নিকটে থাকিত। সে একদিন নলিনীকে ডাকিয়া বলিল, "ভাই তোদের জামাইবাবুর যদি কখনও দেখা পাস্ বলিস্ যেন এবার বিবাহ করিয়া তাহাকে বাপের বাড়ীতে ফেলিয়া না রাখে। আমার সঙ্গে বোধ হয় আর দেখা হবে না, আমি আর বাঁচিব না,—আমার বুকের ভিতর কেমন করে।"

নলিনী কিছু বলিতে পারিল না, চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া গেল। আর সন্ধ্যা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বক্ষ ভাসাইয়া দিল।

আজ সকালে হঠাৎ সন্ধ্যার মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়াছে ; ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিল, যক্ষ্মা হইয়াছে ;—বাঁচিবার আশা অল্প, এমন কি হঠাৎ ২/৪ দিনেও মৃত্যু হইতে পারে।

অমনি প্রবোধকে টেলিগ্রাম করা হইল। প্রবোধও যেদিন টেলিগ্রাম পাইল সেই দিনই কলিকাতায় যাত্রা করিল।

যখন সে শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যার অবস্থা বড় শোচনীয়। কেহ প্রবোধকে দেখা করিতে দিবে না, কিন্তু প্রবোধ তাহা শুনিল না, সে জোর করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। সন্ধ্যা তখন চাহিয়াছিল,—সে স্থিরনেত্রে কতক্ষণ প্রবোধের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রবোধ সাগ্রহে বলিল, "সন্ধ্যা, আমি আসিয়াছি।" সন্ধ্যা একটু ম্লানহাসি হাসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

দারুণ উদ্বেগে তাহার শীর্ণ দেহখানি চমকিয়া উঠিল ; চোখের কোণ দিয়া অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া আসিতে লাগিল। প্রবোধ আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না।

তার পর ক্রন্দনের শব্দে বাড়ী ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তখন প্রবোধ উন্মত্তের ন্যায় পথে ছুটিয়াছে। হায় ! সুবর্ণ প্রদীপ অকালে নির্বাপিত হইয়াছে !

তার পর যখন প্রবোধের খোঁজ হইল, কেহ তখন আর তাহার সন্ধান বলিতে পারিল না। সে পর্যন্ত প্রবোধ আজও নিরুদ্দেশ। কেহ জানে না, প্রবোধ কোথায় গিয়াছে।

আর যাহার সহিত প্রবোধের দ্বিতীয় বার বিবাহের কথা হইয়াছিল, তাহার সে রাত্রেই অপর একজনের সহিত বিবাহ হইয়া গিয়াছে। অর্থ থাকিলে মেয়ের বিবাহের আব ভাবনা কোথায় !

শশিভূষণ দত্ত

হেমমালা

কপালীপুরের রাজাদের দেওয়ান, চক্রধর মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাব একমাত্র সুরূপ পুত্র ধরণীধরের বিবাহ দিয়া, কৌলীন্য মর্যাদাস্বরূপ বহু অর্থ সংগ্রহ করিবেন, আশা করিয়াছিলেন। পুত্রটি যাহাতে 'পাশকরা' নামে আখ্যাত হইয়া, বধূ সহিত পাঁচ সহস্র টাকাব অলঙ্কার, রূপার দান ও তৎসঙ্গে নগদ হাজার দশেক টাকা উপার্জন করিতে পাবে, সেজন্য তাঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। বহু অর্থব্যয়ে তাহাকে কলিকাতায় রাখিযা শিক্ষা দিতেছিলেন. কিন্তু পুত্র ধরণীধর কষ্টে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, যৌবনে পদার্পণেব সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া অপেক্ষা, কুসঙ্গে মিশিয়া নানা ব্যসনে শিক্ষিত হওযা অধিক মূল্যবান মনে করিল !

মুখোপাধ্যায় মহাশয় যখন লোকমুখে ধরণীধরের কীর্তিকাহিনী শুনিলেন তখন অচিরে তাহার সুখের বাসা ভস্ম হইয়া গেল। পুনরায় তাহাকে দেশে আসিয়া পিতৃশাসনেব অধীন হইতে হইল। বাহিরে পিতার যথেষ্ট শাসন রহিল বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ধরণীর পিতামহী ও জননী সময়ে সময়ে একমাত্র বংশধরের একটুকু আদর আবদাব না রাখিয়া পারিতেন না। যাহা হউক বাটী আসিয়া ধরণীধরের উৎসন্ন যাইবাব পথটি কিছু সংকীর্ণ হইয়া পড়িল। কিন্তু সে পাপের মোহময় লালসা কিছুতেই ভুলিতে পারিল না।

বিচক্ষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুত্রটীকে সুপথে আনিবার শেষ উপায়, একটি সুন্দবী বধূ গৃহে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রভূত ধনলাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল।

তিন চারি মাস পর বেলডাঙ্গার আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যার সহিত বিবাহ স্থির হইল। হেমমালার বিধবা মাতার চারি সহস্র টাকা, এবং এই রূপবতী কন্যা ভিন্ন সংসারে কোন আশার স্থল ছিল না। একজন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তাঁহার আশ্রয়স্বরূপ ছিলেন। তিনি ভগ্নীকে স্নেহের চক্ষে দেখিলেও তাঁহার পত্নীর নিকট হেমমালার জননী কখনও সংব্যবহার পাইতেন না। তাঁহাদের গ্রামস্থ বিদ্বান বুদ্ধিমান জমিদাব, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী হেমমালার রূপলাবণ্য এবং মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন,

কিন্তু সমাজ ভয়ে ভীতা হইয়া হেমমালার মাতা তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি কুলীনকন্যা হেমমালাকে গোত্রীয় ব্রাহ্মণে দান করিয়া স্বর্গীয় স্বামীর বংশে কলঙ্ক অর্পণ করিতে ভীতা হইলেন ; কিন্তু এই সৎ যুবকের করে কন্যা অর্পিত হইলে হেমমালার ও তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন যে কত সুখের হইত, সে বিষয় চিন্তা করিলেন না। এমন সময় হেমমালার মাতুল ধনুর্দ্ধর ধরণীধরের সহিত তাহার বিবাহ প্রস্তাব স্থির করিয়া দিলেন। হেমমালার মাতা তাঁহার শেষের সংস্থানের দিকে দৃষ্টি না করিয়া তাঁহার যথাসর্বস্ব চারি সহস্র টাকা জামাতার মানমর্যাদা, দানসামগ্রী এবং কন্যার অলঙ্কারে ব্যয় করিতে সম্মত হইলেন, তিনি ভ্রাতার হস্তে বিবাহের যাবতীয় ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার জামাতা ধনীর সন্তান এবং সম্ভ্রান্ত কুলীন, ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট সুখের বিষয় হইল। তখনও অভাগিনী জননী জানিতেন না, যে এই বিবাহই হেমমালার কালস্বরূপ হইবে।

তাঁহার যথাসর্বস্ব ব্যয় করিয়া জামাতার যোগ্য ধূমধামে বিবাহ সম্পন্ন হইল, কিন্তু তাহাতেও বরপক্ষের মনস্তুষ্টি হইল না। হেমমালা শ্বশুরালয়ে গমন করিল। বৃদ্ধ শ্বশুর তাহার কমনীয় মুখকান্তি দেখিয়া ধনলোভ সম্বরণ করিলেন। তিনি তাহাকে মাতৃ-সম্বোধনে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া তৃপ্ত হইলেন। তাহার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী মনে মনে রূপবতী বধূর প্রশংসা করিলেও এই বধূ গৃহে আনিয়া যে তাঁহার গুণধর পুত্রের মানমর্যাদাযোগ্যপ্রাপ্য পাওয়া যায় নাই, এই বিষয় সকলকার সমক্ষে বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হেমমালাকেও এই জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহার গঞ্জনা সহ্য করিতে হইত।

মায়ের আদরিণী কন্যা শ্বশুর গৃহের অনাদরে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। সে সভয়ে কাতর নয়নে সকলের মুখপানে চাহিত, যেন কতই করুণা ভিখারিণী। কিন্তু একজন তাহাকে কন্যার ন্যায় অতি আদরে ক্রোড়ের নিকট টানিয়া লইতেন, তাঁহার আগমনে শ্বশ্রূর কঠোর কটু বাক্য সংযত হইত, তিনি হেমমালার স্নেহশীল শ্বশুর। হেমমালা অতি আগ্রহের সহিত তাঁহার আগমন অপেক্ষা করিত ; যখন তিনি 'মাজননী' সম্বোধনে অন্তঃপুরে পদার্পণ করিতেন, তখন কারারুদ্ধা বন্দিনীপ্রায় হেমমালার ক্ষুদ্র অন্তঃকরণ আনন্দে নাচিয়া উঠিত। সে অর্দ্ধঘোম্‌টাবৃত হইয়া শ্বশ্রূর আদেশে কখন জলখাবারের রিকাবীখানা, কখন পানের ডিবাটি হস্তে লইয়া তাঁহার সমীপবর্তিনী হইত। লজ্জায় তাহার মুখখানি রঞ্জিত হইয়া উঠিত, সেই লজ্জারঞ্জিত কমনীয় মুখ, সেই সুগৌর সুঠাম দেহ, বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্তরে আনন্দরাশি ঢালিয়া দিত !

কিন্তু সেই বিনীতা বধূর অন্তরে বড়ই বেদনা। বিবাহের পর একদিনের জন্যও সে মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পায় নাই। দুঃখিনী মায়ের বিষাদময়ী মূর্তি সর্বদা তাহার অন্তরে জাগিয়া থাকে। তাহার দুঃখে সহানুভূতি করা দূরে থাকুক, তাহাকে রোদন করিতে দেখিলে শ্বশ্রূ তিরস্কার করেন।

বিবাহের পর কয়েক দিন ধরণীধরের অন্তরে হেমমালার সুন্দরী বালিকা মূর্তি জাগিয়া উঠিত। সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সে দুই একবার তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য গিয়াছিল। কিন্তু তাহার নির্বাক ক্রন্দনে ত্যক্ত হইয়া মাতার নিকট হেমমালাকে কিছু দিনের জন্য পিত্রালয়ে পাঠাইবার নিমিত্ত অনুরোধও করিয়াছিল ; কিন্তু ধনীর কন্যা ধনীর ঘরণী হেমমালার শ্বশ্রূ দরিদ্রা বৈবাহিকার গৃহে বধূ প্রেরণ করিতে বড়ই আপত্তি করিলেন। তাঁহার গবোক্তিতে ধরণীর মত নিমিষে পরিবর্তিত হইল।

দিবসে বধূর সহিত সাক্ষাৎ করা ধরণীধরের নিষিদ্ধ ছিল, রাত্রেও সাক্ষাৎ করিবার অবকাশ ঘটিত না। এই সকল কারণে ধরণীধরের সহিত হেমমালার কোন সংস্রবই ছিল

না। হেমমালারও প্রত্যহ দানের রৌপ্য ডিবাটি মার্জিত করিয়া কয়েকটি তাম্বুল প্রস্তুত করিয়া রাখা ভিন্ন স্বামীর প্রতি অন্য কোন করণীয় ছিল না। দৈবাৎ ধরণীর সম্মুখে পড়িয়া গেলে সে ছুটিয়া গৃহকোণে লুকাইত। পুত্র যাহাতে বধূর বশ না হইয়া যায়, ধরণীর মাতা সে বিষয়ে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। অসৎ পুত্রকে বধূর সংসর্গে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, তিনি বৃথা ধনমানের গর্বে মত্ত হইয়া বরং তাহাতে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিলেন। ধরণীর বৃদ্ধ পিতা ও পুত্র ও পত্নীর কুব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইয়া তাহাদের আর কোন কথাই বলেন না। তাঁহারা তাঁহার শাসনের বাহির হইয়া গিয়াছে। এইরূপে কুনীতি কুসংসর্গ ধরণীধরকে কিছুতেই সৎপথে অগ্রসর হইতে দিল না।

সে বাটীতে দাসী বগলাই তাহাব সখী ও প্রহরী। সে ভিন্ন হেমমালার সুখ দুঃখেব সংবাদ লইতে অপর কেহ ছিল না। যখন রজনীতে শয্যায় শুইয়া মাতার স্নেহময মুখ স্মবণ হইলে, তাহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিত, তখন বগলা আসিয়া সস্নেহ বাক্যে সান্ত্বনা দিত, চক্ষের জল মুছাইয়া দিত।

মধ্যে মধ্যে তাহার দুঃখিনী জননীর দুঃখকাহিনী, তিনি যে তাহার অদর্শনে জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছেন, এই সকল কথা লোকমুখে সংবাদ পাইত। তাহাতে তাহাব প্রাণ ছটফট কবিত, মাতৃবৎসলা কন্যা চক্ষেব জলে ভাসিয়া বলিত, 'মা দুর্গা, আমার দুঃখিনী মাতাব দুর্গতি হরণ কর'। ইহা ভিন্ন তাহার অপর কোন শক্তিই ছিল না।

এইরূপে দুই বৎসর চলিয়া গেল। হেমমালা এখন চতুর্দশ বর্ষীয়া যুবতী; জ্যোৎস্নাপ্লাবিত অর্দ্ধস্ফুট কুসুমেব ন্যায় তাহার রূপরাশি ফুটিযা উঠিয়াছে। স্বামী দুশ্চরিত্র, তাহার সেই লাবণ্য পরিপূর্ণ সুন্দর মূর্তি দেখিবার কেহ নাই।

একদিন বৈকালে বগলা তাহার বেশবিন্যাস করিয়া দিয়া গাত্র ধৌত করিবাব জন্য খিড়কীর পুষ্করিণীতে লইয়া গেল। শুভক্ষণে এমন সময় ধবণীধব খিড়কীর বাগানে গিয়াছিলেন। তাহারা তাহা জানিতে পারিল না। নিঃশঙ্কচিত্তে হেমমালা অবগাহন করিযা ধৌত বস্ত্রখানি হস্তে লইয়া বগলার অপেক্ষা করিতে লাগিল। উভয়ে নিঃসঙ্কোচে কথাবার্তা কহিতে লাগিল। ধরণীধর এমন সময় ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বগলা ধরণীকে দেখিযাও হেমমালাকে জানাইল না; তাহার সহিত সহাস্যে কৌতুক করিয়া বিলম্ব করিতে লাগিল।

ধরণী একদৃষ্টে সেই অনুপম রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইল। সে হতভাগ্য নিজ পত্নীর রূপ কখন চাহিয়া দেখে নাই। সে অনুতপ্ত হইয়া মনে মনে বলিল, ধিক আমাকে এমন হেমকুসুম অযত্নে ফেলিয়া, কি কুহকে মজিয়া আছি? তাহার অন্তর ব্যথিত হইল। সে দিন হেমমালা তাহাকে যে হেমনিগড়ে বদ্ধ করিল, সে সহসা সে বন্ধন মুক্ত করিতে পারিল না।

গৃহ-প্রত্যাগমনের জন্য হেমমালা ফিরিয়া দাঁড়াইল, ধরণীধরকে উপরে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাহার আপাদমস্তক কম্পিত হইল। ভাবিল না জানি অদ্য অদৃষ্টে কি আছে! সে দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া, বগলার পশ্চাৎবর্তী হইল। যাইবার সময় সূক্ষ্ম বস্ত্রের ভিতর হইতে দেখিতে পাইল, অদ্য সেই রুদ্রমূর্ত্তি নহে, করুণ কমনীয় দৃষ্টি! সে দেখিয়া বিস্মিত হইল।

সেই দিন রজনীতে সে যখন একাকী নিজ কক্ষে শয়ন করিয়া বগলার অপেক্ষা করিতেছিল; তখন বৈকালীন ঘটনা স্মরণ হইয়া, তাহার দুর্ভাগ্য তাহার নিষ্ফল প্রেম, অন্তরকে বড়ই ব্যথিত করিতে লাগিল। সে সেই মর্ম্মবেদনায় ক্লিষ্ট হইয়া নীরবে দীর্ঘশ্বাসের সহিত সকল যাতনা দূর করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

সহসা কক্ষে পদশব্দ শ্রবণ করিয়া ভাবিল, বগলা কার্যশেষে শয়ন করিতে আসিয়াছে। সে অবসাদক্লিষ্ট নয়ন মেলিল না। কিছুক্ষণ পরে বগলাকে নির্বাক থাকিতে দেখিয়া নয়ন

মেলিয়া দেখে, পালঙ্কের অদূরে ধরণীধর দাঁড়াইয়া। সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে! সে ত্রস্ত হইয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া দাঁড়াইল। ধরণীধর নীরবে আসিয়া পালঙ্কে উপবেশন করিল। হস্তের কয়েকটী কাগজবেষ্টিত দ্রব্য পার্শ্বে রাখিয়া হেমমালার হস্ত ধরিয়া নিকটে আনিয়া অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিল।

হেমমালার অন্তরে প্রবল ঝড় বহিতেছে, সে অবাক! সংজ্ঞাশূন্যাপ্রায় সে মাটিতে বসিয়া পড়িল। তাহার হস্তপদ শীতল হইয়া গেল।

ধরণীধর হেমমালার অবস্থা কিছুই অনুভব করিতে পারিল না। সে পবিত্র প্রেমের মর্যাদা কি বুঝিবে? আজ যে সে হেমমালার কক্ষে আসিয়াছে, সে কেবল রূপে মুগ্ধ হইয়া। তার অন্তর কিছু অনুতপ্ত। ক্ষণেক পরে বলিল, "হেমমালা! তুমি কি আমাকে দেখিয়া ভীত হইয়াছ? তুমি আমাকে ঘৃণা কবিও না। আমি একদিনও তোমাব মুখপানে চাই নাই, যা খুসী করিয়াছি; এখন হইতে আমি ভাল হইব।" হেমমালা স্বামীর নিকট এমন ব্যবহার পাইবে? এযে স্বপ্নের অগোচর!

হেমমালার কণ্ঠ শুষ্ক; তাহার মুখ দিয়া, কোন কথাই বাহিব হইল না।

কিছুক্ষণ পরে ধরণীধর বলিল, "আমি এখন যাই; তোমাকে এই কয়টী জিনিস দিয়া গেলাম তুমি ব্যবহার করিও। আমি মধ্যে মধ্যে আসিব।" আবেগে হেমমালার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু স্বভাবের দোষ যায় নাই। পতির সহিত আলাপ করিতে তাহাব লজ্জা বোধ হইল।

ধরণীধর প্রস্থান করিল। হেমমালা তন্ময়চিত্তে জীবনের মধুময় ঘটনা ভাবিতে ভাবিতে বিভোর হইয়া ভূমিতে শুইয়া পড়িল।

ক্ষণেক পরে বগলা আসিযা সস্নেহে বলিল, বৌদিদি, মাটীতে শুইযা কেন? দাদাবাবু আজ এঘরে আসিয়াছিলেন দেখিলাম, তোমাকে কিছু বলিলেন কি? হেমমালা লজ্জিত হইয়া, উঠিয়া খাটে বসিল। এমন সময়ে বগলার সেই কাগজ বেষ্টিত জিনিসগুলির উপর দৃষ্টি পড়িল। সেইগুলি হস্তে লইয়া সে হেমমালাকে বলিল, এগুলি বুঝি দাদাবাবু দিয়া গেলেন? দেখ দেখি কি? হেমমালা আগ্রহে খুলিয়া দেখিল, একটি সুন্দর জাপান-বাক্সের ভিতর এক শিশি "কুন্তলীন", এক শিশি এসেন্স "দেলখোস্", একখানি সুন্দর চিরুণী ও একখানা সুগন্ধি সাবান। বগলা হাসিয়া বলিল, বৌদিদি তোমার কপাল এবার ফিরেছে, দেখ দাদাবাবু আদর করিয়া তোমাকে কত সুগন্ধি দিয়া গিয়াছেন; এস তোমাকে একটু মাখাইয়া দি। সে এসেন্সের শিশিটি খুলিয়া দুচারি ফোঁটা তাহার গায়ে ছড়াইয়া দিল, চারিদিক সুগন্ধে আমোদিত হইযা উঠিল; হেমমালা সহাস্যে বলিল, এযে ফুলের গন্ধে মাতিয়ে দিল, যেন ফুলশয্যা আর কি! যা আব দিতে হবে না। বগলা তাহার গাল টিপিয়া বলিল, না আমি আর দিব না, কাল দাদাবাবু নিজে আসিয়া দিয়ে দিবেন; তখন ফুলশয্যাটী ভাল ক'রে মাত্‌বে, না? কথাবার্তা কহিতে কহিতে বগলা ঘুমাইয়া পড়িল। হেমমালাও কত সুখের কল্পনা করিতে করিতে নিদ্রিত হইল। স্বামীপ্রদত্ত সুবাসে ভূষিতা হইয়া না জানি সে কত সুখের স্বপ্নে সুখরজনী প্রভাত করিল!

কয়দিন যাবত হেমমালা বড়ই প্রফুল্ল। তাহার স্বামী তাহার সহিত দেখা করিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে দেখা করিবেন বলিয়াছিলেন; সে সেই আশায় বুক বাঁধিয়া বড়ই আগ্রহের সহিত প্রতি রাত্রে অপেক্ষা করে।

বগলা প্রত্যহ বৈকালে পরিপাটী করিয়া, তাহার কেশবিন্যাস করিয়া দেয়; দু'এক বিন্দু কুন্তলীনে সিন্দুর গুলিয়া, তাহার ললাট ও সীমন্ত শোভিত করিয়া দেয়। হেমমালার আশার

বিরাম নাই। সে তেমনি প্রতিদিন তাম্বুলাধারটী সুমার্জিত করিয়া, সযত্নে তাম্বুলগুলি প্রস্তুত করিয়া রাখে। তেমনি করিয়া প্রত্যহ অবসর কালে জানালায় দাঁড়াইয়া বহির্বাটির উদ্যানের দিকে চাহিয়া থাকে, যদি সহসা তাহার প্রণয়াস্পদের দেখা পায়। এইরূপে ৬/৭ দিন কাটিয়া গেল, অভাগিনীর আশা আর পূর্ণ হইল না।

একদিন মর্মব্যথা গোপন করিতে না পারিয়া বগলাকে বলিল, কৈ আসিব বলিয়া চলিয়া গেলেন, আর ত আসিলেন না ? বগলা বলিল, কি বলিব বৌদিদি সকলি অদৃষ্টের দোষ, নতুবা তোমার মত সুন্দরী গুণবতী মেয়ের এমন দশা হয় ! দাদাবাবু যে কেন এমন হইয়া রহিলেন জানি না ; রথের ধুমে কি আর তাঁর তোমাকে মনে আছে। রাজবাড়ীতে রাজকুমারেব মহলে যে গান বাজনার ঘটা দেখিয়া আসিলাম, তিনিও সেখানেই মত্ত। এ সংবাদে হেমমালা অন্তরে বড়ই আঘাত পাইল। ধীরে ধীরে জানালার পাখিটী খুলিয়া ধাপের উপর বসিয়া পড়িল। অন্য মনে কতই কি ভাবিতে লাগিল, তাহার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল।

এমন সময় গাড়ীর শব্দে তাহার চৈতন্য হইল ; চাহিয়া দেখিল, ধরণীধর টলিতে টলিতে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া বহির্বাটির নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এই ঘৃণিত দৃশ্য তাহাকে মরণের পথে টানিয়া লইল। মনে মনে বলিল, যদি স্ত্রী হইয়া স্বামীকে সুপথে না আনিতে পারিলাম ; স্বামী যদি আমাদ্বারা সুখী না হইয়া, ঘৃণিত কার্যেই সুখ পাইলেন ; তবে আমার জীবনে ফল কি ! আমি কেন এই সকল দেখিয়া জ্বলিয়া মরি ! ইহাপেক্ষা আমার মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। সে অবসাদ-ক্লিষ্ট অন্তরে সেখান হইতে জানালাটী বন্ধ করিয়া উঠিয়া আসিল।

পরদিন দ্বি-প্রহরে ধরণীধর আহারে বসিয়াছেন। হেমমালা স্নানান্তে ভাণ্ডার গৃহের দ্বারা দণ্ডায়মান হইয়া, মাতাপুত্রের কথোপকথন শুনিতে লাগিল। আহাবান্তে ধরণী মাতা পুত্রকে তাম্বুল দিবার জন্য তাম্বুলাধারটী হস্তে লইয়া বধূর চতুর্দশ পুরুষকে পর্যন্ত পরুষ ভাষায় গালি দিতে লাগিলেন। হেমমালা ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া ভাবিল, কি দুষ্কর্ম করিলাম ! হেমমালার শ্বশ্রূ ডিবাটী আছড়াইয়া বলিলেন, "দেখেছ, জুয়াচোরেরা রূপার দান দিয়াছে ! এযে পিতল বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বৌএর রূপ ধুয়ে কি জল খাইব ? ছি ! ছি ! ভয় নাই লজ্জা নাই, মায়ে ঝিয়ে গলায় দড়ি দিয়া মরুক ; আমি কালই ছেলের বিয়ে দিচ্চি।" বাটীর সকলে আসিয়া দেখিল, সত্যই ডিবাটী মার্জিত করিতে করিতে পিতল বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সকলে অবাক, দেওয়ান মহাশয়ের চক্ষে ধূলা দেওয়া ; কি সাহসী স্ত্রীলোক ! এদিকে অর্থলোভে হেমমালার মাতুল যে বিধবার এমন সর্বনাশ করিয়াছে, তাহা তিনি ঘুণাক্ষরেও জানিতেন না।

দুর্ভাগ্যক্রমে দু'একখানি গহনাও গিল্টির পাওয়া গেল ; হেমমালার গঞ্জনার সীমা রহিল না। ধরণীধর তর্জন গর্জন করিয়া বলিল, "বেটীর এত বড় স্পর্দ্ধা ! হয়েছে কি, বেটীকে আদালতে দাঁড় করাইব।" শুনিয়া ঘৃণায় ভয়ে হেমমালা মরিয়া গেল। ভাবিল সত্যই যদি ইহারা মাকে নির্যাতন করে, তা আর দেখিতে পারিব না ; ইহার আগে পালাইতে হইবে। আর সহ্য হয় না ; কত লোক দুঃখে পড়িয়া, আত্মহত্যা করে। আমারও যথেষ্ট হইয়াছে ; আজ আফিং খাইয়া সকল জ্বালা দূর করিব।

অহিফেন সংগ্রহ করিতে তাহাকে অধিক কষ্টস্বীকার করিতে হইল না। বৃদ্ধ শ্বশুরের অনুপস্থিতির সময় তাঁহার কক্ষে গিয়া, তাঁহার শয্যাতল হইতে অহিফেনের কৌটাটী লইয়া লুকাইল।

যখন সন্ধ্যার অন্ধকার পৃথিবীকে ঢাকিতেছে ; তখন মরণের ভীষণ অন্ধকার, হেমমালাকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইল। হেমমালা অতি আগ্রহের সহিত জীবননাশক পরিমাণ অহিফেন ভক্ষণ করিল। নির্বাক বধূ এতদিন যে উৎপীড়ন সহ্য করিয়া আসিতেছিল, তাহা আজ অসহ্য হইয়াছে। স্বামীর দুর্ব্যবহার, শ্বশ্রূর কটূক্তি, মাতার অদর্শন, তাহাকে মরণের পথে টানিয়া লইল। সে শান্তির আশায় নিজেকে স্বহস্তে মৃত্যুর পদতলে টানিয়া লইয়া, যেন চিরশান্তিদাতার শরণাগত হইল।

দিবসের ব্যাপারে সকলেই নিন্দাচর্চায় ব্যাপৃত ; সমস্ত দিবস, কেহই হেমমালার সন্ধান করে নাই। কর্ত্রীর ভয়ে বগলাও তাহার কক্ষের সম্মুখীন হইতে সাহসী হয় নাই। অনেক রাত্রে যখন গৃহিণী বিশ্রামার্থ গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন বগলা উপবাসিনী হেমকে আহার করাইবার জন্য চেষ্টা করিতে আসিল।

হায় ! কাহাকে আহার করাইবে। এতক্ষণ নীরবে মৃত্যু যাতনা ভোগ করিয়া হেমমালা অচেতন। তাহার চক্ষুতারা স্থির ! চতুর্দশ বর্ষীয়া স্ফুরিত যৌবনা বালিকার লাবণ্যে দেহ ঢল ঢল করিতেছে ; আজ আর সে চাঁদমুখ অবগুণ্ঠনাবৃত নহে। কিন্তু হায় ! সুগৌর কমনীয় বদন বিষে নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে !

বগলা এই মর্মভেদী দৃশ্য দেখিয়া, ভূমিতে লুঠিয়া চীৎকার শব্দে রোদন করিতে লাগিল। তাহার রোদন শব্দে বাটীর সকলে সেই কক্ষে একত্রিত হইল। হেমমালার অপঘাত মৃত্যু দর্শনে, সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। কিন্তু রাক্ষসী শ্বশ্রূর অন্তরে আঘাত লাগিল না। তিনি গালে হাত দিয়া বলিতে লাগিলেন ; "মুখে কথাটী ছিল না" কিন্তু অন্তরে বিষম রাগী না হইলে কি এমন হয় ? অভাগীর মেয়ে বিষ খেয়ে মরিবে তা জানিতাম না ; আমি আর উহাকে কি অন্যায় বলিয়াছিলাম, এতেই বিষ খাওয়া ! একালের মেয়েদেব চাল চরিত্রি বুঝা ভার !"

হেমমালার সুখ-দুঃখভাগিনী স্নেহময়ী দাসী বগলা, পাগলিনীর ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে সে বাটী পরিত্যাগ করিয়া গেল।

দাবাক্রীড়ামত্ত ধরণীধর যখন সহসা হেমমালার মৃত্যু-সংবাদ অবগত হইল, তখন তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। কে যেন তাহার অন্তরে কঠোরস্বরে বলিল ; "তুই এই নিৰ্দ্দোষী বালিকার হন্তা।" সে ক্রীড়া ত্যাগ করিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় সেই কক্ষে উপস্থিত হইল।

তখন হেমমালার প্রাণপাখী সুন্দর দেহপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া উড়িয়া পলাইয়াছে ! কিন্তু তার বিষাদক্লিষ্ট করুণ নয়ন দুটী, কাহাকে দেখিবার জন্য যেন বড় আগ্রহভরে চাহিয়া আছে ! বুকের ভিতর যে অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল, লজ্জাশীলা বধূ যেন গুরুজনের নিকট তাহা গোপন করিবার জন্য ভূমিতে বুক দিয়া চাপিয়া আছে !

আত্মীয় স্বজনগণ যখন সেই লক্ষ্মীরূপার ক্ষুদ্র দেহখানি সৎকারার্থ উঠাইয়া লইল, তখন সকলে সাগ্রহে দেখিল ; হেমমালা একটী বাক্স অতি যত্নে বুকে করিয়া আছে। হতভাগ্য ধরণীধর চাহিয়া দেখিল, সেটী তাহার প্রদত্ত সেই উপহার ! সেই জাপান বাক্সে সেই কুন্তলীন ও এসেন্স দেল্‌খোসের শিশি ইত্যাদি ; সেই সকল উপহার সামগ্রী। অভাগিনী সেই কয়টীকে বুকে করিয়া, যেন মৃত্যুযাতনা শমিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে ! আহা ! তাহার ঐ ভিন্ন প্রেমাস্পদ বস্তু ত পৃথিবীতে কিছুই ছিল না।

ধরণীর অন্তরে শতবৃশ্চিক দংশন করিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে নির্ম্মল প্রেমের নিদর্শন সেই কয়টী জিনিস উঠাইয়া লইয়া, সেখান হইতে চলিয়া গেল। আজ হতভাগ্য বুঝিল, যাহা

পাইলে হৃদয় শান্ত হয়, সেই মহামূল্য রত্ন পবিত্র প্রেম সে হারাইল ! এতদিন যাহা চাহিয়া দেখে নাই, আজ তাহা তাহাকে ফেলিয়া পলাইল। তাহার অদৃষ্টে শান্তির আশা ঘুচিল। হতভাগ্যের চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সে অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিল না।

যখন সেই লক্ষ্মীপ্রতিমা চিতায় বিসর্জ্জন করিবার জন্য,—"হরিবোল" শব্দে বাটীর বাহির করা হইল ; তখন সকলে অন্তঃপুরের একটী কক্ষে হৃদয়বিদারক "মা, মা" ধ্বনি শুনিতে পাইল।

কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার জ্যোৎস্নালোকিত গভীর নিশীথে হেমমালার দেহ চিতাশয্যায় শয়ন করিল। এক মাস পূর্বে এমনি সময়ে স্বামীপ্রদত্ত সুবাসে ভূষিতা হইয়া, পালঙ্কে শয়ানা নিদ্রিতা হেমমালা কত সুখস্বপ্ন দেখিয়াছিল !

সুমতিবালা দেবী

ফুল-শয্যা

১

হুগলী সহরে একটি ক্ষুদ্র গলিতে প্রাণধন বসুর বাস। প্রাণধন বাবু একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ব্যক্তি। নলিনী তাঁহারই কন্যা। প্রাণধন বাবুর সংসারটী—তাঁহার গৃহিণী, ঐ কন্যা, একটী নবম বয়স্ক পুত্র ও একটী দাসী দ্বারা গঠিত। ইহা ব্যতীত কতকগুলি গাভীও প্রতিপালিত হইত। বাটিখানি ক্ষুদ্র ৬/৭টি গৃহবিশিষ্ট দ্বিতল। প্রাণধন বাবু নিকটস্থ চন্দন নগরে জনৈক জমীদার মহাশয়ের হিসাবরক্ষকের কর্ম করিতেন। বেতন অতি সামান্য হইলেও মিতব্যয়ে কোনরূপে পরিবার প্রতিপালন করিতেন।

কন্যা নলিনী বড় হইল। এখনও বিবাহ দেওয়া হইল না ; এই চিন্তায় বসুদম্পতিকে আকুলিত করিয়াছে।

কন্যাটী অতুলনীয়া সুন্দরী বলিয়া, বালিকাকাল হইতেই দুই একজন ঘটক যাতায়াত করিত ; কিন্তু নলিন বসুজ মহাশয়ের অতিশয় আদরের বলিয়া. এতদিন গ্রাহ্য করেন নাই। এক্ষণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন।

এই সময়ে একজন ঘটক কলিকাতা হইতে একটি সম্বন্ধ লইয়া আগমন করিলেন। কন্যা দেখিয়া তাহার পছন্দ হইল। যাইবার সময় বলিয়া যাইলেন, এ বিবাহ তিনি নিশ্চয় দিয়া দিবেন।

কিছু দিবস পরে উক্ত ঘটক মহাশয় কলিকাতা হইতে একজন বাবুকে কন্যা দেখাইতে লইয়া আসিলেন। তাঁহার নাম চারুচন্দ্র ঘোষ। কলিকাতায় বংশী দত্তের গলিতে বাস। কোন সওদাগর আফিসে কর্ম করেন। ইনিই পাত্রের পিতা। কন্যা দেখিয়া চারু বাবু প্রীত হইলেন, এবং এই স্থানেই পুত্রের বিবাহ দিবেন, এরূপ আশা দিয়া যাইলেন।

দুই এক দিবসের মধ্যে প্রাণধন বাবু আধুনিক প্রথানুসারে একখানি ফর্দ্দ পাইলেন এবং তাহার সহিত সমস্ত আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তাহার কারণ, ফর্দ্দে নগদ মুদ্রা ২০০০৲ স্বর্ণ ৫২ ভরি, রৌপ্য ২৫০ ভরি, ঘড়ী, চেন, খাট্ বিছানা ইত্যাদি সন্নিবেশিত ছিল। কেহ যেন বিস্মিত হইবেন না ; আজি কালি পাঁঠা বিক্রেতাদিগের "চাপরাস" যুক্ত পাঁঠার দর

এইরূপই দাঁড়াইয়াছে ; কতদূর যে স্থির হইবে, তাহাও ভবিষ্যতের গর্ভে।

যাহা হউক প্রথমতঃ বসু মহাশয় অনেক প্রকার মিনতি করিয়া, ফর্দ কমাইতে লিখিলেন। কিন্তু যাহা কমিল, তাহাও অতি সামান্য। তখন বসু মহাশয় একান্তই এ সম্বন্ধের আশা ত্যাগ করিলেন। তিনি আশা ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু ঘটক চূড়ামণি তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন না। তিনি উভয় বাটী যাতায়াত করিয়া, অনেক কসাকসির পর এবং ঘোষজ মহাশয়ের পুত্রকে কুলক্রিয়া করিতে হইবে ইত্যাদি কারণ দেখাইয়া, নগদ অর্দ্ধ অর্থাৎ ১০০০৲ এবং অপর দিকেও কিছু কিছু কমাইতে সম্মত করাইলেন।

প্রাণধন বাবুও বাধিত হইলেন।

ক্রমে পাকা দেখা আশীর্বাদ শেষ হইল, দিন স্থির হইল। প্রাণধন বাবু জমীদার মহাশয়ের নিকট কন্যাদায় জানাইলে, তিনিও যথেষ্ট সাহায্য করিবেন স্বীকৃত হইলেন। জমীদার মহাশয়ের সাহায্য সত্ত্বেও, তাঁহার নিকট নগদ কিছুমাত্র না থাকাবশতঃ বসত বাটীখানি বন্দক দিতে হইল।

প্রাণধন বাবু বসতবাটী বন্ধক দিয়াও আপনাকে ধন্য মনে করিলেন ; কারণ তাঁহার আদরের নলিন বড় ঘরে যাইতেছে। স্বর্ণকার ডাকিয়া অলঙ্কার ও দান সামগ্রীর ফরমাজ দিলেন। নলিনের মাতার আর আনন্দের সীমা নাই ; কারণ বড ঘরে কন্যার বিবাহ, তাহাতে আবার জামাতাটী সচ্চরিত্র ও বিদ্বান। সুতরাং নলিনী যে শারীরিক ও মানসিক উভয় সুখেই সুখিনী হইবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। পিতামাতার মুখ প্রসন্ন দেখিয়া, নলিনীর মুখও প্রসন্ন হইল। নলিনী স্বভাবসুন্দরী সুহাসিনী। তাহার মুখ পিতামাতার আনন্দে, প্রাতঃসমীরণস্পর্শে কমল দলের ন্যায় প্রফুল্ল হইল ; পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় লাবণ্য ধারণ করিল। নলিনীর বয়স ত্রয়োদশ বৎসর ; আকর্ণ বিস্তৃতনয়নে গভীর কৃষ্ণতারা দৃষ্টি স্থির ও আগন্তুক দর্শনে নিম্নমুখী। ভ্রমর শরমকারী ঘন কৃষ্ণকেশ পদ চুম্বন করিতে যায় যায়, যেন পারে না ; বিধাতা এরূপ সুগঠন অল্পই করেন।

২

চারু বাবুর বাটীখানি দ্বিতল, ১৭/১৮ খানি ঘর আছে। তাঁহার পুত্র দেবেন্দ্রনাথ এইবার এল-এ পরীক্ষা দিয়াছে, খবর এখনও বাহির হয় নাই। চারু বাবুর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, দুই চারি জন দাসদাসী প্রভৃতি অনেকগুলি পরিবার লইয়া সংসার ; দেবেন্দ্রনাথ বিংশতিবর্ষীয় যুবক। গৌরবর্ণ হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেশ সুগঠিত ; দেবেন্দ্র অত্যন্ত শান্ত সুশীল না হইলেও অসচ্চরিত্র ছিল না।

চারু বাবুর গৃহিণী, নলিনের ভাবী শ্বশ্রূ মাতা, একজন যে সে রমণী নহেন ; তিনি একজন ভয়ানক রকমের গৃহিণী। পরিবারস্থ সমস্ত লোক, তাঁহার গৃহিণী-পনার বিশেষ সুখ্যাতি করিত, সর্ব্বদা সকলেই সত্রাসে থাকিত ; কাহার উপর কখন কিরূপ গালাগালি বৃষ্টি হইবে। ভয়ে প্রায় কখন কেহ ইচ্ছাপূর্বক তাঁহার সম্মুখে পড়িত না ; পাছে একটি অকারণ তিরস্কার সহ্য করিতে হয়। যদি কেহ কোনও দিবস তাঁহার নিকট ভুলক্রমে ভর্ৎসিত না হয়, তবে রাত্রে শয়ন করিয়া সে আপনাকে সে দিবস বহু ভাগ্যবান মনে করিত। কিন্তু সেরূপ ভ্রম তাঁহার কদাচ হইত। পড়শীরা প্রত্যহ ঘোষ গিন্নির গুণগান না করিয়া, জল গ্রহণ করিত না। তাঁহার স্বভাবের কথা লিখিতে হইলে, আর একখানি নূতন গ্রন্থ আরম্ভ করিতে হয়। তিনি প্রথমে কর্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারা কত দেবে ?" কর্তা কহিলেন, "নগদ ১০০০৲

হাজার টাকা।" নগদ হাজার টাকা শুনিয়া একেবারে বাটী ফাটাইবার মত চীৎকার করিয়া কহিলেন : "কি, আমার লাক্ টাকার দেবেনকে হাজার টাকা দেবে ? কেন, দেবেন কি আমার ভেসে এসেছে ?"

কর্তা। তারা বড় গরিব, কোথা পাবে বল, যা দিচ্ছে তাই যথেষ্ট।

গৃহিণী। ছোটলোক ত ছোট ঘরে মেয়ে দিক না ? এখানে মরতে এসেছে কেন ? মরণ আর কি !

কর্তা। যা দিচ্ছে তাতেই তার প্রাণ বার হবার উপক্রম হয়েছে, আরও চাওয়া কি ভাল দেখায় ?

গৃহিণী। কেন, দেখাবে না কেন ? দেবেনকে আমার লেখাপড়া শেখাতে হয় নাই ?

কর্তা। হাসিয়া বলিলেন—দেবেনকে লেখাপড়া শিখিয়েছ, সে তোমারই থাক্‌বে, ও ত পরের বাড়ী ঘর করতে যাবে না ?

গৃহিণী। বালাই ষাট্, ও কেন পরের বাড়ী যেতে গেল, ও ব্যাটাছেলে সোণা ; চোকখাকীদের জামাইকে দিতে হলেই প্রাণ বেরিয়ে যায় !—আমি এ বিয়ে কখন দেব না।

কর্তা। কথা দিয়েছি এখন আর অমত কর্তে আছে ? পাকা দেখা পর্যন্ত হয়ে গেল।

গৃহিণী। বয়ে গেল, আমি দেবেনের বিয়ে দেব না।

কর্তা। বউটী বড় সুন্দরী হবে গো, তাইত আমার ইচ্ছে ; আর গোল ক'র না ! বউ দেখলে আর তখন কিছু চাইবে না।

গৃহিণী। আচ্ছা দেখা যাবে ; বউ যদি সুশ্রী না হয়, কি মুখ সুন্দর, কি গড়ন ভাল না হয়,—তবে তখনি তাকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে, তার পরদিন দেবেনের আবার বিয়ে দেব। কর্তা আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। এ রূপ গৃহিণীর বিষয় কেহ অবিশ্বাস না করেন ; আমাদের প্রত্যক্ষ করা।

৩

অদ্য নলিনীর বিবাহ। বসুজ মহাশয় যথাসাধ্য তাহার ক্ষুদ্র বাটীখানি সজ্জিত করিয়াছেন ; বরসভা আলোকমালায় আলোকিত। দ্বারে রুসনচৌকি ইমণ-রাগে আলাপ করিতেছে। অন্তঃপুরে দেশ বিদেশ হইতে আনিত কুটুম্বীনীতে পরিপূর্ণ। তাঁহারা কেহ কেহ কোন কোন কার্যে নিযুক্ত, কেহ বা রসালাপে ব্যতিব্যস্ত। অদ্য অনেকগুলি সমবয়স্কা একত্রিত হইয়া, নলিনীকে নানাবিধ রহস্য করিতেছে। বাহির বাটী ক্রমে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণে পূর্ণ হইতে লাগিল। রাত্রি ৯॥ টার সময় মহা আড়ম্বরের সহিত বর পৌঁছিল। প্রতিবাসী বালক বালিকারা যে যাহা করিতেছিল, তাহারা তাহা তাহা ত্যাগ করিয়া বর আনিতে ছুটিল। বর বাটীতে প্রবেশ করিলে মাঙ্গলিক শঙ্খ-ধ্বনি হইতে লাগিল। তৎপরে বর সভাস্থ হইলে ভিতরের গবাক্ষ হইতে পুরবাসিনীরা বর দেখিতে লাগিল। নিন্দাকারিণীরা বরের চেহারা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল, কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না। প্রায় সমস্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আহার হইলে লগ্ন উপস্থিত হইল ; নরসুন্দর মহাশয় আসিয়া বরকে উঠাইল। তখন বরকর্ত্তা চারু বাবু আসিয়া টাকা চাহিলেন। বসুজা মহাশয় এক সহস্র মুদ্রার কোম্পানীর কাগজ, দান সমগ্রীর সহিত যথাস্থানে রাখিলেন।

সম্প্রদানের সময় বরকর্তা লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, কন্যার অঙ্গে অধিক অলঙ্কার নাই। যাহা আছে, তাহা নূতন বলিয়া বোধ হইল না। তখন তিনি বসুজ মহাশয়কে কহিলেন ;

"মহাশয় এ কিরূপ ভদ্রতা, সমস্ত অলঙ্কার কোথায় ?" প্রাণধন বাবু তখন সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া বলিলেন ; যে "জমীদার মহাশয়ের নিকট আমার যাহা সাহায্য পাইবার কথা ছিল, তাহা এখনও পাই নাই। সুতরাং স্বর্ণকারের নিকট হইতে অলঙ্কার আনা হয় নাই। জমীদারের নিকট না পাইবার কারণ, দেওয়ান কলিকাতা গিয়াছেন। আসিবার কথা ছিল, কেন আসে নাই, বলিতে পারি না ; আসিলেই দিবেন। অলঙ্কার সমস্ত প্রস্তুত ; পাইলেই আনিয়া দিব।"

কথাগুলা বুঝি চারু বাবুর বিশ্বাস হইল না। তিনি ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন,—"অলঙ্কার বাজারে, আপনি কন্যা বিবাহ দিতে আসিয়াছেন ' এরূপ ভদ্রতা এই নূতন দেখিতেছি। যাহা হউক আমার অপরাধ লইবেন না, আমি অলঙ্কার বা তাহার উপযুক্ত মূল্য না লইয়া, পুত্রের বিবাহ দিতে পারিতেছি না"। প্রাণধন বাবু মাথায় হাত দিয়া বসিলেন, অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "উপায় !" কথাটা পুরোহিতের কর্ণে প্রবেশ করিল ; তিনি কহিলেন, "উপায় ভগবান ; আপনি আর একবার জমীদার মহাশয়ের বাটী যান, দেখুন দেওয়ান আসিয়াছেন কি না।" বসু মহাশয় প্রস্থান করিলেন। বিবাহ বন্ধ রহিল।

যথাসম্ভব শীঘ্র জমীদার বাটী যাইয়া বসু মহাশয় দেখিলেন দেওয়ান মহাশয আইসেন নাই। চক্ষু দিয়া জল ঝরিল ; কাঁপিতে কাঁপিতে বাটী আসিয়া চারু বাবুব পা জড়াইয়া ধবিলেন। কহিলেন "মহাশয় রক্ষা করুন, এ রাত্রে আমার জাতি রক্ষা করুন, কাল যেখান হইতে হয় দিব।" চারু বাবুর হুকুম হইল ; বিবাহ চলিল। ক্রমে সকল শেষ হইল।

পরদিবস প্রত্যুষে বসুজা জমীদার ভবনে যাত্রা করিলেন। সেখানে শুনিলেন, যে তখনও দেওয়ান আসেন নাই। তিনি সেই স্থানেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে চারু বাবু বর লইতে আসিলেন। বসুজাকে না দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন, তিনি পলায়ন করিয়াছেন। যত বিলম্ব হইতে লাগিল, তাঁহাব সন্দেহ তত বদ্ধমূল হইতে লাগিল। অবশেষে একজনকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয় ! তিনি গেলেন কোথায় ? পলান নাই ত !"

বেলা ১০টা অবধি বসুজা মহাশয় মনিব বাটীতে অপেক্ষা করিযা, দেওয়ান মহাশয়ের কোনও সংবাদ না পাইয়া, একবার স্বয়ং জমীদার মহাশয়কে মিনতি করিয়া সংবাদ পাঠাইলেন ; তাঁহার নিকট হইতে উত্তর আসিল—"দেওয়ান আসিলেই পাইবে।" তখন হতাশ হইয়া তিনি বাটী ফিরিলেন।

ব্যগ্র হইয়া চারু বাবু কহিলেন—"কই মহাশয় ?" প্রাণধন বাবু কহিলেন—"মহাশয়, তিনি আইসেন নাই।" কথা কয়টী বলিতে তাঁহার চক্ষে ধারা বহিল। চারু বাবু কহিলেন—"ভদ্রতা করিয়া যথেষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে কি করিতে চাহেন বলুন ?" প্রাণধন বাবু কহিলেন—"মহাশয় ! এখন আপনি যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন, যার কথার ঠিক নাই, তার অন্য কথা কহাই অন্যায় ; এইমাত্র বলিতে পারি, আমি জুয়াচোর নহি, ষ্ট্যাম্পের উপর রীতিমত লেখাপড়া করিয়া, হ্যাণ্ডনোট দিতে আমি এখনি পারি, যদি অনুগ্রহ করিয়া লয়েন।"

অবশেষে তাহাই হইল। ১০০০ টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়া, বসুজা মহাশয় তখনকার মত নিষ্কৃতি পাইলেন। গৃহে কিছু টাকা ছিল, তদ্দ্বারা স্বর্ণকারের নিকট হইতে দুই চারিখানি অলঙ্কার আনিয়া দিলেন। নূতন পুরাতন অলঙ্কার ১০০০৲ টাকার হ্যাণ্ডনোট, ১০০০৲ টাকার কোম্পানির কাগজ, বধূ ও পুত্র প্রভৃতি লইয়া চারু বাবু যাত্রা করিলেন। জানি না শুভক্ষণে কি কুক্ষণে বরকন্যা বিদায় হইল।

এখানে বরকন্যা আসিতে বেলা প্রায় ২টা হইল। গৃহিণী বরণ করিয়া, বরকন্যা গৃহে আনিলেন। তখন গৃহিণীর আশীর্বাদ করা দূরে গেল ; রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তিনি কর্তার নিকট যাইয়া কহিলেন,—"গহনা এত কম,—পুরাণ, কেন ! নগদ টাকা কই !" কর্ত্তা নগদ টাকার কোম্পানির কাগজ হাতে দিয়া, যথা যথা বর্ণনা করিলেন। এই সমস্ত বাজে কথা শুনিয়া, গৃহিণী সংহারিণী মূর্তি ধারণ করিয়া, কোম্পানির কাগজ পদতলে দলিয়া, ঝাঁটা লইয়া গৃহের বাহির হইলেন। কর্তা বিনা বাক্যব্যয়ে পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন। যথায় নলিনী যুবতী, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়া, বালিকা ও বালক প্রভৃতির মধ্যে নানারূপে সমালোচিত হইতেছিল, তথায় যাইয়া—"হারামজাদার ঘরের মেয়ে" বলিয়া ঝাঁটা তুলিলেন ! কর্তা অমনি "কর কি, ওর দোষ কি !" বলিয়া ঝাঁটা কাড়িয়া লইলেন। গৃহিণী তখন ঝাঁটারূপ মহাস্ত্রশূন্য হইয়া, অকথ্য গালি দিতে লাগিলেন। তখনকার ভাব দেখিয়া, সকলে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল ; বাটী মহা অশান্তিময় হইযা উঠিল। অবশেষে গৃহিণী গালাগালিতেও ক্ষান্ত না হইয়া, অঙ্গুলীর দ্বারা নলিনীর দুই গণ্ডস্থল এরূপ টিপিলেন, যে মুখের ভিতর হইতে তখনই রুধির নির্গত হইতে লাগিল। নলিনী অনুচ্চস্বরে "মাগো" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার সহিত যে দাসী আসিয়াছিল. সে কহিল, "ওগো তোমরা কর কি। বাপের দোষে কি বেটীকে মেরে ফেল্‌বে।"

তখন গৃহিণী উত্তর করিলেন, "তবে রে হারামজাদী চুপ রও, ফের কোনও কথা বললে ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দেব, বাঁদীব বেটী ! উঁচু কথা ? বাবার বাড়ী পেয়েছিস্ কি না !" অন্য দাসী হইলে তখনি প্রস্থান করিত, কিন্তু সে নলিনীকে মানুষ করিযাছিল ; সুতরাং আর কিছু না বলিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

ক্রমে রাত্রি হইল। গালাগালি কিছু থামিলে, দেবেন্দ্রনাথের ভগিনী নববধূর জন্য আহার আনিল। নলিনী আহাব করিল না ; সুতরাং দাসীও আহার করিল না। শুনিয়া গৃহিণী কহিলেন—"থাক উপসই থাক।" রাত্রি প্রভাত হইল। আজি ফুল-শয্যা—কিছু বেলা হইলে, দস্তুর মত বাপান্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। এ দিকে যান, ও দিকে যান, আর মধ্যে মধ্যে আসিয়া গালাগালি দেন।

একটি কক্ষে বসিয়া নলিনী চক্ষের জল ফেলিতেছে, এমন সময় দেবেন্দ্রনাথ হঠাৎ তথায় প্রবেশ কবিলেন, দেখিলেন নবপরিণীতা ভার্যা, তাঁহাব মাতার তাড়নায় কাঁদিতেছে। দেবেন্দ্রের নলিনীকে অতিশয় মনোনীত হইয়াছিল। মনোমত ভার্যাকে কাঁদিতে দেখিয়া, তাঁহার চক্ষেও জল আসিল। মনে ভাবিলেন, তার জন্য মাতাকে একবার বলিবেন, কিন্তু লজ্জা আসিয়া বাদ সাধিল ; জানি না কেন, সেও একটি গৃহে দ্বাররুদ্ধ কবিয়া চক্ষের জল ফেলিতে লাগিল।

সমস্ত দিন, কাঁদিয়া বৈকালে গালাগালি থামিলে, নলিনী একটু স্থির হইল, দাসীও একটু নিশ্চিন্ত হইল। তখন কেন, বলিতে পারি না, তাহাকে যে জলখাবার দেওয়া হইয়াছিল তাহা হইতে নলিনী কিছু আহাব করিল। দাসীও নিশ্চিন্ত হইয়া কাপড় লইয়া চলিয়া যাইবে, ইত্যবসরে দেবেন্দ্রনাথের মাতা আসিয়া কহিলেন, "ছোট লোক ব্যাটার মেয়ে পাঠাব না ত ; গয়না দিক, না দিক, কখনই মেয়ে পাঠাব না, আবার দেবেনের বিয়ে দিব।" ইহা শুনিয়া নলিনীর বুক ফাটবার উপক্রম হইল ; দাসীকে কহিল,—"বাবা তোমায় আফিং নিয়ে যাবার জন্য পয়সা দিয়েছেন ?"

ঝি। কৈ না।

নলি। আমায় অনেক বলেছেন, আমি মনে করেছিলাম, তোমায় পয়সা দিয়েছেন।

তা—যখন মনে হইল, এই বেলা তোমার কাছে রেখে দাও।

এই বলিয়া তাহার হস্তে পয়সা দিয়া বলিল, "আধ ভবি এনো।"

মনে কোনও কু না ভাবিয়া ঝি আফিং আনিয়া তাহার হস্তে দিল। নলিনী তাহাকে দেখাইয়া বাক্সের মধ্যে রাখিল। তৎপরে সে অন্তরাল হইলে সমস্তটা একেবারে সেবন করিল।

সন্ধ্যার কিছু পরেই প্রাণধন বাবুর বাটী হইতে ফুল-শয্যা আসিল। প্রাণধন বাবুর যতদূর সাধ্য ততদূরই ফুল-শয্যা পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু ঘোষ গিন্নির তাহা মনোনীত হইল না। পা ছড়াইয়া উপবেশন করিয়া একটি একটি করিয়া খুৎ ধরিতে আরম্ভ কবিলেন,—"ও মা, ছি ছি !!! একি ফুল-শয্যা দেওয়ার ছিরি, চোক খাকিরা কি কখনও বাপের জন্মে ফুল-শয্যা দেওয়া দেখেনি ? কেন এই রকম একখানা পার্শী সাড়ী বই কি আর অন্য কোনও দামী কাপড় বাজারে ছিল না ? এই একটা বিশ্রি জামা ছাড়া কি আর অন্য জামা মেলে না ? তা হবে কেন, তাতে যে দু'পয়সা বেশী খরচ হবে ! ঐ দেখ না, সেদিন মিত্তিরদের বড় ছেলে নন্দর বে হল ,—তার কি চমৎকার ফুল-শয্যা দিয়েছিল, আহা দেখলে চোক জুড়ায় ! জিনিসই বা কত, কত ফুল, কত গন্ধ, আহা তাই থেকে নিয়ে মালতী আমার মাথায় একটু কি ঢেলে দিলে, কি চমৎকার গন্ধ, মাথা যেন একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আবার তার নামও তেমনি "কুন্তলীন"। আর একটা শিশির ছিপি খুলে নাকের গোড়ায় নিয়ে এল, প্রাণটা যেন বোন নেচে উঠল ! নামটি শোন "দেলখোস", যেমন নাম তেমনি গন্ধ। তা ছাই কি একটা দিতে নেই ;—কত খরচ বল ? ১২৲ টাকা দিলে ১ বাক্স পাওযা যায। দেবুর মুখে শুনেছি কে নাকি বৌ-বাজারে এইচ বোস, না কে আছে, সব তৈরি করচে। তা কি বলবো বল্ সবই অদেষ্ট"।

বাস্তবিক ঘোষ গিন্নিব দুঃখ হবার কথা ! এত জিনিস দিয়েছে কিন্তু লোক ২/৩টির বেশী পাঠায় নাই, আরও এসেন্স বেশী দেয নাই। শেষে বকুনি ক্ষান্ত দিয়া সকলে বর কন্যাকে আহারাদি করাইয়া ফুল-শয্যোপরি শযন করাইয়া দিল। তার পর কেহ বা আড়ি পাতিল, আব কেহ বা প্রস্থান করিল।

শয়ন করিযা প্রথমতঃ নলিনীব গা ঝিম্‌ঝিম করিতে লাগিল, তৎপবে ক্রমে গাত্রদাহ, আক্ষেপ ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া শেষে নিঝুম হইয়া পড়িল। প্রথমে দেবেন্দ্র কিছুই বুঝিতে পাবিল না, কথা কহিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। অনেক পরে কহিল—"তুমি অমন করছ কেন ?"

নলিনী প্রথমতঃ স্বামীব বুকে হস্ত দিয়া "উঃ উঃ" কবিল। দেবেন্দ্র দেখিল, নলিনের চক্ষে জল . হস্তধারণ কবিয়া কহিল—"নলিনী, কাঁদছো কেন, মা যদি কিছু বলে থাকেন তবে আমার অনুরোধে কিছু মনে ক'র না, মনে কর, তোমার মা হ'লে কি কবিতে ৷"

নলিনী। আমায ক্ষমা কর, আমি—আমি আফিম খেয়েছি !

দেবেন্দ্র চমকিত হইযা শয্যায উঠিয়া বসিল। কহিল, "এ্যাঁ এ্যাঁ, নলিনী আফিম্ খেয়েছ ! না—না—সত্য বল।"

নলিনী। হ্যাঁ মিথ্যা নয,—উঃ মা গো যাই !

দেবেন্দ্র ক্রন্দন কবিয়া কহিল—"নলিনী, নলিনী—কেন তুমি আমাদের ঘরে এলে, হতভাগ্যের অদৃষ্টে এমন রত্ন সহিবে কেন ! উঃ মা ! এসে দেখ আমার কি সর্বনাশ করিলে ! নলিনী, কেন তুমি আফিম্ খেলে ?"

নলিনী। আমায ক্ষমা কব,—মা গো যাই—

দেবেন্দ্র। মা, মা, আমার ফুল-শয্যা দেখ্‌বে এস!

দেবেন্দ্র তখন পাগলের ন্যায় "মা মা" বলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। সকলকে ডাকিয়া দিয়া নিজে ডাক্তার আনিতে ছুটিল। পল্লীতেই একজন ডাক্তার ছিলেন, তাঁহার সহিত ইহাদের বেশ আলাপ ছিল। দেবেন্দ্র তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল। তিনি আসিয়া পরীক্ষা করিয়া মুখ বিকৃতি করিয়া কহিলেন, "বাঁচিবার কোন আশা নাই;—আফিমের বিষ সিস্‌টামে প্রবেশ করিয়াছে।" ডাক্তারের মুখে "বাঁচিবে না" শুনিয়া দেবেন্দ্র মাতার দিকে চাহিল,—মাতাও চাহিলেন। দেবেন্দ্র কহিল,—"মা, আজ আমার ফুল-শয্যা"— !!— !—

মাতা কহিল,—"দুঃখ কি বাবা—এ বউ যায়, আবার খুব ভাল দেখে বউ আন্‌বো।" দেবেন্দ্র কহিল,—"উঃ মা; তুমি কি!" এই বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ বাটীর বাহির হইল, কেহ তখন জানিল না, যে সে জন্মের মত বাহির হইল। তাহার হৃদয়ে তখন নলিনীব শেষ কথা. "ক্ষমা কর, ক্ষমা কর" বাজিতেছিল।

প্রভাতের ২ ঘণ্টা পূর্বে দেখা গেল, দেবেন্দ্রনাথের শরীর উদ্যানস্থিত পুষ্করিণীতে ভাসিতেছে! দেবেন্দ্র পিতা মাতাকে মরমে মারিয়া এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছে!

তারপর? তারপর যাহা—তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। আমাদের ফুল-শয্যা প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়াছে।

বিপিনবিহারী চক্রবর্তী

গরলে অমৃত

প্রথম পরিচ্ছেদ

নবকান্ত বাবু তাহার ভাই উমাকান্ত বাবুকে যে আন্তরিক ভাল বাসেন, গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই একথা স্বীকার করে।

নবকান্ত বাবুর এ ভালবাসার কিছু বিশেষত্ব ছিল। ধন-গৌরবসম্পন্ন চাক্‌রে ভাইকে ভালবাসিতে অনেক দাদাই লালায়িত হন। কিন্তু নববাবু এই চিরাগত প্রথাব অমর্যাদা করিয়া, কেন যে তাঁহার নিঃস্ব চাক্‌রী-বিহীন ভাইয়ের প্রতি এত সদয়, লোকে কিছুতেই এ সমস্যার বহস্যোদ্ভেদ করিতে পাবে না।

কিন্তু প্রকৃতির নীতি জলের মত সোজা না হইয়া, জিলিপির পাকের ন্যায জটিল। গোলাপের সহচর কণ্টক, মধুর সহচর মক্ষিকা-দংশন প্রভৃতি ঘটনায় আমরা এ নীতির পরিচয় পাই। দৃশ্যমান ভৌতিক জগতের এই নিয়ম, অদৃশ্য মনো-জগতেও কড়ায় গণ্ডায় মেলে। তাই আমরা স্নেহপ্রেমের অমৃতধারার পার্শ্বে প্রায়ই ঈর্ষা বিদ্বেষের বিষস্রোত প্রবাহিত দেখিতে পাই।

নববাবু তাঁহার ভাইকে আপনার স্নেহের ছায়ে স্থান দান কবিলেও তাঁহার স্ত্রী মোক্ষদা দেবী কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃজায়া বিন্ধ্যবাসিনীকে দু'চক্ষের বিষ দেখেন। বিন্ধ্যর প্রত্যেক কথা, উঠা বসা, চলন ফেরন যেন তাঁহার গায়ে তীব্র বিষ ঢালিয়া দেয়।

সত্য বটে বিন্ধ্যবাসিনী তাঁহার মুখের উপর কোন কথা বলে না, সসঙ্কোচে অপরাধীর ন্যায় তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? বিন্ধ্য কি নিঃস্ব উমাকান্ত বাবুর পত্নী নহে? তাহাই যে তাহার যথেষ্ট অপরাধ।

কথায় বলে—"যাকে দেখ্‌তে নারি তার চলন বাঁকা।" মোক্ষদার চক্ষে বিন্ধ্যর শুধু চলন

নহে,—কিন্তু তাহার সমস্ত জীবনটাই বাঁকা ঠেকিত।

আর ঠেকিবেই বা না কেন ? তাঁহার স্বামী পায়ের ঘাম মাথায় ফেলিয়া টাকা উপার্জ্জন করেন, আর বিন্ধ্যরা সেই কষ্টার্জিত অর্থে মজা করিয়া আপনাদের পেট পুরিয়া লয়.—ইহা একান্ত অদূরদর্শী কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যতীত সকলেরই চক্ষুশূল জন্মাইবার পক্ষে যথেষ্ট। মোক্ষদা কুশাগ্রবুদ্ধিশালিনী, তাঁহার তো হইতেই পারে!

কিন্তু কি জানি কেন মোক্ষদার স্বামী এ সোজা কথাটা বুঝিতে পারেন না। যার নিজের বুদ্ধি থাকে না, সে বন্ধুর পরামর্শ অনুসারে কাজ করে। কিন্তু তাঁর স্বামীটি এম্নি অপূর্ব জীব,—নিজের ঘটে বুদ্ধি নাই, অথচ যাদের আছে, তা'দের কথাতেও চলিতে চান না। তাঁহাকে "মেষ বানাইয়া" তাঁহার সুচতুর ভ্রাতা যে নিজের কাজ কিনিতেছে, সে বিষয়ে তিনি একেবারেই অন্ধ। এই বিষয়বুদ্ধির চূড়ান্ত উন্নতি কালে যুধিষ্ঠিরেব চরিত্র অনুকরণ, মস্তিষ্ক-হীনতার পরিচায়ক এবং নেহাতই ন্যক্কারজনক।

কিন্তু কিছুতেই স্বামী বুঝে না,—সে স্বামীর দুর্বুদ্ধি এবং ঐ চক্ষুশূল স্বরূপিণী বিন্ধ্যবাসিনীর সুকৃতি—মোক্ষদা আর কি করিবে ? তাই অগত্যা মনের আগুনে নিজে পুড়িয়া এবং তাহার জাকে দগ্ধ করিয়া মোক্ষদা দেবী কোনমতে দিনযাপন করিয়া যাইতে লাগিলেন।

মোক্ষদার সন্তানের মধ্যে একটি কন্যা—নাম সুখদা, বয়স ৮ বৎসর। কন্যাটি তাঁহার মনের মত সুন্দবী হয় নাই। তিনি নিজে অতিশয় সুরূপা ছিলেন, এবং কথায়, চলনে, সময় মত অনেক বাব সে রূপের পরিচয় অনেকেরই কাছে দিয়াছেন। তিনি তাঁহার গর্ভে স্বভাবতঃই একটি পরীর আবির্ভাব আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! ভগবানের কি অবচীনতা! তিনি পরী না পাঠাইয়া একটি সাধাবণ মনুষ্য আকারের ক্ষুদ্র বালিকাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বিধাতা উঠিতে বসিতে তাঁহাকে জ্বালাতন কবিতেছিলেন।

ও দিকে বিধাতারই মার প্যাঁচে কাঙ্গালিনী পরান্নভাগিনী বিন্ধ্যবাসিনী একটি সুন্দরী কন্যা ও একটি পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিল। ইহাকে বিধির বাদ সাধা বই আর কি বলিব ? মানুষেই না হয় অন্ধ হয়, কিন্তু বিধাতাও কি ছাই তাই! নচেৎ উপযুক্ত পাত্র মোক্ষদাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার নজব অপাত্র ঐ বিন্ধ্যর উপর পড়িল কেন ? হায়! হায়! বিধাতাও কাচ কাঞ্চনের পার্থক্য বুঝিতে পারে না।

যাই হ'ক অচিরে বিধাতার চক্ষু একটু ফুটিল। বিন্ধ্যর পুত্রটি দুঃখিনী মাতার আনন্দ এবং মোক্ষদা দেবীর অভিশাপ মস্তকে বহিয়া, পৃথিবীর আলোকে চক্ষু মেলিয়াছিল। কিন্তু ৩ মাস মাতৃ-স্তনের স্নেহসুধা ও জেঠাই মার বিদ্বেষ গরল পান করিয়াই এখানকার সাধের খেলা সাঙ্গ করিয়া গেল। বুঝি বা স্নেহ অপেক্ষা বিষের মাত্রাটা বেশী হইয়াছিল! যে নিয়মে কুসুম-কোরকে অসময়ে কীট প্রবেশ করিযা তাহাকে বিনষ্ট করে, সেই নিয়মের তার একটি সাফল্য-নিদর্শন রাখিয়া, স্বর্গেব শিশু স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিল।

ইহাতে একদিকে যেমন বেদনা, অন্যদিকে তেম্নি সান্ত্বনা আনয়ন করিল। একটি বুকের পাথর উঠিয়া আজ অন্য বুকে চাপিয়া বসিল। মোক্ষদার হৃদয়ের ভার অনেকটা লঘু হইল।

বিন্ধ্যবাসিনী চোখের জলে, প্রাণের বেদনায়, পরাধীনতার তীব্রদাহনে হৃদয়ারাধ্য স্বামীর ও স্নেহের পুত্তলি তনয়ার মুখপানে তাকাইয়া কোনমতে দিনযাপন করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দুঃখী তাপীদিগের জন্য রাত্রি পরম বন্ধু। নির্জন রজনীর অন্ধকারচ্ছায়ে সন্তপ্ত প্রাণের জ্বালা যন্ত্রণা নেত্রজলে গলাইয়া দুঃখী হৃদয়ে সান্ত্বনা লাভ করে। দুঃখীব আর একটা বন্ধু আছে—সে প্রিয়জনের স্নেহ-প্রেম ইহা সংসার-তাপক্লিষ্ট প্রাণে বর্ষার নববারি বিন্দুর ন্যায় কার্য করে।

কিন্তু হায়! প্রিয় বস্তুও পলায়ন করে! সান্ত্বনাদায়িনী বজনী দিবালোকে অন্তর্হিত হয়।।

পূর্ব গগনে উষালোক ফুটিয়া উঠিবার পূর্বেই বিন্ধ্যবাসিনী স্বীয় নবমবর্ষীয়া কন্যা শৈলবালার প্রফুল্ল সুপ্ত মুখখানি সস্নেহে চুম্বন করিয়া শয্যা ত্যাগ করিল। তাহার মাথায় সংসারের সমস্ত কাজ। নীরবে সকল ভার বহন করিয়া, সকল জ্বালা পোহাইতেছিল—"ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কূলা" শৈলর মা।

বিন্ধ্যবাসিনীর গৃহ হইতে বাহির হইবার কিছু পরেই সহসা শৈল জাগিয়া উঠিল। সে আজ ভোরের দিকে একটি সুন্দর স্বপ্ন দেখিতেছিল। কি তাহার ঠিক মনে পডিতেছিল না, কত যেন গান হইতেছিল ; কত যেন কি!—সে ঠিক মনে করিতে পারে না। সে স্বপ্নের মোহময় ভাঙ্গা স্মৃতি আবছায়ার মত তাহার প্রাণে লাগিযাছিল। ঘুমের আবেশে সে শুনিল, যেন তাহার স্বপ্নশ্রুত সঙ্গীতের খানিকটা সুব বাস্তব জগতে আসিয়া তাহাব কানেব কাছে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। একটু ভাল করিয়া চোখ মুছিয়া দেখিল, তাহার কপালের উপর ও চুলের ভিতব কতকগুলি মৌমাছি গুণ গুণ করিয়া উডিতেছে। তাহারা একবার ঘরেব ভিতরে আসিতেছিল, এবং পরক্ষণেই জানালা দিযা বাহিব হইযা যাইতেছিল। শৈল জানালার দিকে মাথা করিয়া শুইয়াছিল,—সেই জানালার পশ্চাদ্দিকে বেলি, যুঁই, শেফালি প্রভৃতি কতকগুলি ফুলের গাছ।

পাছে দংশন করে এই ভয়ে সে উঠিতে পারিল না। "ন যযৌ না তস্থৌ" অবস্থায় আছে, এমন সময় মক্ষিকাগুলি একবার এককালীন সকলে উডিযা যেমন বাহিব হইযাছে, সে অম্নি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে আসিল এবং ছুটিয়া মায়েব কাছে গেল। মা সব কথা শুনিযা শত দুঃখের মধ্যেও একটু হাসিল। বলিল, কাল রাত্রে আমিও একটি অতি সুন্দব গন্ধ পেয়েছিলাম, একদিনও এমন পাই না। বুঝি এক সঙ্গে অনেক ফুল ফুটেছে তাই এত মৌমাছি জুটেছিল। এই বলিয়া পুনরায় স্বকার্যে চলিযা গেল।

তখন শৈল মুখ হাত ধুইয়া, সাধ্যানুসারে গৃহস্থলীর ক্ষুদ্র কাজগুলি সম্পন্ন কবিতে লাগিল—তরকারি কুটিয়া দিল, বাসনগুলি বান্নাঘরেব যথাস্থানে রাখিল ইত্যাদি।

মোক্ষদা দেবী সকাল সকাল স্বীয় কন্যাকে মনোমত করিয়া খাওয়াইয়া, যখন বেলা প্রায় ১০টা তখন ডাকিলেন—"ওলো শলি, খাবার নিয়ে আয় , খেতে এত খোসামুদী কবা আমার পোষায় না।" শৈল সভয়ে আসিয়া দাঁড়াইল এবং কি খাবার পাইল, তাহা পাঠকদেব জানিয়া কাজ নাই।

খাওয়া হইলে বিন্ধ্য মেয়েকে বলিল,—যা মা নেয়ে আয়। নাইবার কথায় তার নাইবার সঙ্গিনীকে আবার মনে পড়িয়া গেল—সে তাহার সই। সই তার সেই ভোরেই শ্বশুব বাড়ী গিয়াছে। সে তখন ছল্ ছল্ চোখে বলিল—মা সই আমায় কত ভালবাসে। কাল সন্ধ্যেবেলায় ডেকে নিয়ে গিয়ে কত কাঁদলে, আমায় কত কথা বল্লে। তারপর তাব সব জিনিসপত্র আমায় দেখালে ; শেষে আমার মাথায় একটি সুন্দর তেল দিয়ে দিলে, এবার তার বাবা তাকে সে তেল এনে দিয়েছে। তার নাম—"কুন্তলীন।" মা সে বড় সুন্দর তেল,

খুব সুগন্ধ। মা, সই নিশ্চয় আমার জন্যে কাঁদ্‌বে।

মা বলিল—বাছা মেয়েদের সকলেরই এই দশা। চিরদিন কেউ বাপের বাড়ী থাকে না। তুইও কবে চলে যাবি,—তখন আমি কি ক'রে থাক্‌বো ? বলিয়া অভাগিনী কাঁদিয়া ফেলিল। শৈল বেগতিক দেখিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন দিবা দ্বিপ্রহরে গৃহকর্ত্রী স্বাভাবিক সপ্তমে ডাকিলেন—শলি, বলি ব'সে ব'সে কেবল গিল্‌তেই আছিস ? লোকে একটা ছাগল গরু পুষলে তা হ'তে কত উপকার পায়, আর হাতীপারা মেয়ে তুই, তো হ'তে কি সংসারের কিছু হয় না ? আমি সুখোকে নিয়ে এখন মুখুয্যেদের বাড়ী চল্‌লাম—ফিরতে ১ ঘণ্টা দেরি হবে, এর মধ্যে আমার দেরাজ, আলমারি, পোর্টমেণ্ট সব বেশ ক'রে ঝেড়ে ঝুড়ে রাখ। এসে যেন সব পরিষ্কার দেখতে পাই। আব নয়তো পার যদি মায়ের গলা জড়িয়ে সারাদিন "সলগা" করো, তবেই সংসার চলবে। এই বলিযা কর্ত্রী চলিয়া গেলেন।

শৈল কাজ করিতে কখনও নারাজ নয়, কিন্তু জেঠাই মায়ের কাজে তার হাত কাঁপে। কিন্তু হুকুম খুব কড়া,—সুতরাং সে ভয়ে ভয়ে কাজে নিযুক্ত হইল।

বিপদ কখন কি আকারে মানুষকে দেখা দেয় তার স্থিরতা নাই। আলমারি ঝাড়িতে গিয়া শৈল দেখিল—কপাট খোলা। সে ধীবে ধীরে কপাট বন্ধ করিয়া দিল ; কিন্তু সেই সময় একটি সুন্দর শিশি তাহার চোখে পড়িল,—গায়ে লেখা "কুন্তলীন"। অমনি তাহার সইয়ের বিদায় দিনের সজল মুখখানি মনে পড়িল। মনে পড়িল তাহার গলা ধবিয়া ক্রন্দন, তাহার সস্নেহে কুন্তলীন মাখান। সে মনোহর স্নিগ্ধ গন্ধ তাহার সখীর ভালবাসার সঙ্গে তাহার প্রাণকে সুবাসিত করিয়া রাখিয়াছে। সুন্দর জিনিসেব প্রাণ আকর্ষণ করিবার একটি স্বাভাবিকী শক্তি আছে। মাতৃকোলের শিশু শতযোজন দূরস্থ সুন্দর চন্দ্রের আকর্ষণে আপনার ক্ষুদ্র প্রাণটিকে অনন্ত আকাশের অকূল সাগরে ছাড়িয়া দেয়। মনে হয়, সেই চাঁদখানির উপর যদি সে নিজের কোমল কচি হাতখানি বুলাইতে পায়, তবে কি আনন্দ হয় ! শৈলেরও আজ মনে হইল, একবার যদি সে ঐ সুন্দর শিশিটি হাতে করিতে পায়। হায় ! বালিকার সরলতা,—তাহাতেই যেন তাহার জীবনের সকল কৃতার্থতা লাভ হইবে !!

সে এই মধুর প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া, সভয়ে শিশিটিকে হাতে উঠাইয়া এক মনে যেমন তাঁহার গায়ের লেখাগুলি পড়িতেছে, এমন সময় তাহার মূর্তিমান যম স্বরূপিনী জেঠাইমা সহসা ঘরে প্রবেশ করিলেন। বালিকা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল ; তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল, সে কাঁদিযা ফেলিল।

জেঠাইমা বুলি ধরিলেন—"যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই ! মিটমিটে ডাইন্ ছেলে খাবার রাক্ষস। থাকেন যেন কত ভাল মানুষটি, ডুব দিয়ে দিয়ে জল খান। তাড়াতাড়িতে আল্‌মারি বন্ধ করিতে ভুলে গিয়েছিলাম, গিয়েই মনে হল, শলি আজ একটা কিছু কব্‌বে। লক্ষ্মীছাড়া হ'লে কি সব দোষগুলি জুটতে হয় ! শেষে কিনা চুরি !! খেতে দিই তাই ভাগ্যি, তার উপর আবার, এত সৌখিনি ফলান কেন ? ওলো বিন্দি, একবার তোর মেয়েব ভাল মানুষী দেখে যা। ছি ! ছি ! মরণ, গলায় দড়ি !!"

বিন্ধ্য ঘাট হইতেই গলা শুনিয়া ছুটিল ; বুঝি শৈল ঝাড়তে ঝাড়তে কিছু ভেঙ্গে ফেলেছে। পরে সবিশেষ অবগত হইয়া যখন পিতৃপিতামহের শ্রাদ্ধমন্ত্র শুনিল, তখন সে

মরমে মরিয়া গেল। শৈলর পীঠে সজোরে একটি চাপড় মারিয়া বলিল—"তুই এখনি মব, আমি নিশ্চিন্তি হই!"

তারপর সে মোক্ষদার পায়ে ধরিয়া বলিল, "দিদি ছেলেমানুষ ওব দোষ ধর না। মনে কর, তোমার একটি মেয়ে দুষ্টু হয়েছে, কি করবে বল? তুমিতো আমাদেব সব অত্যাচাব সইচ? এটাও সহ্য কর। বড়ঠাকুরকে বলো না, ছি! তিনি শুনলে কি মনে কববেন!"

"চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী" মোক্ষদা দেবী আবও অগ্নিশর্মা হইযা বলিলেন—"সে তো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেও দেখতে পায না, চাবিদিকে কেবল সরলতাব ছবি দেখে, আজকের ছবিটা একবার ভাল ক'রে দেখাব! মায়ের যোগ না থাকলে মেয়েব সাধ্য কি এতটা সাহস্ করে!"

এই বলিয়া বাগে গস্ গস্ করিতে করিতে আলমারি বন্ধ কবিয়া ঘব হইতে বাহিব হইযা চলিযা গেলেন। বিন্ধ্য চোখের জল আঁচলে মুছিয়া আপনার কাজে গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভাগ্যে ভগবান দুঃখীকে সহিষ্ণুতা দিযাছিলেন; না হইলে দুঃখীর কি হইত, বলিতে পাবি না। কিন্তু দুঃখীব সহিষ্ণুতাবও সীমা আছে, যে সীমা অতিক্রম করিলে, মানুষের পক্ষে চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব।

বিন্ধ্য রাগের মাথায় শৈলকে মাবিয়াছিল, ইহার আগে সে কখনও মারে নাই। কিন্তু পবে যখন মেয়ের মুখে সব কথা শুনিল, তখন প্রাণে অনন্ত যন্ত্রণা হইতে লাগিল। হায়! ভগবান দুঃখীর ঘরে স্বর্গের ফুল কেন পাঠান্! কিন্তু কি জানি কেন বিধাতা সশৈবাল পঙ্ককেই কমলেব উৎপত্তি স্থান নির্দ্ধারিত কবিযাছেন!

দুঃখিনী সেদিন স্বামীর কাছে প্রাণেব বেদনা না জানাইযা কিছুতেই থাকিতে পাবিল না: সেদিন তাহার হৃদয়ের অভিমান সহিষ্ণুতার সহস্র বাঁধ ভঙ্গ কবিয়া উচ্ছ্বসিত বেগে প্রবাহিত হইল।

উমাকান্ত বাবু ধীর হইলেও মানুষ কত সহ্য করিবেন! তাঁহার মনে বড় আত্মগ্লানিব উদয হইল। যদি ভরণ পোষণ করিতে না পারিবেন, তবে সে সবলাকে কেন তিনি অকূলে ভাসাইলেন! তিনি স্ত্রীকে বলিলেন—"দেখ এরূপ ভাবে নিশ্চেষ্ট থাকিলে, দিন কাটিবে না। আর সত্যই দাদা একলা মানুষ কতদিন আমাদের সকলকে বসাইয়া খাওয়াইবেন? চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে কলিকাতা হইতে লিখিয়াছেন, সেখানে স্কুলে একটি চাকরি হওয়া সম্ভব, তবে আর ইতস্ততঃ না করিয়া কালই যাই।"

বিন্ধ্য কেমন করিয়া বলিবে—"যাও?" স্বামী তার এখনও সারেন নাই। তাহার অর্থ না থাকিলেও সে হৃদয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়া, প্রতিদিন স্বামীর সেবা করিতে পায়, এবং ইহাকেই সে পরমার্থ জ্ঞান করে।

কিন্তু উমাকান্ত বাবু যা বলেন, কাজেও তাই করেন। তাই পরদিন প্রাতেই চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিঠিখানি হাতে করিয়া তিনি দাদার কাছে উপস্থিত হইলন, এবং কলিকাতায যাইবার জন্য তাঁহার অনুমতি চাহিলেন।

নববাবু সহসা এ সংবাদে অস্থির হইয়া পড়িলেন। উমা তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। তিনি সংসারের সকল ভার তাহার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত। বিশেষতঃ উমাকান্ত এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হন নাই। সেই জন্য তিনি বলিলেন, "তুমি আরও কিছুদিন বাড়ীতে থাক, শরীরটা ভাল

করিয়া সারুক তার পরে যেও। তাড়াতাড়ি কি ?"

মোক্ষদা দেবী যদিও শাসাইয়াছিলেন, তথাপি স্বামীর কাছে পূর্ব দিনের কোন কথাই বলেন নাই। স্বামীকে বলিলে, সুফল না হইয়া কুফলেরই বেশী সম্ভাবনা। তাই সেই ঘটনাটিকে বিন্ধ্যের মর্মচ্ছেদনের একটি নূতন উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, তিনি নিশ্চিন্ত রহিলেন। সুতরাং নববাবু সে বিষয়ে কিছুই জানিতে পারেন নাই।

উমাকান্তবাবু বলিলেন,—"বায়ু পবিবর্তনে শরীরেরও উপকার হইতে পারে,—অতএব যাওযাই আমার শ্রেয়ঃ, আবার এমন সুযোগ শীঘ্র না ঘটিতেও পারে।"

উমাকান্ত বাবু সেই দিনই কলিকাতা রওয়ানা হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তাবপব ৪ মাস অতীত হইয়া গেছে।

যখন দুর্ভাগ্যের সময হয়, তখন পোড়া 'শোল' মাছও হাত হইতে পালায , আবাব যখন ভাল হইবার হয, তখন ঈশ্বর ছাপ্পড় ফুঁড়িযা সৌভাগ্য ঢালিয়া দেন। ইহাই জীবনের সুখ দুঃখ।

উমাকান্ত বাবু এখন দুর্ভাগ্যের অন্ধকার অতিক্রম কবিযা, সৌভাগ্যেব আলোকে পদার্পণ কবিয়াছেন। প্রথমে তিনি একটি কলেজিয়েট স্কুলে(Collegiate School)দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন ,—পরে প্রধান শিক্ষকের পদ খালি হইলে, লোকে তাঁহাব গুণের পবিচয পাইযা তাঁহাকেই সেই পদে উন্নীত করে। এখন তাঁহার আয় মাসে ১০০ টাকা এবং শীঘ্রই কলেজেব একজন Professor হইবার সম্ভাবনা আছে।

ঘনঘোর বর্ষার পর সূর্য্যের মুখ বড় মধুময় বোধ হয়। দুঃখের পব সুখ অতিশয মধুর লাগে। বিন্ধ্য আর এখন পরাধীনা নয় ; চিববিষাদময়ী প্রতিমার মুখে এতদিনের পর হাসি দেখা দিয়াছে। নব বাবু ভাইয়েব এই উন্নতিতে আন্তরিক সুখী হইযাছেন।

অনেক স্থলে স্নেহ প্রেমে যাহা করিতে পারে না, টাকায় তাহা পারে। শত্রুকে মিত্র করিতে টাকাব ন্যায় 'অব্যর্থ মহৌষধ' খুব কমই আছে। মনে মনে ঈর্ষাদগ্ধ হইলেও মোক্ষদা দেবী এখন বিন্ধ্যকে দিনে অনেকবার "বোন" বলিয়া সম্বোধন করিযা থাকেন।

দেখিতে দেখিতে পূজার সময় উপস্থিত হইল ; উমাকান্ত বাবুদের স্কুল এতদুপলক্ষে ১ মাস বন্ধ হইল। তিনি বাড়ী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। একদিন বাজারে গিয়া সমস্ত জিনিসপত্র কিনিলেন।

বাজার হইতে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া বাসায় ফিরিতেছেন, এমন সময় রাস্তায একটি বালিকাকে তাহার মা মারিতেছে দেখিয়া তিনি হঠাৎ থামিলেন ়কি মনে হইল, আবার বাজারের দিকে ফিরিযা গেলেন।

পরদিন যথাকালে উমাকান্ত বাবু বাড়ীতে পৌঁছিলেন। তাঁহার সতী সাধ্বী স্ত্রী আনন্দাশ্রুজলে ও কন্যা স্নেহঅভিষেকে তাঁহাকে ঘরে তুলিলেন। নব বাবু ভাইকে আলিঙ্গন করিয়া সুখী হইলেন। উমাকান্ত বাবু সাদরে সুখদা ও শৈলবালাকে কয়েকখানি ভাল গল্পের বই, ভাল কাপড়, মোজা বুনিবার জন্য পশম, সুন্দর ছবি ইত্যাদি উপহার দিলেন।

পরদিন দুই প্রহরে খাওয়া দাওয়ার পর উমাকান্ত বাবু বিছানায় শুইয়া আছেন, এক পার্শ্বে তাঁহার স্ত্রী, অপর দিকে শৈল তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতেছিল, এমন সময় তিনি বলিলেন,—শলু, যা দেখি, ঐ জামাটার পকেট হতে চাবি নিয়ে, আমার পোর্টমেণ্টটা খোল্

তো।

শৈল। কেন বাবা?

উমাকান্ত। আগে খোল, তারপর বলছি।

শৈল পোর্টমেণ্ট খুলিল।

উমাকান্ত। ঐ ডানদিকে কাগজে মোড়া যে জিনিসটা আছে, আমার কাছে আন।

শৈল তাহাই করিল।

উমাকান্ত। আচ্ছা এতে কি আছে বল দেখি?

শৈল। কি জানি।

উমাকান্ত। তবু বলনা আন্দাজ করে।

শৈল। তোমার কোন ওষুধ হবে।

উমাকান্ত। ঠিক বলেছিস পাগলী, এতে চাকরীর ওষুধ আছে। এতে যে হাত দেয় তার বাবার চাকরী হয়।

শৈল ও তাঁহার মা এ কথায় খুব হাসিয়া উঠিল।—সে আবার কেমন ওষুধ না জানি।

তখন উমাবাবু কাগজের মোড়ক খুলিলেন। ভিতর হইতে দুইটি সুন্দর শিশি বাহির হইল। শৈল একেবারে ঝাঁপাইয়া তাঁহার হাত হইতে কুন্তলীনের শিশিটি লইল। এবং আবেগে বলিয়া উঠিল,—বাবা, কাল তুমি যে আমায় বই কাপড় দিয়েছিলে আমি সে সব রেখে দিয়েছি, আমার ভালই লাগে নি। আমার খুব আশা ছিল, যে কুন্তলীনের জন্যে আমি মার খেয়েছিলাম, নিশ্চয় তুমি আমার জন্যে সেই 'কুন্তলীন' নিয়ে আসবে। কিন্তু যখন তুমি বই দিলে, কাপড় দিলে, "কুন্তলীন' দিলে না, তখন বড় দুঃখু হল তাই সে সব তুলে রেখেছি এইবার আমার সব ভাল লাগবে।

উমাকান্ত। তুই কেবল "কুন্তলীন" জানিস, কিন্তু এটি কি বল দেখি?

শৈল। তা কি জানি।

উমাকান্ত। এর নাম "এসেন্স দেলখোস", বড় সুন্দর সুবাস। আয় দেখি তোর হাতে একটু লাগিয়ে দিই—দেখ সত্যি কি না?'

উমাকান্ত বাবু শিশি খুলিবামাত্র একটি সুমিষ্ট স্নিগ্ধ গন্ধে ঘর আমোদিত হইয়া উঠিল। বিন্ধ্য বলিয়া উঠিল, বড় সুন্দর গন্ধ তো।

শৈল আহ্লাদে আটখানা হইয়া কি করিবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না, সে শিশি দুইটি বাবার কাছে রাখিয়াই, সইকে এ সংবাদ দিতে ছুটিল।

তখন উমাবাবু অঙ্গুলিতে একটু "কুন্তলীন' মাখাইয়া, সস্নেহে প্রণয়িনীর কপালে লাগাইয়া দিয়া বলিলেন—সিঁথির সিন্দুরের সঙ্গে আজ হইতে ইহাকেও জীবনের চিরসহচর কর, ইহাই আমাদের সংসারের লক্ষ্মী।

বিন্ধ্যের মুখখানি আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে হঠাৎ কি মনে করিয়া বলিল, বা' ঠিক এই গন্ধই তো সেদিন সারারাত পেয়েছিলাম। তখন বুঝতে পারি নাই,—মনে ক'রেছিলাম ফুলের গন্ধ। শৈলকে যে একদিন মৌমাছিতে বিপদে ফেলেছিল, সে শুধু এই সুমিষ্ট বাসের জন্যে, তার সই তার মাথায় সে দিন "কুন্তলীন' দিয়েছিল। সাধে কি শলুর লোভ হয়েছিল—এমন তেলে কার না লোভ হয়?

উমাকান্ত বাবু হাসিয়া বলিলেন, তা বেশ মজা মন্দ নয়। তবে তো দেখছি তোমাকে এ তেল মাখতে দিয়ে আমায় সর্বাগ্রে মৌমাছি বংশ ধ্বংস ক'রতে বেরুতে হবে। ক'লকাতায় মাষ্টারির পর বাড়ীতে এ একটা চাকরি মন্দ হবে না।

তারপর স্বামী স্ত্রীতে কথোপকথন হইতে লাগিল। পাঠক! আপনার ও আমার তাহা শুনিবার অধিকার নাই। আসুন এইখানেই আমরা সরিয়া পড়ি।

বিনয়ভূষণ সরকার

অদৃষ্ট চক্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমার গত জীবনের ঘটনা শুনিলে লোকে আমাকে কি বলিবে জানি না, কিন্তু আমি প্রকৃত পক্ষেই বাঙ্গালীর ঘরের একজন "নিরীহ মেয়ে"।—আমার অদৃষ্ট-চক্রই আমার অখ্যাতি বা সুখ্যাতির প্রবর্তক। একথা যিনি না বুঝিবেন, এ ক্ষুদ্র জীবনের কাহিনী শুনিয়া তাঁহার কাজ নাই।

পশ্চিমে মধুপুরে, ছোট পাহাড়ের উপরে বেড়াইতে বালিকা আমি বড়ই ভাল বাসিতাম। সকলে বলিত, "সুকুমারী পাহাড়ে মেয়ে হয়ে গেল!" তাহা সত্য না হউক, কিন্তু পাহাড়ের উপরে গিয়া দেখিতে পাইতাম—পশ্চিমের আকাশে সিন্দুর ঢালিয়া দিয়া, রবিটি ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইত; মেঘের গায়ে সোনালী আলো ছড়াইয়া পড়িত, নীচে সবুজ শস্যক্ষেত্রে বায়ু ঢেউ খেলাইয়া দিত, বড় বড় মহিষ, গরু এবং মানুষ সব ছোট ছোট দেখাইত, সেই বিচিত্র সৌন্দর্য দেখাব আনন্দ আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। আর যে আমাকে সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখাইত, তাহাকেও ভুলিতে পারিব না। আমার মনে হয়, অস্তমান সূর্যের সেই অপূর্ব শোভা পাহাড়ের উপরে বসিয়া না দেখিলে, নবমানবের চক্ষু সার্থক হয় না! কিন্তু সত্য বলিতেছি, সেই শোভারাশি উপভোগ করিবার মত শক্তি তখনও আমার জন্মে নাই;—যতীশ আমাকে দেখাইত, বুঝাইত আরও শিখাইত। তাই আমি প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে পাইতাম। যখনকার কথা বলিতেছি, তখনকার সময়ে আমাব বয়স আট, নয়, দশ এবং এগার বৎসর। চারি বৎসর পর্যন্ত এইরূপ হইতেছিল।

আমার বাবা কলিকাতার একজন বড় ডাক্তার। বাবা, মা, আমি, আমাব ছোট ভাই ললিত আর লোকজন, আমরা সকলেই পূজার সময়ে মধুপুরে যাই। বাবা দুই এক মাস পরে কলিকাতায় আসেন, আমরা, ফাল্গুন মাস পর্যন্ত সেখানে থাকি। ললিত ও আমি, মাতা পিতার এই দুইটি মাত্র সন্তান।

মধুপুরেই যতীশের সহিত আমার প্রথম বন্ধুত্ব। যতীশের বাড়ী পল্লিগ্রামে; তাহার বাপ জমিদার। মধুপুরে তাঁহাদেরও এক বাড়ী আছে, তাঁহারা শীতকালে সেই খানে থাকেন।

যতীশ আমার অপেক্ষা আট নয় বৎসরের বড়। যতীশ আমাকে পড়া বলিয়া দেয়; আঁক কষিতে ও লিখিতে শেখায়; আমার সঙ্গে বেড়াইতে যায়, গল্প করে। তাঁহার সৌন্দর্যের কি এক অনির্বচনীয় শক্তি দেখিয়াছি, যে সকল ভুলিয়া তাহার কাছে থাকিতে হয়; অথবা তাহার কাছে থাকিলে সকল ভুলিতে হয়! বলিতে গেলে গোলমাল হইয়া যায়, কিন্তু সত্য সত্যই যতীশের মুখে কি আছে! কলিকাতায় থাকিয়া সে পড়িত, কিন্তু তাহাদের হোষ্টেলের নিয়মানুসারে সে বিশেষ কারণ ব্যতীত বাহিরে যাইতে পারিত না; সেই জন্য কলিকাতায় আমাদের বড় একটা সাক্ষাৎ হইত না। তাই যতীশ যখন পড়িতে যাইত, আমি সমস্ত বৎসর তাহার মুখখানি ভাবিয়া কাটাইতাম। কলিকাতার মাসগুলা যেন দুই হাতে সরাইয়া, মধুপুরে যাইবার মাসকে টানিয়া আনিতে ইচ্ছা করিত। লোকে ইহাতে "পূর্বরাগ" ভাবিবে কি না

জানি না ; কিন্তু আমার বয়স তখন যাহা, তাহা বলিয়াছি। তবু আমার মনে একটা কথা আছে ! সে কথা এই যে বাল্যকালের ভালবাসাই আমাদের খাঁটি ভালবাসা। পণ্ডিতেরা মানবের সর্ববিধ সুশিক্ষা বাল্যকালে আরম্ভ করিতে বলিয়াছেন ; আমার বোধ হয়, ভালবাসার অনুশীলনও বাল্যকালে করিতে হয়। কেননা প্রাপ্তবয়সে মানব-প্রাণ অমন গলিতে পারে না, পরের ভিতরে অমন আপনাকে হারাইতে পারে না, এবং হৃদয়ে পরের অমন সুন্দর ফটোটিও উঠিতে পারে না ! যাহা হউক ইহার পরে আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিল, তাহা পরে বলিতে প্রবৃত্ত হইব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রি গভীব। মধুপুরের বাড়ীতে খাটের উপরে আমি ঘুমাইতেছিলাম ; সহসা ঘরের মধ্যে কথাবার্তার শব্দ শুনিয় আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শুনিলাম মা বাবার সহিত কথা কহিতেছেন, আমারই বিবাহের কথা ; আমি নিঃশব্দে আগ্রহপূর্ণ হৃদয়ে তাহা শুনিতে লাগিলাম। নিজের বিবাহের কথা শুনিতে কোন্ বালিকার সাধ নাই ?

শুনিলাম মা বলিতেছেন, "মেয়ের বিয়ের ভাবনায়ই তো আমার মাথা ঘোরে। গেল আশ্বিনে আমার সুকুমারী তের বছরে পড়েছে ; আজ পর্যন্ত তুমি কোথাও সম্বন্ধ ঠিক কোল্লে না ; হিন্দু ঘরের মেয়ে কত দিন আইবুড়া থাক্‌বে ? আর তুমিই বা এর পরে তাড়াতাড়ি ওকে কার হাতে দেবে ? বাবা উত্তর কবিলেন, "মেয়ের বিয়েব ভাবনা তোমার আছে, আমার কি নাই ? পাত্র ত খুঁজচি, তা মনেব মত ঘর বর পাই কৈ ? আমাদের ত একটি মেয়ে, যাকে তাকে ধরে দিতে পারি কি ?"

মাতা। কি বল্‌ছিলে তুমি ?—যতীশের সঙ্গে সুকুর বিয়ে হ'তে পারে না কেন ? ছেলেটি দেখ্‌তে যেমন সোণার চাঁদ, বিদ্যাবুদ্ধি তেমনি, আবার জমিদারের ছেলে। অমন পাত্র আর কোথায় পাবে ?

আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিতে লাগিলাম, বাবা উত্তব করিতেছেন, "যতীশেবা খুব বড কুলীন কাযস্থ। কুলীনের প্রথম ছেলে যতীশ ; পাল্‌টী ঘরে বিবাহ না করিলে কুল-বক্ষা হয না। আমরা বড় কুলীন নই, তাই যতীশের বাপ—তিনি গোঁড়া হিন্দু কি না, তাই তিনি এ বিবাহে সম্মত হন নাই। যতীশের যেন মনে মনে খুবই ইচ্ছা যে সুকুমারীব সঙ্গে বিবাহ হয় কিন্তু বড়ই পিতৃভক্ত ; বাপের কথার অন্যথা কত্তে পারে না।" মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আহা ! আমরা যতীশকে তবে পাব না ! অমন ছেলে কিন্তু আর হবে না !"

ইহার পরে মা বাবা কি কথা বলিলেন, বলিতে পারি না। কারণ বাবার কথা শুনিয়া, আমাকে যেন সহস্র বিছা একেবারে দংশন করিল ! সে অসহ্য যাতনায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে পারিলে বাঁচিতাম ! তাহা পারিলাম না ! যতীশের সঙ্গে বিবাহ হইবে না, এ নিদারুণ শব্দ, শত বজ্রশব্দ হইতেও আমার পক্ষে ভয়ানক।

তা যতীশের সঙ্গে বিবাহ হইবে, এমন কথা আমাকে কেহই বলে নাই ; কেবল আমিই জানিতাম যতীশের সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে। কেমন করিয়া জানিতাম, তাহাও বলি। আমি রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িতাম ; তাহাতে পড়িয়াছিলাম, রাজকন্যারা যাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিত, তাহারই সঙ্গে বিবাহ হইত। একদিন সীতা, সাবিত্রী, সুভদ্রা ও দময়ন্তীর মত একটা বর ঠিক করিতে আমার বড়ই ইচ্ছা করিতে লাগিল।

সে আজি এক বৎসর আগেকার কথা। আমরা তখন কলিকাতায়, সিমলা ষ্ট্রীটের উপরে আমাদের বাড়ী। সদর বারাণ্ডার উপরে চিক ফেলা। চিকের আড়াল হইতে আমি রাজপথচারী অগণ্য লোক-শ্রেণী দেখিতে লাগিলাম ; সেই গাড়ী, ঘোড়া, বাইসিকেল, পাল্কী ও পদব্রজে কত লোক চলিতেছে দেখিলাম, কত সুন্দর মুখও দেখিলাম ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটিও রাম, সত্যবান, অর্জ্জুন অথবা নলের মত দেখিলাম না। কাহাকে দেখিয়াও আমার স্বয়ম্বরা হইবার সাধ হইল না। তখন ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

ঘরে ফিরিয়া শুনি, মা পিসীমার কাছে বলিতেছেন, "যতীশের সঙ্গে যদি আমার সুকুর বিবাহ হয়, তাহা হইলে আমার জীবন সার্থক হয় বটে !" শুনিয়া যেন ঘোর-আঁধারে বিজলী দেখিলাম! সেই নবোদিত তপনের মত সুন্দর, তেজস্বী, সরল ও পবিত্র যতীশ-মূর্তি আমার মনে পড়িল ! মধুপুরের পাহাড়ের উপরে, গৈরিক প্রান্তরে, স্নিগ্ধ নির্ঝরের উপকূলে সেই মধুমাখা কথা, সেই মনোহর গান, সেই প্রাণভরা ভালবাসা মনে পড়িল !—আরও মনে পড়িল, সে মূর্তি যেন রামের চেয়ে, সত্যবানের চেয়ে, অর্জুনের চেয়ে এবং নলের চেয়ে সুন্দর ! তখন মনে হইল, যতীশের সহিত যাহার বিবাহ হইবে, সে মেয়ে বুঝি বা সীতা, সাবিত্রী, সুভদ্রা ও দময়ন্তী অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবতী।

আমি দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা, আমি সেই অবধি যেখানে দেব-মন্দির দেখিয়াছি, সেইখানে প্রার্থনা করিয়াছি, যেন যতীশের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। যখন পরের বিবাহ দেখিতে গিয়াছি, অমনি করিয়া যতীশের সঙ্গে আমার বিবাহ হইতেছে, মানস-নেত্রে দেখিয়াছি ; কতদিন ফুলের মালা গাঁথিয়া, তরুর শাখায় দোলাইয়া "যতীশের গলায় দিলাম" ভাবিয়াছি। সেই অবধি যতীশের চরণে আপনাকে বিকাইয়াছি ! এখন আমার উপায় কি ?

আজি এই মুহূর্তে নিষ্ঠুর জাগ্রতি আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া দিল ! এখন আমার উপায় কি ? আমি নীরবে চক্ষের জলে বালিস ভিজাইতে লাগিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমরা কলিকাতায়।—আমার মাথামুণ্ড আর কি বলিব, বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে।—যতীশের সঙ্গে নহে ; অন্য ব্যক্তির সঙ্গে। পাত্র একজন হাইকোর্টের উকিল ; তাঁহার পিতা বা অন্য অভিভাবক কেহ নাই, নিজেই কর্তা। পাত্রের বিদ্যা, বুদ্ধি, খ্যাতি এবং ওকালতীতে পসার যথেষ্ট। পরের বিবেচনায় আমার শুভাদৃষ্ট ; আমার বিবেচনায় আমার সর্বনেশে অদৃষ্ট ; আমার জীবন্তে সমাধি। এখন বিবাহের আগেই যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার ধর্ম রক্ষা হইতে পারে। প্রকৃত পাপ পুণ্য কিসে হয়, তাহা অবশ্য আমি জানি না ; তবে আমি হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ পড়িয়া উপদেশ শুনিয়াছি, যে মনে মনে পরপুরুষের প্রতি পতিভাবে চাহিলেও মহাপাপ হয়। আমি যদি এখন অন্যের সহিত বিবাহিতা হই, তাহা হইলে আমার পক্ষে যতীশ পরপুরুষ, অথচ আজি দেড় বৎসর পর্যন্ত মনে মনে আমি তাঁহাকেই পতিভাবে উপাসনা করিতেছি। এখন যে আমার ইহকালও যায়, পরকালও যায়, আমার উপায় কি ? সামাজিক মঙ্গলের তুলনায় একজনের জীবন তুচ্ছ কথা, তাহা জানি। যতীশ ব্যতীত অন্য কোনও সুপাত্র আমার স্বামী হইলে আমি নিজেও মনস্তাপে দগ্ধ হইতে থাকিব, সেই নির্দোষ পুরুষকেও দগ্ধ করিতে থাকিব। তবে সামাজিক মঙ্গলের চরণে আত্ম-বলি দিয়া (বঙ্কিম বাবুর লবঙ্গলতার মত) অপ্রার্থিত স্বামীকে লইয়া গৃহধর্ম নির্বাহ করিতে পারি। তাহাতে আত্মসংযম ও ত্যাগস্বীকারের সম্পূর্ণ অনুশীলন হইলেও

উপরে যে সর্বান্তঃযামী বিশ্বতশ্চক্ষু রহিয়াছে, সে চক্ষু যে আমার পাপের চিত্র দেখিয়াছে। আমি মরিলেও যে "মা" বিশ্বজননী আমাকে তাঁহার স্নেহের কোলে স্থান দিবেন না ! একজন জ্ঞানী সুবোধ ব্যক্তি এ অবস্থায় পড়িলে কি করিতেন জানি না ; আমি বঙ্গীয় বালিকা, আমার মনে হইল, এ অবস্থায় আত্মহত্যাই আমার উপায়।

তা আত্মহত্যার কি পাপ নাই ? কিন্তু আমি বাঁচিয়া থাকিয়াই বা কি করিব ? যতীশের উপরে আমার যে ভালাবাসা তাহা দুর্দমনীয়, তাহা অপরিহার্য্য। সেই সমুদ্রতুল্য অপ্রমেয় ভালবাসা লুকাইয়া রাখিয়া অন্যের পত্নীত্ব স্বীকার করিব ! জীবন্তের রাবণের চিতা বুকে বহিব ? সে কাজ কখনওকরিতে পারিব না।—আমার এই কথা শুনিয়া লোকে "সোশিয়া-লিষ্টিক" বলিবে ; কিন্তু আমি এত কপটতা, এত চালাকি খেলিয়া. "সমাজের মঙ্গল" করিতে পারিব না,—"মা" পৃথিবী ! ক্ষমা করিও।

তা আমার বাবাকে মা'কে দারুণ শোক দিয়া যাইব ? আমার পায়ে কাঁটাটি ফুটিলে, তাঁহারা কত ব্যথা অনুভব করেন, আর সেই আদরেব মেয়ে আমি নিতান্ত হৃদয়হীনের মত মৃত্যুকে সাধিয়া আলিঙ্গন করিলে, তাঁহারা কত ব্যথাই পাইবেন ! আমাব ছোট ভাই ললিত কত কান্নাই কাঁদিবে ! মরিতে পারিব কি ?

পারিব বই কি ! আমি আমার সতীত্ব লইয়া পলাইলে, মা বাপের গৌরব ভিন্ন অগৌবব হয় না। আমি যে সদ্বংশে জন্মিয়াছি, সে বংশেব অপমান করা হয় না। ললিত বেঁচে থাকুক, উহার বিবাহ হইবে, বৌ আসিবে, তখন মা বাবার শোকের অনেক শান্তি হইবে।

এইরূপ বহু তর্কবিতর্কেব পর অবশেষে আমি আত্মহত্যা কবিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলাম। ঠিক মুহূর্তে ঝি আমার হাতে একখানা ডাকের পত্র দিয়া গেল।

হাতের লেখা দেখিয়া চিনিলাম। হাত কাঁপিতে লাগিল ; গা কাঁপিতে লাগিল ; খামখানা ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলাম ;পত্র এই—

"স্নেহের সুকু ! প্রায় দুই বৎসর তোমাদিগকে দেখি নাই ; এ হতভাগাকে এতদিন একটু পত্র লিখিলে না ! যাহা হউক আমার পিতৃদেব অতীব পীড়িত ; তাহার চিকিৎসার জন্য আমরা স্বতন্ত্র বাসা কবিয়া কলিকাতায় আছি। তোমরা কলিকাতায় আছ, তাহা জানি। সুকু ! যদি বল, তাহা হইলে একদিন তোমাদিগকে দেখিয়া আসি। হযতো সেই দেখাই শেষ দেখা হইতে পারে। ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী যতীশ।"

একি ! বাবা বলিয়াছিলেন, আমাকে বিবাহ করিতে ওঁর আন্তরিক ইচ্ছা ; সে কথা সত্য বই কি ! যতীশ আমারই ! যতীশ আমারই উপাস্য দেবতা ! আমি আনন্দে মবিতে পারিব ! পত্রের উপরে বাসার ঠিকানা লেখা ছিল, কিন্তু আমি আজি পত্রেব উত্তর দিতে পারিলাম না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইংরাজেরা বলেন, যে সকল দোষে বাঙ্গালী "মানুষ" হইতে পারে না, দীর্ঘসূত্রিতাই তাহার মধ্যে প্রধান। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গীয় পুরুষেরা দীর্ঘসূত্রিতা দোষে দূষিত কি না, সেকথা আমি অবশ্য জানি না ; তবে আমি এইটুকু জানি, যে দীর্ঘসূত্রিতা দোষ আমাদেরই—বাঙ্গালীর মেয়েদেরই একচেটিয়া। খোকার দুদ ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে, আর খোকার মা ঝিনুকটি হাতে করিয়া, দুই পা ছড়াইয়া, সেজ পিসীর সঙ্গে গল্প করিতেছেন, এমন দৃশ্য কে না দেখিয়াছ ?

ট্রেণে যাইতে হইবে বলিয়া আত্মীয়েরা কমলাকে তাড়া দিতেছেন, কমলা হয়তো তখন তাড়াতাড়ি বিমলার নূতন গঠিত হার ছড়াটির সমালোচনা কবিয়া লইতেছেন, এমন দৃশ্য কে না দেখিয়াছ ? তাই বলিতেছি, আত্মহত্যা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেও আমার মরিবার যে বিলম্ব হইতেছে, তাহার জন্য পুরুষেরা যাহাই বলুন, আমার বঙ্গবাসিনী ভগিনীরা, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট ভরসা।

কিন্তু কেবল দীর্ঘসূত্রিতার জন্য নহে, একে বঙ্গবাসিনী, তাহাতে বালিকা ; আত্মহত্যা করিবার কথায় ভয়ও করে, সুবিধাও পাই না, কাজে কাজেই আমাকে উপহাস করিতে করিতে হৃদয়হীন দিনরাত্রিগুলা মাথার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে।

সুতরাং আমার গায়ে হলুদ হইল। আত্মীয়া কুটুম্বিনীতে গৃহ পূর্ণ হইল। বিবাহের সময়ে কিরূপ আলো, কিরূপ বাজনা, কিরূপ সমারোহ হইবে ; আমার গহনা ও পোষাক কিরূপ হইবে, তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত হইল। আর বিলম্ব করা অসম্ভব, তাই আমি আত্মহত্যার উপায় স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

উদ্ভাবিত নানা উপায়ের মধ্যে একটি উপায় সহজেই হইল। মা'র পেটে বেদনা হইলে, সেখানে মালিস করিবার জন্য বাবা এক শিশি ঔষধ দিয়াছিলেন, তাহা "বিষ"। বাবা মা'কে বলিয়াছিলেন, "শিশিটা সাবধানে রেখ, ওটা ভয়ানক বিষ"। একটুখানি ঔষধ ব্যবহার করিয়াই মা আরাম হইলেন। মেয়ের বিবাহের ব্যস্ততাবশতঃ বাবা ও মা সেই বিষের কথা ভুলিয়া গেলেন। একটা তাকের উপরে শিশিটা পড়িয়াছিল, অগ্নি-শিখা দেখিয়া পতঙ্গ যেমন আনন্দ প্রাপ্ত হয়, আমিও সেই রকম আনন্দে বিষের শিশি চুরি করিলাম। বিষের শিশি হাতে করিয়া, আমার বুকে যেন ঢেঁকি পড়িতে লাগিল। খাইলে সব গোলমাল চুকিয়া যায়, তাহা জানি ; তবু কেমন যেন খাইতে সাহস হইল না। বাক্সের মধ্যে শিশিটি রাখিয়া চাবি দিলাম। ঠিক করিলাম, বিবাহের রাত্রে সকলে যখন আমাকে একা এই ঘরে রাখিয়া জামাতা অর্চনা করিতে যাইবেন, তখনই আমি বিষ খাইব। তার পরে যখন বিবাহের জন্য আমাকে লোকে জাগাইতে আসিবে, তখন সেই উৎসাহপূর্ণ অসহিষ্ণু আহ্বানকে উপেক্ষা করিয়া নিস্পন্দ দেহখানি অনন্ত শান্তির কোলে ঘুমাইতে থাকিবে। নিন্দাশূন্য, প্রশংসাশূন্য, বিবাহশূন্য রাজ্যে তাহার প্রাণ জন্মের মত চলিয়া গিয়াছে।

সবতো ঠিক হইল, কিন্তু প্রাণাধিক যতীশকে একবার বলিয়া যাইতে হইবে। যে কথা এ জন্মে বলি নাই, সে কথাও তাঁহাকে শুনাইতে হইবে। যে মরণের পথে দাঁড়াইয়াছে, তাহার আর লজ্জাই বা কি, ভয়ই বা কি ?

তখন নিভৃত কক্ষে, পত্র লিখিতে বসিলাম। কি পাঠ লিখিব, আপনি অথবা তুমি লিখিব, এই সব মীমাংসা করিতে করিতে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। অনেকক্ষণের পরে যাহা স্থির হইল, তাহাই লিখিলাম—

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র পাইয়াছি। উত্তর দিতে পারি নাই। ক্ষমা করিবেন। এ জগতে আপনাতে আমাতে আর দেখা হইবে না। বোধ হয় আপনি আমার বিবাহের কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু প্রিয়তম! বহু দিন আগে ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া আপনার চরণে আমি আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি। আমি বিবাহের ঠিক পূর্বমুহূর্তে আত্মঘাতিনী হইব, ইহাতে লোকে আমাকে যাহা ইচ্ছা বলুক, কিন্তু আপনি আমাকে ঘৃণা করিবেন না। আপনার স্নেহের সুকু তাহার সতীত্ব লইয়া চলিয়া যাইবে, আপনি লোকের কথা শুনিয়া তাহাকে ঘৃণা করিবেন না। আর কি

লিখিব ! যদি জন্মান্তর থাকে তবে জন্মান্তরে যেন কায়মনোবাক্যে আমি আপনারই দাসী হইতে পারি। ঈশ্বরের চরণে ইহাই প্রার্থনা। ইতি।

অভাগিনী সুকু।"

উপরে নাম ও ঠিকানা লিখিয়া, ঝির হাতে দিয়া পত্র ডাকঘরে পাঠাইলাম ! কিন্তু পত্র রওনা করিয়া আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল ! ছি ! ছি ! এ কি পত্র লিখিলাম ? তিনি যে আমাকে "পাহাড়ে মেয়ে" ভাবিবেন ! লজ্জায় আমি মরিতে লাগিলাম ! কিন্তু আমার অদৃষ্টের নিয়ন্তা যাহা ঠাওরাইতেছেন, তাহা কেবলমাত্র তিনিই জানেন !

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আজি আমার বিবাহ। লোকে জানিতেছে "বিবাহ", আমি জানিতেছি, আজি আমার শেষ দিন। আমাদের বাড়ীর পাশেই ফুলবাগান। আমার ছোট ভাই ললিত ও আমি সেখানে বেড়াইতেছিলাম ; আমি মনে মনে মরিবাব কথা ভাবিতেছিলাম, তাই ললিতের আনন্দোচ্ছ্বাস পূর্ণ মুখখানি দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল।

বাগানের চারিদিকে ইষ্টকের প্রাচীর। প্রাচীরে জানালা। সহসা দেখি, রাস্তার দিকে জানালায় একজন অপরিচিতা রমণী। সে একটা ছোট ঝুড়ি হাতে করিয়া নিতান্ত অপরিচিতার মত আমাকে বলিল, "চারি টাকার জিনিস চারি আনায় বেচিব, নাওনা গো দিদিমণি ?" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "তুমি কে গা ?" সে উত্তর করিল, "আমি সুখ'র মা। তোমারি যোগ্য জিনিস এনেছি, নাও গো নাও। পেটের জ্বালায় চারি টাকার মাল, চারি আনায় দিব, দোহাই তোমার নাও। তা পয়সা কিছুক্ষণ বাদে দিলেও চলবে। লক্ষ্মীটি আমার নাও, নাও।" সুখ'র মা আমার চির অপরিচিতা হইলেও তাহার কথাবার্তায় আমরা দুই ভাই বোনে বড়ই প্রীত হইলাম। বাগানে আমার অভিভাবকেরা থাকিলে হয়তো সেই স্ত্রীলোকের প্রতি কোনও রূপ সন্দেহ করিতে পারিতেন, কিন্তু আমরা তাহাকে দয়ার চক্ষে দেখিলাম, সে নির্দোষ ! বিশেষতঃ চারি টাকার কি জিনিস চারি আনায় বেচিবে, ইহা দেখিবার জন্য আমরা বড়ই ব্যগ্র হইলাম ; ললিতের পকেটে একটা সিকি ছিল, সে আমার সম্মতিক্রমে বাগানের দরজা খুলিয়া সুখর মাকে ভিতরে আনিল।

প্রথমতঃ বিক্রেয় জিনিস না দেখাইয়া সুখর মা আমার ও ললিতের নাম জিজ্ঞাসা করিল। আমরা উভয়ে নাম বলিলে সে নামের খুব সুখ্যাতি করিল। আমরা আগ্রহাতিশয়ে তাহার বিক্রেয় জিনিস দেখিতে চাহিলে, সে চুপড়ী নামাইয়া, ছেঁড়া কাগজ, করাতের গুঁড়ি সরাইয়া দেখাইতে বসিল।

তাহার বিক্রেয় বস্তু, প্রথম একশিশি "কুন্তলীন" তৈল, মূল্য এক টাকা ; দ্বিতীয় একশিশি "গোলাপ গন্ধ কুন্তলীন" তৈল, মূল্য দুই টাকা ; তৃতীয় একশিশি "এসেন্স দেল্‌খোস্" মূল্য এক টাকা। আমরা কুন্তলীনের ছিপি খুলিয়া সুন্দর, নির্মল তৈলের মনোমোহন সৌরভে মুগ্ধ হইলাম।

কুন্তলীন তৈলের বিজ্ঞাপন পড়িয়াছিলাম, কিন্তু তৈলটি অদ্যাপি দেখি নাই, তাই আমার কাছে তৈলের গন্ধ বড়ই মিষ্ট লাগিল। সহসা ললিত একটুকু গোলাপ গন্ধ কুন্তলীন আমার নাসিকাগ্রে ধরিল ; নবস্ফুট গোলাপের সৌরভে আমার প্রাণ ভরিয়া গেল ! দেখিয়া সুখ'র মা বলিল "ঐ চেপ্‌টা শিশিতে যে তেল আছে ওতেও খোস্‌বয় খুব" ; সেটা বাস্তবিক তৈল

নহে—এসেন্স দেল্‌খোস্‌। আমরা চতুষ্কোণ শিশি খুলিয়া তাহার আঘ্রাণ লইলাম ; মরি ! মরি ! কি অপূর্ব সৌরভ ! আমাকে মুগ্ধ দেখিয়া ললিত বলিল, "অডি কলোন, ল্যাবেণ্ডার চেয়ে এর সুগন্ধ মিষ্ট, মনোহর, কেমন নয় দিদিমণি ?"

এই চারি টাকার জিনিস চারি আনায় বিক্রয় করিতেছে, ইহাতে অনেক সন্দেহ ঘটিতে পারে। কিন্তু আমরা বালক বালিকা, সন্দেহ করিতে পারিলাম না। বরং এই চারি টাকার এমন রমণীয় সুগন্ধি দ্রব্য চারি আনায় কিনিলে আমাদেব জুয়াচুরি করা হইবে, মনে হইতে লাগিল। গত আষাঢ় মাসে, বাবা রথের বাজারখরচ চারি টাকা দিয়াছিলেন, ললিতকে সেই টাকা কয়টি আনিতে বলিলাম ; আমি বাগানে রহিলাম।

আমাকে একা দেখিয়া সুখ'র মা বলিল, "ও সব জিনিসের দাম দিতে হবে না, দিদি মণি। ও সবই তোমার জন্য। এই চিঠিখানায় সব আছে। আমি তবে আসি।" আমার হাতে পত্র দিয়া, এবং আমাকে কথা কহিবার অবকাশ না দিয়া, সুখ'র মা প্রস্থান করিল। বিস্ময়ে সোৎসুকে আমি পত্র খুলিলাম ; লেখা চিনিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িলাম—পত্র এই—

"স্নেহের সুকু ! তোমার পত্র পড়িয়া আমার হৃদয় মুগ্ধ হইল। তুমি বালিকা হইলেও দেবী। ভাবিয়াছিলাম, তোমার বিবাহ দেখিয়া তার পরে আমি সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যাইব। তাহা হইল না। আমি সত্য বলিতেছি তুমিও মরিবে, আমিও মরিব।

প্রিয়তমে ! আমি আজি তোমার কাছে একমাত্র ভিক্ষা চাহিতেছি, আজ তুমি জীবন ত্যাগ করিও না। আমি আজি প্রাণ ভরিয়া জনমের মত তোমার পবিত্র সরল মুখখানি দেখিয়া লইব। তোমার সহিত যাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে, সেই শ্রীশবাবু আমার পরম বন্ধু। তাঁহার সহিত আমি 'বরযাত্রী' হইয়া যাইব।

"কুন্তলীন" দুই শিশি এবং "এসেন্স" এক শিশি দিলাম, ইহার সৌরভ আমার বড় ভাল লাগে ; আর মাথার অসুখে ইহা হইতে আমি বড়ই উপকার পাই, সেই জন্য ইহা তোমাকে দিলাম, হতভাগার শেষ উপহার বলিয়া গ্রহণ করিও ! ইতি।

হতভাগা যতীশ"

পত্র পড়িয়া বড় কান্না আসিল। আজ আর মরা হইবে না। উনি আমাকে ঘৃণা করেন নাই, বাঁচিলাম !

উপসংহার।

"শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কালহরণম্‌" কথাটি বহু পুরাতন হইলেও অমূল্য। আজিকার দিনে আত্মহত্যার বডই বাড়াবাড়ি হইয়াছে ; যাহারা ঐ ভয়ানক কাজ করেন তাঁহারা যদি রাগের বা দুঃখের প্রথম আবেগটা একটু সম্বরণ করিতে পারেন, যদি "অশুভস্য কালহরণম্‌" মনে করেন, তাহা হইলে হয়তো আমার মত অনেককেই ঐ মহাপাপে পড়িতে হয় না।

সন্ধ্যা হইয়াছে। আমাদের বাড়ীতে বিবাহের ধূম পড়িয়াছে। আমি পলকে পলকে মৃত্যু পিপাসা সংযত করিতেছি, আমার উপাস্য দেবতার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিব না। যখন বর আসিল, যখন আনন্দোচ্ছ্বাসে, বাদ্যহিল্লোলে আলোকতরঙ্গে জনসমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তখন আমি—বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা, চন্দন ও অলক্ত রাগ-রঞ্জিতা, আমি সঙ্গিনীদিগের কোলে মূর্ছিতা হইয়া পড়িলাম।

সংজ্ঞা পাইয়া দেখি, যে বাবা কত রকম ঔষধ আমার মুখে ও নাকে দিতেছেন। মা

কাঁদিয়া বলিতেছেন, "অমন হ'লে কেন মা ? ঠাকুর যে মুখ তুলে চেয়েছেন ! তোমার জন্য আমি যে সেই হারাধন পাব মা !" সে কি ?

যখন আমাকে বিবাহের সভায় লইয়া গেল, তখন বাবা গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "বাপ যতীশ । আমার যে চিরদিনের কামনা, তাহা ভগবান আজি পূর্ণ করিলেন । এখন তাঁর কৃপায় তোমরা চিরজীবি হও ।" যতীশ কে ? বর ? আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল । আমি কি বিষ খাইয়াছি ? বিষের মোহে কি স্বপ্ন দেখিতেছি ? তখন অবস্থা, উপযোগিতা সবই ভুলিয়া, ঘোম্‌টা খাটো করিয়া চাহিয়া দেখি, আমার সেই অভীষ্ট দেবতা বর সাজিয়া আসনে বসিয়াছেন ! এ কি সেই আমার অদৃষ্ট চক্র ?

বিবাহের সমস্ত আচার অনুষ্ঠান শেষ হইলে, কেবল উনি আর আমি বাসর ঘরে রহিলাম ; মা আর কাহাকে সেখানে থাকিতে দিলেন না ; উনি আমার হাতখানি নিজের কমল করে লইয়া ডাকিলেন, "সুকু !" সেই চির পরিচিত অথচ চির নূতন কণ্ঠস্বর ! আমি কথা কহিব কি, চোখের জলে মুখ ভাসিতেছিল, মাথা ঘুরিতেছিল ; জানিয়া উনি আমার মাথায় একটু কুন্তলীন দিলেন, আর সেই দেল্‌খোস্ মাখা সুবাসিত রুমালখানি দিয়া, আমাব মুখ চোখ মুছাইয়া দিলেন । আমার শরীর বেশ একটু স্নিগ্ধ হইল ; তখন উনি বলিতে লাগিলেন, "এ সবই ঈশ্বরের কৃপা । তোমার পত্রখানি শ্রীশবাবুকে দেখাইয়া আমি সকল কথা তাঁহাকে বলি । শ্রীশবাবু অতি সদাশয় মহাত্মা । তিনি অনুতপ্ত হইয়া তখনই আমার বাবার কাছে যান । বাবাকে সবিশেষ বলিয়া, এ বিবাহ না হইলে আমাদের দুজনেব জীবন যাইবে, তাহাও বলেন । ঈশ্বরের কৃপায় আর শ্রীশবাবুর বাক্যকৌশলে বাবা সবই বুঝিলেন ; বলিলেন, 'কুলের চেয়ে আমার ছেলের জীবন বহুমূল্য ।' তার পরে আমার শ্বশুব মহাশয়কে ডাকিয়া বাবা সব বলিলেন ; আমার শ্বশুর মহাশয় সম্মত হইলেন । তাই শ্রীশবাবুর পরিবর্তে আমিই বর সাজিয়া তোমার বাসরে আসিলাম ।"

আনন্দে আমার প্রাণ ভরিয়া গেল । কোথায আত্মহত্যা, আর কোথায় প্রিয়তমের সহিত চির মিলন ! ওঁর কোলে মাথা রাখিয়া আমি শুইয়া পড়িলাম । শ্রীশবাবুর মহাপ্রাণতা আমার চিরস্মরণীয় ।

মানকুমারী বসু ।

দশম পুরস্কার—৫্

জামাই বেটার উপাখ্যান

পশ্চিম-আকাশ রঞ্জি বিবিধ ববণে
চলেছেন সূর্য্যদেব বিশ্রাম ভবনে ;
হবচন্দ্র রাজা মন্ত্রী গবচন্দ্র সনে
গভীর মগন এবে একটি চিন্তনে ;—
হবচন্দ্র রাজ্যে এক ছিল জলাশয়,
অপহৃত হইয়াছে নিশীথ সময় !
কেমনে ধরিবে চোর হব ভাবে মনে,
তারি পরামর্শ করে গবচন্দ্র সনে ।
হেন কালে ধীরে এক ব্রাহ্মণ সন্তান

উত্তরাভিমুখে ধীরে করিছে প্রয়াণ।
আকাশেতে দ্বিজবর দেখিল চাহিয়া,
বায়ু ভরে শঙ্খচিল যাইছে উড়িয়া ;
স্কন্ধ হ'তে ছাতি, লাঠি, ব্যাগটি রাখিয়া
শঙ্খচিলে নমে দ্বিজ ভূমিষ্ট হইয়া।
এ ব্যাপার রাজা মন্ত্রী করি দরশন
আরম্ভিল ঘোর তর্ক দুজনে তখন ;—
রাজা বলে, কহ মন্ত্রী করিয়া বিচার,
তোমারে কি মোরে দ্বিজ কৈল নমস্কার ?
মন্ত্রী বলে, মোরে দ্বিজ কৈল নমস্কার।
রাজা বলে, অসম্ভব কেন কহ আর ?
তুমি মন্ত্রী, আমি রাজা—তোমা হ'তে বড় ;
মোরে লক্ষ্য করি দ্বিজ নোয়াইল শির।
মন্ত্রী বলে, কেন কহ অসম্ভব বাণী ?
রাজা আর রামা আমি সমান যে গণি।
অন্তঃপুর সম এই রাজপুরী মাঝে
দিবা নিশি থাক তুমি আনন্দেতে মজে' ;
বাহিরের কোন্ লোক তোমারে বা জানে ?
আমি মন্ত্রী , আমারেই সর্বলোকে চেনে।
সর্বস্থানে যাতায়াত করি সর্বদাই,
মন্ত্রীজ্ঞানে দ্বিজ মোরে প্রণমিল তাই।
রাজা বলে, মিছা তর্কে কিবা আর কাম ?
জিজ্ঞাসহ দ্বিজে, কারে করিল প্রণাম।
"ঠাকুর, ঠাকুর," মন্ত্রী ডাকিল ব্রাহ্মণে ;
ব্রাহ্মণ ফিরিয়া এল তাহাদের স্থানে।
জিজ্ঞাসিল নৃপ তা'রে কহ দ্বিজবর,
মোদের মাঝারে কা'রে কৈলে নমস্কার ?
ব্রাহ্মণ বলিল শুনি, সে প্রশ্ন রাজার,
তোমাদের কা'রেও (ও) না কৈনু নমস্কার।
শঙ্খচিল যেতে ছিল আকাশে উড়িয়া,
প্রণাম করিনু তা'রে ভূমিষ্ট হইয়া।
জিজ্ঞাসিল নৃপ পুনঃ দ্বিজে সম্বোধিয়া,
শঙ্খচিলে প্রণমিলে কিসের লাগিয়া ?
দ্বিজ বলে, শঙ্খচিলে নমি লাভ যত,
এক জিহ্বা মোর আমি কহিব তা' কত ?
বাসুকি অশেষ মুখে অক্ষম বর্ণনে,
এক মুখে আমি তাহা বর্ণিব কেমনে ?
শঙ্খচিলে প্রণমিয়া যেবা লাভ হয়,
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন মহাশয়।

ধন-লাভ, রাজ্য-লাভ, রাজকন্যা আর,
পাবে যদি শঙ্খচিলে করে নমস্কার।
রাজা বলে, বটে বেটা এত বড় কথা?
যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা?
গরীব ব্রাহ্মণ বেটা, নিরন্ন হইয়া
বিবাহ করিতে চাহ আমার তনয়া?
এ দুষ্ট ব্রাহ্মণে মন্ত্রী কর বন্দী এবে,
দেখিব কেমনে ওর লাভ এত হবে।
কন্যার বিবাহ আজ হইবে নিশায়,
মোর কারাগারে রাখা উচিৎ যে নয়;
গণ্ডগোলে সেই কালে পালাবে নিশ্চয়,
অতএব রেখ এস তোমাব আলয়।
যে আজ্ঞা, বলিয়া মন্ত্রী ধরিযা ব্রাহ্মণে
লইয়া চলিল তবে আপন ভবনে।
পথে গিয়া গবচন্দ্র জিজ্ঞাসে ব্রাহ্মণে,
পরিচয় কিবা তব, বাস কোন স্থানে?
কিবা তব নাম?—মোরে কহ প্রকাশিযা,
জানিতে উৎসুক্ বড় হইতেছে হিযা।
দ্বিজ বলে, বন্দী-পরিচয়ে কিবা কাম?
জানিও জামাই-বেটা এবন্দীর নাম।
বাটী গিয়া গৃহিণীরে কহে মন্ত্রী ডেকে,
সতর্কে বাখিও এই জামাই বেটাকে।
দেখ যেন কোন মতে পলায়ে না যায,
একবার পলাইলে ধরা হবে দায়।
এত বলে মন্ত্রী চলে গেল রাজস্থানে.
দ্বারা-তত্ত্ব অবধানে রাখিয়া ব্রাহ্মণে।
সচিব-প্রেয়সী তবে ভাবে মনে মনে,
বহু দিন পবে এল জামাতা এখানে।
এক নয়, দুই নয়,—পঞ্চবর্ষ পবে.
কবিলেন পদার্পণ জামাতা এঘবে।
পরম আদরে মন্ত্রীপ্রিয়া জামাতাকে
চর্ব্য. চোষ্য, লেহ্য, পেয় খাওযাইল সুখে।
জামাতা ও বিষ্ণু এতে নাহি কোন ভেদ,
লিখিয়াছে সর্বশাস্ত্রে—স্মৃতি আর বেদ।
আহারান্তে সুখশয্যা করিলা গৃহিণী,
শয়ন করিল মহা সুখে দ্বিজমণি।
হেন কালে মন্ত্রীকন্যা এলেন তথায়,
এইবার আরম্ভিল মান-অভিনয়;—
চবণে এতই আমি করেছি কি দোষ,

কেন মোর প্রতি এত করিয়াছ রোষ ?
না হেরিয়া চন্দ্রানন পাঁচটি বছর,
কত কষ্টে কাটাইনু কহিতে বিস্তর।
ছল করি দ্বিজ তবে কহিল তাহারে,—
সত্য অপরাধী আমি, ক্ষমা কর মোরে ;
চন্দ্রমুখ দেখিবারে কার ইচ্ছা নয় ?
আঁধারে করিতে বাস কার ইচ্ছা হয় ?
এত দিন আসিনু না যে কারণে প্রিয়ে,
কহিতে অনেক তাহা, কহিব সময়ে।
রাজকন্যা বিবাহ হইবে আজ নিশি,
নিমন্ত্রণ আছে মোর সেথায় প্রেয়সি !
অতএব শীঘ্র করি যেতে হবে সেথায়,
বিলম্বিলে রাজা মনে পাইবেন ব্যথা।
অতএব ক্ষণকাল তবে মোরে প্রাণ,
বিদায় দেও হে, সেথা করিব প্রয়াণ !
এত বলি দ্বিজ যদি উঠি দাঁড়াইল,
তবে মন্ত্রীকন্যা দ্বিজে এমৎ কহিল ;—
নিতান্তই সেথা যদি যাবে প্রাণেশ্বব !
এ মলিন বেশ-ভূষা কর পরিহার।
আমার পিতার আছে উত্তম ভূষণ,
তাহা পরি' রাজবাটী কবহে গমন।
এত বলি মন্ত্রীকন্যা ভূষণ আনিল,
মহোল্লাসে দ্বিজরাজ সে বস্ত্র পরিল ;
চুলগুলি রুক্ষ রুক্ষ, মন্ত্রীকন্যা বলে,
বিনাইযা দিব আমি কিছু বিলম্বিলে।
শীঘ্র গিয়া মন্ত্রীকন্যা চিরুণি আনিল,
সুচারু কবিয়া তাঁর কেশ বিনোদিল।
কি দিয়া রুক্ষতা নাশে, ভাবে মনে মনে,
হেনকালে "কুন্তলীন" পড়ে তাঁর মনে।
কুন্তলীন ও পুষ্পসাব দেলখোস্ আনি'
প্রাণেশের সর্বশিরে মাখিল রমণী।
সুবাসে মাতিল প্রাণ, আনন্দে বিভল,
কহে দ্বিজ,—ওকি তৈল শিরে দিলে বল ?
এমন সুগন্ধি দ্রব্য মর্তে নাকি থাকে !
পারিজাত-আতর কি দিলে শিরে মেখে ?
মন্ত্রীকন্যা বলে সত্য পারিজাত প্রায়,
ইহার সুবাসে যেন হৃদয় মাতায়।
চুলের রুক্ষতা নাশে, জন্মায় স্নিগ্ধতা,
নাশে শির-রোগ, কেশ অকাল পক্কতা ;

ইহার গুণের কথা কহিতে বিস্তর,
কহিব অনেক গুণ সময় অন্তর ;
"কুন্তলীন" "দেলখোস" ইহাদিকে বলে,
সুবাসে ও গুণে পরাজয়ে সর্ব তৈলে।
এরূপে সুবেশে দ্বিজ হইয়া ভূষিত
রাজবাটী অভিমুখে চলিল ত্বরিত।
রাজবাটী মন্ত্রীবাটী মধ্যে অবস্থিত,
প্রকাণ্ড প্রান্তর এক দিগন্ত বিস্তৃত ;
মধ্যে মধ্যে দুই এক প্রকাণ্ড অটবী,
কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বিটপী ;
লতাগুল্ম আচ্ছাদিয়া আছে সে সকলে
ভাবিতে ভাবিতে দ্বিজ রাজবাটী চলে ;
হেন কালে দেখে, বর রাজকন্যা আশে
শিবিকায় আরোহিয়া যায় মহোল্লাসে।
গাত্র হরিদ্রায় বহু খেয়ে নিমন্ত্রণ,
আমাশায় জন্মেছিল বরের তখন।
বাহকদিগকে বর কহিল ডাকিয়া,—
আরবার এই স্থানে দেহ নামাইয়া।
বৃক্ষাড়ালে কিছু দূরে ছুটে সে তখন
মলত্যাগ করিবারে করিল গমন।
বাহকেরা কিছু দূরে সরিয়া বসিল,
এইকালে দ্বিজবর মনে কি ভাবিল ;—
ত্বরিত শিবিকামাঝে বৈসে স্থির হয়ে,
আদেশে শিবিকা শীঘ্র নিতে রাজালয়ে ;
যেমনি শিবিকা হ'ল নীত অন্তঃপুরে,
মুকুট পরিল দ্বিজ শীঘ্র শিরোপরে ;
মুকুটে আচ্ছন্ন শির, কেবা কারে চেনে
বসিল তখন দ্বিজ বিবাহ আসনে।
হবচন্দ্র সম্প্রদান করিল তনয়া,
দ্বিজকেই মনোনীত জামাতা ভাবিয়া।
এদিকে বরের কথা বরযাত্রীগণ
কিছুই না অবগত ছিলেন তখন ;
বহির্বাটী বসি' সবে, আনন্দে মগন,
দাবা আর পাশা দিয়া খেলিছে তখন ;
হেনকালে উপস্থিত বরকে সেথায়
নেহারি' পরাণ গেল উড়িয়া কোথায় !
যখন সকল তা'রা করিল শ্রবণ
ভয়েতে না সরে বাণী, কাঁপিছে সকল !
ওই ভাবে দাবা পাশা রইল পড়িয়া,

পরাণ লইয়া সবে যায় পলাইয়া।
অনতি-বিলম্বে রাজা শুনিল সকল,
হবচন্দ্র হ'য়ে গেল হ-য-ব-র-ল!
কেন পলাইল তা'রা না পায় ভাবিয়া,
জামাতা নিকটে রাজা জিজ্ঞাসে আসিয়া।
হেনকালে দ্বিজরাজ মুকুট খুলিল,
দেখি, হবচন্দ্র রাজা অবাক্ হইল!
কি কৌশলে রাজকন্যা লভিল ব্রাহ্মণ,
বুঝাইয়া হবচন্দ্রে বলিল তখন।
ব্রাহ্মণের বুদ্ধি শুনি' রাজা তুষ্ট হ'ল,
তখনি উদেশ্যে শম্ভুচিলে প্রণমিল।
রাজ্যের অর্দ্ধেক দিল ব্রাহ্মণে তখন,
জামাতাকে সাধু সাধু কৈল সর্বজন।

হরকুমারী সেন।

ছেলে-ভুলান ছড়া

"ছেলে-ভুলান ছড়ার" জন্য--

(১) শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী—১০৲
শ্রীযুক্ত পুলিনবিহাবী গঙ্গোপাধ্যায়ের বাসা,
মাদারীপুর, ফরিদপুর।

(২) শ্রীমতী মৃণালিনী দাসী—৫৲
শ্রীযুক্ত মেঘনাথ রাযের বাটী,
গোহালডাঙ্গা, মেদিনীপুর।

(৩) শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী দেবী—৫৲
শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাটী,
ইনাতপুর, যশোহর।

(৪) শ্রীমতী শান্তমণি দেবী—৫৲
উকিল মাখমলাল সিংহের বাটী,
২নং, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন, হাওড়া।

(৫) শ্রীবিন্দুবাসিনী সরকার—৫৲
· চাক্‌লাদারের বাসা,
নসীরাবাদ, ময়মনসিংহ।
—"কুন্তলীন পুরস্কার" পাইয়াছেন।

ইহাদের প্রেরিত ছড়া সমুদায়ের মধ্য হইতে নিম্নলিখিত ছড়াগুলি নির্বাচিত হইল।

১। আয চাঁদ আলো করে। দীঘির জল কালো ক'রে।
মাছ ধরলে মুড়ো দেব। ধান ভান্‌লে কুঁড়ো দেব॥

গাই বিয়লে বাছুর দেব। দুধ খাবার বাটী দেব॥
সোণার থালে ভাত দেব। চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা॥

২। ধন ধন ধন।
বাড়ীতে নটের বন।
এ ধন যার ঘরে নাই,
তার বৃথাই জীবন॥
তারা কিসের গরব করে?
তারা উনুনে মরুক পুড়ে॥

৩। আমার পুঁটু যদিরে কাঁদে।
আমি ঝাঁপ দিবরে বাঁধে॥
পুঁটু যদি হাসে।
উঠ্‌ব হেসে হেসে॥
পুঁটু না কি রে কেঁদেছে।
ভিজে কাটে রেঁধেছে॥
কাল যাবরে গঞ্জের হাট।
কিনে আন্‌ব শুকনো কাট॥

৪। চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
কদম তলায় কে?
আমি তোদের কেষ্ট ঠাকুর
ঘোমটা তুলে দে।

৫। ধূলায় ধূসর নন্দকিশোর
কে দিল ধূলা গায়?
আমি ধূলা ঝেড়ে কোলে করি
আয়রে যাদু আয়।

৬। সোণার নূপুর পায়, খুকু নেচে যায়,
হাতে নিয়ে সব্‌ড়ী কলা চুষে চুষে খায়।
খুকু ফিরে ফিরে চায়।
আর নাচে ধায় ধায়।

৭। ও দাদা ভাই কেম্‌নে যাবে।
হাজার টাকা মাইনে পাবে॥
তুলসী দানা গলায় দেবে।
চন্দ্রকলা বৌ আন্‌বে॥

৮। খোকা কান্ত বড় শান্ত মাছ ধরিল টেপা।
খোকার বৌ ডাক্‌তেছে ভাত খাও সে বাবা॥
খোকা লাল মাছ ধর্‌বে, ধরে এলো ইচের গুড়।
খোকার বৌ ডাক্‌তেছে ভাত খাও সে খুড়॥
খোকা গেল মালী বাড়ী নিয়ে এলো হাবই।
খোকার বৌ ডাক্‌ছে ভাত খাও সে তাওই॥
খোকা গেল কুমার বাড়ী নিয়ে এলো ভ্যাটা।

খোকার বৌ ডাক্‌ছে ভাত খাও সে জ্যাটা ॥
আমার খোকা কই ? খাটে শুয়ে অই।
গাছ পাকা সব্‌রী কলা, গামছা বাঁধা দই ॥

৯। আয় আয় চাঁদা মামা টীপ দিয়ে যা।
চাঁদের কপালে চাঁদ টীপ দিয়ে যা ॥
মাছ কুটিলে মুড় দেব, ধান কুটিলে কুঁড় দেব,
কালো গাইর দুধ দেব, দুধ খাবার বাটী দেব।
আমার খোকার কপালে চাঁদ টীপ দিয়ে যা ॥

১০। মাসী পিসি বন কাপাসী
বনের মধ্যে টিয়ে,
মাসী গিয়েছেন বৃন্দাবন,
দেখে আসি গিয়ে।
কিসের মাসী, কিসের পিসি,
কিসের বৃন্দাবন।
ঘরে গিয়ে দেখি আমি,
মা বড় ধন।
মাকে দিব সরু শাখা
বাপকে নীলে ঘোড়া—
আপনি যাব মোট, নিয়ে আস্‌ব কোট,
দিব ভায়ের বিয়ে।
পান খাব, পিক্ ফেলাব,
নাচ্‌ব থিয়ে থিয়ে।

১১। খোকামণি বঁড়শী বায় ক্ষীর নদীর কূলে।
কোলা ব্যাঙ্গে ছিপ নিল মাছ নিল চিলে ॥
খোকা বলে পাখীটি কোন বিলে চরে।
খোকা বলে ডাক দিলে উড়ে এসে পড়ে ॥

১২। আয় চাঁদ লড়িয়া, হাতী ঘোড়া চড়িয়া,
ভাত দিব থালা করে,
জল দিব ঝারী ভরে।
খুকুর মার দুধ দিব। খুকুর সঙ্গে ঘুম দিব,
খুকুর ভালে টুকু দিব।

১৩। অনুপমা দুধের সর।
কেম্‌নে কর্‌বে পরের ঘর ॥
পরে ধ'রে মারিবে।
কানাচে বসে কাঁদিবে।
ছিনে জোঁকে ধরিবে।
লাফাইয়া মরিবে।
বাপ বল্‌বে আয় আয়,
মা বল্‌বে থাক।

বৌ বল্‌বে দূর করে দাও
শ্বশুরবাড়ী যাক্ ॥
১৪। ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি চামে পোকা মজুমদার
ধেয়ে এলো দামোদর।
দামোদর ছুতোরের পো। শিমূলগাছে বেঁধে থো।
শিমূল গাছে কড়কড়ানি, জগন্নাথের হাঁড়িকুঁড়ি,
দুয়ারে বসে চাল কাঁড়ি। চাল কাঁড়িতে
হলো বেলা, ভাত খাও এসে বোনাই শালা।
ভাতে পড়লো মাছি ; কোদাল দিয়ে চাঁছি ॥
১৫। আজ দুর্গার অধিবাস কাল দুর্গার বিয়ে।
দুর্গা যাবেন শ্বশুরবাড়ী বকুলতলা দিয়ে ॥
বকুল ফুল কুড়তে কুড়তে পেয়ে গেলুম মালা।
রাম বরাবর বাদ্য বাজে সীতারামের খেলা ॥
নাচে রে ভাই সীতারাম কাঁকাল বাঁকাযে।
আলো চাল ভাজা দিব টেপর ভরিয়ে ॥
আলো চাল ভাজা খেতে গলা হলো কাঠ।
হেথা কোথা জল পাব ত্রিপুণির মাঠ।
ত্রিপুণির মাঠে রে ভাই বালী ঝুব্ ঝুর্ করে।
চাঁদমুখেতে রোদ লেগেছে ডালিম ফেটে পড়ে ॥
১৬। ঘুম যাচ্চে ঘুম যাচ্চে গাছের পাতরা।
ষষ্ঠীতলায় ঘুম যাচ্চে মহাভারতের ঘোড়া ॥
রাস্তা যুড়ে ঘুম যাচ্চে খেঁকী কুকুর।
গোয়াল ঘরে ঘুম যাচ্চে লালকি বাছুর।
বড় ঘরে ঘুম যাচ্চে খোকা ঠাকুর ॥
১৭। আয় চাঁদ হেসে হেসে।
ভাত দিব ভালবেসে।
খোকার কপালে বসে সুখে কর খেলা ॥
খোকা আমার ঘুম যায়, মুখ তুলে নাহি চায়,
এই ভাবে পড়ে রবে তিন প্রহর বেলা ॥
১৮। আগড়ুম বাগড়ুম ঘোড়াড়ুম সাজে।
ডান মৃগেল ঘাগর বাজে ॥
বাজতে বাজতে গেল ঢুলী।
ঢুলী গেল সেই কমলা ফুলী।
কমলা ফুলী টে টা, সৃজ্জি মামার বেটা।
আয় বুড়ী হাটে যাই, পান সুপারী কিনে খাই ॥
একটি পান ফোঁকড়া, মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া ॥
শালার বেটা সেকরা, ধরে এনে খেংরা,
মাগুর মাছের ঝোল, সরস্বতীর দোল ॥
১৯। ডালিম গাছে পিরভু নাচে।

দুই ধারেতে বাদ্য বাজে ॥
আই গো আই চিন্তে পার।
গোটা দুই অন্ন বাড় ॥
অন্নপূর্ণা দুধের সর।
কাল যাব মা পরের ঘর ॥
পরের বেটা মারলে চড়।
কাঁদতে কাঁদতে খুড়োর ঘর ॥
খুড়ো দিলে বুড়ো বর।
ও খুড়ো তুই পুড়ে মর ॥
খুড়ো তোমাব পায়ে পড়ি।
রেখে এস বাপের বাড়ী ॥
বাপ দিল সরু শাঁখা
মায়ে দিল শাড়ী।
ভাই দিল হুড়কোর বাড়ী
চল শ্বশুববাড়ী ॥

২০। ওপারে দুটো শিয়াল চন্দন মেখেছে।
কে দেখেছে কে দেখেছে, দাদা দেখেছে ॥
দাদার হাতের লাল ধনুক খান ফেলে মেরেছে।
দুই দিকে দুই কাতলা মাছ ভেসে উঠেছে ॥
একটা নিলেন গুরু ঠাকুর, একটা নিলেন টীয়ে,
টীযের মার বিযে, লাল গামছা দিয়ে ॥
চল দেখে আসি গিয়ে ॥

২১। আয় বে আয় টিয়ে,
নায়ে ভরা দিয়ে।
না নিল বোয়াল মাছে।
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে।
ওরে ভোঁদড় ফিবে চা।
খোকার নাচন দেখে যা ॥

২২। ঘুঘু লো সই, দাখানা কই ?
দা দিয়ে কি করবি ?
পাত কাটবো।
পাত দিয়ে কি করবি ?
বৌ ভাত খাবে।
বৌ কই ? জলে গেছে।
জল কই ? শুকিয়ে গেছে।
কাদা মাটী কই ? ধোপা নিয়েছে
ধোপা কই ? কাপড কাচে।
কাপড় কই ? রাজা পরেছে।
তিনটা আনলে ভাঁটা ;

ঘুঘু লো ঘুঘু হাঁড়ী পাতিল সরা,
তাল গাছ পড়ে—দুম্।

২৩। এক শিয়ালে রাঁধে বাড়ে এক শিয়ালে খায়।
আর শিয়ালে না পেয়ে বাপের বাড়ী যায়॥
বাপ দেয় ধান দুর্বা, মা দেয় ফুল।
কাঞ্চনেরে বিয়ে দেছে ক্ষীর নদীর কূল॥

২৪। আলুপাতা থালু থালু ভেন্নাপাতার দৈ।
সকল জামাই বোস্‌ল খেতে গোদা জামাই কৈ?
গোদা গেছে মাছ ধর্‌তে আনলে দুটা বাটা।
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া করে গোদায় মাল্লে ঝাঁটা।
মাল্লি মাল্লি ঝাঁটার বাড়ি!
তেল দে চান করি,
ভাত দে খাই।
পাটীটা বিছায়ে দে
গোদেরে নাচাই॥

২৫। ঘুম যাওরে খোকাবাবু
সোনার যাদুমণি।
আস্‌বে ঘুম মণির চোখে,
কত ভাল বাসবো তোকে;
হীরের বালা মুক্তমালা,
কোর্‌বো কত দান।
বাটী ভরে দুধ খাওয়াব,
বাটা ভরে পান!

২৬। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান।
শিব ঠাকুরের বিয়ে হলো তিন কন্যে দান।
একটি কন্যা বাঁধে বাড়ে, একটি কন্যা খায়,
একটি কন্যা রাগ করে বাপের বাড়ী যায়।
মায়ে দেয় তেল সিঁদূর, মাসী দেয ফুল.
এমন খোঁপা বেঁধে দিব হাজার টাকা মূল॥

২৭। আদুরের কলাগুলি বাদুড়ে খায়।
এমন সময় খোকামণি মামার বাড়ী যায়॥
মামার বাড়ী যেয়ে খোকা ব্যাভার পেলে কি।
সোনার মাদুলি আর রূপার কিঙ্কি॥
তা হারায়ে খোকা লড় দিয়ে যায় ঘরে।
মাসীরা তুলে নিলেন কোলেতে করে॥
মামারা উঠে বলেন, সাদা না কালো।
মাসীরা ডেকে বলেন আঁধার ঘরের আলো॥

২৮। দুধের বাটি তপ্ত।
খোকা হলো ক্ষিপ্ত॥

কে রে কে রে কে রে ?
তপ্ত দুধে চিনির পানা,
মণ্ডা ফেলে দে রে ॥

২৯। ধন ধন ধন ধনিয়ে,
কাপড় দিব বুনিয়ে,
তাতে দিব গো নীলের ডোরা,
ধন যাবে গো কস্‌মি পাড়া,
তারা দিবে গো পাটের থোপ,
ফেটে মর্‌বে পাড়ার লোক।

৩০। বাপ নয় গো শ্বশুর,
দুয়ারে উঠে বসুক।
বাপধন শ্বশুরের নাতি,
এনে দেব মস্ত হাতী।

৩১। ধেই ধেই ধেই ধেই।
আমার খোকা নাচে ধেই।
ধিন্‌তা ধিন্‌তা ধিন্‌তা,
তিন্‌তা তিন্‌তা তিন্‌তা,
আয়রে ভোলা আয়,
আমার খোকার নাচন দেখে যা।

৩২। একখানি কঞ্চে দুখানি কঞ্চে
কঞ্চে বড় পাকা।
অন্নদা যাবেন শ্বশুর বাড়ী,
রাখ্‌তে যাবেন কাকা ॥
আগে যায় গো ভার বাউটি
পেছু যায় গো ডুলি।
দাঁড়াওরে কাহের সকল
মায়ে বোধ করি ॥
মা বড় নির্বোধ
কেঁদে কেটে মরে।
নিজে না ভাবিয়া দেখে
কার ঘর করে ॥

৩৩। ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল,
বরগি এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েচে,
খাজনা দিব কিসে ?

৩৪। আয়গো আয় বুড়ী মাসী
গোপাল আমার কেঁদেচে।
ঘোমটা থেকে বউ আমাদের
লুকিয়ে চিম্‌টি কেটেচে ॥

বউ বলে তোমার গোপাল
ঠাকুরপো যে হয়।
আমার উপর দোষ দিয়ে
কেন কথা কও ॥
বউ-এর হাসি দেখে বাছা
হাসিল বারেক।
বুড়ী মাসীর কোলে গিয়ে
নৃত্য করে দ্যাখ্ ॥

৩৫। ধিনতা নাচন মধুর বচন, তোমরা বল কি ?
মনের আনন্দে মোরা, খোকন নাচাচ্ছি।
নাচিতে নাচিতে খোকার, গা হ'ল আগুন,
খোকার শাশুড়ী তত্ত্ব দিল, গোটা দুই বেগুন ?
আর নেচনা যাদুমণি, চরণ হ'ল ভারি,
ঘাম দিল চাঁদমুখে ; খোকার কাছে হারি।

৩৬। ওরে আমার দাঁত্ মানিক,
মধুর হাসি হাস না।
ঐ হাসিরে ছড়ায় প্রাণে,
কত রঙ্গ তা জান না ॥
তোমার হাসি দেখেরে চাঁদ,
আকাশের চাঁদ হাসে।
আমি হাসি আর জগৎ হাসে,
হাসিব বাজার বসে ॥

৩৭। আমার খোকাবাবু, সাহেব হবে,
পরাই পেণ্টুলেন।
আব বুক কাটা কোট পরায়ে দিয়ে
দিব ঘড়ী চেন ॥
আলবার্টের তেড়ী কাটি'
পরাব সুন্দর হ্যাট্।
পায়ে পরাব মোজা বুট,
চ'লে যাবে ঘ্যাট্ ঘ্যাট ॥
ইংরাজীর বুকুনি দিয়ে,
চাইবে ওয়াইন ব্রেড্।
তোষামুদেরা ঘুস দিবে,
কত কেতা হান্‌ড্রেড্ ॥

৩৮। খোকন খোকন ডাক পাড়ি—
খোকন গিয়েছে কোন খানে ?
হল্‌দি বাড়ীর মাঠপানে।
সেখানে খোকন কি করে ?
লাফ্ দিয়ে দিয়ে ফুল পাড়ে।

কাজ নাই খোকনের ফুল তোলা
বাড়ী এসে খাওরে যাদু দুধ কলা।

৩৯। ধান ভানি ধান ভানি মচ্ছির গুঁড়া দিয়ে,
ঐ আসছে খোকার শ্বশুর দুখান কুলো নিয়ে।
একখান কুলো মাঠে, একখানা কুলো ঘাটে,
বাঁশ মড় মড় করে।
সোনার টোপর ভেঙ্গে গেলে কে গড়িতে
পারে? খোকার ভাই বলরাম
সেই গড়িতে পারে।

৪০। খোকন মণির বিয়ে হবে হট্টমালার দেশে,
তারা গাই বলদে চষে—
রুইমাছ পালঙ্গের শাক
ভারে ভারে আসে,
তা' দেখে খোকনের শাশুড়ী—
পেছন ফিরে বসে।

৪১। আমার খোকন যাবে শ্বশুরবাড়ী,
আয়না বসা খড়খড়ি,
বাঁধা হুকা সোণার কারি,
নাপিত যাবে ভাণ্ডারী—
আঁব কাঁঠালের বাগান দেব,
ছাওয়ায় ছাওয়ায় যেতে,
"কুন্তলীন" "দেল্‌খোস" দেব,
শাশুড়ী ভুলাতে—
তবু খোকনের মন উঠে না,
শ্বশুরবাড়ী যেতে।

৪২। এসরে আমার লক্ষ্মী ছেলে
ধূলায় কেন পড়ি'।
কেউ কি কিছু বলেছেরে
দিচ্চ গড়াগড়ি॥
দুধে ভাতে খাবে চলরে
চল আমার সোণা।
যা চাইবে তাই পাবে ধন
কেঁদ না কেঁদ না॥

৪৩। আয়রে চাঁদের কোণা।
তোরে খেতে দিব ফুলের মধু
পরতে দিব নীল সাড়ী,
আর, মুরলী বাঁধায়ে দিব
যত লাগে সোনা।
আয়রে চাঁদের কোনা।

৪৪। আয়রে পাখী আয়,
আমার যাদু ঘুমায়।
আয়রে পাখী হুমো,
আমার যাদুকে নিয়ে ঘুমো।
আয়বে পাখী লেজ ঝোলা
তোরে খেতে দেব চাল ছোলা।
খাবি দাবি কল্‌কলাবি,
যাদুকে নিয়ে ঘুম পাড়াবি।

৪৫। ওরে আমার যাদু!
সেক্‌রা ডেকে মোহর কেটে,
গড়িয়ে দেব বাজু।
ওরে আমার সোণা!
সোণাকে গড়িয়ে দেব
মোহর কেটে দানা।

৪৬। পুঁটু আমাব কেঁদেছে,
কত মুক্তা পড়েছে।
যখন পুঁটু হয় নাই,
ভিখারী ভিক্ নেয় নাই।
ভাগ্যে পুঁটু হয়েছে,
ভিখারী ভিক্ নিয়েছে।

৪৭। গোপাল গোপাল গোপাল,
কাঙ্গালিনীর দুলাল।
তুমি আমার যোগীর কোশাকুশী,
তুমি আমার শ্যামের হাতের বাঁশী।
তুমি বর্ষা কালের ছাতি,
তুমি আঁধার ঘরের বাতি।

চতুর্থ বৎসর

অদ্ভুত-হত্যা

কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধানের নিমিত্ত আমাকে ময়মনসিংহ অঞ্চলে যাইতে হইয়াছিল। প্রায় সপ্তাহ কাল তথায় থাকিয়া সে মোকদ্দমার যথাসম্ভব প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া গোয়ালন্দ-ট্রেনে রাত্রে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করি। পরদিন প্রাতঃকালে কাগজপত্র গুছাইয়া রিপোর্টাদি লিখিয়া নিজের কোন প্রয়োজনবশতঃ জনৈক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে একজন কনেষ্টবল যথারীতি লম্বা সেলাম ঠুকিয়া, একখানা সরকারী চিঠি আমার হস্তে প্রদান করিল। চিঠির উপরে লাল কালিতে বড় বড় ইংরেজী অক্ষরে লিখিত "অতি দরকারী"—এ

দুটি কথা সর্বপ্রথমে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কনেষ্টবলকে বিশ্রাম ঘর দেখাইয়া দিয়া ত্রস্ত হস্তে চিঠি খুলিয়া পত্র পড়িতে লাগিলাম। পত্রে প্রধান কর্মচারী যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সার মর্ম এই ;—

"আজ চারি দিবস গত হইল, মির্জাপুর ষ্ট্রীটের একটি ছাত্রাবাসে মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটি ছাত্র অতি আশ্চর্যরূপে হত হইয়াছে। পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও এ পর্যন্ত খুনের কিনারা করিতে পারে নাই। তুমি মুহূর্তমাত্র গৌণ না করিয়া উক্ত হত্যা-ব্যাপারের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে। মুচিপাড়া থানার পুলিশ-কর্মচারী হত্যা-ব্যাপারের প্রথম অনুসন্ধান করিয়াছে।"

পত্রখানি পাঠ করিয়া আমার বন্ধুদর্শনবাসনা পলকে বিলুপ্ত হইল। সেই কৃত্রিম মুদ্রার জটিল মোকদ্দমার গুরুভার হইতে মুক্ত হইতে না হইতে আবার এক হত্যাকাণ্ডের গুরুতর ভার মস্তকে বহন করিতে হইবে ভাবিয়া মন অবসন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু উর্ধ্বতন কর্মচারীর আদেশ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমাকে প্রতিপালন করিতে হইবে, সুতরাং আর ইতস্ততঃ না করিয়া কনেষ্টবলকে বিদায় দিয়া গাড়োয়ানকে গাড়ী প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলাম এবং কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে অবিলম্বে মুচিপাড়া থানায় উপস্থিত হইলাম। সেখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে বড় সাহেবের লিখিত পত্রের মর্ম জ্ঞাত করাইলে তিনি আমাকে উক্ত হত্যা-ব্যাপারের প্রধান অনুসন্ধানকারী কর্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। অনুসন্ধানকারী কর্মচারীর নাম সুশীলবাবু ; সুশীলবাবু আমার পূর্বপরিচিত। ইনি আমাকে হত্যা সম্বন্ধে নিজ তদন্তে যতদূর তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা একে একে সন্তুষ্টির সহিত সমস্ত বর্ণনা করিলেন। হত্যাসংক্রান্ত আমূল বিবরণ শুনিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম, এ ব্যাপারের কিনারা করা বড় সহজসাধ্য নহে। পুলিশানুসন্ধানে এ সম্বন্ধে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল—

"মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী বিক্রমপুর অঞ্চলের বজ্রযোগিনী গ্রামে। ইহার পিতার নাম হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। মহেশ কলিকাতা সিটি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। মির্জাপুরের এক স্টুডেন্ট মেসে ইঁহার বাসা ছিল। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার বন্ধে সেই মেসের অধিকাংশ ছাত্রই বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল, কেবল তিনজন বি, এ, পরীক্ষার্থীর সহিত মহেশচন্দ্র বন্ধের সময়ও সেই মেসেই ছিলেন। মেসের দালানটি দ্বিতল ; উপরে চারিটি ঘর, নীচে দুটি। মেসে অধিক ছাত্র না থাকায়, পড়াশুনার সুবিধার নিমিত্ত চারিটি ঘরে চারিজন ছাত্র শুইবার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। নীচের একটি ঘরে রান্না ; এবং অপরটিতে খাওয়া দাওয়ার কার্য সম্পন্ন হইত। মেসে এক্ষণে একটিমাত্র ব্রাহ্মণ দ্বারাই সর্ব কার্য চালিত হয়। ব্রাহ্মণটি রাত্রে মেসে থাকে না। ২৬শে আশ্বিন রাত্রিতে, মহেশচন্দ্রকে অন্যান্য রাত্রির ন্যায় সকলে সুস্থ শরীরে আপন ঘরে পড়িতে দেখিয়াছেন। পর দিবস প্রত্যূষে অতুলবাবু নামে ঐ মেসেরই অন্যতম ছাত্র যখন মহেশচন্দ্রের ঘরের মধ্য দিয়া নিম্নতলে যাইতেছিলেন, তখন তাহাকে ছিন্ন কণ্ঠ, রক্তাক্ত কলেবর দেখিতে পাইয়া উচ্চ চীৎকারে সকলকে সেখানে একত্র করেন। পরে তথায় উপস্থিত সকলের পরামর্শ মত অগৌণে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া সে ঘরে একখানা রক্ত-রঞ্জিত বড় কাটারি ও এক পাটি নাগরা জুতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এগুলি ইতিপূর্বে মেসের কেহ কখন দেখে নাই। হত্যাকারীর এ পর্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আশ্চর্যের বিষয়, হত্যাগৃহের একটি সামান্য জিনিস কিম্বা একটি কপর্দকও স্থানান্তর হয় নাই। মহেশের চাবি তাহার পকেটে পাওয়া গিয়াছে ; উক্ত চাবি দ্বারা পুলিশ মহেশের পোর্টমেণ্ট ও হাত বাক্স খুলিয়া টাকা পয়সা মহেশের লিখিত

হিসাবের মিল মতনই পাইয়াছেন।

"মহেশের সহিত যে সে মেসে কাহারও মনোমালিন্য বা বিবাদ ছিল, এমনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনটি ছাত্র ও ব্রাহ্মণের 'জবানবন্দী'তে হত্যার অনুসন্ধানে কার্যকরী হইতে পারে, এরূপ কোন কথাই প্রকাশ পায় না। ইহাদের কেহ কাহাকে মহেশের হত্যাকারী সন্দেহ করেন না। পরন্তু মহেশের সহিত সকলেরই সদ্ভাব ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।"

পুলিশের এই রিপোর্ট দেখিয়া এবং ব্রাহ্মণ ছাত্রত্রয়ের জবানবন্দী আনুপূর্বিক মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া অনুসন্ধানের কোন সূত্রই বাহির করিতে পারিলাম না। তবে জুতা ও কাটারিখানা দেখিতে হইল। সুশীলবাবু তৎক্ষণাৎ সেগুলি আমার সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। আমি তখন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলাম, রক্তাক্ত কাটারিখানা অপূর্বব্যবহৃত। জুতাখানিও একেবারে অব্যবহৃত বলিয়াই বোধ হইল। উহা পায়ে দেওয়ার কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হইল না। সুতরাং এগুলি অনুসন্ধানের পক্ষে কোন সহায়তা করিবে, এরূপ মনে করিতে পারিলাম না। আমি সেখানে আর বেশী সময় অপেক্ষা না করিয়া সেই মেসটি দেখিতে মনস্থ করিলাম এবং সুশীলবাবুর সহিত সেই মেসে যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

তখন পূজোপলক্ষে স্কুল কলেজাদি বন্ধ ছিল, সুতরাং সকলকেই বাসায় প্রাপ্ত হওয়া গেল। আমি প্রথমে হত্যাগৃহ এবং তৎপরে মেসের অন্যান্য স্থান যথারীতি পরীক্ষা করিলাম ; কিন্তু হত্যা সম্বন্ধে কোন নূতন তথ্যই সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলাম না। পরিশেষে আমি হত্যাগৃহে প্রথম উপস্থিত সেই অতুলবাবুকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিলাম, এবং উত্তর আমার নোট বহিতে লিখিয়া লইলাম।

আমি। আপনি সেদিন প্রাতে প্রথম সে কক্ষে পদার্পণ কবিয়াছিলেন, না, রাত্রে সে কক্ষের ভিতর দিয়া আর কোনবার নীচে নামিয়াছিলেন ?

অতুলবাবু। না, সেই প্রথম আমি সে কক্ষে প্রবেশ করি।

আমি। যে রাত্রে মহেশ খুন হয়, সে রাত্রে সর্বশেষ তাহাকে কে জীবিত দেখিয়াছিলেন ?

অ, বাবু। সর্বশেষ কে জীবিত দেখিয়াছিলাম, মনে নাই। আমরা সকলেই একসঙ্গে নীচের ঘর হইতে উপরে আসিয়া আপন আপন কক্ষে পড়িতে বসিয়াছিলাম।

আমি। আপনারা সেদিন শয়ন করিবার পূর্বে আর নীচে যান নাই ?

অ, বাবু। আমি সেদিন আর নীচে যাই নাই।

আমি তখন আর দুজনকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারা তদুত্তরে বলিলেন, সে রাত্রে তাঁহাদের কাহারও নীচে যাইবার প্রয়োজন হয় নাই। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম।— "আপনাদের মেসের ছাত্রগণ ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত মহেশবাবুব বিশেষ জানাশুনা ছিল বলিয়া আপনারা জানেন ?"

অ, বাবু। মহেশবাবুর বিশেষ বন্ধু ত কেহ দেখিতে পাই না।

আমি। মহেশবাবুর কাহারও সহিত শত্রুতা বা মনোবিবাদ ছিল, বলিতে পারেন ?

অ, বাবু। না, মহাশয়, তাঁহার সহিত কাহারও শত্রুতার কথা আমরা পরিজ্ঞাত নহি।

আমি। হত্যার দিনে মহেশবাবু সমস্ত দিবস কি মেসেই ছিলেন, না কোথাও বাহিরে গিয়াছিলেন।

অ, বাবু। (খানিক চিন্তার পর) হাঁ, মহেশ বাবু সেদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে বাহিরে গিয়াছিলেন।

আমি। কোথায় গিয়াছিলেন, বলিতে পারেন ?

অ, বাবু। না, তাহা বলিতে পারি না।

আমি। মহেশবাবুর কি বেড়াইবার অভ্যাস ছিল ?

অ, বাবু। মধ্যে মধ্যে বেড়াইতে যাইতেন বৈ কি !

আমি। হত্যার তারিখে কোন সময়ে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন ?

অ, বাবু। বোধ হয় রাত্রি ৭।।০, কি ৮টার সময়।

আমি। মহেশবাবুর স্বভাব চরিত্র কেমন ছিল, আপনার বিশ্বাস।

অ, বাবু। (একটু বিরক্তির সহিত) ওগুলি কি বলিব ?

আমি তখন অপেক্ষাকৃত গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলাম, "দেখুন, আপনারা সকলেই বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান। অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন, এ হত্যার কিনারা করা বড় সহজ সাধ্য নহে। কেহ অর্থলোভে এ নৃশংস কাণ্ড সম্পন্ন করিয়াছে, অবস্থাপর্যবেক্ষণে, এমন বিশ্বাস আমি করিতে পারিতেছি না। ঈর্ষামূলেই বোধ হয় এ লোমহর্ষণ হত্যা সংশাধিত হইয়াছে। এক্ষণে যদি আমি হত ব্যক্তির সম্বন্ধে সমস্ত কথা অবগত হইতে না পারি, তবে প্রকৃত দোষীর অনুসন্ধান কিরূপে করিতে সমর্থ হইব ? আর অবশ্য ইহাও আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন, যদি কোন প্রকারেই এ হত্যার কূলকিনারা করা না যায়, তবে পুলিশ শেষকালে আপনাদের লইয়াই টানাহিচ্‌ড়া করিতে পারে। কে জানে, আপনাদের কেহ এ ব্যাপার-বিজড়িত নহেন ? এ বাড়ীতে অপর কেহ বাস করে না, মহেশবাবুর সহিত অন্য কাহারও শত্রুতা ছিল না একথা আপনারাই বলিতেছেন ; এমতাবস্থায় কাহার উপর প্রথম সন্দেহদৃষ্টি পড়িতে পারে ; তাহা আপনারাই ভাবিয়া দেখুন। হত্যাগৃহে প্রাপ্ত কাটারিখানি সম্পূর্ণ নূতন, সুতরাং হত্যাকারী যে পুরাতন পাপী নহে, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে একপাটি নাগরা জুতা পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কে বলিতে পারে ইহা আপনাদের চালাকি নয় ?—"

আমি এতদূর বলিলে ছাত্র বাবুটি অপেক্ষাকৃত কাতরস্বরে বলিলেন, "ক্ষমা করুন মহাশয়, আমি যাহা জানি, বলিতেছি। আমার বিশ্বাস মহেশবাবু নিষ্কলঙ্ক চরিত্র দিলেন না।"

আমি। কাহার সঙ্গে, কোথায় মহেশবাবুর আসা যাওয়া ছিল, বলিতে পারেন ?

অ, বাবু। সে সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না। তবে তিনি মধ্যে মধ্যে অনেক রাত্রির পর বাসায় আসিতেন এবং মাঝে মাঝে একটি ঝি শ্রেণীর স্ত্রীলোক তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিত।

আমি। ঝির ঠিকানা আপনি জানেন ?

অ, বাবু। না, মহাশয়, ঠিকানা জানি না।

আমি। ঝিকে দেখিলে চিনিতে পারিবেন ?

অ, বাবু। হাঁ, পারিব বৈ কি ! হত্যার তারিখেও দিনের বেলায় ঝি তাঁহার নিকট আসিয়াছিল।

আমি। যে দিন হত্যার কথা জানিতে পান, সে দিন প্রথমে কে সদর দরজা খুলিয়াছিলেন ?

অ, বাবু। সম্ভবতঃ সদর দরজা খোলা ছিল।

আমি। সদর দরজার খিলান ত অভগ্ন ; তবে হত্যা কিরূপে সংঘটিত হইল, আপনাদের বিশ্বাস ?

অ, বাবু। সদর দরজা মধ্যে মধ্যে খোলাও থাকে। বোধ হয় সে রাত্রে আমরা কেহ দরজা ভেজাই নাই। বামনটি চলিয়া গেলে, কোন দিন দরজা ভেজান যায়, কোন দিন বা

যায় না।

আমি। বামনটি কেমন, কতদিন যাবৎ এখানে কাজ করিতেছে?

অ, বাবু। অনেক দিন। বামনটি খুব বিশ্বাসী, সে আমাদের বড় যত্ন করে।

আমি এ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়া সুশীলবাবুর সহিত মেস হইতে বহির্গত হইলাম। তখন বেলা ১টা বাজিয়া গিয়াছে। সুতরাং আর থানায় না যাইয়া, সুশীলবাবুকে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া, বরাবর বাসাভিমুখে অগ্রসর হইতে গাড়োয়ানকে আদেশ করিলাম।

২

আমি অনুসন্ধানের সূত্র উদ্ভাবনার্থ যতই চিন্তা করিতে লাগিলাম. প্রথমে ততই নিরাশা-সাগরে নিমগ্ন হইতে আরম্ভ করিলাম। আমি বুঝিয়া উঠিলাম না, এ হত্যা কাহার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। ধনাপহরণ মানসে কি এ হত্যা সংঘটিত হওয়া সম্ভব? তাহা হইলে একগাছি তৃণেরও বিপর্যয় ঘটিল না কেন? শুনিয়াছি, মহেশের চরিত্র ভাল ছিল না, তবে কি অপর কোন মন্দ চরিত্র প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বারা এ কার্য সম্পন্ন হইয়াছে? অসম্ভব কি? কিন্তু সে ব্যক্তির অনুসন্ধান কিরূপে করিব? মেসের কেহ ত কুচরিত্র নহে? সদর দরজার খিলান অভগ্ন; এমতাবস্থায় সহজে বাহিরের লোক কিরূপে ভিতরে প্রবেশ করিবে? কিন্তু যদি সদর দরজা সে রাত্রে খোলাই থাকিয়া থাকে, তবে এই এক কথার উপর নির্ভর করিয়া মেসস্থ ছাত্রদিগকে দোষী সাব্যস্ত করা ত যুক্তিযুক্ত নহে। আচ্ছা একটা লোক একই বাড়ীতে খুন হইল, আর বাড়ীর অপর কেহই ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিল না, ইহা বা কি প্রকারের কথা? হত্যাগৃহে একখানা নাগরা জুতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তবে কি হত্যাকারী কোন হিন্দুস্থানী? কিন্তু তাহা হইলে জুতাখানি একেবারে অব্যবহৃত থাকিবার কারণ কি? এ জুতা পায়ে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ত কিছুতেই বোধ হয় না।

মেসের ছাত্র হইতে জানিলাম, একটি ঝি মহেশের কাছে আসা যাওয়া করিত, হত্যার তারিখেও সে আসিয়াছিল; সে ঝি কে? তাহার সন্ধানের উপায় কি?—এবম্বিধ নানা প্রশ্ন ক্রমে ক্রমে মনে উদিত ও লয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। শেষে যখন আর ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলাম না; কোন্ সূত্রাবলম্বনে অনুসন্ধান কার্য আরম্ভ করিব, তাহার কিছুই নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইলাম না; তখন অগত্যা তখনকার মত এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে, আজ রজনীযোগে গুপ্তভাবে মির্জাপুরের সেই ছাত্রাবাসে ছাত্রদিগের কথাবার্তা শুনিতে চেষ্টা পাইব। যদি প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা হত্যা ব্যাপাবের সংশ্লিষ্ট থাকে কিম্বা এ সম্বন্ধে কিছু পরিজ্ঞাত থাকে, তবে খুব সম্ভবতঃ ইহাদিগের মধ্যে আজ এ বিষয়ের গোপনীয় কথাবার্তা চলিতে পারে। তখন বোধ হয়, হত্যা সম্বন্ধে কিছু না কিছু সন্ধান পাইতে পারিব।

এইরূপ স্থির করিয়া স্নানাহার সমাপনান্তে শয্যায় পড়িয়া একটু বিশ্রাম ভোগ করিতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ মনে পড়িল, এ হত্যাসম্বন্ধে ডাক্তারসাহেব কি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমি এ পর্যন্ত জানিতে পারি নাই। অনুসন্ধান আরম্ভ করিবার পূর্বে এ তথ্যটি জানিয়া লওয়া আমার পক্ষে একান্ত কর্তব্য;—এই মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্বক 'ধড়াচূড়া' পরিধান করিয়া পুনরায় মুচিপাড়া থানাভিমুখে রওয়ানা হইলাম।

যথাকালে মুচিপাড়া থানায় পঁহুছিয়া সরকারি ডাক্তারের রিপোর্ট পাঠে যাহা অবগত হইলাম, তাহাতে সন্দেহ আরও বর্ধিত হইল। ডাক্তার বলেন, মৃত্যুর পূর্বে হত ব্যক্তিকে

ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে হৃতচেতন করা হইয়াছিল। পরে অজ্ঞানাবস্থায় তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে ইহাকে হত্যা করা হইয়াছে। কি ভয়ানক কথা! জীবিতাবস্থায় হত্যা করিলে পাছে আহত ব্যক্তির আর্তনাদে অন্যান্য লোক জাগরিত হইয়া পড়ে, এজন্য পূর্বাহ্নে সাবধান হইয়া হত্যাকারী ইহার উপর বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল! হত্যাকারী তবে ত নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি নহে! মেসেরই কি কোন ছাত্র কি তাহা হইলে আন্তরিক বিদ্বেষবশে, গুপ্ত কারণে, অপর সকলের অজ্ঞাতে এরূপ সাবধানতা সহকারে হত্যাকাণ্ড সমাধা করিল? সন্দেহ ক্রমে দৃঢ় হইতে লাগিল। এ সময়ে একবার মহেশের মৃতদেহ দেখিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু সে সুবিধা ঘটিয়া উঠিল না। আমার কলিকাতা পহুঁছিবার বহু পূর্বেই, ডাক্তারের পরীক্ষার পর উক্ত মৃতদেহের সৎকার হইয়া গিয়াছিল।

নানা বিষয়িনী চিন্তার পর অবশেষে আমি প্রথম অনুসন্ধানকারী কর্মচারী সুশীলবাবুর সহিত পুনর্বার সাক্ষাৎ করিলাম। এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সুশীলবাবু, কি সূত্রে অনুসন্ধান কার্য আরম্ভ করিব?" সুশীলবাবু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "সূত্র বাহির করিবার জন্যই ত টিকটিকির প্রয়োজন।" সুশীলবাবু ডিটেক্‌টিভকে টিক্‌টিকি বলিতেন। আমি পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি সেদিন ঘর তল্লাসের সময় কাহারও কাছে ক্লোবোফর্ম আছে কি না, অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কি?" সুশীল বলিলেন, "না, আমরা ত তখন জানিতাম না যে হত ব্যক্তির উপর প্রথমে ক্লোরোফর্ম প্রযুক্ত হইয়াছিল।" আমি তখন হাসিয়া বলিলাম, "অনুসন্ধানের সকল সুযোগ আমি কলিকাতা আসিবার পূর্বেই শেষ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং এখন এ অদ্ভুত হত্যা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া কৃতকার্যতার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।" ইহার উত্তরে সুশীল বাবু বলিলেন, "ভাল মনে পড়িল;—সে দিন মহেশচন্দ্রের হাতবাক্স অনুসন্ধানের সময় ইহার ভিতরের কতকগুলি চিঠিপত্র আমি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলাম, অবকাশাভাবে সেগুলি এ পর্যন্ত পড়ি নাই। আপনার ইচ্ছা হইলে আপনি তাহা পড়িয়া দেখিতে পারেন, যদি কোন সূত্র বাহির হয়।" এই বলিয়া তিনি কতকগুলি বিশৃঙ্খল চিঠিপত্র আনিয়া আমার সম্মুখস্থ টেবিলে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। আমিও তখন আর কিছু করিবার নাই ভাবিয়া সেগুলি হইতে এক একখানি পত্র লইয়া আগ্রহ সহকারে আপন-মনে পড়িতে লাগিলাম। পাঁচ সাতখানি চিঠির পর একখানি চিঠি পাঠ করিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিলাম। চিঠিখানি অবিকল এইরূপ:—

"—নং হাড়কাটা গলি।
২৬শে আশ্বিন।

প্রাণের মহেশ,

তুমি আর আসিতেছ না কেন? বিধুবাবুর সহিত ঝগড়া করিয়া আমায় পরিত্যাগ করা কি তোমার উচিত? আজ যা হয়, একটা হইয়া যাইবে। বিধুবাবু বাড়াবাড়ি করিলে, তাহাকে আমার কাছে আসিতে বারণ করিব। আমার কুন্তলীন একেবারে ফুরাইয়া গিয়াছে। দেলখোস নামে নাকি এক প্রকার নূতন এসেন্স বাহির হইয়াছে, দেখিতে পাই কি? ঝিকে পাঠাইলাম, তুমি আজ অবশ্য অবশ্য আসিবে, অন্যথা না হয়। ইতি।

তোমারই ভালবাসার
নলি—।"

পত্রখানা দুইবার পড়িয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। পত্রের তারিখ দেখিয়া অস্থিরতা আরও বৃদ্ধি পাইল। এ পত্রে ঝির সন্ধান পাইলাম। বিধুবাবু নামে কোন ব্যক্তির

সহিত মহেশের মনোমালিন্য ছিল, পত্র পড়িয়া বুঝিতে পারিলাম। এক্ষণে যেন অনুসন্ধানের কিছু কিছু সূত্র বাহির হইল, মনে করিলাম। আমি আর বিলম্ব না করিয়া ধড়াচূড়া ছাড়িয়া একটি ফিট্ বাঙ্গালী বাবু সাজিলাম। তাহার পর চিঠিখানা পকেটে পূরিয়া, আমার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত গাড়োয়ানকে সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া পদব্রজে রাস্তায় বাহির হইলাম।

৩

হাড়কাটা গলির সেই বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। আমি একেবারে 'সপাসপ' উপরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তখন অপরাহ্ণ পাঁচটা—সন্ধ্যার প্রাক্কাল। গৃহকর্ত্রী বেশভূষা পরিপাটী করিতেছে। আমি চিরপরিচিতের ন্যায় একখানা কেদারা টানিয়া বসিয়া পড়িলাম। যুবতী তখন আমার অভ্যর্থনার্থ তাড়াতাড়ি আপন কার্য সমাধা করিয়া ঝিকে তামাক আনিবার নিমিত্ত আদেশ করিল।

আমি ইত্যবসরে আপন মনে অনুচ্চস্বরে বলিতে লাগিলাম, "বিধুবাবুর এতক্ষণ এখানে আসিবার কথা ছিল, কই তিনি যে আসিলেন না।" যুবতী উত্তরচ্ছলে বলিল, "কই, সে ত আজ কয়দিন আসিতেছে না। সেই যে সেদিন মহেশের সঙ্গে মারামা—" এ পর্যন্ত বলিয়া যুবতী আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি যেন নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিলাম, "তা কাজটা কি ভাল হয়েছিল ? আমি সমস্তই শুনিতে পাইয়াছি। বিধু আমার পরম বন্ধু।"

যুবতী। কই আপনাকে ত একদিনও এখানে দেখি নাই।

আমি। এতদিন আসিবার প্রয়োজন পড়ে নাই ; তাই আসি নাই ; কিন্তু সেদিনকার ঘটনাব পর বিধু প্রতিজ্ঞা করিয়াছে ; সে আর কখনও এখানে একাকী আসিবে না।

যুবতী। তা মহাশয় ; আমার দোষ কি বলুন ? বাস্তবিক ; সেদিন মহেশের কাজটা ভারি অন্যায় রকমের হয়েছিল। ভদ্রলোকের গায়ে হাততোলা জুতা মারা, এগুলি নেহাত ছোট লোকের কর্ম।

এই বলিয়া যুবতী স্বহস্তে প্রস্তুত পানের খিলি দুটি আমাকে প্রদান করিল। আমি সমস্ত ব্যাপার ইতিমধ্যে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। এক্ষণে আমার মনে হইতে লাগিল. এ জুতোমারা কাণ্ডের প্রতিশোধ লইতে বিধু বাবু নামক ব্যক্তির পক্ষে মানসিক উত্তেজনার প্রাবল্যে মহেশের জীবনলীলা সাঙ্গ করা একেবারে অসম্ভব নহে। ইহা ২৬শে আশ্বিনেরই ঘটনা। যাহা হউক. অধুনা আমার পক্ষে এই বিধু বাবুর অনুসন্ধান লওয়া বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িল ; কিন্তু এখানে আমি বিধুবাবুর বন্ধু বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছি, সুতরাং সোজাসুজি ইহাকে সেকথা জিজ্ঞাসা না করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম। ইতিমধ্যে, ঝি-মূর্তি, একটি রূপার হুকা হাতে করিয়া সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। এবং আমাকে দেখিয়া বলিল,—

"এটি যে নূতন বাবু !" যুবতী তদুত্তরে বলিল. "ইনি বিধুভূষণের বিশেষ বন্ধু !"

ঝি। কোন্ বিধুভূষণ ?

যুবতী। অ্যাঁ—নেকি ? মুখুয্যে বিধু—সেই ২১ নম্বর কলুটোলার।

এতক্ষণে সহজেই আমার কার্য সিদ্ধ হইয়াছে ;—আমি ঘটনাক্রমে বিধুর ঠিকানা অবগত হইলাম। সুতরাং আর সেখানে অপেক্ষা করিবার দরকার নাই ভাবিয়া, ঝির কথার উত্তরচ্ছলে অন্যমনস্কভাবে বলিলাম, "বিধু বাবুর ত এখনই এখানে আসিবার কথা ছিল, দেরী হইতেছে কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। তা, আমি একটু দেখিয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া আমি "২১ নং কলুটোলা" ঠিকানাটি মনে রাখিয়া সে বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত হইলাম

এবং অবিলম্বে মুচিপাড়া থানায় আসিয়া পহুঁছিলাম।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। আসিয়া আমি দেখি সুশীলবাবু আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া বলিলে তখনই বিধুর সম্বন্ধে তদন্ত করা উচিত বলিয়া পরামর্শ স্থির হইল। দুই জন পুলিশ কনেষ্টবল, পুলিশপোষাক পরিহিত সুশীলবাবু এবং বাঙ্গালী বাবু আমি—শকটারোহণে অগৌণে কলুটোলায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। বলিয়া রাখা ভাল, হত্যাগৃহে প্রাপ্ত কাটারি এবং নাগরা জুতা আমাদিগের সঙ্গে লইয়াছিলাম।

তাহাদিগকে গাড়িতে পথের উপর অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমি একাকী সেই ২১ নং বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। এটি একটি ছোটখাট ডিস্পেন্সারী। অনুসন্ধানে জানিলাম, সুধীরবাবু নামে জনৈক ভদ্রলোক এ ডিস্পেন্সারীর স্বত্বাধিকারী। তিনি সপরিবারে ইহারই উপরতলে বাস করেন, নীচের ঘরে ডাক্তারখানা। আরো জানিলাম, সত্য সত্যই বিধুভূষণ নামে উক্ত সুধীর বাবুর এক ভাইপো এ বাড়ীতে বাস করেন। তিনি এক্ষণে বেকার অবস্থায়ই আছেন।

আমি যে সময় সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম, সে সময় ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডারকে বিধু বাবুকে সংবাদ দিতে বলিয়া নীরবে সেখানে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

কম্পাউণ্ডাব উপরে চলিয়া গেল, এবং অল্প সময়ের মধ্যে আরক্তনয়ন, বিষাদ-বদন, রুক্ষকেশ এক যুবক সমভিব্যাহারে সে কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। যুবকের মুখাকৃতি ও ভাবগতি সন্দর্শনে আমার মনের দারুণ সন্দেহ একেবারে বিশ্বাসে পরিণত হইল।

আমি একটু ত্রস্ততাব সহিত অথচ মৃদুস্বরে যুবককে বলিলাম, "আমি হাড়কাটা গলি হইতে আসিয়াছি। পথে গাড়ীতে 'নলি' অপেক্ষা করিতেছে, আপনি একটু বাহির হইতে পারেন ?" যুবক সংক্ষেপে উত্তব করিল "আমি আজ বড় অসুস্থ।" আমি তবে ব্যগ্রভাবে বলিলাম, "তবে আপনি একটু এখানেই অপেক্ষা করুন, আমি তাহার নিকট হইতে এই আসিতেছি।" এই বলিয়া ত্বরিতপদে সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম, এবং কয়েক মুহূর্তের পর দলবলসহ সুশীলকে সে বাড়ীতে উপস্থিত হইতে উপদেশ দিয়া, পুনরায় ডাক্তারখানায় প্রবেশ করিলাম। এবারে তাড়াতাড়ি আসিয়াই আমি দৃঢ়মুষ্টিতে বিধুর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া, বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে সেই নাগরা জুতাখানি বাহির করিয়া বলিলাম, "দেখ দেখি বিধু, তুমি এ জুতা সেদিন রাত্রিকালে মহেশের হত্যাগৃহে ফেলিয়া আসিয়াছিলে কিনা ?"

আমার কথা শুনিয়া ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া বিধু ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল এবং স্বীয় হস্ত ছাডাইয়া লইবার চেষ্টা পাইল। তখন আমি আমার মুষ্টি দৃঢ়তর করিয়া বলিলাম, "সে চেষ্টা বৃথা ; তুমি মহেশের হত্যাকারী, তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করিলাম।"

ইত্যবসরে কনেষ্টবলসহ সুশীলবাবু সে গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আসামী গ্রেপ্তার হইয়াছে, এক্ষণে থানায় চলুন।"

বিধু এ সকল দেখিয়া শুনিয়া একেবারে দমিয়া গেল। আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পুনর্বার বলিতে লাগিলাম, "দেখ, বিধু, আমি সমস্তই জানিতে পারিয়াছি ; তুমি হাড়কাটা গলিতে নলির বাড়ী মহেশ কর্তৃক প্রহৃত ও অবমানিত হইয়া প্রতিশোধ লইবার মানসে, উত্তেজনাবশে, সেদিনই মহেশকে খুন করিয়াছ। এ বিষয়ে সমস্ত প্রমাণাদি আমি সংগ্রহ করিয়াছি, এক্ষণে চল, তোমাকে হাজতে লইয়া যাইব।"

আমি এতটুকু বলিয়া দেখিলাম, বিধু আমার সমস্ত কথা শুনিতেছে কি না সন্দেহ। কারণ, ক্রমে ক্রমে যেন তখন তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করিল।

তদনন্তর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিধু, তুমি এক্ষণে কি বলিতে বা কি করিতে চাও ?" সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে উত্তর করিল, "মহাশয়, আমার কিছু বলিবার বা করিবার নাই। পাপ গোপন থাকে না। পাপের ফল অবশ্যই ভুগিতে হইবে ; চলুন, আমি কোথায় যাইব।"

আমি বলিলাম, "তুমি হত্যাপরাধ স্বীকার করিতেছ ?" সে উত্তর করিল, "আর মিথ্যা বলিব না ; আমি হত্যা করিয়াছি।"

আমরা সেখানে বসিয়াই উপস্থিত কতিপয় ভদ্রলোক সমক্ষে বিধুর স্বীকারোক্তি এবং তৎকর্তৃক বর্ণিত হত্যার আমূল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

অবমানিত হইয়া উত্তেজনা-বশে যে এ ভীষণ কার্যে ব্রতী হইয়াছিল ; মহেশ যাহাতে চীৎকার করিতে না পারে, তজ্জন্য যে পূর্বাহ্নেই ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করিয়াছিল ; অনুসন্ধানকারীকে বিপথে চালিত করিবার জন্য যে হত্যাগৃহে স্বেচ্ছাপূর্বক নাগরা জুতা রাখিয়া আসিয়াছিল, একে একে এ সমস্তই বিধু স্বীকার করিল। এইরূপে বিধুর জবানবন্দী সমাপ্ত হইলে আমরা তাহাকে থানায় লইয়া চলিলাম।

বলা বাহুল্য, এই অদ্ভুত হত্যার মোকদ্দমা দায়রা সোপর্দ হইল, এবং দায়রায়, জজ সাহেব ও জুরির বিচারে, বিধুভূষণ চিরনির্বাসন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল।

রজনীচন্দ্র দত্ত।

অদল বদল

প্রথম পরিচ্ছেদ

সে আজ কয়েক বৎসর পূর্বের কথা ; কার্তিক মাসের শেষে একদিন আমি বেলা বারোটার সময় যথারীতি অফিসে আসিয়া বসিতেই চাপড়াস বদ্ধ এক হিন্দুস্থানী মুসলমান মূর্তি আমার সন্নিকটবর্তী হইয়া বলিল "বড়া সাহেব আপকো সেলাম দিয়া বাবুজি !" বড়সাহেব আমাদের ডিটেক্‌টিভ পুলিশের সুপারিনটেন্‌ডেন্ট ; আমি তখন সবে ডিটেকটিভ্ ডিপার্টমেণ্টে প্রবেশ করিয়াছি ; আমি ডিটেক্‌টিভের সাবইন্‌সপেক্টর, বাঙ্গালায় যাকে বলে 'গোয়েন্দা দারোগা।'

বড়সাহেব আমার উপর কিছু প্রসন্ন ছিলেন ; অল্পদিনের মধ্যে আমার কিঞ্চিৎ সুনামও জন্মিয়াছিল , এবং কোন জটিল মোকদ্দমা তদন্ত করিবার আবশ্যক হইলে, অনেক সময় সিনিয়ার দারোগার পরিবর্তে আমার উপরই তদন্তের ভার পড়িত। আজও সেইরকম একটা কিছুর প্রত্যাশা করিয়া বড়সাহেবের 'আফিস রুমে' প্রবেশ করিলাম।

সাহেব তখন মাথা গুঁজিয়া কি লিখিতেছিলেন ; আমার গৃহ প্রবেশমাত্র সাহেব এক চোখের চশমার ভিতর দিয়া একবার আমার দিকে চাহিলেন, এবং কোন কথা না বলিয়া বাম হস্তে আমার সম্মুখে একখান বাঙ্গালা খবরের কাগজ ফেলিয়াদিলেন ; আমি তাহা কুড়াইয়া লইয়া খুলিলাম ; নাম দেখিলাম 'সদর ও মফঃস্বল', ইহা কলিকাতা কিম্বা মফঃস্বলের কোন নগর হইতে বাহির হয় কি না জানি না, এখন পর্যন্ত ইহার অস্তিত্ব বর্তমান আছে কি না জ্ঞাত নহি ; ইহা 'সঞ্জীবনী' অপেক্ষা কিছু ছোট আকারের সাপ্তাহিক পত্রিকা, এ কাগজ সর্বপ্রথম এই দেখিলাম। প্রথম পৃষ্ঠা উল্টাইতেই, 'সম্পাদকীয় মন্তব্যের' নীচে নীল পেন্সিলের মোটা দাগ দেওয়া একটা প্যারা আমার নজরে পড়িল, বুঝিলাম ইহাই দেখিবার জন্য সাহেব

কাগজখানি আমায় দিয়াছেন, আমি প্যারাটি আগাগোড়া পড়িলাম ;—

"মালদহের বঙ্কুবিহারী সাহা নামক একজন হাতুড়ে 'কুন্তলীন' নামক বিখ্যাত কেশতৈলের বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া লাভবান হইবার আশায় 'কুন্তলীনের' নামের অনুকরণে 'কুন্তলতৈল' নামক এক প্রকার কেশ তৈল প্রস্তুত করিয়াছে, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ ইহা ব্যবহার করিবার পূর্বেই ইহার অসাধারণ গুণের কথা অবগত হইয়াছে। এই তৈল ব্যবহার করিয়া দুইজন লোক ভব-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে, আর দুইজন লোক সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে পড়িয়া আছে, ডাক্তার সাহেব সযত্নে চিকিৎসা করিতেছেন, রোগীদ্বয় বাঁচিবে কি না এখনো বলা যায় না ; নিজ মালদহ হই'তে আমরা এ সংবাদ পাইয়াছি, বঙ্কু সাহার 'কুন্তল তৈল' আর কোথাও কোন বিভ্রাট ঘটাইয়াছে কি না তাহা আমরা এখনো জানিতে পারি নাই। আমরা সংবাদ পাইলাম বঙ্কু সাহার নামে ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রেপ্তারী ওয়ারেন্ট বাহির করিবার পূর্বেই সে চম্পট দিয়াছে, পুলিশ এ পর্যন্ত তাহার কোন সন্ধান করিতে পারে নাই।"

সংবাদটা দুইবার মনে মনে পড়িলাম। তাহার পর কাগজখানা ধীরে ধীরে টেবিলের উপর রাখিয়া সাহেবকে বলিলাম "কিছু বুঝিতে পারিলাম না, বঙ্কু সাহা হাতুড়ে সন্দেহ নাই ; হাতুড়েদের মতই হয়ত সে কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ এবং হয়ত এই তৈলের বিভিন্ন উপাদানের রাসায়নিক ক্রিয়ায় ইহা বিষাক্ত হইয়াছে ; কিন্তু এমন বিষাক্ত হইল যে তাহা মাখিয়াই দুইটা মানুষ মরিয়া গেল ; আর দুজন মরমর ; তৈলে যে এমন কোন উগ্র বিষ ছিল তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে ?"

সাহেবের লেখা শেষ হইয়াছিল, তিনি চেয়ারখানা অল্প ঘুরাইয়া লইয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন, এবং অল্প হাসিয়া বলিলেন, "আমিও কিছু না বুঝিতে পারিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে একখান অফিসিয়াল পত্র লিখিয়াছিলাম, তিনি উত্তরে লিখিয়াছেন তৈলে যে উগ্র উদ্ভিজ্জ বিষ বর্তমান, পরীক্ষা দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। মৃত ব্যক্তিদ্বয়ের পাকাশয় Chemical Examiner এর কাছে পাঠান হইয়াছিল, পাকাশয়ে এই বিষের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল।

আমি আকাশ হইতে পড়িলাম, বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "পাকাশয়ে বিষ পাওয়া গিয়াছে ! তাহা হইলে আপনি বলিতেছেন তৈল মাখিয়া ইহারা মরে নাই, খাইয়া মরিয়াছে ?"

সাহেব বলিলেন, "কাণ্ডটা আমার নিকটও আগাগোড়া রহস্যপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে। সমস্ত ঘটনার full report আমি পাই নাই, ম্যাজিষ্ট্রেট বঙ্কু সাহাকে ধরিবার জন্য একজন expert ডিটেক্‌টিভ নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছেন,—বুঝিয়াছ তোমাকে ডাকিয়াছি কেন ?"

এ সম্বন্ধে সাহেবের সঙ্গে আমার আরও দুই চারিটা কথা হইল। তাহার পর সাহেব সহসা ঘড়ি খুলিয়া বলিলেন,—"তোমাকে আজই লুপ মেলে যাইতে হইবে। আর দু ঘণ্টা মাত্র সময় আছে, এখন গুড়বাই।" টুপিটা মাথায় তুলিয়া সাহেব কার্যান্তরে উঠিয়া গেলেন, আমিও আর বিলম্ব না করিয়া বাহিরে আসিলাম।

লুপ মেল বেলা স তিনটার সময় হাবড়া ছাড়ে ; আমি তাড়াতাড়ি বাসায় আসিয়া দরকারী কয়েকটা জিনিষমাত্র একটা ট্রাঙ্কে পুরিয়া হাবড়া রওনা হইলাম। ষ্টেসনে আসিয়া গাড়ী ছাড়িতে মিনিট দশেক মাত্র সময় ছিল, জিনিষপত্র গুছাইয়া গাড়ীর মধ্যে একটু ভাল করিয়া বসিতেই গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল, গার্ডের হুইস্‌লে শিশ দেওয়া হইল, এবং প্ল্যাটফর্ম কম্পিত করিয়া হুস্ হুস্ শব্দে ট্রেন ছুটিয়া চলিল।

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটার সময় রাজমহলে উপস্থিত হইলাম। সেই রাত্রেই ডাকের নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া আমি গো-শকটের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। গাড়ীর খোঁজ করিতেছি শুনিয়া পাঁচ সাতজন গাড়োয়ান আসিল, এবং আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া প্রায় একসঙ্গে সকলেই জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁহা জানে হোগা সাব রাঁংরেজা ?" 'রাঁংরেজা' কিরে বাপু ? শেষে বুঝিলাম ইংরেজবাজার বা ইংরেজাবাদ মালদহের সিভিল ষ্টেসন ইহাদের নিকট এই সংক্ষিপ্ত নামে পরিচিত। পাঁচ সিকা দিয়া আমি রাঁংরেজার জন্য গাড়ী করিলাম। গাড়োয়ান আমার বিছানা বিছাইয়া দিলে, ধূলিধূসর মস্তকটি উপাধানে ন্যস্ত করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সকালবেলা যখন নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, তখন দেখি প্রভাত রৌদ্রে মুক্ত প্রকৃতি পরিপ্লাবিত, ধীরে ধীরে শীতল বাতাস বহিতেছে, গাড়ী প্রশস্ত পথ বহিয়া মন্থর গতিতে চলিতেছে, পথের উভয় পার্শ্বে মাটির উঁচু আইল দেওয়া তুঁতের ক্ষেত, আমের বাগান, পাখীর কলগান, বনের ছায়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচ্ছন্ন কৃষক-কুটীরে বালক-বালিকার হর্ষকল্লোল, আর অনেক দূরে ধূসব গিরিশ্রেণীর উপর প্রাতঃসূর্যের দীপ্তালোক, আমি গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া বসিলাম।

বেলা তিনটার সময় মালদহে আসিয়া পৌঁছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমাকে মালদহে আসিয়া কোন অপরিচিত ব্যক্তির আতিথ্য গ্রহণ করিতে হয় নাই, আমার বাল্যবন্ধু কমলকৃষ্ণবাবু সে সময় মালদহের ডিস্‌টিলারি সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট ছিলেন, তাঁহার স্কন্ধেই ভর করিলাম। তিনি আমাকে সহসা উপস্থিত দেখিয়া অত্যধিক আনন্দিত হইলেন। অপরাহ্নে স্নানাহার শেষ করিয়া, তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে আমি আমার এই আকস্মিক অভিযানের বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট বিবৃত করিলাম। দেখিলাম তিনি বঙ্কু সাহার সম্বন্ধে অনেক কথা জানেন ; আমাকে কৌতূহলাক্রান্ত দেখিয়া তিনি তাহার সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিলেন, আমি বলিলাম, "তাহার সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছ আগাগোড়া বল।"

কমলকৃষ্ণবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"বঙ্কু সাহার অবস্থা এমন ছিল না যে আমি তাহার বিষয়ে কোন খবর রাখি. তবে তাহাব পলায়নের পর বিষয়টা কিছু interesting হইয়া উঠায় দিগম্বরবাবুর কাছে কথা প্রসঙ্গে যাহা শুনিয়াছি তাহাই তোমাকে বলি ; দিগম্বর বাবু আমাদের এ অঞ্চলের একজন বড় জমিদার, প্রথম যৌবনে বঙ্কু তাঁহার একজন মোসাহেব ছিল ; তাঁহাদেরই গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে সে কিছুদিন পড়িয়াছিল, কিন্তু সরস্বতীর অকৃপাবশতঃ ছাত্রবৃত্তি পাশ করিতে পারে নাই, অবশেষে সে মালদহে আসিয়া 'সারদাসুন্দরী (দিগম্বরের মাতার নাম) দাতব্য চিকিৎসালয়ের' কমপাউণ্ডারের এসিষ্ট্যাণ্ট নিযুক্ত হয় ; কিছুদিন এসিষ্ট্যাণ্টগিরি করিয়া দিগম্বর বাবুর অনুগ্রহে তাঁহার কম্পাউণ্ডারের চাকরীটি লাভ হয়, কিন্তু দীর্ঘকাল তাহার চাকুরী করা পোষাইয়া উঠিল না, সে সর্বদাই বলিত, প্রতিভাশালী ব্যক্তির কখন চাকরী করিয়া পোষায় না, প্রতিভা বিকাশই তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তাই সে চাকরী ছাড়িয়া আবিষ্কার কার্যে মনঃসংযোগ করিল, কিন্তু বাঙ্গালা দেশে নাকি সর্বদা সার হম্‌ফ্রে ডেভি বা ক্রিষ্টোফার কলম্বস জন্মগ্রহণ করে না, তাই বেচারার আবিষ্কারের মধ্যে তেমন originality ছিল না, অর্থাৎ সে যখন দেখিল প্রতিভা খাটাইয়া কিছু আবিষ্কারও করা চাই সঙ্গে সঙ্গে অর্থ উপার্জনও চাই, তখন আর কিছু আবিষ্কারের সুবিধা না পাইয়া 'কুন্তল তৈল'

নামে একটা কেশ-তৈল আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। বোধহয় কুন্তলীনের বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া ও তাহার খ্যাতির কথা শুনিয়া সে ইহার নামের অনুকরণে নিজের তৈলের নাম রাখিয়াছিল, এরকম অনুকরণ আজকাল আমাদের দেশের রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক শুধু এই তৈল আবিষ্কার করিয়া ক্ষান্ত হইলেই হয়ত বেচারীকে কোন বিপদে পড়িতে হইত না, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা নিরীহ লোকের প্রাণও যাইত না।"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—"বল কি তুমি, তাহা হইলে কি সে তৈল বিষাক্ত নয় ? আমি বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছি এ তৈলে উগ্র উদ্ভিজ্জ বিষ বর্তমান আছে।"

কমলকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, "আরে ভাই কথাটা শোনই, অনেক রহস্য আছে, বুঝিতেছ না মাখিবার তেল খাইয়া মানুষ মরিয়াছে, বিষ থাক বা না থাক, মাখিবার তৈল আর কে খায় ?"

আমি বলিলাম, "তোমার গল্প শেষ না হইলে আর এ রহস্যের অন্ত পাইতেছি না,—বল।"

কমলকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন,

"বঙ্কু সাহা শুধু তৈল প্রস্তুত করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, ভাবিয়া চিন্তিয়া পেটের ব্যায়াবামের একটা পেটেণ্ট মেডিসিন বাহির করিল তাহার নাম দিল উদরাময়ের মহৌষধ। এই মহৌষধের আর কোন গুণ ছিল কি না জানি না, কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর আঠালো যে তাহা আর কহতব্য নয়, বোধ করি এই মহৌষধ দিয়া ভাঙ্গা কাচও জোড়া দেওয়া চলে। এ পরিচয় আমরা পরে পাইয়াছি, সেই কথাই এখন বলিব।

তৈল ও উদরাময়ের ঔষধ আবিষ্কার করিয়া বঙ্কু সাহা তাহার ভূতপূর্ব মনিব 'সারদাসুন্দরী দাতব্য চিকিৎসালয়ের' ও দিগম্বরবাবুর পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার কে, সি, দত্ত, এল, আর, সি, পি, (এডিন) মহাশয়েব নিকট দুই শিশি উপহার পাঠাইল, এবং তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানাইল যে যদি তিনি এই তৈল ও মহৌষধের উপকারিতা সম্বন্ধে একটা সার্টিফিকেট দেন তাহা হইলে তাহার মহোপকার হয়। ডাক্তার জানাইলেন, ইহাদের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া তিনি সার্টিফিকেট দিবেন ; শিশি দুটি আপাততঃ তাঁহার নিকট রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কমলকৃষ্ণ বলিলেন,—"এই ঘটনার তিন দিন পরে মালদহের সেসন বসিল। রাজসাহীর সেসন জজ সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লইয়া দাওরা করিতে আসিলেন ! দেখিতে দেখিতে বিচারালয় সজীব হইয়া উঠিল, দাওরা আরম্ভ হইবার দিন আদালতের সম্মুখবর্তী সুবৃহৎ নিম্ববৃক্ষ-মূল ও অদূরবর্তী ছায়াচ্ছন্ন আম্র-তরুতল উকিল, মোক্তার, সাক্ষী, আসামী ও ফরিয়াদীপক্ষীয় লোক, স্কুলের ছাত্র, দোকানদার সর্বশ্রেণীর জনসমাগমে এক বৃহৎ হাটের আকার ধারণ করিল, এরূপ হইবার বিশেষ কারণও ছিল, জজ আরবথনট কোম্পানীর সহিত জমিদার দিগম্বরবাবুর একটা হাটের অধিকার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয় ; একদিন হাটে উভয়পক্ষীয় লোকই উপস্থিত ছিল, কথায় কথায় তাহাদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া গেল, প্রথমে মুখে মুখেই চলিতেছিল, শেষে লাঠি চলিতে লাগিল, আরবথনট কোম্পানীর এক পাইকের লাঠিতে দিগম্বর বাবুর একটা লাঠিয়ালের মাথা ভাঙ্গিয়া যায়, সেই আঘাতেই বেচারা মরিয়া গিয়াছে। দাওরার প্রথম দিনই এই মোকদ্দমার বিচার হইবে এরূপ স্থির হইয়াছিল, উভয়পক্ষই প্রবল, কলিকাতা হইতে দুই পক্ষই বড় বড় ব্যারিষ্টার আনাইয়াছেন। পেটা ঘড়িতে ঢন্ ঢন্ করিয়া

এগারটা বাজিয়া গেল, কনেষ্টবল বেষ্টিত আসামী 'কাঠগড়ার' মধ্যে আনীত হইল, জজসাহেব খাস কামরা হইতে বাহির হইয়া বিচারকের আসনে উপবেশন করিলেন, ব্যারিষ্টার সাহেবেরা আসিয়া বিচারালয়ের বিভিন্ন কাষ্ঠাসন শোভিত করিয়া বসিলেন, এবং সামলা মাথায় দিয়া সরকারী উকিল বিচারগৃহে প্রবেশ করিলেন।

প্রথমে সরকারী উকিল মোকাদ্দমা আরম্ভ করিলেন। মোকাদ্দমার ফরিয়াদী পক্ষের কয়েকজন প্রধান সাক্ষীর জবানবন্দী শেষ হইলে, একজন বড় রকমের সাক্ষীর সময় আসিল, এই সাক্ষী আর কেহ নহে, দিগম্বর বাবুর পারিবারিক চিকিৎসক মিঃ কে, সি, দত্ত, এল্, আর, সি, পি মহাশয়।

কিন্তু এখনও তিনি উপস্থিত হন নাই, একে বিলাতফেরত ডাক্তার, তাহার উপব আবার এল্, আর, সি, পি (এডিন), মামলা মোকদ্দমার তিনি তোয়াক্কাই রাখেন না, কিন্তু সেসন আদালতের কথা স্বতন্ত্র, তাহার উপর হাকিম যে রকম কড়া খাতির না করিয়া উপায় নাই। কোর্টে যখন তাঁহার উপস্থিত হওয়া দরকার ঠিক সেই সময়টিতে তিনি হ্যাট-কোটে পরিশোভিত হইয়া, তাঁহার ডগকার্টখানিতে করিয়া বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন।

এখানে দত্ত সাহেবের কথা তোমাকে একটু বলি ; তাঁহার একটু প্রাকৃতিক বিকৃতি জন্মিয়াছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ সহধর্মিণীর নব-যৌবন বর্তমানেই পঁয়ত্রিশ বৎসর মাত্র বয়সে তাঁহাব মস্তকের সম্মুখের নিবিড় কেশরাশি উঠিয়া গিয়া দুই চারিগাছি মাত্র চুল মরুভূমে ওয়েশিসের মত বিদ্যমান ছিল। বন্ধু সাহা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিল যেন তাহার আবিষ্কৃত কুন্তল তৈল যথারীতি ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে তাঁহার লুপ্ত কেশরাশি অঙ্কুরিত তাঁহার অনুর্বর মস্তক সুশোভিত করিবে। কাছারীতে সাক্ষী দিতে যাইবাব কয়েক মিনিট পূর্বে বন্ধু সাহার সেই তৈলের কথা তাঁহার মনে পড়িল, শিশিটা তখনও খোলেন নাই, মনে করিলেন 'তৈলটা একটু মাথায় লাগাইয়া যাই নাই কেন ?' শিশি বাহিব করিয়া চাকবকে সেই তৈল তাঁহার মাথায় উত্তমরূপে লাগাইয়া দিবার আদেশ করিলেন। চাকরটা শিশিব কর্ক খুলিয়া অর্দ্ধছটাক পরিমাণ তরল পদার্থ তাঁহার মস্তকের উপর উত্তমরূপে অনুলিপ্ত করিয়া দিল। অতঃপর তিনি মস্তকে হ্যাট আঁটিয়া কাছারীতে সাক্ষ্য দিতে চলিলেন।

আমি তোমাকে একটা কথা এতক্ষণ বলি নাই, বন্ধু সাহা যে কুন্তল তৈল ও উদবাময়ের মহৌষধ আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহাদের শিশি ঠিক এক রকমের, শুনিয়াছি শিশির উপর লেবেল লাগাইবার ভার দিয়াছিল একটা নিরক্ষর চাকরের উপর, চাকরটা লেবেলগুলা অদল-বদল করিয়া ফেলিয়াছিল, অর্থাৎ কুন্তল তৈলের লেবেল উদরাময়ের মহৌষধের শিশিতে লাগাইয়াছিল, আর মহৌষধের লেবেল লাগাইয়াছিল তৈলের শিশিতে : ইহাতে যে ফল ফলিল তাহা বুঝিতেই পারিতেছ, কারণ আমি পূর্বেই বলিয়াছি উদরাময়ের মহৌষধটা ভয়ানক আঠালো জিনিষ। কাজেই সেই আঠালো উদরাময়ের মহৌষধ অতি পরিপাটিরূপে দত্ত সাহেবের মস্তকে লিপ্ত হইল।

কোর্টের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া তিনি হ্যাট খুলিবেন, উঠাইতে গিয়া দেখেন তাহা মাথার উপর আঁটিয়া বসিয়াছে। এরূপ অলৌকিক ঘটনার কারণ কি তাহা বুঝিতে না পারিয়া তিনি আর একবার হ্যাটের এক কোণ ধরিয়া সজোরে টান দিলেন, কিন্তু বৃথা চেষ্টা ! শিরীষের আঠা বরং ভাল, বিস্তর টানাটানিতে হ্যাট একটুও নড়িল না, এদিকে টাকের উপর ঔষধ শুখাইয়া চামড়ায় টান ধরিয়াছে, মাথা চুলকাইবার জন্য তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন, কিন্তু হায়, হিমাচলের অভ্রভেদী শিরে চির বরফ স্তূপের মত তাঁহার মস্তকে সোলা-হ্যাট অটুট রহিল।

এদিকে আর সময় নেই, তাঁহার আগের সাক্ষী অনেকক্ষণ সাক্ষীর 'কাটরা' হইতে নামিয়া গিয়াছে, অগত্যা তিনি হ্যাট মাথায় দিয়াই সাক্ষীর কাটরায় উঠিলেন দেখিয়া অনেকে পূর্ণ বিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিল, কারণ হ্যাট মাথায় দিয়া কোন সাহেব বা বাঙ্গালীকে সাক্ষী দিতে আর কখনও তাহারা দেখে নাই।

জজ সাহেবটি কিছু অতিরিক্ত রোখা, সাক্ষীরা তাঁহার হস্তে নিগ্রহ ভোগ করে বলিয়া একটা জনরব ছিল। জজ সাহেব ডাক্তারের মাথায় হ্যাট দেখিয়া তৎপ্রতি দুই একবার তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিলেন, কিন্তু ডাক্তারকে যখন হ্যাট অপসারণ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন দেখিলেন, তখন গম্ভীর স্বরে বলিলেন,

"আদালত গৃহে মাথায় হ্যাট রাখা নিয়ম বিরুদ্ধ একথা একজন শিক্ষিত সাক্ষীকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া লজ্জাজনক।"

ডাক্তারের গলদঘর্ম হইতেছে, তিনি বুকের পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ললাটের ঘর্ম অপসারণ করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমি ইচ্ছা করিয়া মাথায় হ্যাট রাখি নাই, আমার—"

সাহেব—"আপনার ইচ্ছাতেই হোক আর অনিচ্ছাতেই হোক কোর্টে আপনার মস্তক উন্মুক্ত করিতে হইবে, ভারতেশ্বরীর বিচারাসনের প্রতি অসম্মান প্রকাশ করিবার আপনার অধিকার নাই।"

ডাক্তার—"আমার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা—"

সাহেব এবার গর্জন কবিয়া উঠিলেন, বলিলেন, আপনার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কথা কোর্টের জানিবার কোন আবশ্যক নাই, আপনি এই মুহূর্তে হ্যাট খুলিবেন কি না?"

ডাক্তার—"কি বিপদ, কি আমার কথাটা—"

জজ সাহেব—"ইহা নিতান্ত বেয়াদবী! আমি আপনার কোন কথা শুনিতে চাহি না, আগে মাথা খুলুন, পরে কথা; আর যদি বিন্দুমাত্র বিলম্ব করেন, তবে আপনাকে—"

ডাক্তার আবেগের সহিত বলিলেন, "মহাশয়, আমার কৈফিয়ৎটা শুনিয়া—"

জজ সাহেব এবার ব্লটিং-এর রুলটা টেবিলের উপর আছড়াইয়া সক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"চাপড়াসী, আবি উন্‌কো টোপী জোরসে উতার লাও, পেস্কার, আমি ইহাকে আদালত অবজ্ঞার জন্য কুড়ি টাকা জরিমানা করিলাম।"

পেস্কার জরিমানার ওয়ারেন্ট লিখিতে বসিল। চাপরাসী হুজুরের হুকুমে ডাক্তার সাহেবের হ্যাট খুলিবার জন্য সাক্ষীর কাটরার নিকট উপস্থিত হইল, কিন্তু ভীমকান্তি ডাক্তারসাহেবের বিরাট ঘুসি উত্তোলিত দেখিয়া আগাইতে ভরসা করিল না, এখন তাহার অবস্থাটা অনেক পরিমাণে

"না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ
সীতার হরণে যথা মারীচ কুরঙ্গ!"

একদিকে জজ সাহেবের হুঙ্কার, অন্যদিকে ডাক্তারের ঘুসি, দুইটাই সমান আতঙ্কজনক—চাপরাসী বেচারা প্রমাদ গনিল।

জজ সাহেব তাঁহার হুকুম তামিল হইল না দেখিয়া চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিলেন, চাপরাসীর দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিলেন—"চাপরাসী—গাধা, সুয়ার, তোমারা ক্যা ডর হ্যায়, জোরসে নেকালো উসকে টোপী, আবি নেকালো, পেস্কার আমি সাক্ষীকে আরো পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করিলাম।"

একে ত ভারি ধুমধামের মোকদ্দমা, তাহার উপর বড় বড় ব্যারিষ্টার আসিয়াছে; পূর্বেই

বলিয়াছি শহরের অধিকাংশ লোক আসিয়া জড়ো হইয়াছিল. বিচারের মধ্য পথে বিচারগৃহে এই প্রহসন আরম্ভ হওয়ায় ঘরের দ্বার ও বারান্দায় আর তিল ফেলিবার স্থান বহিল না, সকলের দৃষ্টি ডাক্তারের উপর, ব্যাপার দেখিয়া সকলেই শশব্যস্ত, কিছু বুঝিতে না পারিয়া সকলেই বিস্ময়াকুল। ডাক্তার সাহেব কিন্তু এত লোকের সাক্ষাতে এরূপ অপমানিত হইয়া একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিলেন, তাঁহার চোখ মুখ দিয়া আগুন ছুটিতে লাগিল, ললাট বহিয়া টস্ টস্ করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল, তাঁহার ধৈর্যের বাঁধন ছিড়িয়া গেল, জজ সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, —"পঞ্চাশ কেন, আপনি এই মুহূর্ত্তে পাঁচশো টাকা জরিমানা করুন না কেন, জরিমানার ভয়ে কে কখন অসাধ্য সাধন করিতে পারে ? আপনি শুধু রাগই করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছেন না যে হ্যাটটি আমার মাথায় কায়েমীভাবে বসিয়া গিয়াছে ; আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নাই, কিন্তু হাজার টানাটানিতেও ইহা খুলিবে না। যাহা হউক আমি আপনার আক্ষেপ রাখিব না, দেখুন ইহা অন্য উপায়ে খুলি।" বলিয়া দত্ত সাহেব পকেট হইতে একখানা ছুরি বাহির করিলেন, এবং তাহা খুলিয়া সোলা-হ্যাটের উপর তাহার অগ্রভাগ বসাইয়া জোরে টানিলেন, তাহার পর সেই ফাঁকে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া সজোরে টানিতে লাগিলেন, সোলা-হ্যাটের ক্ষুদ্র প্রাণ সে বিষম টান সহ্য করিতে পারিল না পড় পড় শব্দে মাথার উপর হইতে হ্যাট উঠিয়া আসিল, মাথায় লুপ্তাবশিষ্ট যে দুই চারি গুচ্ছ কেশ বর্তমান ছিল এই বিপুল টানে তাহাদেরও অস্তিত্ব লোপ পাইল, এবং হ্যাটের এক পরদা সোলা টাকটি জুড়িয়া বিরাজ করিতে লাগিল, কি রকম শোভা হইল কিছু অনুমান করিতে পার ?" কমলকৃষ্ণ হাসিয়া আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমিও হাসিয়া উত্তর করিলাম, "তাহা আর পারি না ?"

'ছাদিত্ম শরদভ্রেণ শশি লেখেব দৃশ্যতে', তারপর ?

"তাহার পর আর কি ? হাসির ছররা পড়িয়া গেল ; সাক্ষী দেওয়া শেষ হইলে ডাক্তার অগ্নি-মূর্ত্তিতে আদালত হইতে বাহির হইয়া বঙ্কু সাহাকে তেলের সার্টিফিকেট দিবার জন্য ঘোড়ার চাবুক হাতে করিয়া ছুটিলেন, বঙ্কু ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া তাঁহাব সার্টিফিকেটের হাত হইতে সে যাত্রা বক্ষা পাইল। ডাক্তার মাথার পঙ্কোদ্ধার করিতে তিনখানা 'ভিনোলিয়া সোপ' খরচ করিলেন, মাথার গরম দূর করিবার জন্য মাথায় দু বোতল 'কুন্তলীন' মালিশ করিতে হইয়াছিল, ইহার পর বোধ করি তাঁহার মাথা কিছু ঠাণ্ডা হইয়াছে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কমলকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, "ডাক্তাবের এই ঘটনার পরদিন পাব্লিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেন্টের ওভারসিয়ার মাথা ও ঘাড় উত্তমরূপে চাদর দিয়া ঢাকিযা আমার বাসার কাছ দিয়া যাইতেছিল, তখন বেলা আটটার বেশী হয় নাই ; আমি তাহাকে ডাকিয়া তামাক খাইতে বসাইলাম, দেখি বেচাবা মাথায় পাগড়ি 'ঙ' হইয়া ঘাড় উঁচু করিয়া বসিল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'তোমার মাথায় কি কোনরকম বেদনা হইয়াছে, না ঘাড়ে ফিক্ লাগিয়াছে ? ওরকম করিয়া চাদর জড়াইয়াছ কেন ?' ওভাবসিয়ার বলিল, 'মহাশয় দুঃখের কথা আর কি বলিব, বঙ্কু সাহা নামক একটা হাতুড়ে এই সহরে 'কুন্তল তৈল' নামে একটা তেল আবিষ্কার করিয়াছে। কাল রাত্রে তাহাই একটু মাথায় দিয়া শুইয়াছিলাম, মধ্যে মধ্যে আমার মাথাটা ঘোবে, ভাবিলাম, তেলটা বোধ হয় ভাল, সস্তাও বটে। তেলটি মাথায় মালিশ করিবার সময় আমার চাকর বলিল, 'ভারি আঠালো তেল'। আমার দুর্বুদ্ধি ! আমি

বলিলাম, 'আঠালো হোক, ভাল করে মালিশ কর।' সে মাথার কাছে আধ ঘন্টাটাক বসিয়া মালিশ করিল, আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম, সকাল বেলা উঠিয়া দেখি, বালিশটি মাথার সঙ্গে দিব্যি জোড়া লাগিয়া গিয়াছে, কষ্টে সৃষ্টে বিছানায় উঠিয়া বসিলাম, বালিশটিও যীশুখৃষ্টের ক্রুশ-কাষ্ঠের মত মাথার সঙ্গে আড় হইয়া বাধিয়া উঠিল। কি করি, অনেক বিবেচনার পর খোল হইতে বালিশটা খুলিয়া ফেলা হইল, কিন্তু ওয়াড় ত মহাশয় আর কিছুতে মাথা ছাড়িতে চায় না, বিস্তর টানাটানি করিয়া দেখা গিয়াছে, আর এ বেশে বাহিরই বা হই কি করিয়া ? অগত্যা ঘাড়ে মাথায় চাদরটা জড়াইয়া একবার সেই 'রাসকেলের' কাছে যাইতেছি, অবস্থাটা একবার তাহাকে দেখাইয়া আসি। এমনি রাগ হইতেছে, বেটাকে ঘা কত দিয়া আসি আর বলিয়া আসি যে যদি আমার মাথার এ আঠা না ছাড়াইয়া দেয় ত তার নামে ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা আনবো।'—ওভারসিয়ার চলিয়া গেল, কিন্তু বন্ধু সাহার যে রকম সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল, তাহাতে তাহাকে হাজির পাওয়া সহজ হইল না। ইহার দিন কয়েক পরে যখন তাহার 'কুন্তল তৈল' রূপী 'উদরাময়ের মহৌষধ' সেবন করিয়া দুইজন লোক মরিল, আর দুইজন সরকারী ডাক্তারখানায় আসিয়া মরণাপন্নভাবে তিন চারিদিন কাটাইয়া ডাক্তারের বিশেষ চেষ্টায় বাঁচিয়া উঠিল, তখন চারিদিকে একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল, তাহাকে arrest করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়ারেন্ট বাহির করিলেন। কিন্তু তাহার পূর্বেই যে সে কোথায় গা ঢাকা দিয়াছে, পুলিশের সাধ্য নাই যে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করে। তাহার অন্তর্দ্ধানের পর তাহার বাসা খানা-তল্লাসী করা হইয়াছিল, পাওয়া গিয়াছে কি জান ? গোটা কত কেরোসিনের বাক্স, একখানা ভাঙ্গা চৌকি, সরল জ্বর-চিকিৎসা, বিসূচিকা দর্পণ, বৈজ্ঞানিক সামগ্রী প্রস্তুতের সহজ উপায় প্রভৃতি কয়েকখানা পুঁথি, আর তাহার মহৌষধ কয়েক ডজন, এ সকল জিনিষ এখন ম্যাজিষ্ট্রেটের নাজিরের জিম্মায় আছে। এ সকল জিনিষ যখন লইয়া যাওয়া হয়, তখন তাহার তুলো বাহির করা ময়লা বালিশটার নীচে দুখানা পত্র পাওয়া গিয়াছে, পত্র দুখানা ভারি মজার, দেখিতে ইচ্ছা করত কাল একসময় ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে যাইও, হেডক্লার্কের কাছ হইতে লইয়া দেখাইব।"

পরদিন কোর্টে গিয়া পত্র দুখানি দেখিয়া আসিলাম, দেখিলাম একখান বহরমপুর হইতে আর একখান বর্দ্ধমান হইতে আসিয়াছে। আমি হেডক্লার্ককে বলিয়া একটা কাগজে পেন্সিল দিয়া পত্র দুখানা নকল করিয়া লইলাম। বর্দ্ধমানের পত্রখানি এইরূপ :

মার্নবরেষু।

মহাসয়, এই কলীজুগে হরেক রকম জুআচুরির কতা হামেসা স্রেবন করিআ আসিতেছি। কিন্তুক এরকম জুআচুরি এই প্রেথম দেখিলাম। অন্য জুআচোরেরা ধন লইয়া খ্যান্ত হয় কিন্তুক আপুনি প্রাণ পর্য্যান্তি নষ্টো করিবার উপক্রোম করিআছেন। আমার মাতা ঠাকুরানি কিছু কাল জাবদ পেটের পীড়েয় কষ্টো পাইতেছিলেন, বিধায় আপনার উদরাময়ের মহৌসদের বিজ্ঞাপন দ্রিষ্টে ঐ মহৌসদ আনাইআ তাহাকে সেবন করিতে দিই, একবার সেবনের পর পীড়ে উপসোম হওোয়া দুরের কথা তিনী ক্রেমেসা তো ভেদবমীতে অস্থির হইআ পড়িলেন, অগত্যে ঔসদ বন্দ করিআছি। যাহা হইবার হইআছে, মাতাঠাকুরানি পুব্বু পুণ্যি ফলে এ জাত্রা রইখ্যে পাইআছেন, আমার কাছে ফাকী দিআ যে দাম আদায় করিআছেন, পত্রোপাট তাহা ফেরত পাঠাইবেন, নচেৎ আমী বঙ্গোবাসী পত্রিকায় আপনার জুআচুরির কতা প্রেকাশ করিআ পত্রো লিখিবো জানিবেন, অধীক লেখা বাহুর্ল ইতি—

নিঃ শ্রী নিত্রানন্দ পরামাণিক।

দ্বিতীয় পত্রখানি আরো অদ্ভুত, ভাষা এত পরিশুদ্ধ না হইলেও ইহা অপেক্ষা তাহাতে অধিক রস আছে, তাহা এই :—

শ্রীযুক্ত বি, বি, সাহা এণ্ড কোং
মালদহ।

মহাশয়,

আমার পুত্র শ্রীমান্ কৃষ্ণকিশোর সান্যাল আপনার কুন্তল তৈলের বিজ্ঞাপন দেখিয়া ভ্যালুপেএবল ডাকে ঐ তৈল এক শিশি আনাইয়া লইয়াছিল, কিন্তু আমার নিকট একথা প্রকাশ করে নাই, শুনিয়াছি ঐ তৈল মালিশ করিলে কেশহীন স্থানে কেশোদ্গত হয়, এই কথা বিজ্ঞাপনে পাঠ করিয়াই সে এ কাজ করিয়াছে ; বাবাজীর মাথায় কেশ প্রচুর আছে, কিন্তু তাহার অষ্টাদশ বৎসর বয়স হইল, এ পর্যন্ত দাড়ি গোঁফের কোন চিহ্নমাত্র প্রকাশ না হওয়ায় বাবাজী কিঞ্চিৎ ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি দাড়ি গোঁফ লাভের আশায় মুখমণ্ডলে মালিশ করিবার অভিপ্রায়ে ঐ তৈল আনাইয়াছে, এবং মুখে একদিন মাত্র মালিশ করিয়াছে, ঐ এক দিনের মালিশেই তাহার মুখে চিবস্থায়ী কালো বার্নিসের পত্তন হইয়াছে, পিয়ার্সের সাবান দূরের কথা, নারিকেলের ছোবড়া ঘসিয়াও সে বার্নিস চটাইতে পারিলাম না : বাবাজীবন লোকসমাজে মুখ দেখাইতে অক্ষম হইয়া বাড়ীর ভিতরেই সর্বদা বাস করিতেছেন এবং কয়েকদিন হইতে স্কুল যাওয়া বন্ধ হইয়াছে। তৈলের খোসবাটিও অতি চমৎকার, বোধ করি ইহার মধ্যে কয়েক ফোঁটা করিয়া ছারপোকা, তেলাপোকা এবং ঝেলোপোকার আবক আছে, যাহা হউক কযেক দিন ধরিয়া মুখের উপর এসেন্স 'দেলখোস' লাগাইয়া গন্ধটাকে নষ্ট করা গিয়াছে, কিন্তু রঙ্গটি কিসে অন্তর্হিত হয় তাহা লিখিলে পরমোপকৃত হইব। দাম আর ফেবত চাই না। আপনার এ ব্যবসায় কতদিনের ? সাবধান হইযা ব্যবসায় চালাইবেন, নতুবা পেটেব দায়ে পিঠে বিস্তব খাইতে হইবে। ইতি—

শ্রী নবকিশোর সান্যাল।

আমি পত্র দুখানি নকল করিয়া লইয়া হেড্‌ক্লার্ককে ফেরত দিয়া বলিলাম, "মহাশয় বঙ্কু সাহার আসল বাড়ী কোথায় জানেন কি ?

হেডক্লার্ক বলিলেন, "শিবগঞ্জ, এখান হইতে এগাবো ক্রোশ হইবে, গঙ্গাতীববর্তী সমৃদ্ধ গ্রাম, ইচ্ছা করেন ত স্টীমারে যাইতে পারেন, আই, জি, এস্, এন্, কোম্পানীর 'তিলোত্তমা' স্টীমার আজ বেলা চারিটার সময় সিরাজগঞ্জ ছাড়িবে।"

আমি প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাহাব পরে পুলিশ সুপারিনটেন্‌ডেন্ট সাহেবেব সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেইদিনই স্টীমার যোগে সিরাজগঞ্জ যাত্রা করিলাম। সিরাজগঞ্জে বঙ্কু সাহার বিস্তর অনুসন্ধান করিলাম, সেখানে তাহার নিজের ঘরবাড়ী কিছুই নাই, লোকটা মামার বাডী থাকিত, কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে একেবারে নিরুদ্দেশ।

দীনেন্দ্রকুমার রায়।

অবগুণ্ঠিতা

(১)

মাতা অনেক চেষ্টা করিয়াও মেয়ের চরিত্র সংশোধন করিতে পারিলেন না।

দুই বৎসরের কন্যা শৈলবালাকে লইয়া জননী বামাসুন্দরী বিধবা হন। স্বামী রামজীবনের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না ; নগদ অর্থ ও যৎকিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি রাখিয়া তিনি পরলোকগমন করেন। সরিকী মোকদ্দমায় জমিটুকু রক্ষা করিতেই বামাসুন্দরীর নগদ অর্থগুলি নিঃশেষিত হইয়া যায়। সে আজ দশ বৎসরের কথা ; এক্ষণে এই যৎকিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ও কন্যা শৈলবালাই বিধবার একমাত্র সম্বল ; তিনি ভাবিয়াছিলেন, কন্যাটীকে গুণবতী করিয়া যোগ্য পাত্রে সমর্পণ করিতে পারিলেই তাঁহার সাধ ও কর্তব্য পূর্ণ হয়। কিন্তু মায়ের শত চেষ্টাতেও মেয়ে মায়ের মনের মত হইল না।

শৈলর গুণের চেয়ে রূপের ভাগই বেশী ছিল। নিভৃত কাননের এক প্রান্তে বন-মল্লিকার শুভ্র কুট্‌্মল যেমন আরণ্য প্রকৃতিকে খণ্ড সুষমায় অলঙ্কৃত করে, তাহারও অপূর্ব রূপরাশি বিধবার জীর্ণ কুটীর শত শোভা শোভিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শৈলর ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু তাহার এই অপরূপ রূপগর্বে সর্বদা স্ফীত হইয়া থাকিত। সে পৃথিবীতে আর কাহাকেও আপনাপেক্ষা সুন্দরী মনে করিত না, এবং গ্রাম্য বালিকা বিদ্যালয়ের সতীর্থা বালিকাবৃন্দের সহিত প্রতি কথায় তাহার নাসিকাদেশ ও ভ্রূযুগল কুঞ্চন পূর্বক যথাসাধ্য পরস্পর সন্নিহিত হইয়া এই ভাবই প্রকাশ করিত। শৈলর সঙ্গে কথায় কাহারও আঁটিয়া উঠিবার সাধ্য ছিল না। মা যাহা বলিতেন শৈল তাহার বিপরীত করিয়া বসিত ! বামাসুন্দরী একাকিনী গৃহকার্য করিয়া উঠিতে পারিতেন না। শৈল কোন দিন ভুলিয়াও তাঁহার সাহায্য করিত না। শৈলবালা আপনার ইচ্ছামত বিদ্যালয়ে "গুরুমার" নিকট "উপস্থিত" হইয়া বাকী সময়টুকু রায়েদের বকুলবাগানে, মুখুয্যেদের বাঁধা ঘাটে এবং ভুলু চাষীর ছোলার ক্ষেতে পুরুষোচিত ক্ষমতা ও গুণ বিস্তার করিয়া কাটাইয়া দিত। মাতা যদি কোন দিন শাসন করিতে গিয়া বলিতেন "শৈল, ষেটের বাছা তুই সোমত্ত মেয়ে হ'তে চল্লি, এখনও কি তোর বুদ্ধি সুদ্ধি হ'ল না ? অমন করে পথে ঘাটে বেড়ান আর ভাল দেখায় না। এত বড় মেয়ে হ'লি, খড়গাছি ভেঙ্গে দু'খান কত্তে শিখ্‌লি না, আজ বাদে কাল পরের ঘর করবি, শাশুড়ী ননদের লাথি ঝাঁটা খেতে খেতে তোর জিউ যাবে, লক্ষ্মী মা, বদ্‌তরিবৎগুলো ছাড়,"—তাহা হইলে সেদিন মেয়েকে পাড়া হইতে খুঁজিয়া আনিতে এবং ভাত খাওয়াইবার জন্য সাধিতে সাধিতে মাতাকে অনেকখানি বেগ পাইতে হইত।

(২)

পাত্র পাত্রীর রূপ গুণ থাক্ বা না থাক্,—বঙ্গদেশের অত্যুর্বর মৃত্তিকার গুণে তাহাদের বিবাহলতা সামাজিক "শুভঙ্করের" আর্যানুসারে যথাসময়ে পুষ্পবতী হইতে ভুলে না ! শৈলবালা "বিবাহ" অপেক্ষা বসু মহাশয়ের "নূতন পাঠ" এবং রায় মহাশয়েব "বকুল গাছটী কই" বেশী বুঝিত। কিন্তু "পাড়া পড়্সীর" চোখে যে ঘুম ছিল না, সেজন্য একঘরে হইবার ভয়ে বামাসুন্দরী শৈলর পাত্রান্বেষণে বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন না।

কে মনে করিয়াছিল, অসহায়া দরিদ্রা বিধবার এমন অপদার্থ কন্যাটীকে

গ্রাম্য-জমিদার-পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ স্বয়ং বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন ? আজকাল প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, পিতামাতা যখন উপাধিধারী পুত্রের বিবাহের জন্য পণ ও যৌতুকের লম্বা লম্বা ফর্দ প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত থাকেন, তখন পুত্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল পুস্তক-স্তূপ হইতে আপনার শান্ত নয়ন যুগল উৎসারিত করিয়া একটু সৌন্দর্যের জন্য ইতস্ততঃ প্রধাবিত করেন এবং ভাবী পত্নীর সহিত "সূর্যমুখী", "কমলমণি" অথবা "ভ্রমরের" সাদৃশ্য পাইতেই অধিকতর ব্যগ্র হন ! শৈলবালার সেই আধ-প্রস্ফুটিত সৌন্দর্যের অপূর্ব মাধুরী কোন্ শুভক্ষণে সত্যেন্দ্রকে মুগ্ধ করিয়াছিল, কুসুমেষু মকরকেতনই কেবলমাত্র তাহা অবগত আছেন !

জমিদার পুত্র জামাতা হইবেন. বামাসুন্দরী স্বপ্নেও ভাবেন নাই ! পাত্রপক্ষ প্রস্তাব করিবামাত্র তিনি সাদরে স্বীকৃতা হইলেন। সত্যেন্দ্রনাথের ন্যায় বিদ্বান্, ধনবান, সুরূপ, সচ্চরিত্র পাত্রে কন্যাদান করিয়া তাঁহার আবৈধব্যের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। যে রূপরাশি বন্য বকুলের অযত্নগ্রথিত মালিকাতেই শতগুণে বর্ধিত হইত, তাহা আজ পুষ্পরাগখচিত সুবর্ণহারে সংযুক্ত হইয়া স্বামিগৃহে প্রদ্যোদিত করিল !

(৩)

গ্রামের অর্ধেকখানি জায়গা জুড়িয়া জমিদার অন্নদাগোবিন্দের বৃহৎ ভবন। রাজধানীর ধনি-প্রাসাদের ন্যায় ইহা শ্বেত মর্মর-স্ফটিক খচিতা, সুরুচিসম্পন্ন (?) চিত্রাবলী পরিশোভিতা মনোহারিণী অট্টালিকা না হইলেও ইহাতে গ্রাম্য সৌন্দর্যের অভাব ছিল না ! পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই এই সৌন্দর্যের প্রধান উপাদান। "ড্রেনের গন্ধ ম্যালেরিয়া" ইহাব ত্রিসীমানায় পদার্পণ করিতে পারিত না। সুস্বচ্ছ সরোবর সমূহ, তাহার চতুষ্পার্শ খর্জুর তাল নারিকেল বৃক্ষ সমাচ্ছন্ন ; প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের পর সুদৃশ্য উপবন বিচিত্র বর্ণকুসুমে পরিশোভিত। মধ্যে মধ্যে আম্র, কাঁটাল, কদলী প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিটপি-শ্রেণী। কোথাও সুশীতল বাপী-সলিলে রাজহংস ক্রীড়া করিতেছে, কোথাও বা সুমন্দ মলয়ানিল-সঞ্চালিত রক্ত পদ্ম-থর !—এই কবিজনারাধ্যা প্রকৃতি সুষমার তুলনা কোথায় ?

নিদাঘ অপরাহ্ন শেষ প্রায়। অন্তপুর দীর্ঘিকার কালো জল ঘন বিন্যস্ত আম্র বৃক্ষের ছায়া-পাতে আরও কালো হইয়াছে। ইতস্ততঃ কমলিনী কোরক ফুটিয়া উঠিতেছে এমন সময়ে শৈলবালা নিস্তব্ধ সোপানাবলী অলঙ্কার ঝঙ্কারে মুখরিত করিয়া জলে নামিল। তাহার নিমজ্জমান দেহমৃণালে পূর্ণ পরিস্ফুট আসন-পদ্ম প্রাকৃতিক সরোজশোভাকে ম্লান করিয়া দিল ! সন্ধ্যায় প্রস্ফুট কমল দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে না ;—কেবল অদূরস্থিত সহকার শাখান্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া একটি ভাগ্যবান্ সুপুরুষ এই অনৈসর্গিক শোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন—তিনি সত্যেন্দ্রনাথ !

হঠাৎ শৈলর দৃষ্টি সেদিকে পড়িল। সত্যেন্দ্রকে দেখিয়া শৈল তাড়াতাড়ি আর্দ্র বস্ত্র মাথায় টানিয়া দিল, তাহার এত সাধের বৈকালিক খোপাটী জলে ভিজিয়া গেল। সত্যেন্দ্র আর আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিলেন না। হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিয়া বলিলেন, "ছি শৈল, অবেলায় ভিজা কাপড় মাথায় দিও না, অসুখ করবে। শীগ্‌গির ফেলে দেও।"

শৈল। তুমি দুষ্টুমী করিয়া আমায় লুকিয়ে দেখ্‌ছিলে কেন ?

সত্যেন্দ্র। তা না হ'লে তোমাকে দেখ্‌তে পাই কই ? তোমার খালি তিন হাত ঘোমটা দেখে আমার লাভ ?

শৈল। তবে এখন বিবি সাজ্‌তে হবে নাকি ?

সত্যেন্দ্র। আচ্ছা আর কোন দিন লুকিয়ে দেখ্‌ব না ; এখন ভিজে কাপড় ফেল।

ঘোমটা ফেলার কারণ যে শুধু লজ্জা, তাহা নহে ; শৈলর সেই বাল্য একগোঁয়ামী এখনও দূর হয় নাই। সে ঘোমটা ফেলা দূরে থাক, আরও খানিক লম্বা করিয়া টানিয়া বেশী জলে সরিয়া দাঁড়াইল।

সত্যেন্দ্র তখন আসল কথা পাড়িয়া বলিলেন, "শৈল, তোমায় শুধু লুকিয়ে দেখ্‌বার জন্য আসিনি, কালই আমি কলকাতায় যাচ্ছি ; ভট্টাচার্য মশায়ের কাছে গিয়াছিলাম, তিনি সন্ধ্যার সময় যাত্রা করিয়া থাকিতে বলিলেন। একটু পরেই চলে যাব—, তাই একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম ; তাতে এমন যদি অপরাধ হয়ে থাকে বল চলে যাচ্ছি।"

শৈলবালা এ সব কথায় নরম হইবার মেয়ে নয়, সে বলিল, "তা কলিকাতায় যাবে যাও না ; আমি ঘোম্‌টা না খুলিলে কি কল্‌কাতার রাস্তা খোলসা হচ্ছে না ?"

সত্যেন্দ্র হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। সহসা বুদ্ধি করিয়া বলিলেন "তা নয় গেলাম, কিন্তু পূজার ছুটীতে আস্‌বার সময় তোমার কি কি জিনিষ আন্‌তে হবে তা' না জান্‌লে কেমন করে যাই ?"

এবার ঠিক জায়গায় ঔষধ পড়িয়াছিল। শৈল নরম হইয়া বলিল "তুমি কি কি আন্‌বে আগে বল, তবে কাপড় ফেল্‌বো।"

সত্যেন্দ্র। তুমি যা চাইবে, তাই দিব। লক্ষ টাকার জিনিষ !

কথাটা হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়া সত্যেন্দ্র কিছু অপ্রস্তুত হইলেন। কিন্তু শৈলর কাছে কাজের কথা ফাঁক যাইবার সম্ভাবনা নাই ; সে কথাটী ধরিযা বলিল "আমিও তাই চাই—লক্ষ টাকার জিনিষ, তার কম হ'লে আর কোন দিন ঘোম্‌টা খুল্‌বো না। এই নাও—" বলিয়া শৈল মাথার কাপড় ফেলিয়া দিল !

সলিলসিক্ত হওয়ায় শৈলের রূপ আরও বাড়িয়াছিল ; কুন্তলীকৃত বেণী বহিয়া বারিবিন্দু কপোল ছড়াইয়া পড়িতেছিল, সত্যেন্দ্রনাথ সতৃষ্ণনয়নে এই অপূর্ব সৌন্দর্যসুধা পান করিতে করিতে "তবে আসি, শৈল"—বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

(৪)

পূজা আসিয়াছে। মেঘশূন্য নীল নির্ম্মল গগনে সুধাকর হাসিতেছে। দিক্‌বসনা প্রকৃতি পূর্ণাঙ্গী ; প্রতি পুষ্পে-পত্রে, প্রতি নদীকলতানে, প্রতি কোকিল কাকলীতে, প্রতি গিরি-নির্ঝরে তাহার অতুল সৌন্দর্য উছলিয়া পড়িতেছে !

গ্রাম্য পথ বহিয়া একখানি গোশকট চলিয়াছে। গাড়োয়ান একবার গরুর লেজগাছি মলিয়া দিয়া "মর, মর এদিকে" বলিতেছে ; কখনও হস্তস্থিত চর্ম্মরজ্জুখানির সহিত গো-বেচারীর পৃষ্ঠস্থিত চর্ম্মের বল পরীক্ষা করিতেছে ! ভিতরে একটি যুবক আরোহী। তাঁহার মলিনতাক্লিষ্ট মুখমণ্ডল দেখিয়া বুঝা যায় কোন বিষাদপূর্ণ চিন্তা তাঁহাকে এই শারদীয় প্রকৃতির সুখ-উপভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। যুবক আপনার পকেট হইতে একখানি পঠিত পত্র বাহির করিয়া পুনরায় পড়িতে লাগিলেন :—

"প্রিয়তম !

তোমার পত্রে জানিলাম, তুমি শীঘ্রই বাড়ী আসিতেছ। সেইদিন পুকুরের ধারে ঘোমটা

ফেলার প্রতিজ্ঞাটী মনে আছে ত ? সেইটী স্মরণ করিয়া দেওয়ার জন্যই এই পত্র লিখিলাম ! লক্ষ টাকার জিনিষ ভুলো না যেন, তাহা হইলে তোমার সঙ্গে আড়ি। ইতি

তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী

শৈল।

পত্র পড়িয়া সত্যেন্দ্রনাথ আরও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন ! কি কুক্ষণে তিনি একটি বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন"—এই নীতি বাক্যের তাৎপর্য মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছেন ! এবার কলিকাতা গিয়া পড়াশুনাতেও বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে। পূজায় বাড়ী আসিবার সময় কলিকাতা বাজারের অর্ধেক দ্রব্য তিনি পোর্টমেণ্ট-।।ৎ করিয়াছেন, তথাপি প্রতিশ্রুতির পক্ষে যথেষ্ট হইল না মনে করিয়া চিন্তিত হইতেছেন।

দেখিতে দেখিতে গাড়ী জমিদার মহাশয়ের সিংহদ্বারে আসিয়া লাগিল। জিনিষপত্র তোলার ধূম, ডাক হাঁক্, হৈ চৈ পড়িয়া গেল। পিতা মাতাব স্নেহাশীর্বাদ-সম্ভাষণ, অনুচব ভৃত্যের আদর আপ্যায়িতের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বাড়ী আসিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে সুখ নাই।

(৫)

এক হাত ঘোমটা টানিয়া শৈলবালা সত্যেন্দ্রের শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিল। সত্যেন্দ্র একখানি শোফায় ঠেস্ দিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিলেন। শৈলকে দেখিযা বলিলেন "শৈল ভাল আছ ত ?"

শৈল। বিধাতা যেমন রেখেছেন। শৈল কিন্তু ওসব বাজে কথায় ভুলছে না, আমার জিনিষ কোথায় ?

সত্যেন্দ্র। ঘোমটা না খুল্‌লে দিব না।

শৈল। না দিলে ঘোমটাও খুল্‌বো না।

সত্যেন্দ্র একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া পোর্টমেণ্টের ভিতর হইতে একে একে আয়না, চিরুনী, সাডী, বডি প্রভৃতি শৈলের পদপ্রান্তে রাখিতে রাখিতে বলিলেন "দেখ দেখি শৈল, এবার আরবারের চেয়ে কত বেশী জিনিষ এনেছি ; এখন "দেহি পদ পল্লবমুদারম্" !

শৈল। তা "মানভঞ্জনের" পালাই গাও আর "হনুমানের বস্ত্রহরণের" পালাই গাও, আমার জিনিষ চাই-ই। এই বুঝি তোমার লক্ষ টাকার জিনিষ ! আয়না, চিরুনী আর বুঝি কেহ কোন দিন চক্ষে দেখে নাই। অত টাকার কথা দূরে থাক্—একটা নূতন জিনিষই বা কই ?

সত্যেন্দ্র যেন অকূল সাগরে তীর পাইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে চিন্তার কৃষ্ণ ছায়া অপসারিত হইল—বলিলেন "আচ্ছা, তার জন্য কি ? এবার তোমার জন্য নূতন জিনিষও এনেছি, এখন খুসী হবে তো ?" তারপর আর একটি বাক্স হইতে দুই শিশি "কুন্তলীন" ও এক শিশি "দেলখোস" বাহির করিয়া শৈলর হাতে দিয়া বলিলেন "দেখ কেমন নূতন জিনিষ ; আয়না, চিরুনীই যেন চক্ষে দেখিয়াছ, এমন সুন্দর সুগন্ধি তেল তো আর চোখে দেখা কপালে ঘটে নাই। এখন ঘোমটা খুলিয়া একটু মাথায় দাও দেখি, তা হ'লে তোমার গরম মেজাজটা সুদ্ধ নরম হবে।"

শৈল শিশিগুলি হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া রাগে তাম্বুলরসরাগরঞ্জিত অধর দুইটি ফুলাইয়া বলিল—"ছাই তেল, ছেলেভুলাতে এসেছেন। আমি এ চাই না"—বলিয়া ঘরের মেজেয় শিশি তিনটি সজোরে নিক্ষেপ করিল। শিশি চূর্ণ হইয়া তৈলগুলি সুমসৃণ মেজে

বহিয়া ঢেউ খেলিতে লাগিল!

আজ এই প্রথম সত্যেন্দ্র শৈলর ব্যবহারে মর্মাহত হইলেন। তিনি আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া শোফায় আসিয়া বসিলেন। শৈলও ক্রোধভরে নিজ পালঙ্কে গিয়া শয়ন করিল।

এতক্ষণ পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্র পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছিল; তাহার মূর্চ্ছাতুর মৃদুকররাশি উন্মুক্ত দ্বার ও বাতায়ন দিয়া তৈল-নিষিক্ত মেজেয় পড়িয়া অস্পষ্ট চন্দ্রমণ্ডল সৃজন করিতেছিল! সত্যেন্দ্র বসিয়া বসিয়া এই শোভন শোভা দেখিতেছিলেন। শৈল ইতঃমধ্যে রাগে ফুলিয়া ফুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু তখনও সে দুই হাতে ঘোমটা ধরিয়া আছে, পাছে "চুরি করে চায়"; এ রহস্য দেখিয়া সত্যেন্দ্রের মনে পড়িতেছিল :—

"আমার হৃদয় প্রাণ
সকলি করেছি দান,
কেবল সরমখানি রেখেছি!
চাহিয়া নিজের পানে
নিশিদিন সাবধানে
সযতনে আপনারে ঢেকেছি।"

—ভাবিতে ভাবিতে সত্যেন্দ্রের চক্ষু দুটি মুদিয়া আসিল, তিনি শোফাতেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন!

(৬)

গভীর রজনী। হঠাৎ একটি গুরুতর পতন শব্দে সত্যেন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ততক্ষণ চন্দ্রদেব অস্ত গিয়াছেন, প্রদীপও নিবিয়া গিয়াছে। সত্যেন্দ্র অনুভব করিলেন, ঘরের মধ্যে কি যেন নড়াচড়া করিতেছে। তিনি ভয়চকিতচিত্তে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আলো জ্বালিয়া দেখিলেন একটি অপরিচিত লোক ঘরের মেজেয় পড়িয়া আছে! শিশির চূর্ণিত এক খণ্ড কাচ তাহার দক্ষিণ পাঁজরায় দারুণ বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে আরও দুই চারিখানি কাচ ফুটিয়াছে। রক্তে তাহার সর্বাঙ্গ মাখিয়া গিয়াছে। উঠিবার সামর্থ্য পর্যন্ত নাই। তাহার নিকটে একটি বৃহৎ বোচ্‌কা পড়িয়াছিল।

সত্যেন্দ্রের চীৎকারে বাড়ীর ভৃত্যেরা দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে ধৃত করিল! লোকটী কেবল কাঁদিতে লাগিল। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ ও অনুসন্ধানের পর জানা গেল,—সে একটি পাকা চোর। গভীর নিশীথে সত্যেন্দ্রনাথের গৃহদ্বার উন্মুক্ত থাকায় সুবিধা পাইয়া কোন ক্রমে প্রবেশ লাভ করে। তাহার সঙ্গে সুষুপ্তিকর ঔষধ ছিল, তাহার আঘ্রাণ দ্বারা শৈলকে গভীর নিদ্রিত করিয়া তাহার গাত্রস্থিত যাবতীয় বহুমূল্য অলঙ্কার এবং গৃহজাত অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি যাহা পাইয়াছিল চুরি করিতেছিল। ঘরের খানিক মেজে যে তৈলপিচ্ছিল ছিল, সে তাহা জানিত না! হঠাৎ পা দেওয়ায় পড়িয়া গিয়া এ দুর্দ্দশা। তাহার নিকট সেই বোচকাটীতে শৈলর সমস্ত অলঙ্কার ও অপহৃত দ্রব্যাদি পাওয়া গেল। তাহাকে তৎক্ষণাৎ পুলিশে দেওয়া হইল!

পরদিন সত্যেন্দ্র শৈলকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিলেন "কি শৈল, লক্ষ টাকার জিনিষটা বুঝলে ত কেমন? এখন খুসী হয়েছ!"

ইতঃপূর্বে শৈল তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। সে হাসিতে হাসিতে বলিল "হ্যাঁ, ভাগ্যিস

তেলটা এনেছিলে, তাই আমার লাখ টাকার গহনা পত্রগুলো পেলাম। এসব দেবতার কাণ্ড।”

সত্যেন্দ্র। খবরদার, আর কোন দিন ঘোমটা দিও না যেন!

শৈল। খবরদার, আজই আমার জন্য এক ডজন ঐ তেল আনতে পাঠান হয় যেন!

বলাবাহুল্য উভয়েই উভয়ের এই সাবধান-বাক্য পালন করিয়াছিল।

সুরেশচন্দ্র সাহা।

রঙ্গিয়া

(১)

গ্রামের একটি নিভৃত প্রান্তে ক্ষুদ্র বাগানবাটী আমাদের বাসস্থান। আমাদের একখানি ক্ষুদ্র একতালা বাড়ী; তাহার সম্মুখে একটি পুষ্করিণী এবং সেই পুষ্করিণীর চারিদিকে সুপারি, নারিকেল এবং আম গাছের ঘন শ্রেণী। বাগানের একটি ধার পরিষ্কার করিয়া সেখানে দেশী ও বিদেশী ফুলের গাছ লাগাইয়াছিলাম এবং মধ্যস্থলে একটি লতাগৃহই আমার চিন্তামন্দির। অন্ন সংস্থানের চেষ্টায় ঘুরিবার আবশ্যক ছিল না; পিতার কোম্পানীর কাগজের সুদেই চলিয়া যাইত। আমি আমার জীবনের অখণ্ড অবসর অধ্যয়ন এবং চিন্তাতে কাটাইয়া দিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। প্রতিদিন কাব্যগ্রন্থ লইয়া আমার পুষ্পকুঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করিতাম। কল্পনা ধীরে ধীরে আসিয়া আমার মনকে বিশ্বরাজ্যের কত অনাবিষ্কৃত অমরাপুরীতে লইয়া যাইত! কত শকুন্তলা, কত বসন্তসেনা, কত রত্নাবলী, কত মহাশ্বেতা, কত জুলিয়েট্, কত মিরাণ্ডা আমার সেই ক্ষুদ্র নিকুঞ্জ গৃহখানিব চারিদিকে উঁকি দিত। প্রাণ ভবিয়া কাব্যসুধা পান করিতে করিতে আত্মহারা হইতাম। মেঘমুক্ত আকাশের মধ্য দিয়া পাখী উড়িয়া যাইত—গ্রাম্য পথ দিয়া পথিক সুখ দুঃখের গান গাহিয়া চলিত; আমার মন চারিদিকের কোলাহল ও ব্যস্ততা উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন এক অজানিত দেশে স্বপ্নরাজ্য রচনা করিত!

এমনি একটি মধুর ললিতরাগের ধ্বনি লইয়া জীবনের নবঊষা জাগরিত হইল। বিশ্বের নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্য-মাধুরী আমার জীবনপ্রভাতে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

তারপর সহসা একদিন চাহিয়া দেখিলাম আমার হৃদয়-কাননের শত সহস্র কুসুম কাহার নূপুর শব্দে যেন বিকশিত হইয়াছে—কাহার মধুর স্পর্শে যেন স্তবকে স্তবকে অশোক কুরুবক নয়ন মেলিয়াছে।

সেদিন সমস্ত বিশ্ব বসন্তের পুলক কম্পনে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। মধুকণ্ঠ কোকিল সেদিন মধুর কূজন করিতেছিল; সমস্ত প্রকৃতি কোন এক অজ্ঞাত আনন্দে যেন নাচিয়া উঠিতেছিল। এমনি একটি সুমধুর স্মৃতিজড়িত নিশীথে সুকুমারী আসিয়া আমার হৃদয়ে আসন স্থাপন করিল। জ্যোৎস্না প্লাবনে সমস্ত জগৎ ভাসিয়া যাইতেছিল—নিশীথের সুপ্ত বক্ষ বাসরানন্দে আন্দোলিত হইতেছিল—এমনি সময়ে চারি চক্ষুর মিলন হইল।

হায়, আজ কত দিন পরে জীবনের সে পুণ্য মুহূর্তের কথা মনে পড়িতেছে! সত্যই কি সেদিন একটি ব্রীড়াবনতা বালিকার কোমল অঙ্গুলি স্পর্শে আমার জীবন তন্ত্রীর প্রতি আশা, প্রতি ভরসা মোহন ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিয়াছিল!

কি জানি কি হইয়াছিল! তবুও যেন মনে হয় কোন সুখ যেন অতীতের সহিত জড়িত

হইয়া রহিয়াছে। তাই আজ জীবন-সন্ধ্যায় সেই কনককিরণময়ী উষার কথা ভাবিতেছি। কতদিন চলিয়া গিয়াছে ; যে ভাবে জীবন আরম্ভ করিয়াছিলাম সে ভাবে তাহা শেষ করিতে পারিলাম না। মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল আলোক নিবিড় ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন হইয়াছে ; শুধু মাঝে মাঝে সেই অন্ধকার অপসারণ করিয়া আমার সেই হাস্যময়ী স্মৃতি আসিয়া উপস্থিত হয়।

আমাদের হৃদয়ে তখন বাসন্তীরাগ-রঞ্জিত প্রগাঢ় প্রেমাকাঙ্ক্ষা অঙ্কিত ছিল। প্রাণের মধ্যে তখন নবীন সূর্যের সুখস্পর্শ আলোক অনুভব করিতাম। কি এক অপূর্ব মোহে আমরা সমস্ত বিশ্বনূতন সৌন্দর্যে ভূষিত দেখিতাম। তখন বুঝি বনদেবী আমাদেরই জন্য চম্পক সুগন্ধ বহন করিত। জীবনের সেই অভিনব উষা এমনি সুখে আরম্ভ হইল। কত সুন্দর পুষ্প বৃক্ষের সহিত আমাদের স্নেহ স্মৃতি জড়িত হইয়া রহিল—কত শত উপল খণ্ডে আমার সুকুমাবীর নাম অঙ্কিত রহিল।

(২)

আমাদেব এ আনন্দের সঙ্গিনী ছিল রঙ্গিয়া। ক্ষুদ্র বালিকা তাহার হৃদয়েব অপরিসীম স্নেহরাশি লইয়া সুকুমারীর পিতৃগৃহ হইতে তাহাব সঙ্গে আসিয়াছিল। উত্তর পশ্চিমের কঙ্করময় ভূভাগে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহার হৃদয় বঙ্গদেশে সুলভ কোমলতায় পূর্ণ ছিল। পিতৃ মাতৃহীন রঙ্গিয়া বাল্যকাল হইতেই সুকুমারীব সঙ্গিনী। সুকুমারীর পিতা মাতা রঙ্গিয়াকে কন্যা নির্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন ; উভযে এক বৃন্তে দুইটি অপরিস্ফুট কুসুম কোরকের ন্যায় শোভা পাইয়াছিল।

জন্ম জন্মান্তরে বিস্মৃতপ্রায় কোনও স্নেহসূত্রে তাহাদের হৃদয় গাঁথা হইল কি না জানি না, কিন্তু যে অপরিসীম স্নেহ, অন্তরের যে দেবভোগ্য সৌখ্য সম্বন্ধে তাহারা পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল তাহা এ পৃথিবীর নহে স্বর্গের। বঙ্গিয়া সুকুমারীর হাসি মুখ দেখিলে প্রফুল্লমুখী হইত, আর তাহার মুখে একটু বিষাদ কালিমা দেখিলেই মলিনা হইত। আমাদের মিলনানন্দের মধ্যে সে চঞ্চলা গিরি-নির্ঝরিণীর ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া বেড়াইত। প্রতিদিন সুকুমারীর কেশরাশি "কুন্তলীনে" রঞ্জিত করিয়া দিত, তাহা চূর্ণ কুন্তল " দেলখোসে" সুবাসিত করিত। আমাদের মান অভিমানের মধ্যে সে অযাচিতভাবে প্রণয়দূতীর অভিনয় কবিত ; সুকুমারীকে মনের মত সাজাইত। আড়াল হইতে আমাদের মিলন দেখিত। কিন্তু তাহার এ সকল বাহ্যিক স্নেহ পরিচয় ব্যতীত তাহার হৃদয়ের অন্তঃপুরে নিভৃতে যে সহস্র সহস্র পুষ্প প্রতিদিন মধুর আনন্দ-কিরণপাতে ফুটিয়া উঠিত তাহা লোক চক্ষুর অগোচর হইলেও দুর্লভ এবং আদরণীয়।

এইরূপে আমাদের জীবন কাটিতে লাগিল। তখন ভাবিতাম এ সংসার বুঝি কেবল সুখেরই স্থান, এখানে বুঝি কেবল প্রণয়ের অস্ফুট ও কোমল কপোত কূজন, এখানে বুঝি কেবল অসীম সৌন্দর্য এবং বিশ্বের অনন্তকালব্যাপী সঙ্গীতই নিরন্তর বাজিতেছে। তখন জানিতাম না যে পৃথিবীর এ মিলনের মধ্যে কেবল একটা করুণ বিরহবেদনা জাগিতেছে, তখন জানিতাম না যে অনন্ত জীবন সঙ্গীতের মধ্যে কেবল মরণ-ঝঙ্কারই বিরাজ করিতেছে। অবশেষে এমন দিন আসিল যেদিন জীবনের সে ভুল বুঝিলাম।

এক শারদীয়া পূর্ণিমা রজনীতে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র "জলিবোট" খানি সরোবরে ভাসাইয়া দিলাম। শৈবাল বিকীর্ণ সরোবরতলে জ্যোৎস্না ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, দাঁড়ের শব্দে সহসা জাগরিত হইল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় আরোহণ করিয়া চঞ্চল বালিকার মত

সরোবর বক্ষে বিচরণ করিতে লাগিল। আমি দাঁড় টানিয়া বোটখানিকে মধ্য সরোবরে লইয়া গেলাম। দাঁড় ছাড়িয়া দিয়া বসিলাম। সুকুমারী আমার বক্ষে মাথা রাখিয়া জ্যোৎস্না মধুর গগন পানে তাকাইয়া রহিল। মন্দান্দোলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা আমাদের বোটে আঘাত করিতে লাগিল। আমার বক্ষে সুকুমারীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখ তাহার উপর চন্দ্রকিরণ ক্রীড়া করিতেছিল, দূরে পাপিয়ার নিশীথ সঙ্গীত মিশাইয়া যাইতেছিল। তীরে কুসুমকুঞ্জে আলো ও ছায়ার শুভ সম্মিলন। সেই আলো সেই ছায়া এবং তরঙ্গমালার সেই অস্ফুট ধ্বনিতে সেইখানে এক অপূর্ব কাব্যের সমাবেশ হইয়াছিল।

ধীরে ধীরে সুকুমারী মাথা তুলিয়া বলিল—"প্রিয়তম, আমরা আমাদের জীবন-তরণী কি এমনি মধুর জ্যোৎস্না মধ্যে বাহিয়া লইয়া যাইতে পারিব ?" আমার মনে কি হইতেছিল ? আমি দেখিতেছিলাম এমন মধুর সংসার, এমন মধুর রজনী ঐ দূরাবলম্বী কালো একখানি মেঘ উহা কি এক মুহূর্তে এই জ্যোৎস্না এই আলো নিভাইয়া দিতে পারে না ? সুকুমারী ধীরে ধীরে আবার বলিল—"প্রিয়তম, আমার কি ইচ্ছা হয় বলিব ?" আমি তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম। সুকুমারী বলি ল—"আমার ইচ্ছা হয় এই মধুর দৃশ্যে এমনি সময় এমনি করিয়া তোমার বক্ষে মাথা বাখিয়া মরি।" একটা শোকপূর্ণ হাহারব গগন বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া গেল। আমার চক্ষে জল আসিল! সুকুমারী আমার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল—"ছি প্রিয়তম, কাঁদিও না ; তোমায় ছাড়িয়া যাইতে কি আমার ইচ্ছা হয় ?"

(৩)

কিন্তু জানি না সেই রাত্রি হইতেই আমার মন যেন কেমন উদাস হইল। সুকুমারীর প্রতি হাসি প্রতি কথাতে যেন একটা বিষাদের সুর অনুভব কবিতাম। মনে হইত আমার হৃদয়ের একটা স্থান যেন অপূর্ণ হইতে চলিয়াছে। সুকুমারীকে সর্বদা চক্ষে চক্ষে বাখিতাম। সুকুমারীও আমার মনের দুশ্চিন্তা দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিত ; কিন্তু সেই পূর্ণিমা রজনীতে আমার হৃদয়ে যে কালিমা পড়িয়াছিল তাহা আর কিছুতেই অপসৃত হইল না।

সুখের অবসরে দুঃখের চিন্তা করিতে করিতে পৃথিবীর উপর দিয়া একটি বৎসরের তরঙ্গ চলিয়া গেল। কোন সুখসুপ্ত হৃদয়ে বিষাদের জাগরণ আসিল, কোন পুষ্পময় উপবন দগ্ধ হইল, কোন মাধবী লতিকা ছিন্ন হইল, তাহা দেখিবার জন্য বর্ষ-তবঙ্গ থামিল না ; ধীর গতিতে অনন্ত কাল-সাগরে গিয়া মিশিল।

বর্ষশেষে আমি চাহিয়া দেখিলাম আমারও মধুস্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে। পূর্ণ বরষার যৌবন প্লাবন শেষ না হইতে হইতে সুকুমারী শয্যা শায়িনী হইল, সুখস্নাত ধরণীর বক্ষে শরতের প্রস্ফুট আলোক না পড়িতে পড়িতে আমার সোনার পিঞ্জরের সোনার পাখী সোনার দেশে উড়িয়া গেল।

জীবনের মাধুরী লইয়া সুকুমারী চলিয়া গেল। বিবাহ বাসরে যে মূর্তি লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল সেই পুষ্পময়ী মূর্তি লইয়াই চলিয়া গেল। মৃত্যুর কালিমা তাহার বদন স্পর্শ করিতে পারে নাই। সেই মুখ অম্লান, উজ্জ্বল,—এই পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার সময়ও একবার আমার দিকে ফিরাইয়াছিল। যৌবনের পরিপূর্ণ বসন্তে—জীবন বল্লরীর একটি পল্লব, একটি কুসুম না ঝরিতে ঝরিতে ইহ জগৎ হইতে প্রিয়তমা অপসৃত হইল।

সুকুমারী গেল। এই অনন্ত জগৎ, তাহার মধ্যে আমি একা। এই অনন্ত আলোকময়ী ধরণী ; আমার চক্ষে তাহা অন্ধকার। ভাবিয়াছিলাম সুকুমারী গেলে আর বাঁচিব না। তবু

হায়, বাঁচিতে হইল—তবু হায়, সংসারের শত শত ক্ষুদ্র কাজের মধ্যে শান্তি অন্বেষণ করিতে হইল।

ভগ্ন হৃদয় রঙ্গিয়া সুকুমারীর শয্যাগৃহ তেমনি করিয়া সাজাইয়া রাখিল। সুকুমারীর প্রিয় জিনিসগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিল ; তাহার বড় আদরের "কুন্তলীন" ও "দেলখোস" তাহার সজ্জা টেবিলের উপর তেমনি ভাবে স্থাপন করিল। আর যে বাতায়ন পাশে বসিয়া উভয়ে উভয়ের হৃদয়ের কথা বিনিময় করিত, সেই বাতায়ন তলে ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

আমি বহুব্যয়ে শয়নগৃহের সম্মুখস্থ উদ্যানে সুকুমারীর একটি মর্মর মণ্ডিত সমাধি স্তম্ভ স্থাপন করিলাম। রঙ্গিয়া তাহার চারিদিকে পুষ্প বৃক্ষ রোপণ করিল।

আমি আমার দাব-দগ্ধ-হৃদয় লইয়া এই বিজনগৃহে কিছুতেই বাস করিতে পারিলাম না। আমার শূন্য পুরীর মধ্যে একটা বিষাদ সঙ্গীত অবিরত ধ্বনিত হইত। সুকুমারীর সমাধিস্তম্ভ কেবল জীবনের একটি পুণ্য অবসরের কথা স্মরণ করাইয়া দিত। যেদিকে চাহিতাম সেই দিকেই কেবল বিরহের একটা হাহারব শুনিতে পাইতাম। অনন্ত কালের গতি কেবল অশ্রান্তভাবে চলিতে লাগিল। আবার সেই শরতের প্রথম প্রভাত আসিল। শতদল শ্রী, গ্লানিধৌতা ধরণী আবার শারদ প্রভাতের অরুণ কিরণে হাসিতে লাগিল। সেকালে নিকুঞ্জ, শস্য শীর্ষ, তটিনীর বক্ষ এবং বিহগকণ্ঠ সে হাস্য-হিল্লোলে নাচিয়া উঠিল। আমি এই নব শোভাময়ী ধরণীর শোভার মধ্যে আমার সকল দৈন্য, সকল ক্লেশ নিমগ্ন করিবার আশায় বিদেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলাম।

(৪)

অনেক স্থান ভ্রমণ করিলাম, অনেক স্থানে শান্তি অন্বেষণ করিলাম ; কোথাও পাইলাম না। কোথায় সেই হিমালয়ের অভ্রবেদী শিখর, কোথায় সেই শ্যামসীমা সাগরবেলা, কোথায় সেই মোগলের গৌরব ও পতনের ইতিহাস ভূমি, কোথায় রাজপুত বীরের কীর্তিস্থল ! কোথাও শান্তি পাইলাম না। আবার দেশে ফিরিলাম।

গভীর নিশীথে বাসগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। সমস্ত প্রকৃতি যেন অর্দ্ধ ছায়া এবং অর্দ্ধ আলোকে একখানি অপূর্ব চিত্রপটের মত দেখাইতেছিল। আমি ধীরে ধীরে সুকুমারীর সমাধিস্তম্ভের দিকে অগ্রসব হইলাম। ভাবিলাম, এই জীর্ণ হৃদয়খানি একবার সুকুমারীর সমাধি পাশে স্থাপন করিয়া শীতল হইব।

ধীর পাদবিক্ষেপে চলিলাম। অদূরে পুষ্পবিতানে সুকুমারীর সমাধিস্তম্ভ ; পাশে চন্দ্রালোকে অসংখ্য ছায়ার সম্পাত—আর সেই মর্মর মণ্ডিত স্তম্ভ ধারণ করিয়া কে ঐ আলুলায়িতকেশা রমণীমূর্তি গাহিয়া উঠিল :—

"সইরে না মিটিল পিয়াস হামারি।"

স্বরের প্রতি লহরীতে যেন কোন অজ্ঞাত হৃদয়বেদনার ব্যাকুল মূর্চ্ছনা কাঁদিয়া কাঁদিয়া সেই নিশীথ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল।

আমি মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সেই সঙ্গীত শুনিতে লাগিলাম। কে গাহিতে ছিল তাহা দেখিবার অবসর হয় নাই। সঙ্গীত থামিলে গায়িকার মুখের পানে অস্ফুট চন্দ্রালোকে চাহিলাম ; দেখিলাম সমাধিস্তম্ভ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রঙ্গিয়া।

রঙ্গিয়ার নাম ধরিয়া ডাকিলাম ; রঙ্গিয়া উত্তর না দিয়া আকাশে দুইটি চক্ষু স্থাপন করিয়া

ভাস্কর-খোদিতা পাষাণময়ী মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। রঙ্গিয়া আবার ডাকিলাম—রঙ্গিয়া আবার গাহিয়া উঠিল—"সইরে না মিটিল পিয়াস হামারি।"

বালিকা থামিল! গগন প্রান্তে চক্ষু তেমনিভাবে স্থাপন করিয়া ভাস্কর-খোদিতা পাষাণময়ী মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি বালিকার ভাব কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমাদের পুরাতন ভৃত্যকে ডাকিলাম। বিষণ্ণ বৃদ্ধ আসিয়া বলিল—"রঙ্গিয়া কয়েকদিন পাগল হইয়া গিয়াছে।"

ভৃত্যের কথা শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। আমি সেই আকাশনিবদ্ধ-দৃষ্টি বালিকার মুখে এক মহিমা মণ্ডিত দেবীত্ব দেখিলাম। সেই নিস্তব্ধ রজনীতে, সেই অর্দ্ধস্ফুট আলোকে, সেই মন্দাদোলিত পুষ্পকুঞ্জ পাশে আমি মূর্তিমতী বিরহব্যথা দেখিলাম। স্পর্ধা করিয়াছিলাম আমার মত বুঝি কেহ সুকুমারীকে ভালবাসিতে পারে নাই; আমার সেই গর্ব দূর করিবার জন্য বুঝি রঙ্গিয়া মনুষ্য জীবনের অমূল্যনিধি যে জ্ঞানরত্ন তাহা অন্তর হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া প্রিয়জনকে উপহার দিল। প্রেমের এই আত্ম-বলিদান দেখিয়া আমার হৃদয় বিস্ময় ও প্রীতিতে উচ্ছ্বসিত হইল; আমি ভক্তিপূর্ণ অন্তরে সেই বালিকাকে প্রণাম করিলাম।

*   *   *   *

আজও এই শূন্যপুরীর মধ্যে আমরা দুইটি প্রাণী বাস করিতেছি। প্রভাতে, নিশীথে, প্রদোষে রঙ্গিয়ার কণ্ঠে এবং আমার অন্তরে সেই এক বিরহ রাগিণী বাজিতেছে "সইরে না মিটিল পিয়াস হামারি।"

কুলদাকান্ত ঘোষ

শোভা

অনেক দিন হইল সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল; বিজ্ঞাপনটী এই—

"গত বৈশাখ মাসে রামচন্দ্রপুর গ্রাম হইতে একটি বালিকা হারাইয়াছে। বালিকার নাম শোভা, বয়স দশ বৎসর, রঙ ফরসা; গঠন কিছু কৃশ; বালিকার বাম বাহুতে কাটিয়া যাওয়ার একটি ক্ষুদ্র দাগ আছে; বাঙ্গালা লেখাপড়া কিছু কিছু জানে। যিনি এই বালিকাটীকে অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন, তিনি পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার পাইবেন। নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকটে সংবাদ দিতে হইবে।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র—রামচন্দ্রপুর"

প্রথম বিজ্ঞাপনের তিন বৎসর পরে, আবার বিজ্ঞাপন দেখা গেল,—

"অদ্য তিন বৎসর হইল রামচন্দ্রপুর হইতে শোভা নাম্নী একটি বালিকা হারাইয়া যায়। তদ্বিষয়ে—সালের—মাসের—তারিখের কাগজে, বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপন প্রকাশের কিছুদিন পরে, সেই বালিকার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, একখানি ডাকের পত্র প্রাপ্ত হন; পত্রে লেখা ছিল 'জগদীশ্বরের কৃপায় আপনার ভগিনী অতি নিরাপদ স্থানে আছেন। এখন আপনাকে কিছু জানাইতে পারিলাম না, কিছুদিন পরে সমস্ত জানিতে পারিবেন; ব্যস্ত হইবেন না,' যাহা হউক আমরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বালিকার অন্য কোনও সংবাদ পাই নাই; বিনীত নিবেদন লেখক যিনিই হউন, অনুগ্রহপূর্বক বালিকার সর্বশেষ সংবাদ দিবেন।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র—নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।"

উপরোক্ত বিজ্ঞাপন বাহির হইবার দুই সপ্তাহ পরে, সংবাদপত্রে আবার বিজ্ঞাপন দেখা গেল,—

"মাননীয় শচিন্দ্রবাবু, কালিকাপুরের জমিদারদিগের বাটীতে অনুসন্ধান করিলে আপনার বিজ্ঞাপিত রামচন্দ্রপুরের হারানো বালিকা সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।"

এই বেনামী বিজ্ঞাপনে অনেকেই আশ্চর্যান্বিত হইল। পরে যাহা হইল তাহা ক্রমে বলিতেছি।

(২)

এক দিন সন্ধ্যার সময় দুইটি নবীন যুবা কালিকাপুর জমিদার বাড়ীর সদর দেউড়ীতে আসিয়া বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ জানাইলেন। দরওয়ান তাঁহাদের কার্ড লইয়া বাবুর কাছে গমন করিল এবং কিঞ্চিৎ পরে আসিয়া যুবকদ্বয়কে লইয়া জমিদার বাবুর পড়িবার ঘরে উপস্থিত হইল। জমিদার বাবু একখানি চেয়ারে বসিয়া 'বেঙ্গলি' কাগজ পড়িতেছিলেন, দরওয়ান তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কালিকাপুরের প্রাচীন জমিদার রোহিণীকান্ত রায় বাহাদুর প্রায় পাঁচ বৎসর হইল পরলোক গমন করিয়াছেন ; তাঁহার একমাত্র পুত্র আশুতোষ রায় বাহাদুরই এখন 'জমিদাব বাবু'। যুবকদ্বয় দেখিলেন জমিদার বাবুর বয়স বাইশ তেইশ বৎসর ; আকৃতি পরম সুন্দর। আশুতোষ বাবু নিজে উঠিয়া, সহাস্য মুখে আগন্তুকদ্বয়কে অভ্যর্থনা করিলেন।

প্রথম শিষ্টাচার ও দুই এক কথার পরে আশুতোষ বলিলেন, "মহাশয়, আপনাদের মধ্যে যিনি শচীন্দ্রবাবু, তাঁহাকে বোধহয় আমি চিনিযাছি ; আপনিই শচীন্দ্রবাবু ?" বিস্মিত হইয়া শচীন্দ্রনাথ বলিলেন, "মহাশয় যখন কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতেন, তখন আমি কোন কোন দিন আপনাকে দেখিয়াছি—সে অপরিচিতরূপে দূর হইতে দেখিয়াছি ; আমি নিজে সিটি কলেজের ছাত্র ; এরূপ স্থলে আপনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন, ইহা অতি আশ্চর্য।" হাসিয়া আশুতোষ বলিলেন "আপনার মুখ দেখিয়া—আপনার মুখে আপনার ভগিনী শোভার সাদৃশ্য আছে বলিয়া এত সহজে চিনিলাম।"

তখন অন্য কথা ভুলিয়া সোৎসুকে, কাতর কণ্ঠে শচীন্দ্র বলিলেন, "মহাশয়, আমার ভগিনী শোভা কোথায় আছে ? আমার সঙ্গে আমার পরম বন্ধু যোগেশবাবু ; উহার কাছে আমার সকল কথাই প্রকাশ্য।" প্রসন্ন মুখে আশুতোষ বলিলেন "আপনার ভগিনী আমাদের বাড়ীতেই আছেন, তাঁহার মুখেই আপনি তাঁহার সকল কথা শুনিতে পাইবেন।"

তখন চাকরে আলো লইয়া চলিল, তাঁহারা দুই তিন মহল পার হইয়া অন্দর মহলে উপস্থিত হইলেন।

(৩)

দোতলার উপরে একটি সুন্দর ঘর ; ঘরের দেয়ালে সবুজ রঙের লতা, পাতা ও সোনালী ফুল ; সে সব এত সুন্দর যে সহসা ঘরটীকে একটি কুঞ্জবন বলিয়া মনে হয়। সেখানে সেজের আলোতে বসিয়া একটি মেয়ে—তাহার বয়স কিঞ্চিদধিক তেরো বৎসর হইবে, সে রঙ ও তুলি দিয়া ছবি আঁকিতেছিল ; সেই ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া ঝি বলিল "বাবু আর দুজন লোককে সাথে কোরে আসচেন দিদিমণি", বালিকা ব্যস্ত হইয়া তুলি ছাড়িয়া উঠিতেছে,

সেই সময়ে শচীন্দ্র তাহাকে দেখিলেন। শচীন্দ্র দেখিলেন, স্ফুটনোন্মুখ গোলাপ কলিকার মনোহর সৌন্দর্যে ফুলবাগান যেমন আলো হয়, বালিকার সুকুমার সৌন্দর্যে সে ঘরও তেমনি আলো হইয়াছে। শচীন্দ্র মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

শচীন্দ্রকে নিতান্তই "ব্যাকুব" দেখিয়া, আশুবাবু বলিলেন "ঘরে আসুন, শচীনবাবু, ইনি তো আপনারই সহোদরা।"

শচীন্দ্র অবাক! ঐ কি শচীন্দ্রের সহোদরা? তিন বছরে তিন যুগের পরিবর্তন? এই কি সেই শোভা?—শচীন্দ্র ঘরে ঢুকিবেন কি, তাঁহার কথা কহিবার ক্ষমতাও যেন চলিয়া গিয়াছে!

দাদাকে দেখিয়া হৃদয়ের পূর্বোচ্ছ্বাসভরে বালিকা বিবশা হইয়া পড়িল; তাহার সোনা মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিল; চোখে জল আসিল, কাঁপিতে কাঁপিতে, ঘামিতে ঘামিতে সে দাদার পদতলে প্রণাম করিল। তখন ভগিনীর প্রণামটি লইয়া আর তাহার অশ্রুসিক্ত রাঙ্গা মুখখানি দেখিয়া শচীন্দ্রনাথ কাঁদিয়া ফেলিলেন। শোভার মাথায় হাত বুলাইয়া, তাহার হাতখানি ধরিয়া তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভ্রাতা ভগিনীকে অবসর দিয়া আশু বাবু অন্য সকল লোকদিগকে লইয়া বিদায় লইলেন।

(৪)

অনুজাকে নির্জনে পাইয়া শচীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি বাড়ী থেকে চলে এলে কেন শোভা? এতদিন কোথায় ছিলে? আর এখানেই বা কি করে এলে?

আবার চোখের জল মুছিয়া, উচ্ছ্বসিত অশ্রু সংযত করিয়া শোভা বলিতে লাগিল "দাদা! সেই যে মা'র শ্রাদ্ধ শেষ ক'রে তুমি কল্‌কেতায় চলে গেলে, সেই যে আমায় বলে গেলে 'ছোট মা আমাদের বিমাতা হলেও তুমি তাঁকে খুব ভক্তি করিও। আমাদের দু ভাই বোনের বাপ নাই, মাও মারা গেলেন, এখন ছোট মা ভিন্ন আর কেউ নাই, এই কথা ভেবে ছোট মাকে ভক্তি কর্‌বে। এই রকম কোল্লেও যদি ছোট মা তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন, তা হ'লে আমার কাছে তুমি চিটি লিখো, আমি তোমায় কোল্‌কাতায় নিয়ে এক বন্ধুর বাড়ীতে রাখ্‌বো।' সে সব কথা আমি কখনই ভুল্‌তেম না; কিন্তু দাদা, আমি কি কোর্‌বো? ছোট মা ছুতায় নতায় আমায় মেরে মেরে আধ মারা কোত্তেন। আমি বাসন মাজ্‌তেম, ঘর নিকুতেম, পুঁটীকে দুধ খাওয়াতেম, তবু ছোট মা বল্‌তেন 'সর্বনাশি! শতেক খুয়ারি! কেবল বসে বসে গিল্‌বি!' আবার বোল্‌তেন 'তোর মা আমার হাড় জ্বালিয়ে গেছে, তুইও তো সেই রাক্ষসীর সন্তান! সতীন-কাটা আর কত ভাল হবি!' একদিন পূবের বাড়ীর ক্ষমা পিসী নাকি ছোট মাকে বলেছিলেন 'ছোট বোউ! তোর আক্কেল কি গা? শোভা অমন শান্ত মেয়ে তবু তুই বাছাকে মারিস্ বকিস্! তোর মত সৎমা'র মুখে আগুন; আমাদের সেজ বৌ দেখি সতীন পো, সতীন ঝিদের আপন পেটের ছেলে মেয়ের মত যত্ন, আত্তি করে!' ছোট মা তাঁকে বেশী কিছু না বোলে বাড়ী এসে আমায় বোল্লেন 'হতভাগি! তুই মিট্‌মিটে ডাইন, তোর পেটে এত গুণ? পাড়ার লোকের কাছে আমার নামে লাগিয়ে বেড়াস্, আসুক তোর পাড়ার লোক!' আমি কেবল কাঁদতে কাঁদতে বোল্লেম 'না মা, আমি কারুর কাছে কিছু বলি নাই, অমনি তিনি আরো রেগে উঠ্‌লেন, বোল্লেন 'বলিস্‌নি বটে! এখন তোকে বাঁচায় কে দেখি, এই বয়সে তোর এতটা ন্যাকামি! দেখ্! আজ ও ন্যাকামি ভেঙ্গে দিচ্ছি!' এই কথা ব'লে আমায় চড় কিল লাথি মাত্তে লাগ্‌লেন; আমার নাক দিয়ে রক্ত পড়্‌তে লাগ্‌লো;

পুড়িয়া মরিলেন ! আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, তিনি অনাহারে তিন দিন শয্যাগত থাকিয়া তাঁহার বামুন ঠাকুর ও ঝিকে বলিয়াছিলেন "সে পোড়ামুখীর এত সুখ ঐশ্বর্য হওয়ার চেয়ে আমার মরণ হওয়া ছিল ভাল !"

মানকুমারী বসু

গহনার বাক্স

আমি ডিটেক্‌টিভ্ আফিসে প্রবেশ করিবার প্রায় ছয় মাস পবে, একদিন বড় বাবু আফিসের সেই নির্জন কক্ষে আমাকে ডাকিয়া, বর্ধমানের এক ভয়ানক খুনের আমূল পরিজ্ঞাত ঘটনা বিবৃত করিলেন, এবং এই হত্যা সম্বন্ধীয় সমস্ত কাগজপত্র আমার হাতে দিয়া তৎক্ষণাৎ বর্ধমান যাত্রা করিয়া তথায় গুপ্ত হত্যাকারীর অনুসন্ধান করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন।

প্রায় তিন সপ্তাহ বর্ধমানে অবস্থান করিলাম, হত্যাস্থানের চারিদিকের অধিবাসিগণের সহিত তৎপ্রসঙ্গে অনেক আলাপাদিও করা গেল, কিন্তু হত্যাকারীর বিশেষ কোন সন্ধান পাইলাম না। তবে স্থানীয় পুলিশ ভূষণ দাস নামক জনৈক হোটেলওয়ালাকে এই হত্যা ব্যাপারের সহিত জড়িত বলিয়া যে সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট এবং স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট বেশ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তা' ছাড়া আমি ভূষণ দাসের হোটেল ঘর অনুসন্ধান করিয়া যে তিনখানি গোপনীয় পত্র আবিষ্কার করিয়াছিলাম, তাহার মর্মে উক্ত ব্যক্তিই যে প্রকৃত হত্যাকারী তাহাতে আর আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও, ভূষণের আবাসস্থান স্থির করিতে পারিলাম না, হত্যাকাণ্ডেব দিন হইতে সে নিরুদ্দেশ !

এই প্রকার অবস্থায় তথায় অবস্থান করা বৃথা এবং কষ্টকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু আর অধিককাল আমায় সেখানে থাকিতে হইল না, অবিলম্বে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিবার আদেশসহ বড় বাবুর একখানি টেলিগ্রাম পাইলাম। বাঁচা গেল, সেই দিনই পূর্বাহ্নে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম, হত্যাকারীর অনুসন্ধান এইখানেই শেষ হইয়া গেল।

চারিটার সময় কলিকাতায় পৌঁছিয়া, বাসায় না গিয়াই আমার ত্রিসাপ্তাহিক অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফল, সেই ভূষণ দাসের জীর্ণ ও নীরস চিঠি কয়েকখানি সহ একেবারে আফিসে গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং আমার অনুসন্ধানের আমূল বিবরণ বিবৃত করিলাম।

আমার কথায় বাবু বিশেষ বিরক্ত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না, তিনি ধীরভাবে বলিলেন,—'বর্ধমানের হত্যা ব্যাপারের শেষ যে এই দাঁড়াইবে, তাহা প্রথমে পুলিশ রিপোর্ট হইতেই বুঝেছিলাম, তবুও একবার দেখা গেল। যাহা হউক তুমি এসেছ, বেশ হয়েছে ; কালই তোমাকে দেওঘরে যেতে হবে। আজ কয়েকদিন হ'ল সেখানে বনমালী চৌধুরী নামক জনৈক বড় লোকের বাড়ীতে অনেক টাকার গহনা চুরি হয়ে গেছে ; তার অনুসন্ধানের জন্য একটা লোক পাঠাইবার জন্য তিনি স্বয়ং আমাকে লিখেছেন। তোমাকেই যেতে হবে।"

অবিলম্বেই দেওঘবে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণের পূর্বে বড় বাবু আবার বলিলেন,—"দেখ এই চুরি ব্যাপারটা একটু নূতন রকমের ! বাড়ীর কর্তার

বিশ্বাস, তাঁহার পরিবারস্থ কোন এক ব্যক্তি ইহাতে লিপ্ত, এজন্য তাহাকে লইয়া একটা প্রকাশ্য গোলযোগ করা তাহার অভিপ্রেত নয়। যাহা হউক, তুমি সেখানে গেলেই সব শুনিতে পাইবে, কিন্তু খুব সাবধান।"

পরদিন কলিকাতা ত্যাগ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে দেওঘরে পৌঁছিলাম।বনমালী চৌধুরীর বাড়ী অনুসন্ধান করিতে বিলম্ব হইল না, সহরে লোকটার বেশ মান প্রতিপত্তি আছে; শুনিলাম বহুকাল সরকারী আমীনের কাজ করিয়া পেন্‌সন্ প্রাপ্তিব পর তিন চারি বৎসর হইতে তিনি সপরিবারে বৈদ্যনাথে বাস করিতেছেন। নগদ টাকা যথেষ্ট, এবং উচ্চ সুদে কর্জ দিয়া তদ্দ্বারা প্রচুর আয়ের সংস্থান হয়। সন্ধ্যার পর বনমালী চৌধুরীর বাটীতে উপস্থিত হইলাম, কিন্তু তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না; কর্তা তখনও আহ্নিকের ঘরে রহিয়াছেন, শুনিলাম বাহিরের ঘবে আসিতে অর্ধ ঘণ্টা বিলম্ব হইবে। দেখিলাম বাসায় লোকজনের সংখ্যা খুব অধিক নয়, একজন খানসামা, একজন বেহারা, একটি মুহুরী আর এক পাচক ব্রাহ্মণ। মুহুরীর নাম শ্রীশ্যামলাল বায়, লোকটা মিষ্টভাষী, আমাকে প্রথমে দেখিয়াই, অর্থকৃচ্ছ্রতায় তাড়িত ঋণ গ্রহণেচ্ছু বিপন্ন ব্যক্তি ঠাহবাইয়াছিলেন, এবং অচিরাৎ ভূসম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া আমি কর্তার "মহামহিম" পদবীব প্রসার বৃদ্ধি করিব, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণার ব্যবস্থা করিব, তাহাতে আর তাঁহার সন্দেহ ছিল না। আমি আত্মগোপনের এই সুযোগ ছাড়িতে পারিলাম না, দুই সহস্র মুদ্রা ঋণগ্রহণ সম্বন্ধে কর্তার সাহায্য প্রার্থনা আমার আগমনের কারণ বলিয়া প্রকাশ করিলাম। লোকটা আমার কথায় বেশ বিশ্বাস করিয়া ফেলিল, এবং আশু কার্য সিদ্ধির জন্য তিনি যে বিশেষ সচেষ্ট থাকিবেন, একথা বলিতেও ছাড়িল না।

কর্তা বাহিরে আসিলে, একাকী আমি তাঁহার নির্জন কক্ষে গিয়া, বড়বাবু প্রদত্ত আমাব নিযোগ পত্রখানি দেখাইলাম। তিনি পত্রখানি আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া ধীরে ধীবে চশমাখানি খুলিয়া বলিলেন,—"সাহেব আপনাকে চুরির অনুসন্ধান করিতে পাঠাইয়াছেন, ভালই। অনুসন্ধান আবম্ভের পূর্বে আপনাকে একটা কথা বলিয়া দেওয়া ভাল বোধ করিতেছি। আজ চারি দিন হ'ল আমার প্রায় পাঁচ হাজার টাকার গহনা চুবি গিয়াছে, কিন্তু এ পর্যন্ত একথা গৃহিণী ব্যতীত অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই, কেবল গোপনে পুলিশে একটা সংবাদ দিয়া রাখিয়াছি। আপনি আমার এই ব্যবহারেব কথায় হয়ত বিস্মিত হইতেছেন, কিন্তু সব শুনিলে আমার সঙ্কট বুঝিতে পারিবেন। আমার বিশ্বাস অলঙ্কারগুলি আমার হতভাগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র রজনী চুরি করিয়াছে। গৃহিণীরও এই মত। হতভাগাকে, পিতার মৃত্যুর পর হতে ছেলের মত পালন করে আসিতেছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি,—"

আমি এইখানে তাঁহাকে বাধা দিযা বলিলাম,—"মহাশয়, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রেব কথা পরে শুনিলেই চলিবে, এখন চুরিটা কি প্রকারে হয়েছিল, আগে তাহাই বলুন।"

কর্তা তখন বলিতে লাগিলেন,—"ব্যাপারটা হচ্ছে, সেই চুরির দিন কতকগুলি গহনা বন্ধক রাখিয়া, কয়লা খাদের এক ঠিকাদার আমার নিকট তিন হাজার টাকা কর্জ লইয়া গিয়াছিল, গহনাগুলা আমার এই বৈঠকখানা ঘরে একটা বড় হাত বাক্সে রাখিয়াছিলাম, তাড়াতাড়ি বশতঃ লোহার সিন্দুকে তুলিয়া রাখা হয় নাই। এই ঘরে রাত্রিতে কেহই থাকে না, সেই হতভাগা, শুনিলাম সেদিন রাত্রে এখানে শুইয়াছিল। প্রাতঃকালে কি রাত্রে কখন সে উঠে গেছে, কেহ জানে না, আমি যথাসময়ে প্রভাতে উঠিয়া আর বাক্স দেখি নাই। চোর যে কে তাহা বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না, তাই একটা ঘরাও গোলযোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য, বাক্সটা আমি বাড়ীর মধ্যে রাখিয়াছি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। এখন

যাহাতে বিনা গোলযোগে পরের অলঙ্কারগুলি হস্তগত হয়, তাহার উপায় করুন।"

বহুকষ্টে চুরির এই সামান্য ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া আপাততঃ পরিতৃপ্ত থাকিতে হইল, কারণ কর্তার সহিত আর যাহা কথা হইল, তাহাতে ভ্রাতুষ্পুত্র রজনীনাথের উদ্দেশে অজস্র গালিবর্ষণ এবং নিজের আকস্মিক গ্রহবৈগুণ্যের জন্য অদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার ভিন্ন আমার ডিটেক্টিভ বুদ্ধি প্রয়োগের উপযোগী কিছু পাওয়া গেল না। সে যাহা হউক কর্তার বিশেষ অনুরোধে, কার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত তাহার বাসাতেই থাকার ব্যবস্থা হইল। আত্মগোপন মানসে আমি যে ঋণ গ্রহণেচ্ছু ব্রাহ্মণ সন্তান বলিয়া চাকরদিগের নিকট পরিচয় দিয়াছিলাম, সে কথাটা কর্তাকে বলিয়া দিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে, আবার কর্তার সহিত চুরি সম্বন্ধে অনেক কথোপকথন হইল। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ব্যতীত অপর কোনও ব্যক্তির উপর সন্দেহ হয় কি না জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন :—"আমার পরিবারস্থ মুহুরী, বেহারা, চাকর, ব্রাহ্মণ সকলই বিশ্বাসী পুরাতন ভৃত্য। যে ব্যক্তি এই সর্বনাশ করিয়াছে, আমি বহুপূর্বে তাহার আভাস দিয়াছি। আর কাহারও উপর আমার সন্দেহ নাই।"

সেই দিনই, ঘটনার পরিজ্ঞাত বিবরণসহ, বড় বাবুকে একখানি পত্র লিখিলাম। লোকটা যখন ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর এতটা সন্দেহ করিতেছে, একবার তাহার অবস্থাটা অনুসন্ধান করা ভাল বলিয়া বোধ হইল ; শুনিলাম সে বৈদ্যনাথের নিকটেই মধুপুর ষ্টেশনে কি একটা চাকরি করে, কিন্তু হঠাৎ এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হইল না। পত্রোত্তরে বড় বাবুর পরামর্শের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে, স্নানাহ্নিক সমাপণ করিয়া কর্তা যথারীতি মহাদেব দর্শন করিতে বহির্গত হইলেন এবং আমাকেও যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সে সময়ে আমার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তা' ছাড়া বড় বাবুর চিঠিও পাইবাব সম্ভাবনা ছিল, এই সকল কারণে, কোন প্রকারে কর্তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া, বাসাতেই থাকিয়া গেলাম।

সেদিন কর্তা বাহির হইয়া যাবার কিছুক্ষণ পরেই মুহুরী মহাশয়ও একটা কাজে চলিয়া গেলেন। আমি একলা বৈঠকখানায় বসিয়া আছি, এমন সময় ডাকপিয়ন আসিয়া কতকগুলি পত্র আমার হাতে দিয়া গেল। বড় বাবুর নিকট হইতে পত্র পাইবার সম্ভাবনা ছিল, আমি তাড়াতাড়ি সেই পত্র খুঁজিতে লাগিলাম, কিন্তু আমার নামীয় কোন পত্রই পাইলাম না। তখন আমি একে একে সেই পত্রগুলির শিরোনাম পাঠ করিতে লাগিলাম, কোন প্রকারে সময় ক্ষেপণ করা ব্যতীত এই কার্যের অপর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। পত্রগুলির মধ্যে শ্যামলাল রায় মুহুরী মহাশয়ের নামীয় একখানি চিঠি ছিল, তাহার শিরোনামা পড়িবার সময় লেখাটা যেন আমার কোনও পরিচিত লোকের বলিয়া বোধ হইল, ডাকঘরের ছাপটা বড় অপরিষ্কার পড়িতে পারিলাম না। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, বর্ধমানের হত্যাকারী ভূষণ দাসের লেখা কি এই প্রকার নয় ? অনেক নিদ্রাহীন স্তব্ধরাত্রি ভূষণের কয়েকখানি পত্র নাড়াচাড়া করিয়া অতিবাহিত করিয়াছি, তাহাব হস্তাক্ষরের প্রত্যেক টান তখনও আমার চক্ষে প্রত্যক্ষবৎ ছিল। মুহুরী মহাশয়ের পত্রখানি যে সেই ভূষণ দাস কর্তৃক লিখিত তাহাতে আর আমার সন্দেহ রহিল না। পত্রগুলি অপ্রয়োজনীয় বোধে বড় বাবুকে দিই নাই, সেগুলা আমার পোর্টমাণ্টোস্থ একটা জামার পকেটে ছিল। তাড়াতাড়ি বাক্স হইতে পত্রগুলি বাহির করিয়া তাহার অক্ষরের সহিত, মুহুরী মহাশয়ের নামীয় পত্রের শিরোনামার অক্ষরের সহিত মিলাইয়া দেখিলাম অবিকল একই হাতের লেখা ! অপর চিঠিগুলা টেবিলের উপর রাখিয়া, একটা নির্জন স্থানে গিয়া, সেই পত্রখানি খুব সাবধানের সহিত পড়িলাম। চিঠিখানি যশোহর

হইতে প্রেরিত, লেখা ছিল :—

"কল্যাণবরেষু,—**আমি** কিছুদিন হ'তে তোমার পত্র না পাইয়া উদ্বিগ্ন আছি। পূজার **জিনিষ** পত্র সঙ্গে **লইয়া** আসিবে, এবং ছুটীতে আসিবার সময় **কলিকাতায়** গিয়া, শ্রীমতী মৃণালিনীর জন্য সেই **বহুবাজারের** এইচ্, বসুর এক শিশি কুন্তলীন, আর এক শিশি **দেলখোস,** অবশ্য করিয়া আনিবে। শীতকালে সাহেব **বিবির** নাচ দেখ্‌তে, সে কলিকাতায় যাবে বল্‌ছে। সদর রাস্তায়, এইচ্, বসুর খুব বড় দোকান। **গোবর্ধন** ভাল আছে, **ঠাকুরের** জ্বর হইয়াছে। কলিকাতার **কাঠগোলায়,** তোমার কাকার সহিত একবার দেখা করিও। আমি ভাল **আছি।**

আশীর্বাদক
শ্রীকালীকান্ত রায়।

পুঃ—মিনি **শীঘ্র** বেশ্ লিখ্‌তে শিখেছে, সে কিছুতেই ছাড়্‌লে **না,** তার হিজিবিজি হাতের লেখা পত্রের সঙ্গে পাঠাইলাম, তুমি **আসিলে** ভাল লেখা দেখাইবে। কুন্তলীন ও দেল্‌খোস্ না আনিলে, বড় **গোলযোগ** বাধাইয়া তুলিবে।"

তারপর পত্রের সহিত মোড়ক করা এক খণ্ড পৃথক কাগজে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা :—

"খ, চ, খ, ক, ক, গ, খ, জ, খ, ক, ঙ, খ, ন, ঙ, জ।"

পত্র পাঠ করিয়া প্রায় সকল আশাই নির্মূল হইতে চলিল। কিন্তু ভূষণদাসের সহিত চিঠিখানির প্রত্যেক অক্ষরের ঐক্যতা সহজে মন হইতে বিদূরিত হইল না, বিশেষতঃ বালিকাকন্যা মিনির যথেচ্ছা লিখিত আঁকা বাঁকা অক্ষরগুলিতেও যেন দুই একটা পাকা হাতের টান দেখিতে পাইলাম।

সে যাহা হউক, চিঠিখানি আর সেই ক্ষুদ্র কাগজ খণ্ড আমার নিকটেই থাকিল, মুহুরী মহাশয়ের প্রতি একটু খরদৃষ্টি রাখিলাম, কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে সন্দেহজনক কিছুই দেখা গেল না। আহারাদির পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া, আবার চিঠিখানি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলাম, হঠাৎ মনে হইল টুক্‌রা কাগজে যে কয়েকটী অক্ষর লেখা আছে, হয়ত তাহার সাহায্যে পত্রখানি পড়িতে হইবে। আশ্চর্যের বিষয় আমার অনুমান ঠিক হইল, এবং এই কয়েকটী কথা তখন পত্রের মধ্যে স্পষ্ট পড়িতে পারিলাম। "আমি জিনিষ লইয়া কলিকাতায় বহুবাজারের দেলখোস বিবির গোবর্ধন ঠাকুরের কাঠগোলায় আছি, শীঘ্র না আসিলে গোলযোগ।"

বর্ধমানের হত্যাকারী ও দেওঘরের চুরির সহায়ক ভূষণ দাসকে উক্ত পত্রস্থ লুক্কায়িত বাক্যদ্বারা ধৃত করিবার সম্ভাবনা দেখিয়া, আমার মানসিক অবস্থা কি প্রকার হইযাছিল, পাঠক-পাঠিকাগণ অনায়াসেই অনুমান করিতে পারেন। আমি পত্রখানি সাবধানে পকেটস্থ করিয়া, কর্তার নিকট গিয়া বলিলাম,—"আপনার চুরির বোধহয় একটা কিনারা হইবে, আমাকে এখনই একবার মধুপুরে যাইতে হইবে। কথাটা যেন প্রকাশ না হয়।" গোলযোগের আশঙ্কায় আমার প্রকৃত গন্তব্যস্থান যে কলিকাতা তাহা আর প্রকাশ করিলাম না।

সাতটার গাড়িতেই যাওয়া স্থির করিলাম, দেখিতে দেখিতে ছয়টা বাজিয়া গেল, আমি কিছু অগ্রেই ষ্টেশনে যাত্রা করিলাম। যাইবার সময় মুহুরী মহাশয় আমার হঠাৎ গমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বলিলাম যেসকল সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া কর্তা আমাকে টাকা

কর্জ দিবেন, তৎসম্বন্ধীয় কাগজপত্র ভুলে বাড়িতে ফেলিয়া আসিয়াছি, কল্যই দলিলপত্র লইয়া আবার ফিরিতেছি।"

প্রাতঃকালে কলিকাতায় পৌঁছিয়াই মুচীপাড়ার থানার ইনেস্পেক্টার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দশজন পুলিশ কন্‌ষ্টেবল্ সঙ্গে লইয়া দেল্‌খোস বিবির লেনে উপস্থিত হইলাম। গোবর্ধন ঠাকুরের কাঠগোলা বাহির করিতে বিলম্ব হইল না, ভূষণকে সনাক্ত করিয়া গ্রেপ্তার করাও সহজে হইয়া গেল, কারণ বর্ধমানে অবস্থান কালীন তাহার আকারাবয়বের বিশেষত্বগুলি পরিচিত লোকদিগের মুখে শুনিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। প্রথমে দেওঘরের চুরির ব্যাপারের সকল কথাই ভূষণ অস্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু তারপর হাজতে রাখিয়া দুই একটি তাড়া দিবার পর সে সকলই স্বীকার করিল এবং অপহৃত গহনাগুলিও কাঠগোলাতে পাওয়া গেল।

আমার এই অপরাধী ধরিবার আমূল ইতিহাস শুনিয়া বড় বাবু বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং সেই রাত্রেই দেওঘরে যাত্রা করিয়া চৌর্য কার্যের সাহায্যকারী সেই মুহুরী শ্যামলাল রায়কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আদেশ করিলেন। এই প্রকার অসম্ভাবিত উপায়ে কৃতকার্যতা লাভ করিয়া, শ্রমক্লিষ্ট ক্ষীণ শরীরে যেন চতুর্গুণ বল প্রাপ্ত হইলাম এবং একজন সাহায্যকারী ইনেস্পেক্টরকে সঙ্গে লইয়া সেই রাত্রেই পুনরায় দেওঘরে যাত্রা করিলাম।

পরদিন প্রাতে দশটার সময় দেওঘরে পৌঁছিয়া, স্থানীয় থানা হইতে কয়েকজন কন্‌ষ্টেবল সঙ্গে লইয়া, বনমালী চৌধুরীর বাসায় উপস্থিত হইলাম। শ্যামলাল রায় মুহুরী মহাশয় তখন একজন দেন্দারের সুদের হিসাব করিতেছিলেন ; আমি তাঁহাকে আইনমত অপরাধের কথা বলিয়া গ্রেপ্তার করিলাম। এ কথা কর্তার কর্ণগোচর হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। তিনি কতকগুলা বাজে কথা বলিয়া আমাদিগকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। আমি তাঁহাকে পার্শ্বের ঘরে লইয়া গিয়া, চুরির আমূল ইতিহাস বর্ণন করিলাম এবং মুহুরী মহাশয়ের নামীয় সেই চিঠিখানিও দেখাইলাম। বলা বাহুল্য সেই পত্র হইতে কি প্রকারে আমি ভূষণ দাসের সন্ধান পাইয়াছিলাম তাহা তিনি প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। তারপর "খ চ খ ক ক ইত্যাদি" অক্ষরাঙ্কিত সেই কাগজখণ্ডের সাহায্যে যে পত্রখানি পড়িতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দিলাম ; বাঙ্গালা বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর "খ"-এর অর্থ প্রথম ছত্রস্থ দ্বিতীয় শব্দ "আমি" এবং তৎপরবর্তী বর্ণমালার ষষ্ঠ অক্ষর "চ" যে পত্রের দ্বিতীয় ছত্রস্থ ষষ্ঠ শব্দ "জিনিষ" বুঝাইতেছে এবং এই প্রকারে যে পত্রপাঠ করিতে হইবে চৌধুরী মহাশয়কে বেশ বুঝাইয়া দিলাম। কর্তা তখন স্বয়ং পত্রের প্রত্যেক ছত্র হইতে পূর্বোক্ত প্রকারে নির্দিষ্ট শব্দগুলি বাহির করিয়া পত্রপাঠ করিয়া আমার বুদ্ধির যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন।

অপরাধী শ্যামলাল রায়কে হাজতে পাঠাইয়া, আমরা সেদিন চৌধুরী মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে দেওঘরে অবস্থান করিলাম।

পরদিন কলিকাতায় গিয়া শুনিলাম, বর্ধমানের হত্যাকারী এবং দেওঘরের চোর ধৃত করার পুরস্কার স্বরূপ, একটি সত্তর টাকা মাহিনার পদে আমার উন্নতি হইয়াছে।

জগদানন্দ রায়

রেলে চুরি

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সাড়ে বারটার গাড়ীতে শেয়ালদহ ষ্টেসনে ট্রেনে চড়িলাম। স্লো পেসেঞ্জার ঢিকুতে ঢিকুতে চলিতে লাগিল। গাড়ীতে বসিয়া মনে মনে উত্তরাঞ্চলবাসীদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতেছিলাম। সেখানকার কোন এক বুদ্ধিমান জমিদার মহাশয়ের গৃহে একজন সন্ন্যাসী কৃপা করিয়া পদধূলি দিয়াছিলেন। সাধু-সেবাপ্রিয় জমিদার দুই দিন কায়মনোবাক্যে সাধুসেবা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মানিতেছিলেন। তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে দেখা গেল যে সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইয়াছেন এবং দক্ষিণাস্বরূপ জমিদারের ক্যাশবাক্সটী লইয়া গিয়াছেন। আমার কর্মভোগ ছিল, সেইজন্য জমিদার মহাশয়ের বুদ্ধিমত্তার ফল আমাকেও কিছু ভোগ করিতে হইতেছে, কারণ সেই অন্তর্হিত সন্ন্যাসী মহাশয়কে খোঁজ করিবার কার্যটা আমার উপরেই পড়িয়াছিল।

সন্ন্যাসী ঠাকুরের চেহারা সম্বন্ধে জমিদার যেরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহাতে জ্ঞাত হইয়াছি সন্ন্যাসীর বর্ণ সাধুজনোচিত উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ, বুদ্ধি পরিচায়ক প্রশস্ত ললাট, নাসিকা সুবঙ্কিম, চক্ষু ক্ষুদ্র ও উজ্জ্বল, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং তাঁহার পৃষ্ঠদেশে একটি অস্ত্রাঘাতের দাগ আছে। অস্ত্রাঘাতে দাগ বোধ হয় তাঁহার পূর্ব্বের গুণপনার নিদর্শন হইবে।

দার্জিলিং মেলে যাইলে সুবিধা ছিল বটে, কিন্তু রাণাঘাটে শ্বশুরালয়ে নামিয়া একবার প্রণয়িণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল। সেইজন্য স্লো ট্রেনে যাইতেছি। রাণাঘাটে এ ট্রেন ছাড়িয়া দার্জিলিং মেলে চড়িব মনস্থ করিয়াছি।

কাঁচড়াপাড়া ষ্টেসনে গাড়ী থামিবামাত্র, দেখিলাম একটি লোক ষ্টেসন মাষ্টারের নিকট কাঁদিয়া পড়িল। গোলমাল দেখিয়া আমি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। দেখিলাম লোকটি অবিশ্রান্ত ক্রন্দন করিতেছে; তাঁহার ক্রন্দনের ভাবার্থ সংগ্রহ করা কিছু দুষ্কর হইল বটে, কিন্তু অবশেষে বুঝিলাম যে এই লোকটি লাটুদহের জমিদারের নায়েব। কলিকাতা হইতে দশ হাজার টাকার নোট লইয়া একটি জমিদারী কিনিবার জন্য কৃষ্ণনগর অভিমুখে যাইতেছিল। নোটগুলি তাহার গলায় ঝুলান কারেন্সি ব্যাগে ছিল, সেই নোটগুলি সমস্তই চুরি গিয়াছে। সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার নিকট হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ সংগ্রহ করিলাম :—

"আমি শেয়ালদহ হইতে যখন গাড়ীতে উঠি তখন চাবিওয়ালাকে কিছু দক্ষিণা দিয়া অপর কেহ কামরায় উঠিতে না পারে এজন্য চাবি বন্ধ করাইয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে এমন সময় একটি ভদ্রলোক, পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া আমার কামরা খুলিয়া তাহাতে উঠিলেন এবং উঠিয়াই পুনরায় দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। ভদ্র লোকটির সঙ্গে মোট বেশি ছিল না, কেবল একটি মাত্র ছোট চামড়ার ব্যাগ ছিল, সেটি একজন মুটে বহিয়া আনিয়াছিল। বেশভূষায় তাঁহাকে একজন সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া বোধ হইল। তিনি গাড়ীতে উঠিবামাত্র গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তখন তিনি যেমন ব্যস্ত হইয়া মুটিয়াকে ব্যাগ হইতে পয়সা বাহির করিয়া দিবেন অমনি তাঁহার ব্যাগ হইতে একটি শিশি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল এবং সুগন্ধে চর্তুদিক আমোদিত হইল। যখন দমদমা ষ্টেসনে গাড়ী থামিল, তখন তিনি দুই খিলি পান কিনিলেন এবং তাহার এক খিলি সুজনোচিত ব্যবহার অনুসারে আমাকে প্রদান করিলেন। আমি তাঁহার এই ভদ্র ব্যবহারে অতীব প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলাম।

"এরূপ কিছুকাল কথোপকথনের পর ট্রেন যখন বারাকপুর হইতে ছাড়িল তখন আমি সেই ভগ্ন শিশিটির মধ্যস্থ পদার্থের গন্ধে বিমোহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম :—

'মহাশয় এ শিশিতে কি ছিল ?'

"তিনি বলিলেন, 'সে কি মহাশয় আপনি কুন্তলীন তৈলের নাম জানেন না ? কুন্তলীনের জন্যই আজকাল এইচ্, বসুর নাম বিখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু তাহার এসেন্স দেলখোস যদি আপনি আঘ্রাণ করেন তাহা হইলে আপনি ইহা অপেক্ষাও মোহিত হইবেন।' এই বলিয়া একটা সুন্দর ক্ষুদ্র শিশি পকেট হইতে বাহির করিলেন।"

"আমি অত্যন্ত কৌতূহল পরবশ হইয়া বলিলাম, 'মহাশয়, এইটিই কি এসেন্স দেলখোস।'

'হাঁ মহাশয়' বলিয়া শিশিটি তিনি আমার হাতে দিলেন। আমি ছিপি খুলিয়া নাকের কাছে ধরিলে প্রথম একটি মিষ্ট গন্ধ পাইলাম, কিন্তু সর্ব শরীর অবশ হইয়া আসিল, হাত হইতে শিশিটি পড়িয়া যাইতে ছিল তিনি ধরিলেন। তাহার পর কি হইল কিছুই বলিতে পারি না। কাঁচড়াপাড়ার নিকট আসিয়া যখন আমার চৈতন্য হইল তখন আর সে লোকটীকে দেখিতে পাইলাম না, ব্যাগ খুলিয়া দেখিলাম তাহাতে একখানি নোটও নাই" এই কথা বলিয়া সে লোকটী বালকের মত ভেউ ভেউ করিয়া কান্দিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তাহার নিকট হইতে এইরূপ বিবরণ শুনিয়া সেখানকার দুই এক জন বুদ্ধিমান পুলিশ অফিসার সাব্যস্ত করিলেন যে এই ব্যাটা মনিবের টাকা চুরি করিয়া এ রকম ধূয়া তুলিয়াছে। আমার মত কিন্তু তাঁহাদের সহিত মিলিল না। আমি ইত্যবসরে সেই কামরাটির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম, বাস্তবিক একটি শিশি ভাঙ্গিয়া এক প্রকার গন্ধ তৈল গাড়ীর মেজেয় ঢালিয়া পড়িয়াছে। বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম একটি তৈলাক্ত নূতন রবারের জুতার ছাপ গাড়ীর অপর দ্বার পর্যন্ত গিয়াছে। তাহার পর ফুটবোর্ডের উপরও কয়েকটি দাগ দেখিতে পাইলাম, কিন্তু ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ীর জানালা পর্যন্ত গিয়া ফুটবোর্ডের উপর আর দাগ পাওয়া গেল না দেখিয়া, আমি সেইখান হইতে ফিরিয়া আসিলাম। প্লাটফরমে আসিয়া ট্রেনের টিকিট পরীক্ষককে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে তিনি ফার্ষ্ট ক্লাসে কোন আরোহীকে দেখিয়াছেন কি না ? তিনি বলিলেন যে ফার্ষ্ট ক্লাসে একটি সাহেব ছিলেন, তাঁহার টিকিট হারাইয়া গিয়াছিল তিনি টিকিট পরীক্ষককে পোড়াদহ পর্যন্ত ভাড়া ধরিয়া দিয়াছিলেন । ট্রেন শ্যামনগরের নিকটস্থ হওয়ার সময় টিকিট পরীক্ষকের সহিত এই সাহেবটির দেখা হইয়াছিল। আমি ভাবিলাম ফুটবোর্ড দিয়া বাঙ্গালী বেশে চলিলে নিশ্চয় ধরা পড়িবেন, সাহেবের বেশ ধরিলে লোকে টিকিট পরীক্ষক অথবা গার্ড ভাবিয়া লইতে পারে তাহাতেই হয় ত এই সাহেবী বেশ।

আমি তখন কাঁচড়াপাড়া ওয়ার্কসপ্ হইতে একটি ট্রলি লইয়া নৈহাটি ষ্টেসনে আসিলাম। হুগলীর প্লাটফরমে যে দুই জন পুলিশ অফিসার হুগলীর লাইনের যাত্রীদিগেব প্লেগ পরীক্ষার জন্য থাকেন তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয় কোন সাহেব নৈহাটি হইতে হুগলীর লাইনে গিয়াছেন ?" তাহারা বলিলেন "না"।

আমি বলিলাম "আপনারা ত সমস্ত টিকিটই প্লেগের ছাপের জন্য পরীক্ষা করিয়াছেন, বিনা টিকিটের কোন যাত্রীকে হুগলীর যে ট্রেন ছাড়িল সেই ট্রেনে যাত্রা করিতে

দেখিয়াছেন ?

তাঁহারা বলিলেন, "একটি ভদ্রলোক বোধহয় হিন্দুস্থানী হইবেন টিকিট করিবার সময় না পাওয়াতে বিনা টিকিটে ট্রেনে উঠিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি গার্ডকে মূল্য ধরিয়া দিয়াছেন।

এই যাত্রীটিই যে আমার শিকার, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ রহিল না। কিন্তু ফিরে ট্রেনে হুগলীতে যাইতে হইলে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। সেইজন্য আমি আর ট্রেনের জন্য অপেক্ষা না করিয়া নৈহাটি বাজারের রাস্তা দিয়া খেয়া ঘাটে গিয়া গঙ্গা পার হইলাম।

ষ্টেসনে যাইয়া গাড়োয়ানদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, পূর্বের ট্রেনে আগত একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক প্রতাপপুর গিয়াছেন। আমি সেই বাড়ীর ঠিকানা লইয়া নিকটবর্তী পুলিশ আফিসে উপস্থিত হইলাম। সেখানে বেশ পরিবর্তন করিয়া পাড়া গেঁয়ে ইতরলোকের বেশ ধারণ করিলাম।

নম্বর চিনিয়া গাড়োয়ানের কথিত বাটীতে উপস্থিত হইলাম। বাটীতে প্রবেশ করিয়াই বাবুর সাক্ষাৎ পাইয়া ষাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হইয়া পড়িলাম ; করুণস্বরে নিবেদন করিলাম যে, "হুজুর আমার বাড়ী বাঁক্ড়ো, আমার ত্রিসংসারে কেহ নাই। আপনি ব্রাহ্মণ দেবতা, যদি দয়া করে স্থান দেন, আপনার সেবা করে পেসাদ পেয়ে শেষ কটা দিন কাটাই। আর গঙ্গার তীরে থাক্‌বো মরণকালে গঙ্গা পাব।"

বাবুজীর মন সেদিন কিছু প্রফুল্ল ছিল, তিনি বলিলেন যে "বাপু হে আজকালকার দিনে বালাম চালের দাম দেয় কে ? আচ্ছা থাক দেখা যাবে তুমি কেমন কাজের লোক।" আমিও মনে মনে বলিলাম যদি কপালে থাকে তাহা হইলে আমি যে কাজের লোক তাহাব পরিচয় পাইবে।

তাঁহার চাকরের সঙ্গে আমার অবস্থানের বন্দোবস্ত হইয়া গেল। চাকরটার সেদিন অত্যন্ত জ্বর হইয়াছিল। আমার বোধ হইল, সেই জন্যই এই ভদ্র লোকটি আমার উপব এত অনুগ্রহ করিয়া বেগার ধরিলেন।

কথায কথায় বাবুর চাকরের নিকট জানিতে পারিলাম যে একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত হইয়াছিল বটে কিন্তু কিছুক্ষণ পরে এখান হতে পায়ে হেঁটে চলিয়া গিয়াছেন।

কর্তা বাবুটি একজন কৌল অর্থাৎ তান্ত্রিক ধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ ; কারণ অর্থাৎ মদ্য এবং শুদ্ধি অর্থাৎ মাংস প্রভৃতিতে বিশেষ অনুরাগ। পেশা দালালী ও মহাজনী অর্থাৎ টাকা সুদে খাটান। যাহা হউক দু চারি দিন সেখানে থাকাতেই বুঝিতে পারিলাম যে ঠাকুরের অন্য কোন পেশা আছে। গঙ্গার ওপারে গৌরীপুর কাকিনাড়া, জগদ্দলে যে সমস্ত কল আছে সেই কুলী মজুর প্রভৃতির দ্বারা প্রায় চুরি ডাকাতি হইয়া থাকে। কর্তাবাবুর আড়তে সেই চোরাই মাল জমা করিয়া লওয়া ও তাহার বিলি বন্দোবস্ত করা বাবুর একটি বিশেষ কার্য তাহা বুঝিতে পারিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাবুর বাটীতে একটি কাঠের লেটার বাক্স ছিল। হরকরা সেই লেটার বাক্সে চিঠি রাখিয়া যাইত। বাবু পরে খুলিয়া পড়িতেন। সেই বাক্স হইতে চিঠি চুবি করিয়া পড়া আমার প্রধান কার্য হইল।

ডিটেক্‌টিভ কর্মচারীদিগের চিঠি খুলিয়া পড়িতে বেশী কষ্ট পাইতে হয় না। শীল করা চিঠিগুলি, মদে রুটি ভিজাইয়া মোহরের ছাপার প্রতিলিপি তুলিয়া রাখিয়া, খুলিয়া পড়িয়া আবার পূর্বের মত শীল করিয়া দেওয়া যায়। আমি তাহা অপেক্ষাও সহজ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম। চিঠির খামের একধারে একচুল কাগজ কাটিয়া চিঠিখানি বাহির করিয়া লইতাম। তাহার পর শিরিশ দিয়া এমন জুড়িয়া দিতাম যে কাহারও সাধ্য নাই ধরিতে পারে।

যতগুলি চিঠি পড়িয়াছিলাম তাহাতে বিশেষত্ব কিছুই পাই নাই। চার দিনের দিন একখানি চিঠি পড়িয়া মন কিছু সন্দেহ যুক্ত হইল। চিঠিখানি এই :—

প্রণামপূর্বক নিবেদন মিদং

চৌধুরী মহাশয় আপনকার কথামত **চারি** পাঁচ দিন বিলম্ব করিয়া **রাজা** বাবুর বাগানে যাই। দেখিলাম **বাগান** ঘাস এবং আগাছায় ও **নোটের নটশাকে ভরিয়া আছে ; আর লেটারখানি** বাবুকে দিয়াছি এখানকার **নম্বর** পঞ্চান্ন। পুকুরের অবস্থা ভাল **নাই**। আপনি নিয়ম মত চারি **পাঁচ** দিন বাদে এক **একখানি** পত্র অবশ্য করিয়া **পাঠাইবেন**। যে সকল ইট ভাঙ্গিতে **বাকি** আছে সেগুলি সমস্ত **কলে** লইয়া গিয়াছে। এবং কতক **ভাঙ্গাও** হইয়াছে।

নিবেদন ইতি শ্রীকরম চাঁদ সিং

চিঠিখানিব ভাবার্থ বিশেষ কিছুই বোঝা যায় না। যাহা হউক "নোটেব" "লেটার" "নম্বর" এই সমস্ত কথাগুলি দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যে এই চিঠির মধ্যে হারান নোট সম্বন্ধে কিছু গূঢ় রহস্য আছে এবং ইহা মনে করিয়া আমি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত বারম্বার চিঠির লিখিত শব্দগুলির পর্যালোচনা করিতে লাগিলাম। সহসা আমার নিকট চিঠিখানির রহস্যোদ্ঘাটন হইয়া গেল।

তখন আমার বিনা মাহিনার চাকরীতে ইস্তাফা দিয়া কলিকাতা চলিয়া আসিলাম এবং ডাক বিভাগের কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজাবাগান ডিভিসনের পিয়নের কার্যে নিযুক্ত হইলাম। নিযুক্ত হইবার পরদিনই আমি যাহা আশা করিতেছিলাম তাহা পাইলাম, অর্থাৎ চুঁচুড়া প্রতাপপুর হইতে সাধুচন্দ্র খাঁ চৌধুরী প্রেরিত করমচাঁদ সিংহের নামীয় একখানি রেজেষ্টারী চিঠি আমার হস্তগত হইল।

রেজেষ্টারী চিঠি লইয়া আমি চার নম্বরের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। রেজেষ্টারী চিঠির সংবাদ পাইয়া বাটীর কর্তা বহির্বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার নিকট হইতে রসিদখানি লইয়া সই করিয়া আমার হাতে ফেরত দিলেন। আমি দেখিলাম পূর্বোল্লিখিত পত্রের লেখা ও এই হাতের লেখা ঠিক এক প্রকার। তখন আমার সঙ্কেতে চারি জন পাহারাওয়ালা আসিয়া করমচাঁদকে গ্রেপ্তার করিল।

তারপর সেই রেজেষ্টারী চিঠিখানির উপর ডেডলেটার আপিসের ছাপ দিয়া একজন সহকারীর দ্বারা প্রতাপপুরে সাধুচন্দ্র খাঁ চৌধুরীর ওখানে পাঠাইয়া দিলাম। ডাকওয়ালা গিয়া খবর দিল যে কলিকাতার একখানি রেজেষ্টারী চিঠি ডেডলেটার আফিস ঘুরিয়া ফেরত আসিয়াছে। চৌধুরী মহাশয় অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রসিদখানিতে সই করিয়া ফেরত লইলেন। সেই সময় পুলিশ আসিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল এবং পূর্বোক্ত রেজেষ্টারী চিঠি খোলায় তাহার মধ্য হইতে পাঁচখানি চোরাই নোট বাহির হইল এবং তাঁহার বাড়ী খানাতল্লাসী করায় অপহৃত নোটের আরো কয়েকখানি পাওয়া গেল।

পূর্বোক্ত করমচাঁদই যে সন্ন্যাসী সাজিয়া ক্যাস বাক্স চুরি করিয়াছিল এবং রেলে নায়েবকে দেলখোসের পরিবর্তে ক্লোরোফর্ম দ্বারা হৃতচেতন করিয়া তাহার ব্যাগ হইতে নোটগুলি চুরি

করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে পূর্বোক্ত চিঠিখানির "নোটের" "লেটার" "নম্বর" এই তিনটি কথা হঠাৎ চোখে পড়িয়া আমার মনে প্রথম সন্দেহের উদয় হয়। সেই সময় বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলাম যে এই কয়েকটি কথা ঠিক চারিটি চারিটি কথার অন্তরে আছে। এই ইঙ্গিত অনুসারে পত্রের আরম্ভ হইতে প্রত্যেক পঞ্চম কথা একত্রে পড়িয়া দেখিয়াছিলাম যে কথাগুলি এইরূপ দাঁড়ায় "চারি রাজাবাগান নোটের লেটার নম্বর নাই পাঁচখানি পাঠাও বাকী কলে ভাঙ্গাও"। অতএব পত্রলেখক যে এই কথাগুলি লিখিবার জন্যই এরূপ সুকৌশলে বাক্য বিন্যাস করিয়াছিল, তাহাতে আমার আর সন্দেহ ছিল না।

বাঙ্গালীর পেটে কোন কথা থাকা বোধহয় বিধাতার নিয়ম নহে। সেই কারণে হারানো নোটের যে সিরিয়াল নম্বর নাই, একথা কলিকাতা সহব ময় রাষ্ট্র হইয়াছিল। কাজেই জুয়াচোরদের একথা জানিতে অধিক কষ্ট পাইতে হয় নাই।

নায়েব নিষ্কৃতি পাইয়া আমার নিকট আসিয়া কৃর্তজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। আমি তাঁহাকে উপদেশ দিলাম যে যদিও তিনি লাটুদহের জমিদারের নায়েব, কিন্তু তথাপিও বাস্তার প্রত্যেক ভদ্র লোকের সহিত আলাপ করাটা ঠিক হয় নাই।

সরলাবালা দাসী

বুদ্ধিমান রাজার স্বর্গযাত্রা

প্রথম সর্গ

রাজসভাতলে বসি রাজা বুদ্ধিমান,
রাজকার্য করিছেন প্রফুল্ল বয়ান।
হেনকালে প্রজাগণ চারিদিক হতে,
প্রণাম করিল আসি রাজচরণেতে।
বলিল একটি ঠক পশেছে নগরে,
নিশি দিন আমা সবে জ্বালাতন করে।
ঠকাইয়া ধন রত্ন সব নিয়ে যায়,
বাঁচে না প্রজারা প্রভু, কি হবে উপায়।
কোন বেশে কবে আসে বুঝিতে না পারি,
কেমনে বুঝিব প্রভু, ঠকের চাতুরী।
শুনিয়া প্রজার মুখে ঠকের কাহিনী,
অস্থির হইল রাজা পরমাদ গণি।
কহে আমি বুদ্ধিমান বুদ্ধে বৃহস্পতি,
মম রাজ্যে ঠক আসে এমন শকতি।
বুদ্ধি-জালে জড়াইয়া ঠক্‌কে ধরিব,
কত বুদ্ধি রাখে ঠক সকলি বুঝিব।
মম বুদ্ধি হতে বল কার বুদ্ধি বড়,
কেন ভয় পাও সবে যাহ নিজ ঘর।

এত কহি বুদ্ধিমান মনেতে বিচারি,
নগরে পাহারা দিল দশ পাঁচ কুড়ি ।
সুরাপানে মত্ত হয়ে পাহারা সকল,
নগরের প্রান্তভাগে ঘুমায় কেবল ।

দ্বিতীয় সর্গ

কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথি নিশীথ সময়,
অন্ধকারে পথ ঘাট দৃষ্টি নাহি হয় ।
হেন কালে বুদ্ধিমান নিজ হর্ম্যতলে,
পূজিছেন শিবলিঙ্গ অতি কুতূহলে ।
চন্দন কুসুম চুয়া কুসুমের হার,
ধুপ দীপ নৈবেদ্যাদি নানা উপচার ।
হেনকালে ঠক এক চিন্তি মনে মনে,
ধরিল শিবের মূর্তি পরম যতনে ।
হরিষে হাড়ের হার গলায় পরিল,
ব্যাঘ্র চর্ম পরি নিজ বসন ত্যাজিল ।
খড়ি মাটী গুলি অঙ্গে রং ফলাইল,
দর্পণ ধরিয়া ভালে ত্রিনেত্র আঁকিল ।
দু একটি মৃত সর্প স্কন্ধে জড়াইয়া,
চলিল রাজার কাছে বলদে চড়িয়া ।
রাজদ্বারে গিয়া দোরে করে করাঘাত,
সে শব্দে রাজার ধ্যান ভাঙ্গিল হঠাৎ ।
বাহিরে থাকিয়ে ঠক বম্ বম্ করে,
রাজা গিয়া দ্বার খোলে হরিষ অন্তরে ।
বলদে চড়িয়া ঠক গৃহে প্রবেশিল,
আমি শিব আসিয়াছি রাজাকে বলিল ।
রাজা ভক্তিভাবে চাহি দেখে বার বার,
উপাস্য দেবতা শিব সম্মুখে তাহার ।
আনন্দে অস্থির হয়ে বুদ্ধিমান রাজা,
হীরক প্রবাল দিয়ে তারে করে পূজা ।
ঠক কহে তুমি রাজা ভকত প্রধান,
এ জগতে কেহ নাই তোমার সমান ।
তোমার পূজায় তুষ্ট হইলাম অতি
তাই আজি স্বর্গ ছাড়ি মর্তে মম নতি ।
পুণ্য কৃষ্ণ চতুর্দশী তাতে নিশাকাল,
এ সময়ে সুরলোকে চল মহীপাল ।
মর্ত্যবাস তব রাজা পূর্ণ হইল আজ,
আজ তব গতি হবে দেবের সমাজ ।

রাজা বলে অধমের গতি মাত্র তুমি,
এখনি তোমার সঙ্গে স্বর্গে যাব আমি ।
অধম পাতকী জনে এত তব দয়া,
তোমার চরণে আমি সঁপিলাম কায়া ।
ঠক বলে এক কথা শুন তবে রাজা,
সশরীরে স্বর্গে যাওয়া নাহি হয় সোজা ।
স্বর্গে যেতে মানবেরা যত কষ্ট পায়,
সে সকল কষ্ট কিন্তু স্পর্শিবে তোমায় ।
যোড় হাত করি রাজা কহে তবে ধীরে,
কষ্ট বিনে স্বর্গ সুখ কেবা লাভ করে ।
ঠক কহে তবে রাজা মুদ নেত্রদ্বয়,
খুলিবে, যখন মম অনুমতি হয়
বাক্যব্যয় না করিয়া চলহ ভূপতি,
বাক্যব্যয়ে হইবে না স্বর্গপুরে গতি ।
এই আমি চলিলাম বলদে চড়িয়া,
নীরবে বৈসহ তুমি লাঙ্গুল ধরিয়া ।

তৃতীয় সর্গ

ঠকের ইঙ্গিত পেয়ে চলিল বলদ,
লাঙ্গুল ধরিয়া রাজা ভাবে গদ গদ
চলিল চতুর ঠক কাঁটা পথ দিয়া
জর্জর হইল রাজা কণ্টক ফুটিয়া
কত শিমুলের কাঁটা কত বেল কাঁটা
ঘটাইল রাজ অঙ্গে শোণিতের ঘটা ।
কণ্টকে কণ্টকে রাজা হল জর জর,
তবুও অটল রাজা না হয় কাতর ।
ভাবে এত কষ্ট নয় সুখেরি কারণ,
কষ্ট বিনে স্বর্গে যেতে পারে কোন জন ।
রহিল কণ্টকে বিঁধি বসন রাজার,
তথাপি সঙ্কোচ দুঃখ না হয় রাজার
ধুলা কাদা মল মুত্র শরীরে ভরিল,
তথাপি ভকত শ্রেষ্ঠ চক্ষু না মেলিল ।
ভাবে অনুমতি বিনে মেলিলে নয়ন,
যদি আর নাহি হয় স্বর্গ দরশন ।
সঙ্গে করি স্বর্গে শিব না লয়েন যদি,
আমা সম অধমের কি হইবে গতি ।
এত ভাবি অতি জোরে নয়ন মুদিয়া,
শিব মূর্তি ধ্যান করে তন্ময় হইয়া ।

ব্যথিত বলদ অতি লাঙ্গুলের টানে,
আতঙ্কে অস্থির হয়ে ছোটে প্রাণপণে,
এইভাবে কিছুক্ষণ করিলে গমন,
রজনীর শেষ ভাগ দিল দরশন।
একটি কলুর গৃহে রাজাকে লইয়া,
কলুর ঘানির পরে দিল উঠাইয়া।
গোটা কত গরু তাতে বাধি আনি দিল,
শিক্ষিত ঘানির শব্দে রাজা পুলকিত,
মনে ভাবে এই বুঝি স্বরগের রথ।
ঠক বলে শুন ওহে ভকত প্রধান,
এই রথে স্বর্গধামে করিবে প্রয়ান।
চক্ষু না মেলিবে তুমি কথা না কহিবে,
তা হইলে সশরীরে স্বর্গপুরে যাবে।
আমিও তোমার সঙ্গে অন্তরীক্ষে রব,
সময় হইলে ধরি স্বর্গে উঠাইব।
স্বর্গের অনেক পথ এসেছ রাজন,
এই দেখ স্বর্গ গন্ধ মধুর কেমন।
এত বলি তাড়াতাড়ি ঠক চূড়ামণি,
ঢেলে দিল একশিশি "কুন্তলীন" আনি।
"কুন্তলীন" সৌরভেতে বিমুগ্ধ রাজন,
ভাবে আছে সম্মুখেতে পারিজাত বন।
সময় বুঝিয়া তবে ঠক পলাইল,
অভ্যাসে ঘানির গরু ঘুরিতে লাগিল।
ঘ্যার ঘ্যার ঘ্যার ঘ্যার ঘানির শব্দে,
রাজা ভাবে যাইতেছে রথ স্বর্গ পথে।
এই ভাবে বিভাবরী প্রভাত হইল,
কলুর গৃহের লোক সকল জাগিল!
ঘানির সে শব্দ শুনি আশ্চর্য মানিল,
এত ভোরে ঘানি ঘোরে গরু কে বাঁধিল?
দেখিতে চলিল সবে হয়ে একত্রিত
ভয়ানক দৃশ্য হেরি হইল চমকিত।
ঘানি পরে উপবিষ্ট বুদ্ধিমান রাজা।
কোমল শরীরে তার কতরূপ সাজা।
পরণে বসন নাই উলঙ্গ শরীর,
শরীর কন্টকাকীর্ণ বহিছে রুধির।
মল মূত্র মাখা অঙ্গ রাজা বুদ্ধিমান,
নেত্রদ্বয় নিমীনিত প্রফুল্ল বয়ান।
কিসের সুগন্ধ এক কোথা হতে আসে,
সে গন্ধে ভ্রমর ছোটে মনের উল্লাসে।

সকলে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসে রাজায়,
নয়ন না মেলে রাজা উত্তর না পায়।
তখন সকল লোক বিষণ্ন অন্তরে,
সংবাদ কহিল গিয়া মন্ত্রীর গোচরে।

চতুর্থ সর্গ

সংবাদ শ্রবণে মন্ত্রী আশ্চর্য হইল,
রাজাকে আনিতে লোক পাঠাইয়া দিল।
রাজার অবস্থা হেরি অতি বিপরীত,
দাস দাসী লোকজন হল বিষাদিত।
কিসে হল এ দুর্দশা জিজ্ঞাসে রাজায়,
তবু বুদ্ধিমান রাজা উত্তর না দেয়।
অবশেষে লোক বলে বিষণ্ন অন্তরে,
সংবাদ বলিল গিয়া মন্ত্রীর গোচরে।
তখন আপন মন্ত্রী সেই স্থানে গিয়া,
বিস্ময় মানিল অতি রাজাকে দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল কেন রাজা সিংহাসন ছেড়ে,
বসিয়া রয়েছ কলু ঘানির উপরে।
দাস দাসী লোকজন জিজ্ঞাসে তোমায়,
কোন জন কোন রূপ উত্তর না পায়।
হে রাজা নয়ন দুটি মেল একবার,
এই দেখ আমি মন্ত্রী সম্মুখে তোমার,
এমন দুর্দশা তব কে করেছে বল,
এখনি তাহারে আনি দিব প্রতিফল।
রাজা কহে মন্ত্রী আমি মেলিলে নয়ন,
আর না হইবে মম স্বরগে গমন।
স্বর্গ যাত্রা করিয়াছি শুভক্ষণ করি,
তুমি কেন বাদ সাধ করিয়া চাতুরী।
পুণ্যফলে স্বশরীরে স্বর্গে যাই আমি,
তাহাতে আসিয়া মন্ত্রী হিংসা কর তুমি।
মন্ত্রী কহে ভাল স্বর্গে চলেছ রাজন,
সকলি বুঝিবে যদি মেল দু নয়ন।
রাজা কহে ঘ্রাণশক্তি হীন মন্ত্রী তুমি,
স্বরগের গন্ধ যায় দশ ক্রোশ ভূমি।
এ গন্ধ কি নাহি যায় তব নাসিকায়,
নিতান্তই মূর্খ তুমি কি বলিব হায়।
মন্ত্রীও সে সু সৌরভে মোহিত হইল,
বহু অন্বেষিয়া শিশি বাহির করিল।

কহিল এ "কুন্তলীন" স্বর্গ গন্ধ নয়,
চক্ষু মেলি একবার দেখ সমুদয়।
ঠকে ঠকাইয়া তোমা এনেছে এখানে,
পরম দয়ালু ঠক মারে নাই প্রাণে।

এত শুনি বুদ্ধিমান নয়ন মেলিল,
ঠকের চাতুরী সব বুঝিতে পারিল।
নিজের অবস্থা দেখি লজ্জিত বিশেষ,
"বুদ্ধিমানের স্বর্গযাত্রা" এইখানে শেষ।

অম্বুজা সুন্দরী দাসী

পঞ্চম বৎসর

আমার চাক্‌রী

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্কুল ছাড়িয়া চাক্‌রীর জন্য প্রথম দুই বৎসর কত লোকের যে উমেদারী করিয়াছি, বৃথা আশায় মুগ্ধ হইয়া কত লোকের দ্বারে প্রত্যহ কতবার যে যাওয়া আসা করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। সে সময় যেখানে চাক্‌রী খালির একটু আভাস মাত্র জানিতে পারিতাম অমনি 'পেরির' চাকচিক্যময় সলাইন 'ফুলস্কেপ্‌' কাগজে যথাসাধ্য সুন্দররূপে দরখাস্ত লিখিয়া সেই মহাতীর্থ সদৃশ সাহেবমণ্ডিত অফিসমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। বাটী হইতে বাহির হইবার সময় মনে স্বতঃই আশার এই ক্ষীণ শিখাটি জ্বালিয়া উঠিত যে 'এবার লাগলেও লাগতে পারে'। কিন্তু হায় প্রত্যাগমন কালে প্রতিবার এক হৃদয়-ভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস সেই ক্ষীণ শিখাটিকে নির্বাপিত করিয়া দিয়া হৃদয়ের চিরনিবদ্ধ অন্ধকারকে অধিকতর ঘনীভূত করিয়া তুলিত। প্রথম প্রথম বাড়ীর সকলেই বিশেষ উদ্বিগ্নচিত্তে আমার প্রত্যাগমন অপেক্ষায় থাকিত ; এবং বাড়ী ফিরিবার পর যখন তাহারা আমার ক্রন্দনোন্মুখ মুখ হইতে নিষ্ফলতার নিরস কাহিনী শ্রবণ করিত তখন বোধহয় আমার ন্যায় তাহারাও মর্ম্মের কোন অংশে একটা ক্ষুদ্র আঘাত অনুভব করিত। তাই সে সময় তাহারা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিত 'হায়, এমনি পোড়া অদৃষ্ট ?'

এইরকমে দুই বৎসর চলিয়া গেল। আমিও নিষ্ফলতার পেষণে দিন দিন পিষ্ট হইতে লাগিলাম। কিন্তু তবুও চাকরীর আশা ছাড়িতে পারিলাম কই ? পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যহ সংবাদপত্রের অপেক্ষায় অতি প্রত্যুষে লাইব্রেরীর চির পরিচিত বেঞ্চে গিয়া বসিয়া থাকিতাম। তাহার পর কাগজ আসিলে অগ্রে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপনটি আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতাম। সৌভাগ্যবশতঃ যদি কোন উপযুক্ত চাকরী খালির বিজ্ঞাপন থাকিত তাহা হইলে তীক্ষ্ণধার ছুরির সাহায্যে তৎক্ষণাৎ সেইটিকে হস্তগত করিতাম। একখানি কাগজে উহার অবিকল নকল সংগ্রহ না করিয়া উহাকে স্বস্থানচ্যুত করিবার তাৎপর্য, পাছে অন্যে দরখাস্ত করিয়া আমার আশা-পথ কণ্টকিত করিয়া তুলে ! তখন চাকরী এতই অমূল্য বস্তু হইয়া পড়িয়াছিল।

নিয়মিত লাইব্রেরী হইতে কর্ম্মখালির সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ডাক মারফত দরখাস্ত পাঠাইতে লাগিলাম। কেবল যেগুলি বিজ্ঞাপন দাতার ঠিকানা সমেত প্রকাশিত হইত সেই

সকল স্থলে নিজে যাইয়াই দেখা করিতাম। এই রকমে আরো কিছুদিন কাটিল। তাহার পর একদিন দুপুর বেলায় ডাকহরকরা আমার নামে একখানি চিঠি দিয়া যায়। তখন আমি দিবা নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম। কারণ সময় আমার 'কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই'। ঘুম ভাঙ্গিলে ছোটো ভাই চিঠিখানি দিয়া গেল। চিঠির উপরে আমার নাম ও ঠিকানা লিখা ছিল। এবং উহা খুলিবার সময় মোহরের উপর নজর পড়াতে দেখিলাম উহা প্রথমে জেনারেল পোষ্ট আফিসে ফেলা হইয়াছিল। তখন আবার আশার বাণী হৃদয়-কর্ণে বাজিয়া উঠিল। কম্পিত হস্তে ত্রস্তভাবে চিঠি খুলিয়া পড়িয়াই আহ্লাদে লাফাইয়া উঠিলাম। একটি আফিস হইতে সাহেব চিঠি লিখিয়া ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। অবিলম্বে এ শুভ সংবাদ বাড়ীর সকলে শুনিল। বয়স্ক ব্যক্তিরা বলিলেন, "হবে না ত কি! তুই কি লেখা পড়া শিখিস্ নি?" স্ত্রী লোকেরা বলিলেন, "আহা তাই হোক। এই পূর্ণিমাতে বাবা-সত্যনারা'ণের স' পাঁচ পয়সার সিন্নি দেব।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চিঠি খানিতে পর দিবস দশটার সময় সাহেবের সহিত তাঁহার আফিসে দেখা করিবার কথা লিখা ছিল। সুতরাং পর দিবস নয়টার মধ্যেই স্নানাহার শেষ করিয়া লইতে হইল। তাহার পর সিন্দুক হইতে জামা কাপড় বাহির করিয়া বেশভূষা করিয়া দেবতাদের উদ্দেশে দেবতাদের প্রণাম করিয়া যখন সিঁড়ি দিয়া নামিতেছি সেইসময় রতনদার সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা হইল। রতনদা সম্পর্কে আমার ঠাকুরদাদা হইতেন।

তিনি আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কিহে ভায়া আজ এত সকাল সকাল কোথায়?"

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম "আজ্ঞে এই চাকরীর চেষ্টায়।" রতনদা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথাও জোগাড় হোল নাকি?"

আমি। "এক জায়গা থেকে পাঠিয়েছে।"

রতনদা। "তা একবার উপরে চল। বিশেষ দরকার আছে।"

পুনরায় উপরে যাইতে আমি অনেক আপত্তি করিলাম। অধিক কি ইহাও জানাইলাম যে সাহেব দশটার সময় দেখা করিতে লিখিয়াছেন। কিন্তু তখন এসব আপত্তি শুনে কে? রতনদা আমাকে টানিয়া উপরে লইয়া গেলেন এবং মাকে ডাকিয়া বলিলেন "বৌমা, ছেলেটাকে কি এমনি করে সাজিয়ে দিয়ে সাহেবের কাছে পাঠাতে হয়। এ বেশে সাহেবের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে যে তারা দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে। কই চিরুণী খানা দাও?"

মা হাসিতে হাসিতে চিরুণী ও ব্রাশ আনিয়া দিলেন। তখন রতনদা আমার কেশ বিন্যাসে বসিয়া গেলেন। সে সময়ে আমাকে ছাড়িয়া দিবার জন্যে আমি কত কাকুতি-মিনতি করিলাম কিন্তু তিনি আমাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না। অধিকন্তু যখন আমি বড়ই অধীর হইয়া উঠিলাম তখন তিনি কর্কশ স্বরে বলিলেন "দেখ্ ছোঁড়া এবার নড়বি তো দুই গালে দুই চড় বসিয়ে দেব।" পাঁচ মিনিট পরে রতনদার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। তখন তিনি আমার সম্মুখে আরসিখানা ধরিয়া বলিলেন "দেখ্না শালা দেখ্না; এখন কা'কে দেখ্তে ভালো হ'লো! তোকে না তোর এই বুড়ো দাদাকে?"

প্রত্যুত্তরে আমি একবার দর্পণে আমার চেহারাখানা ভালো করিয়া দেখিয়া ঈষৎ হাসিলাম। তখন রতনদা বলিলেন "দেখিস্ ভাই, সাহেব দেখে যেন ভেবড়ে যাস্নে? মাথা

ঠাণ্ডা করে' সাহেবের কথাগুলো আগে ভালো করে' শুনে তাহার পর বেশ গুছিয়ে তাহার জবাব দিস্। যদি একবার কাজে বসতে পারিস্ তা' হ'লে আমি বলে' দিলুম তোর চাকরী আর মারে কে ? এমন চাঁদপানা মুখ দেখলে সাহেবের মাথা ঘুরে যাবে ! দাদা, আমরাও এক সময় সাহেবের চাকরী ক'রে সংসার ধর্ম ক'রেছি। সাহেবদের মেজাজ বুঝতে আমাদের আর বাকী নেই। আমরা বরাবর দেখেছি যে লোকটার চেহারাখানা একটুকু জমকালো, যার রংটা একটু কটা,—মুখখানা ঘোরালো সে মাহিনা বাড়িবার সময় ঠিক দশটাকা পেয়ে বসে আছে আর আমাদের মতো কালিন্দে-কেষ্টরা গোণা পাঁচটী টাকা তাও অতি কষ্টে।"

আমি অনুগত ভক্তের ন্যায় তদ্গতচিত্তে রতনদার বক্তৃতা সেদিন আর বেশী শুনিতে পারিলাম না। কারণ পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম তখন বেলা প্রায় সাড়ে নয়টা। রতনদাও পিছনে 'দুগ্গা' 'দুগ্গা' বলিতে বলিতে বাজারে চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে অফিসে পৌঁছিয়া সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। সেদিন সাহেব আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করিয়াছিলেন। সাহেবের সঙ্গে কথা কহিবার সময় আমার মনে রতনদার উপদেশ জাগিতেছিল। তাহার ফলে আমার প্রত্যুত্তরে সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে একটি পঁচিশ টাকার কার্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন ; এবং পর দিবস হইতে কাজে যোগ দিবার জন্য আমাকে বলিয়া দিলেন।

বাড়ী আসিয়া দেখি রতনদা আমার অপেক্ষা করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন দাদা, কাজ ফতে করে' এসেছ তো ?"

রতনদার কথায় আমার কেমন একটু কৌতুক করিবার প্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠিল— "হ্যাঁ, চিরকাল যা হয়ে আসছে তাই হয়েছে !"

"কি গলা ধাক্কা ?"

"তাছাড়া আর কি !"

"তাই বুঝি আজ চোখের কোণে জলের বদলে হাসির ঢেউ'! দূর শালা শাশুড়ে।"

এইবার আমি হাসিয়া ফেলিলাম। তখন আর প্রকৃত কথা গোপন করা চলিল না। আমার সফলতায় সকলেই আহ্লাদ প্রকাশ করিল বটে কিন্তু সেদিন সেই সরল বৃদ্ধ যে যথার্থ সুখ অনুভব করিয়াছিল তাহার দীপ্তিহীন নিরস চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়া তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিয়াছিল।

সাহেব পছন্দ করিয়া লইয়াছে এই হিংসায় আফিসের অপর বাবুরা দিনকতক আমার সঙ্গে কেহই আলাপ করিল না। আমি যে বাবুটীর অধীনে নিযুক্ত হইয়াছিলাম তিনিও আমার পরিচয় গ্রহণের ইচ্ছাপ্রকাশ না করিয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবু তোমার কত টাকা মাহিনা হোলো ?"

অপরিচিত ব্যক্তি পরিচয় গ্রহণ না করিয়া সর্বাগ্রে তাহার আয়ের খতিয়ান লওয়া যে শিষ্টাচার বিরুদ্ধ ইহা জানিয়াও আমি যথাসম্ভব নম্রস্বরে বলিলাম "আজ্ঞে-- পঁচিশ টাকা।"

"একেবারেই পঁচিশ টাকা ?" এই বলিয়া তিনি পার্শ্ববর্তী আর একটি বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন "নরেন, এখানে তোমার দেখছি আর কোনো সুবিধা নাই। এখন বাহিরের লোকদেরই খাতির বেশী।"

নবেন বলিল, "তাই ত দেখ্ছি। আচ্ছা পরে বোঝা যাবে।"

নরেনের কথায় আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। কিন্তু ইহার কারণ তখন কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। ক্রমে শুনিলাম আমি যাঁহার অধীনে কাজ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলাম তাঁহার নাম প্রিয়বাবু এবং নরেন তাঁহারই পুত্র। সে তখনও এপ্রেন্টিস্ খাটিতেছিল। আমাদের ঘরে আমরা এই তিনজন ছাড়া আর কেউ বসিত না।

কাজকর্ম বুঝিতে একমাস কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে আফিসের সকল বাবুর সঙ্গে আমার একপ্রকার আলাপ হইয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে হারুবাবুর সঙ্গে আমার বড়ই ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। হারুবাবু বা হারাণবাবু জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি আফিসে সিপ্‌সরকাবের কাজ কবিতেন। নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজে রপ্তানি মাল পাঠাইয়া দিয়া কাপ্তেনের নিকট হইতে মালেব রসিদ লওয়া এবং আমদানি মাল জাহাজ হইতে খালাস করিয়া আনিয়া গুদাম-জাত করা হারুবাবুর কাজ ছিল। সেইজন্য তিনি কোম্পানীর কাছ হইতে আঠারটি টাকা বেতন পাইতেন। ইহা ছাড়া ব্রাহ্মণের আরো দু' পয়সা উপরি পাওনা ছিল। হারুবাবুর একে বয়স হইয়াছিল তাহার উপর হাঁপানির দৌরাত্ম্যে তিনি একেবারে ধনুকের ছিলার ন্যায় বাঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। হারুবাবু আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। টিফিনের পর যদি কোনো দিন তিনি আমাকে টিফিন ঘরে একলা দেখিতে পাইতেন তাহা হইলে মালিকে পুনরায় তামাক সাজিতে বলিয়া তিনি আফিস সংক্রান্ত অনেক গুপ্ত বিষয়ের রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া আমাকে ভবিষ্যতে বিশেষ সাবধান হইবার জন্য সতর্ক করিয়া দিতেন। বলা বাহুল্য সেই তিনি আমার নিকট প্রত্যেক বাবুর প্রকৃতির বিশিষ্ট পরিচয় দিতে তিনি কখনও সন্দেহমনা হইতেন না। তিনি বেশ জানিতেন যে আমি ভুলেও তাঁহার এই সরল বিশ্বাসের প্রাণঘাতী প্রতিফল দিবার বাসনায় অকৃতজ্ঞের পথ অবলম্বন কবিব না।

যেদিন হারুবাবুর মুখে আমার প্রতি প্রিয়বাবু ও তাঁহাব পুত্র নরেনের আন্তরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের আভাস পাইলাম সেইদন বুঝিলাম এখানে থাকিযা আমার অন্ন করিয়া খাওয়া অধিক দিন চলিবে না। কোনো অছিলায় আমার এই পঁচিশ টাকা চাকরীর মাথা খাইবাব জন্য ইঁহারা সর্বদা সচেষ্ট রহিবেন। সেদিন বাড়ী আসিযা বতনদার সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাকে একথা বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন "ভায়া বলতে কি আমিও অমন তোমার মতো কত ছোঁড়ার পেছনে প্রথম প্রথম লেগেছিলুম ; কিন্তু তাহার পর তাহারা যত পুরোনো হয়ে আস্‌তো আমারও তাদেব সঙ্গে বেশ মিল হ'য়ে যেত। দাদা, ওটা আফিসের একটা প্রধান দস্তুর। তুমি এখন এক কাজ করো। তোমার বাবুর ও তাহার ছেলের দিনকতক খুব খোসামোদ লাগিয়ে দাও। তা হ'লেই দেখবে সব বাঁকা চাল সোজা হ'য়ে আসবে।"

আমি বলিলাম, "এদের কাছে খোসামোদ যে কিছু হবে তা'ত আমার বিশ্বাস হয় না। বিশেষত ছেলেটা ত একটা বিচ্ছু!"

এই কথা শুনিয়া রতনদা কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন "খোসামোদে বশ হয় না এমন লোক তো আজ পর্যন্ত দেখ্‌লুম না। নিয়মিত রূপে দেবতার অর্চনা করিলে তিনিও মুখ তুলে চান, তা মানুষ কোন ছার! এই বুড়োর কথাটা শুনে তুই ভাই একবার ওদের খোসামোদ করেই দেখ্‌না। তাহার পর এতেও যদি তাহারা তুষ্ট না হয় তা হ'লে পিয়াদায় আক্কেল সেলামী দিয়ে যাবে।"

সেই দিন মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম যে রতনদার কথানুযায়ী চলাই বুদ্ধিমানের কার্য। আর শাস্ত্রেও বলে "বৃদ্ধস্য বচন্যং গ্রাহ্য"।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রতনদার পরামর্শ মতো প্রিয়বাবু এবং তাহার উপযুক্ত পুত্র নরেনের মন জোগাইয়া চলিতে লাগিলাম। তাহাদের মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া কাজ করিতে লাগিলাম। বাড়ী আসিবার সময় তাঁহাদের সঙ্গে কিছুদূর আসিয়া পুনরায় সোজা পথে ফিরিয়া বাড়ী আসিতে লাগিলাম। অবশেষে একদিন তাহাদের পিতা-পুত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ীতে আনিলাম। সেদিন হারুবাবুকেও নিমন্ত্রণ করিবার লোভ ছাড়িতে পারি নাই। ব্রাহ্মণ ইহাতে বড়ই খুশী হইয়াছিলেন। সেদিন সকলে আহারে বসিলে পর রতনদা প্রিয়বাবু এবং নরেনকে বেশ মিষ্ট ভাষায় আমার হইয়া অনেক কথা বলিয়াছিলেন। প্রিয়বাবুও আমার উন্নতি চেষ্টা করিবার জন্য তখন মৌখিক স্বীকৃত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু প্রাণে বোধহয় ঈর্ষার বাতি জ্বলিতেছিল।

আহার শেষ হইলে প্রিয়বাবু পুত্রের সহিত বিদায় লইলেন। তিনি হারুবাবুকেও সঙ্গে যাইবার জন্য ডাকিয়াছিলেন কিন্তু হারুবাবু তখন ধূমপানের ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তাঁহাদিগকে অগ্রগামী হইতে হইয়াছিল। হারুবাবু তামাক খাইবার অছিলায় বড় বাবুর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া নির্জনে রতনদাকে বলিলেন, "দাদা, আমি এই আগুন হাতে কারিয়া দিব্য করিতেছি যে যতদিন আমার দানাপানি এ আফিসে থাকিবে ততদিন রমেশের (আমার নাম) অন্ন কেহই মারিতে পারিবে না। আমি উহাকে প্রথম হইতেই ছেলের মতো ভালোবেসে ফেলেছি।" এই বলিয়া হারুবাবু খুব জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন।

সকলে চলিয়া গেলে রতনদা আমাকে বলিলেন "দেখ্‌লি শালা চাঁদপানা মুখোর জোরটা দেখ্‌লি! দাদা, এর আগে একদিনও কি তুমি জানিতে পেরেছিলে যে এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তোমার অজ্ঞাতে তোমাকে একেবারে এতটা ভালোবেসে ফেলেছে? তোমার পিছনে পিছনে হিতকারী বন্ধুর ন্যায় ওই ব্যক্তি সর্বদাই ফিরিতেছে? তুমি উহার শত ভাবনার মধ্যে একটা প্রধান ভাবনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছ?" এই বলিয়া রতনদা খানিক থামিলেন। তাহার পর পুনরায় বলিলেন "ভাই আর এক কাজ কর; ভুলেও কারুর অনিষ্ট চেষ্টা কবিও না। তাহা হইলে দেখিবে উন্নতির পথ কত সোজা কত সরল।"

সেই মাসের মাহিনা হস্তগত হইলে আমি প্রিয়বাবুর কেশবিরহিত মস্তকের জন্য দুই শিশি কুন্তলীন এবং নরেনের জন্য এক শিশি দেলখোস কিনিয়া লইয়া বাড়ী আসিলাম। পর দিবস আফিসে আসিবার পূর্বে রতনদাকে আমার সঙ্কল্পের কথা জানাইয়া বলিলাম— "দাদা, মুখে এত খোসামোদ করিতেছি তবুও বাপ বেটার মন পেলুম না। ছেলেটাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে গেলে সেতো ফোঁস করিয়া উঠে। আর যিনি কর্তা তিনি তো সকল কথার একটু ভূমিকা না কবিয়া সিধা জবাব দেন না। তাই কাল আসিবার সময় মনে করিলাম প্রিয়বাবুর জন্য দুই শিশি কুন্তলীন কিনিয়া লইয়া যাই; এবং নরেনকেও কিছু না দিলে সে একেবারে রাগে গস্‌ গস্‌ করিবে তাই এই দেলখোসটা তাহার জন্য আনিয়াছি। আমার এখন কেউটের চেয়ে সলুইকে বেশী ভয়। কিন্তু দাদা, তাও বলি এরকম করে কি চাকরী করা পোষায়!"

রতনদা বলিলেন "দাদা, দিন কতক এই রকম ক'রে কাজ কর্মগুলো শিখে নাও তাহার পর আর কে কার খোঁজ রাখে?" শেষে বলিলেন "তা তোমার এ পলিসি মন্দ নয়। আর যদি তোমার বরাত জোরে এবং তেলের গুণে প্রিয়বাবুর মাথায় কচি কচি দুর্ব্বো ঘাসেব মতো চুল গজিয়ে যায় তা হ'লে সে তোমাকে একটু স্নেহ না করে' কখনোই থাকতে পারবে না। আর ওই নরেন ছোঁড়াটাকে এত ভয় করবার বিশেষ কারণ দেখি না।"

সেইদিন আফিসে গিয়া প্রথমেই প্রিয়বাবুকে দুই শিশি তৈল উপহার দিলাম। বলাবাহুল্য সেদিন তাঁহার চির গাম্ভীর্য্য সমাকীর্ণ মুখমণ্ডল কিছুক্ষণের জন্য হাস্য বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। এবং নরেনও আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিল।

সেই বৎসর পূজার সময়ে নরেনের পনর টাকা মাহিনা হইল। প্রিয়বাবু ছেলের জন্য যথাসাধ্য ওকালতী করিয়াছিলেন ; কিন্তু সাহেব কিছুতেই তাঁহার রায় বদলাইলেন না। বরঞ্চ প্রিয়বাবুকে বলিয়াছিলেন "তোমার ছেলে যদি রমেশের মত চালাক হইত এবং কিছু লেখাপড়া বোধ থাকিত তাহা হইলে আমি কিছুতেই রমেশকে কাজে লইতাম না। রমেশ আজকাল ইনভয়েসের সমস্ত কাজ একলা করিয়া থাকে। এবং আমরাও উহাকে একাজে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি। কিন্তু তোমার ছেলে দুই বৎসর আফিসে থাকিয়াও একটা সামান্য এক্সচেঞ্জ কসিতে পারে না। তুমি কোন সাহসে তাহার হইয়া রেকমেণ্ড করিতে আসিয়াছ ? যাও, যাও ইহার অধিক আর কিছু হইবেক না।"

প্রিয়বাবু সাহেবের কামরা হইতে বিষণ্ণবদনে নিজ স্থানে আসিয়া বসিলেন। অমনি নরেন তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। প্রিয়বাবু বিরক্ত হইয়া তাহাকে তাহার জায়গায় যাইয়া বসিতে বলিলেন। গতিক যে ভালো নহে আমি তাহা আভাসে বুঝিয়াছিলাম।

সেইদিন টিফিন ঘরে হারুবাবু আমাকে প্রকৃত বিষয় জানাইয়াছিলেন। নরেনের মাহিনা লইয়া সাহেবের সহিত প্রিয়বাবুর কথাবার্তা তিনিই আমাকে বলিয়াছিলেন।

এখন আমি আর প্রিয়বাবুর তাঁবে নহি। ইনভয়েস সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের চার্জ এখন আমার উপর। আমার টেবিলের দুই পার্শ্বে দুইটি ড্রয়ার তৈয়ার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাড়ী আসিবার সময় এখন হইতে উহার ভিতর সমস্ত কাগজপত্র রাখিয়া চাবিবন্ধ করিয়া আসিতে হয়। চাবি দক্ষিণ দিকের ড্রয়ারের গায়ে ঝুলাইয়া আসিতাম। এখন আমাব একটি বিশেষ কাজ কমিয়াছে। প্রিয়বাবুর মনস্তুষ্টি সম্পাদনের নিমিত্ত আমাকে আর নিত্য নব পথ অন্বেষণের জন্য মাথা ঘামাইতে হয় না। তবে উহা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। বোধহয় ইহার কারণ স্নায়বিক দুর্বলতা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যেদিন নরেনের মাহিনা ঠিক হইল সেইদিন হইতে প্রিয়বাবুর মেজাজ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছিল। আফিসের কাজ করিতে হয় তাই তিনি করেন। এখন তাঁহাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে প্রিয়বাবু স্বল্প কথায় তাহার জবাব দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। সকল বিষয়ে ঔদাসীন্যের লক্ষণ দেখা যাইত। সমস্ত কাজেই গাফিলতার যেন একটা সূক্ষ্ম আস্তরণ জড়িত থাকিত। নরেনের প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। সে যেন কিসের অন্বেশণে নিয়ত ছোঁক ছোঁক করিয়া এধার ওধার ঘুরিয়া বেড়াইত ; এবং অবসর পাইলেই আমার উন্মুক্ত ড্রয়ারের মধ্যে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিমেষ মধ্যে অভ্যন্তরস্থ বস্তুগুলির একখানি সঠিক তালিকা গ্রহণ করিত। সে সময় হঠাৎ আমাদের দৃষ্টি বিনিময় ঘটিলে সে থতমত খাইয়া জিজ্ঞাসা করিত যে, আগামী 'মেলের' জন্য সেবার কতকগুলি ইন্‌ভয়েস বিলাতে পাঠাইতে হইবে ? আমি তাহার চাতুরী বুঝিতে পারিয়াও তাহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতাম। কিন্তু নরেনের এবম্বিধ অস্বাভাবিক অস্থিরতা এবং গুপ্ত উদ্দেশ্য সাধনহেতু চতুরতার কারণ বড় অধিক দিন গোপন রহিল না। একদা বৈশাখের ঈষদুষ্ণ মধ্যাহ্নে তাহার বিদ্যাবুদ্ধি সমস্তই প্রকাশ হইয়া পড়িল।

ইন্‌ভয়েসের সমস্ত কাজ আমার হাতে আসাতে আফিসের সকল সাহেবের সহিত আমার অল্পাধিক সংশ্রব ছিল। সুতরাং দিনের মধ্যে অনেকবার আমাকে সাহেবদের ঘরে যাওয়া আসা করিতে হইত। এক সপ্তাহের 'মেল' চলিয়া গেলে আমাকে আবার পরবর্তী মেলের জন্য প্রস্তুত হইতে হইত। বস্তুতঃ অপরাপর কেরাণীর ন্যায় বৃহস্পতিবারে মেল ক্লোজ করিয়া সপ্তাহের অবশিষ্ট কয়দিবস একটু আরাম করিবার অবসর আমার ছিল না। সাহেবরা ইহা জানিতেন; এবং সেইজন্য আমার বেতন সম্বন্ধেও ইতিপূর্বে তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন।

বৈশাখ মাসের কোন্ তারিখ মনে নাই এক বুধবারে রাত্রি সাড়ে আটটা পর্যন্ত বাতি জ্বালিয়া পর দিবসের মেল সম্বন্ধীয় যাবতীয় কাজ একপ্রকার শেষ করিয়া বাড়ী ফিরি। পূর্বের ন্যায় সে দিবসও লাল ফিতা সংলগ্ন চাবির গোছা ড্রয়ারের গায়ে ঝুলান ছিল। পর দিবস একটু সকাল সকাল আফিসে আসিয়াছিলাম। তখন বেলা নয়টার বেশী হয় নাই। সে সময়ে আফিসে কেহই আসে নাই। কেবলমাত্র আমাদের পাখাটানা কুলী আমাদের ঘরের বাহিরে আমাদের অপেক্ষায় বসিয়াছিল। আমি আসিলে সে সেলাম ঠুকিয়া পাখা টানিতে আরম্ভ করিল। আমি অগ্রে লাল কালি দিয়া একখানি ছোটো কাগজে 'শ্রীদুর্গা' লিখিলাম। তাহার পর ড্রয়ার হইতে ইন্‌ভয়েসগুলি বাহির করিয়া লইয়া একবার কসা মাজাগুলি মিলাইয়া লইলাম। বেলা দশটার পর আফিসের সমস্ত বাবু ও সাহেবরা আসিলেন। সেদিনও হারুবাবু অভ্যাস মত আসিয়া একটি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিলেন। এবং তৎপরিবর্তে আমার মস্তক আশীর্বাদ বচনে অভিষিক্ত করিয়া তিনি নীচে গুদামঘরে চলিয়া গিয়াছিলেন।

বেলা একটার পরে ছোটো সাহেব আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ছোটো সাহেব প্রতি মেলের ইন্‌ভয়েস চেক করিয়া তাহাতে সই করিলে তবে উহা বিলাতে পাঠানো হইত। একটার পর হইতে চেক আরম্ভ হইত। ছোটো সাহেবের ডাক শুনিয়া ইন্‌ভয়েসের তাড়া লইয়া আমি তাঁহার কামরায় প্রবেশ করিলাম। তাহার পর সাহেবের বই-এর সহিত মিলাইয়া চেক হইতে লাগিল। দুইটার কিছু পূর্বে সমস্ত ইন্‌ভয়েস চেক হইয়া গেল; আমিও চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলাম। তখন ছোটো সাহেব সস্মিত বদনে আমাকে আমার প্রভূত পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ দিলেন। বলা বাহুল্য আমিও সপ্তাহের দারুন পরিশ্রম জনিত ক্লান্তি মনিবের একম্বিধ গুণগ্রাহিতার আতিশয্যে ত্বরায় বিস্মৃত হইলাম। তাহার পর যখন আমি আমার নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া বসিলাম সেই সময় নরেন জিজ্ঞাসা করিল "কিহে রমেশ, সমস্ত ইন্‌ভয়েস চেক করা হয়ে গেল নাকি?"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "হ্যাঁ ভাই, বাঁচা গেল!"

কিঞ্চিৎ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল— "একেবারে সমস্ত?"

তখন আমার কেমন সন্দেহ হইল। তাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন বল দেখি; এক আধখানা কি টেবিলে পড়েছিল?

"না তাই বলছিলুম; এই এতগুলো ইন্‌ভয়েস এরই মধ্যে চেক হয়ে গেল, আর এক আধখানা পড়ে থাকবার যো কি! সাহেব বই-এর সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে সব তবে তো ছেড়েছো?"

নরেনের কথায় আমি একটু সামান্য 'হু' দিয়া তারপর নিরস্ত হইলাম।

সেইদিন বেলা চারিটার সময় বড় সাহেব আমার তলব করিলেন। হঠাৎ মেনেজারের ডাক শুনিয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। কারণ কোন বিশেষ আবশ্যক না হইলে মেনেজার

কাহারও বড় একটা খোঁজ করেন না। তদ্ব্যতীত আফিসের নূতন পুরাতন সমস্ত বাবু মেনেজারের সুদীর্ঘ মূর্তিটিকে যমের ন্যায় ভয় করিত। আমিও তাহাদের দলের একজন। সুতরাং যূপকাষ্ঠবর্তী উৎসৃষ্ট ছাগশিশুর ন্যায় কম্পিতকলেবরে ধীরে ধীরে মেনেজারের সুবৃহৎ কামরায় গিয়া ঢুকিলাম। সে সময়ে ছোটো সাহেব মেনেজারের কামরায় গিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমি ঘরে প্রবেশ করিলেই মেনেজার তাঁহার উজ্জ্বল নীলাভাযুক্ত গোল চোখ দু'টি আমার ভয়বিকম্পিত শুষ্ক মুখের উপর রাখিয়া অতি কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবু, লিভার পুলের গানির ইন্‌ভয়েস কোথায়? মিষ্টার জার্ডিন কি তোমায উহা দেন নাই?" জার্ডিন ছোটো সাহেবের নাম।

আমি কম্পিত কণ্ঠে বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ছোটো সাহেব যে আমাকে উহা দিয়াছিলেন তাহা আমার বেশ স্মরণ আছে। আমি উহা এখনি আমার টেবিল হইতে আনিয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া সাহেবের ঘর হইতে বাহির হইয়া একেবারে আমার টেবিলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তাহার পর তন্ন তন্ন করিয়া ড্রয়ার দু'টি খুঁজিলাম। পার্শ্ববর্তী ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি হইতে কাগজগুলি তুলিয়া তাহাদের পরীক্ষা করিলাম কিন্তু আবশ্যক ইন্‌ভয়েসের কোন সন্ধান পাইলাম না। তখন ব্যাকুলকণ্ঠে নরেনকে সমস্ত বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "ভাই, যদি পেয়ে থাক দাও, আমি তোমাকে এই মাসের মাহিনা পেলে যাহা খেতে চাও তাহাই খাওয়াইব। দাও ভাই যদি নিয়ে থাক এ সময়ে দাও। এখন সাহেবকে দিতে না পারলে আমাকে জেল খাটতে হবে।"

আর বলিতে পারিলাম না আমার গলা ধরিয়া আসিল। চক্ষুদ্বয় জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

গম্ভীরবদনে নরেন উত্তর দিল "বাঃ! আমি কি জানি? তুমি কি আমার কাছে উহা জিম্মা রাখিয়াছ যে এখন চাচ্ছ? বেশ লোক ত! তুমি এখন জেল খাটবে কি পাথর ভাঙবে তা আমি কি জানি!"

অধিক বিলম্ব হইতে দেখিয়া ছোটো সাহেব আমাদের ঘরে আসিয়া আমাকে ইনভয়েসেব কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন আমার শরীরের সমস্ত রক্ত একসঙ্গে আমার মাথায় আসিয়া জমা হইয়াছিল। আমি জড়িতস্বরে কহিলাম "কই সেটা দেখতে পাচ্ছি না!"

ছোটো সাহেব বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "কি বললে; দেখতে পাচ্ছো না? সেটা কোথায় গেল? তুমি জান, মার্চেন্টদের ইনভয়েসই প্রাণ! বিশেষতঃ ওই লিভারপুলেব ইনভয়েস আমাদের হেড আফিস অনেক কষ্টে এবার অন্য পার্টির হাত থেকে সিকিওব করেছে। সেইজন্য নতুন কাজ বলিয়া উহা আমার বইএর মধ্যে লিস্টভুক্ত ছিল না। তাই চেক করিবার সময় ধরা পড়ে নাই। কিন্তু উহা ম্যানেজারের নোট বুকে টোকা ছিল। কই, তোমার ড্রয়ার দেখি?"

আমি সরিয়া দাঁড়াইলাম। ছোটো সাহেব ড্রয়ার দু'টি বেশ করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম বৃথা হইল। ইনভয়েস পাওয়া গেল না।

সাহেবের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় মেনেজারের কামরায় প্রবেশ করিলেন। সে সময় তাঁহারা পরস্পর যে কি বলাবলি করিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। তখন আমার বোধ হইতে ছিল যেন আমার চারিদিকের আলমারি সজ্জিত দেওয়ালগুলি আমাকে বেষ্টন করিয়া বর্তুলাকারে ঘুরিতেছিল। আমার সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত হইযা উঠিয়াছিল।

কতক্ষণ পরে জানিনা মেনেজারের বজ্র গম্ভীরস্বরে আমার চেতনা শক্তি আনিয়া দিল।

তিনি বলিলেন "হ্যালো বাবু, এ ইনভয়েসের জন্য দোষী কে ?"

আমি শুষ্ককণ্ঠে কাতর স্বরে কহিলাম "আজ্ঞে আমিই দোষী। কিন্তু—"

মেনেজার বাধা দিয়া বলিলেন "আমি 'কিন্তু' শুনিতে চাহি না। কেবল যাহা জিজ্ঞাসা করি তুমি তাহারই উত্তর দাও।" তখন পুনরায় প্রশ্ন হইল "তুমি আর কাহাকেও ইনভয়েস দিয়াছিলে ?"

"না"।

"তবে উহা যে তোমার দ্বারাই যে কোন প্রকারে নষ্ট হইয়াছে ইহা ঠিক কেমন ?"

"তাহা বলিতে পারি না।"

"কেন ?"

"কারণ যখন আমি জ্ঞাতসারে এক টুকরা কাগজ ভালো করিয়া পরীক্ষা না করিয়া নষ্ট করি না তখন—"

"আমি ওসব শুনিতে প্রস্তুত নহি। এর জন্য তোমাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এখন তুমি আপনার জায়গায় যাও।" প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে আমি বাহিরে আসিলাম। অমনি অফিসের যত বাবু অধিক কি দপ্তরি, বেহারা অবধি আসিয়া আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। এবং চারিদিক হইতে অনর্গল প্রশ্নধারা আমার দিকে বর্ষিত হইতে লাগিল। আমাকে অধিকতর ক্লান্ত করিয়া তুলিল।

ইহাদিগের মধ্যে নরেনের ঔৎসুক্য সর্বাপেক্ষা অধিক। সে কখন আমাকে প্রশ্ন করিতেছিল কখন বা ছোটো সাহেবকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছিল·"রমেশ very useful hand এখন রমেশের হাতে hand cuff লাগাও। মরে যাই আর কি "শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর !"

আফিসের চারিদিকে তখন আমার কথা লইয়া আন্দোলন চলিতেছিল।

খানিকপরে ছোটোসাহেব মেনেজারের ঘর হইতে আমাকে ডাকিলেন। আমি ধীরে ধীরে টেবিলের ধারে গিয়া দাঁড়াইলাম তখন মেনেজার বলিলেন "দেখ বাবু, আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে, আমি পুলিশ ডাকিয়া এ বিষয়ের মীমাংসা করি কিন্তু মিস্টার জার্ডিন তাহা করিতে দিলেন না। তুমি বোধহয় জানো যে জার্ডিন সাহেব তোমাকে খুব পছন্দ করিতেন। তিনি এখনও বলিতেছেন যে, একাজ বোধহয় তোমার দ্বারা হয় নাই। কিন্তু এটা কেবল তাঁহার কল্পনামাত্র। আজ তুমি আমাদের যে ক্ষতি করিলে ইহার জন্য বোধহয় আমাকে হেড আফিস হইতে বিস্তর ভর্ৎসনা সহ্য করিতে হইবে। যাহা হউক আমি তোমাকে এই দণ্ডে ডিস্‌মিস্ করিলাম। তুমি এখনি আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও।"

ভয়ে ভয়ে মেনেজারকে একটি শেষ সেলাম করিয়া যেমন আমি আমার কম্পিত মস্তকটি তুলিয়াছি সেই সময় দেখি হারুবাবু আমাদের ঘরের পাখাটানা কুলীর সহিত আমার পিছনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি সেলাম করিয়া বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিলে এক দৃঢ় মুষ্টিতে আমাকে ধরিগা অন্য হস্তে মেনেজারকে সেলাম করিয়া হিন্দীতে বলিলেন "হুজুর আমি আপনার ইনভয়েসের খবর জানি।"

মেনেজার ব্যগ্রভাবে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে ? তুমি ইনভয়েসের কি জান ?"

"আমি হুজুরের চাকর। আমি আজ ত্রিশ বছর হুজুরের আফিসে সিপ্ সরকারের কাজ করিতেছি।"

"তুমি কি জান বল।"

"এই ছোকরা রমেশ, যাহাকে আপনি এইমাত্র ডিস্‌মিস্‌ করিলেন, তাহার মত বিশ্বাসী প্রভুভক্ত চাকর বোধহয় হুজুরের আর একটিও নাই। অধিক কি আমিও তদ্রূপ নহি কিন্তু আফিসের বাবুরা কেহই ইহার অনুকূল নহে বরং সকলেই ইহার অল্পাধিক শত্রু। ইহার প্রধান শত্রু আপনার বড়বাবু প্রিয়বাবু এবং তাঁহার উপযুক্ত পুত্র নরেন। তাহার সাক্ষ্য এই দেখুন।"

এই বলিয়া হারুবাবু পরিহিত অর্দ্ধমলিন বস্ত্রের এককোণ হইতে একখানি শততালি সংযুক্ত কাগজ বাহির করিয়া মেনেজারের সম্মুখে রাখিলেন।

মেনেজার কাগজখানি দেখিয়াই চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাই জোভ্‌, এই সেই ইনভয়েস।"

ছোটো সাহেবও ততোধিক চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, "তাইতো! কিন্তু এমন করিয়া ছিঁড়িয়া পুনরায় জোড়া দিলে কে?"

হারুবাবু বলিলেন "হুজুর কে ছিঁড়েছে তাহা আপনি এই পাঁচ টাকার চাকর পাখাটানা কুলীর মুখে শুনুন। এই কুলীই আমাকে ছেঁড়া ইনভয়েস দিয়াছে। আর আমিই জাহাজে মাল বোঝাই করিবার সময় ইহাকে পুনরায় পূর্বাকারে গড়িয়া তুলিয়াছি।

তখন পাখা টানা কুলী বলিল, "হুজুব সাহেব, এই হারুবাবু আমাকে মাসে মাসে আট আনা জল খেতে দেন। ইনি বলে দিয়েছেন রোজ আটটার সময় আমাকে আফিসে এসে দেখতে হবে যে কোন্‌ বাবু সকালে এসে কি করেন। যদি কেউ কিছু ছিঁড়ে ফেলেন, তাহলে আমাকে সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে হারুবাবুকে দিতে হয়। আজ বেলা সাড়ে আটটার পর নরেনবাবু আপিসে আসেন। তাহার পর রমেশ বাবুর মেজের চাবি খুলে একখানা কাগজ নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেন; আর সেই ছেঁড়া কাগজ আমায় ফেলে দিতে বলেন। আমি নীচে গিয়ে গুদাম ঘরের গাঁটরীর পাশে সেগুলি রাখিয়া দিই। তাহার পব হারুবাবু আসিলে তাঁহাকে ছেঁড়া কাগজগুলি দিয়া নিশ্চিত হই।"

তৎপরে সে ইনভয়েস খানির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিযা বলিল, "হুজুর সাহেব, এই সেই নরেনবাবুর ছেঁড়া ইনভয়েস।"

পাখাটানা কুলীর জবানবন্দী শুনিয়া সাহেবদ্বয় পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন। তাহার পর ছোটো সাহেব হারুবাবুকে জিজ্ঞাসা কবিলেন "বাবু, তুমি এই কুলীকে মাসে আটআনা করিয়া দিয়া প্রত্যহ বেলা আটটার সময় আফিসে আসিতে বলিয়াছিলে কেন?

হারুবাবু বলিলেন "হুজুর, আটটার সময় কেন আসিতে বলিয়াছিলাম তাহা ত আপনি উহার নিজ মুখেই সমস্ত শুনিলেন। তবে কেন আমি এরকম মতলব কবিয়াছিলাম তাহা শুনিবার আপনার অধিকার আছে। আমি কেবল এই রমেশকে নিরাপদে রাখিবার জন্যে এই এতগুলি দুর্দান্ত, চির-অনিষ্টকরী বাবুদের হাত হইতে এই নিরীহ বালককে রক্ষা করিবাব জন্য এই পথ অবলম্বন করিয়াছিলাম। আমি রমেশের অনিষ্টের যে আশঙ্কা করিযাছিলাম অবশেষে তাহাই ঘটিয়াছে।"

ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিলেন "রমেশ তোমার কে হয়?" সাহেবের প্রশ্নে এইবার হারুবাবুর স্বর কাঁপিতে লাগিল। তিনি সিক্তকণ্ঠে বলিলেন "হুজুর, রমেশ আমার কেউ নয় কিন্তু রমেশ আমার সব। উহার নির্মল স্বভাব, সরল প্রকৃতি এবং সর্বাপেক্ষা উহার সুন্দর প্রতিমূর্তি এই বৃদ্ধকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। উহার বাহির যেমন নয়নাকর্ষক, অন্তর ততোধিক পবিত্র। আমি উহাকে ছেলের মতো ভালোবাসি।" এই বলিয়া হারুবাবু বস্ত্রপ্রান্তে চক্ষু মুছিলেন।

সেই সময় ছোটো সাহেব বলিয়া উঠিলেন "Baboo, you are quite right!"

ম্যানেজার তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া আঠারো টাকা বেতনভোগী সিপ্ সরকার হারুবাবুর সহিত করমর্দ্দন করিলেন। এবং তাঁহার এই পরোপকারিতার জন্য ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তৎপরে আমার নিকট আসিয়া ধীরে ধীরে আমার অপবাদ-লাঞ্ছিত মস্তকটি দুইহাতে তুলিয়া ধরিয়া সেন্‌হপূর্ণস্বরে বলিলেন "রমেশ, মিস্টার জার্ডিন যে যথার্থই নির্দ্দোষীর উপর তাঁহার বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা আমি এতক্ষণে বেশ বুঝিলাম। আর তোমার গুণের পুরস্কার স্বরূপ আজ হইতে আমি তোমাকে আমাদের প্রধান নেটিভ এসিসটেন্টের পদে নিযুক্ত করিলাম। তুমি আমার পূর্ব ব্যবহার ভুলিয়া যাও।"

এইবার নরেনের খোঁজ পড়িল। ছোটো সাহেব প্রিয়বাবুকে ডাকিলেন। তিনি শুষ্ক মুখে সাহেবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বে হারুবাবু বলিলেন "হুজুর, অদ্যকার এই ঘটনার বিষয় প্রিয়বাবু কিছুই জানিতেন না। আশা করি আপনি উঁহাকে রেহাই দিবেন।"

সাহেব প্রিয়বাবুকে চিরকালের নিমিত্ত অবসর দিলেন। কিন্তু নরেনের সন্ধান কেহই বলিতে পারিল না। সে ইতিপূর্বেই আফিস পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

সেদিন বাড়ী আসিবার সময় অনেক জেদ করিয়া হারুবাবুকে আমাদের বাড়ীতে আনিয়াছিলাম। তাহার পর রতনদা'কে ডাকিয়া আনিয়া যখন একে একে সবিস্তারে হারুবাবুর কীর্তি কাহিনী বলিলাম, তখন রতনদা হারুবাবুকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া বলিলেন "ভাই, আমি রমেশকে সাজাইয়া গোজাইয়া বাঘের মুখে পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম। কিন্তু তুমি তাহাকে সমস্ত দিবস মাতৃপক্ষপুট নিহিত পক্ষীশাবকের ন্যায় তাহাদের দুর্দান্ত আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া অবশেষে তাহার মস্তকে এই মহিমাময়ী স্নেহ মুকুট পরাইয়া দিয়া আপনার অকপট বাৎসল্যের পূর্ণ পরিচয় দিলে।"

দৃঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ প্রবীণ বন্ধুদ্বয়ের চক্ষের অবিরল আনন্দাশ্রু সেদিন আমার অভিশপ্ত মস্তকে চিরকালের নিমিত্ত যেন শান্তিবারি বর্ষণ করিয়াছিল।

সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বৈসূচন

কুসুমকুমারী বিবাহের পর যখন প্রথম শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিল, তখন সুখের পরিবর্তে বিষাদ, হাস্যের পরিবর্তে কাতর নিশ্বাসের ঘন বেদনা তাহার হৃদয়খানিকে সবলে বেষ্টন করিয়া রহিল। পিত্রালয়ের সেই অযাচিত স্নেহ, অকারণ আবদার, অবিরাম ক্রীড়া, উন্মুক্ত বায়ু, বিমল আনন্দ,—সর্বোপরি চারি বছরের ক্ষুদ্র ভ্রাতার বিদায় বিধুর মলিন মুখ খানির কণ্টকিত স্মৃতি তাহার এই নিঃসঙ্গ বধূজীবনকে প্রতি মুহূর্তে ব্যথিত করিয়া তুলিতে ছিল!

পল্লীগ্রামে অতি সামান্য ঘটনায় বিবাদ বাধিয়া ওঠে, বিশেষতঃ বরকর্তা ও কন্যাকর্তার মধ্যে নিতান্ত সূক্ষ্ম সূত্র অবলম্বন করিয়াই নারদ ঋষি শুভাগমন করিয়া থাকেন! কালীকুমারবাবু পুত্রের বিবাহ দিবার পূর্বে কুসুমকুমারীর পিতাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিবার সংক্ষিপ্ত উপায় নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া তাঁহাকে যে একখানি সুদীর্ঘ ফর্দ প্রদান করিয়াছিলেন,—বিবাহের পর যখন দেখিলেন, তাহার মধ্য হইতে দুই একটি জিনিষ বাদ পড়িয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা তাঁহার পূর্ব গ্রথিত বিপুল ঋণজাল অকস্মাৎ ছিন্ন হইবার কোন

সম্ভাবনা নাই, তখন দুঃখে ক্ষোভে তিনি একান্ত ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন। পুত্র নবকুমারও অপরূপ-রূপ সমন্বিতা মনোমত "রাজকন্যা" একং "অর্ধেক রাজত্ব" প্রাপ্তির আশায় জলাঞ্জলি পড়িল দেখিয়া নিতান্ত সংক্ষুব্ধ হইল।

কালীকুমার বাবু বৈবাহিক মহাশয়ের এই অসমীক্ষ্যকারিতাব কোন প্রতিফল দিবার সদুপায় স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। দুই একজন সহৃদয় সুহৃদ্ পুত্রের পুনরায় বিবাহ দিয়া বৈবাহিককে জব্দ করিবার পরামর্শ নিয়াছিলেন। তাঁহারও কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু গৃহিনী বধূর অশ্রু জলে প্রাণপ্রিয় পুত্রের অকুশল হইবে আশঙ্কায় যখন অন্ন জল ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, তখন বাধ্য হইয়া বন্ধুজনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে হইল! পরিশেষে, এই রুদ্ধস্রোত রোষ-প্রবাহ দশ বৎসরের বালিকা কুসুমকুমারীর উপর নিক্ষেপ কবিয়াই আপাততঃ নিশ্চিন্ত থাকিবেন, মনে করিলেন। পুত্রবধূকে নিজালয়ে আনয়ন পূর্বক আর পিত্রালয়ে যাইতে দিবেন না, স্থির হইল। উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া কুসুমকে আনিবার জন্য পাল্কী পাঠাইলেন।

(২)

বিবাহের পর কুসুম এই নূতন স্বামীর ঘর করিতে যাইতেছে। বালিকা বলিয়া মাতা যাহা যাহা শিখাইতে হয়, শিখাইলেন। শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, জা ও দেবর প্রভৃতি কাহাকে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে,—কুসুম অবিহিতচিত্তে সে অমৃতময়ী উপদেশ-বাণী গলাধঃকরণ করিল। তাহার পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ কুসুমকে একটু আড়ালে লইয়া গিয়া স্বামীর প্রতি আদব করাটাও বেশ বুঝাইয়া দিল। কুসুম কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিয়া ভ্রাতৃবধূব উদ্দেশ্যে একটি ছোট কিল উঠাইল!

কুসুমকুমারী বাহিরে পাল্কীতে উঠিতে যাইতে ছিল, এমন সময়ে চৌকাঠে হুঁচট লাগিয়া একটু রক্তপাত হইল। মাথার উপর একটি কালো টিক্‌টিকি "টীক্‌টীক্" করিয়া উঠিল। কুসুমকুমারীর সরলতান্ধ কোমল হৃদয় ভয়ে দুরু দুরু করিয়া উঠিল। পিতামহী বলিলেন "কুসুম, একটু বসে' যাও মা, বাধা পড়লো—।"

কুসুম ফিরিয়া আসিয়া মায়ের কাছে বসিল : স্নেহময়ী জননী যেন কোন্ অজ্ঞাত অমঙ্গলে ভীত হইয়া প্রাণসমা কন্যাকে একবার বক্ষের মাঝে চাপিয়া ধরিলেন। একটা তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার গণ্ডে আসিয়া ঠেকিল। জননী "ষাট"—বলিয়া আর একবার কন্যাকে বক্ষে ধরিলেন। তারপর বিদায় দিলেন!

(৩)

চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। দশ বৎসরের বালিকা কুসুম এখন চতুর্দশ বৎসরের যুবতী। যৌবন-প্রভাবের অরুণ-প্রভা তাহার প্রতি অঙ্গে ফুটিয়া উঠিতেছে।

এই সুদীর্ঘকালে কুসুমের ভাগ্যে একদিনের জন্যেও পিতামাতার স্নেহ, ভাই ভগিনীর ভালোবাসা, সঙ্গিনীগণের প্রীতি সম্ভাষণ ঘটিয়া উঠে নাই—কদাচিৎ নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় ম্লান হাসিয়া ফুটিয়া ওঠে মাত্র।

সব সহ্য হয়—কিন্তু "ননী ভাইটির" মুখখানি কুসুম ভুলিবে কি করিয়া? সে আজ দুই দুই বৎসরের কথা—যেদিন কুসুম বিদায় দিয়া আসিয়াছিল। ননীর সেই করুণ আঁখি কুসুম

ভুলিবে কি করিয়া ? কুসুম উঠিবার সময় ননীর সেই "দিদি" বলিয়া কাতর সম্বোধনে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি কতবার গৃহপানে ছুটিয়া আসিয়াছিল সে সব কথা কুসুম কেমন করিয়া ভুলিবে ? পিতা মাতাকে কুসুম ভুলিতে পারে—যে পিতা মাতা কন্যাকে একটি কথা ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না সে পিতামাতাকে ভুলা যায় ! কিন্তু নিরপরাধ বালক ননী ! কুসুম তাহাকে ভুলিবে কি করিয়া ? না জানি ননী এখন কত বড় হইয়াছে ! এখন বুঝি সে নিজে নিজেই কাপড় পড়িতে, জুতা পায়ে দিতে শিখিয়াছে !

—এমনি করিয়া কুসুম কত কথা ভাবিত ! কত কথা কতভাবে আসিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানিকে কখন আশার কোমল স্পর্শে, কখন নিরাশার বজ্র সংঘর্ষণে জাগাইয়া তুলিত। তাহার সমগ্র বালিকা-বক্ষের ভিতর দিয়া এমনি একটা ব্যাকুলতা, এমনি একটা গোপন আকাঙ্ক্ষা, এমনি একটা নীরব ব্যথা সঞ্চালিত হইয়া যাইত যে, সে নিজেই তাহার আকাঙ্ক্ষিত ধন, বেদনার হেতু সকল সময়ে ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিত না।

শাশ্বত সুখ যেমন মানব ভাগ্যের অগম্য ঠিক দুঃখও তেমনি ! কুসুমের এত বিষাদ এত চিন্তার মধ্যেও একটি মধুর চিন্তা স্থান পাইল, সে তাহার স্বামীকে মনে মনে ভালবাসিয়া রাখিযাছিল ! সে ভালবাসা মেঘাশ্রিত বলাকার ন্যায় তেমনি শুভ্রোজ্জ্বল ! জলপ্রপাতের ন্যায় তেমনি স্নিগ্ধ ! গভীরগর্ভ সিন্ধুর ন্যায় তেমনি অতল !! এই চিন্তাকে অবলম্বন করিয়া কুসুম মাঝে মাঝে ননীকে ভুলিবার আয়োজন করিত ;—কিন্তু হায়, তাহাও হইত—স্বামী যদি কুসুমকে একটু প্রাণ খুলিয়া ভালোবাসিত !—হায়, হায়, বিধাতার রাজ্যে দানের প্রতিদান কই ?

(৪)

এমনি করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া, বুকের বেদনা বুকে বহিয়া স্বামীর তাচ্ছিল্য, পিতা-মাতার স্নেহবৈমুখ্য, শ্বশুর শাশুড়ীর কঠোরতা সহিয়া সহিয়া কুসুমের আরও পাঁচবৎসর কাটিল। এত দুঃখ, এত কষ্ট তো আর সহা যায় না,—মরিতে পারিলেও ত বুঝি একটু—সান্ত্বনা মিলিত। কিন্তু হায়, ননীর মুখখানি একটিবার না দেখিয়া কুসুম কেমন করিয়া মরিবে ? তাই কুসুম মনে মনে ভাবিয়া ভাবিয়া, ভাঙ্গিয়া গড়িয়া একটি মতলব ঠিক করিল। নিশীথে স্বামী নিদ্রিত হইলে কুসুম গোপনে বসিয়া একখানি পত্র লিখিল। "ননী ভাইটি আমার, আমাকে সকলেই ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তুমিও কি আমায় ভুলিলে ? আমাদের সে শৈশব-ভালোবাসা কি ভুলিবার ভাই ? তোমার কুসুম দিদির কোলে বুকে যে ভাই তোমার জীবনের কতো বৎসর কাটিয়া গিয়াছে তাকি তোমার মনে নাই ? ভাইটি, সে স্নেহের, সে ভালোবাসার কিছুই পুরস্কার নাই ? আর কিছু চাই না, চুপ করিয়া আমাকে একটিবার আমাকে দেখিয়া যাও, আমি বেশীদিন বাঁচিব না ! তোমার আসার সময় মা কি বাবা যেন টের না পান।"

দাসীর হাতে দিয়া কুসুম সে চিঠি পরদিন ননীর কাছে পাঠাইয়া দিল।

(৫)

ননী আর এখন সে ননী নাই। কুসুম দিদির কোলে কোলে বেড়ানো,—কুসুম দিদির ইটের ঘরে পক্ক—পরমান্ন-ভোজী, কদলী পত্রের ঘণ্টপ্রত্যাশী নেহাত ছেলে মানুষটি নহে ! সে এখন গ্রাম্য পাঠশালায় কেরোসিন কাষ্ঠের বাক্সে বসিয়া গুরু ম'শায়ের সুচিক্কণ

বেত্রাদণ্ডের মহিমা ভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছে ; পদার্থ কয় প্রকার, ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার—এইরূপ নানাবিধ সুকঠিন সমস্যা সমূহের ভাবনির্ণয়ে সে তখন রীতিমতো সমর্থ !

কিন্তু বড় হইলেও ননী কুসুমকে ভুলিয়া যায় নাই। পড়িতে পড়িতে খেলিতে খেলিতে কুসুম দিদির সেই স্নেহ চর্চিত মুখখানি তাহার মনে পড়িয়া যায়। কতদিন সে মা'র কাছে কুসুম দিদিকে দেখিতে যাইবার জন্য "বায়না" ধরিয়াছে। "তুমি ও বাড়ীতে যেও না বাবা, সেখানে আমাদের যেতে নেই—" বলিয়া কতবার মাতা তাহাকে "ভোগা" দিয়াছেন। কিন্তু ননীর স্নেহ-কাতর বক্ষঃ সেই কঠিন আদেশ প্রদান মানিয়া নিয়া কতবার না বিদীর্ণ হইয়াছে।

প্রথম একদিন ননীর মা, ননীকে কুসুমের বাড়ী যাইবার জন্যে অনুমতি দিয়াছিলেন বলিয়া ননীর বাবার সঙ্গে তাঁর বড় ঝগড়া হইয়াছিল। ননীর পিতা স্বভাবতঃই অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক ছিলেন। তারপর ক্রমান্বয়ে চারি পাঁচটি কন্যা "পার" করিতে করিতে তাঁহার মেজাজ আরো একটু চড়িয়াছিল। বিশেষতঃ বর্তমান বৈবাহিক মহাশযের পৈশাচিক ব্যবহারে তিনি আরও চটিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কোমলপ্রাণা জননীর সন্তান বাৎসল্য কি কোন সামাজিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে ?—মাতা অনেক মিনতি কবিয়া স্বামীকে বলিলেন "তুমি একবার কুসুমকে আনিতে লোক পাঠাও, তবু তাহাকে চোখের দেখা দেখবো। তারপর তারা তাদের বউ নিতে না চায়—না নিবে ; আমি যখন পেটে ঠাঁই দিয়েছি তখন না হয় 'হাঁড়িতেও' ঠাঁই দেব।"

কিন্তু সকল স্নেহ-যুক্তি তাঁহার কাছে টিকে নাই। তাঁহার কঠোর আদেশ "এ বাড়ীর যে লোক সেখানে পা দিবে তার এ বাড়ীতে ঢুকা নিষেধ—তা ছেলেই হোক্—আর মেয়েই হোক্—"। শুনিয়া ননীর মা মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিয়াছিলেন।

সেইদিন হ'তে ননী আর দিদির বাড়ী যাইবার নামও করে না। কিন্তু দিদির স্মৃতি তাহাকে সর্বদা উৎপীড়ন করিতে ছাড়িত না।

(৬)

যথাসময়ে কুসুমের চিঠি ননীর হস্তগত হইল। কুসুম দিদির শ্বশুর বাড়ীব লোক পত্র বাহিকা দিদি লেখিকা, সুতরাং চিঠির কথা কাহারও নিকট ঘুণাক্ষরেও জানিতে দিল না। গোপনে পত্রখানি পড়িল। গোপনে বড় বড় বাঁকা বাঁকা অক্ষবে দিদিকে লিখিল--

"তোমাকে আমি কত ভালোবাসি, তোমার কথা কত ভাবি, তাহা চিঠিতে কেমন করিয়া জানাইব ? যদি তোমার সঙ্গে একদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়, তবে তোমার নিকট সে সকল কথা প্রকাশ করিব। কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াটাও কত কঠিন। তুমি মেয়েমানুষ, বাড়ীর মধ্যেই থাকো, কেমন করিয়া গোপনে দেখা হইবে ? তাই আমি মনে করিয়াছি, আমিও মেয়ে মানুষের মতো কাপড় পরিয়া, ঝি'র সঙ্গে তোমাদের বাড়ীর মধ্যে গিয়াই তোমাকে দেখিয়া আশা মিটাইব, নতুবা এমনি গেলে তোমাকে হয়তো সেজন্য গাল খাইতে হইবে। আবার এখানকার কেউ জানিতে পারিলে আমারও সেই দশা ঘটিবে। আমার যুক্তিটা কেমন লাগিল ?

বড় বৌদির জন্য বড় দাদা কলিকাতা হইতে কয়েক শিশি "কুন্তলীন" ও "দেলখোস" পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি তোমাকে উপহার দিবার জন্য তাহার দুইটি চুরি করিয়া রাখিয়াছি। উহা লইয়া গিয়া, তোমাকে যে আমি ভুলি নাই তাহা প্রমাণ করিব !"

ননীর পত্রের কোনো স্থানে আত্ম পরিচয় বা কোনো সম্পর্কের কথা প্রয়োগ করিল না, কি—জানি, যদি পাছে শ্বশুর বাড়ীর কেহ পত্রখানি পড়িয়া বুঝিতে পারে যে এখানি কুসুমদিদির পিত্রালয়ের পত্র !—হায়, বালক বুদ্ধি যদি সকল কুটিলতার মধ্যে অবাধে প্রবেশ করিতে পারিত, তাহা হইলে শৈশব এত সুখের হইত কি ?

(৭)

কুসুমের স্বামী নবকুমার কি ধরনের লোক তাহা এ পর্যন্ত বলা হয় নাই। পাড়াগেঁয়ে একটু অবস্থাপন্ন, অশিক্ষিত যুবক যেমন হইতে হয় সেও তেমনি ছিল। যৌবনের তৃষা, বিলাসিতার কামনা, কুশিক্ষা, অসৎ সংসর্গ প্রভৃতি লইয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবন যেমন করিয়া গঠিত হয়,—তাহারও তাহাই হইয়াছিল।

আজ কয়েকদিন হইল, নবকুমার লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে যে, কুসুম একখানি পত্র লইয়া বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে ! সেখানিকে সে কখনো বালিশের নীচে, কখনও মাথার "তাকে" কখনও সিন্দুরের ঝাঁপিতে বিড়ালের ছানার ন্যায় মুহুর্মুহুঃ স্থানান্তরিত করিয়া লইয়া বেড়াইতেছে ! একে সে চিরকালই কুসুমের প্রতি বিরক্ত, তাহাতে তাহার দূরদর্শিতাও অত্যন্ত,—এরূপ স্থলে বিদ্বান দূরদর্শী যুবকেরই মাথা ঘুরিয়া যায়,—সন্দেহ সাগরে ডুবিতে তাহার ন্যায় ব্যক্তির কতক্ষণ ? সন্দিহান নবকুমার পত্রখানি সুযোগে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

একদিন কুসুম স্নান করিতে গিয়াছিল, ইত্যবসরে নবকুমার পত্রখানি বাহির করিয়া পড়িতে বসিল। পড়িয়া তাহার চিত্ত ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিল। সে পূর্বে যাহা সন্দেহ করিয়াছিল এ পত্রখানি তাহারি অনুকূলে দেখিয়া তাহার ব্যাপার বুঝিতে বাকী রহিল না !

কিন্তু নবকুমারের এই রোষ-বহ্নি শীঘ্রই আনন্দ-ভস্মে পরিণত হইল ; সে এই ঘটনাসূত্র অবলম্বনে তাহার "কণ্টক" দূর করিবার এক উপায় ঠিক করিল !

(৮)

"কতদিন পরে—"

রুদ্ধ বাতায়ন কক্ষে স্ত্রীবেশী ননীকে বক্ষের মধ্যে ধরিয়া অজস্র চুম্বনে অভিসিক্ত করিতে করিতে স্নেহাবেগে কুসুম বলিল "কতদিন পরে" !

তারপর ভাইবোনে অনেক কথা হইল। আজ সাত আট বৎসরের সুখ দুঃখের কথা কি দুই এক ঘণ্টায় শেষ হয় ? যে প্রেম-সুখ ভোগ আগে অবারিত ছিল, সে প্রেম-সুখ কি চোরের ন্যায় চুরি করিয়া ভোগ করিয়া তেমন তৃপ্তি হয় ? অনেক কথা থাকিয়া গেল, অনেক চুম্বন বাকী রহিল, কুসুম এ জন্মে হয়ত সে বাকী শোধ করিতে পারিবে না। সুকুমার ননীকে বালিকা বেশে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। তাহার কোমল গণ্ডে বিদায়ের অশ্রু রাজি আরও সুন্দর দেখাইল।

"আবার একদিন আসিব" বলিয়া ননী বিদায় লইয়া ঘরের বাহিরে আসিতেই তাহার বিপদ হইল কে যেন দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে দেখিয়া সরিয়া গেল, ননী কুসুমের অমঙ্গল আশঙ্কা বক্ষে লইয়া গৃহে ফিরিল।

(৯)

কথা 'ছাপা' থাকে না—বিশেষতঃ কাহারও কুৎসা। কুসুমের ভ্রাতৃ-সম্মিলনও নানা প্রকারে পল্লবিত ও বহুধা রূপান্তরিত হইয়া নানা-প্রকারে লোকমুখে আন্দোলিত হইতে লাগিল। বহিঃ সাধারণ যাহা শুনিল, তাহা কতকটা এইরূপ :—"কে যেন রাত্রিকালে কুসুমের ঘরে ঢুকিয়াছিল, কুসুমের স্বামী দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধরিয়া উত্তম-মধ্যম দিয়াছে। কুসুমও অব্যাহতি পায় নাই—ইত্যাদি ইত্যাদি।" নবকুমারের পিতা—যিনি এতদিন শুধু বধূকে অবরোধ রাখিয়াই বৈবাহিককে জব্দ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; তাঁহার নিকট ইহা একটি সুযোগ বলিয়া গণ্য হইল। শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি আত্মীয়েরা বুঝিল,—ছেলে বউকে ভালোবাসে না, তাহাতে সোমত্ত মেয়ে, এমন অবস্থায় পাপ-পঙ্কে পড়িবে তাহার আর বিচিত্র কি ?

সব কথা কুসুমের কানে গেল। তাহার হৃদয় বাল্যকাল হইতে নানাপ্রকার বেদনার আক্রমন অবাধে সহ্য করিয়া আসিতেছে। কিন্তু মিথ্যা কলঙ্কাঙ্কিত অপবাদ বেদনা আজ তাহার বক্ষে বড় বাজিল ! হায়, হায়, কুসুমেব স্বামীই দেবতা কুসুমের সর্বস্ব সেও একথা বিশ্বাস করিল ! যাহাকে ভালোবাসিয়া বাসিয়া সে সারা দিন কাটাইত—তাহার কাছেও অবিশ্বাসী হইতে হইল ! তাহার চেয়ে মরাইত ভালো ! আজ কুসুমের চিন্তার শেষ নাই।

কালীকুমারবাবু বৈবাহিককে একখানি পত্র লিখিলেন— : "আপনার কন্যা দ্বিচারিণী। তাহার স্বামীর চাক্ষুষ প্রমাণই এ বিষয়েব যথেষ্ট প্রমাণ ইহাতে আপনার মুখ হয়ত উজ্জ্বল হইয়াছে, কিন্তু আমি বস্তুতঃই সমাজে অপদস্থ হইতেছি। হিন্দু গৃহের যাহা সর্বোচ্চ কলঙ্ক—আপনার কন্যা হইতে আমার তাহাও হইল। এমন বধূ ঘরে রাখিলে আমার ধর্মভয় ও লোকনিন্দা হইবে। আপনি অদ্যই লোক পাঠাইয়া আপনার কন্যাকে লইয়া যাইবেন।"

হতভাগিনী জননী শুনিয়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইলেন। কন্যার দুঃখে এতদিনে পিতার মনও গলিল। কুসুমকে সে পাপপুরী হইতে আনাই স্থির হইল ! শ্বশুর শাশুড়ী বধূকে পর করিতে পারে, কিন্তু পিতা মাতা পারে কি ?

(১০)

বালক ননীও সকল কথা শুনিয়াছিল। কিন্তু ব্যাপার তত তলাইয়া বুঝিতে পারিল না। চুপি চুপি দিদিকে লিখিল :—

"আমার জন্যই বুঝি তোমার এত লাঞ্ছনা। আমি তোমার ভাই, তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়াছিলাম, তাহাতে লোকের এত মাথা ব্যথা কেন ? ভাই বোনে দেখা-সাক্ষাৎ সেও কি একটা পাপ ? থাক্, আমি এ কথা সবাইকে বলিলেই তো সব গোল মিটিয়া যায় ; তুমি কি বল দিদি ?"

বালকের সরলতা দেখিয়া কুসুম একটু হাসিল। দীপ-নির্বাণের পূর্বে বুঝি ইহাই তাহার শেষ দীপ্ত শিখা !

পত্রোত্তরে কুসুম লিখিল :—

"ননী,

আমার মাথা খাও, একথা নিয়ে আর নাড়া-চাড়া করিও না। তোমায় বুকে করিয়া কত কষ্টে তোমায় মানুষ করিয়াছি, তার একটু প্রতিদান দাও ভাইটি ! আর এখন তুমি বুঝাইতে

গেলেই বা তাহা কে বিশ্বাস করিবে ?

মা বাবাকে বলিবে, আমার স্থান কোথায়ও নাই। শ্বশুর শাশুড়ীর লোকনিন্দা ও ধর্মভয় আছে। পিতামাতার কি তাহা নাই ? আমি কেন তাহাদের অপযশভাগিনী হইব ?”

গভীর রজনী। উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া চাঁদের আলো নিদ্রিত স্বামীর মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কুসুম ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া স্বামীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, নিঃশব্দে স্বামীর পদধূলি মাথায় লইল ! অতি নিঃশব্দে একটি কাগজের মোড়ক বাহির করিল !

তারপর সেই কাল নিশা প্রভাতে কুসুমের কি হইল ? সে কথা নূতন নহে, বহু পুরাতন অতি সাধারণ ! আমরাও মহাজন-বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলি “প্রভাতে সূর্যের সুবর্ণ আলোকে সংসার হাসিতে ছিল। জগতের রথচক্র যেমন ঘুরিতেছিল, তেমনি ঘর্ঘর রবে ঘুরিতে লাগিল, অনন্ত পথিমধ্যে কুসুম রথচ্যুত হইয়া কোথায় পতিত হইল, কে জানিল ?

সুরেশচন্দ্র সাহা

“দীপ নির্বাণ”

সে আজ অনেক দিনের কথা। আমি তখন বি এ পাশ করিয়া বেকার বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছি। শুধু আহার নিদ্রা ভিন্ন আমার আর কোন কাজ ছিল না। তবে অলস সময়ের ভার বহিবার জন্য কখন কখনও—হেম, বঙ্কিম নবীন কখনো বা ইউগো, করেলি প্রভৃতি লইয়া আমার অবসন্ন চিন্তাটুকু লইয়া আপনাকে একটু সজাগ করিযা তুলিতে চেষ্টা করিতাম। আমার মনের অবস্থাও তখন তত ভালো ছিল না, এই কথা শুনিয়াই কেহ যেন মনে না করেন যে আমি তখন একজন একের নম্বর বিরহ-বিকল-প্রেমোদ্ভ্রান্ত সন্ন্যাসী।

দীর্ঘ অবগুণ্ঠন আচ্ছাদিত ব্রীড়াবিমণ্ডিত এক খানি সরল সুন্দর সুকোমল ক্ষুদ্র মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া রজনী যাপন করিতে আমি তখনও শিখি নাই। প্রণয় কবিতা লেখা ; বাঁশরী রবে আকুল হওয়া, শীতল জ্যোৎস্না ধরিয়া কোকিলের কুহু-কুহুর সঙ্গে মিশাইয়া ছাঁকিয়া খাওয়া আর আধফোটা ফুলের দিকে হাঁ করিয়া জগৎ সংসার ভুলিয়া চাহিয়া থাকা—এ সকল বাতিকের একটিও আমাকে তখন ধরে নাই। বিরহ-ভিসু-ভিয়স্, প্রেমের প্যাসিফিকও যেন তখন আমার নিকট হইতে অনেক দূরে ছিল। আমার জীবন তখনও ঘোরতর গদ্যময়। নায়িকাবিহীন নাটকের মতো। তন্ত্রবিহীন বেহালার মতো, গন্ধবিহীন কুসুমের মতো, কণ্ঠবিহীন কোকিলের মতো আমি তখন নিতান্ত নীরস।

আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের বি এ। পরীক্ষায় পাশ বলিয়া পাশ নহে, সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী ও দর্শনে প্রথম শ্রেণীর অনারও ছিল। তাই তখন আমি আমার ভবিষ্যৎ জীবনের কত কল্পনাময় শোভন সুন্দর শিল্প চিত্র-নিত্য অঙ্কিত করিতাম। কি যে হইবে না, কি যে হইবে তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না। আমরা তিন ভাই। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডেপুটী, মধ্যম দাদা উকিল, আর আমার তো কথাই নাই। এই ত গেল আমার অবস্থা। এমন সময় বড় দাদা পত্র লিখিলেন, “ডেপুটীগিরি পরীক্ষাটা একবার দাও।” আমি ভাবিলাম ছি, এত পড়িয়া শুনিয়া শেষে “ঘটীরাম” হইবে ! কিন্তু কি করি, বাড়ীতে সকলেরই ইচ্ছা আমি একজন হাকিম হই ; বাধ্য হইয়া একটু করিযা পড়াশুনা আরম্ভ করিলাম। আত্মশক্তির উপর বাল্যকাল হইতেই আমার বড় বিশ্বাস ছিল। লোকের মুখে যখন শুনিতাম “হাকিমী

পরীক্ষাটা বড় কঠিন"—তখন শুনিয়া আমি হাসিতাম। এইবার আমার নিজের পালা আসিল। হাকিম হওয়া দূরের কথা একজন "সবডেপুটী" হওয়াও আমার অদৃষ্টে ঘটিল না। আমার সুপারিশ পত্র ছিল না। আমি কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিতাম না। কিন্তু মনে মনে ভারি চটিয়া গেলাম। স্থির করিলাম কাগজে কাগজে প্রবন্ধ লিখিব—দেশে দেশে লম্বা স্পিচ্ দিয়া বেড়াইব ; দেখিব আমাদের দেশের লোক দাসত্ব ছাড়িয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করে কিনা ! কিন্তু হায় তাহাও হইল না। সুরেন্দ্রবাবুর অনেকগুলি বক্তৃতা আমার বেশ মুখস্থ ছিল, কিন্তু সিডিশনের ভয়ে সে সব কোন কাজে আসিল না। আমার সমস্ত কল্পনা, সব অভিলাষ ভাসিয়া গেল। তখন হইতে আমি ধীরে ধীরে সংসারকে চিনিতে আরম্ভ করিলাম। আমার ভুল ভাঙ্গিল। যাক্, যা বলিতেছিলাম তাই বলি। সেদিন আমি একটু অনতি-উচ্চস্বরে "ভারত ভিক্ষা" পড়িতেছি, এমন সময়ে মেজদাদা ডাকিয়া পাঠাইলেন। "ভারত উদ্ধার" করিব বলিয়া প্রায়ই তিনি আমাকে বিদ্রূপ করিতেন, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি বইখানি লুকাইয়া রাখিয়া নিতান্ত ভালো মানুষটির মতো মেজদাদার সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। একখানি কাগজ আমার হাতে দিয়া তিনি বলিলেন "রমেশ, কালই তোমাকে কলিকাতা যাইতে হইবে। আর শ্যামবাবুর কয়েকটা জিনিষের ফরমাস—আছে ; ওই কাগজে সে সব লেখা আছে।"

আমি। "হঠাৎ কলিকাতা যাইতে হইবে কেন ?"

দাদা। সরলা অনেকদিন শ্বশুরবাড়ী আছে। তাকে এখন একবার অনিতে হয়। আমি চিঠিপত্র লিখিয়া দিয়াছি।" আমি বলিলাম, "আচ্ছা, তবে আমি যাওয়ার বন্দোবস্ত করি।"

* * *

মেজদাদার সম্মুখ হইতে আসিতে না আসিতে মেজ বৌ প্রকাণ্ড রকমের একখানি ফর্দ আনিয়া দাখিল করিলেন। প্রথমতঃ আমি অস্বীকার করায় বলিলেন "তা পারবে কেন ? যদি আর কেউ থাক্‌তো তাকে আর বল্‌তেও হতো না। দাও আমার কাগজখানা ফিরিয়ে দাও" আমি দেখিলাম তিনি কিছু অসন্তুষ্ট হইলেন তাই কাতর হইয়া বলিলাম, অসন্তুষ্ট হইবেন না, আপনার জিনিষ আমি সকলের আগে আনিব। তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে চলিয়া যাইতেছিলেন, যাইতে যাইতে হঠাৎ আবার ফিরিয়া বলিলেন "ঠাকুর পো, আমার যে কুন্তলীন আনবে সেটা যেন পদ্ম গন্ধ হয়।" বরাবরই দেশীয় তৈল, গন্ধ প্রভৃতির ওপর আমার কোন আস্থা ছিল না। আমি বাধা দিয়া বলিলাম—"কুন্তলীন কি হইবে—'ম্যাকেসার অয়েল' বেশ ভালো। আমি তাই এনে দেব। কুন্তলীনে না আছে কোনো গন্ধ না তাতে কোন উপকার হয়। কেবল তেলের রংটাই দেখতে ভাল।" তিনি একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন " তোমরা বুঝি খবরের কাগজগুলো পড় না ? দেখ দেখি কাগজে কাগজে কুন্তলীনের কত সুখ্যাৎ।"

আমি দেখিলাম তর্ক নিষ্প্রয়োজন—আমার পরাজয় ভিন্ন আর জয় হইবে না, কলহ শাস্ত্রে রমণী চিরপ্রসিদ্ধা। তাই মানে মানে রণে ভঙ্গ দিয়া বলিলাম "আচ্ছা, তাই হবে, আমি পদ্মগন্ধ কুন্তলীনই আনিব।" দেশীয় বাঙ্গালা কাগজগুলিতে আমাদের দেশের মেয়েদের আর কোন উপকার হউক বা না হউক তারা বিলাস সামগ্রীর সুললিত বিজ্ঞাপনগুলি পড়িয়া পড়িয়া সযত্নে তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে ইহা আর আমার বুঝিতে বাকী রহিল না। বঙ্গ অন্তঃপুর না থাকিলে বুঝি তাহাদের বিলাস দ্রব্য এত বিক্রয় হইত না। যাবার সময়ে বৌদিদি আবার ভালো করিয়া কাগজটা পড়িয়া দিয়া গেলেন—

খুকীর পেনি ৩টে।
সোহাগের জামা ২টা।
প্রমথের মোজা ও জুতা।
কুন্তলীন ৩ শিশি,
ভালো সাবান ৩ বাক্স।
মেজবাবুর জন্য দেল্‌খোস ২ শিশি।

আমি ভালো করিয়া শুনিয়া রাখিলাম।

আমার কলিকাতা যাত্রার সময় আসিল।

সরলা আমার ছোটো ভগ্নী। অনেকদিন পর তাহাকে আবার দেখিতে পাইব বলিয়া আমার বড় আনন্দ হইতেছিল। আহারাদির পর আমি প্রস্তুত হইলাম। আসিবার সময় বৌদিদি বলিলেন, "খুব সাবধান হয়ে যেও, আর আমার জিনিষ আনিতে ভুলিও না।" আমি হাসিয়া বলিলাম "আর কি ভুল হয়, আপনি আমার সঙ্গে যে খাবার দিলেন, পথে খিদে পেলে যদি আমি ভুল করিয়া সে সব না খাই, আর যদি ভুলিয়া সরলাকেও না আনি, তত্রাচ—আপনার জিনিষ আনিবই আনিব।

বাহিরেও আমার 'পুষ্পরথ' প্রস্তুত। যাঁহারা কখনো গো-শকটে আরোহণ করেন নাই তাহাদিগকে আমি বুঝাইতে পারিব না। কিবা মনোহর আকৃতি—কিবা কারুকার্য আর কিবা চলনভঙ্গি—মরি মরি মরি! বিশ্বকর্মা বুঝি হাতের সকল কাজ সারিয়া তাঁহার নধর দেহখানিকে একটি সুকোমল কুশাসনে ঢালিয়া দিয়া দীর্ঘ ৫/৬ ঘণ্টা নিদ্রার পর নবীন উদ্যমে নবীন উৎসাহে নিতান্ত নির্জনে বসিয়া এই অদ্ভুত পদার্থটির সৃষ্টির অবতারনা করিয়াছিলেন! এমন যান আর দ্বিতীয় নাই, ইহাই জলে চলে, স্থলে চলে—সুতরাং উভচর! কাদার ভিতর দিয়া, খানার ভিতর দিয়া যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া চালাও চলিবে। রথের বলদ দুইটি বেশ স্থূলকায়। আমাদের বাহিরের উঠানে একটি বকুলের গাছ ছিল। সেই বকুলতলে বসিয়া নিমীলিত নেত্র, ধীর রোমন্থনব্যাপৃত বলদ দুইটি তাহাদের সেই সুদীর্ঘ তীর্থ যাত্রার কথা বোধহয় মনে মনে ভাবিতেছিল। এবং মনুষ্য সম্প্রদায়ের উপর একটি ঘোরতর তীব্র অভিসম্পাত প্রদান করিয়া পরমেশ্বরের নিকট আপনাদের মৃত্যু প্রার্থনা করিতেছিল। গাড়ার ভিতর আমার শয্যা প্রস্তুত। কারণ বসিয়া থাকিয়া যাইবার তেমন সুবিধা নাই। সংসারে মানুষের 'দশ' দশটি, কিন্তু গো-শকটে যাহারা যাতায়াত করেন তাহাদিগের ৪টি দশা মাত্র—(১) চিত, (২) কাত. (৩) উপুড় এবং (৪) হেঁটমুণ্ডে উপবেশন! আমি গাড়ীতে যাইয়া উঠিব এমন সময় শ্যামবাবুর কন্যা হেম আসিয়া একখানি পত্র আমার হাতে দিল। পত্রখানি সরলার নামে। পত্রখানি পকেটে ফেলিয়া আমি কহিলাম "হেম তোমার কোন ফরমাস্ আছে?" হেম মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল "না।" কিন্তু হেমের অদৃষ্ট, সোহাগ নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। সে অম্‌নি বলিয়া উঠিল "না কাকাবাবু, ও পিসিমাকে দুটো বই আন্‌তে লিখেছে।"

হেম একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল "দুখান নয়। প্রথম লিখিয়াছিলাম দীপনির্বাণ ও স্বর্ণলতা। শেষে প্রথমখানা আনতে নিষেধ করিয়াছি।" আমি বলিলাম, "আচ্ছা, তোমার দু'খানা বই-ই আমি আনিব। তোমার বাবার কাছে বলো যে তাঁর জিনিষের ফর্দও আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

আমি গাড়ীতে উঠিলাম। হেলিতে দুলিতে নানা রকম শব্দ করিতে করিতে আমার পুষ্প রথ মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল—যেন যৌবন গঙ্গার ভরাভাদ্রে কোন সুন্দরী ষোড়শী পূর্ণ

কুম্ভকক্ষে লইয়া ঈষৎ হেলিয়া মল বাজাইয়া আসিতে ছিল। যতক্ষণ দেখা যায় দেখিলাম মেজদাদা, প্রমথ, সোহাগ ও হেম পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। গরুর গাড়ীতে যাতায়াত করা আমার বরাবরই অভ্যাস আছে। তাই পথ অতি দীর্ঘ হইলেও আমার তেমন আশঙ্কা হইল না। আমি ধীরে ধীরে শয়নের ব্যবস্থা করিলাম। গো-শকটে উঠিলেই আমার ঘুম পাইত। কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিতে থাকিতেই আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

হঠাৎ একবার ঘুম ভাঙ্গিল। দেখি যে তখন আমার সারথিপ্রবর বলদ দুইটির লেজ ধরিয়া বড়ই টানাটানি করিতেছে আর বলিতেছে "আরে বাঁ বাঁ! এমনও দেখিনি—আরে বাঁ আ আ আ—"। কর্দমে গাড়ীর চাকা আট্‌কাইয়া গিয়াছে—গাড়ী আর চলে না। রামধন তাহার বলদকে নিতান্ত অভদ্র ভাষায় গালাগালি করিতে লাগিল। কিন্তু একে গোজাতি; তাহাতে আবার বলদ—তাই বুদ্ধিমান রামধনের কথা তাহারা বুঝিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া আমি গাড়ী হইতে নামিলাম। শেষে দু'জনে মিলিয়া কোনোক্রমে সেই কর্দমব্যূহ হইতে আমার রথকে উদ্ধার করিলাম। আবার গাড়ী চলিতে লাগিল।

যতদূর দৃষ্টি চলে, পথের উভয়পার্শ্বে শ্যাম শোভাময় মাঠ—মাঠের পরে মাঠ—তারপর আবার মাঠ। দূরে রাখাল বালক গরু চরাইয়া ফিরিতেছিল। তাহাদের সেই উচ্‌কণ্ঠ মেঠো রাগিণী নীরব প্রান্তর ভূমি কাঁপাইয়া তুলিতেছিল। পথিপার্শ্বে বড় বড় অশ্বত্থ বৃক্ষ যেন যুগযুগান্ত ধরিয়া কাহার সহিত মিলনের আশায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে আর তাহাদিগের ধীর পবন সঞ্চালিত অগনিত শাখা প্রশাখা যেন প্রেমালিঙ্গনোন্মুখ শতবাহু প্রসারণ করিয়া কাতরে সেই চিরবাঞ্ছিতকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিয়া বলিতেছে—আয়, আয়, আয়। তখন গাছের মাথায়, প্রান্তরের শেষ প্রান্তে সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছিল। দূরে বৃক্ষচ্ছায়াচ্ছাদিত গ্রামখানি আধ আলোক আধ অন্ধকারের মধ্যে মধুর মিলনে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। মাঠের ভিতর দিয়া আঁকা বাঁকা গ্রাম্য পথ। দূরস্থিত গ্রাম হইতে মৃদু পবন সঞ্চালিত সন্ধ্যা-আরতির শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আমাদের কানের কাছে ভাসিয়া আসিতেছিল। ধীরে ধীরে তিমিরবাসনা রজনী গ্রামের উপর দিয়া, প্রান্তরের উপর দিয়া, বৃক্ষ শাখা লতাপল্লব সমস্ত আবৃত করিয়া আমাদের গাড়ীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আমরা অন্ধকারে ডুবিয়া গেলাম। গাড়ী যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিল। অগণিত খাদ্যোত-শোভিত বৃক্ষগুলি আমার চোখের সম্মুখে মায়ালোকের একটি প্রীতি-প্রফুল্ল কাল্পনিক চিত্রের রহস্যময় আবরণ উন্মোচন করিয়া দিল। আমি সেই ঝিল্লীরব মুখরিতা তিমিরাবৃতা রজনীতে আপন ভাবনায় আপনি বিভোর হইয়া উঠিলাম। মস্তকের উপর তিমিরময়ী রাত্রি আর সম্মুখে সুদূর বিস্তৃত রাজপথ। আমি সেই নির্জন পথের একমাত্র পথিক হইয়া চলিয়াছি। তখন আমার অজ্ঞাতসারে আমি আপন মনে বলিয়া উঠিলাম।

"আঁধারের কীটানু আমরা,
দুদণ্ড আঁধারে করি খেলা,
অন্ধকারে ভেঙে যায় হাট,
জীবন ও মরণের মেলা।
কোথা হ'তে আসে, কোথা যায়,
ভাবি না কেহ কিছু পায়,
অজ্ঞানেতে জনম-মরণ
বিস্ময়েতে জীবন কাটায়।"

দুই দিন হইল কলিকাতায় আসিয়াছি। আমি সকালে সকালে স্নানাহার সমাপন করিয়া বাজার হাট করিতে বাহির হইলাম। যখন বাসায় ফিরিলাম তখন আমার জিনিষপত্রে ঘর ভরিয়া উঠিল। পাছে কোনো গোলমাল হয়, তাই যাহার যে জিনিষ, সেই জিনিষের গায়ে তাহার নাম লিখিয়া রাখিলাম। বলা বাহুল্য, যে বৌদিদির ফর্দ মাফিক জিনিষগুলি আমি সকলের আগে কিনিলাম। সরলা প্রস্তুতই ছিল, জিনিষপত্র গুছাইয়া লইতে আমার বেশী সময় লাগিল না। আমরা সেই রাত্রেই ১০টার গাড়ীতে রওনা হইলাম। বাড়ী আসিয়া যখন বৌদিদির চরণপ্রান্তে একে একে তাহার জিনিষগুলি রাখিয়া গড় হইয়া একটি প্রণাম করিলাম তখন তিনি একটু মৃদু হাসিয়া আশীর্বাদ করিলেন—"তোমার শিগ্‌গিরই বিয়ে হোক্।" পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাই আহারাদির পর আমার নির্জন কক্ষের একটি ক্ষুদ্র বাতায়নের মুখে আরাম চেয়ারে বসিয়া রৌদ্রতপ্ত নীল গগনের দিকে চাহিতে চাহিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

তারপর প্রায় ২/৩ মাস চলিয়া গিয়াছে। একদিন শুভ প্রাতঃকালে শুভসংবাদ আসিল, যে আমি * * স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছি। আর একবার "হাকিমী পরীক্ষা" দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নিতান্ত চুপ করিয়া বসিয়া অন্ন ধ্বংস করাটা আমার স্বাধীন মুক্তচিত্ত ততখানি পছন্দ করিত না। বিশেষ বিলাতী Independence-এর ideaটা আমার মনের মধ্যে প্রধূমিত। আগ্নেয় পর্বতের মতো ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া জ্বলিত। তাই চাকুরী করিবার জন্য আমি বিদেশ যাত্রা করিলাম। অনেকদিন হইতেই বিবাহ করিবার জন্য মা আমাকে অনুরোধ করিতেন। আমি তাঁহার সে কথায় কর্ণপাত করিতাম না। নিজের উপায় নিজে যতদিন না করিতে পারিব, ততদিন বিবাহ করিব না, আমাব এই সংকল্প ছিল। সকালে সকালে পুত্রের বিবাহ দিয়া বধূমাতাকে "ঘরের লক্ষ্মী" করিয়া ঘরে আনা, যে বাঙ্গালী পিতা-মাতার বড় আনন্দের বিষয়, তাহা আমি বেশ বুঝিতাম। কিন্তু যতদিন আমি আমার নিজের জন্য পরমুখাপেক্ষী ততদিন আর একজনের সুখ-দুঃখের ভার গ্রহণ করাটা যুক্তিসঙ্গত কিনা এই সম্বন্ধে আমার বড় সন্দেহ ছিল। তাই মা, দাদা প্রভৃতি সকলের অবাধ্য হইয়াও আমি বলিতাম—"বিবাহ করিব না"। শত লোকের সহস্র চেষ্টাতেও আমার সে প্রতিজ্ঞা টলিল না। মা মনে মনে ভাবিতেন যে, হয়ত আমার মনের মতো পাত্রী পাওয়া যাইতেছে না, তাই আমি বিবাহ করিতে এত নারাজ। কত স্থান হইতে বিবাহ সম্বন্ধ আসিত ; পাত্রীর ফটো আসিত কিন্তু আমি স্বীকার হইতাম না বলিয়া, সে সব ভাঙ্গিয়া যাইত। আমি এখন বিদেশে হঠাৎ একদিন সরলার পত্র পাইলাম ; সে মাতাঠাকুরানীর পীড়ার সংবাদ দিয়াছে। আমি সেদিনই মাতৃদর্শন মানসে বাড়ী রওনা হইলাম। বাড়ী আসিয়া দেখি মাব শরীর কিছু অসুস্থ বটে—কিন্তু ব্যস্ত হইবার তেমন কিছু নাই। রুগ্ন শয্যায় থাকিয়াও মা আবার আমাকে ধরিয়া বসিলেন, "তুমি বিবাহ কর"। আমি তখনকার মতো তাহাকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিলাম। দুই তিন দিন বেশ কাটিয়া গেল। একদিন রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নে আমি আমার নিতান্ত নির্জন কক্ষে বসিয়া একটু প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করিতেছি, এমন সময় সরলা আসিয়া ডাকিল "দাদা !" আমি অমনি এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। সরলার মুখ বিশুষ্ক কপোলদেশে ঈষৎ ঘর্মবিন্দু দেখা যাইতেছিল। একটু থামিয়া, দুই একবার ঢোক গিলিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"তুমি একবার আমার সঙ্গে চল !"

আমি। "কোথায় ?"

সরলা। "শ্যামবাবুদের বাড়ী।"

আমি। "সেখানে কেন যাব ?"

সরলার আর যেন বিলম্ব সহিল না। ছল ছল নেত্রে অতিশয় কাতরকণ্ঠে সে বলিল "তা আমি জানিনা—আর দেরি কোরো না, চল—মাসীমা তোমাকে ডাকিতেছেন।"

হেমের মাকে সরলা মাসীমা বলিয়া ডাকিত। ব্যাপারটা যে কি তাহা আমি মোটেই বুঝিতে পারিলাম না। প্রত্নতত্ত্বের সহিত আমার মনোযোগটা তখন বেশ জমিয়া আসিতেছিল। তাই নিতান্ত অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও আমি সরলার সহিত শ্যামবাবুদের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সরলা অগ্রে অগ্রে। আমি পশ্চাতে ধীর পদবিক্ষেপে একটি ক্ষুদ্র কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম, রুগ্নশয্যায় হেম। মাসীমা শয্যা পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে ব্যজন করিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন! শয্যাশায়িনী হেম অতি কষ্টে তাহার বস্ত্রাঞ্চল আপনার মস্তকের উপর স্থাপন করিলেন।

আমাদের গ্রামে আমি একজন ছোটোখাটো রকমের হোমিওপ্যাথ—তাই নিতান্ত বিজ্ঞের মতো আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কতদিন হইতে এ ব্যারাম হইয়াছে ?"

মাসীমা। "তুমি ত শুনিয়াই গিয়াছিলে, হেমের বিবাহের যোগাড় হইতেছিল। সব প্রায় ঠিকই হইয়াছিল কিন্তু বিবাহের ৫/৬ দিন পূর্বে একদিন জ্বর আর মূর্চ্ছা। সে জ্বর আর ছাড়িল না। প্রায় দুই মাস হইল আমার হেমের এই অবস্থা। যদি কর্তা বাঁচিয়া থাকিতেন!"—

মাসীমাকে একটু আশ্বাসিত করিবার জন্য আমি বলিলাম, "তা ভয় কি, আমরাই আছি।" কিন্তু হেমকে মৃত্যুমুখে দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইতে লাগিল। হেম ও সরলা কতদিন আমার নিকট পড়া বলিয়া লইয়াছে—কতদিন আমি তাহাদিগকে কাগজে ছবি আঁকিয়া দিয়াছি। এসব ত সেদিনের কথা। আজ তাহাকে দেখিলে আর সে হেম বলিয়া চেনা যায় না। এখন তাহার আর সে বেশ নাই. সে লাবণ্য নাই, সে শান্তি নাই, সে সব কিছুই নাই। হেমের রোগযন্ত্রণা ক্লিষ্ট—দুর্বল নয়ন একবার আমার মুখের উপর স্থাপিত করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"হেম, এখন তুমি কেমন আছ ?" অতিশয় ক্ষীণকণ্ঠে হেম বলিল—"আমি ভালো আছি—আপনি কবে এসেছেন ?" এমন সময় মাসীমা কার্যান্তরে উঠিয়া গেলেন সরলা আসিয়া হেমের পার্শ্বে বসিল।

আমি যে স্থানে বসিয়াছিলাম তাহারই নিকটে একখানি ছোটো অর্দ্ধভঙ্গ টেবিলের উপর কতগুলি ছোটোবড় শিশি, একটি কাচের ছোট গ্লাস, এবং একটি অর্দ্ধদগ্ধ বাতি পড়িয়াছিল। সেই শিশি বোতলগুলির উপর আমার নজর পড়িল, আমি দেখিলাম সবগুলি শিশিই এলোপ্যাথিক ঔষধের। এরূপ অবস্থায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ফল শীঘ্র শীঘ্র ধরিবে কিনা আমি তাহাই ভাবিতেছি, হঠাৎ এক শিশি কুন্তলীনের উপর আমার দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম সেই শিশির গায়ে লেবেলের উপর লাল কালিতে মোটা মোটা অক্ষরে আমারই হাতের লেখা—"হেমের জন্য"।

সে কতদিনের কথা!—আমি কলিকাতা হইতে শ্যামবাবুর জিনিষপত্র আনিবার সময় তাঁহারই ফরমাইস মত হেমের জন্য একশিশি পদ্মগন্ধ কুন্তলীন আনিয়াছিলাম। এই সেই কুন্তলীন যেমন আনিয়াছিলাম ঠিক তেমনি আছে। কিছু আশ্চর্য হইয়া আমি বলিলাম "হেম, তুমি এটা ব্যবহার কর নাই ?" আমার কথা শুনিয়া হেম যেন কিছু চঞ্চলা হইল—তাহার পাণ্ডুর বদন রবিকরবিশোষিতা স্থল-কমলের মতো রক্তিম হইয়া উঠিল। সরলাও আমার কথার কোনো উত্তর দিল না, হেমের উপাধানের নীচে হইতে একখানি যত্ন রক্ষিত পুস্তক বাহির করিয়া আমাকে দেখিতে দিল। আমি দেখিলাম, সেখানি আমারই প্রদত্ত

"দীপনির্বাণ।" বইখানার ভিতরে লাল কালিতে লেখা আছে "শ্রীমতী হেমপ্রভাদেবী" লেখাটিও আমার হাতের। ঠিক তাহারই উপর কে যেন অশুদ্ধ বর্ণবিন্যাসে লিখিয়া রাখিয়াছে—'রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়'। লেখাটা হেমের বলিয়া বোধ হইল। কোনো স্থানে বা আমার নাম লেখা আছে আর তাহার ঠিক নীচেই লেখা আছে "হেম"! পুস্তকের সর্বশেষ পৃষ্ঠায় আমার স্বহস্ত-অঙ্কিত জলসেচন ব্যাপৃতা শকুন্তলার পেন্সিল চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে! এ ছবি আজ এক বৎসর পূর্বে আমি আঁকিয়া দিয়াছিলাম।"

ধীরে ধীরে পুস্তকখানি রাখিয়া আমি বলিলাম—"সরলা, আমি যাই, আমার একটু কাজ আছে।"

পবদিনে অতি প্রত্যূষে আমি কর্মস্থানে চলিয়া গেলাম।

* * *

উক্ত ঘটনার পর প্রায় ৬ মাস চলিয়া গিয়াছে। প্রথম প্রথম কিছুদিন বেশ গেল তারপর হইতেই মধ্যে মধ্যে হেমের কথা মনে হইত। ক্রমশঃ যেন হেমের জন্য আমি ব্যগ্র হইয়া পড়িতে লাগিলাম। তোমরা ভালোবাসাই বল, আর অনুরাগই বল, যাহাই বল হেমের জন্য আমার মনের ভিতর ঠিক তেমনি কি একটা আসিয়া বিষম গোল বাঁধাইয়া দিল। আমি দিন দিন কেমন চঞ্চল হইতে লাগিলাম। এইবার আমি তোমাদের সেই 'কি জানি কেমন কেমন' হইয়া পড়িলাম।

আরও কিছুদিন চলিয়া গেল। কত দিবস রজনী আকুল হইয়া হেম তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের গুপ্ত অন্তরালে যে উষ্ণ আকাঙ্ক্ষা যত্ন করিয়া পুষিয়াছিল, তাহার নিবৃত্তি হইল—যে আগুনে দিবা নিশি জ্বলিয়া হেম, বেদনা মথিত যাতনা-ক্লিষ্ট হৃদয়ে, তাহার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভগ্ন জীবন তরণী উত্তাল তরঙ্গ মালা সমাকুল ভব সাগরের পরপারে যাইবার জন্য ভাসিয়াছিল—সে অনল নির্বাপিত হইল! মরা গঙ্গায় আবার ভরা ভাদ্রেব জোয়ার খেলিল, আর তাহার উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত-তরঙ্গে-তরঙ্গে বসন্ত পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র স্বর্গের হাসি হাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। হেমের বাত্যাসংক্ষুব্ধ হৃদয়নিকুঞ্জে আবার প্রেমের ফুল ফুটিল। সেই মান্দার কুসুমের মোহনগন্ধে আমি উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম। তারপর একদিন বসন্ত পূর্ণিমার স্নিগ্ধ চন্দ্রকর সুশোভিতা সুন্দরী রজনীতে বাসন্তী কোকিলের প্রহেলিকাময় কণ্ঠের শেষ তানের সহিত উচ্ছ্বসিত হর্ষ কোলাহল মুখরিত ফুলদল পরিশোভিত বিবাহভবনের মিলন বাঁশরীর শেষ প্রতিধ্বনি চ্যুত সুনীলসাগর চুম্বী রজত-রশ্মি-বিধৌত সুপ্ত অনন্ত গগনের সুদূর নিভৃত-প্রান্তে ভাসিয়া ভাসিয়া মিশিয়া গেল। তখন আমি আপনা হারাইলাম। আমার বলিতে ইচ্ছা হইল, 'এ জগতে যদি কেহ সুন্দরী থাকে তবে সে তুমি। অনন্ত নীলিমা চিত্র-পট করিয়া বিধি তোমাকে অঙ্কিত করেন কেন?'

এক কথায় বলিতে গেলে, আমি হেমের হইলাম, হেম আমার হইল। আর আমার চঞ্চল উদ্ভ্রান্ত উন্মত্ত জীবনে একটা বিষম বাধা আসিয়া লাগিল। আমার উচ্ছৃঙ্খল কল্পনাস্রোত ফিরিয়া গেল—আমার স্বপন ভাঙ্গিল। তখন হইতেই আমি পূর্ণমাত্রায় সংসার চিনিলাম। আমি এতদিন শুধু মানুষ চিনিতাম—হৃদয় চিনিতাম না। হেম আমার শিক্ষাগুরু হইল!

হরিপদ গুপ্ত

অদ্ভুত স্বপ্ন

গত ২২শে জ্যৈষ্ঠ দাদার বিবাহ উপলক্ষে পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম। প্রথম ঘর করিতে আসিয়া আর পিত্রালয়ে যাইতে পাই নাই। ঘরের কথা বলিতে কি, আমায় পাত্রস্থ করিয়া পিতা অঋণী হইয়া ভূসম্পত্তি ভোগ করিতেছেন, সেটা আমার শ্বশ্রূমাতা ঠাকুরানীর পক্ষে অসহ্য, পূজার তত্ত্বে, পৌষ পার্বণে, ষষ্ঠি বাঁটায় আর সন্দেশ কাপড়ে তাহার মন ওঠে না। ওইসঙ্গে দুই একখানি তালুকের দানপত্র পঁহুছিলে, আমি ঠিক বলিতে পারি, বৎসরের মধ্যে অন্যূন চারি ক্ষেপ পিত্রালয়ে যাতায়াত করিতে পারিতাম। একটিমাত্র ভাই-এর বিবাহ, লোকলজ্জা ভয়ে না পাঠাইলে নয় তাই আট দিবসের কড়ারে আমায় পিত্রালয়ে পাঠাইয়াছিলেন।

ঠিক গাত্র হরিদ্রার দিবস, দুই প্রহরে, কুটুম্বিনীর ন্যায়, আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত কর্মের বাটীতে, উপস্থিত হইয়া কোমরে কাপড় বাঁধিয়া, এ-ঘর ও-ঘর করিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। আনন্দ ও হুলুধ্বনির বিশেষ কলরব বৃদ্ধি করিয়াছিলাম। আমোদ আহ্লাদে বিবাহের কয়দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলাম। মিষ্টান্ন প্রভৃতি বিতরণের ভার আমার হস্তে ছিল, আর উচ্চাঙ্গের পাকসাকাদি পাড়ার খ্যাতনামা পিসী মাসীদের একচেটিয়া। শিক্ষানবিশ কর্মপ্রার্থীর ন্যায়, সোজা অথচ বোঝা বহা ভাত রাঁধা ভারটা আমাদের উপরই পড়িয়াছিল।

কাজেই অতিরিক্ত পরিশ্রম ও রাত্র জাগরণের ফল অতি শীঘ্রই ফলিল। বৌভাতের দিবস অপরাহ্নে ক্লান্ত দেহে আমার যেন মূর্চ্ছার ন্যায় ভাব হইল। এরূপ ভাব দেখিয়া সকলেই স্ব স্ব কার্য পরিত্যাগ করিয়া, আমার নিকট ছুটিয়া আসিলেন এবং নানা প্রকার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এমন সময় দাদা আসিয়া আমার অবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে গেলেন এবং মুহূর্ত মধ্যে এক শিশি কুন্তলীন তৈল আনিয়া খানিকটা আমার মাথায় মাখাইয়া দিলেন। তারপর মস্তকে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। আমার শরীর কিছু স্নিগ্ধ ও সুস্থ বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম। স্বামীর দৌলতে নানাপ্রকার সুগন্ধযুক্ত তৈল ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু কোনটিই আমায় এত স্নিগ্ধ ও সুস্থ করে নাই। তাই সে দিবস দাদার নিকট একশিশি কুন্তলীনের আবদার করিয়া রাখিয়াছিলাম।

পাকস্পর্শের পরদিবসই শ্বশ্রূমাতার এক জরুরী পত্র লইয়া তাঁহার পুত্র আমায় লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত। পিতা কিছু জেদি প্রকৃতির লোক ছিলেন ; কাজেই এত সত্বর পাঠাইতে দ্বিরুক্তি করিলেন না। মা চক্ষের জল চক্ষে মুছিলেন, আমিও কাঁদিতে লাগিলাম। আমার চক্ষে জল দেখিয়া, দাদা আমায় ছেলে ভুলান গোছ করিয়া একশিশি কুন্তলীন দিয়া সান্ত্বনা দিলেন। কুন্তলীন শিশিটি পাইয়া আমি বাক্সজাত করিলাম। ২৯-এ জ্যৈষ্ঠ (প্রত্যূষেই যাত্রা করিয়া) মধ্যাহ্নে আহারান্তে গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া স্বামীসহ বিদায় লইলাম। ট্রেন ছাড়িবার ১০ মিনিট পূর্বে মদনপুর স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ট্রেন আসিলে স্বামী আমায় মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া নিজে পুরুষদের গাড়ীতে উঠিলেন। আমি স্ত্রী-স্বভাবসুলভ অভ্যাস মত গাড়ীর মধ্যে অপর সকলের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু কথোপকথনে তেমন আপ্যায়িত হইলাম না। কারণ, কাঁহাকেও জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন ?" উত্তর "নাইনিতাল গো নাইনিতাল"। আমি আরও মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম "নাইনিতাল কোথায় ?" "যার পশ্চিমে আর দেশ নাই, রেলে দশ

দিবসের পথ।" কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাগলপুরে আপনার স্বামী কি করেন ?" একটু টানিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া উত্তর করিলেন "লোকজন মেয়াদ দেন।" কেহ বলিল "ঐ যে কাপড় পড়িতেছেন ও আমার স্বামীর দৌলতে" ! প্রশ্নের উত্তরে বুঝিলাম, তাঁহার স্বামী রেলি ব্রাদার্সের বাটী কার্য করেন। আমার স্বামীর পঠোদ্দশা শুনিয়া, আমাকে আলাপের অযোগ্য ভাবিয়া সকলেই মুখ ফিরাইয়া সরিয়া বসিলেন। আমারও কয়দিবস অতিরিক্ত পরিশ্রম, তায় মানবিক অবস্থা খারাপ। তাই ইহাদের নিকট হইতে সরিয়া কামরায় একপ্রান্তে বসিয়া, সুদূর শ্যামলশস্য ক্ষেত্রের শোভা অবলোকন করিতে লাগিলাম। দেখি, দূর দূরান্তের বৃক্ষগুলি, বাষ্পীয় রথের দ্রুতগতি দেখিয়া, হিংসাবসে যেন সচল হইয়া দ্রুত ছুটিতেছে !

অল্পক্ষণ পরেই আমার পার্শ্বস্থিত স্ত্রীলোকটি বলিলেন "আমার কুন্তলীনটি দেন দেখি, আমি তুলিয়া বাখি" আমি অবাক্ হইয়া বলিলাম "আপনার কুন্তলীন ! আমার নিকট ?" উক্ত স্ত্রীলোকটি উত্তর করিলেন "হ্যাঁ, আমার কুন্তলীন দেখিতে লইয়া কি ভুলিয়া গেলেন ?" আমার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল ; অপর আর একটি স্ত্রীলোকের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "আমি কি এঁর কুন্তলীন দেখিতে লইয়াছিলাম ?" তিনি একটু গম্ভীরস্বরে বলিলেন "এইরূপ তো স্মরণ হয়।" যখন এইরূপ বাক্যালাপ চলিতেছিল, তখন ট্রেন বগুলা স্টেশনে আসিয়া থামিবামাত্র কুন্তলীন দাওয়া-কারিনী স্ত্রীলোকটি, স্বামীকে ডাকিবার জন্য তাঁহার পরিচারিকাকে পাঠাইয়া দিলেন। অল্পক্ষণ পরেই এক পেন্টুলেন কোটধারী বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শরীর ও চোখ দেখিলেই বোধহয় যেন কিছু রুক্ষ স্বভাবের লোক। তিনি ব্যাপার সম্পূর্ণ অবগত না হইয়াই চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন— "ভদ্রমহিলার এতবড় গুরুতর অপরাধ ক্ষমনীয় হইতে পারে না ! কালে এ বিষম রোগ প্রতিঘরে, প্রতি ললনাকে আক্রমণ করিতে পারে। অতএব পুলিশের সাহায্য লওয়াই কর্তব্য। তাঁহার চিৎকারে ক্রমে গোলমাল বাড়িয়া গেল। বহুলোক স্ত্রীলোকের গাড়ীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। আমার স্বামী ছুটিয়া আসিয়া সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া রাগে ক্ষিপ্তের ন্যায় হইলেন এবং ঐ রুক্ষ মেজাজ বাবুটির সহিত অনেক বাকবিতণ্ডা কবিতে লাগিলেন। শেষে মারামারির উপক্রম। পুলিশ উভয়কে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং আমার স্বামীকে বলিলেন "আপনার স্ত্রীকে নীচে নামিতে বলুন"। আমি কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ ধীরে ধীরে নামিলাম, ও অঞ্চল হইতে চাবি ফেলিয়া দিলাম। সর্ব সমক্ষে বাক্স খোলা হইলে কুন্তলীন বাহির হইয়া পড়িল ! আমার স্বামী লজ্জায় বাতাহত তালপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। আমি প্রায় অর্দ্ধমৃত অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। পুলিশ কর্মচারী অপর স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহা যে আপনার কুন্তলীন তাহার প্রমাণ কি ?" তিনি বলিলেন "শিশির গায়ে একটি 'স' অক্ষর লেখা আছে।"

পরীক্ষায় মিলিবামাত্র পুলিশ আমার স্বামীকে বলিলেন "৩৭৯ ধারা অনুযায়ী আপনার স্ত্রী দণ্ডনীয় হইবেন ! এখন এঁকে আমরা লইয়া যাইতে পারি।" তাহা শুনিয়া গাড়ীর স্ত্রীলোকগুলি সপ্তমস্বরে বলিতে লাগিলেন "ও মা, কি লজ্জা ! মেয়ে মানুষের এত ক্ষমতা ! ভদ্রলোক ছোটলোক চেনা ভার ! মাগির আবার কত ঠাট ! এ যেন তেমন সময় নয়, ইংরাজ রাজত্ব। হজম হইবে কেন ? যেমন কর্ম তেমনি ফল। এখন জেল খেটে মরগে ! এইসব তীক্ষ্ণ বানের ন্যায় কথাগুলি আমার স্বামীর আর সহ্য হইল না ; তিনি সেইখানে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। আমার বোধ হইল, যেন শত সহস্র বজ্র সেই সময় আমার মস্তকে পতিত হইল ! আমিও চিৎকার করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম।

তারপর কি হইল, কিছুই মনে নাই। হঠাৎ স্বামীর ডাক শুনিয়া উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী

কৃষ্ণগঞ্জে আসিয়াছে। সেইখানেই আমাদিগকে নামিতে হইবে। আমি স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া আমার অদ্ভূত স্বপ্নের কথা ভাবিতে ভাবিতে হাসিতে লাগিলাম। এমন স্বপ্ন মানুষেও দেখে!

এস কে দেবী
[সরোজকুমারী দেবী]

গোমতী তীরে

১

সকালবেলা অমূল্যবাবুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। অমূল্যবাবু বৈঠকখানার সম্মুখের বারান্দায় একখানি ইজিচেয়ারে বসিয়াছিলেন, তাঁহার শিশুপুত্র অমরকুমার একখানি ছবির বই হাতে করিয়া পিতার চেযারের পার্শ্বে দাঁড়াইযা আধ আধ ভাষায অনর্গল বকিযা যাইতেছিল। অমূল্যবাবু সস্নেহ নয়নে পুত্রের মুখপানে চাহিযা তাহাব অর্থহীন কথাগুলি একাগ্রচিত্তে শুনিতেছিলেন। আমাকে আসিতে দেখিযা বলিলেন "তাতুল, এসেছ ? আমি তোমারই অপেক্ষায় বসিযা আছি।"

আমাকে দেখিযা অমব তাহার নূতন ছবিব বইখানি দেখাইতে ছুটিয়া আসিল।

অমূল্যবাবু বলিলেন "তোমাব সে কাজটিব জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। হইবার খুব সম্ভব।"

আমি বলিলাম "আমাব অবস্থা আপনি তো সকলই জানেন। সম্প্রতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়াব বিশেষ অনুবোধে বিবাহ করিয়া আরও বিপদগ্রস্ত হইয়াছি।"

অমূল্যবাবু কোমলস্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই, আমি সে সমস্তই জানি। কাল সকালে তুমি আসিও। যাহা হয কাল নিশ্চয়ই জানা যাইবে।"

কতকটা আশ্বাসিত হইয়া বাড়ী ফিরিলাম। বড় বধূ তখন বন্ধন কবিতেছেন, বন্ধন গৃহের দুযাবের কাছে রানী দাঁড়াইযা আছে। আমাকে দেখিযা এক গলা ঘোমটা টানিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর গিয়া লুকাইল। আমি দুযাবের কাছে দাঁড়াইয়া বলিললাম "বড বৌ, তোমাব তো দাসী আনিযা দিয়াছি, তবে কেন এখনও নিজে এত পরিশ্রম কব ?'

বড বৌ ছল ছল নেত্রে বানীকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলেন "ও কথা আমাকে বোলো না ঠাকুবপো, বরং বলো তোমাকে ছোটো বোনটি আনিযা দিযাছি।"

এই বলিযা বড় বৌ আমার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। চক্ষে জল, ওষ্ঠে হাসি! বলিলেন, "আমাব দাসী, না তোমার বানী ?"

২

পরদিন ঠিক সময়ে অমূল্যবাবুব বাটী উপস্থিত হইলাম। অমর আজ হাতে কালি মুখে কালি মাখিয়া, আপনার লিপিকুশলতাব পরিচয় দিতেছিল। অমূল্যবাবু একখানি খবরের কাগজ পাঠ করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া প্রসন্নমুখে বলিলেন "ভাই অতুল, আজ সুলতানপুর হইতে পত্র পাইয়াছি। কাজটি ঠিক হইযা গিযাছে। আগামীকল্য রাত্রেব

গাড়ীতেই তোমাকে রওনা হইতে হইবে।"

আমি সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলাম "যে উপকার আপনি আজ করিলেন, কি বলিয়া যে—" তিনি বাধা দিয়া বলিলেন "থাক্, আমার কাছে ওসব কথা কেন ভাই।"

আমি নীরবে পূর্ণ অন্তরে বসিয়া রহিলাম। আর কিছু বলিতে ইচ্ছা হইল না। অমূল্যবাবুও নীরব। সৎকার্যে যদি আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, তবে আমার ন্যায় বিপদগ্রস্তের একটা উপায় করিয়া দিয়া তিনি যে সেসময় আত্মপ্রসাদ সুখ অনুভব করিতেছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে অমূল্যবাবু বলিলেন, "অতুল, তোমাদের বাড়ীখানিও কি বন্ধক পড়িয়াছে?"

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম "দাদার অসুখের সময় সমস্তই বন্ধক দিতে হইয়াছিল, যদি তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিতাম তাহা হইলে সমস্তই সার্থক হইত। কিন্তু এত করিয়াও তাহাকে বাঁচাইতে পারিলাম না।"

তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"ওঃ—আমার তখন ভয়ানক মাথার অসুখ, কিছুই জানিতে পারি নাই।"

আমি বলিলাম "অতিরিক্ত অধ্যয়নেই বোধহয় আপনার মস্তিষ্ক অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল।"

এইকথা শুনিয়া তাঁহার চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হইল। মুখমণ্ডল ঈষৎ আরক্তিম হইল। তাঁহার মুখ দেখিযা বোধ হইল, মনেব ভিতর যেন কি একটি প্রবল আবেগ তিনি যথাসাধ্য দমন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

কিছুক্ষণ নীবব থাকিয়া ঈষৎ রুদ্ধস্বরে বলিলেন "মস্তিষ্কেব পীড়া? না অতুল, তাহা নহে, আমি একেবারেই উন্মাদ হইয়াছিলাম। কেন যে আমার পীড়া হইয়াছিল অনেকেই জানেন না। যদিও তুমি আমার অপেক্ষা পাঁচ ছয় বৎসরের ছোট, তথাপি ভিন্ন জগতে আর আমার বন্ধু বলিতে কেহই নাই। যে ভয়ানক যন্ত্রণা একদিন হৃদয়ে পোষণ কবিয়া আসিতেছি, আজ তাহা তোমার কাছে বলিয়া একটু শান্তি লাভ করিব।"

৩

অমূল্যবাবু বলিতে লাগিলেন—"তোমার বোধহয় মনে আছে পাঠদ্দশায় আমি সর্বদা নির্জনে থাকিতেই ভালো বাসিতাম, লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে আমার বড়ই বিরক্তি বোধ হইত। হাসি, গল্প, আমোদ এ সকল আমার কিছুই ভালো লাগিত না। মনে হইত, জগতে এমন কেহ নাই, যে আমার কথা বুঝিবে, আমি যাহার কথা বুঝিব, যাহার সহিত আমার মনোভাবের মিলন হইবে।

জগতে আমি একা। এই নির্বান্ধব জগৎ আমার নিকট সুখশুন্য, আশাশূন্য মরুভূমির ন্যায় বোধ হইত। সেই সময় তোমার সহিত দেখা হয়। প্রথম দর্শনেই তোমার উপর স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু তুমি আমাপেক্ষা অনেক ছোট, এজন্য তোমার সহিত মিশিতে লজ্জা বোধ হইত।

হৃদয়ের ভার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটি পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইতাম, আত্মীয়েরা আনন্দ প্রকাশ করিতেন, আমার পিসীমা কতই

সুখী হতেন, কিন্তু আমার মনে বিন্দুমাতরও আনন্দ হইত না।

বৃথা, সমস্তই বৃথা! জীবন ধারণই বৃথা! কতগুলি পুস্তক পড়িয়া, কতকগুলি কথা শিখিয়া. নামের পার্শ্বে কতকগুলি অক্ষর যোগ করিয়া আমার কি লাভ হইবে? কিছুই না!

পিসীমা আমার বিবাহের জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, অগত্যা তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য বিবাহে সম্মতি দিলাম। শুভদিনে, শুভক্ষণে, বিবাহ করিয়া জীবনসঙ্গিনী গৃহে আনিলাম। "জীবনসঙ্গিনী!" একি উপহাস? আমার হৃদয়ের এ গভীর শূন্যতা সে ক্ষুদ্র বালিকা কি সে পুরাইবে?

জানিনা, বিবাহের মন্ত্রে কি শক্তি আছে, অথবা ইন্দুর কি ক্ষমতা ছিল! বিবাহের দিন হইতেই কেন জানি না, ধীরে ধীরে আমার প্রকৃতি পরিবর্তিত হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র ইন্দুকলা ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া মধুর জ্যোৎস্নায় আমার অন্ধকার হৃদয় আলোকিত করিল। আমার জীবন ইন্দুময় হইয়া গেল!

নির্জন বাস পরিত্যাগ করিয়া আমি জগৎ সংসারে বাহির হইলাম। কর্মময় জীবনে কত আনন্দ, ইন্দুই তাহা আমাকে শিখাইল। কি সাধনায় মানুষ 'মানুষ' হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী আমি. প্রথমে তাহা ক্ষুদ্র বালিকা ইন্দুর নিকট শিক্ষা করিলাম।

পিসীমাব মৃত্যুর পর কিছুদিনের জন্য আমরা লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলাম। গোমতীর তীরে আমাদের একখানি ছোট বাঙ্গালা ছিল, একখানি ছোটো জালিবোট প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। সেখানির নাম রাখিয়াছিলাম "ছায়াপথ"। জ্যোৎস্নারাত্রে আমি ও ইন্দু ছায়াপথে নদীবক্ষে ভ্রমণ করিতাম।

একদিন আমি আর ইন্দু ছায়াপথে বেড়াইতে বাহিব হইলাম। তখন ভাদ্রমাস, গোমতী কূলে কূলে পূর্ণা। আকাশের জ্যোৎস্না নদীর জলে মিশিয়া গিয়াছে, মনে হইতেছে, আকাশে আর পৃথিবীতে দুটি যেন জ্যোৎস্নার নদী! ইন্দু হালের কাছে বসিয়াছিল, মৃদুস্বরে কহিল "মৃত্যু যে কত মধুর আজিকার রাত্রে তাহা বুঝা যায়"। আমি বলিলাম, "যদি দুজনা একসঙ্গে মরিতে পারি"।

অতি কোমল করুণ দৃষ্টিতে ইন্দু আমার দিকে চাহিল, সে দৃষ্টি যেন তীক্ষ্ণ ছুরিকার মত আজিও আমার হৃদযে বিঁধিয়া আছে! ইন্দু বলিল "আমাব মত সুখী জগতে কে আছে? আজকাল মনে হয় আমার জীবনের কাজ শেষ হইয়াছে, জীবন সার্থক হইয়াছে। এমনি জ্যোৎস্না বাত্রে তোমার কোলে মাথা রাখিয়া মরিতে পারি, তবে—" তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে, হঠাৎ কেমন করিয়া জানি না, উলটিয়া সশব্দে জলে পড়িয়া গেল! আমিও তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিলাম! তাহার পর কি হইয়াছিল মনে হয় না!

৪

যখন জ্ঞান হইল, তখন মনে হইতে লাগিল, কেবল ঢেউ,—আমার চারিদিকেই ঢেউ। ঢেউগুলি আমার মুখের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। আর আমার নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইতেছে, ঢেউ আসিতেছে, যাইতেছে, ছোট ঢেউ, বড় ঢেউ, চারিদিকে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ। আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। আবার যখন জ্ঞান হইল, তখন সেই তরঙ্গ মালা, তেমনি প্রবল সলিল-উচ্ছ্বাস। প্রতি মুহূর্তে নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছে। আমি যেন আর ইন্দুকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না, ইন্দু যেন আমার হস্ত স্খলিত হইয়া জলের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল! ইন্দু ইন্দু বলিয়া চিৎকার করিয়া আবার আমি কোথায়

ভাসিয়া গেলাম।

এইরূপ অবস্থায় কতদিন ছিলাম, বলিতে পারি না। একদিন সম্পূর্ণ জ্ঞান হইতে, দেখিলাম, কলিকাতার বাড়ীতে বৈঠকখানায় কৌচের উপর শুইয়া আছি। সকলেই বলিলেন "আমার মস্তিষ্কের গোলমাল হইয়াছে। ডাক্তার ও কবিরাজগণ নিয়মমত আসিতে লাগিলেন, তাঁহাদের ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ পথ্যাদি ব্যবহার করিতে লাগিলাম, কিন্তু সময়ে সময়ে মস্তকে ও বুকের ভিতর যে একপ্রকার ভয়ানক যন্ত্রণা হইত, সেটা কিছুতেই গেল না। প্রায় ছয়মাস গত হইল, একদিন আমি বাড়ীর ভিতর গিয়াছিলাম। অনেকদিনের পর আমার শয়নকক্ষের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, গৃহে প্রবেশ করিতে সাহস হইল না। অনেকক্ষণ দুয়ারে দাঁড়াইয়া— থাকিয়া, কি জানি, কি ভাবিয়া ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিলাম। ইন্দুর নিজের হাতে কত যত্নে সাজানো ঘর, এখন ধূলা ও আবর্জনায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম, ঝুপ ঝুপ করিয়া একপশলা বৃষ্টি আসিল, আমার কাপড় ভিজিয়া গেল। এই কি আমার ইন্দুর চোখের জল ? সেই ধূলি আবর্জনাপূর্ণ গৃহতলে আমার দুই বৎসরের পুত্র অমরকুমার খেলা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িতেছে। এক বৎসর পরে আজ তাহাকে প্রথম দেখিলাম। আমার ইন্দুর হৃদয়ের ধন অযত্নে অবহেলায় কতই কৃশ ও মলিন হইয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহাকে তুলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলাম। মনে হইল, যেন হৃদয়ের গুরুভার অনেকটা কমিয়া গেল।

হঠাৎ তাকের উপরিস্থিত একটি শিশির দিকে দৃষ্টি পড়িল। শিশিটি কুন্তলীন তৈলের। প্রথম যখন কুন্তলীন বাহির হয়, তখন আমিই এটি ইন্দুকে কিনিয়া দিয়াছিলাম। দেখিলাম শিশির গায়ের কাগজে ইন্দুর হাতের ছোট ছোট লেখা "আমার স্বামীর প্রথম উপহার।"

অমরকে বুকে করিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম ডাক্তারবাবু আসিয়াছেন। বোধ হইল, অমরকে আমার নিকটে দেখিয়া তিনি একটু খুশী হইলেন। দুটি একটি কথার পর তিনি বলিলেন—'এইচ বসুর' কুন্তলীন তৈলে মস্তিষ্ক খুব শীতল রাখে, দিন কতক ব্যবহার করিয়া দেখুন না, ক্ষতি কি ?"

আমি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, একি আমার ইন্দুর পরামর্শ ? যথাসময়ে সেইদিন হইতে কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া যন্ত্রণার অনেক উপশম হইয়াছে। আর আমার অমর—অমরই একমাত্র আমার হৃদয় বেদনার ঔষধ। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়, কোলাহলপূর্ণ সংসার ত্যাগ করিয়া পূণ্যতোয়া গোমতী তীরে বৃক্ষতলে পড়িয়া থাকি। দিন রাত্র গোমতী তরঙ্গের কলকল্লোল শ্রবণ করি। কিন্তু আমার অমর—অমরই আমাকে সংসারে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।"

৫

সেদিন বাড়ী ফিরিতে আমার অনেক বেলা হইয়া গিয়াছিল, এজন্য বধূর নিকট কিছু মিষ্ট ভর্ৎসনা লাভ করিলাম। অন্যমনস্কভাবে স্নান করিয়া আহার করিতে বসিলাম, মনের ভিতর কেবল অমূল্যবাবুর কাহিনীই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সেই জ্যোৎস্নারাত্রের গোমতী তরঙ্গের দৃশ্য যেন আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছিল। যে উদ্দেশে অমূল্যবাবুর কাছে গিয়াছিলাম, তাহা যে সিদ্ধ হইয়াছে, একথা বড় বধূকে বলিতেও মনে ছিল না।

আহারাদির পর উপরে গিয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিবার একটু পরে রানী আমার নিকট আসিল। বলিল "আজ তোমার কি হয়েছে ?"

আমি বলিলাম "হবে আবার কি ?"

রানী হাসিয়া বলিল "তবে মুখখানি অমন বিভীষণের মত করে আছ কেন ?"

"আমি সংক্ষেপে অমূল্যবাবুর কাহিনী রানীকে শুনাইলাম। রানী শুনিয়া বলিল "সেই ইন্দুর মতই ভাগ্য যেন সব মেয়ের হয়।"

আমি বলিলাম "রানী, তুমিও হয়ত কোনদিন আমাকে এমনি করিয়া ফাঁকি দিয়া পলাইবে !"

"তোমারও দেখছি মাথা খারাপ হয়েছে" বলিয়া রানী কোথা হইতে একশিশি "দেলখোস" আনিয়া খানিকটা আমার মাথায় ঢালিয়া দিল !

সরলাবালা দাসী

একখানি পত্র

১

কলিকাতার কোন এক মেসের একটি নির্জন কক্ষে বসিয়া যুবক সুধীরচন্দ্র বড় আগ্রহের সহিত একখানি পত্র পাঠ করিতেছিলেন ; পত্রখানি এই—

আরাধ্য দেবতা,

অপরের অপরাধে এ দাসীকে পরিত্যাগ করা কি ধর্মসঙ্গত ? প্রতীক্ষা করিয়া করিয়া অধৈর্য হইয়াছি, আর জীবনের সাধ নাই। পথপানে তাকাইয়া রহিলাম, একবার আসিও। পনর দিনের মধ্যে না আসিলে দাসীর আর এ জন্মে শ্রীচবণ দর্শন করা কপালে ঘটিবে না। তরুবর যদি শ্রীচরণাশ্রিতা লতাকে আশ্রয় না দেয়, তবে পৃথিবীতে তাহার আর স্থান কোথায় !

জীবনবৃন্ত ছিন্ন করিবার পূর্বে লজ্জার সীমা অতিক্রম করিয়া, উপেক্ষার ভয়কে উপহাস করিয়া, প্রাণের দেবতাকে প্রাণের ব্যথা জানাইলাম—মনে কিছু ভাবিও না। ইতি

জীবনে মরণে তোমারই

স্নেহ।

পত্রপাঠ দৃঢচিত্ত যুবক অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং তিন চারি দিন পরে বড়দিনোপলক্ষে কলেজ বন্ধ হইলে পিতৃদেবের অগোচরে শ্বশুরালয়গমনের সংকল্প করিলেন।

২

একখানি শোভাময়ী ক্ষুদ্র গ্রাম। পুণ্যতোয়া ভাগীরথী যেন তাহার পঙ্কিলতা প্রক্ষালিত করিয়া লইয়া তর তর করিয়া বহিয়া যাইতেছেন। তাহারই অনতিদূরে পরলোকগত মুন্সেফ অতুলকৃষ্ণবাবুর মনোহর অট্টালিকাখানি শোভা পাইতেছে।

মৃত্যুকালে অতুলবাবু মাতৃহীনা একমাত্র দুহিতা প্রাণপ্রতিমা স্নেহলতাকে মধ্যম ভ্রাতা নবীনকৃষ্ণ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়কৃষ্ণের হস্তে বহু ধনসম্পত্তিসহিত সমর্পণ করিয়া যান। জ্যেষ্ঠের ন্যায় ধর্মভীরু ও ন্যায়পরায়ণ বিনয়ের বিশেষ চেষ্টা ও যত্নেই নিশ্চিন্তপুরের জমিদার

রামলাল বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের একমাত্র পুত্র সুধীরচন্দ্রের সহিত স্নেহের বিবাহ হয়। কিন্তু এই ঘটনার অল্পদিন পরেই বিনয়ের মৃত্যু হওয়ায় অর্থলোলুপ নবীনকৃষ্ণই সর্বেসর্বা হন এবং তাঁহার তৃতীয় পক্ষের ভার্যা রামসুন্দবী ও তাঁহার বিধবা জননীর প্ররোচনায় কালবিলম্ব না করিয়া স্নেহের যাবতীয় অলংকারপত্র লইয়া এ পক্ষের তিনটি কন্যারই বিবাহ দেন ও স্নেহের সর্বনাশ সাধন করেন।

লোক পরম্পরায় এই সংবাদ শ্রবণগোচর হওয়ায় রামলাল বাবু ক্রোধে অন্ধ হইয়া পত্র লিখিলেন এবং ছয় মাসের মধ্যে বধূমাতাকে অলংকারাদি সহিত না পাঠাইলে পুত্রের পুনর্বাবি বিবাহ দিবার ভয় দেখান। হায়! কে ভয় পাইবে? স্নেহের কি পিতামাতা আছে? ছয় মাস ছাড়িয়া দুই বৎসর অতীত হইল দেখিয়া, নিদারুণ আক্রোশবশতঃ তিনি এক্ষণে পুত্রের বিবাহ দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, এবং মার্জিত রুচি পুত্র সুধীবচন্দ্রকে বিষম চিন্তাকূলে নিক্ষেপ করিয়াছেন।

সে যাহা হইক, উক্ত বাটীখানিতে নবীনকৃষ্ণই সপরিবারে বাস করিয়া থাকেন। আর স্নেহ—পিতামাতার বড সোহাগের বড় যত্নের স্নেহ—ক্রীতদাসীর ন্যায় তাঁহারই পরিবাবভুক্ত হইযা রহিয়াছে। অপরাহ্ন সমাগত দেখিয়া স্নেহ পুনরায় গৃহকার্যে ব্যাপৃত হইতে চলিল, তখনও তাহার নয়নে অশ্রুবিন্দু নৃত্য করিতেছিল! কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা দিদিমার (রমাসুন্দরীর জননীর) দৃষ্টিগোচর হওয়াব গৃহস্থের অকল্যাণ ভয়ে তিনি স্নেহেব উদ্দেশ্যে মর্মভেদী গালি পাড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় রমাসুন্দরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুশীল আসিযা বলিল "মা, জামাইবাবু আসিয়াছেন।"

মা—"সে কি! কোন জামাই বাবুবে।"

সুশীল—"সুধীর বাবু।"

মা—"হাঁ, হাঁ, তা না হলে এমন আসবার ছিরি কার?"

দিদিমা—"সুধীর বাবু আবাব কেন? সারা দিন খেটেখুটে এই একটু এসে বসছি, তোদের যা খুশি করগে যা বাছা! ওরে আমার কি সাধের জামাইরে স্বর্গেব সিঁড়ি সব' সুশীল আব অধিক বাক্যব্যয় বৃথা জানিয়া অগত্যা নিজেই যথাসাধ্য সুধীরের সম্বর্দ্ধনা করিতে গেল।

রন্ধনশালায় হতভাগিনী স্নেহ উচ্ছ্বসিত অশ্রু বসনাঞ্চলে মুছিতে লাগিল। আহা! তাহাব পিতামাতা থাকিলে আজ সুধীরের সমাদর দেখে কে?

৩

ঢং ঢং করিয়া ১২টা বাজিযা গেল। জমিদার পুত্র চিব অনভ্যস্ত সামান্য একটি শয্যায় পডিয়া ছট্‌ফট্ কবিতেছিলেন, এক্ষণে আর ধৈর্য ধরিতে না পারিয়া মৃদু পাদ বিক্ষেপে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—দেখিলেন নীরব নিস্তব্ধ বাটীখানি চন্দ্রালোকে হাসিতেছে। কক্ষে কক্ষে দ্বার অবরুদ্ধ হইয়াছে। তবে কি স্নেহ অন্যত্র শয়ন করিয়াছে? যুবক নিতান্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে কক্ষ প্রত্যাবর্তনের মানস করিতেছিল, এমন সময়ে কাংস্যপাত্র মার্জনের শব্দ শ্রুত হওয়ায় সেইদিকে লক্ষ্য করিয়া গিয়া অন্তরাল হইতে দেখিলেন, সেই গভীর নিশীথে জ্যোৎস্নালোকে একা বসিয়া জ্যোৎস্নাস্নাত ফুলরানীর মত সুন্দরী একটি কিশোরী বাসন মাজিতেছে। চাহিয়া চাহিয়া চিনিলেন—এই স্নেহ। স্নেহের দুর্দশা দেখিয়া সুধীর মর্মে আহত হইলেন। 'হায়! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে করিব' ভাবিতে ভাবিতে আকুল আগ্রহে তিনি স্নেহের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেনহ

ভয়চকিত নেত্রে ফিরিয়া চাহিল। চারি চক্ষুর মিলন হইল—উভয়ের শিরায় শিরায় তড়িৎ প্রবাহিত হইল। অবগুণ্ঠিতা স্নেহ বিবশার ন্যায় সুধীবের পদপ্রান্তে লুটিয়া পড়িল। তাহাকে তুলিয়া, হৃদয়ে ধারণ করিয়া অশ্রুধারায় অশ্রুধারা মিশাইয়া সপ্রেমে সুধীর সেই নিষ্কলঙ্ক পবিত্র মুখখানিতে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "স্নেহ! কাজ সারিয়া ঘরে চল, ভয় নাই, আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি।"

কতক্ষণ পরে সমস্ত কাজ কর্ম সমাধা হইলে স্নেহ স্বামীর সহিত শয্যায় গিয়া বসিল। সে রাত্রি আর তাহাদের নিদ্রা হইল না। কত হাসি অশ্রু, কত আশা নিরাশা ও হর্ষ বিষাদের উচ্ছ্বাসের মধ্যে রজনী অবসান হইয়া আসিল, কেহ জানিতেও পারিল না। হঠাৎ ঘড়ি খুলিয়া ৪টা বাজে দেখিয়া সুধীর চমকিত হইলেন, সুন্দব আননখানি বিষাদের ছায়ায় সমাবৃত হইল, স্নেহকে কোন প্রাণে এই অশ্রু পুবীতে ফেলিয়া যাইবেন ভাবিযা বড়ই ব্যাকুল হইযা পড়িলেন, কিন্তু নিরুপায়,—তাই বুক বাঁধিয়া স্নেহেব নিকট বিদায চাহিলেন। আরও বলিলেন যে, কয়েকদিন থাকিবেন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এখন আর থাকিতে একবারেই প্রবৃত্তি হইতেছে না।

স্নেহও খুড়ীমা ও দিদিমার ভয়ে স্বামীকে আর একটি দিনও থাকিতে বলিতে সাহস কবিল না, কেবল কাঁদিযা আকুল হইল। সুধীব অনেক সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন "স্নেহ! আমি যাইতেছি, কিছু বলিবে? সে অবরুদ্ধ স্বরে বলিল, "আবাব ভুলিযা যাইও না।" কখনই ভুলিবেন না, কিছুতেই পুনবায় বিবাহ কবিবেন না, বি এ পবীক্ষার পরই লইয়া যাইবেন, প্রতিজ্ঞা কবিয়া পত্নীব অশ্রু ধাবা পরিসিক্ত মুখকমল বাবংবাব চুম্বন কবিয়া, উচ্ছ্বসিত অশ্রু রুমালে মুছিতে মুছিতে সুধীব অর্ন্তহিত হইলেন, স্নেহভূমিতে লুটাইযা পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

৬

বাত্রি প্রভাত হইলে খুড়ীমা ও দিদিমা বাহিবে আসিযা স্নেহকে অন্যান্য দিবসেব ন্যায কাজ কর্মে ও স্নান সাবিযা বন্ধনেব উদ্যোগ কবিতে দেখিলেন, কিন্তু সুধীবেব অবস্থিতিব কোন নিদর্শন না পাইযা বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। দিদিমা বলিলেন "লতি! এখানে মাদুব কেন? তুই কাল বান্নাঘবেই শুযেছিলি নাকিবে?" খুড়ীমা হাসিযা "ওঃ! তাই বুঝি নবাবেব পো রাগ কবে চলে গেছে?"

দিদিমা—(সোৎসুকে) লতি? চলে গেছে?

স্নেহ—হ্যাঁ।

একটা হাসির গবরা পড়িয়া গেল।

খুড়ীমা—যাবার সময় অবিশ্যি তোকে দেখ্‌তে পেযেছিল, তা কি বল্লে?

স্নেহ—আমাব কি চাই তাই।

খুড়ীমা—(আগ্রহের সহিত)—তুই কি চাইলি?

স্নেহ —আমার ত কিছুরই দরকার নাই, তুমি সেদিন কুন্তলীন খুঁজছিলে তাই তোমার জন্য কুন্তলীন চাহিয়াছি।

কল্য প্রণামীতে টাকা পাইয়াছিলেন, অদ্য আবাব এ সংবাদে খুড়ীমা নিরতিশয় প্রীত হইলেন, তবে একটু ভীতও হইলেন। বলিলেন—"দূর হাবি! টাক হয়েছে বল্লি কেন?"

স্নেহ —না তা বলি নাই, তোমার মাথা ঘোরে বলিয়াছি।

খুড়ীমা। (অধিকতর প্রীত হইয়া)—"ওমা লতির আমার বুদ্ধি আছে!" খুড়ীমার এ সন্তোষ প্রকাশে দিদিমা আন্তরিক বিরক্ত হইলেও একমুখ হাসিয়া কন্যার বাক্যের সমর্থন করিতে ত্রুটী করিলেন না। যাহা হউক, সেদিন আর স্নেহকে গঞ্জনা ভোগ করিতে হয় নাই। সুধীরের আকস্মিক গমনে বড় ব্যথিত হইল—সুশীল।

৫

দুই মাস হইল বি এ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, স্নেহের হৃদয়ও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সুধীরের পিতা নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হইবার ভয় দেখাইয়া জোর করিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছেন, স্নেহকে আর লইয়া যাইতে দিবেন না,—তাহার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে। জীবনভার দিন দিন দুর্বহ হইয়া উঠিতেছে, কেবলমাত্র আশার কুহকে পড়িয়া সে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিতেছে। এমন সময় হঠাৎ একদিন শিবিকাসহ তাহার শ্বশুরালয়ের লোকজন আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহকর্ত্রীরা তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। ক্রীতদাসীকে ছাড়িতে মন চাহিল না। "দিন নেই, ক্ষণ নেই, হুট্ বলতে কে মেয়ে পাঠাবে!" এইরূপ ওজর আপত্তি উত্থানপূর্বক তাঁহারা পাল্কী ফিরাইয়া লইয়া যাইবার হুকুম করিলেন। দুই পক্ষে জোর বাদানুবাদ চলিল। অবশেষে বিষম বিবাদের উপক্রম, এমন সময় সুশীল আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মা ও দিদিমাকে ধিক্কার দিয়া স্নেহের হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন। পাল্কীতে উঠিয়া স্নেহ ব্যাকুলভাবে বলিল, "দাদা, আমার সেই ছোট্ট বাক্সটি আনিয়া দিবে?" বাক্সে তাহার অন্যকিছুই লোভনীয় ছিল না। কেবল স্বামীর প্রদত্ত কিছু উপহাব দ্রব্য ছিল, তাই এ কাতরতা! সুশীল ছুটিয়া গিয়া বাক্স আনিয়া দিল। স্নেহ কাঁদিয়া ফেলিল, "দাদা মনে রেখো" বলিতে বলিতে শিবিকা চলিয়া গেল।

সুশীলকুমার দাঁড়াইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল। কত ভয়, কত সন্দেহ, কত আশা নিরাশা ও কত হর্ষবিষাদ, যে স্নেহের হৃদয় তরঙ্গায়িত করিতেছিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? সন্ধ্যার সময় স্নেহ শ্বশুরালয়ে পৌঁছিল, কেহ তাহার অভ্যর্থনা করিতে আসিল না। সঙ্গের দাসীই তাহাকে ঘরে লইয়া চলিল, শাশুড়ীকে দেখিয়া স্নেহ ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল "জন্মোয়োস্ত্রী হও, পাকা মাথায় সিঁদুর পর" বলিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে শাশুড়ী চলিয়া গেলেন। স্নেহের ভিখারিণীর বেশই কি ক্রোধের কারণ? অথবা সকলের অমতে সুধীর আনিয়াছেন বলিয়া এতদূর বিরাগ?—আকাশ পাতাল ভাবনা লইয়া স্নেহ ঝির প্রদর্শিত একটি ঘরে বসিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে একটি অল্পবয়স্কা রহস্যপ্রিয় দাসী স্নেহকে জলযোগ করিবার জন্য ডাকিতে আসিল। সুযোগ বুঝিয়া স্নেহ এ-কথা ও-কথার পর জিজ্ঞাসা করিল, "এদের কারো মনে সুখ নাই কেন ঝি?"

ঝি— "মা তোমাকে বল্‌তে যে মানা করে দিয়েছেন, বৌদিদিমণি!"

স্নেহ— "আমি কাকেও বলব না, তুমি বল; আমার মাথা খাও, বল!"

ঝি— "দাদাবাবুর যে শক্ত ব্যারাম, তাই ত মার কাছে তোমাকে দেখ্‌বার সাধ করেছিলেন বলে তোমায় আনা হয়েছে। তা নইলে কি বাবা কখনো তোমায় আন্‌তেন? আবার বিয়ে দেবার জন্য কত কাণ্ড! সেই ভাবনাতেই ত দাদাবাবুর এই অসুখ।"

স্নেহ—(হৃদয়াবেগ চাপিয়া কাতর স্বরে) "এখন কেমন আছেন?"

ঝি—"ডাক্তারও ত হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। ক দিন শুধু অজ্ঞান।"

স্নেহ চতুর্দিক শূন্য দেখিল, সংজ্ঞাহীনার ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া গেল। হতভাগিনীর মনে হইতে লাগিল, যেন কেহ তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া লইতেছে, দাসীর কোন প্রকার সান্ত্বনা বাক্যই কার্যকরী হইল না। অনাহারে অনিদ্রায় হতচেতনার ন্যায় সে এক পাশে পড়িয়া রহিল।

৭

রাত্রি একটা বাজিয়া গিয়াছে। পিতামাতা ঔষধ হস্তে পুত্রের শিয়রে বসিয়া আছেন। এমন সময় তাঁহাদের মৃত প্রাণে অমৃত বর্ষণ করিয়া আজ তিনদিনেব পর সুধীর একবার চাহিলেন।

মা—"বাবা, ঔষধ খাও।"

সুধীর—"মা! ঔষধ খাইতে আর ইচ্ছা নাই।"

পিতা—"বাবা! তোমার অমতে আর কোন কাজ করিতে যাইব না।"

মা—"বাবা! বৌ আসিয়াছে বাবা, আহা বাছার আমার কষ্ট দেখিলে শত্রুরও বুক ফাটিয়া যায়! হরি হে, হরি হে আর কারো পানে না চাও সে দুধের বাছার পানে চাও ঠাকুর!"

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সুধীর ঔষধ খাইল।

আজ তিন দিনের পর জমিদার বাবু স্বীয় কক্ষে গমন করিলেন। স্নেহের ডাক পড়িল। মাতা তাহাকে সুধীরের নিকট বসিতে বলিয়া পুত্রের আহার্য আনিতে গেলেন।

স্নেহ ধীরে ধীরে স্বামীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতখানি বুকের উপর লইয়া সুধীর বলিলেন "স্নেহ! আজ দেড় মাস শয্যাগত, তাই তোমায় আনিতে বা সংবাদ লইতে পারি নাই, কিছু মনে করিও না। তোমার জন্য কতই ভাবিয়াছি স্নেহ!" স্নেহের দেহলতা কাঁপিতে লাগিল, সে বসিয়া পড়িল! বহুকষ্টে আত্মসংযম ও অশ্রুবারি সংবরণ করিয়া সুধীরের শীর্ণ অঙ্গে পদ্মহস্ত বুলাইতে তাহার অর্দ্ধেক রোগ ও যাতনার উপশম করিয়া দিয়া বলিল, "তার জন্য কি, তুমি ভাল হইলে আমার সব! বেশী কথা বলিও না, অসুখ বাড়িবে।"

অতঃপর মাতাকে গৃহপ্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া, অবগুণ্ঠিতা হইয়া স্নেহ এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

৮

আজ জমিদার বাটীতে বড় ধুমধাম। সুধীরের আরোগ্যলাভ উপলক্ষে পূজা, কাঙ্গালী বিদায় ও লোক খাওয়ানোর বিপুল আয়োজন হইতেছে। ইহার উপর আবার সুধীরের প্রশংসার সহিত বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ সে আনন্দকে শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে। নানা কার্যে ব্যাপৃত স্নেহ রত্নালংকার খচিত দেবী প্রতিমার ন্যায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শ্বশুর শাশুড়ী এরূপ কর্মকুশলা ও গুণবতী বধূ পাইয়া নিরতিশয় প্রীত হইয়াছেন।

সহসা কোন প্রয়োজনাপক্ষে স্নেহ আনমনে আপনকক্ষে প্রবিষ্ট হইল। সে জানিত না যে সুধীর সেখানে মেঘমুক্ত শশধরের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। তাহাকে অপ্রতিভ দেখিয়া সুধীরচন্দ্র হসিয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন "ওঃ ঘরখানি যে সুগন্ধে পূর্ণ করে

দিলে !"

স্নেহ বলিল—"তোমারই পুরস্কারের সেই কুন্তলীন ও দেলখোস আজ মাখিয়াছি। এই দিনেরই প্রত্যাশায় বড় যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম।" সুধীর—"কি আশ্চর্য ! সেই বিদায়ের দিন দিয়াছিলাম, এত দিন তাহা মাখ নাই ?"

স্নেহ—তোমরা কিছুই বুঝিতে পারো না, আমার কি সে অবস্থায় কুন্তলীন মাখিতে প্রবৃত্তি হইতে পারে ?

সুধীর—বাঃ তোমার রুক্ষ কেশ দেখিয়া আমি এতগুলি কুন্তলীন পাঠাইলাম, আর তুমি তাহাব এক শিশিও মাখিলে না ?

স্নেহ—তাহার জন্য ভাবনা কি ? এখন হইতে আমাকে প্রতি মাসে এক ডজন কবিয়া কুন্তলীন দিও আমি মাখিয়া ফেলিব।

সুধীর—সর্বনাশ ! তাহা হইলে কুন্তলীনের আলাদা একখানি ফর্দ ফি মাসে বাবার নিকট পাঠাইতে হইবে, দেখিতেছি !!

স্নেহ—বাবাকে ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে দিলে আমি তোমার একফোঁটা কুন্তলীন স্পর্শ করিব না।

সুধীর—তবে তোমার কুন্তলীনের জন্য আমাকে টুইসন খুঁজতে হইবে বল ?

স্নেহ—তা কেন ? তাহা হইলে আমি তোমায় বলিব কেন ? তুমি যে অত টাকা স্কলারসিপ পাইবে, তাতে আর আমার দু' শিশি কুন্তলীন ও দু' শিশি করিয়া দেখখোস্ হইবে না ?

সুধীব—হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন "ওঃ এতদূর ঠিক করিয়া ফেলিয়াছ ? তাহা হইলে তোমাব কুন্তলীন এসেন্স মাখিবার খুব যোগাড় হইয়াছে বটে !!"

স্নেহ—ছাড়, এইবার আমি যাই, কাজ আছে।

সুধীর—সারাদিনের মধ্যে এই দেখা পাইয়াছি, ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছে না।

স্নেহ—এত যদি, তবে কলিকাতায় যাইবে কিরূপে ?

সুধীর—সে দায়ে পড়িয়া, যাহা হউক স্নেহ ! পত্রের মাহাত্ম্য ভুলিও না। তোমার একখানি পত্র এত শীঘ্র এতটা করিল, তোমার আমার কুশল ফিরাইল, ইহা মনে রাখিয়া কলিকাতায আমাকে খুব তাড়াতাড়ি পত্র দিবে।

স্নেহ—আমাকে ধরিযা রাখিলে আমি মোটেই পত্র লিখিব না।

সুধীর—তবে যাও।

সুধীরের হৃদযে যে মেঘ সেই মেঘ রাখিয়া বিজলী ছুটিয়া পলাইল !

ইহার কযেকদিন পবে স্নেহময়ী জননীব হস্তে স্নেহকে সমর্পণ কবিযা সুধীব নিশ্চিন্ত মনে এম এ পড়িতে কলিকাতা রওনা হইলেন।

ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ

শুয়ে শুয়ে চোর ধরা

অদ্য বিপিনবাবুর বাটীতে বড়ই গোলযোগ। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা নলিনী এই প্রথম শ্বশুরালয় যাইবেন। কনিষ্ঠ জামাতা সুধীরকুমার নলিনীকে লইতে আসিয়াছেন। একে ত নূতন জামাইকে লইয়াই বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা ব্যতিব্যস্ত, তাহার উপর আবার নলিনীর 'ঘর

বসন্তে'র উদ্যোগ করিতে হইবে। সুতরাং এক মহা আয়োজন হইতেছে। বাটীর চাকরেরা ও বিপিনবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথ, সাধ্যমত দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেছেন, তথাপি গৃহিনী অর্থাৎ নলিনীর জননীর মনোমত হইতেছে না। তিনি কেবল, "হ্যাঁরে, সুরেন এটা নিয়ে এলিনে ? ওটা নিয়ে এলিনে ?" ইত্যাদি কহিতেছেন। সুরেন বলিলেন "মা, আজ দশ বারোদিন বাজার করিতেছি, তবু আপনার হবে না, তা আমি কি করিব বলুন ?" তখন গিন্নী অপেক্ষাকৃত কিছু নরম হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, তা ত আন্‌ছোই, আর গোটা কত জিনিষ আনলেই হয়, মেয়ে পাঠান কি সহজ ?"

সুরেন। আচ্ছা, আমি কাগজ পেন্সিল আনিতেছি, আপনার যাহা যাহা দরকার হয় বলুন, আমি লিখিয়া লইতেছি।

গিন্নী। তবে লেখ আমি বল্‌ছি ; রসো ; আগে কি কি আনা হয়েছে দেখি ; ভাল কথা, সেদিন যে থালখানা ছোট হয়েছে বলে ফিরিয়ে দিলুম, সে থাল ত তুমি আর আননি ?

সুরেন। লিখিলাম আর যাহা হয় বলুন।

গিন্নী। আর এই যে দেখ্‌ছি, এই ট্রাঙ্ক, বাক্স, কাপড়-চোপড় সব আনা হয়েছে, বাসন টাসনও এসেছে।

ইতিমধ্যে বিপিন বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমুদ সেই স্থানে আসিলেন. তাঁহাকে দেখিয়া গৃহিণী যেন কিছু শক্তি পাইলেন, কারণ তিনি সুরেনকে দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিবার জন্য তাড়া দিয়া, কি কি আনিতে হইবে ভুলিয়া যাইতেছিলেন ! এখন কন্যাকে সম্মুখে পাইয়া বলিলেন "হ্যাঁরে কুমুদ, আর কি কি আন্‌তে হবে বল দেখি ?" কুমুদ গম্ভীরস্বরে উত্তর করিল "এখনই আনারই বা কি হয়েছে ?"

গিন্নী। ওমা ! সে কি কথা রে, তুই না কাল বল্লি যে বাসকো টাস্‌কো সব গোছান হয়েছে !

কুমু। হ্যাঁ, তা হয়েছে বটে, খেলনার বাক্সো, চিঠি লিখ্‌বার বাক্সো সাজান হয়েছে কেবল চুল বাঁধাটাতে কিছু কিছু বাকি আছে।

গিন্নী। কেন, ফিতে, চিরুণী, কাঁটা, আরসী এসব ত আনা হয়েছে ?

কুমু। তাহলে কি হয়, সাবান, ল্যাভেন্ডার, দেল্‌খোস, আর দুই একরকম ভাল তেল আন্‌তে হবে।

সুরেন। তেল আবার কি হবে দিদি ? তাহাদের বাড়ীতে কি তেল নাই ?

কুমু। তেল নেই কে বল্লে ? আমি ত আর নারকেল তেলের কথা বলছি নে : কোন রকম ভাল সুগন্ধি তেল দুই শিশি এন।

সুরেন। এই যে সেদিন দু'শিশি কুন্তলীন নলিনীর কাছে দেখেছিলাম, তাহা সমস্ত খরচ হইয়াছে ?

কুমু। সে অনেকদিন ফুরিয়েছে, একদিন মার বড় মাথা ঘুরছিল, তাই নলিনী একটুখানি নিয়ে মার মাথায় দিয়েছিল, সেটাতে মার বড় উপকার হল ; সে অবধি মার যখন মাথা ঘোরে তখনই কুন্তলীন মাখেন।

সুরেন। তবে আর কি কি চাই একটু শীঘ্র করিয়া বলিয়া দাও।

তখন মাতা ও কন্যাতে মিলিয়া যাহা যাহা চাই সমস্ত বলিয়া দিলেন। সুরেন্দ্র আর বিলম্ব না করিয়া, উমেশ চাকরকে সঙ্গে লইয়া, ট্র্যামে আরোহণ করিয়া, বড় বাজার, বহু বাজার, প্রভৃতি ঘুরিয়া, উমেশের মোটটিকে দলে ভারী করিয়া বাটী ফিরিলেন।

বাঙ্গালীর বাড়ী জামাই আসা এক মহাব্যাপার। সে কয়দিন বড়ই আনন্দে কাটিয়া গেল।

কর্ত্রী ঠাকুরানীর নানান রকমের খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতেই সময় অতিবাহিত হইত। কুমুদের উপর আবার অনেকগুলি কাজের ভার পড়িয়াছিল। পান সাজা, বিছানা করা, ভগ্নিপতির সহিত কথাবার্তা কহা, ঠকাইবার জন্য কৃত্রিম খাবার তৈরী করা ত আছেই। তাহার উপর আবার প্রতিবেশিনী সমবয়স্কাদের সহিত জামাইয়ের গল্প করা ত ইত্যাদি।

যাহা হউক, এ কয়দিন যেমন আনন্দের ফোয়ারা ফুটিতেছিল, আজ বিপিনবাবুর বাড়ী তেমনি নিরানন্দ। বিশেষ নলিনীর চক্ষু দুইটি জবাফুলের মত হইয়াছে। তখন নলিনীর শ্বশুরালয়ে যাইবার দিন, যাত্রা করিবার সময় হইল দেখিয়া, বিপিনবাবু বাটীর ভিতর আসিয়া বলিলেন "তোমাদের কি সব ঠিক হইয়াছে ? গাড়ী আসিয়াছে" কন্যাকে কহিলেন "কুমুদ, সুধীরের জল খাওয়া হয়েছে ?

কুমু। হ্যাঁ, হয়েছে।

গিন্নী। (কন্যার প্রতি) নলি ! তুমি কেঁদ না মা, শ্বশুরবাড়ী এক বেলারও পথ নয়, আমি আবার তোমাকে শীঘ্রই লইয়া আসিব।

এমন সময় সুধীরকুমার সম্বন্ধীর সহিত হাসি হাসি মুখে সকলকে নমস্কার করিতে আসিলেন। কিন্তু সকলকে কাঁদিতে দেখিয়া তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গেল। নমস্কারাদি হইয়া গেলে বিপিনবাবু জামাতাকে লইয়া বাহিরে গেলেন। সুরেন ছোট ভগ্নীকে কহিলেন, "নলি কাঁদিস কেন ? আমি তোব সঙ্গে দেখা করিতে যাইব।" তখন আর বিলম্ব না করিয়া নলিনীকে লইয়া সকলে বাহিরে আসিলেন এবং নলিনীর মাতা কন্যার হাত ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।

২

নলিনীর শ্বশুরবাড়ী কলিকাতার নিকটবর্তী কোন পল্লীগ্রামে। তাহার শ্বশুরের নাম বিনয়কুমার বসু। তিনি পূর্বে গভর্মেন্ট অফিসে উচ্চ কর্মচারী ছিলেন এখন একশত টাকা পেন্‌সন পাইয়া থাকেন। তাহা ছাড়া তাঁহার কিছু জমিদারীও আছে। তাঁহার দুইটি পুত্র ও সর্বকনিষ্ঠা একটি কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শিশিরকুমার, কনিষ্ঠটি আমাদের পরিচিত সুধীরকুমার। কন্যাব নাম সরোজিনী। তাঁহাদিগের গ্রামে বিনয়বাবু একজন গণ্যমান্য লোক। তাঁহার স্বভাব অতি প্রশংসনীয়।

তাঁহার পুত্রদ্বয় পিতার মত পরোপকারী, সুশীল, শান্ত, মিষ্টভাষী। লেখাপড়া বিষয়ে উভয়েরই খুব মনোযোগ আছে। শিশিরকুমার বি এ-তে একবার ফেল হইয়া পুনরায় কলিকাতায় বি এ ক্লাসে পড়িতেছেন, সুধীরকুমার এফ এ ক্লাসে পড়েন। বিনয়বাবুর কলিকাতায় একখানি বাসাবাড়ী আছে। গ্রামেও বড়লোক বা মধ্যবর্তী গৃহস্থের থাকিবার উপযোগী একখানি ভদ্রাসন আছে। ইহা ব্যতীত বাগান, পুষ্করিণী ইত্যাদিও আছে। বাটীতে পুত্র কন্যা পরিবার ছাড়া তাঁহার খুড়ীমা ও ভগ্নীও আছেন। বিনয়বাবুর সহধর্মিনী তাঁহাদের সকলকে উপযুক্তরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। বাড়ীতে 'রাধাবল্লভ' নামে বিগ্রহ আছেন, তাঁহার ভালরূপে সেবা হইয়া থাকে। তৎভিন্ন বার মাসের তের পার্বণ ত আছেই। ফল কথা, বিনয়বাবুর সংসার দেখিলে, সংসার বিরাগীদেরও সংসার করিতে ইচ্ছা হয়। সেই আনন্দ উদ্যানে আমাদিগের নলিনী কুসুমকলিকাবৎ শোভাবর্ধন করিতেছেন।

বিনয়বাবুর বাটীর দ্বিতলের একখানি প্রকোষ্ঠে বসিয়া, তিনটি বালিকা বা যুবতী কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে বিনয়বাবুর গৃহিণী মোক্ষদা, সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ

করিয়া কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "সরো ! আয় বাছা তোদের চুলটা বেঁধে দিয়ে যাই, বেলা গেল। (জ্যেষ্ঠ বধূর প্রতি) বড় বউমা ! তুমি ত আর আজ চুল বাঁধবে না, তুমি কাপড় কেচে, ময়দা টয়দা বার করে বামন ঠাকরুনকে গুচিয়ে দাও গে।" ইহা শুনিয়া বড় বধূ সরলা শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন।

মোক্ষ। এস, ছোট বৌমা, তোমার চুলটা আগে বেঁধে দিই।

সরো। তা ভাই ছোট বৌদিদি, তোমার সেই তেলের শিশিটা বার কর না ভাই (মাতার প্রতি) মা ! ছোট বৌদিদির কাছে কেমন ভাল তেল আছে, তার গন্ধ খুব ভাল, তাতে খুব চুল বাড়ে, আমাকে এক শিশি কিনে দিও না মা।

মোক্ষ। কৈ, কেমন তেল দেখি ' তোর বড় দাদা কি ছোট দাদাকে বলে দিস্ কলকাতা থেকে আসবার সময় আন্‌বে এখন।

সরো। হ্যাঁ ছোট বৌদিদি, তার নামটা কি বলেছিলে ভাই ?

নলিনী মৃদুস্বরে কহিলেন "কুন্তলীন"।

সরো। আর একটা যে ছোট আতরের শিশির মত, সেটা কি ?

নলি। সেটা এসেন্স 'দেল্‌খোস।'

মোক্ষ। যাও মা, শিগ্‌গির ফিতে চিরুনী নিয়ে এসো গে।

নলিনী উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সরোজ উঠিল। কক্ষান্তরে গিয়া, পোর্টম্যান্ট খুলিয়া কেবল নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন, কারণ মাথার সোনার কাঁটা ও চিরুনী পাওয়া যাইতেছে না। এদিকে শাশুড়ি ঠাকুরানী শীঘ্র আনিতে বলিয়াছেন। বালিকা ভয়ভীত স্বরে বলিলেন. "ঠাকুরঝি ! কাঁটা চিরুনীটা পাইতেছি না কি হবে ভাই ?"

সরো। সেকি বউদিদি ! কোথায় রেখেছিলে ?

নলি। এই ট্রাঙ্কের ভিতর রেখেছিলাম।

তখন কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া সরোজিনী যাইয়া মাতাকে কহিল, "মা ! বৌদিদিব কাঁটা চিরুনী পাওয়া যাচ্ছে ন.।"

মোক্ষ। সে আবার কি কথা ! কোথায় রেখেছিল যে পাওয়া যাচ্ছে না ?"

সরো। ওই ঘরে পোর্টমেন্টের ভিতর।

"তবে ওখানেই আছে" বলিয়া মোক্ষদা নিজেই খুঁজিতে গেলেন।

তিনি মনে করিলেন, ওরা ছেলে মানুষ, তিনি অবশ্য কৃতকার্য হইবেন। কিন্তু ট্রাঙ্ক উল্টাইয়া ফেলিলেন, তথাপি পাইলেন না। ইতিমধ্যে বিনয়বাবুর ভগ্নী আসিয়া বলিলেন, "বৌ ! তুমি কি করতেছ ? দাদা বাড়ীর ভিতর এসেছেন।"

মোক্ষ। আরে ভাই, বড় মুস্কিলে পড়েছি।

ভগ্নী। কি মুস্কিলে এ পড়েছ ভাই ? এখন মুস্কিল আসান-কে ডাক !"

মোক্ষ। না তামাসা নয়, ছোট বৌমার চিরুনী কাঁটা পাওয়া যাচ্ছে না।

ভগ্নী। সত্যি ! সেই সোনার চিরুনী কাঁটা ? চার পাঁচ ভরির জিনিষ, দু' এক টাকার নয় ! কোথা রেখেছিলে গো বাছা ?

নলিনী কথা না কহিতে কহিতে সরোজিনী বলিল, "নাইবার সময় চুল খুলে এই ট্রাঙ্কে রেখেছিলেন।" বিনয়বাবুর ভগ্নী কহিলেন, "পেট্‌রাটার ত মুখ নেই, যে হাঁ করে খেয়ে ফেল্‌বে। অন্য কোথায় রেখে ভুলে গেছে।" এইরূপে তিনি যত জেরা করিতে লাগিলেন, নলিনীর মুখখানি তত মলিন হইয়া আসিতে লাগিল। বড় বড় চক্ষু দুইটি জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সরোজের যেন তাহা ভাল লাগিল না। বিনয়বাবুর ভগ্নী মোক্ষদার প্রতি

ফিরিয়া কহিলেন, "কি বল বৌ ? আমার বোধহয় বৌমা আন্‌তে ভুলে গেছে, এখন ঠিক্ করতে পারছে না, তাই চুপ করে রয়েছে।" বিমলার কথা শুনিয়া মোক্ষদা একটা বড় গোছের নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,— "কি করে জানব বল ?" মোক্ষদা চলিয়া গেলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ— "বাবা ! কি বল্লুম যে কান্না হোল ? বলিযা বিমলাও চলিয়া গেলেন। নলিনী ও সরোজিনী অনেক খুঁজিলেন, অনেক ভাবিলেন, অনেক কথা কহিলেন। কিছুক্ষণ পরে সরোজ কহিল "চল ভাই নিচে যাই, আর কেঁদে কেটে কি হবে ?"

এদিকে নীচে রান্না ঘরে একটি জাঁকাল গোছের সভাব অধিবেশন হইয়াছে। সভ্যগণ কেহ কাহার অপেক্ষা ন্যূন নহেন, সকলেই যেন এখানেই রণজয়ী হইতে পারেন ! মুখের আস্ফালনে রুষরাজকেও ভয় পাইতে হয় ! বুয়র যুদ্ধে বোধকরি ইহাদিগকে পাঠাইলে, ইংরাজ রাজকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইতে হইত না। উপস্থিত চীনযুদ্ধে পাঠান একান্ত কর্তব্য। মোক্ষদা উপর হইতে নামিবামাত্র বিনয়বাবুর খুড়ী বলিলেন, "কোথায় ছিলে গো বাছা ? বিনয় বাড়ীর ভিতর জল খেতে এল, আর তোমার অম্নি কাজের ভিড় পোড়্‌ল।" বিমলা বলিলেন, "তা ও কি কর্বে, বৌ যে এক কিত্তি করে বসেছে।"

বি, খুড়ী। সে আবার কী ?

মোক্ষ। ছোট বৌমার কাঁটা চিরুনী পাওয়া যাচ্ছে না।

বি, খুড়ী। তাই বল, আমি বলি না জানি কি !

বিমলা ! "আঃ আমার কপাল, সে যে সোনার গো, খুঁজে খুঁজে খুন, পেলে না।" ইহা শ্রবণ করিয়া, কেহ দশণে রসনা চাপিলেন, কেহ গণ্ডস্থলে হস্ত ধাবণপূর্বক অবাক হইয়া রহিলেন। দিনু বৃদ্ধা ঝি ত একেবারে নাই বলিলেই হয় ? চাঁপি নতুন ঝি, আকাশ হইতে পড়িল ! সকলে মিলিয়া অনবরত গালাগালি করিতে লাগিল।

যে নিয়েছে তার সর্বনাশ হোক, সে দুটি চোক্ষের মাথা খাক্ ইত্যাদি। খুড়ী ঠাক্রুন বলিলেন, "ওমা ! এমন অসাবধান বউ ত দেখিনি ! কোথায় ফেল্লে তার খোঁজ নেই গা !" ইতিমধ্যে খুনী আসামীর মত, আমাদের নলিনী, সরোজিনীকে লইয়া রান্নাঘরে আসিলেন। এখন বাড়ীর সকলেই সেইখানে বর্তমান। বিনযবাবুব খুড়ী বলিলেন "হ্যাঁগা নাত বৌ ! তুমি ত বাছা ছেলেমানুষ নও ! অত টাকার জিনিষটা কি করে হারালে ?" নলিনীকে উত্তর দিতে হইল না, সরোজিনী তাহার হইয়া বলিলেন, "তা কি সাধ করে হারিয়েছে, চাবি কুলুপের ভিতর থেকে যাবে তা ও কি করবে বল ?"

বিমলা। আচ্ছা চাবি ত বৌমার কাছে ছিল !

চাঁপি। তাই ত আমিও ভাবছি, গেল কি করে ?

দীনু। ভাল কথা, বড় বৌদিদি ! তুমি না বল্‌ছিলে যে ছোট বৌ নাইতে এসে চাবি ফেলে গেছে।

সর। সত্যি ত ! হ্যাঁ আমি উপরে গিয়ে ঠাকুরঝির হাতে দিয়ে বল্লাম, ছোট বৌকে দিয়ে এস।

সরো। আমি তোমায় এখুনি দিয়ে এলুম, না বৌদিদি !

নলি। (মৃদুস্বরে) হ্যাঁ, তুমি তখনি দিয়েছ, কিন্তু তখন আমি আঁচলে বাঁধি নাই, টেবিলের উপর রেখে দিয়েছিলাম। পরে জল খাইয়া গিয়া বাঁধিয়াছি।

বিম। সে সময় ত কেউ উপরে যায়নি, দীনু বাসন মাজ্‌ছিল, চাঁপি বাজারে গিয়েছিল।

বি, খুড়ী। হাবা মেয়ে ! তোরঙ্গের আর সব জিনিষ ত আছে ?

সরো। হ্যাঁ, আর সব আছে কেবল এক শিশি কুন্তলীন তেল নাই।

ইহা শুনিয়া সকলেই উচ্চহাস্য করিলেন। কেহ বলিলেন "একেই বলে ছেলেমানুষের কথা" কেহ বলিলেন, "চোরের ত বড় সখ গা ?" খুড়ী ঠাকুরানী বলিলেন "তবে বোধ করি সরি কি বড় নাত্ বৌ লুকিয়ে রেখেছে," —ইহা শুনিয়া সরলা কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ চাহিয়া রহিলেন। সরোজ রাগিয়া ঠাকুর মাকে দু' চার কথা শুনাইয়া দিল। মোক্ষদা বিরক্ত হইয়া বলিলেন "আরে বকাবকিতে কাজ নেই, সকলে আপনার কাজ দেখগে যাও।" ক্রমে এই সংবাদ বাহিরে বিনয়বাবুর কানে পৌঁছিল। তিনি শুনিয়া ভাবিলেন "ইহা ঝি বেটিদের কাজ।" কিন্তু কোনরূপ সন্ধান না পাওয়াতে তিনি প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না। বাটীর ঝিএরা ও অন্যান্য সকলে বলিতে লাগিল, "ওঁরই ত ঝি বৌ-এর হাতে চাবি ছিল, বড় ঘরের বড় কথা বাছা!" কিছু দিনে গোল মিটিল বটে, কিন্তু সকলের মনে একটা দাগ রহিয়া গেল। বিশেষ করিয়া নলিনী ও সরলার; তাঁহারা আপনদিগকেই অপরাধিনী জ্ঞান করিতেন। যদিও বিনয়বাবু ও মোক্ষদা তাঁহাদিগকে কিছু বলেন নাই তথাপি তাঁহারা ভাবিতেন,—

"আমরা অতিশয় অপরাধিনী।"

এইরূপে দুই চারিদিন করিয়া, দুই চারি মাস অতীত হইল। নলিনীর পিত্রালয়ে যাইবার কথা হইল। বিনয়বাবু কহিলেন "ছোট বৌমাকে পাঠাইতে হইবে, বিপিনবাবু লিখিয়াছেন।" খুড়ীমা কহিলেন, "এখন হবে না বাবা, এরপর দেখা যাবে।" সুতরাং সে সময় পাঠান হইল না, নলিনী নিরাশ হইয়া কাঁদিয়াকাঁদিযা পীড়িতা হইলেন। বিনয়বাবু যথোচিত চিকিৎসাদি করাইতে লাগিলেন। মোক্ষদা বধূমাতার সেবার জন্য চাঁপাকে নিযুক্ত করিলেন। নলিনী আট দশ দিন পরে কিছু সুস্থ হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে বেশী উঠিতে হাঁটিতে দেওয়া হইত না। একদিন চাঁপা তাঁহার কাছে বসিয়াছিল, তিনি যেন কি একটা সুগন্ধ পাইলেন। কিছুক্ষণ পরে, তাঁহার বদনমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সেই সময়ে সরোজ আসিয়া বলিল, "চাঁপা তুমি নীচে যাও!" চাঁপা চলিয়া গেলে নলিনী বলিলেন, "ঠাকুরঝি আমি চোর ধরেছি, তুমি চাঁপার ঘরে একটি কুলুপ দিয়ে এসো!" সরোজ কহিল "কি করে ধল্লে?"

নলি। আমি চাঁপার মাথায় গোলাপ গন্ধ কুন্তলীনের গন্ধ পাইয়াছি আমার যে তেলের শিশিটা চুরি গিয়াছে, সেটা গোলাপ গন্ধ কুন্তলীন ছিল। যে এই তেল নিয়েছে সে আমার কাঁটা চিরুনী নিয়াছে।"

পরে তাহাই যথার্থ হইল। চাঁপা চাবি রাখিতে দেখিয়াছিল। বাজারে যাইতেছি বলিয়া উপরে গিয়া চুরি করিয়াছে। সে দুইদিন মাত্র সেই কুন্তলীন মাখিয়াছে, কিন্তু আজ ধরা পড়িল। চাঁপার ঘরে তাহার একটা বাক্সের ভিতর সব পাওয়া গেল। সরলা ও নলিনী ভাবিলেন তাঁহাদের কলঙ্ক দূর হইল। সরোজ বলিল "বৌদিদি তুমি খুব চোর ধরেছিলে!" নলিনী হাসিয়া বলিলেন,

"আমার বুদ্ধির এম্নি জোর
শুয়ে শুয়ে ধরি চোর!"

নীরোদবাসিনী ঘোষ

মেয়ে

১

"সই তোর নাকি নতুন মা আস্‌বে ?"

বেলফুলের কথায় সরসীর চোখে জল আসিল। আজ এক মাস তাহার মাতা স্বর্গে গিয়াছেন, ইহারই মধ্যে তাহার পিতা আবার নূতন গৃহিণী আনিতে চলিয়াছেন। বালিকা অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া সইয়ের হাত ধরিয়া বলিল, "চল্ ভাই! তোদের বাড়ী বেড়িয়ে আসি।"

সরসীর পিতা বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় স্বনামধন্য জমিদার। নিজের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি পাঁচ শত টাকার তালুকটীকে পঁয়তাল্লিশ হাজারে পরিণত করিয়াছিলেন। দেশে বিদেশে তাঁহার নাম লোকের মুখে মুখে ফিরিত। কিন্তু গ্রামের নিন্দুকেরা বলিত, অনেক অনাথা, বিধবা ও দরিদ্র ব্রাহ্মণের অশ্রুজল এবং মর্মান্তিক দীর্ঘ নিশ্বাসের ভিত্তির উপর এই বিপুল সম্পত্তি গঠিত। তা নষ্ট দুষ্ট লোকে যতই কেন দুর্নাম করুক না, বিপ্রদাস বাবু যে এক জন বিলক্ষণ কৃতী পুরুষ, তাহা কেহই অস্বীকার করিত না।

কিন্তু তাঁহার দেশবিখ্যাত নামটি বংশধরের অভাবে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে—এই চিন্তা বিপ্রদাসের মনে সর্বদা দুঃস্বপ্নের মত ঘুরিয়া বেড়াইত। যখন তিনি প্রথম পক্ষের সন্তান সম্ভাবনা না দেখিয়া দ্বিতীয় দারগ্রহণে সঙ্কল্প করিতেছিলেন, সেই সময় বিপ্রদাসের ভবিষ্যৎ বংশধরের সম্ভাবনা সত্যসত্যই দেখা দিল।

যে দিন পুত্ররত্ন জন্মগ্রহণ করিল, সে দিন বিপ্রদাসের দানশীলতায় তাঁহার শত্রুরাও মুগ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু অদৃষ্টদোষে শিশুটি চিররোগী হইল। ইহার চারি বৎসর পরে বিপ্রদাস-পত্নী সন্তানসম্ভবা হইলেন। কিন্তু শুভক্ষণেই হউক কি অশুভ মুহূর্তেই হউক, এবার দ্বিতীয় বংশধরের আশা লুপ্ত করিয়া সরসী শোভা মাতার কোল আলো করিয়া বসিল। বিপ্রদাস সেই দিন হইতে কন্যাটির দিকে আর ফিরিয়া চাহিতেন না।

সরসীর জন্মের এক মাসের মধ্যে বিপ্রদাসের আদরের দুলাল চিররুগ্ন বংশধরটি তাহার পিতা মাতার বুকে বজ্রশেল বিঁধিয়া চলিয়া গেল। মাতা শোকতপ্ত হৃদয়ের উপর কন্যাকে চাপিয়া ধরিলেন। পিতা সেই দিন হইতে বাহিরের ঘরে স্থায়ী হইলেন।

কন্যার প্রতি যে মমতাহীনতা বিপ্রদাসের হৃদয়ে প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছিল, দিন দিন তাহা বিদ্বেষ ও নিষ্ঠুরতায় পল্লবিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি কঠিন আদেশ করিয়াছিলেন,—ভ্রমেও কেহ যেন অলক্ষণা মেয়েটাকে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে না আনে।

আজ মাসাবধি সরসীর মাতা গত হইয়াছেন। ভাবী বংশধরের কামনায় পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ বিপ্রদাস নূতন সংসার পাতিতে চলিয়াছেন।

২

শঙ্খধ্বনি ও উলুরবে চারি দিক মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল। এক মাস পূর্বে মৃত্যুর কালো ছায়া যেখানে একটা বিভীষিকা ও অশ্রুজলের দৃশ্যপট উদঘাটিত করিয়াছিল, সেখানে আজ আবার আনন্দ ও হাস্যলহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। সেই ক্ষণিক ব্যস্ততা ও আনন্দ

কোলাহল হইতে সরিয়া গিয়া বালিকা সরসী নির্জন গৃহে বসিয়া কাঁদিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া তাহার মাতার সহাস্য মুখচ্ছবি তাহার চোখের কাছে ভাসিয়া উঠিতেছিল মাতার স্নেহপূর্ণ সম্ভাষণ কানে বাজিতেছিল। বালিকার বুকের মধ্যে ক্রন্দন যেন গুমরিয়া উঠিতেছিল। পিতার নিকট তিরস্কৃত হইয়া যখন সে মার স্নেহক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া কাঁদিত, তখন মাতা তাহার অশ্রুসিক্ত মুখখানি বুকের উপর রাখিয়া কত সোহাগ কত আদর করিতেন, কত উপদেশ দিতেন। আজ সেই সকল কথা তাহার বুকের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল।

তাহার সে স্নেহময়ী জননী আজ কোথায়? কেহ ত এখন তাহার মুখের দিকে চাহে না। সে পিতার মুখে জন্মাবধি কখনও মিষ্ট কথা শোনে নাই। তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়াই তাহাকে সন্তুষ্ট হইতে হইত। পিতার স্নেহের উপর মেয়ের যে আবদার, তাহা সে কখনও ভোগ করিতে পায় নাই। কেন সে পিতার কাছেও যাইতে পায় না তাহা সে বুঝিত না। মাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কাঁদিতেন বলিয়া বালিকা মুখ ফুটিয়া আর তাঁহাকে কখনও জিজ্ঞাসা করে নাই। মার নিকট সে 'সীতার বনবাস" রামবনবাস, অনেক কথা পড়িয়াছিল। পিতৃভক্তির শত কাহিনী তাহার মাতার মুখে শুনিয়াছিল। পিতার প্রতি রামের ভক্তি তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টিকে কোন এক অজানা আকর্ষণে পিতৃপদতলের দিকে টানিয়া লইয়া যাইত কিন্তু তাহার অদৃষ্টে পিতৃস্নেহ ছিল না।

বালিকা এইরূপ কত কি ভাবিতেছিল সকলগুলি তেমন স্পষ্ট নহে, যেন আগাগোড়া-হীন। কেমন একটা গোলমালের মত ভাল করিয়া কিছু বুঝা যায় না অথচ প্রাণটা যেন কাঁদিয়া উঠে। সবটুকু ভাল না বুঝিলেও সরসীর মনে হইতেছিল, তাহার পিতার উপর যেটুকু দাবী ছিল, আজ আর এক জন সে দাবী হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিল।

কাদিতে কাঁদিতে শ্রান্ত বালিকা মাটীর উপর লুটাইয়া পড়িল। নিদ্রার শান্তিস্নিগ্ধ কোমল স্পর্শ তাহার অলস চক্ষুর উপর পদ্মহস্ত বুলাইয়া গেল। পূর্বের সূর্য মাথার উপর আসিয়া ক্রমে পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল। কিন্তু অভুক্তা মাতৃহীনা বালিকার কেহ তত্ত্ব লইল না। প্রতিবেশী যাহারা আসিয়াছিল তাহারা বৌ দেখা শেষ হইলে চলিয়া গিয়াছিল যাঁহার কন্যা, তিনি আলবোলার নল মুখে দিয়া রূপসী পত্নীর কিরূপে মনোরঞ্জন করিবেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন। সুতরাং বালিকা নির্জন গৃহমধ্যে একাকী পড়িয়া রহিল

৩

যখন অপরাহ্ণের ছায়ার দিকে দিকে শান্তি ও স্নিগ্ধতা নামাইয়া আনিতেছিল তখন নূতন বধূ বাপের বাড়ীর ক্ষীরি চাকরাণীর সহিত পতিগৃহ দেখিয়া বেড়াইতেছিল প্রকাণ্ড বাড়িটী নির্জনপ্রায়। সকল কক্ষে মনুষ্য থাকিত না। হেমাঙ্গিনী গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইতেছিল। সহসা সে দেখিল, মাটীর উপর ম্লান পুষ্পের মত একটি বালিকা শুইয়া আছে তাহার আলুলায়িত কেশরাশি অযত্নে মাটীতে লুটাইতেছিল। মুদ্রিত নেত্রপল্লবে ও সুন্দর গণ্ডে অশ্রুচিহ্ন তখনও মুছিয়া যায় নাই। সেই নিদ্রিত কমনীয় মুখমণ্ডলে এমন সারল্য, এমন বিষাদচ্ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল যাহাতে নিতান্ত হৃদয়হীনের হৃদয়েও করুণা জাগিয়া উঠে।

হেমাঙ্গিনী মন্ত্রমুগ্ধের মত কয়েক মুহূর্ত তাহাকে দেখিল। তার পর ক্ষীরিকে জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়েটি কে?" ক্ষীরি বলিল, "বোধ হয় তোমার সতীন ঝি।"

নূতন বধূ ধীরে ধীরে বালিকার মাথা কোলে তুলিয়া লইল। সরসী সহসা চমকিয়া

জাগিয়া উঠিল। বিহ্বল দৃষ্টিতে সে একবার বধূমূর্তির দিকে চাহিল। তারপর একে একে সকল কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। বালিকা আবার অঞ্চলে মুখ ঢাকিল।

হেমাঙ্গিনীর বুকের মধ্যে করুণার প্রস্রবণ যেন উছলিয়া উঠিল। নূতন দৃষ্টিতেই সে একেবারে বালিকাকে যেন আপনার মত ভাবিয়া লইয়াছিল। মাতৃহীন বালিকার শত দুঃখ সে নিজেই সহ্য করিয়াছিল। হেমাঙ্গিনী সহানুভূতি ও স্নেহের সহিত বালিকাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "লক্ষ্মী, কেঁদ না, আমি আজ থেকে তোমার মার মত ভালবাসবো।"

হেমাঙ্গিনীর স্বর মমতামধুর। বালিকা সরসী মুখ তুলিয়া চাহিল। সে দেখিল, সেই করুণাময়ী বধূমূর্তির চারি দিকে যেন একটা আলোকদীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আদর করিবার সময় তাহার মার মুখে যেমন একটা শুভ্র জ্যোতিঃ উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিত, অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনের মধ্যে নববধূর মুখে তেমনি একটা আনন্দ-কিরণ তাহার পরলোকগত মাতৃমূর্তি বিকসিত করিয়া তুলিয়াছে। বালিকা হেমাঙ্গিনীর গলা জড়াইয়া ধরিল।

ক্ষীরি একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল। সে ঈষৎ বিরক্তিব্যঞ্জকস্বরে বলিল, "তুমি নতুন বৌ, লোকে বলবে কি? ছেড়ে দাও। এখনি অত ভাল নয়।"

সরসী চমকিয়া গলা ছাড়িয়া দিয়া চাকরাণীর দিকে চাহিল। তাহার বিবর্ণ মুখমণ্ডল আরও বিবর্ণ হইয়া গেল।

হেমাঙ্গিনী তীক্ষ্ণোজ্জ্বল দৃষ্টিতে ক্ষীরির দিকে চাহিল। তারপর দৃঢ় অনুভার স্বরে বলিল, "দেখ্ ক্ষীরি, আমি এখন ছেলে মানুষ নই; সকল কথায় তুই থাকিস্ নে। আমার যা ইচ্ছা তাই কর্‌বো, তুই তাতে কোন কথা কস্'নে। যা, আমার ঘরে সন্দেশ আছে, কতকগুলো বের করে নিয়ে আয়।"

৪

শরতের শুভ্র মঙ্গলজ্যোতি, নহবৎ ও ঢাকের শব্দ ষষ্ঠীর প্রভাত বড় মধুর করিয়া তুলিয়াছিল। নীরব গ্রাম, বৈচিত্র্যহীন পল্লীজীবন আজ পূজার উৎসববাদ্যে সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রাম্য বালক বালিকা প্রতিমার বোধন দেখিতে পূজাবাড়ী পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল।

সরসী নীচে নামিয়া যাইবার সময় একবার পিতার শয়নগৃহে উঁকি মারিল। গৃহমধ্যে তখন কেহ ছিল না। তাহার জননীর তৈল চিত্রখানি দেওয়ালে টাঙ্গান ছিল। প্রত্যহ সুবিধা পাইলে বালিকা অন্যের অলক্ষ্যে চুপি চুপি মাতৃপ্রতিকৃতি দেখিয়া লইত। সে গৃহে তাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। পিতা তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, এ ঘরে কখনও আসিও না। প্রাণান্তেও সে গৃহের মধ্যে বালিকা প্রবেশ করিত না। তবে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া বা জানালার মধ্য দিয়া গোপনে সে মার ছবিখানি দেখিয়া লইত। অনেক সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য তাহার নিতান্ত আগ্রহ হইত। তাহার শৈশবের সহস্র স্মৃতি সেই ঘরের মধ্যে সর্বদা যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহার সাধ হইত, সেই অতীত কালের অমূর্ত সঙ্গীগুলির সহিত আবার পরিচয় করিয়া লয়। কিন্তু পিতার নিষেধ স্মরণ করিয়া অতি কষ্টে সরসী সেই ইচ্ছা দমন করিত।

বালিকা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ঘরের চারিদিক দেখিতে লাগিল। দেওয়ালে তাহার মাতার ছবিখানি যেন তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছিল। ঘরের ভিতরের পুরাতন জিনিসগুলি যেন তাহাকে নীরবে ডাকিতেছিল। বালিকার পদদ্বয় যেন এক অদৃশ্য

আকর্ষণের বলে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার মাতা যে টেবিলের উপর কত রকমের ভাল ভাল পুতুল, কাঁচের সাজ সজ্জা সাজাইয়া রাখিতেন, সরসী ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইল। পিতার নিষেধ-আজ্ঞা তখন একেবারেই সবসীর মনে ছিল না।

বালিকা দেখিল, তাহার মাতা যেখানে যে জিনিসটি সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেগুলি ঠিক সেইখানেই আছে। নূতন হস্তস্পর্শে কেবল মার্জিত হইয়া তাহারা অতীতস্মৃতিকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। মার কথা মনে করিয়া সরসীর চোখে জল আসিল। আজ এই পূজার দিনে তাহার স্নেহময়ী জননী কোথায়?

অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া বালিকা আরও একটু সরিয়া গেল। এক পাশে টেবিলের উপর একটা মখমল-মোড়া অতি সুদৃশ্য বাক্স। বাক্সের ডালা খোলা। তাহার মধ্য হইতে কত কি উজ্জ্বল জিনিস দেখা যাইতেছিল। আর একটা মৃদু গন্ধ সেই স্থলটুকু সুবাসিত করিয়া তুলিতেছিল। বালিকার কৌতূহল বাড়িল, সে বাক্সটাকে একটু সরাইয়া আনিয়া দেখিল, কত রকমের চিরুনী, কাঁটা, সুগন্ধি সাবান, রেশমী ফিতে, নানারকম সুদৃশ্য শিশিভবা গন্ধদ্রব্য।

আত্মবিস্মৃত সরসী এক এক করিয়া সবগুলি তুলিযা দেখিতে লাগিল। একটা শিশি তুলিয়া দেখিল, "কুন্তলীন তৈল।" একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া বালিকা সেটা বাখিয়া দিল। আর একটা তুলিল, পড়িল, বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে, "দেলখোস্।" চাবিদিকে নাড়িয়া দেখিল এক স্থলে লাল কালিতে লেখা রহিয়াছে,—"শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর পূজার উপহার।" নীচে তাহার পিতার নাম।

সরসীর তখন সব কথা আবার মনে পড়িল। সে যে তাহার পিতার নিষেধ অবজ্ঞা করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে! ভয়ে বালিকার মুখ শুকাইয়া গেল। যদি এই সময় কেহ আসিয়া দেখে।

বালিকার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। এমন সময় দবজার কাছে চটি জুতার শব্দ হইল। সরসী তাড়াতাড়ি শিশিটা বাক্সে রাখিতে যাইবে, এমন সময়ে কে কক্ষস্বরে বলিল, "সবসী, কি কচ্ছিস ওখানে?" বালিকা বেতসপত্রের মত কাঁপিতেছিল। তাহার কম্পমান হস্ত হইতে শিশিটি মাটীতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। একটা দমকা বাতাস ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দেলখোসেব ঘন সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া দিল।

ভয়ে সরসীর মুখ মরা মানুষের মত সাদা হইয়া গিযাছিল। সে ফিবিয়া চাহিয়া দেখিল,—সম্মুখে তাহার বাবা! বিপ্রদাস বাবুব মুখ ক্রোধে লাল হইযা উঠিয়াছিল। যুবতী পত্নীর মনোরঞ্জনের পূজার উপহার কি না হতভাগা মেয়েটা এমনি করিয়া নষ্ট করিল: তাঁহার নিষেধ না শুনিয়া চোরের মত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিযাছে, এ কি কম ধৃষ্টতা!

আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া বিপ্রদাস বাবু কন্যার গণ্ডে চপেটাঘাত করিলেন। বালিকা কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে কাঁদিতে সেইখানে বসিয়া পড়িল। নির্দয় প্রহারে তাহার মাথার খুলিটা পর্যন্ত নড়িয়া উঠিয়াছিল।

বিপ্রদাসের ক্রুদ্ধ চীৎকারে সমস্ত বাড়িটা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

৫

দরজার পার্শ্বে একগোছা চাবির ঝুমঝুম্ শব্দ হইল। বিপ্রদাস চাহিয়া দেখিলেন পত্নী হেমাঙ্গিনী। চকিত দৃষ্টিতে হেমাঙ্গিনী সকলি বুঝিয়া লইয়াছিল। ঝটিকার পূর্বে বিদ্যুৎভরা মেঘগুলি যেমন নীরবে ও লঘু গতিতে আকাশের একদিক হইতে অপর দিকে চলিয়া যায়,

হেমাঙ্গিনী ঠিক তেমনি ভাবে যেখানে সরসী বসিয়া কাঁদিতেছিল সেইখানে গেল ; নীরবে তাহাকে কোলের উপর বসাইল। তার পর গন্ধদ্রব্যের বাক্স হইতে একটা "কুন্তলীনের" শিশি খুলিয়া খানিকটা বালিকার মাথায় ঢালিয়া দিল। "দেলখোসের" আর একটা শিশি একেবারে সরসীর কাপড়ে ঢালিয়া দিল।

বিপ্রদাসের প্রভুত্বকে যেন বিদ্রূপ করিতে করিতে সেই ঘন সুগন্ধ বালিকার চারি দিক বেষ্টন করিয়া ক্রমশঃ দরজা জানালা দিয়া বাহিরের বাতাসকে সুবাসিত করিয়া তুলিল। হেমাঙ্গিনীর গৌর মুখমণ্ডলে স্থির প্রতিজ্ঞার দীপ্তি তাহার যৌবনশ্রীকে যেন আরও নিবিড়, তাহার সৌন্দর্যকে যেন আরও জটিল প্রলোভনে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল।

বিপ্রদাস রাগে দশটা হইয়া ফুলিতেছিলেন ; কর্কশস্বরে তিনি বলিলেন, "কি করিলে ? এত টাকার জিনিস নষ্ট করিতে হয় !"

হেমাঙ্গিনী ধীরে ধীরে বলিল, "আমার জিনিস, আমার যাহাতে সুখ হয়, আমি তাহা করিলাম ; তোমার তাতে কি ?"

এত বড় কথা বিপ্রদাসের মুখের সামনে কেহ কখনও বলিতে সাহস করে নাই। অন্য কেহ হইলে এতক্ষণ একটা কুরুক্ষেত্র ব্যাপার ঘটিয়া যাইত ; কিন্তু এ যে হেমাঙ্গিনী ! বিপ্রদাসের যত ক্রোধ বালিকা সরসীর উপর গিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, "দেখ, তুমি ঐ মেয়েটাকে যত বেশী ভালবাসিবে, আমি ওকে তত বেশী ঘৃণা করিব, তা জান ? তবে কেন অনর্থক আমার রাগ বাড়াও।"

হেমাঙ্গিনী বিদ্যুৎকটাক্ষে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বড় পৌরুষ। নিজের মেয়েকে ঘৃণার চক্ষে না দেখিলে পুরুষত্ব বজায় থাকিবে কেন ? তোমার রাগে আমি ভয় করি না।" বলিতে বলিতে হেমাঙ্গিনীর কণ্ঠস্বর আরও উচ্চে উঠিল, তাহার চক্ষে একটা উজ্জ্বল আলোক দেখা গেল। গ্রীবা উন্নত করিয়া সে আবার বলিল, "দেখ, এক বৎসরের উপর তুমি আমায় বিয়ে করেছ, তুমি আমার স্বামী, আমার পূজনীয় ; কিন্তু সত্য বলিতে কি, তোমার নিষ্ঠুর ব্যবহার, রাক্ষসের আচার দেখে আমার শতবার আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা হয়েছে। সরসী না তোমার মেয়ে ? তোমার রক্তে না তার জন্ম ? কিন্তু কি আশ্চর্য—তুমি ওকে মোটেই দেখতে পার না : আমি ওকে পেটে ধরি নাই, ওর রক্তের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই ; কিন্তু আমি ওকে যতটা ভালবাসি, তুমি ওর জন্মদাতা, তার এতটুকু ভালবাসাও তোমার নাই !"

হেমাঙ্গিনীর মুখ চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতেছিল। এতগুলা কথা একেবারে বলিয়া ফেলিয়া সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সগর্বে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী তুলিয়া সে ধীরে ধীরে পুনরায় কহিল, "আমি মা কালীর শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি তুমি সরসীর গায় আর কখনও হাত দাও, যদি আজ থেকে তাকে ঠিক মেয়ের মত স্নেহ না কর তবে ঠিক জেন, আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্কই থাকিবে না। ইহাতে যদি আমার পাপ হয়, যতদিন বাঁচিব প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

দ্রুতপদে বিপ্রদাস-গৃহিণী অঞ্চল দোলাইয়া চলিয়া গেল। গৃহমধ্যে একটা গম্ভীর শূন্যভাব যেন কোথা হইতে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সরসী অধোমুখে কাঁদিতেছিল। পিতৃনিন্দা তাহার কোমল হৃদয়ে বেদনার মত বাজিতেছিল। বিপ্রদাসের ব্রহ্মতালুতে কেহ যেন একটা জ্বলন্ত লৌহদণ্ড আঘাত করিয়াছিল। এত অপমান, এত লাঞ্ছনা,—একটা মেয়ের জন্য। সেই হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটা আবার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ! একটা দুরন্ত রাক্ষসপ্রবৃত্তি বিপ্রদাসের হৃদয়মধ্যে জাগিয়া উঠিল। সজোরে বালিকার কমনীয় দেহখানির উপর পদাঘাত

করিয়া বিপ্রদাস নীচে নামিয়া গেলেন।

মূর্চ্ছিত সরসী ভূমিতলে পড়িয়া রহিল। তাহার চারিধারে "দেলখোসের" মৃদু সৌরভ আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

৬

বিপ্রদাস দিবানিদ্রার পর আলবোলায় ধূমপান করিতেছিলেন। বৃদ্ধ দেওয়ান আসিয়া বলিলেন, "মা ঠাকুরানী পাল্‌কী আনাইয়া বাপের বাড়ী চলে গেছেন।"

বৃদ্ধ রামগতি দেওয়ানজী কথাটা বুঝাইয়া বলিলেন। বিপ্রদাসের হাতের নল পড়িয়া গেল। উদ্বেলিতস্বরে বৃদ্ধ জমিদার আপনা-আপনি বলিলেন, "আমায় না বলিয়া গেল?" ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঘোড়া তৈয়ার কর।"

পুরাতন দেওয়ানজী হাত কচলাইয়া আবার বলিলেন, "আর একটি কথা, দিদি বাবুর বড় জ্বর হইয়াছে। মুখ দিয়া রক্ত উঠিতেছে। একেবারে অচৈতন্য। একবার তাহাকে দেখিয়া আসিলে ভাল হয়।"

মুখ বিকৃত কবিয়া দারুণ ঘৃণার সহিত বিপ্রদাস বলিলেন, "আপদটা মরে গেলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। কি কুক্ষণে মেয়েটা আমার ঘরে এসেছিল! ওর জন্ম হতেই আমার সর্বনাশ হলো। আমার দেখতে যাবার এখন অবকাশ নাই।" এই বলিয়া বিপ্রদাস বেশ পরিবর্তন করিয়া অভিমানিনী পত্নীকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অশ্বারোহণে যাত্রা করিলেন।

বৃদ্ধ রামগতি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধন্বন্তরী মহাশয়কে সংবাদ দিতে গেলেন। সরসী যে তাঁহার মেয়ের সই; তাহাকে যে আশৈশব বুকে পিঠে করিয়া তিনি মানুষ করিয়াছেন।

৭

রাত্রে যখন সরসীর জ্ঞান হইল, তখন দেখিল, সইমা শিয়রে বসিয়া তাহার বুকে ঔষধ লেপন করিতেছেন। সে একবার বুকে হাত দিয়া দেখিল—বড় বেদনা। সরসী ধীরে ধীরে ডাকিল, "সই মা!"

কয় রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া সইমার চোখ ঘুমে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল; তিনি নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "কি মা?"

বালিকা অতি ধীরে ধীরে বলিল, "আমার কত দিন অসুখ সইমা?"

সই-মা বলিলেন, "কাল একুশ দিন গেছে বাছা! তুমি একটু ঘুমোও।"

সরসী থামিল না। সে বলিতে লাগিল, "সইমা, আমি যেন স্বপ্নে দেখছিলাম, বাবার পা ভেঙ্গে গেছে। তিনি যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে কাঁদছেন। আর সকলে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ তাঁর সেবা কচ্ছে না। হাঁ সইমা! বল না, বাবা কেমন আছেন?"

সই-মা বিস্মিত হইলেন। বিপ্রদাসবাবু স্ত্রীকে ফিরাইতে গিয়া ঘোড়া হইতে পড়িয়া পা ভাঙ্গিয়াছেন, একথা কেহ সরসীর নিকট বলে নাই, অথচ বালিকা জানিল কেমন করিয়া!"

বালিকা বলিল, "সইমা! সত্যি করে বল, বাবা আমার কেমন আছেন? হ্যাঁ গা! চুপ করে রইলে কেন? আমায় তাঁর কাছে নিয়ে চল সইমা! মা আমায় স্বপ্নে বলে গেছেন বাবার আমি যেন সেবা শুশ্রূষা করি।"

সই-মার চোখে জল আসিল। এমন বাপের এমন মেয়ে! তিনি বলিলেন, "অমন করে

বেশী কথা কইলে আমি কোনও কথা বলিব না। তোমার বাপের পা ভেঙেছিল বটে, কিন্তু এখন অনেকটা সেরে উঠেছেন। তুমি আর কথা কহিও না। কবিরাজ মহাশয় শুনিলে আমায় বড় বক্‌বেন। এখন চুপ করে ঘুমোও।"

সরসীর ইচ্ছা হইল, সেই মুহূর্তে ছুটিয়া গিয়া পিতার রোগশয্যার পার্শ্বে বসে। আহা! কে তাঁহার সেবা করিবে? বালিকা মানসনেত্রে ভগ্নপদ পিতার অবস্থা কল্পনা করিয়া লইল। বৃদ্ধের যন্ত্রণা বালিকা মনে মনে যেন অনুভব করিল। সরসী আবার বলিল, "সইমা, ছোটমা কোথায়? তিনি বাবার সেবা করিতেছেন না?" তিনি বলিলেন, "বাপের বাড়ী গিয়ে তাঁর বড় জ্বর হয়েছে। নাও, আর কথা কহিও না। আমি আর উত্তর দিব না।"

বালিকা বিছানায় শুইয়া কেবল ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

৮

ঘরের মধ্যে এককোণে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল। ম্লান আলোক গৃহমধ্যস্থ সমুদয় অন্ধকার দূর করিতে পারে নাই। এক পার্শ্বে এক জন ভৃত্য সারারাত জাগিয়া জাগিয়া অঘোরে ঘুমাইতেছিল। বিপ্রদাসের চক্ষে নিদ্রা নাই। জ্বরের জ্বালায় শরীর দগ্ধ হইতেছিল। পায়ের যন্ত্রণা তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিতেছিল। আবার থাকিয়া থাকিয়া কি একটা অজানা বেদনা বুকের মধ্যে বাজিয়া উঠিতেছিল। রুগ্নশয্যায় আত্মকৃত পাপ, আত্মগ্লানি ও অনুশোচনা প্রায়শ্চিত্ত করিবার শুভ অবসর পাইয়া থাকে। বিপ্রদাসের বুকের মধ্যে এইরূপ সহস্র যন্ত্রণা উঁকি মারিতেছিল। জীবনের সহস্র পাপ বড় বড় অক্ষরের মত তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

বিনিদ্রনয়নে চাহিতে চাহিতে বিপ্রদাস দেওয়ালস্থ তৈলচিত্রের প্রতি চাহিলেন। অস্পষ্ট আলোকে তিনি যেন অনুভব করিলেন, সেই চিত্রিত চক্ষুযুগল সত্য সত্যই যেন তাঁহার দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। যেন তিনি অনুভব করিলেন, সেই কাতর চক্ষুযুগল নীরবে ভূমিতলে তাঁহাকে চাহিতে অনুরোধ করিতেছে। বিপ্রদাস নয়ন নিমীলিত করিলেন। দেখিলেন, সেই দৃষ্টি তাঁহার দিকে তেমনি স্থিরভাবে নিবদ্ধ। অতি কষ্টে বিপ্রদাস পার্শ্ব পরিবর্তন করিলেন। আজ তিন সপ্তাহ তিনি শয্যাশায়ী। এই তিন সপ্তাহ তিনি যেরূপ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, সমুদয় জীবনে তেমন আর সহ্য করিতে হয় নাই।

বিপ্রদাস আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তখনি বোধ হইল, একটি বালিকা ভূমিতলে ছট্‌ফট্ করিতেছে; তাহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতেছে। বিপ্রদাসের শরীরের রক্ত যেন বরফের মত শীতল হইয়া গেল। তাঁহার বোধ হইল, বালিকাটি মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। তাহার কাতরোক্তি সহস্র বেদনার মত তাঁহার বুকের মধ্যে বিদ্ধ হইতে লাগিল। বালিকার মৃত্যুযন্ত্রণা-কাতর চক্ষু দুইটি যেন তাঁহার দিকে চাহিয়া কি মিনতি করিতেছে।

বিপ্রদাসের হৃদয়ের একটা রুদ্ধভাগ সহসা যেন কোন মন্ত্রবলে উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। অতৃপ্ত স্নেহের সহস্র তরঙ্গ প্লাবনের মত তাঁহার বুকের মধ্যে ওতপ্রোত হইতে লাগিল। পীড়াকাতর দুর্বল মস্তিষ্ক আর ধারণা করিতে পারিল না, বিপ্রদাস অস্ফুট কাতরোক্তি করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

চৈতন্যের সহিত বিপ্রদাস অনুভব করিলেন, কাহার শীর্ণ ক্ষুদ্র অঙ্গুলি তাঁহার মস্তকে ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হইতেছে। কাহার ক্ষীণ মৃদু নিশ্বাস তাহার উত্তপ্ত কপোল স্পর্শ করিতেছে। সংশয়ান্বিত হইয়া ধীরে ধীরে বৃদ্ধ চাহিলেন। বোধ হইল, স্বর্গের কোন দেবকন্যা যেন তাঁহার

শিয়রে বসিয়া। কিন্তু বালিকার রক্তশূন্য বিবর্ণ মুখমণ্ডল, সহানুভূতিস্নিগ্ধ ক্লান্ত নয়ন মুহূর্ত মধ্যে বিপ্রদাসের ভ্রান্তি ঘুচাইয়া দিল।

গুহা-নির্গত জাহ্নবীর রুদ্ধ বারিপ্রবাহের মত কতদিনের সঞ্চিত স্নেহ বিপ্রদাসের বুকের লৌহ-কপাট ঠেলিয়া ফেলিয়া উন্মাদ উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া বাহির হইল। বিপ্রদাস চীৎকার করিয়া কন্যার গলা জড়াইয়া বলিলেন, "মা, মা, আয় মা আমার বুকের ধন বুকে আয়। আর আমি তোকে মারবো না, আর তোকে অযত্ন করবো না।"

অশ্রুভারে বিপ্রদাসের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। বালিকা পিতার জ্বরতপ্ত বুকের উপর মাথা রাখিল। এ কি সুখ, এ কি শান্তি! বিপ্রদাসের জীবনে এমন মধুময় মুহূর্ত অনেক দিন আসে নাই।

সরোজনাথ ঘোষ

মেয়ের বিয়ে

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্নেহের আর বিয়ে হয় না! মেয়ে এগার উত্‌রে বারোয় পা দিয়েছে, আর কতদিন ঘরে রাখা যায়? মা তো একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। দে মহাশয় পুরুষ মানুষ। তাঁহার মনের ভাবনা বড় একটা মুখে প্রকাশ পায় না। মুখে বলেন, "মেয়ে তো বিয়ে দিলেই পরের হয়ে যাবে, যে কয় দিন কাছে থাকে সেই ভাল।" গিন্নিকে বলেন, "তুমি বুঝি মেয়ে বিদায় করতে পারলেই বাঁচ?" গিন্নি বলেন, "ও কি তোমার কথার শ্রী? ও কথা কি বলতে আছে? আমার অতুল ও অমূল্য হতে স্নেহ বেশী। নাড়িছেঁড়া ধন কেহ কি সাধ করে পরের হাতে দিতে চায়? কি করি, পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে, কাজেই ভাবনা হয়। ঘরে তো আর টাকার জোর নাই যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক্‌বো? তুমি তো আর জগৎ সংসারের কোন খবরই রাখ না, আজকাল মেয়ের বিয়ে যে কি দায়, তার আর জান্‌বে কি?"

ঘটকীরা আসে যায়, সম্বন্ধ আর ঠিক হয় না। কেহ কেহ বলে, "হ্যাঁগা, ছেলেব বে' দাও না। ছেলে দুটো পাশ করে তিনটে পাশের পড়া পড়ছে, এই তো বিয়ে দেওয়াব সময়।" গিন্নি বলেন, "ওগো বাছা, আগে মেয়েটির সম্বন্ধ করে দাও, কন্যাদায়ে উদ্ধার হই, ছেলের বিয়ে তার পর হবে।"

"তা তো সত্যি কথা মা, মেয়েরই বিয়ের ভাবনা, ছেলের জন্য আর ব্যস্ত কি? তা মা, তোমার যে মেয়ে, এর জন্যে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না, মেয়ে তো নয়, যেন লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ। এমন চাঁপা ফুলের মত বর্ণ, যেন ফলান রঙ্‌ ভুরু যেন তুলি দিয়ে আঁকা। লোকে মেয়ের মাথার চুল হবার জন্যে কুন্তুলী-মুন্তুলী কত কি তেল মাখায়, তোমার মেয়ের চুল বিনা যত্নেই যেন মেঘের মত; এমন মেয়ে লোকে আরাধনা ক'রে পায় না। তবে কি জান, কায়েতের ঘরে মেয়ে পার করতে কিছু পয়সা লাগে, বিনি পয়সায় তো হয় না! আর তোমরা হলে মৌলিক, কুলের ঘর হ'লে কিছু সুবিধে হতো। এই শ্যামকান্ত বোসেরা ছেলের কুল করবে বলে একটি সুন্দরী মেয়ে খুঁজছে, কিছু নেবে না, শুধু মেয়েটি চায়; তা, সে তো আর হবে না! তা না হোক্‌, তা বলে কি বিয়ে আট্‌কে থাক্‌বে? অমন সুন্দরী মেয়ের বিয়ের ভাব্‌না কি?" এইরূপ প্রবোধবাক্যে নীলমাধব বাবুর গৃহিণী আশ্বস্ত হইতেন বটে, কিন্তু সুন্দরী

মেয়ে দেখিয়া অনেকে পছন্দ করিলেও দুই হাজারের নীচে কেহই নামিতে চাহিতেন না ; এদিকে ঘরে দুই শতেরও সংস্থান নাই।

স্নেহ মেয়েটি বড় লক্ষ্মী, একথা সকলেই বলিত। আগে গলির মোড়ে একটা স্কুলে বোধোদয়, পদ্যপাঠ ও বাইবেল মুখস্থ করিত, নামতাও ষোলর কোঠা অবধি পড়িয়াছিল। বিয়ের কথা হয়ে অবধি আর পড়িতে যায় না, বাড়ীতে মায়ের কাজকর্মের সাহায্য করে। অতুল কলেজ হইতে আসিলেই, আগে "টুনটুনের" খোঁজ পড়ে, সে দাদার কাপড় দিবে, বই গুছাইয়া রাখিবে, খাবারের জায়গা করিয়া দিবে। নীলমাধব বাবুর "মা লক্ষ্মী" না হইলে আফিসের কাপড় ছাড়া হয় না ; কেবল "মেজদা" অমূল্যই তাহাকে সর্বদা জ্বালাতন করে। স্কুলে পড়িয়া, স্নেহের সুর করিয়া পড়া অভ্যাস হইয়াছিল, সে বই খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেই অমূল্যও সুর কবিয়া ভ্যাংচাইতে আবম্ভ করিত, স্নেহের অগত্যা বই পড়া বন্ধ করিতে হইত। "পোড়ারমুখী, লক্ষ্মীছাড়ি, খ্রীস্টানি স্কুলে যাওয়া হয়, বাইবেল পড়া হয়, খ্রীষ্টান হবে ?" ইত্যাদি বলিয়া অমূল্য স্নেহকে শাসন করিত। "কেন ও'কে অমন করিস্ অমূল্য ? তোর কি পড়াশুনা নাই ?" মায়ের নিকট এইরূপ সম্ভাষিত হইলে কিছুক্ষণের জন্য অমূল্য স্নেহকে নিষ্কৃতি দিত।

অমূল্য আর্য্যমিশন ইন্‌স্টিটিউশনে ফোর্থ ক্লাসে পড়ে। হিন্দুধর্মে তাহাব প্রগাঢ় অনুরাগ ও গীতার অনেক শ্লোকই তাহার মুখস্থ আছে। তাহার সহাধ্যায়ী বন্ধু চারু তাহার এই ধর্মানুরাগ বহ্নিতে সর্বদাই ঘৃতাহুতি দিয়া থাকে। চারুকে অমূল্যের বন্ধু বলিলেও হয়, গুরু বলিলেও হয়। চারুর কথায় বা কার্যে যে কোনরূপ ভুল থাকিতে পারে, ইহা অমূল্যের বুদ্ধির অতীত। চারু যে একজন অসাধারণ মনুষ্য ও তাহার দ্বারা যে হিন্দুসমাজের বিশেষ উন্নতি হইবে, এ বিষয়ে অমূল্যের (কতকটা চারুরও) সন্দেহ ছিল না। চারু একে বড়মানুষের ছেলে, তাহাতে চেহারাটিও মন্দ নহে, পোষাক পরিচ্ছদ বেশ কেতা-দুরস্ত, ইতিপূর্বে বাঙ্গলা নভেলগুলি প্রায় সমস্তই শেষ করিয়াছেন, আজকাল চেষ্টা করিয়া ইংরাজী নভেল পড়িতে পড়িতে ইংরাজীতেও একটু দখল হইয়াছে, মাসিকপত্রেও মাঝে মাঝে কবিতা লেখা হয় ; এই সকল গুণে স্কুলে তাহার বেশ একটু পসাব আছে।

দ্বিতীয় পবিচ্ছেদ

অমূল্যদের ও চারুদেব বাড়ী পাশাপাশি, অতএব উভয় বাটীর গৃহিণীদ্বয়েব পরস্পরের সহিত আলাপ পরিচয় আছে। এ বিষয়ে সন্দেহ করা উচিত নহে। আলাপ আছে বটে, কিন্তু তেমন আত্মীয়তা নাই ; কেন না, তৈল আর জল এক পাত্রে থাকিলেও যেমন মিশ্রিত হয় না, ধনী ও দরিদ্রে সম্বন্ধবন্ধনও কতকটা সেইরূপ বটে। এ জন্য দে মহাশয়ের গৃহিণীর মনে মনে একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও সাহস করিয়া মিত্র গৃহিণীর নিকট স্নেহকে বধূরূপে গ্রহণ করিবার অনুরোধ করিতে পারেন নাই ; কিন্তু আমরা চারুর কবিতার খাতা চুপে চুপে পড়িয়া দেখিয়াছি, এক স্থানে লেখা আছে—

"প্রাণসখী স্নেহলতা বুঝিবে কি প্রাণ মোর,
সঁপিয়াছি এ হৃদয় চরণের তলে তোর।"

মিত্র মহাশয়ের বড় সাধ, চারু একটা বি এ কি এম এ হয়। বড় ছেলে দুটি মূর্খ হইয়াছে, এজন্য চারুর লেখা পড়া সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ যত্ন। তবে প্রাইভেট টিউটর রাখিবার খরচটা আর লাগে না, মিত্রমহাশয়ের জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র বিজয় তাঁহার বাড়ীতে থাকে, প্রাইভেট

টিউটারের কাজটা তাঁহার দ্বারায় চলিয়া যায়।

বিজয়ের সহিত অতুলের বড় প্রণয়। যেন দুটিতে একপ্রাণ। বিজয় ছেলেটি ভাল, বি এ অনারে পাশ করিয়াছেন, এখন জেঠামহাশয়ের সুপারিশে যদি একটা কাজ কর্ম জুটিয়া যায়, সেই ভরসায় আছেন। মিত্র মহাশয় কিন্তু সেদিকে বড় একটা কান দেন না, বলেন, "ওহে, আজকালকার গতিক তো দেখ্‌তে পাচ্ছো? পাশ কেবল পাঁশ, ছাই আর ভস্ম। ওতে এখন বড় একটা সুবিধা নাই। সেকালে যখন কেবল দুটো একটা লোক পাশ করেছিল, তখন ছিল পাশের আদর। যখন মধুসূদন গুপ্ত মড়ার গায়ে প্রথম ছুরি বসায়, তখন কেল্লায় তোপ পড়েছিল. এখন আঁদাড়ে পাঁদাড়ে এম এ আর বি এ, গলিতে গলিতে ডাক্তার আর উকীল। বাঙ্গালী যে দাসের জাত, সে কথা তো মিথ্যা নয়, সাহেবের লাথি খেয়ে মর্‌বে, তবু সেই কেরাণীগিরিরই উমেদারী করবে, ব্যবসার দিকে ঝুঁকবে না। আমার পরামর্শ যদি শুনতে চাও, একটা সুবিধা মত বিয়ে ক'রে কিছু টাকা যোগাড় কর, তারপর সেই টাকাটা দিয়ে একটা ব্যবসা আরম্ভ কর, তাহা হ'লে আমিও কিছু কিছু সাহায্য করতে পারি। এই যে দেখছো বাড়ী আর জুড়ী গাড়ী, এ কেবল ব্যবসার দৌলতে। এই দেখ না, এইচ্‌ বোস একটা তেল বাহির করে কি টাকাটাই কর্‌লে! বুদ্ধি চাই, নহিলে কি কিছু হয়?"

এখন বিজয়ের বিবাহের যাহা হোক্‌, চারুর একটি পরীর মত বৌ ঘরে আনবার জন্য চারুর মা একেবারে পাগল। ছেলের চৌদ্দ বৎসর বয়স, তায় এমন সোনার চাঁদ ছেলে, কোন্‌ মায়ের এমন পাষাণ প্রাণ যে, এমন ছেলের বিয়ে দিতে না সাধ হয়? সত্যি তো আর ঘরে খাবার নাই এমন নয়? সত্যি তো আর খাবার বিনে মা মাগী শুকিয়ে মর্‌ছে, ভাইটে খেতে পায় না এমন নয়? (যেমন বিজয়ের) কেবল বিদ্যের চুবড়ি তো আর নয়, খেতে না পেলে বিদ্যে নিয়ে কি লোকে ধুয়ে খাবে? তা তো আর নয়? এমন ছেলের বিয়ের নাম মুখে আনলে কত লোক পরীর মত মেয়ে এনে পায়ে সেধে দেবে। এখন বিয়ে না দিলে লোকেই বা বলবে কি?

গৃহিণীর এসব কথা মিত্র মহাশয় বড় কানে তোলেন না, নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিলে বলেন, "বড় ছেলে দুটো অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে বখে গেল, ছোটটাও কি তাই হবে, এই তোমার ইচ্ছা?" তিনি প্রত্যহই একবার করিয়া চারুর পড়ার ঘরে গিয়া বইগুলি উল্টাইয়া খুঁজিয়া দেখেন, এইরূপ খানাতল্লাসীতে প্রথম প্রথম কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি দুই একখানি ধরা পড়িয়াছিল, কিন্তু আজকাল ছেলেও সেয়ানা হইয়া গিয়াছে, এখন আর পড়িবার ঘরে সে সব বই বড় একটা পাওয়া যায় না।

তবে একদিন চারু বড় বিপদে পড়ে। পিতা কখন জুতা খুলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরে উপস্থিত হইয়াছেন, বেচারী তাহা দেখিতে পায় নাই, সে এক মনে কাগজ কলম লইয়া—

"নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে,
নূপুর নিক্কণ বাজে,"

ইত্যাদি লিখিতেছে, এমন সময় পিতা সহসা সম্মুখে! মিত্র মহাশয় বিনা বাক্যব্যয়ে কাগজখানি পড়িলেন ও পকেটস্থ করিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন, চারুর মনে সমস্ত দিন তিলমাত্র শান্তি রহিল না।

মিত্র মহাশয়ের নিকট হইতে বিজয়ের তলব হইল। সে সম্মুখে আসিলে বলিলেন, "সমস্ত দিন কর কি? ছোঁড়াটাকে একটু দেখাশুনা করতে বলেছি, তাও পার না? আজকাল নাকি কাগজে পদ্য লিখ্‌ছে, ব'খে যাবার লক্ষণ আর কি!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিজয় বলিল, "ভাই অনেক কষ্টে প্রাইভেট টুইশন্‌টা যোগাড় করেছি, কিন্তু কাজটা লওয়া জেঠামশায়ের মত নয়। তিনি বলিলেন, 'তুমি এদিকে ওদিকে থাক্‌লে চারুকে দেখা শুনা হবে না।' এদিকে টাকার দরকার তা তো বুঝতেই পাচ্ছো, বিজয়ের মাহিনা দিতে পারি নাই বলে স্কুলে নাম কেটে দিয়েছে।"

অতুল বলিল, "চাকরী পেয়ে ছেড়ে দেবে, এ কখনও উচিত নয় ; এমন অন্যায় কথা যদি তোমার জেঠামহাশয় বলেন, তা হলে সে কথা কেমন করে শুনা যায় ?"

বিজয় বলিল, "কিন্তু জেঠামহাশয়ের কথা না শুন্‌লে তিনি রাগ করতে পারেন, সেটা কি ঠিক হবে ?"

এমন সময় নীলমাধববাবু আসিয়া বলিলেন, "এই যে বিজয় এসেছ, বেশ হয়েছে। আমার তোমাদের দু'জনের কাছেই একটা কথা আছে। অতুলের বিবাহ না দিলে তো আর স্নেহের বিবাহের উপায় দেখিতে পাই না।"

অতুল আস্তে আস্তে বলিল, "বাবা, আর এক বৎসর দেরী করিলে আমার বি এটা দেওয়া হইত।"

"সে কথা কি আমি বুঝি না ? কিন্তু কি করিব ? আর এক বৎসর বিলম্ব করিতে গেলে লোকনিন্দার ভয় আছে। বিশেষ একটি ছেলে ঠিক হইয়াছে, কিছু অল্পেই হতে পারে ; তখন কি এটিকে হাতছাড়া করা ভাল হয় ? বিজয়, বাবা, আমার তো বুদ্ধির স্থিরতা নাই, তোমার মতে কি করা উচিত ?"

বিজয় বলিল, "আমার বোধ হয় বি এটা দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কবিলে ভাল হয়। কোন স্থানে কি টাকা ধার পাওয়া যায় না ?"

নীলমাধববাবু হাসিয়া বলিলেন, "সম্পত্তির ভিতর আমার এই বাড়ীখানি, আর পঁচাত্তর টাকা মাহিনা। বাড়ীখানা বন্ধক না দিলে আর উপায় দেখি না, কিন্তু একবার বন্ধক দিলে আর খালাস করে উঠ্‌তে পার্‌বো ?"

"বাবা খাবার ঠাঁই হয়েছে" বলিয়া স্নেহ হঠাৎ উপস্থিত হইয়া বিজয়কে দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। নীলমাধব বাবু হাসিয়া বলিলেন, "মা লক্ষ্মী! লজ্জা কি ? ও যে বিজয়বাবু, যার কাছে ছোট বেলায় ছবির জন্য আবদার করিতে। চল বাড়ীর ভিতর যাই ; এস বিজয় এস।"

বিজয় ভাবিতে লাগিল, "এমন লক্ষ্মীর মত মেয়ে, ইহার বিয়ে হয় না ?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যাহা হউক্, বিয়ের সম্বন্ধ তো ঠিক হইয়া গেল। ছেলেটি দোজ্‌বোরে, বয়স ৩৪ বৎসর, প্রথম পক্ষের তিনটি ছেলে আছে। সতাসতীনের ঘর বলিয়া মায়ের মনে কিছু দুঃখ হইল, আবার ভাবিলেন, "স্নেহ আমার যে লক্ষ্মী মেয়ে, মানাইয়া নিতে পারিবে।"

ইতিমধ্যে চারু জল খাবারের পয়সা জমাইয়া একটি কুন্তলীন এবং একটি এসেন্স কিনিয়াছে, সাদা কাগজে ছোট ছোট অক্ষরে "স্নেহের জন্য স্নেহোপহার" লিখিয়া আঠা দিয়া শিশির গায়ে আঁটিয়া দিয়াছে। স্কুল হইতে অমূল্যর সঙ্গে অমূল্যদের বাড়ী আসিয়া স্নেহের হাতে দিবে, এইটি তাহার ইচ্ছা ; কিন্তু অমূল্যদের বাড়ী আসাও হইল, স্নেহেরও দেখা

পাইল, কিন্তু দিতে আর সাহস হয় না। শেষে অনেক কষ্টে "স্নেহ, এগুলি তোমার জন্য আনিয়াছি" বলিয়া স্নেহের কাছে রাখিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল।

বাহিরে আসিয়াই অমূল্যর সহিত দেখা হইল। অমূল্য বলিল, "এই যে! কোথায় ছিলে?" চারু বলিল, "আমি তোমাকে খুঁজ্‌ছি, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

অমূল্য চারুর কি কথা জানিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইল। তখন চারু বলিল, "অমূল্য, এত দিন তোমাকে যে কথা বলি নাই, আজ তাহা বলিব; তুমি প্রতিজ্ঞা কর, কাহাকেও বলিবে না!"

অমূল্য তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিল।

তখন চারু বলিতে লাগিল, "ভাই অমূল্য, কত দিন যে হৃদয়োচ্ছ্বাস গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহা আর আজ তোমার ন্যায় প্রাণের বন্ধুর কাছে গোপন করিতে পারিলাম না। স্নেহের বিবাহ হইবে শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আমি স্নেহকে ভালবাসি, যত দিন বাঁচি, ততদিন বাসিব। স্নেহই আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী ও কবিতার উৎস। আমার বিশ্বাস, স্নেহও আমাকে ভালবাসে, কিন্তু অধঃপতিত হিন্দু সমাজে এখন আর পূর্বের ন্যায় স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত নাই, তাই আজ তাহার অন্যের সহিত বিবাহ হইতেছে। আজ আমি স্নেহকে স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ দুটি গন্ধদ্রব্য দিয়া আসিয়াছি। তাহাকে বলিও, সে যেন তাহা যত্ন করিয়া রাখে, আর মনে রাখে, তাহার প্রতি আমার যে ভালবাসা, সেও ঐরূপ নির্মল ও মনোহর। আমার আর গৃহবাসে বাসনা নাই। আমি সন্ন্যাসিবেশে দেশে ভ্রমণ করিব। তুমি তোমার হতভাগ্য বন্ধুকে মনে রাখিও, এই আমার শেষ অনুরোধ।"

অমূল্য চারুর কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া চারুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, এমন অদ্ভুত কথা সে জীবনে কখনও শুনে নাই, কিন্তু চারু যখন বলিতেছে, তখন কথাগুলি অদ্ভুত হইলেও যে সত্য, তাহার সন্দেহ নাই। স্নেহ যে আবার একটা মানুষ, এতদিন সে একবারও তাহা ভাবে নাই, আজ চারুর কথা শুনিয়া তাহার স্নেহের উপর কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধার উদয় হইল। চারু সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে শুনিয়া সে নির্জনে বসিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিয়াছিল, কিন্তু চারুকে বারণ করিবার সাহস হয় নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মানুষ বড় নিন্দাপ্রিয়! মিত্রজা ভাবী বৈবাহিকের সঙ্গে এতটা বেশী ভদ্রতা করেন, সেটা তাহাদের সহ্য হয় না। লোকে বলাবলি করে, নীলমাধব বাবুর বাড়ীখানার উপর মিত্রজার কিছু নজর আছে, তাই এত মৌখিক ভদ্রতা করিতেছেন।

গরীবের ঘরের মেয়ে, বরেরাও তেমন সঙ্গতিপর নহে, কাজেই বিবাহে কিছু ঘটা হয় নাই। হুলু ও শঙ্খধ্বনি ছাড়া অন্য কোন রকম বাজনা ছিল না। যা হউক, এখন কোন রকমে চার হাত এক হলে হয়। তবে লক্ষ কথা না হলে তো আর বিবাহ হয় না, কাজেই বরকর্তা মিত্রজা কথা আরম্ভ করিলেন, "বেহাই! আপনি তো এখন ঘরের লোক, কিছু মনে করিবেন না, আপনাকে আর গোপন কি? নগেনের শ' চেরেক টাকা দেনা আছে, টাকাটা আজ শোধ না দিলে নয়। আপনার জামাই, আমার ছেলে, দায় দু'জনেরই সমান, বুঝেছেন কি না?"

নীলমাধব বাবু এই মিষ্ট সম্ভাষণে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া বলিলেন, "নগদ টাকা তো কিছু দিবার কথা ছিল না, আর আমার এমন কিছুই নাই যে দিতে পারি।"

বৈবাহিক বলিলেন, "হরেকৃষ্ণ ! এ কি কথা ? আপনার জামাতার ঋণদায়, আপনি তো বাড়ীখানি বন্ধক দিয়াও টাকা দিতে পারেন। দেনা শোধ না হইলে আমি ছেলের বিবাহ দিতে পারি না।"

এইরূপ এক কথা, দুই কথা, ক্রমে লক্ষ কথা পূর্ণ হইল, কিন্তু তথাপি বিবাহ হইল না। অবশেষে বরকর্তা বর লইয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। নীলমাধব বাবু গিয়া তাঁহার পায়ে ধরিলেন, তথাপি তাহার দয়া হইল না। অতুল একেলে ছেলে, তার অল্প বয়স। সে এতটা সহ্য করিতে পারিল না, বলিয়া ফেলিল, "স্নেহর বিয়ে না হয় সেও ভাল, তবু অমন চামারের ঘরে বিবাহ দেবেন না। এরূপ বিবাহে স্নেহ কখনও সুখী হইবে না।" বরকর্তা অতুলের কথা শুনিবামাত্র ক্ষণবিলম্ব না করিয়া পুত্রের হাত ধরিয়া বাড়ীর বাহির হইলেন। বরযাত্রীরা আহার ত্যাগ করিয়া গোলমাল করিয়া উঠিয়া পড়িল। দেখিয়া নীলমাধব বাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, বাড়ীর ভিতর কান্নাকাটি পড়িয়া গেল।

* * * *

মিত্রগৃহিণী বলিলেন, "একেই বলে কলিকাল ! ওমা—কোথায় যাব মা ! বিজয় ছোঁড়ার আক্কেল দেখ ! এতদিন ছেলের মত মানুষ করলুম, বিয়ে করতে গেলি, তা একবার বলেও গেল না গা ?"

মিত্র মহাশয় বলিলেন, "নীলমাধব লোকটা ভাল। ভদ্রলোকের জাত বাঁচিয়েছে, ছোঁড়া কাজটা মন্দ করে নাই। তবে ওর অদৃষ্টে নেহাত ভূয়ো। ভেবেছিলাম, বিয়ে করে কিছু টাকা পাবে, সে দফায় মাটী।"

* * * *

চারু দিনের বেলা গেরিমাটী দিয়া কাপড় ছোপাইয়াছিল। রাত্রে সেই কাপড় পরিয়া খিড়কির দরজা দিয়া একেবারে আমবাগানে বাহির হইয়া পড়িল। একে মাঘ মাসের ভয়ানক শীত, তাহাতে অন্ধকার রাত্রি, চারি দিকে ঝিঁঝির শব্দ, কয়েক পদ চলিয়া চারুর সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল। ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া ঘরে লেপ মুড়ি দিল। পরদিন অমূল্যকে বলিল, "ভাই ! কাল সন্ন্যাসিবেশে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে ভাবিলাম, আমি কি স্বার্থপর ! কেবল নিজের দুঃখের জন্য গৃহ ছাড়িতেছি, সমাজের উন্নতির কথা একবারও ভাবিতেছি না ! তাই আবার ফিরিয়া আসিলাম : মনে সঙ্কল্প করিয়াছি, হিন্দুসমাজের উন্নতিসাধনে এ জীবন নিয়োজিত করিব।"

অমূল্য এ কথায় বড়ই খুশী হইল।

সরলাবালা দাসী

দান

সে দিন ফাল্গুনের ২৬শে। স্থির নীলাম্বুবিস্তারতুল্য অনন্ত নীলাকাশে সপ্তমীর চন্দ্র অযুত রজতরশ্মি ছড়াইতে ছড়াইতে ধীরে ধীরে দূর গগনে হেলিয়া পড়িতেছিল। আর সেই অমল

তবল রজতরাশি পথিপার্শ্বস্থ নবমুঞ্জবিত বৃক্ষগুলির কোমল পল্লবসমূহে গলিয়া পড়িয়া বিরল পত্রচ্ছেদের ভিতর দিয়া তলস্থ অন্ধকার রাশিকে ভিজাইয়া তুলিতেছিল। শান্ত গগনতল তখন আর্দ্র, ভাগীরথী-শীকর-শীতল বসন্ত পবন আর্দ্র, বৃক্ষ আর্দ্র, বৃক্ষপত্র আর্দ্র, সেই বসন্ত, চন্দ্রিকায় তখন সমস্ত কলিকাতা আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সুপ্ত, সিক্ত, স্তব্ধ নিশীথে যোড়াসাঁকোর একটি ত্রিতল অট্টালিকায় একটি সজ্জিত কক্ষেব মধ্যে অমবনাথ আকুল আগ্রহে মালতীকে বক্ষে ধরিয়া ভাবিতেছিল—

"কেন তুমি মূর্তি হ'য়ে এলে,
রহিলে না ধ্যান ধাবণাব—"

মালতী বালিকা নহে, মালতী যুবতী নহে, নববর্ষাসমাগমে মরা গঙ্গা পূর্ণাঙ্গী হইবার পূর্বে যেমন হয়, ঠিক সেই রকম। হিমান্তে কোকিল-কূজন-মুখরিত বসন্তপবনের কম্পিত প্রথম নিশ্বাস যেরূপ, ঠিক সেইরূপ। পূর্ণবিকশিতা হইবার পূর্বে প্রভাতে স্ফুটনোন্মুখী নলিনী যেমন, ঠিক সেই রকম। সেই শ্মশানবিহাবী, হিমগিবিতুল্য, কাঞ্চনসন্নিভ, মহাযোগী মহাকালের ধ্যানভঙ্গমানসে কুসুমশরনিক্ষেপেব পূর্বে কুসুমায়ুধেব স্নিগ্ধ ফুল্ল কোমল অধবে যেমন হাসিটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, মালতীর সর্বশরীর দিয়া আজ তেমনি একটা লাবণ্য ফুটিয়া ফাটিয়া পড়িতেছিল। অমরনাথ মুগ্ধ—অমবনাথ আত্মবিস্মৃত—অমরনাথ সমাধিগত।

সেই নীরব উজ্জ্বল কক্ষ কুসুমরাশিপরিব্যাপ্ত। অমবেব বন্ধুগণ বহুযত্নে তাহা সংগ্রহ করিয়াছিল। শয্যার ফুল, শয্যাপ্রান্তে ফুল, টেবিলেব উপব ফুল, মেজেব উপর ফুল। ফুলবাসরে মালতীকে ফুলবাণী সাজাইয়া অমরনাথ হৃদয় হাবাইয়াছিল।

ধীরে ধীরে চন্দ্র ডুবিয়া গেল। চন্দ্রকরসিক্ত অন্ধকাবরাশি আবাব অন্ধকাব হইয়া উঠিল। সেই সুপ্ত জগৎ আবার জাগ্রত হইল। সেই স্বপ্নময়ী, কল্পনাময়ী, আবেগময়ী যামিনী অতীতেব অনন্তগর্ভে মিশাইয়া গেল।

২

বমণীবাবু তাঁহার যথাসর্বস্ব বিক্রয় কবিয়া কন্যার বিবাহ দিয়াও অমবেব পিতাব মন পাইলেন না। নগদ চারি সহস্র মুদ্রা দিবার কথা ছিল, রমণীবাবু ঋণ কবিয়াও তিন সহস্রেব অধিক দিতে পারিলেন না। ফুলশয্যার রাত্রে অবশিষ্ট সহস্র মুদ্রা দিবাব কথা, তাহারও আব দিবার সংস্থান হইল না। অলঙ্কাবের ভিতরেও আবাব কতক কতক গিল্টি বলিয়া সাব্যস্ত হইল। মোহিনীমোহন নিষ্ঠুরহৃদয়ে আদেশ করিলেন, এমন ছোট লোকেব মেয়ে আব ঘবে রাখিবেন না। তাই মালতী স্বামীসঙ্গ হইতে নির্বাসিতা হইল—ফুলশয্যাব পবদিনই সে পিত্রালয়ে প্রেরিতা হইল।

তারপর এক বৎসর গিয়াছে। সেই ফুলশয্যার বাত্রির পর, অমরেব সহস্রসুখব্যাপ্ত কল্পনার হেমহর্ম্যে অগ্নিগর্ভ জ্বালাময় বজ্রের নিষ্ঠুব পতনেব পব আব এক বৎসর গিয়াছে। আর দেখা হয় নাই। বুঝি আর হইবে না।

একদিন শ্রান্ত অবসন্ন অমর আপন মনে ভাবিতেছিল, কেন পাইযাছিলাম, কেন হারাইলাম ? বিরহবেদনাব্যথিত হৃদয়েব লক্ষ প্রশ্ন অমরকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল। আজ আবার সেই ফাল্গুনের চন্দ্রকবোজ্জ্বল সপ্তমী নিশি। এই সেই কক্ষ সেই পালঙ্ক—পালঙ্কের উপর সেই শয্যা। কে যেন সেই একদিন আসিয়াছিল। সে বুঝি স্বপ্ন,

স্বপ্নে আসিয়াছিল—স্বপ্নে হাসিয়াছিল। একটু ক্ষীণহাসি প্রাবৃটের নিবিড়মেঘাচ্ছাদিত গগনতলে চন্দ্রে ক্ষণিক ক্ষীণ আলোক সম্পাতের ন্যায় একটু হাসি। এখনও বুঝি কক্ষে, কক্ষপ্রাচীরে, কক্ষগাত্রস্থ দর্পণমধ্যে সর্ব স্থানেই সেই হাসিটুকু হাসিতেছে। এখনও ওই বুঝি প্রভাতশিশিরস্নাত পুষ্পের মত তাহার নয়ন দুইটি কক্ষের ভিতর ভাসিয়া বেড়াইতেছে ;—আর ব্যাকুল আগ্রহে অমরের দিকে চাহিতেছে। আর কিছু মনে পড়ে না, শুধু সেই কৃষ্ণতার নয়ন দুইটি। নয়ন মুদিয়া অমরনাথ হৃদয়ের দিকে চাহিল, দেখিল, শুধু সেই নয়ন দুইটি। অসীম অনন্তপ্রবাহমধ্যে ইন্দীবরতুল্য সেই নির্নিমেষ নয়ন দুটি কেবল ভাসিয়া বেড়াইতেছে—আর কিছুই নাই। অমরনাথ কাঁদিয়া ফেলিল। পিতা ডাকিলেন—"অমর— !" অমরের সকল চিন্তা মুহূর্ত মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। মোহিনীবাবু ধীরে ধীরে অমরের কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

৩

উদ্বেলিতহৃদয় অমরনাথ সেই রাত্রি জাগিয়া কাঁদিয়া কাটাইল। আশা ছাড়িলে মানুষ বাঁচে না। অমরেরও আশা ছিল—বুঝি সময়ে পিতার ইচ্ছা পরিবর্তিত হইবে। তাহার হৃদয় বলিতে লাগিল,—"আবার বিবাহ ? বিবাহ কি তবে ধর্মহীন, ন্যায়হীন, সত্যহীন ক্রীড়ামাত্র ? বিবাহ কি তবে অর্থের বিনিময়ে জীবনদানের নীচ কপট আভাসমাত্র ? তাহা না হইলে আবার বিবাহ কেন ? মালতী কি অপরাধ করিয়াছে ?" অমর আজ পিতার অবাধ্য হইল। এত দিন বড় কষ্টে সে যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতেছিল, আজ আর তাহা পারিল না। আজ সে তাহার মালতীকে পত্র লিখিতে বসিল। অমরের হৃদযে বড় ব্যথা বাজিল—পিতা বলিয়াছিলেন "শ্বশুরালয়ের সহিত কোন সংস্রব রাখিও না।" কিন্তু মালতী ? অমরের জীবননির্ভর প্রেমের সাগর মালতী ? অমরের সুখের স্বপ্ন, স্বপ্নের রানী, হৃদয়নন্দনের অমূল্য পারিজাত মালতী ? অমরের উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে দৈববাণী হইল—"অমর ! তুমি নারায়ণসমক্ষে এক দিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, সুখে দুঃখে মালতীর হইবে। মালতী অপরাধ না করিলে তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিবে না।"

অমরনাথ তীব্রবেগে শয্যা ত্যাগ করিল—তাহার হৃদয়ে দারুণ জ্বালা। সেই জ্বালা জুড়াইবার জন্য অমর ছাদের উপর আসিল। আসিয়া দেখিল—মুক্ত, স্তব্ধ নীলাকাশ ভরিয়া সেই সপ্তমী চন্দ্রের মোহিনী মাধুরী। সে দিনও এমনি ছিল—হায় রে সে দিন ! অমর কাঁদিয়া যুক্ত করে তাহার পিতার উদ্দেশে বলিল, "বাবা ! আমাব বুকের ভিতর চাহিয়া দেখ,—তোমার দারুণ অভিমান বুঝি তাহা হইলে আর থাকিবে না।"

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে পাদচালনার পর অমরনাথ আবার মালতীকে পত্র লিখিতে বসিল। অমর লিখিল—লিখিয়া ছিঁড়িল—ছিঁড়িয়া আবার লিখিল। তার পর ? তার পর পুনরায় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া লেখনী দূরে নিক্ষেপ করিয়া অমরনাথ টেবিলের উপর তাহার ব্যথিত মস্তক রক্ষা করিল। অমরের তখন মনে হইতেছিল, যেন একটি শব্দহীন ভাষাহীন করুণ ক্রন্দন ধীরে ধীরে তাহার চতুর্দিক হইতে উছলিয়া উঠিতেছে।

৪

আজ যে বেদনা বড় অসহ্য হয়, কাল আর তাহা থাকে না। আজ অন্ধকার হইয়া তুফান

উঠিয়াছে বলিয়া মনে করিও না যে, কাল আবার শান্ত তরঙ্গিনী-হৃদয়ে তরুণ তপন হাসিবে না। তপন আবার আসিবে—আবার হাসিবে। ইহাই বিশ্বনিয়ন্তার প্রধান কৌশল। এই কৌশল মানুষে জানে না বলিয়াই মানুষ মানুষ,—দেবতা নহে। দিনে দিনে অমরের হৃদয়ও কথঞ্চিৎ শান্ত হইল। কিন্তু সে বুঝিতে পারিতেছিল না যে, তাহাদিগের সেই হাস্যকোলাহল চঞ্চল জীবন্ত সংসারে অমরনাথ একটা প্রাণহীন, শক্তিহীন মৃতের ছায়ার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অমরের আপন গৃহ তাহার সমাধিমন্দির হইয়া উঠিল।

* * * * *

অমরনাথ এখন প্রায় প্রতিদিনই মালতীর পত্র পাইত। অমরের একটি বন্ধুর ঠিকানায় মালতী পত্র লিখিত। অমরনাথ অপহৃত দ্রব্যের মত অতি নির্জনে সে লিপি বাহির করিত,—নির্জনে তাহা দেখিত, একবার দুইবার করিয়া নির্জনে তাহা কতবার পাঠ করিত ;—তারপর অতি গোপনে, অতিশয় যত্নে যক্ষের ধনের মত তাহাদিগকে সংগোপনে রক্ষা করিত।

* * * * *

মালতীর বড় সাধ, একবার অমরকে দেখিবে ! সেই সে দিন—সে দিনও কিছু বলা হয় নাই। তখন বড় লজ্জা করিয়াছিল। এখন মালতী সব বুঝিযাছে। মালতী জানিত, অমরনাথ তাহাকে ভালবাসে। তাই লজ্জা ত্যাগ করিয়া সে লিখিল,—"একবার কি আসিতে পার না ? আমি একবার তোমাকে দেখিব।"

পত্রের উত্তরে দুই দিবস পরে মালতী একখানি পত্র পাইল। পত্রের ভিতর অমরনাথের আলোকচিত্র। সেই চিত্রের পাদদেশে লেখা আছে,

"মনে রেখ"

২৫শে ফাল্গুন, ১৩০৫।

অমর—তোমার।

মালতী প্রাণ ভরিয়া দেখিল। সেই কবে একবার দেখিয়াছিল—তখন ভাল করিয়া চাহিতেও পারে নাই। তাই নির্জনে নীরবে অমরনাথের মালতী অমরের আলোক-চিত্রখানি আপন হৃদয়পটে অঙ্কিত করিতে লাগিল। সেই দেবমূর্তি কি সুন্দর ! মালতী যতবার দেখিল, ততবারই সেই মূর্তি নবভাবে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

৫

দিন যায়, দিন বসিয়া থাকে না। আরও এক বৎসর গেল। দুরন্ত কাল মালতীর অপেক্ষা করিল না—তাহার দিকে একবার চাহিয়াও দেখিল না। মালতীর প্রেমপূর্ণ ক্ষুদ্র হৃদয়ে বজ্রনিক্ষেপ করিয়া দুষ্ট কাল দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। যখন চারি দিক হইতে অনন্ত বিপদরাশি আসিয়া মানুষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখন ক্ষুদ্র বিপদগুলিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সে অন্যগুলির সহিত সংগ্রামে অগ্রসর হয়। মালতী পিতৃবিয়োগবেদনা সহিল, সহিয়া যখন

শুনিল শ্বশুরের আজ্ঞায় অমর পুনরায় বিবাহ করিতেছে, তখন দারুণ যন্ত্রণায় ভূমিতলে আছড়াইয়া পড়িল। মালতীর বৃদ্ধা মাতা গ্রামের সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, মালতীকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবেন। তার পর তাহার অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহাই হইবে। তাই একদিন মালতী তাহার দগ্ধ অদৃষ্ট লইয়া—নিতান্ত ভিখারিণীর মত কলিকাতা যাত্রা করিল।

যে পাষাণরাশি এত দিন অমরের মাতার উদ্দাম চঞ্চল আবেগতরঙ্গকে নিতান্ত বেদনা দিয়া রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, বৌমাকে দেখিয়া গৃহিণীর শোকের উচ্ছ্বাস সেই পাষাণস্তূপ ভেদ করিয়া ছুটিয়া বাহির হইল। তার পর যখন মালতী বড় অপরাধিনীর মত গৃহিণীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া অতিশয় করুণ কাতরকণ্ঠে ডাকিল, "মা!—" তখন মোহিনীবাবুর কঠিন অনুশাসন ভাসিয়া গেল—ভাগীরথীতরঙ্গে এক দিন সেই মত্ত মাতঙ্গ ভাসিয়া গিয়াছিল! মাতৃস্নেহের পক্ষপুটান্তরালে ব্যথিতা মালতীকে রক্ষা করিয়া গৃহিণী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

* * * * *

নিশির দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। সমস্ত মৃতবৎ সুপ্ত। সেই সুপ্ত নিশীথে মালতী ধীরে ধীরে কম্পিতচরণে তাহার দেবমন্দিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। অমর পূর্বেই শুনিয়াছিল যে, মাতার নয়নজলে পিতার প্রতিজ্ঞা টলে নাই। নির্বাসিতা মালতী নির্বাসিতাই থাকিবে। অমর তখন মরণ-যন্ত্রণায় ক্ষিপ্তের মত কক্ষমধ্যে ঘুরিতেছিল। রোরুদ্যমানা মালতী উন্মাদিনীর মত আসিয়া অমরের চরণ-যুগল ধারণ করিয়াছিল করুণসিক্তনয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মালতীর মলিন বেশ,—মুক্ত কেশ,—সিক্ত নয়ন,—যুক্ত কর! অমরনাথ নির্বাক্—নিস্পন্দ—নিশ্চল। হৃদয়ের কথা প্রকাশ করিবার তখন ভাষা ছিল না।

তখন সমস্ত সংসার স্তব্ধ—বুঝি তখন বাতাসও বহিতেছিল না। অমরের চক্ষু অন্ধ হইয়া আসিল—সমস্ত বিশ্ব সেই অন্ধতমোরাশি মধ্যে নিমগ্ন হইল। ক্ষিপ্ত অমরনাথ ক্ষিপ্তের মত তপ্ত বক্ষে মালতীকে তুলিয়া লইল।

* * * * *

কিন্তু তাহার পিতার নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হইবার নহে। মালতী পুনরায় পিত্রালয়ে প্রেরিত হইল।

৬

অমরনাথ দিন দিন বৃন্তচ্যুতস্থলকমলবৎ শুষ্ক হইতে লাগিল। মোহিনীমোহন তাহার বিবাহের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিলেন, পুত্রের আবার বিবাহ দিলেই সকল ব্যাধি সারিয়া যাইবে। বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইয়া গেল। আর সপ্তাহমাত্র বিলম্ব। অকস্মাৎ মস্তকে দারুণ আঘাত পাইলে যেমন বুদ্ধিবৃত্তি সমস্তই লুপ্ত হয়, অমরেরও তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু মালতীর একখানি পত্র এক দিন আবার অমরকে সকল কথা স্মরণ

করাইয়া দিল। মালতী বড় কাঁদিয়া লিখিয়াছিল,—

"প্রিয়তম,

তুমি আবার বিবাহ করিও—আমি তাহাতে বাদী হইব না। কিন্তু একবার আসিয়া আমাকে দেখা দিয়া যাইও। আমি একবার তোমার দর্শন-ভিখারিণী। যে দিন আসিবে, সেই দিনই না হয় আবার চলিয়া যাইও—আমি বনফুল, বনে ফুটিয়াছিলাম, তুমি যে ঘৃণা করিয়া সেই গন্ধবিহীন কুসুমকে পদদলিত কর নাই, ইহাই আমার সুখ। আমি সেই সুখ স্মরণ করিয়াই সুখী হইব। একবাব আসিও।

তোমার দাসী—মালতী।"

* * * * *

মালতী আরও কত কথা লিখিয়াছিল। বিপদে পড়িলে দুর্বল মানুষ যেমন কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার সকল বেদনা দেবতার চরণে নিবেদন করে— মালতীও তাহাই করিয়াছিল। সেই পত্রেব প্রত্যেক বর্ণ, প্রত্যেক বিন্দু, প্রত্যেক মসীচিহ্ন পর্যন্ত যেন মালতীর আহত হৃদয়ের উষ্ণ শোণিতে রঞ্জিত হইয়া অমরনাথের পাদমূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। অমরনাথ সেই দিনই গৃহত্যাগ করিল।

৭

এ দিকে দুই তিন দিন পর্যন্ত কলিকাতার সকল স্থানে অনুসন্ধান করিয়াও অমবের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। বিবাহের দিন নিকটবর্তী, মোহিনী বাবু অস্থিব হইয়া উঠিলেন। পলায়নের পর চতুর্থ দিবসে রাণাঘাট হইতে সংবাদ আসিল, অমরের বড় জ্বর হইয়াছে। মোহিনীবাবু শুনিলেন, শুনিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"কি ! রাণাঘাট !" আবাব দুই দিন পরে সন্ধ্যাব সময় তারে সংবাদ আসিল, অমবনাথের বিকাব হইয়াছে। এইবার মোহিনীমোহনের মস্তকে ইন্দ্রের বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল—অমর যে তাঁহার একমাত্র নির্ভর। মোহিনীবাবু সস্ত্রীক রাণাঘাটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। রমণীবাবুর ভগ্ন গৃহেব দ্বারদেশে পৌঁছিবার পূর্বেই তাঁহারা শুনিলেন, শীতার্ত মাঘের সেই অন্ধকার রজনীতে দূরে ধ্বনিত হইতেছে—"বল হবি, হরিবোল !" মোহিনীমোহন চমকিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আবার শুনিলেন, যেন সহস্র-কণ্ঠ আর্তস্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিযা বলিতেছে "বল হরি হরিবোল !" তাঁহার হৃদয়মধ্যে গলিত তপ্ত লৌহ কেহ ঢালিয়া দিল। তাঁহারা স্টেশনে ফিরিয়া গেলেন।

* * * * *

তখন দূরে শ্মশানভূমিতে চিতাব আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছিল। মালতী স্থির দীপ্তিপূর্ণ জ্বলন্ত নয়নে সেই অনলের দিকে চাহিয়া রহিল। তখনও তাহাব সীমন্তে শোণিতরক্ত সিন্দুরবিন্দু—তখনও তাহার অঙ্গুলিতে অমরনাথের প্রেমের উপহার সেই সুবর্ণাঙ্গুরীয়

শ্মশানচিতার ভীষণ আলোকে বিদ্যুতের মত ঝলসিতেছিল—তখনও তাহার হস্তে সিন্দুররঞ্জিত শঙ্খ বলয়।

তার পর ধীরে—অতি ধীরে সেই প্রেমের চিতা নির্বাপিত হইল। তখন উন্মাদিনী মালতী আপন হস্তে সীমন্তের সিন্দুর মুছিয়া ফেলিল—আপন হস্তে একখানি অঙ্গারসার কাষ্ঠ তুলিয়া লইয়া তাহারই প্রচণ্ড আঘাতে শঙ্খ বলয় ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তার পর ?—তার পর একটি করুণ চীৎকারে সেই নীরব শ্মশান বিদীর্ণ করিয়া মূর্চ্ছিতা মালতী ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।

* * * * *

অমরনাথের চিতা নির্বাপিত হইবার ছয় মাস পরে মালতী ও তাহার মাতা জন্মের মত রাণাঘাট পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে যাত্রা করিল। মালতী বলিল, "মা যাইবার সময় একবার কলিকাতা হইয়া যাইব।" তাই এক দিন সন্ধ্যার সময় মাতা পুত্রী মোহিনীমোহনের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

* * * * *

মালতী ধীরে ধীরে অমরনাথের কক্ষে প্রবেশ করিল। মোহিনীবাবুর আদেশক্রমে আজ ছয় মাসের মধ্যে এ স্থানে আর কেহ আসে নাই—যে দ্রব্য যেমন ছিল, তাহা তেমনি রহিয়াছে—কেহ স্পর্শও করে নাই। সেই পালঙ্ক,—পালঙ্কে সেই শয্যা,— শয্যার উপরে সেই উপাধান। সেই টেবিল,—টেবিলের সেই কাগজ পত্র, সেই সব। মালতী ধীরে ধীরে মেজের উপর বসিল—বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। সেই কক্ষের প্রত্যেক ধূলিকণার সহিত মালতীর আমরণ সম্বন্ধ—প্রত্যেক ধূলিকণা মালতীর সেই দুই দিনের সুখস্বপ্নের কথা কহিতে লাগিল। টেবিলের উপর কতকগুলি পুস্তক ও কাগজপত্র বিক্ষিপ্ত হইয়া ছিল, কি জানি কেন, মালতী তাহা সাজাইয়া রাখিল—অমরনাথের পরিধেয় বস্ত্রাদি যথাস্থানে সাজাইল। অমরনাথের শয্যা—সেই শয্যা, যেখানে দুই দিনের জন্য মালতী অমরের পদপ্রান্তে স্থান পাইয়াছিল, আজ সেই শয্যা মালতী আবার নূতন করিয়া রচনা করিল। তার পর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক, বসনমধ্য হইতে একটি বহুমূল্য কড়ির বাক্স বাহির করিয়া, তাহার ভিতর হইতে অমরের আলোকচিত্রখানি গ্রহণ করিল।

এ সেই বাক্স—ফুল শয্যার মিলননিশীথে অমরনাথ মালতীকে উপহার দিয়াছিল। সেই রাত্রিতে যখন অমর ধীরে ধীরে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মালতী নিদ্রার ভান করিয়া শুইয়া রহিয়াছে, তখন এই বাক্স হইতে এক শিশি দেল্‌খোস লইয়া, অমর মালতীর গায় ঢালিয়া দিয়াছিল। আজ আবার মালতী সেই প্রেমের উপহার বাহির করিল। তাহার ভিতর তখনও এক শিশি পদ্মগন্ধ কুন্তলীন, মালতী ও অমরের নামাঙ্কিত একটি সুবর্ণাঙ্গুরীয়, এবং সুন্দর সুশোভন রজত কৌটায় সুগন্ধ সিন্দুর সজ্জিত ছিল—তখনও সেই শিশির গাত্রে লাল কালীর অক্ষরে লেখা ছিল, "মনে ক'রে রেখো মনে।" এ লেখা অমরের—মালতীর হৃদয় দেবতা অমরনাথের। মালতী কুন্তলীনের শিশিটা বাহির করিয়া সেই অক্ষরগুলি দেখিতে লাগিল, আর কাঁদিতে লাগিল। তখন মালতী অমরের আলোকচিত্রখানি একটি উপাধানের আশ্রয়ে পালঙ্কের উপর স্থাপন করিয়া জানু পাতিয়া মেজের উপর বসিয়া আপন মনে বলিল,—"প্রিয়তম! তুমি বলিয়াছিলে 'মনে ক'রে রেখো মনে'—আমি তোমাকে ভুলি

নাই। যম না ভুলাইলে ভুলিব না।"

মালতীর সম্মুখস্থ কক্ষ-প্রাচীরে একখানি বড় মুকুর ছিল। সেই দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। মালতী কালবিলম্ব না করিয়া অমরনাথের টেবিলের উপর হইতে একখানি কাঁচি লইল। তাহার পর সেই দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার সুদীর্ঘ কুঞ্চিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি কাটিয়া ফেলিতে লাগিল। ধীরে ধীরে মালতী সেই আলুলায়িত কেশরাশি কাটিয়া অমরনাথের চিত্রের পাদদেশে রাখিয়া দিল।

রাজেন্দ্রলাল আচার্য

দর্শনের যম

১

প্রজাপতি দেবতা ঘাড়ে চাপেন নাই বাঙ্গালী ছেলে মহলে এদৃশ্য কমই দেখা যায়। তবে সম্প্রতি ইংরাজী আবহাওয়ায় দেবতাব ঘাড়ে চড়া ব্যাপারটা বেশ একটু "সঙ্গীন" ও সাধ্যসাধনার বিযয় হইয়া পড়িয়াছে।

এখন শিক্ষিত যুবকগণ প্রথমে বিবাহ প্রস্তাবে একান্ত নারাজ ভাব দেখাইয়া থাকেন। কেহ বিবাহ করাকে 'দাসত্ব', কেহ 'অবিবেকত্ব' কেহ বা আর 'কিছুত্ব' সংজ্ঞা দান করিয়া সগর্বে আপনাদিগকে চিরকুমার সভাব সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া বসেন। কিন্তু বিচিত্র প্রজাপতির লীলা! এই বিবাহ বিবোধী দলই শেষে এই 'দিল্লীর লাড্ডু'তে সর্বাপেক্ষা বেশী মজিয়া পড়েন!! কিন্তু তাই বলিয়া যে কোন যুবকই প্রথমে আন্তরিক বিবাহ বিরোধী থাকে না, এ কথা যেন কেহ মনে না করেন। সাধারণের অবগতির জন্য আজ আমি একটি এইরূপ চরিত্রের আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ করিব।

আমাদের আখ্যাযিকার নায়কের নাম—বিমলেন্দু। সুকুমাব শৈশব হইতেই তাহার বিবাহের প্রস্তাব আসিতেছিল। বিমল বড় লাজুক, তাই তাব সমবয়স্ক বালকেরা পর্যন্ত তাহাকে "মেযে মানুষেব বাড়া" বলিয়া বর্ণনা করিত। সে বিবাহের প্রস্তাব শুনিলেই ভাবিত—বিবাহ! তার অর্থ চাটুয্যেদের ননীকা'র মত হওয়া! (সম্প্রতি তাঁহারই বিবাহ হইয়াছিল)—কিন্তু তিনি আমা অপেক্ষা কত বড়! ছি! ছি!!

এই "ছি! ছি!" এন্ট্রেন্স হইতে এফ, এ এফ, এ হইতে বি, এ, পর্যন্ত গড়াইল। তাব পর বি, এ, পড়িতে পড়িতে বিমলের জীবন নদীতে এক সম্পূর্ণ নূতন স্রোত প্রবাহিত হইল!

বি, এ, পাঠকালে নানারূপ দর্শনশাস্ত্রের মত আন্দোলনে বিমলের ভাবপ্রবণ হৃদয় দোলায়মান হইয়া উঠিল। "মনের রাজ্য কি বিশাল! তুচ্ছ ভৌতিক জাতি, তুচ্ছ আকাশের অগণ্য তারকা! মানবের মানসপটে যে অগণ্য রহস্যমালা বিরাজিত, তাহার মধ্যে কি গভীর মহত্ত্ব, কি বিশাল অপরিমেয়তা! সৃষ্টির বিশালত্বের পরিচয় আকাশ অপেক্ষা মানবের হৃদয়ে উজ্জ্বলতররূপে প্রকটিত। মানবের এই বিশাল চিত্তকে স্বার্থের সঙ্কীর্ণ সীমায় বদ্ধ রাখা কি ভীষণ পৈশাচিক ব্যাপার! এ যেন উদার সমুদ্রকে সঙ্কীর্ণ কূপের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করিবার প্রয়াস! বিবাহ এই গণ্ডি স্থাপনে সহায়তা করে। কি মূর্খ তাহারা, যাহারা আপন হইতে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া চরিত্রের উন্নতিপথ রুদ্ধ করিয়া দেয়!"—

এইরূপ চিন্তা সর্বদা তাহার মন আন্দোলিত করিত। শেষে স্থির সিদ্ধান্ত হইল—সে বিবাহ করিবে না। বিবাহ জ্ঞান-পথের কণ্টক, সাধনের ব্যাঘাত, নিঃস্বার্থতার

প্রতিবন্ধকস্বরূপ। সাধ করিয়া এমন জিনিসকে আশ্রয় করিতে আছে

২

বিমল বিশ্ব-রহস্যের কণিকামাত্র আস্বাদন করিয়াছিল। সে তখন ত বুঝিতে পারে নাই অপার অনন্ত সিন্ধু সম্মুখে পড়িয়া!

অতি ক্ষুদ্র এক বিন্দু শিশির ফুলের বৃন্ত হইতে মাটিতে পড়ে; অতি ক্ষুদ্র একটি পতঙ্গ আলোকশিখাতে ঝাঁপ দিয়া আত্মবিসর্জন করে; সমুদ্রে অতি ক্ষুদ্র একটি তরঙ্গ উঠিয়াই পরক্ষণে মিলাইয়া যায়;—মানুষ ভাবে, তুচ্ছ ঘটনা। ক্ষীণ মানবের দৃষ্টি! পরিমিত মানবের জ্ঞান! মানুষ কি বুঝিতে পারে; ইহাব মধ্যে বিধাতার কি গূঢ় অভিপ্রায় লুক্কায়িত।

যখন বিমলের মনের অবস্থা এইরূপ, সেই সময় তাহার পিতা সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। শৈশবেই বিমলের মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল; পিতা একাধারে জনক জননী হইয়া আদরে ও যত্নে, স্নেহে ও মমতায় তাহার লালন পালন করিয়াছিলেন।

বিমল দেখিল, পিতার এযাত্রা রক্ষা পাইবার আশা নাই। হায়! এইতো সংসার—কিছুই ধরিয়া রাখা যায় না! স্নেহের বন্ধন এত দৃঢ় হইলেও মৃত্যুর ছুরিকায় এত সহজে ছিন্ন হইয়া যায়!

পিতা ডাকিলেন, বিমল! আমার এ জীবনের অভিনয় শেষ হইতে চলিল, আমার উপরে তোমার ভার অর্পিত ছিল, এখন সে ভার হইতে মুক্ত হইবার সময় উপস্থিত। আমি প্রাণপণে আমার কর্তব্য পালন করিয়াছি, আজ তোমার কর্তব্যপালনের দিন। আশা করি, তোমাদের দর্শনশাস্ত্রে পিতার প্রতি কর্তব্যপালনে কোন বাধা নাই। আমার শেষ সাধ—তুমি বিবাহ কর। আমার এই অন্তিম অনুরোধ তোমাকে রক্ষা করিতেই হইবে। সমস্তই ঠিক, কাল আমি তোমার বিবাহ দেখিব। বিমল নিঃস্পন্দ ও নির্বাক হইয়া রহিল। পর দিন তাহার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পাঁচ দিন পরে তাহার পিতার মৃত্যু হইল।

৩

ইহাকেই বলে নিয়তি বা বিধিনির্বন্ধ। মানুষের সাধ্য নাই ইহাকে অতিক্রম করিয়া চলে।

দেখ, আকাশে বাষ্প শূন্য পথে ঘুরিয়া বেড়ায়, কোথা হইতে শীতল সমীরণ আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে আকৃতি ও সার্থকতা প্রদান করে। বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘের আকারে পরিণত হয়, সেই মেঘ দ্রবীভূত হইয়া বৃষ্টিরূপে ধরাপৃষ্ঠে অবতরণ করিয়া পৃথিবীকে শস্যশালিনী করে। ইহা বিধাতার নিয়ম। কঠিন পুরুষে কোমল নারীর বন্ধনও বিধাতারই অপূর্ব লীলাভিনয়।

এই নিয়তি কখনও মধুর হাস্যে জীবনপথ আলোকিত করে, কখনও ভ্রূকুটিবিভঙ্গে ঘনান্ধকারে চিত্তকে ডুবাইয়া দেয়। কিন্তু ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মানবকে ইহার শাসনে চলিতে হয়, এবং পরিণামে ইহাতেই মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে।

এই নিয়তিবশেই আজ ধনবান পিতার একমাত্র নয়নানন্দদায়িনী, জননীর অজস্র স্নেহের পাত্রী সুশীলা সরলা বালিকা রমলা আমাদের দর্শন রাজ্যের অপূর্ব জীব বিমলের সহিত সম্মিলিতা হইল!

বিমল পিতৃসত্য পালন করিতে বাধ্য হইয়া একটি নরকন্যাকে বিবাহ করিল বটে, কিন্তু

ইহার বহু পূর্বেই তাহার প্রকৃত বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল। পাত্রী তাহার সেই প্রিয় দর্শনশাস্ত্র রূপিনী বরাঙ্গনা!

সে কিছু দিনের মধ্যেই প্রায় ভুলিয়া গেল যে রক্তমাংসময়ী একটি সরলা বালিকা তাহার হাতে চিরজীবনের ভার সমর্পণ করিয়াছে।

* * * * *

অনন্ত কালসাগরে পাঁচ বৎসর বুদ্বুদের ন্যায় লীন হইয়া গেল। ইহার মধ্যে কত তারা অস্তমিত হইল, কত নক্ষত্র আকাশে দেখা দিল। বিমলের পিসীমা গৃহের কর্ত্রী ছিলেন, তিনি জীর্ণ পত্রখণ্ডের ন্যায় সংসার বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়িলেন। এখন কেবল তাহার বিধবা ভগ্নী সুশীলা গৃহে থাকিল। সুতরাং রমলাকে পিত্রালয় হইতে আনিতে হইল। মেয়েদের দেশে রাখা একান্ত অসম্ভব দেখিয়া অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিমল তাহাদিগকে স্বীয় কর্মস্থানে আনিল।

বমলা তাহাব বিকশিত রূপযৌবন লইয়া দিন দিন অপূর্ব শ্রী সম্পদে গৌরবান্বিত হইয' উঠিতে লাগিল, আব দার্শনিক বিমলচন্দ্র প্রতিদিন মনোরাজ্যের নিবিড়তম প্রদেশে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

বেচারা রমলা বিমলকে বাঘের ন্যায় ভয় করিত। বিমল যখন পাঠে বত থাকিত, সে যেন অতিসন্তর্পণে গৃহের কাজগুলি সম্পন্ন করিত, পাছে কোনরূপে বিমলের অধ্যয়নে ব্যাঘাত হয়। সে চুড়ি কয় গাছিকে টানিয়া টানিয়া হাতের অনেক উপবে উঠাইত, পাছে শব্দ হইয়া স্বামীর চিত্ত বিক্ষিপ্ত করে। তাব একটা দোষ ছিল। সে অনেক সময় আপনার মনে কি ভাবিযা আপনি হাসিয়া উঠিত, এবং পরক্ষণেই আপনার পাগলামিতে আপনি লজ্জিত হইত। বিমলের পাঠের সময় তার ভয় হইত, পাছে সে অন্যমনস্ক হইয়া হাসিয়া ফেলে। নিবীহ বালিকা বধূ যেমন মুখরা প্রবীণা সপত্নীকে ভয় করে, রমলা বিমলের দর্শনশাস্ত্রকে ঠিক সেইরূপ ভয় করিত।

যখন বিমল বাড়ীতে না থাকিত, তখন সে চেযারখানি ঝাড়িত, টেবিলটি পরিষ্কার করিত, কাগজগুলি গুছাইয়া রাখিত, পুস্তকগুলি সাজাইত। সে ইংবাজী পড়িতে পারিত না। এক এক দিন কোন একখানি বই খুলিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত—বুঝি বা তাহার মধ্যে সৌন্দর্যের অন্বেষণ করিত। যে সৌন্দর্যে তাহার স্বামী মুগ্ধ হইয়াছিল, রমলা ভাবিত, না জানি সে কি অপূর্ব সৌন্দর্য। কখনও একটি কিল উঁচু করিয়া আপনাব মনে বলিত,—দেখেছ, এ যে সে মেয়ে নয়, একদিন দেব' বসিয়ে! কেন, আমি বুঝি তার কেউ নই? দস্যি! ষোল আনা আত্মসাৎ ক'রতে চায়।—এমন সময় হয় তো ঠাকুরঝি আসিয়া বলিত, "কি লো পাগলী, কিল দেখাচ্ছিস্ কাকে? মরণ হাবি! বইকে কিল দেখিয়ে স্বামী বশ করবি? ঐ কিল তাকে দেখাস্, তা হ'লে বরং কিছু হ'তে পারে।"

রমলা লজ্জায় মুখ লাল করিয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিত,—"যাও দিদি, তোমার যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই! আমি বুঝি বইকে কিল দেখাচ্ছিলাম? আমি তো বইয়ের মধ্যে একটা ছারপোকা ছিল, তাকে মারছিলাম।"

এই সরল ছলনায় ঠাকুরঝির চোখে জল আসিল—তাহার নিজের দুরদৃষ্টের কথা হৃদয়ে গাঁথা আছে, তাহার উপর এই দৃশ্য! হায়! বিমল এমন সরলা সুন্দরীকে চোখে দেখে না! রাত দিন পোড়া বই নিয়ে প'ড়ে আছে! যেন বই তার রমলার চেয়ে বেশী সুন্দর! একেই

বলে পণ্ডিতমূর্খ।

আমরাও বলি,—বিমল একদেশদর্শী। সে এখন কল্পনা-রাজ্যের বিভ্রান্ত পথিক। যাহাকে মূল ধরিয়া তাহার দর্শনশাস্ত্র, সেই দর্শনের প্রতিপাদ্য পদার্থ মানব-চরিত্র ছাড়িয়া সে পুস্তকের শুষ্ক আলোচনায় পাগল। হায় ভ্রম।

৪

এমনিই করিয়া দিন যায়। একদিন পাড়ার একটি ছেলেকে পড়া বলিয়া দিবার সময় দুইটি ছত্র বিমলের মনে একটি সম্পূর্ণ নূতন স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিল। জীবনের কোনও এক শুভ মুহূর্ত্তে সামান্য একটি কথায় মানুষের মনে এমন অভূতপূর্ব পরিবর্তন হইয়া যায় যাহা সহস্র দর্শনশাস্ত্রের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণায় সম্ভবপর নহে। বিমলেবও আজ তাহাই হইল।

"বেদনা যাতনা যবে অভিভূত করে প্রাণ মন,
সেবাশীলা দেবী তুমি হে নারী-রতন!"
"When pain and anguish ring the brow,
A ministering angel thou"

সাধ্বী রমণী সম্বন্ধে কবির এই দুটি ছত্র সে পূর্বেও পড়িয়াছিল ; কিন্তু আজ সে ইহার মধ্যে কি নূতন অর্থ নূতন ভাব দেখিতে পাইল—তাহার চিন্তাস্রোত এই দুইটি ছত্র ঘিরিযা বারংবার প্রবাহিত হইতে লাগিল।

এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বিমল শয্যায় শয়ন করিতে গেল। আজ যে তাহার প্রাণটা কেমন কোমল, কেমন সরস! সে যখন শুইতে যাইতেছে, তখন হঠাৎ দেখিতে পাইল, রমলার বালিসের নীচে একখানি চিঠির একটু অংশ দেখা যাইতেছে। রমলা গভীর নিদ্রিত। বিমল ধীরে ধীরে পত্রখানি বাহির করিল। রমলার হাতে লেখা। অন্য দিন হইলে তাহার এ বিষয়ে কোন আগ্রহই হইত না, আজ তাহাব কেমন ইচ্ছা হইল, চিঠিখানি পড়িয়া দেখে—রমলা কাহাকে কি লিখিতেছে। সে পড়িল,—

প্রিয়মনের কথা,

তোমার পত্র পেয়েছি। সুধার বিয়ে হবে শুনে যে আহ্লাদ হ'চ্ছে, তা ভাই কি ব'লব! হাঁ ভাই! বিয়ে হ'লে কি সুধা আমাদের ভুলে যাবে? কিন্তু আমি তো তোমাদের কৈ ভুলতে পারি না। আমার এমন দিন যায় না, যে দিন তোমাদের সকলের কথা মনে না পড়ে। বিকাল হ'লেই যমুনাতে জল আনতে যাওয়া ও গল্প করার কথা মনে হয়। যাক্, সে সব কথা লিখতে গেলে লেখা শেষ হবে না। তুমি বিয়ের সময় সুধাকে কি দেবে, সে বিষয়ে আমার পরামর্শ চেয়েছ। বেছে বেছে খুব মস্ত পণ্ডিতটাকেই ধরেছ বটে। পণ্ডিতের বউ হলেই যদি পণ্ডিত হওয়া যেত, তবে ভাবনা ছিল না। তবু একটা কথা লিখতে পারি। সেদিন একটি মেয়ে আমাদের বাড়ী বেড়াতে এসেছিল। সুন্দর মেয়েটী, ঠিক সুধারই মতন। কাছে যখন বসালাম—একটি সুন্দর গন্ধ পেলেম। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে ব'ললে, আমি কুন্তলীন মাখি। আহা! ভাই সুন্দর মেয়েদের কুন্তলীন মাখাতে হয়। সুন্দরের সঙ্গে সুন্দর মিশলে খুব সুন্দর হয়। তুমি সুধাকে যা দেবে, তা তো দেবেই ; তা ছাড়া আমার অনুরোধ তাকে এক শিশি কুন্তলীন কিনে দিও। আমি দিতাম, কিন্তু এঁকে জানাতে বড় ভয়

করে। পোড়ার মুখী আমি, কোন কথা মুখ ফুটে ব'লতে পারি না। সুধার বিয়ের বিস্তারিত খবরটা যেন পাই। আমি যদি যেতে পারতাম, তবে খুব আমোদ ক'রতাম। কিন্তু—"

এইখানেই পত্র শেষ। বোধহয়, তার পরই রমলা ঘুমাইয়াছিল। বিমল পত্র পড়িয়া চমকিত হইল।

সে এত দিন কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া কাচে মুগ্ধ ছিল! এমন সরলা পবিত্রহৃদয়া পত্নী তাহার; সে এত দিন তাহার পানে ফিরিয়া চাহে নাই! যে সর্বস্ব তাহাতে সমর্পণ করিয়া তাহার পানে সাগ্রহে চাহিয়া আছে, সে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া তাহার হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রেমপূজা অগ্রাহ্য করিয়া শূন্য দর্শনের অভিমানে প্রতারিত হইয়াছে! আহা! কি সরল নির্ভরতা! কি অসীম বিশ্বাস! কি প্রাণস্পর্শী সঙ্কোচ! এ সরল শোভন হৃদয়ের অপূর্ব সৌন্দর্যের কাছে কি জগতের সকল দর্শন তুচ্ছ ও অপদার্থ নহে? "এঁকে বল্‌তে আমার ভয় করে"—সত্যই আমি হৃদয়হীন পশু? বিমলের রুদ্ধ প্রীতিনদী আজ সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া হৃদয় প্লাবিত করিয়া ছুটিল। সেই স্রোতের মুখে Mill, Spinoza, Spencer, Hegel কোথায় ভাসিয়া গেল! আজ শুধু একটি দিব্যরূপিণী মোহিনী বালিকা-মূর্তি অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে তাহার হৃদয়ে বিরাজিত রহিল।

বিমল উচ্ছ্বসিত প্রেমভরে রমলাব সুন্দর সুসুপ্ত মুখখানি চুম্বন করিল। আজ দর্শনের সহিত প্রীতির পরিণয় সাধিত হইল। সুদূর আকাশের একটি নক্ষত্র বাতায়ন পথে এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া মধুর হাসি হাসিল।

রমলা শশব্যস্তে গায়ে কাপড় টানিয়া নিদ্রাবেশে বিমলের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল। তখনই তাহাব ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে লজ্জায় এক হাত ঘোমটা টানিয়া সভয়ে দূরে বসিতে গেল।

বিমল সাদরে তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া বলিল,—"রমা, আজ আর দূরে নয়; দূরত্বের আজ শেষ—শুষ্ক দর্শনের আজ সমাধি, আজ হৃদয়ের হাবাধনকে হৃদয়ে পুনঃস্থাপনের দিন!—সেই নিস্তব্ধ রজনীতে নির্জন গৃহে বিমল ও বমলার প্রকৃত পরিণয় সাধিত হইল।

* * * * *

সাত দিন পরে রমলা সুধার বিবাহ দেখিতে পিত্রালয়ে গমন করিল। এক দিন বিমলের কাছে কুন্তলীন চাহিতে রমার ভয় হইয়াছিল, বিমল কুন্তলীন ছাড়া কয়েক শিশি দেল্‌খোস আনিয়া দিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল। যাইবার সময় ঠাকুরঝি বলিযা দিলেন—দেখিস্ পাগলী, দেরী করিস নে। বাড়ীর হাসিটুকু তোর সঙ্গে চ'লে যাচ্ছে, তা যেন মনে থাকে। আর যদি শীগ্‌গির না আসিস্, তবে আবার 'দর্শনসুন্দরী'র সঙ্গে আমার ভাইয়ের ভাব করিয়ে দেব, তখন বুক চাপড়ে ম'রবি।'

রমলা। ইস্! দর্শন-রূপসীকে শর্মা আব ভয় করে না! এখন দর্শনের যম জানতে পেরেছি।

ঠাকুরঝি। সে আবার কে লো?

রমলা। সে হচ্ছে রমণী সম্বন্ধে কবিতা। তা শুনলে দর্শন ছট্‌ফট্ ক'রে ম'রে যায়।

ঠাকুরঝি। মরণ তোমার!

রমলা। সত্যি মিথ্যে তোমার ভাইকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো।

ঠাকুরঝি। আচ্ছা তাই হবে। শীগ্‌গীর যেন আসিস্ ভাই। তোকে ছেড়ে আমি এক দণ্ড

থাক্‌তে পারি না।"

বিনয়ভূষণ সরকার

পরিণয়-রহস্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমার পিতা—নগর ওকালতি করিতেন। আমিও তাঁহার নিকট থাকিয়া তত্রত্য কলেজে অধ্যয়ন রত ছিলাম। সেবার আমার ফোর্থ ইয়ার। শৈশবকালেই মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যু হয়; তখন আমাদের সংসারে চারিজন মাত্র লোক,—বাবা, দিদি আমি ও দিদির কন্যা সরজুবালা। আমাদের বাড়িটা কতক সাহেবী ফ্যাসানের; মাঝে একটি বড় হল্, তাহার পূর্বে ও পশ্চিমে উভয় দিকে দুইটি দুইটি করিয়া চারিটি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর। পশ্চিমের ঘর দুইটি বাবার ব্যবহারের জন্য ছিল; পূর্বের একটি কক্ষে আমি থাকিতাম, অপরটি দিদির প্যাটরা, সিন্দুক, কাপড় শয্যাতে পূর্ণ।

বলা বাহুল্য, আমি আজও অবিবাহিত। পিতাঠাকুর অনেকবার বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে বোধহয় আমার অবিচলিত প্রতিজ্ঞা দেখিয়া নিরস্ত হন। দিদি শুধু মাঝে মাঝে অনুরোধ উপরোধের সহিত অল্প বিস্তর অশ্রুজল মিশাইয়া আমার সে বিবাহের অনিচ্ছার ভিত্তিটা নাড়া দিয়া দেখিতেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, আমি অবিবাহিতই রহিয়া গেলাম।

সম্প্রতি আমার শরীর বড় খারাপ হইয়া আসিতেছিল। পরীক্ষা যতই নিকটবর্তী হইতেছিল, ম্যালেরিয়াও তত বর্দ্ধিত প্রকোপে আমাকে দুর্বল করিয়া ফেলিতেছিল। বাবা প্রায়ই বলিতেন, "এবার না হয় পরীক্ষা নাই দিলে, একবার কোন ভাল জায়গায় যেয়ে শরীরটা শুধরাইয়া এস।" আমি প্রথমে তাহা তত আবশ্যক মনে করিতাম না; কিন্তু এবার রোগ শয্যা হইতে অস্থিচর্মসাব দেহ লইয়া উঠিয়া তাঁহার উপদেশই শিরোধার্য্য করিতে হইল। স্থির হইল আমি এক সপ্তাহের মধ্যেই বৈদ্যনাথ যাত্রা করিব। সঙ্গে যাইবেন বাবা ও চাকর রসিকচাঁদ। বাবা আমাদের রাখিয়া চলিয়া আসিবেন, কারণ এদিকে তাঁহার ছুটি বড় নাই।

দিন যাইতে লাগিল; আমারও—নগর ত্যাগের দিন সন্নিহিত হইতে লাগিল। তাহার পর রহিল আর একদিন মাত্র বাকি; আমি কাল বৈকালে বৈদ্যনাথ যাত্রা করিব। আজ দ্বিপ্রহরে বাবা কাছারিতে চলিয়া গিয়াছেন। আমি আমার কক্ষে জানালার নিকটে শয্যায় বসিয়া একখানি বই পড়িতেছিলাম, আর মাঝে মাঝে বাহিরে রৌদ্রদীপ্ত পথ মাঠ চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলাম। পার্শ্বের গৃহে দিদির কোন সইয়ের বাড়ীর মেয়েরা আসিয়াছিল; তাহাদের আধচাপা কলহাস্য আর কথোপকথন শব্দ দ্বারের পরদার ফাঁক দিয়া আমার কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল।

এই সময় সরজু খোলা চুলের রাশি দোলাইয়া এক গোছা চাবি বাজাইতে বাজাইতে আমার কক্ষে আসিল; আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "মামাবাবু, কি হচ্ছে?" আমি হাসিয়া তাহাকে ধরিয়া পার্শ্বে বসাইয়া বলিলাম, "সরজুবালা বোস।" সে উচ্চরোলে হাসিয়া বলিল, "বোস্ কি?"

আমি। তোর উপাধি বোস্, আর তুই খাটে বোস্।

সরজু আরো হাসিতে আরম্ভ করিল।

এমন সময় সহসা আমার গৃহ কি মধুর সৌরভে ভরিয়া উঠিল। দ্বারের দিকে বসনের খস্ খস্ শব্দে আমি চাহিলাম ; দেখিলাম পরদার ফাঁক হইতে দুইটি বড় বড় কালো চক্ষু আর একটি নবনীত শুভ নগ্ন হস্ত সরিয়া গেল। তাহার পর সেই পথে অনেক খস্‌খসানি ও পদশব্দ শুনিয়া আমি চক্ষু ফিরাইলাম ; বুঝিলাম দিদির সইরা চলিয়া যাইতেছেন। শব্দ নীরব হইলে আমি পুস্তক রাখিয়া অঞ্চল লইয়া ক্রীড়াপরায়ণা সরজুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সরজু, দরজার কাছে কে এসেছিল রে ?" সরজু মাথা নাড়িয়া কপোলে বিরক্তির ভ্রুকুটি তুলিয়া বলিল, "ঐ মিত্তিরদের বাড়ীর মেয়ে।"

আমি। কে মিত্তির ?

সর। ঐ যে দ্বারিক মিত্তির, মোরাদপুরে থাকে।

এই সময় দিদি গৃহে আসিলেন। আমি সহাস্যে বলিলাম, "দিদি, এ গন্ধ গোকুল সই কোথা গেলে ?"

দিদি। কেন, ভাল গন্ধ না ?

আমি। হাঁ, বেশ।

দিদি। সুষমা আর তার মা কুন্তলীন মেখে এসেছিল , তারি গন্ধ।

আমি। ওঃ, এই কুন্তলীন ! বেশ চমৎকার গন্ধ তো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমি বৈদ্যনাথে আসিয়াছি। বার্ণ কোম্পানির ক্ষুদ্র রেল লাইনের উপরেই আমাদের বাঙলা। বাবা, আমাদের রাখিয়াই চলিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। আমি এখন সম্পূর্ণ রোগমুক্ত, অধিকন্তু নূতন স্বাস্থ্য ভরে সবল স্ফূর্ত্তিময় ; এ স্থানের স্বভাব সৌন্দর্য বড় নয়ন-মনোরম ; পশ্চিমে নীলাকাশ গায় জড়িত গভীর নীল কূর্মপৃষ্ঠ দিগ্‌ড়িয়া, আর পূর্ব্বে ত্রিকূট, তিনটি সূচ্যগ্র চূড়া শূন্য পথে প্রসারিত করিয়া আপন চিরঘুমের মধ্যেও হস্ত সঙ্কেতে ত্রিদিবের পথ দেখাইয়া দিতেছে। চারিদিকে কঙ্করবন্ধুর উঁচুনীচু প্রান্তর ; কোনটি ঘনসম্বদ্ধ আম, শাল, মহুয়া বৃক্ষে সমাকীর্ণ, আবার কোনটি সুদূর বিস্তৃত সুরগুঞ্জিয়া ফুলে পীতাস্তরণ হাস্যময়। এই শৈলজটিল ভূমে প্রকৃতিদেবী স্তরে স্তরে কত সৌন্দর্য্য বিপণি যে খুলিয়া বসিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। আমার কবিত্বানুশীলনের জন্য এমন অনুকূল স্থান আমি পূর্বে পাই নাই। সমস্ত দিবস মাঠে, বনে পর্বতে, শুষ্ক বালুকাবরণা নদীতটে ঘুরিয়া ফিরিতাম, আর রাত্রে জ্যোৎস্নাস্নাত পার্বতা সুষমা সম্মুখে লইয়া, বা অমানিশার অকূল বিশ্বপ্লাবী তমোরাশির প্রতি চাহিয়া wordsworth-এর বীণাস্খলিত মধুময়ী প্রকৃতি পূজার স্তব আবৃত্তি করিতাম।

কিন্তু জগৎ ক্ষণভঙ্গুর, তাই বুঝি পার্থিব বলিয়া এ নির্দোষ আনন্দও বহুকাল স্থায়ী হইল না। এক দিন দ্বিপ্রহরে পিতার নিকট হইতে একখানি টেলিগ্রাম পাইলাম ; তিনি লিখিয়াছেন, "পরশ্ব দিন সরজুর বিবাহ ; সমস্ত স্থির। তুমি যত শীঘ্র সম্ভব আসিবে।"

আমি স্তম্ভিত বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম। সরজুর বিবাহ ! কৈ আমি তো পূর্বে ইহার কিছুই শুনি নাই। পিতা তিন দিন হইল আমাকে স্বয়ং পত্র লিখিয়াছিলেন, তিনিও তো ঘুণাক্ষরেও একথা প্রকাশ করেন নাই। পাত্র দেখা হইল, কথাবার্তা হইল, অবশেষে দিনও স্থির হইল, আর আমায় কি না লিখিলেন আজ। মনে একটা কি ধাঁধা লাগিয়া রহিল। যাহা

হউক স্থির করিলাম সেই দিন রাত্রেই বারটার গাড়িতে যাইতে হইবে।

রাত্র আটটার সময় আহারাদি শেষ করিয়া একটু বিশ্রাম করিবার আশায় শয্যাশূন্য তক্তপোসে আসিয়া বসিলাম। আমি আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে আপন অজ্ঞাতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম জানি না। রাত্রে এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখিলাম ; যেন এক কি জ্যোতির্ময়ী রূপসী বালিকা আসিয়া আমার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া তাহার তুষারশ্বেত হস্তখানি আমার বক্ষে রাখিয়া বলিল, "তুমি আজ যেও না।" সে মাধুর্য্যডালি যে কি মধুর অনির্বচনীয় তাহা বলিতে পারি না। আবার তাহার চারিদিকে এত আলো, যে সেই প্রভাপুঞ্জে বিলীন মানবীমূর্ত্তিটুকুকে সে আলোকমণ্ডল হইতে পৃথক করিয়া লওয়া বড় কঠিন। আমি প্রথমে ক্ষণেক মন্ত্রমুগ্ধবৎ পড়িয়া রহিলাম, তাহার পর বিস্ময় কথঞ্চিৎ অপনোদিত হইলে উঠিতে প্রয়াস পাইলাম। কিন্তু আমার সমস্ত শরীরের একত্রিত বল প্রয়োগ করিলেও সেই বালিকার কুসুমকোমল ক্ষুদ্র হস্ত সরিল না, তেমনি আমার বক্ষের উপর সন্তর্পণে ন্যস্ত রহিল। বালিকা যেন কত ব্রীড়াবিজড়িত উচ্ছ্বাসভরে বলিল, "তুমি আমার, তাই তুমি আজ যেতে পাবে না।" আমি আবার প্রাণপণ চেষ্টা করিলাম, এবার সেই চেষ্টায় নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগিবা মাত্র এক অপূর্ব সৌরভে নাসিকা ভরিয়া গেল ; সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য যে তখনো সেই হস্তের কোমল উষ্ণ স্পর্শ বক্ষের উপর অনুভব করিলাম। সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইল, আমি শিহরিয়া চক্ষু খুলিলাম। তখনো সেই স্বপ্ন দৃষ্টা বালিকা মূর্তি শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান ! আমি উঠিয়া বসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে তুমি ?" তখন সে ফিরিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইল। আমি এক লম্ফে শয্যা ত্যাগ করিয়া দ্রুত ছুটিলাম। সে গৃহের বাহিরে একটি অনতিদীর্ঘ বারান্ডা, তাহার পর আর একটি গৃহ। বাহির হইয়া দেখিলাম বালিকা উঠান অতিক্রম করিয়া সেই কক্ষের দিকে চলিয়া যাইতেছে। আমি উত্তেজনা ও কি এক অদম্য কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া এত বেগে ছুটিলাম, যে তাহার সহিত প্রায় এক সময়েই সেই গৃহে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু গৃহ শূন্য এবং কি মধুর সহস্র কুসুমবাস সংমিশ্রণজাত গন্ধে আমোদিত।

বালিকা কোথায় গেল ! আমি যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলাম তদ্ব্যতীত, সে গৃহে তো আর দ্বার নাই ! কক্ষ ত্যাগ করিয়া বারান্ডায় আসিলাম। সেখানেও সেই গন্ধ ! সহসা আমার স্মৃতি সাগর আলোড়িত করিয়া একটি শব্দ উঠিল, "কুন্তলীন !" আমি বুঝিলাম এ গন্ধ "কুন্তলীনের"। সেই ছয় মাস পূর্বে দেওঘরে আসিবার পূর্বদিন দিদির সইদের আগমনে এই গন্ধ পাইয়াছিলাম। আজ এই অরণ্য পর্বতময় প্রদেশে ইহা কোথা হইতে আসিল। আমি একবার প্রাচীরের দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম ; সবিস্ময়ে দেখিলাম তাহা উন্মুক্ত। আমার বিলক্ষণ স্মরণ ছিল যে শয়নের পূর্বে আমি সহস্তে তাহা রুদ্ধ করি। আবার সেই অদম্য কৌতূহলের বশে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া প্রাচীরদ্বার অবলম্বনে বাহিরে আসিলাম। তখন উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় রজনী হাস্যময়ী। আমার নির্নিমেষ বিস্ময়বিমগ্ন চক্ষের সম্মুখে সেই স্বপ্ন দৃষ্টা মূর্তি আবার ভাসিয়া উঠিল। কিয়দ্দূরেই রেল লাইন ; এবার বালিকা সেইদিকে দ্রুতপদে যাইতেছিল। আমি ছুটিলাম, রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া যখন লাইনের নিকট আসিলাম, তখন সে তথা হইতে শুধু পাঁচ হস্ত দূরে দণ্ডায়মান। তাহার মুখ আমারি দিকে ফিরান ; অত অরূপরূপলাবণ্যরাশি বুঝি এ পার্থিব দেহে অসম্ভব। আমি কি বলিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় আমার চক্ষের সম্মুখে সে মূর্তি মিলাইয়া গেল। যেন ঘনীভূত ও কি মন্ত্র বলে পরিগৃহীত দেহ জ্যোৎস্না মরুবায় সংস্পর্শে গলিয়া চতুর্দিকস্থ তরল আলোক সাগরে বিমিশ্রিত হইল। আমি ভয়, পলায়ন, নিজ অস্তিত্ব অবধি ভুলিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম।

জাগিলাম যখন সেই মুহূর্তে পদতলবর্তী মৃত্তিকাস্তূপ কাঁপাইয়া সগর্জনে ধূমরাশি উদগীরণ করতঃ বারটার ট্রেন চলিয়া গেল। তৎসহিত সেই দিন বাটী ফিরিবার আশাও ফুরাইল। আমি তখন ফিরিয়া আমার শয়নকক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিনকার ট্রেনে আমি—নগরে ফিরিয়া আসিয়াছি; আসিয়া শুনিলাম বিবাহ সরজুবালার নহে, বিবাহ আমার। আমি এ যাবৎ কাল বিবাহে অসম্মতি জানাইয়া আসিয়াছি বলিয়া পিতা সমস্তই আমার অজ্ঞাতে স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন; শুধু আমার আগমনের বিলম্বেই সব পণ্ড হইয়াছে। অবশেষে লগ্ন উত্তীর্ণ হয় দেখিয়া পিতামহাশয়ই বিশেষ যত্নে সে পাত্রী অন্য পাত্রস্থ করিয়াছেন। এই কারণে এবার আসিয়া অবধি পিতামহাশয় আমার সহিত হাস্যমুখে কথা বলেন নাই; দিদিরও মুখ বড় ভার ভার।

কিন্তু এই অসন্তোষের কুজ্ঝটিকাও অধিক দিন রহিল না; সমস্ত-সমীরণের মৃদু অবিরাম প্রবাহাভিঘাতে নিঃশেষে উড়িয়া গেল। রাগ পড়িলে দিদি একদিন কৃত্রিম কোপের সহিত আমার আসিবার অন্যায় বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি যে কারণ দিয়াছিলাম তাহা প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু অবেশেষে আমাকে তেত্রিশ কোটি দেবতার দিব্য করাইয়া লইয়া বলিয়াছিলেন, "কে জানে বাবু, তোমাদের কি ভুতুরে কাণ্ড। এদিকে আমরা ভদ্রলোককে কথা দিয়ে অপমানটা তো হলুম।"

তাহার পর ক্রমে ক্রমে আট মাস কাটিয়া গিয়াছে। আমার বি এ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, সংবাদ পাইয়াছি আমি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছি। এই সময় একদিন বাবা আমাকে তাঁহার গৃহে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি তাঁহার প্রদর্শিত আসনে বসিলে তিনি বিনা আড়ম্বরে ভূমিকায় বলিলেন, "শৈলেশ, তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে।" তাঁহাব স্বর স্থির, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ নয়নে তীক্ষ্ণ অবিচল দৃষ্টি। আমি একটু ভাবিয়া কম্পিতকণ্ঠে উত্তর দিলাম, "আরো কিছু বিলম্ব করিলে হইত না?"

পিতা। না, আমার ইচ্ছা এই মাসে হউক।

আমি। কিছু কি স্থির করিয়াছেন?

পিতা। হাঁ; কন্যার পিতা দ্বারিক মিত্তিবকে আমি একরূপ কথা দিয়াছি।

দ্বারিক মিত্তির! তাঁহার কন্যা—সেই—সুষমা! আমার এক বৎসর পূর্বে দৃষ্ট পরদার অন্তরালস্থ কালো চক্ষু ও তুষার শুভ্র হস্তখানি মনে পড়িল। আমি ক্ষণেক কি ভাবিয়া বলিয়া ফেলিলাম, "আপনি যদি একান্তই ইচ্ছা করেন, তবে যেমন অভিরুচি হয় করিবেন।" এই বলিয়া আমি বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

* * * * *

তাহার পর আমার বিবাহের রাত্র; মধ্যে আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। সেই আলোক বাদ্য; লোকসমাবেশ, আর কোলাহলের আবর্তনে পড়িয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ আমি কলের পুতলির ন্যায় কি করিলাম, কি মন্ত্র আওড়াইলাম কিছু মনে নাই।

আমি স্বভাবতঃ বড় লাজুক, তাই তখনো আমার ভাবী পত্নীর মুখ একবারো চাহিয়া দেখি নাই। দেখিয়াছিলাম সেই এক বৎসর পূর্ব্বে এক মুহূর্তের জন্য তাঁহার দুইটি কালো ভাবমগ্ন

চক্ষু ; আর সুন্দর হস্তখানি।

তাহার পর আসিল শুভদৃষ্টির সময়। আর লজ্জা করা চলে না। দুই পার্শ্ব হইতে অনবরত বর্ষিত অনুরোধের মধ্যে লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া আমি চাহিলাম। মুহূর্তমধ্যে সমস্ত শরীর বিস্ময়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল, একি ! এ যে সেই বৈদ্যনাথের স্বপ্নদৃষ্ট বালিকা। সেই সময় আমার পুরোবৃত্তি বালিকাও বুঝি শুভদৃষ্টির আশায় আমার দিকে চাহিয়া ছিল ; সেও আমার মুখে চক্ষু ন্যস্ত রাখিয়া বসিয়া বায়ুসন্তাড়িত পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল।

তাহার পর দ্বিপ্রহর রাত্রে শয়ন গৃহে আমার পদপ্রান্তে শায়িতা লজ্জাসঙ্কুচিতা বালিকাকে উঠাইয়া প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলাম, দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সুষমা, তুমি আমায় দেখে অমন কাঁপছিলে কেন ?" এই সময় দ্বারের বাহিরে অর্দ্ধস্ফুটহাস্য ও চুড়ির শব্দে বালিকা আরও লজ্জিত হইল, কোন কথা কহিল না। আমি তখন সুষমাকে কথা বলাইতে নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বহু অনুরোধে, উপরোধে ও মিনতির পর সে অতি অনুচ্চস্বরে বলিল, "আমি তোমায় আগে দেখেছি।" আমি বলিলাম, "কোথায় ?"

সু। তোমাদেরি বাড়ীতে, যখন মা আমি তোমার দিদির কাছে যেতাম, কিন্তু কখনও তোমার মুখ দেখিতে পাইনি। কারণ তুমি সব সময় দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে থাক্‌তে। তার পর তুমি চলে যাবার পাঁচ ছয় মাস পর একদিন স্বপ্নে তোমার মুখ দেখতে পাই ; কিন্তু তখন জানতুম না সে তুমি ; আজ দেখে তা' বুঝেছি।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "কি স্বপ্ন দেখেছিলে ?"

সু। যেন তুমি আজন্মের মত কোথায় চলে যাচ্ছ বলে আমি তোমায় ধরে রেখেছি।

আমি বিস্ময় সাগরে ডুবিলাম, একে একে সুষমাকে সেই নিশীথের সমস্ত ঘটনা বলিলাম। সে শূন্য দৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম, "বিশ্বাস করিলে না ? আচ্ছা তুমি সে দিনে কুন্তলীন মেখে ছিলে না ?"

সুষমা চমকিত হইল, বলিল, "কেন, কুন্তলীন তো আমি রোজ মাখি।"

আমি বলিলাম, "সেই রাত্রে সেই বৈদ্যনাথের বাড়ী কুন্তলীনের গন্ধে ভরে গিয়েছিল।"

সুষমা হাসিয়া নতদৃষ্টে বলিল, "তবে তোমায় ধবে রেখে বড় অন্যায় করেছিলাম।"

আমি তখন নবপরিণীতা ভার্যাকে বক্ষে জড়াইয়া বলিলাম, "না ভালই করেছিলে, নইলে আজ তোমায় তো পেতাম না।"

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

অদ্ভুত চুরি

১

আজি ছয় বৎসর ডিটেকটিভ বিভাগে প্রবেশ করিয়াছি, পরমেশ্বরের অনুগ্রহে এবং উর্ধতন কর্মচারী সুদৃষ্টি আকর্ষণ করায় ইহার মধ্যেই আমার উন্নতির পথ অনেকটা প্রশস্ত হইয়াছে।

একদিন অতি প্রত্যূষে বাহিরে আসিয়া মুখ ধুইতেছি। এমন সময় বহির্দ্বার হইতে কে হাঁকিল "বাবুজি !" গলার স্বর শুনিয়াই বুঝিতে পারিলাম ডিটেক্‌টিভ বিভাগের বড় সাহেবের খানসামা। মুখ প্রক্ষালন করিয়া তাড়াতাড়ি দ্বারে আসিতেই খানসামা একটী সেলাম দিয়া বলিল "বাবুজি, *একঠো* জরুরী চিঠি হ্যায়, বড়া সাহেব ভেজ দিয়া।" এই

বলিয়া পত্রখানি আমার হস্তে দিল, আমি তাহাকে বিদায় দিয়া গৃহাভ্যন্তরে গিয়া পত্রখানি পাঠ করিলাম। পত্রে লেখা ছিল সত্বরই সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে, সাক্ষাৎকারে সকল কথা স্পষ্ট জানিতে পারিব।

যথাসময়ে সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। সাহেব আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া একটী নির্জন কক্ষে লইয়া গেলেন এবং অতি সঙ্গোপনে বলিলেন যে প্রায় সপ্তাহ কাল অতীত হইল কলিকাতার নিকটবর্তী কোন ধনীর গৃহ হইতে তিন হাজার টাকা মূল্যের এক জোড়া হীরামতিখচিত স্বর্ণচুড়ি চুরি গিয়াছে কিন্তু স্থানীয় কর্মচারীগণ সাধ্যানুযায়ী পরিশ্রম করিয়া কোনই ফলপ্রাপ্ত হয়েন নাই।

সাহেবের কথায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম এই চুরির তদন্তের ভার এক্ষণে আমার উপরই ন্যস্ত হইতেছে, অতএব আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া যাঁহারা এই চুরির অনুসন্ধানে লিপ্ত ছিলেন অগ্রে তাঁহাদের নিকট গিয়া যাহা জ্ঞাত হইলাম তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই—

"এই সোনার চুড়ি অপহরণ অতি বিস্ময়কর ভাবে সঙ্ঘটিত হইয়াছে। ধনীপ্রবরের অত্যুচ্চ ত্রিতল গৃহের উপরিভাগে সুবৃহৎ আলমারী, তাহার ভিতর একটী ক্যাস বাক্সে ঐ চুড়ি ছিল। গৃহের কিম্বা আলমারীব অন্য সামগ্রী কিছু স্থানান্তরিত হয় নাই। যে বাক্স হইতে চুড়ি চুরি গিয়াছে সে ক্যাস বাক্সটিও বদ্ধাবস্থাতেই আছে এবং বাক্সের অপর বহু মূল্যের অলঙ্কারগুলির একখানিও অপহৃত হয় নাই।

সেই ত্রিতল প্রকোষ্ঠে কর্তা ও তাঁহার দুই স্ত্রী ও দুই তিনটী ছোট ছোট বালক বালিকা শয়ন করেন। কর্তার প্রথমা পত্নীর দিবাভাগে সেই গৃহে যাওয়া আসা নাই, তাঁহার ভিন্ন গৃহ নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই কক্ষটী সম্পূর্ণরূপে ছোট গিন্নিবই ইজাবা মহল, কেবল তাঁহারই জিনিস পত্রাদি সেই গৃহে থাকে।"

এই বিববণ অবগত হইয়া তখনই কয়েক জন পুলিশ কর্মচাবী সহ জমিদারবাবুর বাটীর সেই গৃহটী পরিদর্শনমানসে তথায় উপস্থিত হইলাম।

আমাকে দেখিয়াই জমিদারবাবু সাদরে চেয়াবে বসাইলেন এবং বেশ মিষ্টভাষায় ভদ্রোচিত আলাপাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। আমি কিয়ৎকাল পরে কাজেব কথা পাড়িলাম এবং চোরাই মাল যে ঘবে ছিল সেই স্থানটী একবার দেখিতে চাহিলাম।

জমিদারবাবু সম্মত হইলেন এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর ভিতব গেলেন। সেই ত্রিতল গৃহটিব সমুদায় স্থান আমি বেশ পছন্দ করিয়া দেখিয়া লইলাম ; এবং একটু বিস্ময়ান্বিত হইলাম ;-কারণ কোন অপরিচিত চোর যে সহজে এ ঘরে ঢুকিবে তার সম্ভব অতি কম। অতএব যাঁহারা সর্বদা ঘরে আসেন বা থাকেন তাঁদের কোন ব্যক্তির দ্বারাই যে ইহা সংঘটিত হইয়াছে তাহাতে আব সন্দেহ রহিল না।

আমি জমিদারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ আলমায়রা ও ক্যাস বাক্সের চাবির অনুরূপ চাবি এই বাড়ীতে আর কাহারো আছে কিনা ? প্রশ্ন করিবামাত্র জমিদারবাবুর মুখ গম্ভীর হইল। তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন যে অন্য কারোই নাই তবে তাহার বড়গিন্নির আছে, দুজনের বাক্স এক প্রকার চাবিও এক প্রকার।

আমি। চুড়ি, কখন চুবি যায় ?

জমিদারবাবু। ঠিক কখন জানি না তবে তিন চার দিন পূর্বেও চুড়ি যথাস্থানেই ছিল, তিন চার দিবসের পর একদিন সন্ধ্যা বেলা কি কারণে বাক্স খোলা হইল, আশ্চর্যের বিষয় সবই আছে, কেবল চুড়ি নাই।

আমি। দিনের বেলায় আপনার বড়গিন্নি ঐ গৃহে আসিয়া থাকেন কি ?

জমিদারবাবু। না, কেবল রাত্রিতে আসিয়া শয়ন করেন।

আমি। আপনার ঐ গৃহে কে কে আসিয়া থাকেন।

জমিদারবাবু। অপর লোকের মধ্যে দুইটি ঝি, ইহা ভিন্ন অন্য কেহ নহে।

আমি। ঝি দুইটির সম্বন্ধে আপনার কিরূপ বোধ হয়।

জমিদারবাবু। মহাশয়, ঝি দুইটি বহুদিন হইতে আমার বাড়ী আছে কোন দিন তাহাদের অবিশ্বাসের কারণ পাই নাই। বিশেষতঃ গিন্নিদের চাবি তাঁদের আঁচলে থাকে তাহা পাইবার কোন উপায় নাই।

তখন আমার মনে হইল যে বড়গিন্নিরই কি এই কাজ ? সতীনে সতীনে মনান্তর থাকিতে পারে। এই ভাবিয়া জমিদারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিছু মনে করিবেন না। কিন্তু বড়গিন্নি সম্বন্ধে আপনার মত কি ?"

জমিদারবাবু। তিনি সদ্বংশের কন্যা সৎস্বভাবা, তাহার গহণার অভাব নাই। যদিও ছোটগিন্নির সহিত কখন কখন কথান্তর হইয়া থাকে নিরপেক্ষ ভাবে দেখিতে গেল সে দোষ ছোট গিন্নিরই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার দ্বারা এ কাজ হইতে পাবে না।

আমি। দ্বেষবশতঃ করিতে পারেন না ?

জমিদারবাবু। বডগিন্নির মনে দ্বেষ-হিংসা থাকিলে এতদিন কত অনর্থ ঘটিত।

আমি। আপনার ছোট গিন্নি কি বলেন ?

জমিদাববাবু। তিনি আর কি বলিবেন তাঁর বিশ্বাস ঝিদিগের দ্বারা একার্য ঘটে নাই। তবে—

"তবে" বলিযা জমিদার মহাশয় কি যেন একটা কথা চাপা দিতে চেষ্টা করিলেন আমি তাহা বুঝিলাম। আমি বলিলাম "আপনাব দুই গিন্নিতে ভাব কেমন ? সেইটি পরিষ্কার জানা চাই।"

জমিদাববাবু একটু ব্যথিত হৃদয়ে বলিলেন, "মহাশয, আপনাকে আব গোপন কবিয়া কি হইবে। দিবারাত্রি আমার গৃহে শান্তি নাই। ছুতো নতায় কলহের সূত্রপাত করিয়া দুজনে আমাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে।"

আমি। ছোট গিন্নি কি বলেন, তাঁব কি বিশ্বাস বড গিন্নি চুডি নিয়াছেন ?

জমিদারবাবু। তিনি তো স্পষ্টই একথা বলিতেছেন কিন্তু ছোট গিন্নিব কথা আমার আদৌ বিশ্বাস হয় না। তিনি বিদ্বেষবশতঃ একথা বলিতেছেন।

আমি। মহাশয আমাকে মাপ করিবেন আমি অনেক কথা জিজ্ঞাসা কবিযা আপনাকে বিরক্ত করিলাম আপনি আর একটি কথাব উত্তর প্রদান করুন। আপনার দুই পত্নীব মধ্যে আপনার ভালবাসাব অধিকাবিণী কে, এবং আপনার উপর কাহাব আধিপত্য অধিক।

জমিদাব মহাশয় কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্নভাবে অথচ অকপটে প্রশ্নোত্তর প্রদান করিলেন। বলিলেন, "মহাশয়, জানেন তো "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা।" আমি আধ বুড়া বযসে পুনঃবিবাহ করিযা যে কুকর্ম করিয়াছি তাহার প্রতিফল স্বরূপ আমার ওপর ছোট গিন্নির আধিপত্যটাই একচেটিয়া হইয়াছে বিশেষতঃ যখন তাহারই গর্ভে সন্তান-সন্ততি হইল তখন তাঁহাকে পায় কে ? কাজেই ছোট গিন্নিবই প্রবল প্রতাপ।

আমি সমস্ত শুনিয়া এবং বাড়ীর ঝি চাকর ইত্যাদি সম্বন্ধেও কতক অনুসন্ধান করিয়া সন্ধ্যাতীতে বাসায ফিরিলাম।

৩

বাসায় আসিবার পর আহারাদি শেষ করিয়া শয়ন করিলাম কিন্তু সুনিদ্রা হইল না, চুরির আদ্যোপান্ত ঘটনা ভাবিতে লাগিলাম। যখন বড় গিন্নির ঐ প্রকার চাবি আছে বাড়ীর অন্য কাহারও নাই তখন একাজ কি তাঁহারই ? কিন্তু জমিদারমহাশয়ের কথার ভাবে বোধ হয় বড় গিন্নি নির্দোষী। বোধহয় ঝিদের দ্বারাই এ কার্য্য ঘটিয়াছে কিন্তু ঝিদের প্রতি ছোট গিন্নির এত বিশ্বাস কেন ? এইরূপ ভাবনা-বিতাড়িত হৃদয়ে বড় অশান্তিতে রাত্রি কাটাইলাম।

দুই তিন দিন নানারূপ চিন্তার পর জমিদার বাটীর ঝি দুইটির স্বভাব চরিত্র বিশেষভাবে জানা কর্তব্য বিবেচনা করিয়া বেশ পরিবর্তন পূর্বক তাহাদের বাসা অন্বেষণে বাহির হইলাম। ঝি দুইটি সন্ধ্যাবেলা যখন তাহাদের বাসায় যায় আমি তাদের আড়ালে আড়ালে সঙ্গে যাই এবং কি প্রকার ধরনের লোকের সহিত ইহারা আলাপাদি করে এবং কি কথোপকথন কবে এই সকল পর্যবেক্ষণ করিয়া বাসায় ফিরি।

পাঁচ সাত দিবস অতীত হইল তথাপি কোন কিনারা করিতে পারিলাম না। একদিন সন্ধ্যার পর জমিদারবাটীর নিকটস্থিত সদর রাস্তা দিয়া পরিভ্রমণছলে বাহির হইয়াছি এমন সময়ে অনতিদূরে বটবৃক্ষ তলে মৃদু রমণী কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হইল। আমি অতি সংগোপনে ধীরপদে তাহাদের নিকটবর্তী হইয়া বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইলাম। শুনিলাম একজন বলিতেছে—

"দেখ্ ফুলি চিঠি সাবধান, আমার মান, ইজ্জৎ, প্রাণ পর্যন্ত সবই ঐ চিঠির মধ্যে। আর তোর জন্য এই কুন্তলীনটা ছোট গিন্নির নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়াছি।" এই বলিয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটা শিশি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল।

অপরা কুন্তলীন পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল এবং বলিল মাসি, ভয় কি ! ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু এলেও চিঠির কথা জানতে পারবে না। রজনীকান্ত বলে দিয়েছে "বলিস্ জিনিস বিক্রি হয় নাই। অত দামের মাল বিক্রি করা সহজ কথা নয়।"

তখন মাসি ফিস্ ফিস করিয়া বোনঝির কাছে কি বলিয়া দিল স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না। কেবল এইটুকু আমার কর্ণে প্রবেশ করিল "তুই যা আমি আধ ঘণ্টা পর যাচ্ছি।"

ইহাদের মধ্যে একটি অর্দ্ধ বয়সী, অপরা যুবতী। অর্দ্ধ বয়সীর গলার স্বর শুনিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলাম, জমিদার বাড়ীর মালতী ঝি। পূর্বে যে সন্দেহ করিয়াছিলাম তাহা সত্যে পরিণত হইল ভাবিয়া মনে বড় আনন্দ হইল।

৪

মালতী ঝি চলিয়া গেলে যুবতী যে দিকে চলিল আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। প্রায় আধ মাইল পথ অতিক্রমের পর যুবতীর নিকটবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?"

যুবতী একটু আশ্চর্যভাবে আমার পানে তাকাইয়া বলিল, "কেন আমি বাজার করিতে গিয়াছিলাম।"

আমি। বাজারে কি করিতে গিযাছিলে, জিনিসপত্র তো কিছু দেখি না।

যুবতী ক্ষুব্ধস্বরে উত্তর করিল "অত খোঁজে তোমার কাজ কি ?"

আমি। রাগ কর কেন, বল না কাজ আছে বৈ কি ?

যুবতী। কুন্তলীন তেল কিনতে, শুনিলে ?

আমি। সেই তেলটা তুমি কোন দোকান হইতে আনিলে আমায় দেখাইয়া দাও।

আমার কথা শুনিয়া যুবতী তাড়াতাড়ি পা হাঁটিয়া চলিল, আমি দেখিলাম শিকার পালায়।

রাস্তা লোকজন শূন্য। তাই আমি সাহস পাইয়া সজোরে তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "তোমার কাছে তোমার মাসি এইমাত্র যে পত্রখানি দিয়েছে তাহা শীঘ্র আমাকে দাও। বিলম্ব করো না, আমি তোমাদের কথাবার্তা সব শুনিয়াছি।"

যুবতী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না, তুমি কি বল্‌ছ।"

আমি তাড়াতাড়ি পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া বলিলাম "চিঠি দেবে তো দাও নচেৎ এই পিস্তলের গুলিতে তোমার মাথা উড়াইয়া দিব।" আমার হস্তে পিস্তল দেখিয়া যুবতী ভয় পাইয়া সব কথা বলিয়া ফেলিল।

যুবতী বলিল "বাবু, মাসি যে বাড়ীতে চাক্‌রি করে সেই বাড়ীর জিনিস চুরি করিয়া রজনীকান্তের কাছে বিক্রি করিতে দিয়াছে ; বাবু আমার কোন দোষ নাই, আমায় ছেড়ে দাও।" আমি বলিলাম "তোমায় ছেড়ে দিব বৈ কি ?" এইক্ষণ তোমায় একবার থানায় যাইতে হইবে।

আমার পূর্ব্ব পরামর্শানুসারে অদূরে দুইজন কনেস্টবল আমার পিছনে ধীরে ধীরে আসিতেছিল আমি সঙ্কেতের বাঁশি বাজাইবা মাত্র তাহার আসিয়া দাঁড়াইল, তার পর আমরা যুবতী সহ রজনীকান্তকে গ্রেপ্তার করিতে চলিলাম। যথাস্থানে রজনীকান্তকে প্রাপ্ত হইয়া মালতীর আগমনাপেক্ষায় সেই স্থানে দাঁড়াইলাম। ক্ষণকাল পরেই মালতীর দর্শন পাইলাম। মালতী আমাদিগকে সেখানে দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কে গা ?"

আমি বলিলাম "তুমি কে গা ?" মালতী বলিল "মরণ আর কি, চেন না ? আমি জমিদার বাটীর মালতী ঝি।"

আমি বলিলাম "হাঁ চিনি বৈ কি ! তুমি জমিদারবাটীর ছোট গিন্নির সোনার চুড়ি চুরি করিয়াছ, এখন থানায় চল" তখন আমার ইঙ্গিত মত কনেস্টবলদ্বয় মালতীর হাতে হাতকড়ি লাগাইল এবং তিন জনকেই থানায় লইয়া চলিল। মালতী জীবন্মৃতবৎ চলিল।

যথা সময় থানায় পৌঁছিয়া মালতীর প্রেরিত পত্রখানি পাঠ করিলাম, পত্রে লেখা—

"আজ কয়েকদিন তোমার দেখা না পাইয়া ভাবিতেছিলাম, তুমি জিনিস লইয়া চম্পট দিলে নাকি ? এখন দেখিতেছি যে বড়ই কুকর্ম করিয়াছি ; কেন না অত বহুমূল্যের চুড়ি বিক্রি করা আমাদের পক্ষে সহজ কথা নহে। এদিকে মহা হুলস্থুল, পুলিশে তদন্ত করিতেছে, বড গিন্নি বেচারীর কি কষ্ট, তার উপরেই সন্দেহ পড়িয়াছে। তুমি আমার অপেক্ষায় বসিয়া থাক আমি একটু পরে যাইতেছি। তোমার আশ্রিতা মালতী।"

মালতী যখন দেখিল সে ধরা পডিয়াছে তখন আর কিছুই গোপন করিল না সমস্ত স্বীকার করিল। চুড়ি চুরির কাহিনী সে আদ্যোপান্ত যাহা বলিল তাহা এইরূপ—

"আমি সাত আট বৎসর সেই বাড়ীতে কাজ করি। সকলেই আমাকে বিশ্বাস করিতেন। গিন্নিঠাকুরানীরা যেখানে যাহা রাখিতেন, আমি তাহা দেখিতাম বা জানিতাম। আমি ছোট গিন্নির ছেলে মেয়ে রাখিতাম, তাঁহার মন জোগাইয়া খোসামোদ করিয়া চলিতাম। তিনিও আমাকে ভালবাসিতেন। আমি ছোট গিন্নির ঘরে সর্বদা যাতায়াত করিতাম। রজনীকান্ত আমাকে সর্ব্বদাই বলিত যে জমিদারবাবুর বাড়ী হইতে বেশী দামের একখানা গহনা যদি আনিস, তাহা হইলে বিক্রি করিয়া দুজনে বিদেশে গিয়া বেশ সুখে বাস করিতে পারি।

এই রজনীকান্তই আমার কাল হইল। তাহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া এই দুষ্কর্ম করিতে স্বীকার হইলাম। অনেক দিন হইতেই চেষ্টায় ছিলাম, এক দিবস সুযোগ পাইলাম। বাবুর বাড়ী যাত্রা গান, ছোট গিন্নি বাহির মহলে গান শুনিতে গিয়াছেন, বাড়ীর প্রায় সকল লোকেই বাহিরে। বড় গিন্নি গান শুনিতে যান নাই তিনি ভিতরে তাঁহার গৃহে নিদ্রিত ছিলেন। সবে প্রভাত হইয়াছে মাত্র।

তেতলায় ছোট গিন্নির ঘর খোলা ছিল। আমি সাহসে ভর করিয়া ধীরে ধীরে বড় গিন্নির ঘরে গেলাম। অতি ধীরে তাঁহার অঞ্চল হইতে চাবির গোছা খুলিয়া আনিলাম, মনে করিলাম এর মধ্যে যদি বড় গিন্নি জাগিয়া চাবি তল্লাস করেন বলিব পড়িয়া গিয়াছিল। আমি পাইয়াছি। তারপর ছোট গিন্নির ঘরে ঢুকিয়া আল্‌মায়রা খুলিলাম। তাহার ভিতর হইতে ক্যাস বাক্স বাহির করিয়া খুলিয়া চুড়ি লইলাম কিন্তু আমার যেন হৃৎকম্প হইতে লাগিল। চুড়ি তাড়াতাড়ি কাপড়ের কোণে বাঁধিয়া বাহির হইলাম। আল্‌মায়রা ও ক্যাস বাক্স সাবধানে বন্ধ করিয়া রাখিয়াই আসিয়াছিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি লোকজন কেহই নাই, মনে করিলাম আমার কি সৌভাগ্য। রজনীকান্ত গান শুনিতে আসিয়াছিল কৌশলে তাহাকে পুষ্করিণী তীরে ডাকাইয়া জিনিষ দিয়া বিদায় করিলাম, কেহই টের পাইল না। ত্বরিতপদে বড় গিন্নির ঘরে গেলাম তখনও তিনি নিদ্রিতা, তাঁহার আঁচলে চাবি বাঁধিয়া বাহিরে আসিলাম।

চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির মহলে গিয়া ছোট গিন্নির কোল হইতে ছেলে লইলাম এবং বলিলাম "বাহ্যি ফিরতে গিয়াছিলাম" বড় পেট নেবেছে, গা কেমন কেমন কচ্ছে।" ছোট গিন্নি তাহা শুনিয়া বলিলেন, "তবে শুয়ে থাক গিয়ে বাত জেগে অমন হয়েছে।"

দুই তিন দিন পর চুড়ির খোঁজ পড়িল। ছোট গিন্নি বড গিন্নিব উপরই দোষারোপ করিয়া নানাপ্রকারে তাঁকে গঞ্জনা দিতে লাগিলেন। পূর্বে কর্তা, বড় গিন্নিকে সন্দেহ করেন নাই, পরে নানা কারণে বড গিন্নিরই এই কার্য্য বলিয়াই কর্ত্তাবিও কতকটা বিশ্বাস হইল।

পরমেশ্বরের রাজ্যে পাপকার্য গোপন থাকে না তাহা আমি এখন বেশ বুঝিলাম। আমি জমিদার বাড়ীর বিশ্বাসী ঝি বলিয়া কত সুখে সম্মানে ছিলাম কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আজ আমার এই দুর্দশা হইল।

হায়! আমি কত দিন ছোট গিন্নির সঙ্গে সঙ্গে নিরপরাধিনী বড় গিন্নিকে কত উপহাস করিয়াছি, বড় গিন্নি চুডি নিয়াছেন বলিয়া কত রকমে কর্তা ও ছোট গিন্নিব মনে বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছি, আমার সে সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হইয়া যাইবে কেন?"

* * * * *

চুড়ি রজনীকান্ত বিক্রয় করিতে পারে নাই। তাহার নিটেই পাওয়া গেল। বিচারে মালতীর দুই বৎসর এবং বজনীকান্তের এক বৎসরের কারাবাসের হুকুম হইল।

হেমন্তকুমারী গুপ্তা

সপ্তম বৎসর

মন্দির

১

এক গ্রামে নদীর তীরে দু'ঘর কুমোর বাস করিত। তাহারা নদীর মাটী তুলিয়া ছাঁচে ফেলিয়া পুতুল তৈরি করিত, আর হাটে গিয়া বিক্রয় করিয়া আসিত। চিরকাল তাহারা এই কাজ করে, চিরকাল এই মাটীর পুতুল তাহাদিগের পরণের বস্ত্র ও উদরের অন্ন যোগাইয়া থাকে, মেয়েরা কাজ করে, জল তুলে, রাঁধিয়া স্বামী পুত্রকে খাওয়ায় এবং নিবান ভস্মস্তূপের ভিতর হইতে পোড়া পুতুল বাহির করিয়া আঁচল দিয়া ঝাড়িয়া চিত্রিত হইবার জন্য পুরুষদের হাতের কাছে আগাইয়া দেয়।

শক্তিনাথ এই কুম্ভকার পরিবারের মধ্যে আসিয়া স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। রোগক্লিষ্ট, ক্ষীণদেহ এই ব্রাহ্মণকুমার, তাহার বন্ধুবান্ধব, খোলাধূলা, লেখাপড়া সব ছাড়িয়া দিয়া এই মাটীর পুতুলের পানে অকস্মাৎ একদিন ঝুঁকিয়া পড়িল, সে বাঁশের ছুরি ধুইয়া দিত, ছাঁচের ভিতর হইতে পরিষ্কার করিয়া মাটী চাঁচিয়া ফেলিত এবং উৎকণ্ঠিত ও অসন্তুষ্ট চিত্তে, পুতুলের চিত্রাঙ্কণ কার্য কেমন অসাবধানতার সহিত সমাধা হইতেছে, তাহাই দেখিত, কালি দিয়া পুতুলের ভ্রূ, চক্ষু, ওষ্ঠ প্রভৃতি লিখিত হইত ; কোনটার ভ্রূ মোটা, কোনটার আধখানা, কাহারো বা বা ওষ্ঠের নীচে কালির আঁচড় লাগিয়া থাকিত, শক্তিনাথ অধীর ঔৎসুক্যে আবেদন করিত, "সরকার দাদা, অমন তাচ্ছিল্য কোরে আঁকচ কেন ?" সরকার দাদা অর্থাৎ কারিগর সস্নেহে হাসিয়া জবাব দিত, "বামুন ঠাকুর, ভাল কোরে আক্‌তে গেলে বেশী দাম লাগে, অত কে দেবে বল ? এক পয়সার পুতুল ত আর চার পয়সায় বিকোবে না।"

২

এই সহজ কথাটার অনেক আলোচনা করিয়াও শক্তিনাথ আধখানা মাত্র বুঝিয়াছিল, এক পয়সার পুতুল ঠিক এক পয়সায় বিকাইবে, তাহার ভ্রূ থাকুক, আর আধখানা ভ্রূ না থাকুক। দুই জোড়া চক্ষু সমান অসমান যাই হোঁক, সেই এক পয়সা ! মিছিমিছি কে এত পরিশ্রম করিবে ? পুতুল কিনিবে বালকে, দু'দণ্ড তাহাকে আদর করিবে, শোয়াইবে, বসাইবে, কোলে করিবে,—তারপর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিবে,—এই তো ? শক্তিনাথ বাটী হইতে সকালবেলা যে মুড়ি-মুড়কি কাপড়ে বাঁধিয়া আনিয়াছিল, তাহার ভুক্তাবশিষ্ট এখনো বাঁধা আছে, তাহাই খুলিয়া অতিশয় অন্যমনস্কভাবে চিবাইতে চিবাইতে, ছড়াইতে ছড়াইতে সে তাহাদের জীর্ণ বাটীর প্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল, বাটীতে কেহ নাই। ভগ্ন-স্বাস্থ্য বৃদ্ধ পিতা জমিদার বাটীতে মদনমোহন ঠাকুরের পূজা করিতে গিয়াছেন। ভিজা আলোচাল, কলা মূলা প্রভৃতি উৎসর্গীকৃত নৈবেদ্য বাঁধিয়া আনিবেন, তাহার পর পাক করিয়া পুত্রকে খাওয়াইবেন, নিজেও খাইবেন। বাড়ীর উঠান কুঁদফুল, করবীফুল ও সেফালীফুল গাছে পূর্ণ। গৃহলক্ষ্মীহীন বাটীটার সর্ব্বত্রই জঙ্গল ; কিছুতে শৃঙ্খলা নাই, কাহারো পারিপাট্য নাই। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মধুসূদন কোনরূপে দিনপাত করেন। শক্তিনাথ ফুল পাড়িয়া, ডাল পাড়িয়া, পাতা ছিঁড়িয়া উঠানময় অন্যমনস্কভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

প্রতিদিন সকালবেলা শক্তিনাথ কুমোরবাড়ী যায়। আজকাল সে পুতুলে রং দিবার অধিকার পাইয়াছে। তাহার সরকার-দাদা সযত্নে সবচেয়ে ভাল পুতুলটা তাহাকে বাছিয়া দিয়া বলে, "নাও দাদাঠাকুর, তুমি চিত্তির কর", দাদাঠাকুর এক বেলা ধরিয়া একটি পুতুল চিত্রিত করে। হয় ত, খুব ভালই হয়, তবু এক পয়সার বেশী দাম উঠে না। সরকার-দাদা কিন্তু বাটী আসিয়া বলে, বামুনঠাকুরের 'চিত্রি করা' পুতুলটি দু পয়সায় বিকিয়েছে।—শুনিয়া শক্তিনাথের আর আনন্দ ধরে না।

৩

এ গ্রামের জমিদার কায়স্থ। দেব দ্বিজে তাঁহার বাড়াবাড়ি ভক্তি। গৃহদেবতা নিকষনির্মিত মদনমোহন বিগ্রহ ; পার্শ্বে সুবর্ণরঞ্জিত শ্রীরাধা,—অত্যুচ্চ মন্দিরে রৌপ্য সিংহাসনে তাঁহারাই প্রতিষ্ঠিত। বৃন্দাবনলীলার কত অপরূপ চিত্র মন্দির গাত্রে সংলগ্ন। উপরে কিংখাপের চন্দ্রাতপ, তাহাতে শত শাখার ঝাড় দুলিতেছে। এক পার্শ্বে, মন্দির-বেদীর উপর পূজাব উপকরণ সজ্জিত, এবং নিত্যনিবেদিত পুষ্প চন্দনের ঘন সৌরভে মন্দিরাভ্যন্তর সমাচ্ছন্ন। বুঝি, স্বর্গসুখ ও সৌন্দর্য্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে, এই পুষ্প ও গন্ধ পূজার প্রথম উপাচার হইয়া আছে, এবং তাহারই সুকোমলসুরভি বায়ুর স্তরে স্তরে সঞ্চিত হইয়া এই মন্দির বায়ুকে নিবিড় করিয়া রাখিয়াছে।

৪

অনেক দিনের কথা বলিতেছি। জমিদার রাজনারায়ণ বাবু যখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিয়া প্রথম বুঝিলেন যে, এ জীবনের ছায়া ক্রমশ দীর্ঘ ও অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে ; যে দিন সর্ব প্রথম বুঝিলেন যে, এ জমিদারী ও ধন, ঐশ্বর্য্য ভোগের মিয়াদ প্রতিদিনই কমিয়া আসিতেছে , প্রথম যেদিন মন্দিরের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চোখ দিয়া অনুতাপাশ্রু বিগলিত হইয়া ছিল, আমি সেই দিনের কথা বলিতেছি। তখন তাঁহার একমাত্র কন্যা অপর্ণা পাঁচ বৎসরের বালিকা, পিতার পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া সে একমনে দেখিত, মধুসূদন ভট্টাচার্য চন্দন দিয়া কাল পুতুলটি চর্চিত করিতেছেন, ফুল দিয়া সিংহাসন বেষ্টন করিতেছেন, এবং তাহারই স্নিগ্ধ গন্ধ, আশীর্বাদ মত তাহাকে যেন স্পর্শ করিয়া ফিরিতেছে। সেই দিন হইতে প্রতিদিনই এই বালিকা সন্ধ্যার পর, পিতার সহিত ঠাকুরের আরতি দেখিতে আসিত এবং এই মঙ্গল উৎসবের মধ্যে অকারণে বিভোর হইয়া চাহিয়া থাকিত।

ক্রমে অপর্ণা বড় হইতে লাগিল। হিন্দুর মেয়ে ঈশ্বরের ধারণা যেমন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করে, সেও তাহাই করিতে লাগিল, এবং পিতার নিতান্ত আদরের সামগ্রী এই মন্দিরটী যে তাহারও বক্ষ-শোণিতের মত, এ কথা সে তাহার সমস্ত কর্ম ও খেলাধুলার মধ্যেও প্রমাণ করিতে বসিল। সমস্ত দিন সে এই মন্দিরের কাছাকাছি থাকিত এবং একটি শুষ্ক তৃণ বা একটি শুষ্ক ফুলও সে মন্দিরের ভিতর পড়িয়া থাকা সহ্য করিতে পারিত না। এক ফোঁটা জল পড়িলে সে সযত্নে আঁচল দিয়া তাহা মুছিয়া লইত। রাজনারায়ণ বাবুর দেবনিষ্ঠা লোকে বাড়াবাড়ি মনে করিত, কিন্তু অপর্ণার দেবসেবাপরায়ণতা সে সীমাও অতিক্রম করিতে উদ্যত হইল, সাবেক পুষ্পপাত্রে আর ফল আঁটে না—একটা বড় আসিয়াছে। চন্দনের পুরাতন বাটীটা বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভোজ্য ও নৈবেদ্যের বরাদ্দ ঢের

বাড়িয়া গিয়াছে। এমন কি, নিত্য নূতন ও নানাবিধ পূজার আয়োজন ও তাহার নিখুঁত বন্দোবস্তের মধ্যে পড়িয়া বৃদ্ধ পুরোহিত পর্যন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। জমিদার রাজনারায়ণ বাবু এসব দেখিয়া শুনিয়া ভক্তি স্নেহে গাঢ়স্বরে কহিতেন, "ঠাকুর আমার ঘরে তাঁহার নিজের সেবার জন্য লক্ষ্মীকে পাঠাইয়া দিয়াছেন,—তোমরা কেহ কিছু বলিয়ো না।"

৫

যথা সময়ে অপর্ণার বিবাহ হইয়া গেল। মন্দির ছাড়িয়া এইবার যে তাহাকে অন্যত্র যাইতে হইবে, এই আশঙ্কায় তাহার মুখের হাসি অসময়ে শুকাইয়া গেল। দিন দেখান হইতেছে, তাহাকে শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইবে। পরিপূর্ণ বিদ্যুৎ বুকে চাপিয়া বর্ষার ঘনকৃষ্ণ মেঘখণ্ড যেমন অবরুদ্ধ গৌরবের গুরুভারে স্থির হইয়া কিছুক্ষণ আকাশের গায়ে নিঃশেষ বর্ষণোন্মুখ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, তেমনি স্থির হইয়া একদিন অপর্ণা শুনিল যে সেই দেখান দিন আজ আসিয়াছে। সে পিতার নিকট গিয়া কহিল, "বাবা, আমি ঠাকুর সেবার যেসব বন্দোবস্ত করিয়া গেলাম তাহার যেন অন্যথা না হয়।" বৃদ্ধ পিতা কাঁদিয়া ফেলিলেন—"তাই ত মা!—না, অন্যথা কিছুই হবে না।" অপর্ণা নিঃশব্দে চলিয়া আসিল। তাহার মা নাই, সে কাঁদিতে পারিল না; বৃদ্ধ পিতার দু' চোক ভরা জল, সে রাগ করিবে কি করিয়া? তাহার পর যোদ্ধা যেমন করিয়া তাহার ব্যথিত ক্রন্দনোন্মুখ বীরহৃদয় পৌরুষ-শুষ্ক হাসিতে চাপা দিয়া তাড়াতাড়ি অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক চলিয়া যায়, তেমনি করিয়া অপর্ণা শিবিকারোহণে গ্রাম ত্যাগ করিয়া অজানা কর্ত্তব্যের শাসন মাথা পাতিয়া লইয়া চলিয়া গেল। নিজের উচ্ছ্বসিত অশ্রু মুছিতে গিয়া তাহার মনে পড়িল—পিতার অশ্রু মুছাইয়া আসা হয় নাই। তাহার নিজের হৃদয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্রমাগত তাহার কাছে যেন কত নালিশ করিতে লাগিল। একে তাহার হৃদয় শত ব্যথায় বিদ্ধ, তাহার পর কোথায় কোন্ গ্রামান্তের মন্দির হইতে যখন সন্ধ্যার শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, তখন সেই আজন্ম পরিচিত আরতির আহ্বান শব্দ তাহার কানের ভিতর দিয়া মর্মে নৈরাশ্যের হাহাকার বহন করিয়া আনিল। ছট্‌ফট্ করিয়া অপর্ণা শিবিকার দ্বার উন্মোচন করিয়া ফেলিল, এবং সন্ধ্যার অন্ধকারের ভিতর দিয়া দেখিতে লাগিল, ছায়ানিবিড় একটা উচ্চ দেবদারু শিখায় একটা পরিচিত মন্দিরের কম্পিত সমুন্নত চূড়া দেখিয়া, সে উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া উঠিল। তাহার শ্বশুর বাটীর একজন দাসী পিছনেই চলিয়া আসিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া কহিল, "ছি বৌমা, অমন কোরে কি কাঁদিতে আছে মা, শ্বশুর ঘর কে না করে?" অপর্ণা দুই হাতে মুখ চাপিয়া রোদন নিবারণ করিয়া পাল্‌কির কবাট বন্ধ করিয়া দিল।

ঠিক সেই সময়টীতেই মন্দিরের ভিতর দাঁড়াইয়া পিতা রাজনারায়ণ মদনমোহন ঠাকুরের পার্শ্বে ধূপ-ধূনার ধূমে ও চক্ষুজ্বলে অস্পষ্ট একখানি দেবীমূর্তির অনিন্দসুন্দর মুখে প্রিয়তমা দুহিতার মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

৬

অপর্ণা স্বামী গৃহে। সেথায় তাহার ইচ্ছাহীন স্বামী সম্ভাষণের ভিতর এতটুকু আবেগ, এতটুকু চাঞ্চল্যও প্রকাশ পাইল না। প্রথম প্রণয়ের স্নিগ্ধ সঙ্কোচ, মিলনের সলজ্জ উত্তেজনা, কিছুই তাহার ম্লান চক্ষুদুটীর পূর্ব্ব দীপ্তি ফিরাইয়া আনিল না। প্রথম হইতেই

স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই যেন পরস্পরের কাছে কোন দুর্বোধ অপরাধে অপরাধী হইয়া রহিল ; এবং তাহারই ক্ষুব্ধবেদনা কূলপ্লাবিনী উচ্ছ্বসিতা তটিনীর ন্যায় একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নির্ম্মাণ করিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল।

একদিন অনেক রাত্রে, অমরনাথ ধীরে ধীরে ডাকিয়া কহিল, "অপর্ণা, তোমার এখানে থাকিতে কি ভাল লাগে না ?" অপর্ণা জাগিয়াছিল, বলিল, "না।"

অমর। বাপের বাড়ী যাইবে ?

অপর্ণা। যাইব।

অমর। কাল যাইতে চাও ?

অপর্ণা। "চাই", ক্ষুব্ধ অমরনাথ জবাব শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আর, যদি যাওয়া না হয় ?" অপর্ণা কহিল, "তা'হলে যেমন আছি তেমনি থাকিব।" আবার কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করিয়া থাকিল ; অমরনাথ ডাকিল, "অপর্ণা !" অপর্ণা অন্যমনস্কভাবে বলিল, "কি !"

"আমাকে কি তোমার কোন প্রয়োজন নাই ?" অপর্ণা গায়ের কাপড় চোপড় সর্বাঙ্গে বেশ করিয়া টানিয়া দিয়া সচ্ছন্দে শুইয়া বলিল, "ওসব কথায় বড় ঝগড়া হয়, ও সব বলিও না।"

"ঝগড়া হয়—কি কবিয়া জানিলে ?"

"জানি, আমাদের বাপের বাড়ীতে মেজ দাদা ও মেজ বউ—এই লইয়া নিত্য কলহ করে। আমার ঝগড়া কলহ ভাল লাগে না।" শুনিয়া অমরনাথ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। অন্ধকারে হাতড়াইয়া সে যেন এই কথাটাই এতদিন খুঁজিতে ছিল, হঠাৎ আজ যেন তাহা হাতে ঠেকিল, বলিযা উঠিল,—"এস অপর্ণা আমরাও ঝগড়া কবি। এমন করিয়া থাকার চেযে ঝগড়া কলহ ঢের ভাল।" অপর্ণা স্থিরভাবে কহিল, "ছি, ঝগড়া কেন করিতে যাইব ? তুমি ঘুমাও।"

তাহার পর অপর্ণা ঘুমাইল কি জাগিয়া রহিল, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিয়াও অমরনাথ বুঝিতে পারিল না।

প্রত্যূষে উঠিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত দিন অপর্ণার কাজকর্মে ও জপতপে কাটিয়া যায়, এতটুকু রঙ্গরস বা কৌতুকের মধ্যে সে প্রবেশ করে না, দেখিয়া তাহার সমবয়সীরা বিদ্রূপ করিযা কত কি বলে, ননদেরা 'গোঁসাই ঠাকুর' বলিয়া পরিহাস করে, তথাপি সে দলে মিশিতে পারে না ; কেবলি তাহার মনে হইতে লাগিল, দিনগুলা মিছা কাটিয়া যাইতেছে। আর এই যে অলক্ষ্য আকর্ষণে তাহার প্রতি শোনিত-বিন্দু, সেই পিতৃপ্রতিষ্ঠিত মন্দিব অভিমুখে ছুটিয়া যাইবার জন্য পূর্ণিমার উদ্বেলিত সিন্ধুবারির মত হৃদয়ের কূলে উপকূলে অহরহ আছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার সংযম কিসে হইবে ? ঘরকন্নার কাজে, না ছোটখাট হাস্য পরিহাসে ? ক্ষুব্ধ অসুস্থ চিত্ত তাহার এই যে বিপুল ভ্রান্তি মাথায় করিয়া আপনা-আপনি পাক খাইয়া মরিতেছে, তাহার নিকট স্বামীর আদর ও স্নেহ, পরিজনবর্গের প্রীতি-সম্ভাষণ ঘেঁসিবে কি করিয়া ? কি করিয়া সে বুঝিবে, যে, কুমারীর দেবসেবা দ্বাবা নারীত্বের কর্তব্যের সবটুকু পরিসর পরিপূর্ণ করা যায় না।

৭

অমরনাথের বুঝিবার ভুল,—সে উপহার লইয়া স্ত্রীর কাছে আসিয়াছে। বেলা তখন ন'টা

দশ'টা। স্নানান্তে অপর্ণা পূজা করিতে যাইতেছিল। গলার স্বর, যতটা সম্ভব মধুর করিয়া অমর কহিল, "অপর্ণা, তোমার জন্য কিছু উপহার আনিয়াছি ; দয়া করিয়া লইবে কি ?" অপর্ণা হাসিয়া বলিল—"লইব বৈকি !" অমরনাথ আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। আনন্দে সৌখীন রুমালে বাঁধা একটা সৌখীন বাক্সের ডালা খুলিতে বসিল। ডালার উপরে অপর্ণার নাম সোনার জলে লেখা। এখন একবার সে অপর্ণার মুখখানি দেখিবার জন্য তাহার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু দেখিল, মানুষে কাচের নকল চোখ পরিয়া যেমন করিয়া চাহে, তেমনি করিয়া অপর্ণা তাহার পানে চাহিয়া আছে। দেখিয়া তাহার সমস্ত উৎসাহ এক নিমিষে নিবিয়া গিয়া যেন অর্থহীন একফোঁটা শুষ্ক হাসির মাঝে আপনাকে লুকাইয়া ফেলিতে চাহিল। লজ্জায় মরিয়া গিয়াও সে বাক্সের ডালা খুলিয়া গোটা কতক কুন্তলীনের শিশি, আরো কি কি বাহিব করিতে উদ্যত হইলে, অপর্ণা বাধা দিয়া কহিল, "উহাই কি আমাব জন্য এনেছ ?" অমরনাথের হইয়া আর কে যেন জবাব দিল,—"হাঁ, তোমার জন্যই আনিয়াছি। দেলখোসগুলো—" ; অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "বাক্সটাও কি আমাকে দিলে ?"

"নিশ্চয়ই।"

"তবে আব কেন মিছা সব বাহির করিবে বাক্সতেই থাক।" "তা থাক্। তুমি ব্যবহার করিবে তো ?" অকস্মাৎ অপর্ণা ভ্রূ কুঞ্চিত কবিল। সমস্ত দুনিয়ার সহিত লড়াই করিয়া তাহার ক্ষত বিক্ষত হৃদয় পরাস্ত হইয়া বৈরাগ্য গ্রহণপূর্বক নিভৃতে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, সহসা তাহার গায়ে এই স্নেহের অনুরোধ কুৎসিত বিদ্রূপের আঘাত করিল ; চঞ্চল হইয়া সে তৎক্ষণাৎ প্রতিঘাত করিল ; বলিল, "নষ্ট হইবে না, রাখিয়া দাও। আমি ছাড়া আরও অনেকে ব্যবহার কবিতে জানে।" এবং উত্তবের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া অপর্ণা পূজাব ঘবে গিয়া প্রবেশ কবিল। আব অমবনাথ,—বিহ্বলেব মত সেই প্রত্যাখ্যাত উপহারের উপর হস্ত রাখিযা সেইভাবেই বসিয়া রহিল। প্রথমে সে সহস্রবার মনে মনে আপনাকে নির্বোধ বলিয়া তিবস্কাব করিল। বহুক্ষণ পরে সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিযা বলিল—"অপর্ণা পাষাণী", তাহাব চোখ জলে ভরিয়া আসিল—সেইখানে বসিয়া, একভাবে ক্রমাগত চক্ষু মুছিতে লাগিল। অপর্ণা তাহাকে যদি সুস্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিত, তাহা হইলে কথাটা অন্যরূপ হইতে পারিত। সে যে প্রত্যাখ্যান না করিয়াও প্রত্যাখ্যানের সবটুকু জ্বালা তাহার গায়ে মাখাইয়া দিয়া গিয়াছে, ইহার প্রতিকার সে কি কয়িয়া করিবে ? অপর্ণাকে তাহার পূজার আসন হইতে টানিয়া আনিয়া, তাহারই সম্মুখে তাহার উপেক্ষিত উপহারটা নিজেই লাথি মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, এবং সর্বসমক্ষে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিবে যে সে মুখ আর দেখিবে না ? সে কি করিবে, কত কি বলিবে, কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া যাইবে ; হয় ত, ছাই মাখিয়া সন্ন্যাসী হইবে, হয় তো অপর্ণার কোন দারুণ দুর্দিনেব দিনে অকস্মাৎ কোথাও হইতে আসিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে। এমনি সম্ভব ও অসম্ভব কত রকম উত্তর প্রত্যুত্তর, বাদ প্রতিবাদ তাহার অপমানপীড়িত মস্তিষ্কের ভিতর অধীরতার সৃষ্টি করিতে লাগিল। ফলে কিন্তু সে তেমনি বসিয়া রহিল, এবং তেমনি কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তাহার এই আগাগোড়া বিশৃঙ্খল সংকল্পের সুদীর্ঘ তালিকা সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল না।

৮

তাহার পর দুই দিন দুই রাত্রি গত হইয়াছে, অমরনাথ ঘরে শুইতে আসে নাই। মা জানিতে পারিয়া বধূকে ডাকিয়া ঈষৎ র্ভৎসনা কবিলে, পুত্রকে ডাকাইয়া বুঝাইয়া বলিলেন ;

দিদি শাশুড়ি এই সূত্রে একটু রঙ্গ করিয়া লইলেন। এমনি সাতে পাঁচে ব্যাপারটা লঘু হইয়া গেল। রাত্রে অপর্ণা স্বামীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল, বলিল, "যদি মনে কষ্ট দিয়া থাকি ত আমাকে ক্ষমা কর।" অমরনাথ কথা কহিতে পারিল না। শয্যার এক প্রান্তে বসিয়া, বিছানার চাদর বারবার টানিয়া পরিষ্কার করিতে লাগিল। সম্মুখেই অপর্ণা দাঁড়াইয়া, মুখে তাহার ম্লান হাসি, সে আবার কহিল, "ক্ষমা করিবে না?"

অমরনাথ মুখ নিচু করিয়াই বলিল, "ক্ষমা কিসের জন্য? ক্ষমা করিবাব অধিকারই বা আমার কি?" অপর্ণা স্বামীর দুই হাত আপনার হাতের ভিতর লইয়া বলিল, "ও কথা বলিও না। তুমি স্বামী, তুমি রাগ করিয়া থাকিলে কি আমার চলে? তুমি ক্ষমা না করিলে আমি দাঁড়াইব কোথায়? কেন রাগ করিয়াছ, বল।" অমরনাথ আর্দ্র হইয়া কহিল, "রাগ ত করি নাই।"

"কর নাই ত?"

"না।" অপর্ণা কলহ ভালবাসিত না; বিশ্বাস না করিয়াও বিশ্বাস করিল। কহিল, "তাই ভাল।" তাহার পর নিতান্ত নির্ভাবনায় বিছানাব এক প্রান্তে শুইয়া পড়িল।

অমরনাথ কিন্তু ভারি আশ্চর্য হইয়া গেল। অন্যদিকে মুখ ফিবাইয়া কেবলই সে মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল যে, এ কথা তাহার স্ত্রী বিশ্বাস কবিল কি কবিয়া! সে যে দুদিন আসে নাই, দেখা করে নাই, তথাপি সে রাগ কবে নাই এটা কি বিশ্বাস কবিবার কথা? এত কাণ্ড এত শীঘ্র মিটিয়া গিযা সব বৃথা হইয়া গেল? তাহাব পর যখন সে বুঝিতে পারিল অপর্ণা সত্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তখন সে একেবারে উঠিযা বসিল, এবং দ্বিধাশূন্য হইয়া জোর করিয়া ডাকিয়া ফেলিল,—"অপর্ণা তুমি বুঝি ঘুমাইতেছ?—ও অপর্ণা!'

অপর্ণা জাগিয়া উঠিল, বলিল, "ডাকিতেছ?"

"হাঁ—কাল আমি কলিকাতায় যাইব।"

"কৈ, সে কথা তো আগে শুনি নাই! এত শীঘ্র তোমার কলেজের ছুটী ফুরাইল? আরো দু'দিন থাকিতে পার না?"

"না, আর থাকা হয় না।" অপর্ণা একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়া যাইতেছ?" ইহা যে সত্য কথা অমরনাথ তাহা জানিত, কিন্তু সে কথা সে স্বীকার করিতে পারিল না। সঙ্কোচ আসিয়া তাহার যেন কোঁচার খুঁট ধরিয়া টানিয়া ফিরাইল। আশঙ্কা হইল পাছে সে আপনার অপদার্থতা প্রতিপন্ন করিয়া অপর্ণার সম্ভ্রম হানি করিয়া বসে;—এমনি করিয়া এই কৌতূহলবিমুখ নারীর নিশ্চেষ্টতা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, স্বামীত্বেব যেটুকু তেজ সে তাহার স্বাভাবিক অধিকার হইতে গ্রহণ করিয়াছিল, সে সবটুকু এই চাব পাঁচ মাস ধরিয়া দিনে দিনে অপর্ণা আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে, এখন সে ক্রোধ প্রকাশ করিবে কোন সাহসে? অপর্ণা আবার বলিল, "রাগ কবিয়া কোথাও যাইয়ো না। তাহা হইলে আমার মনে বড় ব্যথা লাগিবে।" অমরনাথ মিথ্যা ও সত্যে যাহা বানাইয়া বলিতে পারিল তাহার অর্থ এই যে, সে রাগ করে নাই, এবং তাহারই প্রমাণস্বরূপ সে আরো দুইদিন থাকিয়া যাইবে। থাকিলও তাই। কিন্তু কাঁদিয়া জয়ী হইবার একটা লজ্জাজনক অস্বস্তি লইয়াই বাড়ীতে থাকিল।

৯

ঝাড়া বৃষ্টির একটা সুবিধা আছে,—তাহাতে আকাশ নির্মল হয়।কিন্তু টিপিটিপি বৃষ্টিতে

মেঘ কাটে না, শুধু পায়ের নীচে কাদা ও চতুর্দিকে নিরানন্দময় ভাব গড়িয়া উঠে। বাড়ী হইতে যে কাদা মাখিয়া অমরনাথ কলিকাতায় আসিল, তাহা ধুইয়া ফেলিবার একটুখানি জলও সে এই বৃহৎ নগরীর ভিতর খুঁজিয়া পাইল না। এখানে তাহার পূর্বপরিচিত যে সব সুখ ছিল, তাহাদের কাছে এই পঙ্কিল পা দুখানি বাহির করিতেও তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। না লাগে লেখাপড়ায় মন, না পায় আমোদ আহ্লাদে তৃপ্তি। এখানেও থাকিতে ইচ্ছা করে না, বাড়ী যাইতেও প্রবৃত্তি নাই। সমস্ত বুকের উপর অঙ্গার যেন দুর্বহ যন্ত্রণাভার চাপানো রহিয়াছে, এবং তাহা ঠেলিয়া ফেলিবার জন্য ব্যাকুল বক্ষপঞ্জর পরস্পর ঠোকাঠুকি করিতেছে, কিন্তু বিফল চেষ্টা।

এমনি অন্তর্বেদনা লইয়া সে একদিন অসুখে পড়িল। সংবাদ পাইয়া পিতা-মাতা ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু অপর্ণাকে সঙ্গে আনিলেন না। অমরনাথও যে ঠিক এমনটি আশা করিয়াছিল তাহা নয়, তবু দমিয়া গেল। অসুখ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। এসময় স্বভাবতই তাহার অপর্ণাকে দেখিতে ইচ্ছা করিত, কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কথা বলিতে পারিল না, পিতামাতাও তাহা বুঝিলেন না। কেবল ঔষধ পথ্য আর ডাক্তার বৈদ্য। অবশেষে সে তাহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল—অমরনাথ একদিন প্রাণত্যাগ করিল।

বিধবা হইয়া অপর্ণা স্তম্ভিত হইয়া গেল। সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়া একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা তাহার মনে হইল, এ বুঝি তাহারই কামনার ফল! ইহাই বুঝি সে মনে মনে এতদিন চাহিতেছিল—অন্তর্যামী এতদিনে কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। বাহিরে শুনিতে পাইল যে তাহার বৃদ্ধ পিতা চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছেন। এ কি সব স্বপ্ন? তিনি আসিলেন কখন? অপর্ণা জানালা খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, সত্য সত্যই রাজনারায়ণ বাবু বালকের মত ধূলায় লুটিয়া কাঁদিতেছেন, পিতাব দেখাদেখি সেও ঘরের ভিতর লুটিযা পড়িল; অশ্রু-প্রবাহ মাটী ভিজাইয়া ফেলিল।

সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই; পিতা আসিয়া অপর্ণাকে বুকে তুলিয়া বলিলেন—"মা! অপর্ণা!" অপর্ণা কাঁদিয়া বলিল, "বাবা।"

"তোর মদন-মোহন যে তোকে মন্দিরে ডেকেছে মা!"

"চল বাবা যাই।"

"তোর যে সেখানে সব কাজ প'ড়ে আছে মা!"

"চল বাবা, বাড়ী যাই।"

"চল মা চল।" পিতা স্নেহে মস্তক চুম্বন করিলেন, বুক দিয়া সর্বদুঃখ মুছিয়া লইলেন, এবং তাহার পর কন্যার হাত ধরিয়া পরদিন বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া কহিলেন, "ওই মা তোমার মন্দিব! ওই তোমার মদন-মোহন!" নিরাভরণা অপর্ণার বৈধব্যবেশে তাহাকে আর একরকম দেখিতে হইল। যেন এই সাদা বস্ত্র ও রুক্ষ্ম কেশে তাহাকে অধিক মানাইল। সে তাহার পিতার কথা ভারি বিশ্বাস কবিল, ভাবিল দেবতার আহ্বানেই সে ফিরিয়া আসিয়াছে। ঠাকুরে মুখে যেন সেই হাসি, মন্দিরে যেন তাই শতগুণ সৌরভ! নিজে যেন সে এ পৃথিবীর অনেক উচ্চে এইরূপ মনে হইল।

যে স্বামী নিজের মবণ দিয়া তাহাকে পৃথিবীর এত উচ্চে রাখিয়া গিয়াছেন, সেই মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে শতবার প্রণাম করিয়া অপর্ণা তাঁহার অক্ষয় স্বর্গ কামনা করিল।

১০

শক্তিনাথ একমনে ঠাকুর গড়িতেছিল। পূজা করার চেয়ে, ঠাকুর তৈরি করিতে সে অধিক ভালবাসিত। কেমন রূপ, কেমন নাক, কান, চোখ হইবে, কোন্ রং বেশী মানাইবে, এই তাহার আলোচ্য বিষয়। কি দিয়া তাঁহার পূজা করিতে হয়, কি মন্ত্রে জপ করিতে হয়, এ সব ছোট বিষয়ে তাহার লক্ষ্য ছিল না। দেবতার সম্পর্কে সে আপনি প্রোমোশন দিয়া, সেবকের স্থান হইতে পিতার স্থানে উঠিয়া বসিয়াছিল। তবু, তাহার পিতা তাহাকে আদেশ করিলেন, "শক্তিনাথ, আজ আমার জ্বর বাড়িয়াছে, জমিদার বাটীতে গিয়া তুমি পূজা করিয়া এস," শক্তিনাথ বলিল, "এখন ঠাকুর গড়িতেছি—" বৃদ্ধ অসমর্থ পিতা রাগ করিয়া বলিলেন, "ছেলেখেলা এখন থাক বাবা, কাজ সেরে এস," পূজার মন্ত্র আবৃত্তি করিতে তাহার মোটে ইচ্ছা হইত না—তবু উঠিতে হইল। পিতার আদেশে স্নান করিয়া, চাদর ও গামছা কাঁধে ফেলিয়া দেব মন্দিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহার পূর্বেও সে কয়েকবার এ মন্দিরে পূজা করিতে আসিয়াছে কিন্তু এমন কাণ্ড কখন দেখে নাই। এত পুষ্পগন্ধ, এত ধূপ ধূনার আড়ম্বর, ভোজ্য ও নৈবেদ্যর এত বাহুল্য ! তার ভারি ভাবনা হইল এত লইয়া সে কি করিবে ? কিরূপে কাহার পূজা করিবে ? সকলের চেয়ে সে অপর্ণাকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। এ কে, কোথা হইতে আসিয়াছে, এতদিন কোথায় ছিল ? অপর্ণা কহিল, "তুমি কি ভট্টাচার্য মশা'য়ের ছেলে ?" শক্তিনাথ বলিল, "হ্যাঁ," "তবে, পা ধুইয়া পূজা করিতে ব'স।" পূজা করিতে বসিয়া শক্তিনাথ আগাগোড়া ভুলিয়া গেল। একটা মন্ত্রও তাহার মনে পড়ে না। সেদিকে তাহার মনও নাই। বিশ্বাসও নাই,—শুধু ভাবিতে লাগিল, "এ কে, কেন এত রূপ, কি জন্য বসিয়া আছে" ইত্যাদি। পূজার পদ্ধতি ওলটপালট হইতে লাগিল। কখনো ঘণ্টা বাজাইয়া, কখনো ফুল ফেলিয়া, কখনো নৈবেদ্যের উপর জল ছিটাইয়া এই অজ্ঞ নূতন পুরোহিতটী যে পূজার কেবল ভান করিতেছে মাত্র, বিজ্ঞ পরীক্ষকের মত পিছনে বসিয়া অপর্ণা সব বুঝিল। চিরদিন দেখিয়া দেখিয়া এসব সে ভাল করিয়াই জানে, শক্তিনাথ তাহাকে ফাঁকি দিবে কি করিয়া ? পূজাবসানে, কঠিন স্বরে অপর্ণা কহিল, "তুমি বামুনেব ছেলে, অথচ পূজা করিতে জান না !" শক্তিনাথ বলিল, "জানি।" "ছাই জান !" শক্তিনাথ বিহ্বলের মত একবার তাহার মুখপানে চাহিল, তাহার পর চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। অপর্ণা ডাকিয়া ফিরাইল, বলিল, "ঠাকুর, এসব বাঁধিয়া লইয়া যাও—কিন্তু কাল আর আসিয়ো না। তোমার পিতা আরোগ্য হইলে তিনি আসিবেন।" অপর্ণা নিজেই তাহার চাদর ও গামছায় সমস্ত বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে বিদায় করিল। মন্দিরের বাহিরে আসিয়া শক্তিনাথ বার বার শিহরিয়া উঠিল।

এদিকে অপর্ণা নূতন করিয়া পূজার আয়োজন করিয়া অন্য ব্রাহ্মণ ডাকিয়া পূজা শেষ করিল।

১১

এক মাস গত হইয়াছে। আচার্য যদুনাথ, জমিদার রাজনারায়ণ বাবুকে বুঝাইয়া বলিতেছেন—"আপনি ত সমস্তই জানেন ; বড় মন্দিরের এই বৃহৎ পূজা মধু ভট্টাচার্যের ছেলেটার দ্বারা কিছুতেই সম্পন্ন হইতে পারে না।" রাজনারায়ণ বাবু সায় দিয়া বলিলেন, "অনেক দিন হইল অপর্ণাও ঠিক এই কথাই বলিয়াছিল।" আচার্য্য মুখমণ্ডল আরো গম্ভীর

করিয়া কহিলেন, "তা ত হবেই। তিনি হ'লেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপা। তাঁর কি কিছু আগোচর আছে!" জমিদার বাবুরও ঠিক এই বিশ্বাস! আচার্য কহিতে লাগিলেন, "পূজা আমিই করি আর যেই করুন, ভাল লোক চাই! মধু ভট্টাচার্য যতদিন বাঁচিয়াছিলেন তিনিই পূজা করিয়াছিলেন, এখন তাঁহার পুত্রেরই পৌরোহিত্য করা উচিত, কিন্তু সেটা ত মানুষ নয়! কেবল পট আঁকিতে পারে, পুতুল গড়িতে জানে, পূজার্অর্চনার কিছুই জানে না।" রাজনারায়ণ বাবু অনুমতি দিলেন, "পূজা আপনি করিবেন, তবে অপর্ণাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব।" পিতার নিকট একথা শুনিয়া অপর্ণা মাথা নাড়িল, বলিল, "তাও কি হয়? বামুনের ছেলে নিরাশ্রয়, কোথায় তাহাকে বিদায় করিব? যেমন জানে তেমনিই পূজা করিবে। ঠাকুর তাতেই সন্তুষ্ট হইবেন।" কন্যার কথায় পিতার চৈতন্য হইল; "এতটা আমি ভাবিয়া দেখি নাই। মা, তোমার মন্দির, তোমার পূজা, তোমার যা ইচ্ছা তাই করিয়ো, যাহাকে ইচ্ছা ভার দিয়ো।" এই কথা বলিয়া পিতা প্রস্থান করিলেন। অপর্ণা শক্তিনাথকে ডাকিযা আনিয়া পূজার ভার দিল। বকুনি খাইয়া অবধি সে আর এ দিকে আসে নাই, মধ্যে তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে; সে নিজেও রুগ্ন। শুষ্ক মুখে তাহার শোক-দুঃখের চিহ্ন দেখিয়া অপর্ণার মায়া হইল, কহিল, "তুমি পূজা করিয়ো; যাহা জান তাই করিযো, তাতেই ঠাকুরেব তৃপ্তি হইবেন।" এমন স্নেহের স্বর শুনিয়া তাহার সাহস হইল, সাবধান হইযা মন দিয়া পূজা কবিতে বসিল। পূজা শেষ হইলে অপর্ণা নিজের হাতে, সে যাহা খাইতে পারে বাঁধিয়া দিয়া বলিল, "বেশ পূজা করিয়াছ। বামনঠকুব, তুমি কি নিজের হাতে রাঁধিয়া খাও!"

"কোন দিন রাঁধি, কোন দিন, যে দিন জ্বব হয়, সে দিন আব রাঁধিতে পারি না।"

"তোমাব কি কেউ নাই?"

"না।" শক্তিনাথ চলিয়া গেলে, অপর্ণা তাহার উদ্দেশে বলিল, "আহা!" দেবতার কাছে যুক্ত করে তাহার হইয়া প্রার্থনা করিল, "ঠাকুব, ইহার পূজায় তুমি সন্তুষ্ট হইয়, ছেলেমানুষেব দোষ অপরাধ লইও না।" সেই দিন হইতে প্রতিদিন অপর্ণা দাসী দ্বারা সংবাদ লইত, সে কি খায়, কি করে, কি তাহার প্রয়োজন। নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণ কুমারটিকে সে তাহার অজ্ঞাতসারে আশ্রয় দিয়া তাহার সমস্ত ভার স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লইল। এবং সেই দিন হইতে এই কিশোর ও কিশোরী, তাহাদের ভক্তি-স্নেহ ভুল-ভ্রান্তি সব এক করিয়া এই মন্দিরটিকে আশ্রয় পূর্বক জীবনের বাকি কাজগুলিকে পর করিয়া দিল। শক্তিনাথ পূজা করে, অপর্ণা দেখাইয়া দেয়। শক্তিনাথ স্তব পাঠ করে, অপর্ণা মনে মনে তাহার সহজ অর্থদেবতাকে বুঝাইয়া দেয়। শক্তিনাথ গন্ধ-পুষ্প হাত দিয়া তুলিয়া লয, অপর্ণা অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া বলে "বামন ঠাকুর আজ এমনি করিয়া সিংহাসন সাজাও দেখি, বেশ দেখাইবে।" এমনি করিয়া এই বৃহৎ মন্দিরের বৃহৎ কাজ চলিতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া আচার্য বলিলেন, "ছেলেখেলা হইতেছে।" বৃদ্ধ রাজনাবায়ণ বলিলেন, "যা কবিযা হোক মেয়েটা নিজের অবস্থা ভুলিয়া থাকিলেই বাঁচি।"

১২

থিয়েটারের ষ্টেজে যেমন পাহাড় পর্বত, ঝড় জল এক নিমিষে উড়িয়া গিয়া একটা মস্ত রাজপ্রাসাদ কোথা হইতে আসিয়া জোটে, আর লোকজনের, সুখসম্পদের মাঝে, দুঃখ দৈন্যের সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হয়; শক্তিনাথের জীবনেও যেন সেইরূপ হইয়াছে। সে

জাগিয়াছিল, এখন ঘুমাইয়া সুখস্বপ্ন দেখিতেছে, কিম্বা নিদ্রায় দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিল, এখন হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছে, প্রথমে তাহার তাহা ভাল ঠাহর হইত না। তথাপি. এই দায়িত্বহীন দেব-সেবার সুবর্ণ শৃঙ্খল যে তাহার সর্বাঙ্গ জড়াইয়া ধরিয়াছে, এবং থাকিয়া থাকিয়া ঝম্ ঝম্ শব্দে বাজিয়া উঠিতেছে, ঐ বিক্ষিপ্ত পুতুলগুলি মাঝে মাঝে সে কথা তাহাকে স্মরণ করাইত ; সে মৃত পিতার কথা মনে করিত, নিজের পূর্ব্ব স্বাধীনতার কথা ভাবিত , মনে হইত সে যেন বিকাইয়া গিয়াছে, অপর্ণা তাহাকে কিনিয়াছে। অমনি অপর্ণার স্নেহ ক্রমে মোহের মত তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

অকস্মাৎ একদিন শক্তিনাথের মামাত ভাই আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার ভগিনীর বিবাহ। মামা কলিকাতায় থাকেন, সময় ভাল, কাজেই সুখের দিনে ভাগিনেয়কে মনে পড়িয়াছে। যাইতে হইবে। কলিকাতা যাইতে হইবে কথাটা শক্তিনাথের খুব ভাল লাগিল ; সমস্ত রাত্রি সে দাদার নিকট বসিয়া কলিকাতার সুখের গল্প, শোভার কাহিনী, সমৃদ্ধির বিবরণ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। পরদিন, মন্দিরে যাইতে তাহার ইচ্ছা হইল না। বেলা বাড়িতেছে দেখিয়া অপর্ণা ডাকিয়া পাঠাইল ; শক্তিনাথ গিয়া বলিল, "আজ আমি কলিকাতায় যাইব—মামা ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।" বলিয়াই সে একটু সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইল। অপর্ণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে কহিল, "কবে ফিরিয়া আসিবে ?" শক্তিনাথ ভয়ে ভয়ে বলিল, "মামা আসিতে বলিলেই চলিয়া আসিব।" অপর্ণা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। আবার সেই যদু আচার্য আসিয়া পূজা করিতে বসিল। আবার তেমনি করিয়া অপর্ণা পূজা দেখিতে লাগিল, কিন্তু কোন কথা বলিবার আর তাহার প্রয়োজনও হইল না, ইচ্ছাও ছিল না।

কলিকাতায় আসিয়া বিবিধ বৈচিত্র্যে শক্তিনাথের বেশ দিন কাটিলেও কয়েকদিন পরেই বাড়ীর জন্য তাহার মন কেমন করিতে লাগিল। সুদীর্ঘ অলস দিনগুলা আর যেন কাটিতে চাহে না। রাত্রে সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, অপর্ণা যেন তাহাকে ক্রমাগত ডাকিতেছে, আর উত্তর না পাইয়া রাগ করিতেছে। একদিন সে মামাকে কহিল, "আমি বাড়ী যাইব।" মামা নিষেধ করিলেন, "সে জঙ্গলে গিয়া আর কি হইবে ? এইখানে থাকিয়া লেখাপড়া কর, আমি তোমার চাকরি করিয়া দিব।" শক্তিনাথ মাথা নাড়িয়া চুপ করিয়া রহিল। মামা কহিলেন. "তবে যাও।" বড় বৌ শক্তিনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঠাকুর পো, কাল বুঝি বাড়ী যাবে ?" শক্তিনাথ বলিল, "হাঁ, যাব।" "অপর্ণার জন্য মন কেমন কচ্ছে নাকি ?" শক্তিনাথ বলিল, "হাঁ।" "সে তোমাকে খুব যত্ন করে, নয় ?" শক্তিনাথ মাথা নাড়িয়া কহিল. "খুব যত্ন করে।" বড় বৌ মুখ টিপিয়া হাসিলেন ; তিনি অপর্ণার কথা পূর্ব্বেই শক্তিনাথের নিকট শুনিয়া লইয়াছিলেন, বলিলেন, "তবে ঠাকুরপো. এই দুটি জিনিস লইয়া যাও ; তাহাকে দিয়ো, সে আরো ভালবাসিবে।" বলিয়া তিনি একটা শিশির ছিপি খুলিয়া খানিকটা 'দেলখোস' শক্তিনাথের গায়ে ছড়াইয়া দিলেন। গন্ধে শক্তিনাথ পুলকিত হইয়া শিশি দুটি চাদরে বাঁধিয়া লইয়া পরদিন বাটী ফিরিয়া আসিল।

১৩

শক্তিনাথ মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে, পূজা শেষ হইয়াছে। চাদরে, সেই শিশি দুটি বাঁধা আছে—কিন্তু দিতে সাহস হইতেছে না,—এই কয়দিনে অপর্ণা তাহার নিকট হইতে এতই দূরে সরিয়া গিয়াছে। মুখ ফুটিয়া কিছুতে বলিতে পারিল না "তোমার জন্য সাধ করিয়া

কলিকাতা হইতে ইহা আনিয়াছি। সুগন্ধে তোমার দেবতা তৃপ্ত হন, তাই তুমিও হইবে।" এইভাবে সাত আট দিন কাটিল ; নিত্য সে চাদরে বাঁধিয়া শিশিদুটি লইয়া আসে, নিত্য ফিরাইয়া লইয়া যায়, আবার যত্ন করিয়া পরদিনের জন্য তুলিয়া রাখে। পূর্ব্বের মত একদিনও যদি অপর্ণা তাহাকে ডাকিয়া একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলে হয়ত সে তাহাকে তাহা দিয়া ফেলিত, কিন্তু এ সুযোগ আর কিছুতেই হইল না। আজ দুই দিন হইতে আবার জ্বর হইতেছে, তবু ভয়ে ভয়ে সে মন্দিরে পূজা করিতে আসে। কি একটা অজানা আশঙ্কায় সে পীড়ার কথাটাও বলিতে পারে না। অপর্ণা কিন্তু সম্বাদ লইয়া জানিল. যে দুইদিন হইতে শক্তিনাথ কিছুই খায় নাই, অথচ পূজা করিতে আসিতেছে ! অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, তুমি দুইদিন হ'তে কিছু খাও নাই কেন ?" শক্তিনাথ শুষ্ক মুখে কহিল, "আমার রাত্রে রোজ জ্বর হয়।"

"জ্বর হয় ? তবে স্নান করিয়া পূজা করিতে এস কেন ? একথা বল নাই কেন ?" শক্তিনাথের চোখে জল আসিল, মুহূর্তে সব কথা ভুলিয়া গিয়া সে চাদর খুলিয়া শিশি দুইটি বাহির করিয়া বলিল, "তোমার জন্য এনেছি।"

"আমার জন্য ?"

"হাঁ—তুমি গন্ধ ভালবাস না ?"—উষ্ণ দুধ যেমন একটুখানি তাপ পাইবামাত্র টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠে, অপর্ণার সর্বাঙ্গেব রক্ত তেমনি করিয়া ফুটিয়া উঠিল ;—শিশি দুইটি দেখিয়াই সে চিনিয়াছিল ; গম্ভীর স্বরে বলিল, "দাও—" হাতে লইয়াই অপর্ণা, মন্দিরের বাহিরে যেখানে পূজা করা ফুল শুকাইয়া পডিযাছিল,—সেই খানে শিশি দুটি নিক্ষেপ করিল ! আতঙ্কে শক্তিনাথের বুকের রক্ত জমাট বাঁধিয়া গেল। কঠিন স্বরে অপর্ণা কহিল, "বামুন ঠাকুর, তোমার মনে মনে এত। আর তুমি আমাব সামনে এসো না, মন্দিবের ছায়াও মাড়িয়ো না।" অপর্ণা চম্পকাঙ্গুলি দিয়া বহির্দেশ দেখাইযা বলিল, "যাও—"

আজ তিনদিন হইল শক্তিনাথ গিয়াছে। আবার যদু আচার্য পূজা কবিতে বসিয়াছেন, আবার ম্লান মুখে অপর্ণা চাহিয়া দেখিতেছে, এ যেন কাহার পূজা কে আসিয়া শেষ করিতেছে। পূজা সাঙ্গ করিয় নৈবেদ্যের রাশি গামছায় বাঁধিতে বাঁধিতে আচার্য মহাশয় নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ছেলেটা বিনা চিকিৎসায় মারা গেল।" আচার্যের মুখপানে চাহিয়া অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "কে মারা গেল !"

"তুমি বুঝি শোন নাই ? কয়দিনের জ্বরে শক্তিনাথ, ঐ মধু ভট্টাচার্যেব ছেলে, আজ সকাল বেলা মারা পড়িয়াছে।" অপর্ণা তবু তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল। আচার্য দ্বারের বাহিবে আসিয়া বলিলেন, "পাপের ফলে আজকাল অকাল মৃত্যু হইতেছে,—দেবতার সঙ্গে কি তামাসা চলে মা।"

আচার্য চলিয়া গেলেন। অপর্ণা দ্বার রুদ্ধ করিয়া মাটীতে মাথা ঠুকিযা কাঁদিতে লাগিল ; সহস্রবার কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—"ঠাকুর এ কাহাব পাপে ?"

বহুক্ষণ পরে সে উঠিযা বসিল , চোখ মুছিয়া সে সেই শুষ্ক ফুলের ভিতর হইতে স্নেহের দান মাথায় করিয়া তুলিয়া লইল। মন্দিরের ভিতর আবার প্রবেশ করিয়া দেবতার পায়ের কাছে তাহা নামাইয়া দিয়া কাঁদিয়া কহিল, "ঠাকুর, আমি যাহা লইতে পারি নাই—তাহা তুমি লও। নিজের হাতে আমি কখন তোমাব পূজা করি নাই, আজ করিতেছি.—তুমি গ্রহণ কর, তৃপ্ত হও, আমার অন্য কামনা নাই।"

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

স্মৃতি-চিহ্ন

১

দারুণ ম্যালেরিয়া রোগে যখন কাত্যায়নীর শ্বশুর, দেবর, স্বামী, ও পুত্র-কন্যা সকলেই একে একে ভবসংসারের বন্ধন কাটাইয়া চলিয়া গেলেন, এবং বিষয় সম্পত্তিও সেই সঙ্গে পরহস্তগত হইয়া পড়িল, তখন একমাত্র শিশুপুত্র নরেশ ও পর-প্রত্যাশা ভিন্ন আর কোনই সম্বল রহিল না। রঘুপুরের মিত্র বংশ চিরদিন বিদ্যাগৌরবের জন্য বিখ্যাত ; নরেশের পিতা ও পিতামহ উভয়েই দেশ-বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। সেই বংশের একমাত্র বংশধর নরেশ যে মূর্খ হইয়া থাকিবে, একথা মনে করিতেও কাত্যায়নীর কষ্টবোধ হইত, কিন্তু চারিদিকে চাহিয়া তিনি কোনই উপায় দেখিতে পাইলেন না।

রঘুপুরের জমিদার চৌধুরী মহাশয়কে সকলে অতি সদাশয় বলিত, কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি একটু কোপন স্বভাব বলিয়াও তাহার একটা অখ্যাতি ছিল। কাত্যায়নী মনে করিলেন, চৌধুরী মহাশয়ের একটু কৃপাদৃষ্টি হইলেই নরেশ 'মানুষ' হইতে পারে। কিন্তু জমিদার মহাশয় ১০/১৫ বৎসর হইতে ম্যালেরিয়ার উৎপাতে স্বগ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক কলিকাতায় গিয়া সপরিবারে বসবাস করিতেছিলেন, বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র পূজার সময় তিনি বাড়ী আসিতেন। তাঁহার ভদ্রাসনে মহাসমারোহে দুর্গোৎসব হইত, তিন দিন গ্রামের কাহাকেও অভুক্ত থাকিতে হইত না। সেবার অষ্টমীর রাত্রে সন্ধিপূজা শেষ হইলে স্ত্রীলোকেরা যখন দেবী প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিবেন, ঠিক সেই সময়টিতে কাত্যায়নী জমিদার গৃহিণীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "বৌ, আজ মায়ের সম্মুখে আমাকে একটি ভিক্ষা দাও, তোমার অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হইবে।" জমিদার পত্নী বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, "কি ভিক্ষা, ঠাকুরঝি ?" কাত্যায়নী ছেলের হাত ধরিয়া তাহাকে তাঁহার কোলের কাছে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "আমার নরুকে তোমার হাতে দিলাম, ছেলে যা'তে মূর্খ না হয় তোমাকে তাই করতে হবে।" জমিদার পত্নী বিধবা কায়স্থ কন্যার এই কাতর প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিতে পারিলেন না, তিনি স্বামীর সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার সময় নরেশকেও সঙ্গে লইয়া চলিলেন, কলিকাতায় গিয়া নরেশ স্বচ্ছন্দে থাকিয়া কি কায়ক্লেশে দিনপাত করিয়া বিদ্যা উপার্জন করিয়া ছিল তাহা জানা যায় নাই, তবে একথা সকলেই জানিল যে নরেশ যখন প্রবেশিকা-সাগর সন্তরণে পার হইয়া পুরস্কার স্বরূপ দশ টাকা বৃত্তি লাভ করিল, তখন রায়গঞ্জের রামকান্ত বসু স্বয়ং উপযাচক হইয়া তাহাকে তাঁহার পরমাসুন্দরী কন্যাদানে সমুৎসুক হইলেন ; নরেশকে দেখিয়া তাঁহার এতই মনে ধরিয়াছিল যে, গরীবের ঘর বলিয়া অধিকাংশ আত্মীয় আপত্তি করিলেও তিনি তাহতে কর্ণপাত করিলেন না।

২

'রায়গঞ্জের রামকান্ত বসু' এই নামটা সে অঞ্চলে কে না জানিত ? বসুজা মহাশয় স্বনামধন্য পুরুষ, কিন্তু তাঁহার "পিতৃনামে মধ্যম" পঞ্চ-সন্তানের মধ্যে হেমাঙ্গিনী তাঁহার একমাত্র কন্যা ও শৈশবে মাতৃহীনা বলিয়া অত্যন্ত আদরণীয়া। তিনি সর্বদা বলিতেন "মা আমার যেমন লক্ষ্মী তেমনি আমি নারায়ণ আনিয়া জামাতা করিব।" এই জন্য, নরেশচন্দ্র

তাঁহার মনোনীত হইলে তিনি কাহারও কথা না শুনিয়া তাহাকেই কন্যা হেমাঙ্গিনীকে সম্প্রদান করিলেন। কেহ কথা প্রসঙ্গে নরেশের দারিদ্রের কথা উল্লেখ করিলে তিনি বলিতেন, "যে মানুষ হয়, সে কি তার স্ত্রী পুত্রেব ভরণপোষণ করিতে পারে না ? আমি মানুষ চাই, ধন সম্পত্তি থাক বা না থাক, তাহা দেখিতে চাহি না।"

পবীক্ষা দিয়া নরেশ বাড়ী আসিলে বসু মহাশয় জামাতা লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন। নরেশ শ্বশুরবাড়ী যাইবাব সময় মা বলিলেন, "বাবা, আসিবার সময় বৌমাকেও সঙ্গে নিয়ে এসো।" নরেশ হাসিয়া বলিল "এখন না মা, আরও দু'বছর পরে।" কাত্যায়নী অভিমান করিয়া বলিলেন, "ও কি অনাছিষ্টি কথা তোর ?"—কোন উত্তব না দিয়া নরেশ হাসিতে লাগিল।

হেমাঙ্গিনীর দুটি বৌদিদি স্বামীর সঙ্গে বিদেশে থাকেন, আব দুইজন বাটীতে থাকেন, তাঁরা বড একটা ননদের খোঁজে লন না। চুলের পারিপাট্য, নভেল, দিবানিদ্রা ও উলকাটা লইয়াই তাঁহাদের সমস্ত সময় কাটিয়া যায়, কোলের ছেলের খোঁজ লইতেই সময পান না। এখন বার বছবে মেয়েরা যেমন চালাক চতুব হয়, হেম তেমন হয় নাই, বেশভূষা করা কাহাকে বলে তাহা সে জানিতই না, তবু সেই কাল কাল কেশগুচ্ছ কপালে, মুখে, চোখে ও পিঠে পড়িয়া তাহাকে যেমন মানাইত এমনটি বোধ হয় আর কিছুতেই হইত না। নরেশ প্রথমে তাহাকে দেখিয়া ভাবিলেন, এ যেন একখানি র‍্যাফেলের ছবি। দ্বিতীয়বার দেখিয়া মনে করিলেন, এমন সুন্দব ও এত কোমল বুঝি জগতে আব কিছু নাই। লোকে নবেশকে দেখিয়া বলিল "বসুজা যথার্থই লক্ষ্মী নারায়ণ মিলাইযাছেন।" নরেশ কলিকাতা হইতে হেমাঙ্গিনীর জন্য এক শিশি কুন্তলীন ও এক শিশি দেলখোস, আর দুইখানি পুস্তক, শিশুরামাযণ এবং গৃহলক্ষ্মী লইয়া গিয়াছিলেন। শিশির গায়ে কাগজে লেখা "শ্রীমতি হেমাঙ্গিনীর জন্য," বইয়ের উপরে হেমাঙ্গিনীর নামটা মুক্তার মত অক্ষরে ঝক্ ঝক্ কবিতেছে। কিন্তু হেম তো পডিতে জানে না, কি হবে ? প্রথমভাগ অসমাপ্ত বাখিয়াই যে তাহাব বিদ্যালাভ সমাপ্ত হইয়াছে, একথা সে লজ্জায় নরেশকে বলিতেও পারে না, না বলিয়াও চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। অবশেষে কোথা হইতে একখানা দ্বিতীয়ভাগ যোগাড় হইল ; ছুটির সময় নরেশের একটা মাষ্টারি জুটিয়া গেল।

যেদিন নরেশের পরীক্ষার ফল বাহির হইল, সেদিন কি আনন্দের দিন। নবেশ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ২৫্ টাকা বৃত্তি পাইয়াছেন। বসু মহাশয় মহাসমারোহে কালীর বাড়ী পূজা পাঠাইলেন, আনন্দে তাঁহাব সমস্ত বাত্রি ঘুম হইল না। সে বাত্রে নরেশ, হেমাঙ্গিনীব আনন্দে পরিপ্লুত, ও আনন্দ প্রকাশ হইবাব ভয়ে লজ্জায় আরক্তিম মুখখানি চুম্বন করিয়া বলিলেন, "হেম, আমি পাশ হয়েছি, তুমি আমাকে কি পুরস্কাব দিবে বল।"

হেম মাটীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি আবার কি দেব ?"

"আমি যেমন পাশ হয়ে বৃত্তি পেয়েছি, তোমাকে তেমনি গৃহলক্ষ্মী পড়ে গৃহলক্ষ্মী হতে হবে।"

ইহার দুই মাস পবে একদিন কলিকাতা হইতে খবর আসিল, নরেশ কলেরা রোগে ইহলোক পবিত্যাগ করিযাছেন। এই সংবাদ শুনিয়া বসু মহাশয় শয্যায় শয়ন করিলেন, আর তিনি সে শয্যা হইতে উঠিলেন না ; পনের দিনের দিন সংসার হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। শুনা যায়, মৃত্যুব পূর্বদিন তিনি কি উইল করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্রেরা তাহা লোক সমাজে প্রকাশ হইতে দেন নাই।

৩

তখন খুব ভোব, 'পূর্বদিক কেবল লাল হইয়া উঠিয়াছে মাত্র। গাছ, পাতা, ঘাস সমস্ত শিশিরে আর্দ্র, কিন্তু কুয়াসা তেমন বেশী নাই। ছিন্ন লেপের ভিতর হইতে বাহির হইযা শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে হেমাঙ্গিনী তাহার শ্বাশুড়ীকে ডাকিল, "মা।"

একবার আহ্বানে শ্বাশুড়ীর ঘুম ভাঙ্গিল না। হেমাঙ্গিনী আবার ডাকিল, "মা, ওঠ, বেলা হয়ে গেল, ডাল ধুঁতে ঘাটে যাবে না? বড়ি দেওয়া হবে কখন?"

শ্বাশুড়ীর এইবার ঘুম ভাঙ্গিল। নিদ্রাবিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "এত ভোরেই উঠেছিস্ পাগলীর ঝি? বড় শীত, আয় আর একটু লেপের ভিতর শুয়ে থাক।"

বউ বলিল, "মা যেন কি! ঘুমোলে আর কিছু জ্ঞান থাকে না। দত্তদেব বাড়ী থেকে যে পাঁচ সের ডাল এনেছ বড়ি দিতে, তাকি ভুলে গিয়েছ নাকি? ধুঁতে বাঁটতে কত বেলা হবে বল দেখি? বড়ি দেওয়া হবে কখন? এই বডিগুলো তুলে দিলে পাঁচ আনা পয়সা পাওয়া যাবে, তবে আমাদের তেল নুন কেনা হবে, ঘরে একটুও যে নাই।"

বউয়ের কথা শুনিয়া শ্বাশুড়ীর নিদ্রা সম্পূর্ণরূপে দূর হইল। বার কতক এপাশ ওপাশ করিয়া হাই তুলিলেন, তারপর তুড়ি দিতে দিতে ও অনুচ্চস্বরে প্রাতঃস্মরণ করিতে করিতে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। বউ ইতিমধ্যে দুয়ারেব আগড় খুলিয়া ফেলিল; ঘরে আলো দেখিয়া কাত্যায়নী বলিলেন, "তাইত, সকাল হ'য়ে গিয়েছে যে!"

দুই ধারে ঝোপ ও বেতের বন, তাহাব ভিতর দিয়া নদীর পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে, দুইজনে ডালেব ধামা লইয়া সেই পথে চলিলেন। তখন দুই একজন লোক উঠিয়াছে। মাঠে খেজুরগাছ হইতে রস পাড়িবাব জন্য চাষীরা কেহ গাছের উপর উঠিয়াছে, কেহবা ভাঁড় হাতে নিচে দাঁড়াইয়া আছে। নরেশের মা অন্যমনস্কভাবে এদিক ওদিক চাহিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছিলেন, হেমাঙ্গিনী বেলা হইবার আশঙ্কায় আগেই চলিয়াছে; এমন সময় "ওগো, মাগো!" এই চিৎকার শব্দ তাঁহার কর্ণে গেল;—তাহার পর আর কোন শব্দ নাই।

চিৎকার শুনিয়া নবেশেব মা, "ওগো দেখ কি হোল" বলিয়া ছুটিয়া গেলেন, মাঠে যাহারা ছিল তাহারাও দৌড়িয়া গেল। একটু গিয়াই সকলে দেখিতে পাইল, ঘাটের উপব হেমাঙ্গিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া পডিয়া আছে, ধামাব ডাল চারিদিকে ছড়াইয়া পডিয়াছে।

বধূকে এই অবস্থায় দেখিয়া শ্বাশুডী ললাটে কবাঘাত করিযা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "আঃ অভাগীর ঝি! তোর কপালে এত দুঃখও ছিল! এত লোক মরে, তোর কেন মবণ হয না, তা হলে যে আমি নিশ্চিন্ত হই! দেশে কি মানুষ নেই রে, নিত্য নিত্য এই রকম অত্যাচার? গরীবের উপর এত অত্যাচার ধর্ম্মে সহবে না।"

৪

"দিদি শুনেছ? আজ সকালে নরেশের বৌকে ঘাটে একলা পেয়ে কে ধরতে এসেছিল, তাই সে ভয় পেয়ে মূর্চ্ছা গিযেছিল। ওদের হ'ল কি? সে দিন রাত্রে বেড়া কেটে কে ঘরে ঢুকেছিল, রোজ নাকি রাত্রে ওদের বাড়ী ঢিল গোহাড় পড়ে, এর মানে কি? বৌটাকে ভূতে টুতে পায়নি তো?"

"তুইও যেমন ক্ষেপী, তাই ওসব কথা শুনিস। নরেশের বৌর রীত চরিত্তির তো সবই জানিস্, তবে আর ন্যাকাপনা কবিস্ কেন? কে আবার কোথায় বিধবা হয়ে গন্ধ তেল

মাখে ? আর যদি এত গরীব, তবে অত ল্যাভেণ্ডার অডিকলনের শিশি পায় কোথা থেকে ? ওদের কথা শুনিস্ কেন ? এত রাজ্যের লোক থাক্‌তে যত লোকে যায় ওদের বাড়ীর বেড়া কাট্‌তে। আমি যে দিন বৌটার কাছে গন্ধ তেলের শিশি দেখেছি, সেই দিন সকলকে বলেছি, ওর স্বভাব কখনো ভাল নয়।"

"সত্যি দিদি তাই বটে, আমিও তাই ভেবেছিলাম।"

"তাই না ত কি ? শ্বাশুড়ী মাগী আমাকে শুনিযে শুনিয়ে গাল দেয়, আমি যেন আর বুঝ্‌তে পারি না যে আমাকেই বল্‌ছে, ভুবো আমার সুবোধ ছেলে সাতেও নাই, পাঁচেও নাই, কেউ কোন দিন তার উঁচু নজরটি দেখেনি।"

"হ্যাঁ দিদি আবার দাদার কথা ও বলে, বেড়া কাটার রাত্রে নরেশের মা নাকি তাদের দুজনকেই চিন্তে পেরেছিল।"

"কি লো কার কথা হচ্ছে ?" বলিয়া রেবতী পিসি আসরে অবতীর্ণ হইলেন।

"ওই নরেশের বৌর কথা মেনি বল্‌ছিল।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া পিসি বলিলেন, "ধর ধর ললিতে, আর না পারি চলিতে !" কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গেই একটা হাসির রোল উঠিল।

অঘোবের মা পিছন হইতে বলিলেন, "দিদি ওদের কথা আর ব'লো না, যেমন শ্বাশুড়ী তার তেমনি বৌ হয়েছে।" চৌধুরীকে বল্লেন নরেশের মা, "আমার ছেলেকে পড়াতে শুনতে হবে। কর্তা অমনি তটস্থ। ওর কেনা গোলাম কিনা ? আর আমি এত পায়ে ধরে সাধ্‌লাম্, বাছার আমার কোন দোষ নাই, কেবল একটু গাছে চড়া, পাখী পাড়তে, আর একটু সাঁতার দিতে ভালবাসে, আর ইঁট পাটকেল ছুড়ে ঘাটের মেয়েদের কলসী ভাঙ্গে, তা কল্‌কেতায গাছও নেই পুকুরও নেই কলসী নিয়ে পুকুরে জল আনাও নেই। বাছার আমার কোন উৎপাৎ নেই, খেলা পেলে সমস্ত দিনে নাওয়া খাওয়া মনেই থাকে না ; কর্তা বল্লেন, ওর পড়াশুনো হবে না। আর পড়াশুনো হবে কেবল সেই হাড়হাবাতীর ছেলের ! যেমন অন্ধ্বারে চোখে দেখ্‌তে পেতেন না, তেম্‌নি হয়েছে।" বেবতী বলিলেন, "ওদের মুখ দেখ্‌লে প্রাচিত্তির কত্তে হয়, দত্তরা নিঘিন্নে, তাই ওদের হাতের জল খায়।"

৫

সেই দিন রাত্রে শ্বাশুড়ী বৌতে কথাবার্তা হইতেছিল। শ্বাশুড়ী বলিতেছিলেন, "কি করিব মা, উপায় তো ভেবে পাই না। দেশে এমন লোক নাই যে গরীবের মুখের দিকে চায়। সেই রাত্রির পর, দিন কতক কোন উৎপাৎ করে নাই, ভাবিলাম, বুঝি আপদেরা ক্ষান্ত হল, এখন দেখ্‌ছি, তা নয়। এ জলে কুমীর, ডেঙ্গায় বাঘ, যাই কোথা !"

হেমাঙ্গিনী কথা বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। অনেকক্ষণ পরে রুদ্ধস্বরে বলিল, "মা, আমি অনেক ভেবে দেখেছি, কিন্তু মরণ ছাড়া আর কোন উপায় দেখ্‌তে পাই না। মা, মরিলে হয় না ? তাহলে তো আর কোন যন্ত্রণাই থাকে না।" এই পর্যন্ত বলিয়া তাহার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল।

শ্বাশুড়ী বধূর কথায় চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন, তাড়াতাড়ি তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, তাহার পর বলিলেন, "ছি মা, অমন কথা কি বল্‌তে আছে ? আত্মঘাতী হওয়ার বাড়া আর পাপ নাই। ভগবান এত লোককে রক্ষা করছেন, আমাদের কি উপায় করবেন না ? চল, না হয় ঘরদুয়ার বিক্রি করে তোমাকে নিয়ে কাশী যাই।"

হেমাঙ্গিনী মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মা, আমি কাশী যাব না, বরং তুমি দাদাকে ভাল করে লিখে দেখ, তিনি যদি আমাকে নিয়ে যান।" শ্বাশুড়ী বলিলেন, "হাঁ ভাইরা সাত জন্মে খোঁজ নেয় না, সেইসব ভাই আবার নিয়ে যাবে। আর তোর সেই বোতল মোতল আজই দত্তপুকুরে টেনে ফেলে দেব, পাগলের মেয়ে আর কাকে বলে।" মনে মনে ভাবিলেন, "একখানা চিঠি লিখে একবার দেখাই যাক্।"

৬

সকালবেলায় হেমাঙ্গিনী দাওয়ায় খুঁটি হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া পূর্ব রাত্রে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহাই ভাবিতেছিল। স্বপ্নে সে নরেশকে দেখিয়াছিল, যেন তিনি তার মাথার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন ; সেই কাপড়, জামা, সেই কপালে লম্বা লম্বা চুল পড়িয়া কপালের আধখানা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, সেই হাসি হাসি চোখ, তেমনি সব, মাথায় হাত দিয়া তিনি যেন হেমের এলোমেলো চুলগুলি গুছাইয়া দিতে দিতে কত কথা বলিয়াছিলেন, সে সমস্ত কিছুই মনে পড়িতেছে না, তবু একটা সুবিমল তৃপ্তি ও সুগভীর আনন্দে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আজ যেন তার আর কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে না, কলরব পূর্ণ সংসারের ভাষা আর কর্ণে স্থান পাইতেছে না, চোখে যাহা দেখিতেছে কর্ণে যাহা শুনিতেছে সে সমস্তই যেন হিল্লোলের উপরে পত্ররাশির মত ঘুরিয়া ফিরিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, শুধু কোন দূর আকাশের পূর্ণচন্দ্র হিল্লোলে শতচন্দ্র হইয়া তাহার নয়ন সমক্ষে খেলা করিতেছে। নরেশ যে একদিন আদর করিয়া তাহার সিঁথিতে কুন্তলীন মাখাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, "সুগন্ধি যত মর্দন কর ততই যেমন তাহা হইতে অধিক সুঘ্রাণ বাহির হয়, তেমনি যত কষ্ট যন্ত্রণা তোমাকে নিপীড়ন করিবে ততই যেন তোমার স্বভাব আরও মনোহর হয়।" সে কথা তাহার মনে পড়িল। আর একদিন বলিয়াছিলেন, "ফুল যেমন সুন্দর, তেমনি যদি তার সুমিষ্ট গন্ধ থাকে তবেই সে যথার্থ সুন্দর হয়, হেম তুমিও ফুলের মত সুন্দর," এই পর্য্যন্ত বলিয়া হেমাঙ্গিনীর মাথায় হাত দিয়া বলিয়াছিলেন, "তেমনি সুমিষ্ট সৌরভ যেন তোমাতে হয়।" এমনি কত কথাই তাহার মনে পড়িয়া তাহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল, কত বেলা হইয়া গিয়াছে সে তার কিছুই জানিতে পারিল না। কুন্তলীনের ঘন সুরভিরাশির ন্যায় নরেশের স্মৃতি যেন তাহার সর্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া রহিল।

ডাকহরকরা আসিয়া পত্র দিয়া গেল। হেমাঙ্গিনীর দাদা লিখিয়াছেন, "তোমার সমস্ত বিবরণ আমরা পূর্বেই শুনিয়াছি। যাহার জন্য বংশে কলঙ্ক পড়িয়াছে তাহার সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। তোমার এখন মরণই মঙ্গল। আমরাও ভাবিব তুমি মরিয়া গিয়াছ।"

পত্র পড়িয়া হেমের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সে যে ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, প্রস্তর পুত্তলিকাব ন্যায় ঠিক সেই ভাবেই দাড়াইয়া রহিল।

শ্বাশুড়ী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌমা, অপূর্ব কি লিখেছে ?"

হেমাঙ্গিনী নীরব।

শ্বাশুড়ী ভীতা হইয়া বলিলেন, "সকলে ভাল আছে তো ?"

গৃহিণী চৌধুরী মহাশয়ের নিকটে গিয়া বলিলেন, "ও গো, নরেশের বৌ আর তার মা এসেছে।"

চৌধুরী মহাশয় চমকিত হইয়া বলিলেন, "নরেশের বৌ।—কলিকাতায় ? সে কি ? সে কেন আমার বাড়ীতে ?"

গিন্নী বলিলেন, "থাকবে বলে এসেছে।"

কর্তা মহা উগ্র হইয়া বলিলেন, "না, না, তা হবে না। আমার বাড়ীতে স্থান হবে না। এখনি বিদায় কর। গ্রামে কলঙ্ক রাখিবার স্থান নাই, আবার কলিকাতায় আসা হয়েছে !"

গিন্নী বলিলেন, "রাগ কর কেন ? আগে সব কথা শোন।" "তুমিই শোনগে, আমার কিছু শোন্‌বার দরকার নেই।" বলিয়া কর্তা চটিয়া উঠিয়া গেলেন।

গৃহিণী তাঁহার কন্যা কুমুদিনীকে ডাকিলেন। কুমুদিনীর বয়স চতুর্দশ, এক বৎসর হইল বিধবা হইয়াছে। মুখখানি যেন সন্ধ্যাবেলার পদ্মের মত, তেমনি সুন্দর, তেমনি মলিন।

গৃহিণী বলিলেন, "কুমুদ এ যে বিষম দায় হোল মা! কি করি বল দেখি ?"

কুমুদিনী বলিল, "মা ওরা দুদিন উপবাস করে এসেছে, এই মাত্র চারিটি ভাত মুখে দিয়ে শুয়েছে, আজ রাত্রে আর কিছু বোল না। বাবা যদি রাগ করেন, আমি ঘাড়ে দোষ নেব।"

"কর্তার রাগ তো জানিস্ নে। দেখি ঘুমিয়েছে কিনা।" বলিয়া গৃহিণী পার্শ্বের কক্ষে গমন করিলেন।

একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া কুমুদিনীকে বলিলেন, "ওলো কুমুদ. দেখ্ দেখ্ কি ?"

কুমুদিনী অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতেছিল, মায়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কি ?"

"লোকে যা বলে তা তবে মিথ্যা নয় ? দেখ্ ছুঁড়ি ঘুমিয়েছে গায়ে হাত দিয়ে ডাক্‌তে গিয়ে দেখি বুকের কাপড়ে লুকানো কিসের শিশি ! আমি ছুঁড়িকে দেখে ভেবেছিলাম বুঝি ভাল, এসেছে থাক্ এখানে ; খাবে, অতুলের খোকাকে রাখ্‌বে। হাজার হোক নরেশ আমার ছেলের মত ছিল, তার বৌ, দেখে মায়া হয়েছিল। ওমা তা নয়, পেটের ভিতর হারামের ছুরি ! বিধবা হয়েছে এখনো গন্ধ তেলের সখ্ যায় নি, তাই বুকের কাপড়ের ভিতর লুকিয়ে এনেছে ! আমি বাপু ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি, এমন ডাইনি ঘরে রাখতে পারবো না।"

কুমুদিনী আলোর কাছে শিশি ধরিয়া বলিল, "দেখ মা, শিশির গায়ে কার হাতের লেখা ?"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার ?"

কুমুদিনী বলিল, "নরেশ দাদার !"

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে তাহার চোখ হইতে বড় বড় দুই ফোঁটা জল মাটীতে পড়িল ; গৃহিণীর চক্ষুও অশ্রুময় হইয়া উঠিল।

সরলাবালা দাসী

চিকিৎসকের গল্প

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমার চাকর আমার হাতে এক আর্‌জেন্ট টেলিগ্রাম দিল। খুলিয়া পড়িলাম "come as soon as possible. Nawab ill again." (যত শীঘ্র পার আইস। নবাবের পীড়া হইয়াছে।) পাটনার নবাবের আমি একজন চিকিৎসক। মাসে একবার দুবার নবাব সাহেবকে দেখিতে যাইতে হয়। তাঁহার রোগ 'কলিক্'। আমি তখন কলিকাতায় প্রেক্‌টিস করি। মফঃস্বলে যাইতে হইলে আমার বন্ধু নবীন ডাক্তারের নিকট দুই চার দিনের জন্য হাতের রোগীদের চিকিৎসার ভার দিয়া যাই। তখনি নবীনবাবুকে একখানা চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়া সেই রাত্রের মেলে পাটনা রওয়ানা হইলাম। দুই দিন অবধি নবাব সাহেবের পরিচর্যা ও চিকিৎসা করিলাম। তৃতীয় দিবসে কলিকাতায় রওয়ানা হইব ঠিক করিলাম, সকালবেলা পরিচিত বন্ধুগণের সহিত দেখা করিতে বাহির হইলাম। বাঁকিপুরের এসিস্‌টেন্ট সার্‌জন আমার সহপাঠী ছিলেন, পরথমেই তাঁহার সহিত দেখা করিতে চলিলাম। সাত পাঁচ কথার পর তিনি বলিলেন—"আমার হাতে এক মাস হইতে একজন রোগী আছে। অনেক যত্নে তাঁহাকে বাঁচাইয়াছি। টাইফয়েড় হইয়াছিল, এই ৭/৮ দিন জ্বর ছাড়িয়াছে। কিন্তু তাঁহার আশ্চর্য্য উন্নতি, প্রতিদিন যেন শরীরে বল ফিরিয়া আসিতেছে, এত তাড়াতাড়ি এ রকম সারিয়া উঠিতে আর কখনও দেখি নাই।"

"রোগী কে?"

"একজন বাঙ্গালী প্রফেসর, বিলাত ফেরতা, এখানকার কলেজে কাজ কবেন। তাঁহার নাম শ্রীপতিচরণ রায়। তাঁহার স্ত্রী ও একটি ছয় বৎসরের কন্যা আছে। মিসেস্ রায়ের ন্যায় বুদ্ধিমতী ধৈর্যশীলা রমণী অধিক দেখি নাই। এমন সুচারুরূপে সহিষ্ণুতার সহিত তিনি রোগীর শুশ্রূষা করিতেছেন! প্রায় রোজই সেখানে যাইতে হয "

"আজ যাবে?"

"হাঁ।"

"কখন?"

"এ বেলাই যেতে হবে।"

"যদি বেশী দেরী না থাকে ত আপত্তি না থাকিলে আমিও তোমার সঙ্গে যাইতে পারি। তোমার কথা শুনিয়া তোমার রোগীটিকে একবার দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

"বেশ ত, চল না। মাঝে একবার তোমাকে consultation (পরামর্শ) এর জন্য আনাইব মনে করিয়াছিলাম কিন্তু শেষে আর প্রয়োজন হয় নাই। চল, এখনি যাওয়া যাক্।"

আমরা হাঁটিয়া বাহির হইলাম। ইংরাজী টোলার পশ্চিম দিকে একটি ছোট বাংলাতে উপস্থিত হইলাম। বাড়ীর সম্মুখে সুন্দর ছোট বাগান, সেখানে দেখিলাম একটি ছয় সাত বৎসরের বালিকা খেলা করিতেছে। আমার বন্ধুকে দেখিবামাত্র বালিকা 'ডাক্তার বাবু, ডাক্তার বাবু' বলিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল। কি সুন্দর মুখখানি! এমন কমনীয় লাবণ্যমাখা মুখ অধিক দেখি নাই। বাতাসে মুখের চারিদিকে চুল আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার কালো কালো বড় চোখ দুটি হঠাৎ আমার উপর পড়িল, অমনি বালিকা গম্ভীর হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। "লীলা, বাবা আজ কেমন আছেন" বলিয়া আমার বন্ধু গৃহে প্রবেশ করিলেন। হলে মিসেস্ রায় আসিলেন ও তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হইল। তিনি সুন্দরী যুবতী কিন্তু মুখ মলিন ও দেহ কৃশ দেখিলেই মনে হয় অত্যন্ত

শান্ত   নম্র এবং ধীর প্রকৃতির রমণী। আমরা তিনজনে রোগীর শয্যার পার্শ্বে বসিলাম। রোগীর বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হইবে। দেখিতে গৌর বর্ণ মুখের গঠন সুন্দর, উন্নত ললাট। চেহারা দেখিলে বিশ্বাস হয় না যে টাইফয়েড্ জ্বর হইয়াছে; তিনি নিদ্রিত ছিলেন। মিসেস রায়ের সহিত দুচারিটা কথা বলিয়া রোগীর স্থান পরিবর্তনের ব্যবস্থা দিয়া চলিয়া আসিলাম।

এক মাস কাটিয়া গেল। বাঁকিপুরের এই ঘটনা ভুলিয়া গেলাম। কলিকাতায় তখন বসন্ত হইতেছে, আমি দিবারাত্রি ব্যস্ত, মুহূর্ত কাল অবসর নাই। এক দিন তিন চারি ঘণ্টা ঘুরিয়া বেলা দুপুরে বাড়ী ফিরিলাম। বাড়ীতে আসিবামাত্র চাকর আসিয়া বলিল যে একজন বাবু ও স্ত্রীলোক অনেকক্ষণ হইতে আসিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমি তাড়াতাড়ি হলে গিয়া দেখিলাম, বাঁকিপুরে এসিস্টেন্ট সারজন আমার বন্ধু বিনয়বাবু এবং একজন রমণী। হঠাৎ তাহাকে চিনিতে পারি নাই, কিন্তু তখনি চিনিলাম যে সেই রমণীটি বাঁকিপুরের সেই মিসেস্ রায়—শ্রীপতিচরণ রায়ের স্ত্রী। তাঁহার মলিন মুখে একটু উদ্বিগ্ন চিন্তিতভাব অঙ্কিত, বিনয়বাবু উঠিয়া আমাকে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "যোগেন্দ্র আজ এক বিশেষ কাজে তোমার কাছে এসেছি। আমার বেশী সময় নাই, সন্ধ্যার ট্রেনেই বাঁকিপুরের জন্য রওনা হইতে হইবে।"—এই বলিয়া বিনয়বাবু চুপ করিলেন।

"মিসেস্ রায়কে তোমার সঙ্গে দেখিতেছি। মিষ্টার রায় ও মেয়েটি ভাল আছেন ত?"

"হাঁ, মিষ্টার রায় শারীরিক ভাল আছেন, কিন্তু উঁহাদের বড় বিপদ হইয়াছে। এরকম কেস্ সচরাচর দেখা যায় না। আজ আমি মিষ্টার রায়ের কথাই তোমাকে বলিতে আসিয়াছি। এক মাস পূর্বে তোমার বোধ হয় মনে আছ যে তাঁহার টাইফয়েড্ ফিভার হইয়াছিল। তুমি তাঁহাকে দেখিবার পর তিনি ক্রমেই সবল ও সুস্থ হইতে লাগিলেন, এত শীঘ্র এরকম সারিয়া উঠিতে আর কখনও দেখি নাই। পরশু দিন অবধি তাঁহার এক ভয়ানক পরিবর্তন হইয়াছে," একটু থামিয়া আবার বিনয় বাবু বলিতে লাগিলেন, "তাঁহার জীবনের এই শেষ কুড়ি বৎসর স্মৃতি হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। কুড়ি বৎসর পূর্বে যেমন ছিলেন, যাহা ছিল, এখন তাহাই বর্ত্তমান বলিয়া ভ্রম হইতেছে; তাঁহার পত্নী ও কন্যাকে চিনিতে পারেন না, ও বিলাত যাইবার কথা কিছুই মনে নাই। কেহ কিছু বলিতে গেলে অত্যন্ত রাগিয়া ওঠেন। মিসেস্ রায়ের ও তাঁহার কন্যার এখন কিরূপ অবস্থা তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছ।"

আমি আশ্চর্য হইয়া এই অদ্ভুত কাহিনী শুনিতেছিলাম। মিসেস্ রায়ের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তিনি ফিরিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, বিনয় আবার বলিলেন,—"টাইফয়েডে তাঁহার মস্তিষ্ক অত্যন্ত দুর্বল হইয়া স্মৃতি শক্তির বিকৃতি ঘটিয়াছে। তিনি আবশ্যকমত বিশ্রাম না লইয়াই পড়াশুনায় প্রবৃত্ত হওয়াতেই সম্ভবত এইরূপ হইয়াছে। পরশু মিষ্টার ও মিসেস্ রায় কলিকাতায় আসেন। আমিও একটা কাজে সে দিন আসি। পরশু মিষ্টার রায় ও আমি সারাদিন দোকানে ও বাজারে ঘুরিয়াছি, সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরি, তখন পর্য্যন্ত তাহার স্বাভাবিক অবস্থা। তাহার পর একটা চিঠি আসিল, তাহাতে তাঁহার এক প্রিয় বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ পাইলেন, এই সংবাদ পাইয়াই যেন তাঁহার ভাবের পরিবর্তন দেখিলাম। প্রথমে উত্তেজিত ভাবে আমার কাছে সেই ব্যক্তির অনেক গল্প করিলেন। এক সঙ্গে দুজনে কলেজে পড়িতেন, তাঁহাদের মধ্যে সহোদরের ন্যায় ভালবাসা ছিল; তাহার পর দুজনে সেই বাড়ীতে দুদিন থাকিয়া একত্র বিলাত যাত্রা করিলেন; সেখানে পাঁচ বৎসর একত্র বাস করিয়া অধ্যয়ন করেন। এই রকম অনেকক্ষণ গল্প করিয়া তিনি হঠাৎ চুপ করিয়া একেলা বারান্ডায় গিয়া বসিলেন, নীরবে দুই তিন ঘণ্টা বসিয়া রহিলেন; অবশেষে আমি শয়ন করিতে গেলাম। মিসেস্ রায়ের কন্যার জ্বর হইয়াছিল, তিনি তাহাকে লইয়া ঘরে

ছিলেন। আজ সকালবেলা উঠিয়া দেখি এই বিপদ।"

"তোমারা কাহার বাড়ীতে আছ।"

"মিসেস্ রায়ের মামার বাড়ী। তিনি এখন সিমলা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়াছেন, বাড়ী খালি পড়িয়াছিল। মিসেস্ রায়ের নিকট পরে শুনিলাম যে বিলাত রওনা হইবার পূর্বে মিষ্টার রায়েরও সেই বন্ধু এই বাড়ীতে কয়েকদিন কাটান। তাঁহার পিতার সহিত মিসেস্ রায়ের মাতুলের বহুদিনের পরিচয়।"

"তোমার কি মনে হয়?"

"আমার মনে হয় যে মিষ্টার রায়ের টাইফয়েডের পর হইতে মস্তিষ্ক দুর্বল হইয়াছিল, তাহার মস্তিষ্কের বিশ্রাম দেন নাই, তাহাতে ক্রমে আরও দুর্বল হইয়াছিল। পরশু হঠাৎ বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া এইরূপ বিকার হইয়াছে।"

"আমারও ঠিক এইমত। কিন্তু এখন কি করা যায়?"

"আমি ত আর বিলম্ব করিতে পারি না। আজই যাইতে হইবে। মিসেস রায় এই বিপদের সময় একা, আত্মীয় কেহ নাই। তাঁহার এখন মানসিক কিরূপ অবস্থা তাহা সহজেই বুঝিতে পার। মিষ্টার রায়ের পিতা ঢাকায় থাকেন। আমি তোমার উপর ইঁহাদের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে যাইতে পারি। তুমি যাহা হয় করো। কিন্তু কি হয় তাহা জানিবার জন্য উদ্বিগ্ন থাকিব, আমাকে প্রত্যহ সংবাদ দিও। মিষ্টার রায় এখন সেই বাড়ীতেই আছেন। লোকে তাঁহাকে পাগল ভাবিবে ; কারণ, তিনি কুড়ি বৎসরের পূর্ব জীবনের এখন অভিনয় করিতেছেন। কলিকাতার দুই তিনজন বড ডাক্তারের সহিত চিকিৎসা করিলে কিছু হইতেও পারে বলিয়া আমার আশা আছে। এখন বিদায় হই।" এই বলিয়া বিনয় উঠিয়া গিয়া মিসেস্ রায়কে বলিলেন, "আপনি অধীর হইবেন না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার স্বামীর এই রোগ ক্ষণস্থায়ী এবং শীঘ্রই সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবার আশা আছে।" বিনয়বাবু চলিয়া গেলেন। তখন আমি মিসেস রায়ের নিকট গিয়া বলিলাম "আপনি সুস্থির হইয়া বসুন। আমি আপনার জন্য যথাসাধ্য করিব। কাল হইতে তাঁহার কিরূপ ব্যবহাব তাহা সবিশেষ জানিতে চাহি।"

তখন মিসেস্ রায বলিতে লাগিলেন,—"পরশু সারাদিন দোকানে ঘুরিয়া সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরিলেন ; কিছুক্ষণ পরে চিঠিখানা আসিল। মিষ্টার রায় একটা ঘরে শয়ন করেন, আমি ও লীলা আর এক ঘরে থাকি। লীলাব জ্বর হইয়াছিল, কিন্তু আহারের পর তিনি তার কোন খবর লইলেন না ; আমি মেয়ের কাছে ছিলাম, তাঁহার সহিত রাত্রে আর দেখা হইল না। সকালে উঠিয়াও যখন তিনি আমাদের নিকট আসিলেন না, তখন আমি তাঁহার ঘরে গেলাম। তিনি টেবিলের নিকট বসিয়া চিঠি লিখিতেছিলেন ; আমি কাছে গিয়া স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলাম, "লীলার আজ জ্বর নাই। তুমি কেমন আছ।" তিনি আমাকে দেখিয়াই আমার হাত ঝাড়িয়া ফেলিয়া উঠিয়া দূরে গিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আমার প্রতি সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। আমি আবার সেই কথা বলিলাম। তখন তিনি ভ্রূকুটি করিয়া অত্যন্ত বিরক্তির স্বরে বলিলেন,—'আপনাকে আমি চিনি না। অপরিচিত স্ত্রীলোক হইয়া এভাবে আমার ঘরে আসা আপনার নিশ্চয়ই সঙ্গত হয় নাই।'

"আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম, বলিলাম, এ আবার তোমার কি রকম নূতন ধরনের ঠাট্টা? লীলার জ্বর নাই, কুইনাইন দেবো কিনা জানতে চাই। আর মেয়েটা বাবা বাবা করে অস্থির হলো। ওকে একবার দেখতে চল।

"কিছুক্ষণ নিরব থাকিয়া তিনি বলিলেন,—'এত বেশ মজা! কোথা থেকে এক পাগলী এলো! এই দারোয়ান, দেখ ত স্ত্রীলোকটা কি চায়' বলিয়া উচ্চস্বরে দারোয়ানকে ডাকিলেন।

আমার যেন মাথা ঘুরিয়া উঠিল, আমি বাহির হইয়া গেলাম। যেন স্বপ্ন দেখিতে ছিলাম। একটু পরে দেখিলাম, দারোয়ানের হাতে একখানা ডাকের চিঠি দিয়া টুপী পরিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। চিঠির লেফাপাতে দেখিলাম, তাঁহার সে পরলোকগত বন্ধুর নাম ও ঠিকানা। বৈকালে মিষ্টার রায় বাড়ী ফিরিলেন। অমনি লীলা 'বাবা বাবা' বলিয়া নিকটে গিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল।

"'এ আবার কে?' বলিয়া সবিস্ময়ে তিনি সরিয়া দাঁড়াইতেই লীলার মুখ চূণ হইয়া গেল। আমাদের এই এক সন্তান, পিতার বড় আদুরে। তাঁহার এইরূপ ভাব দেখিয়া আমাকে আপনার লইয়া আসিতে বিনয়বাবুকে অনুরোধ করিলাম। আমার এখানে কেহ নাই। আমার স্বামীর কি হইয়াছে? তিনি কি ভাল পাগল হইলেন?'—বলিয়া মিসেস্ রায় নিকটস্থ চেয়ারে মাথায় হাত দিয়া বসিলেন; আমি বলিলাম, "আমার মত বিনয়বাবুকে তো বলিতে শুনিলেন, তাঁহার জীবনের কুড়ি বৎসর স্মৃতি হইতে মুছিয়া গিয়াছে। শুনিলাম, কুড়ি বৎসর পূর্বে বিলাত যাইবার সময় তিনি এই বাড়ীতেই কিছু দিন থাকেন, এবং এই বন্ধুর সহিত বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহার এখন সেই সময় পর্য্যন্ত কেবল মনে আছে, সুতবাং তাঁহার বিলাতের অবস্থিতির কাল এবং তাহাব পরে বিবাহ ইত্যাদি কিছুই মনে নাই; এই কারণে আপনাকে চিনিতে পারিতেছেন না। তাঁহাব পিতা জীবিত, তাঁহাকে এখনই আসিতে টেলিগ্রাম করিয়া দিতেছি। পিতাকে অবশ্যই চিনিবেন, অবিশ্বাসও করিবেন না। মিষ্টার রায় বিদ্বান, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত পুরুষ, তাঁহার পিতা তাঁহাকে সমুদায় বুঝাইয়া বলিলে সম্ভবত কিছু সুফল হইবে।"

আমি প্রথমে নবীন ডাক্তারকে দুই তিন দিনের জন্য আমাব রোগীদের ভাব লইতে লিখিলাম, তাহাব পর মিষ্টার রায়ের পিতাকে আসিতে আরজেন্ট টেলিগ্রাম করিলাম। অনন্তর মিসেস্ রায়কে লইয়া তাঁহার মামার বাড়ী গেলাম। বাড়ীতে পৌঁছিয়াই এক গণ্ডগোল শুনিতে পাইলাম। মিসেস্ রায় তাড়াতাড়ি আপন শযন কক্ষে কন্যাব নিকট গেলেন। আমি উপরে গিয়া দেখিলাম মিষ্টাব রায় একটা খোলা ট্রাঙ্কের (trunk) সম্মুখে দাঁড়াইয়া একজন বাঙ্গালি চাকরকে চেঁচাইয়া গালি দিতেছেন। ঘরে চতুর্দিকে কাপড ও জিনিস ছড়ান। তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না। চাকর বলিতেছে, "আজ্ঞে, এ জিনিসগুলি মাঠক্‌রুণের হইবে।"

"মা ঠাক্‌রুন! কি বলছিস?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ, মা ঠাক্‌রুণকে ডেকে আনবো?"

"দূর লক্ষ্মীছাড়া, কি বকিস্? একপাল পাগলের মধ্যে এসে পড়লাম না কি।" আমি নিকটে গিয়া পরিচিতের মত তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলাম; খানিকক্ষণ আমার প্রতি সবিস্ময়ে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "মহাশয় আপনার সহিত আমার পরিচয় নাই। আপনার ভুল হইয়াছে।"

"না আপনিই ভুলিয়া গিয়াছেন। এই যে সেদিন আপনি যখন শয্যাগত ছিলেন তখন আমি আপনাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। মিসেস রায় ও লীলা ভাল আছেন ত?" তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; হাসি আর থামে না। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মিসেস্ রায় বিলাত যাত্রা করিতে হইবে, একেবারেই সময় নাই, এখন এইসব গণ্ডগোল। আপনাদের সঙ্গে বাক্যব্যয়ের আমার আর সময় নাই" বলিয়া তিনি দ্রুতপদে বাহিবে যাইবার জন্য দ্বারের নিকট অগ্রসর হইলেন; আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলাম—

আপনি একবার আমার কথা শুনুন। এক মাস হইল বাঁকিপুবে আপনার টাইফয়েড্ হয়,

তখন আমি বাঁকিপুরে ছিলাম, এবং আমার বন্ধু বিনয়বাবুর সহিত একদিন আপনাকে দেখিতে যাই। বিনয়বাবু বাঁকিপুরের এসিসটেন্ট সারজন্ এবং আপনার পারিবারিক ডাক্তার। কাল তিনি আমার সহিত দেখা করিয়া বলিলেন যে, আপনার হঠাৎ স্মৃতিশক্তির বিলোপ ঘটিয়াছে, এবং জীবনের কয়েক বৎসরের কোন ঘটনা একবারেই স্মরণ নাই। আপনার পত্নী ও কন্যা এখানেই আছেন। আপনি কাল দোকানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেক জিনিস কিনিয়াছিলেন , ঐ দেখুন, এখনও টেবিলের উপর সেগুলি কাগজে মোড়া রহিয়াছে। আপনার কি সে কথা কিছুই মনে নাই ?"

মিষ্টার রায় প্রথমে বিরক্তি, পরে কৌতূহলের সহিত আমার কথা শুনিতেছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে সেই টেবিলের নিকটে গেলেন, আমিও তাঁহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি একে একে কাগজ খুলিয়া জিনিসগুলি তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। একখানা ক্রেপ সিল্কের সাড়ী উঠাইয়া বলিলেন, "এটা কি রকম রেশম, বোম্বাই সাড়ী ত নয়।"

"কাল আপনার স্ত্রীর জন্য আপনি এইসব কিনিয়াছিলেন।" একটা সুন্দর বাক্সতে দুই শিশি কুন্তলীন ও দুই শিশি এসেন্স দেলখোস ছিল তাহা তুলিয়া তাঁহার হাতে দিলাম . তিনি লেবেল পড়িলেন এইচ বোসেস দেলখোস।' "এ যে বাঙ্গালির তৈরি দেখছি। এদেশে আবার এমন সেণ্ট তৈরি হয় নাকি ? বাঃ বেশ ত করেছে" বলিয়া ছিপি খুলিয়া নাকে ধরিলেন। উহা রাখিয়া কুন্তলীনের শিশি দেখিলেন 'এ তেলটা ও বেশ পরিষ্কার। তাহা রাখিয়া কয়েক খানা বাঙলা বই একে একে তুলিয়া নাম পড়িলেন। তাহার পর একখানা ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্র লইয়া তাহাই পড়িতে লাগিলেন। প্রথমে তারিখ ও সন দেখিয়া দুই চারি লাইন পড়িয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া উহা ছুড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া বলিলেন "এসব আবার কি ?" মিষ্টার রায় হঠাৎ চিন্তিতভাবে অস্থির পদে ঘরে এদিক ওদিক পায়চারী করিতে লাগিলেন। তখন আমি বলিলাম, "আমি আপনার পিতাকে টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছি, তিনি কাল প্রাতঃকালে আসিবেন।' তিনি হঠাৎ দাঁড়াইলেন —তাহার পর বলিলেন "বাবা কাল আসিবেন ? তিনি যাহা বলিবেন তাহাই বিশ্বাস করিব, তিনি পাগলও নন মিথ্যাও বলিবেন না।' এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেলেন। আমি বহুক্ষণ সেই ঘরে বসিয়া চিন্তা করিলাম। বুঝিলাম মিষ্টার রায়ের পিতা না আসিলে কোন উপায়ই নাই ইতিমধ্যে আমি দু একজন ভাল চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে গেলাম। আমরা স্থির করিলাম যে মিষ্টার রায়ের মস্তিষ্কের উপরে এক স্থানে একটা অপারেসন করিলে উপকার হইতে পারে। তার পরদিন সিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে মিষ্টার রায়ের পিতা গোবিন্দ বাবুকে লইয়া আসিলাম, তিনি গৌরবর্ণ পুরুষ, বৃদ্ধ, মুখে শ্বেত শ্মশ্রু, দেখিলাম লোকটি ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন , ভয় ও উদ্বেগ তাঁহার মুখে ঘনাইয়া আসিয়াছে, আমি অবিলম্বে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। নীরবে স্তম্ভিতের ন্যায় সকল কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'ডাক্তারবাবু, যাহা শুনিলাম তাহাতে মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, আমার বৌমা ও লীলার জন্য প্রাণ অস্থির হইতেছে। আপনাদের হাতে শ্রীপতিকে দিলাম, যাহা ভাল হয় করিবেন, তাহার পর যাহা হইবার হয় হইবে। আপনি আমাকে এখন কি করিতে বলেন ?'

"আপনি আপনার পুত্রকে সকল কথা খুলিয়া বলুন ও যাহাতে তাঁহার সে কথা বিশ্বাস হয় তাহার চেষ্টা করুন, তিনি কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে আপনাকে জানিতেন আপনি তাঁহার পিতা, আপনার কথা তিনি বিশ্বাস করিবেন। আর তিনি বুদ্ধিমান, বুঝিবেন, তিনি মত না দিলে ত আর অপারেসন হইতে পারে না।"

"আচ্ছা তাহাই করিব।"

বেলা দুপুরে মিষ্টার রায় বাড়ী ফিরিলেন। পিতা ও পুত্র একটি কক্ষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া এক ঘণ্টা কথা কহিলেন। মিসেস্ রায় লীলা এবং আমি অন্য ঘরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এই দুদিনেই মিসেস্ রায়ের আকারে ঘোর পরিবর্তন হইয়াছে। হৃদয়ের যন্ত্রণা ও কষ্ট মুখে স্পষ্ট অঙ্কিত।

হঠাৎ মিষ্টার রায় ও গোবিন্দবাবু ঘরে প্রবেশ করিলেন। মিষ্টার রায় দ্রুতপদে আমার নিকট আসিয়া হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমাকে ক্ষমা করিবেন। পিতার নিকট এখন যাহা শুনিলাম, তাহাতে হতবুদ্ধি হইয়াছি। আমার পিতা পূজনীয়। পৃথিবীতে তাঁহার ন্যায় আর কাহাকেও শ্রদ্ধা ভক্তি বা বিশ্বাস করি না। তিনি যখন ইহা বলিতেছেন তখন অবশ্য সত্য হইবে, কিন্তু এই অবস্থায় আমি কি করি?"

তিনি ধীরে ধীরে মিসেস্ রায়ের নিকট গিয়া বলিলেন, "বাবা বলিতেছেন তুমি আমার পত্নী, এই সুন্দর বালিকা আমার কন্যা। যাহাতে তোমাদের মনে কষ্ট না দিই তাহারই প্রাণপণে চেষ্টা করিব।"

মিসেস্ রায় নীরবে নত মস্তকে বসিয়া রহিলেন। হায়, এই উনবিংশ শতাব্দীর শকুন্তলার জন্য অভিজ্ঞানাঙ্গুরীয় কোথায়? মিষ্টার রায় ব্যাকুল ভাবে অস্থিরপদে ঘুরিতে লাগিলেন। অবশেষে আমার সম্মুখে আসিয়া কম্পিত কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ডাক্তারবাবু কি করিলে এই বিস্মৃতি কয় বৎসরে স্মৃতি ফিরিয়া পাইব? জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশেব কথাই ভুলিয়া গিয়াছি। আমি বিলাত গিয়া পাস করিয়াছি, এখানে প্রফেসারের কার্য করিতেছি, বিবাহ করিয়াছি—এসব যেন উপকথা বা স্বপ্ন মনে হইতেছে। আমার মত এরকম শোচনীয় অবস্থা কি আর কাহারও হইয়াছে? আমার অর্দ্ধেক জীবন কাটিয়া গেল, তথাপি কিছুই মনে নাই! আমি এখন কোন কার্য্যের উপযুক্ত নহি—অর্থ উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা নাই। আমার পত্নী ও সন্তান আছে তাহাদের চিনি না,—ভালবাসি না। আমি যদি এই শেষ কয়েক বৎসরের স্মৃতি ফিরাইয়া না পাই, তবে কিরূপে জীবনধারণ করিব? বাবার নিকট শুনিলাম, একটা কঠিন অপাররেসন্ করিলে ইহার উপায় হইবার সম্ভাবনা আছে। আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই। অপারেসনটা যদি নির্বিঘ্নে শেষ হয় তবে জীবন সার্থক হইবে। যদি কোন বিপদ হয়,—হউক—এরকম জীবন লইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল!"

আমি বলিলাম, "তবে অপারেসন্ করা হউক্। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সুফল হইবে।"

"ডাক্তার বাবু, আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই, কালই অপারেসন্ করুন।"

"আচ্ছা" বলিয়া আমি বিদায় লইলাম। সেদিনই বৈকালে সমুদায় যোগাড় করিলাম। পরদিন দুপুরে আরও দুইজন চিকিৎসক ও একজন ইংরাজ সার্জনের সাহায্যে মিষ্টার রায়কে ক্লোরোফর্ম দ্বারা অজ্ঞান করাইয়া অপারেসন্ করিলাম। আমি নীরবে উদ্বিগ্নচিত্তে শয্যা পার্শ্বে বসিয়া রহিলাম। সন্ধ্যাবেলা রোগী চক্ষু মেলিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ বাহিরে গিয়া লীলার হাত ধরিয়া বলিলাম, "লীলা, বাবার কাছে এসো।" বালিকা তাহার বিস্ময় বিস্ফারিত দুটি বড় বড় চোখ আমার মুখের উপর রাখিল, তাহার পর আমার সহিত চলিল ও পিতার শয্যার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। লীলার পিতা চারিদিকে একবার শূন্যদৃষ্টিতে চাহিলেন, তাহার পর হঠাৎ লীলাকে দেখিয়াই তাঁহার দৃষ্টিবিভ্রম কাটিয়া গেল, তিনি প্রিয়তমা কন্যাকে কাছে টানিয়া লইয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "কি লীলা! তোমার মা কোথায়! ডেকে আন ত?" আমি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম;

বুঝিলাম, শ্রীপতিচরণ বাবুর জীবন হইতে বিস্মৃতির সুবিস্তীর্ণ ব্যবধান দূর হইয়াছে ; আমাদের অপারেসন্ সফল হইয়াছে।

স্নেহলতা সেন

সার্থক

মাতৃহীন বালক অনাথ যখন ১০ বৎসর বয়ঃক্রমে সংসারের একমাত্র আশ্রয়স্থল পিতাকেও হারাইল, তখন সে সত্যই অনাথ হইয়া পড়িল।

অনাথের পিতা মৃত্যুশয্যায় তাঁহার উকিল বন্ধু প্রিয়নাথকে বলিলেন, "ভাই, আমার বড় হতভাগ্য সন্তান। সে জীবনে মায়ের আদর পায় নাই ; আমি আমার শুষ্ক হৃদয়ের স্নেহমমতায় তাঁহাকে এতদিন সজীব রাখিয়াছিলাম কিন্তু আমারও ডাক পড়িয়াছে। আজ অনাথকে তোমার হাতে সঁপিয়া চলিলাম। দেখো ভাই, তাহাকে তোমার পাঁচটির মধ্যে একটি মনে করিয়া একটু যত্ন করিও।"—তাঁর চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল।

এই মৃত্যুদৃশ্যটি বড় সকরুণ, বড় হৃদয়স্পর্শী ; সেই বিষাদভরা অন্তিম অনুরোধ প্রিয়নাথের প্রাণ স্পর্শ করিল। তিনি ভাবিলেন,—এমন পাত্রে যদি দয়া না করিব তবে মনুষ্য ও পশু জন্মে প্রভেদ কি ?—তিনি অনাথকে সঙ্গে করিয়া কর্মস্থলে লইয়া যাইতে মনস্থ করিলেন।

কিন্তু জগতে ধর্মেব পথ বড় কণ্টাবৃত, পুণ্যের সাধন একান্ত বিঘ্নসঙ্কুল। এখানে দানব দেবতাকে পরাভূত করিতে চায়। প্রিয়নাথের সাধু ইচ্ছার বিরুদ্ধে দানব আসিয়া দণ্ডযামান হইল।

প্রিয়নাথের স্ত্রী স্বামীকে বুঝাইলেন—"পরের ছেলে গলায পরা যত সহজ ভাবছ, তত সহজ নয়। তুমি প্রাণপনে যত্ন কর তবু লোকে বল্‌বে, পর। কোন বিপদ আপদ যদি ঘটে তবে লোকে আঙ্গুল দিয়ে আমাদেরই দেখিয়ে বল'বে—। হ্যাঁ ও পর বইত নয় : ওরা কি তার একটু যত্ন নিত। ছেলেটাকে অযত্নে মেরে ফেল্লে।' কাজ কি বাপু ডেকে বিপদ ঘরে আনা ? না হ'লে একটা ছেলের ভাত কাপড় দেওয়া এমন কিছু বেশী কথা ত নয়।"

প্রিয়নাথের প্রাণে তখনও মুমূর্ষুর অন্তিম মিনতি করুণ সুরে বাজিতেছিল। তিনি স্ত্রীব সৎপরামর্শের সৌন্দর্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। সুতরাং অবচীনেব মত বিপদকে ডাকিয়া গৃহে আনারই সংকল্প করিলেন।

২

একদিন ফাল্গুনের নাতিশীতোষ্ণ প্রভাতে প্রিয়নাথ সপরিবারে অনাথকে লইয়া কর্মস্থান অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দেখিতে দেখিতে প্রবাসে অনাথের ছয় মাস কাটিয়া গেল। প্রথম প্রথম সে হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিত। সহরে সৌধাবলীর দীপ্ত সৌন্দর্যেব মধ্যে সে তাহার জন্মপল্লীর জীর্ণ কুটীরের শান্ত শোভা স্মরণ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিত। অজ্ঞাতসারে তাহার হৃদয় পদ্মদীঘির বাঁধা ঘাটে, ঘোষেদের আমবাগানে, উঠানের শিউলি তলায় ঘুরিয়া বেড়াইত। নগরের বিলাস-খচিত সুবর্ণ-ঝলক পল্লীপথের ধূলিকণিকার নিকট হীনপ্রভ

বলিয়া বোধ হইত।—কিন্তু সময় মাঝে পড়িয়া অন্তরের সকল বিরোধ মিটাইয়া দেয়। কুঞ্চিত ললাটে শান্তির রেখা টানিতে, সময় সিদ্ধহস্ত।

অনাথ এখন স্কুলে পড়িতেছে ; তাহার অনেক বন্ধু জুটিয়াছে। প্রবাসের বেদনা তাহার হৃদয়ে অনেক পরিমাণে লঘু হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু এই প্রবাস দুঃখ অপনোদনের তাহার প্রধান সহায় ছিল প্রিয়বাবুর কন্যা সরলা।

সরলা তাহার শুভর শিশু হৃদয়ের সরল সৌন্দর্যে প্রিয়নাথের গৃহে স্নিগ্ধালোকে বিকীর্ণ করিয়া বিরাজিত ছিল। সে হাসিত—তাহার হাসির ধ্বনিটী মঙ্গল মধুর তানে আকাশে ধ্বনিত হইয়া উঠিত। সে যখন খেলা করিবার সময় গৃহ হইতে গৃহান্তরে ছুটিত, তখন তাহার চুলগুলি কেমন বাতাসে উড়িয়া উড়িয়া ঘামে জড়াইয়া মুখে আসিয়া পড়িত। কাপড়ের খুঁটটী কেমন মধুর ভাবে ধূলায় লটাইত,—পদশব্দে মৌন ভবন কেমন কোমল সোহাগে মুখরিত হইয়া উঠিত।

অনাথ স্কুল হইতে আসিলেই সে ছুটিয়া তাহার কাছে যাইত এবং নানারূপ প্রশ্নে ও কথার তরঙ্গে তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিত।

ক্রমে প্রবাসে অনাথের শুষ্ক দিনগুলি সরস হইয়া আসিল।

৩

কিন্তু সুখেব সঙ্গে দুঃখের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আলোকের পশ্চাতে অন্ধকার, রবির পশ্চাতে বাহু—জগতের সনাতন নীতি।

অনাথ প্রবাসে সুখের মুখ দেখিতে আরম্ভ কবিয়াছিল , কিন্তু তাহার অদৃষ্টাকাশের একটী অশুভ গ্রহ তাহার সর্বাঙ্গীন সুখকে খণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল।

প্রিয়নাথের স্ত্রী অতিশয় মুখরা ছিলেন। মৎস্যের বাজারেব অধিষ্ঠাত্রী দেবী যেন নিয়তই তাঁহার কণ্ঠাসনে বিরাজিত ছিলেন। আদর সোহাগের ভাষাও সেই দেবীর কৃপা দৃষ্টিপাতে যেন গালাগালিব আকার ধারণ করিয়া তাঁহার কণ্ঠ হইতে বহির্গত হইত।

তাঁহার হৃদয়খানিও তাঁহার মুখের উপযোগী ছিল। অনাথেব ভার গ্রহণ করেন এ ইচ্ছা কখনই তাঁহাব মনে স্থান পায় নাই। তবে এ বিষয়ে স্বামীকে কিছুতেই বশে আনিতে না পারিয়া অগত্যা তাঁহাকে স্বীকৃত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি উঠিতে বসিতে বিধিমতে অনাথকে নির্য্যাতিন করিতেন। দুঃখ আপনার অলৌকিক শিক্ষাগুণে শিশু অনাথকে প্রবীণ করিয়াছিল এবং তাহাবই শিক্ষায় অনাথ বুঝিয়াছিল—নিজে উপার্জন করিতে না পারা পর্যন্ত খাওয়া পরাব সুখ তাহার অদৃষ্টে নাই। সুতরাং প্রিয়নাথগৃহিণী যে অনাথকে খাওয়া পরার বিষয়ে কষ্ট দিতেন অনাথ তাহাকে কষ্ট বলিয়াই মনে করিত না, কারণ সে জন্য সে প্রস্তুত ছিল।

অনাথকে কেহ ভালবাসিলে গৃহিণীর তাহা সহ্য হইত না। "অমন অনেক ভাল দেখিয়াছি, শেষ রক্ষে হয় না গো—" বলিয়া তিনি মুখভঙ্গি করিতেন। অনাথ 'প্রাইজ' পাইয়া বাড়ীতে আসিলে বন্ধুরা তাহাকে খাওয়াইবার জন্য ধরিত। অনাথ ভাবিত, আজি মা থাকিলে আমি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করিয়া কত আমোদ করিতাম। কিন্তু এখন আমার কে আছে ? বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তায় একটু দেরি হইলে গৃহিণী বলিতেন,—"কি রে, আমোদ যে আর ধরে না ! বই আর কেউ তো কখন পায় না, এত বাড়াবাড়ি কিন্তু—". অনাথ মরমে মরিয়া যাইত।

গৃহিণীর আর একটী পুত্রসন্তান হইয়াছিল ; তিনি অনাথের উপব শিশুর সকল দায়িত্ব চাপাইয়া ছিলেন। যখন ছেলে কাঁদিত, তিনি আনাথের কাছে তাহাকে ফেলিয়া দিতেন। অনাথকে যে কোন উপায়েই হউক, তাহাকে চুপ করাইতে হইত, নতুবা বাক্যজ্বালায় তাহার রক্ষা থাকিত না।—"কেবল খাবার কুমীর, আমাদের যেন উনি রাজত্ব দেবেন, একটু উপকার হবার যো নেই ; কেবল এয়ারকি দিয়ে বেড়ালেই ভাত মেলে না।"—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

একদিন খোকা বিছানায ঘুমাইতেছিল। অনাথকে খোকার কাছে রাখিয়া গৃহিণী রৌদ্রে চেয়ারে বসিয়া উপন্যাস পড়িতেছিলেন। অনাথ আপনার পাঠ মুখস্থ করিতেছিল, ইত্যবসরে খোকা কখন উঠিয়া চৌকি হইতে নীচে পড়িয়া গেল এবং কাঁদিয়া উঠিল। অমনি কুপিতা সিংহী তর্জন গর্জনে বাড়ী প্রকম্পিত করিয়া অনাথকে নখরে ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন। সেদিনকার সে দৃশ্য বর্ণনা করিবাব আমার সাধ্য নাই। সেদিন শুধু অনাথ নহে. অনাথের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ পর্যন্ত গৃহিণীর নিকট পুষ্পাঞ্জলি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইযাছিলেন।

অনাথের সুখ-চন্দ্রমা কাল-রাহুরূপিনী এই গৃহিণী গ্রাস কবিয়া রাখিয়াছিল।

৪

এইরূপে দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। অনাথ এন্ট্রেন্স পরীক্ষা দিল। সকলেই বলিল, সে একটী বৃত্তি পাইবে।

কায়স্থের ঘরের মেয়ের বয়স যেন অতি শীঘ্র শীঘ্র বাডিযা চলে। সরলা বাব বৎসরে পদার্পণ কবিল।

প্রিয়নাথ স্বভাবতই মেয়ের বিবাহের কথা ভাবিতেন, পূর্ব হইতেই তিনি দু'এক জায়গায় চেষ্টাও করিতেছিলেন, কিন্তু ছেলেগুলি বেশ মনের মত না হওয়াতে কোথাও সম্বন্ধ স্থিরতর কবিতে পারেন নাই।

অনাথ যে ঘবে শুইত সেই ঘবে বাড়ীর চাকর বেহারিও শয়ন কবিত। একদিন বাত্রি দশটার সময় বেহারির পিঠে হঠাৎ একটা বেদনা ধরিল ; সে যন্ত্রণায কাতব হইয়া পড়িল। প্রিয়নাথ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কিছু কিছু জানিতেন। অনাথ তাঁহাকে সংবাদ দিতে গেল।

সে দরজার কাছে গিয়া শুনিল, কর্তা ও গৃহিণীতে খুব বচসা চলিতেছে। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত কবিলাম—

কর্তা। কেন অনাথ অপাত্র কিসে ? দেখতে শুনতে ভাল, স্বভাব ভাল, লেখাপড়ায ভাল, এর বেশী তুমি কি চাও ?

গৃহিণী। ছিঃ ছিঃ তোমাব গলায় দড়ি ! অনাথেব সঙ্গে যদি মেয়ের বিয়ে দিতে হয় তবে তোমার গলায় দড়ি দিয়ে মরাই ভাল। যার ত্রিসংসাবে কেউ নেই, চাল চুলো কিছু নেই,—তাকেই মেয়ে দেওয়া ? তাব চেয়ে সরলার গলায় পাথর বেঁধে জলে ডুবিয়ে মার না কেন—জান্‌ব যে সে মরে গেছে।

কর্তা। আচ্ছা, একটা চরিত্রহীন মাতালকে ধরে দিলেই কি মেয়ে সুখী হবে ? টাকাটাই কি সব ?

গৃহিণী। আচ্ছা, ঢের হয়েছে। তোমার বক্তৃতা শুনতে চাই না। ওই হাঘরে'টাকে মেয়ে

দিলে চারিদিকে ছিঃ ছিঃ পড়ে যাবে। আমি তো কারু কাছে মুখ দেখাতে পারব না।

কর্তা। তবে তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। আমি কিছু বলতে চাই না। তুমিই মেয়ের বিয়ে দিও।

অনাথ সেই রাত্রিতে যাহা শুনিল তাহা চিরজীবনের জন্য তাহার হৃদয়ে গাঁথা রহিল।

৫

অনাথ একটী ২০ টাকার বৃত্তি পাইয়া এফ, এ পড়িবার জন্য কলিকাতায় চলিয়া গেল। ভগবান দুঃখীর প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

শত মনোকষ্ট থাকা সত্ত্বেও যাইবার সময় অনাথ প্রাণে ব্যথা অনুভব করিল। অভ্যাসবশতঃ কয়েদীরও জেলখানা ছাড়িতে কষ্ট হয়।

কিন্তু প্রিয়নাথের গৃহ অনাথের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন কাবাগার ছিল না। সেই কারাগৃহের অন্ধকার একটী আলোকময়ী দেব-বালিকার জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত ছিল।

বিদায় মুহূর্তে অনাথ বুঝিল সরলা তাহার হৃদয়ে অলক্ষিতে কতটা স্থান অধিকার করিয়াছে। সে সময় তাহার বুকটা যেন অনেকখানি খালি বোধ হইল।

সরলার কি কিছুই হইল না? সরলা বালিকা, অন্তরের ব্যথা অন্তরে চাপিয়া রাখা স্ত্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। সরলার যাহা হইল, তাহা সে ভিতরেই রাখিল, বাহিরে কেহই জানিল না।

বাঙ্গলার জলবায়ুতে সে এখন আর বালিকা নহে—কিশোরী। বাঙ্গালীর ঘরে ১২ বৎসরের বালিকা অন্তরে অনেক পরিপুষ্ট হয়, সরলা অনাথকে ভালবাসিত,—সঙ্গ-লিপ্সু মানুষের মন যেমন সঙ্গীকে ভালবাসে, সেইরূপ ভালবাসা। কিন্তু অল্প দিন হইল সে বুঝিয়াছে যে এ ভালবাসা শুধু সঙ্গলিপ্সা নহে, তাহাতে আরও একটু কিছু জড়িত আছে।

তাহার বিবাহের কথা সে শুনিত না তাহা নহে। সম্প্রতি সে তাহার বিবাহের সঙ্গে অনাথকে জড়াইয়া ফেলিয়াছিল। বিবাহ এবং অনাথ যেন একসূত্রে গাঁথা। কিন্তু অনাথেব প্রতি মায়ের ব্যবহারে সে মর্মান্তিক ব্যথা পাইত।

সরলার মনের এই অবস্থায় অনাথ কাঁদিয়া ও কাদাঁইয়া তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

গৃহিণী ভাবিয়াছিলেন কোন রাজপুত্র বা তাহারি কাছাকাছি কোন মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে সরলার বিবাহ দিয়া দশজনের মধ্যে নিজের প্রতিপত্তি জমকাইয়া তুলিবেন। কিন্তু বিবাহের বাজার বড়ই পরীক্ষার স্থান। অল্পদিনেই কর্ত্রী বুঝিলেন—“এ বড় কঠিন ঠাঁই।”

এদিকে যখন সরলার বয়স বাড়িতে লাগিল, এবং রাজপুত্রের সঙ্গে তাহার বিবাহের সম্ভাবনা কমিতে লাগিল—যখন মন্ত্রীপুত্রের পরিবর্তে অনাথ হইতেও অনাথ পাত্র আসরে দর্শন দিতে লাগিল, তখন গৃহিণী স্বামীকে বলিলেন, “এম্নি ক'রে ব'সে থাকলেই কি মেয়ের বিয়ে হবে? তোমার যে ক্ষমতা, তুমি কোথাও বিয়ে দিতে পারবে না। তা কি ক'রব কপালে যা ছিল তাই হবে, না হয় তোমার অনাথকেই একখানা পত্র দাও।”

অনাথ সেবার প্রশংসার সহিত এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রিয়নাথ বলিলেন,—“আমি আর তাকে লিখতে পারব না। তোমার বেশী গর্ব বেশী মান সম্ভ্রমের ভয়, তুমি রাজপুত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিও।”

অনাথ পাথুরিঘাটা ষ্ট্রীটস্থ একটী মেসে থাকিত ; একদিন একখানি পত্র তাহার হস্তগত হইল। অনাথ পত্র পড়িয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। প্রিয়নাথ বাবুর পত্নী তাহাকে লিখিয়াছেন :—

"অনাথ,

আমাদের কাছ হইতে চলে গিয়ে অবধি আর আমাদের কোন খোঁজ খবর রাখ না। সংসারের রীতিই এই, তোমার দোষ নাই। আমরা কিন্তু তোমার কথা একদিনও ভুলি নাই। তোমার প্রতি আমাদের ছেলের মায়া জন্মেছে। আমাদের তাই একান্ত ইচ্ছা এই স্নেহ সম্পর্ক আরও দৃঢ় করি। সরলা বড় হয়েছে, তাকে তোমার হাতে দিয়ে তোমাকে আরও আপনার করতে ইচ্ছা। সরলা যা তা তুমি জান। আশা করি এ প্রস্তাবে সম্মত হবে।"

অনাথ অবাক। একি সেই গৃহিণী ? কি অপূর্ব পবিবর্তন। বিবাহ বাজারের তিক্ত অভিজ্ঞতা যে কুন্তলীন অপেক্ষাও মানুষের মস্তিষ্ক শীতল করিতে সমর্থ সে তাহা ইহার পূর্ব্বে জানিত না।

আহা ! সাধনার ধন সম্মুখে। যাহাকে পাইতে জীবন সার্থক হইবে ভাবিয়াছিল, সে ধন আজ সাধিয়া তাহাকে অর্পণ করা হইতেছে। কিন্তু,—কিন্তু সেই রজনীর সেই মর্ম্মভেদী বাক্যবাণ ! অনাথ ভাবিল—সরলা তুমি স্বর্গের দেবী। কিন্তু তোমাকে পাইয়া আমি সুখী হই, বিধাতার ইহা ইচ্ছা নয়।

পরদিন ডাকে অনাথ উত্তর দিল—"আপনার পত্রে সমস্ত অবগত হইলাম। নানা কারণে সরলাকে আমি বিবাহ কবিতে পারি না। সে জন্য ক্ষমা করিবেন।" তাহার পর আর কোন পত্র লেখালেখি হয় নাই।

২০শে অগ্রহায়ণ মহাসমারোহে সরলার বিবাহ হইয়া গেল।

নন্দী গ্রামের জমিদার হরসুন্দর চৌধুবীর সঙ্গে গৃহিণীর পিতাব পরিচয় ছিল। চৌধুরী মহাশয়ের তৃতীয় পক্ষের পত্নী বিয়োগ হওয়াতে তিনি নরকত্রাণ কামনায় চতুর্থবার দাবপরিগ্রহণে বদ্ধপরিকর হইলেন।

সরলার মাতামহ সরলার সহিত তাঁহাব ঘটকালী করিলেন। সরলাকে বযঃস্থা দেখিয়া জমিদার মহাশয় বিবাহে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। সুতরাং সরলা জমিদাব-পত্নী হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকাবিণী হইল। গৃহিণীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

কিন্তু যাহার জন্য এত আয়োজন, তাহার মুখে হাসির রেখাও ফুটিল না ! গৃহিণী ভাবিয়া ছিলেন, ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া কন্যা কত সুখী হইবে। কিন্তু হায় ! অপবিমেয় সুবর্ণ স্তূপের মধ্যে বসিয়াও সরলা শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। হৃদয় ও বিত্ত কি বিভিন্ন জিনিস !!

গৃহিণী কল্পনায় যে প্রাসাদ গড়িতে ছিলেন তাহা সহসা ধূলিসাৎ হইয়া গেল। তিনি কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া চারিদিক অন্ধকাব দেখিতে লাগিলেন।

কিন্তু নিয়তির চক্র আরও একটু অগ্রসর হইল। একদিন আষাঢ়েব শ্যাম সন্ধ্যায় যখন দিকে দিকে প্রকৃতির দীর্ঘ নিঃশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, গৃহিণী সংবাদ পাইলেন, তাঁহার নবজামাতা তিনদিনের পক্ষাঘাত রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সরলার মুকুল-জীবনেই সকল সুখ সাধ ফুরাইল।

সরলা বিধবা হইবার পর এক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। প্রিয়নাথের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি এক বৎসরের ছুটী লইয়া শ্বশুরালয় কুসুমপুরে অবস্থান করিতেছেন। গৃহিণী কিছুদিন বাপের বাড়ী থাকিবেন বলিয়া জেদ করায়, এইরূপ করিতে হইয়াছিল।

সংসারে একটী ভাঙ্গে আর একটি গড়ে। অনাথের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। কুসুমপুরের কালিকানন্দ বসুর কন্যা অনুপমার সহিত তাহার বিবাহ। কালিকাবাবু একজন ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট।

২৯শে বৈশাখ। কুসুমপুরের বোসেদের বাড়ী বড় ধূমধাম। আজ অনুপমার বিবাহ। নহবতের বাদ্যে, সানাইয়ের সুরে, ছেলেদের গোলে, মেয়েদের বাক্‌বিতণ্ডায়, বসুবাড়ী ধ্বনি-মুখরিত।

সরলা মাতুলালয়েই ছিল। অভাগিনী কোথায় যাইবে? অনুপমা সবলার সই। বহু দিন পরে দুই সইয়ে সাক্ষাৎ হইল—কিন্তু কি বিভিন্ন অবস্থায়! একজনের সুখ আশা জন্মেব মত লুপ্ত,—আর একজন আশাপূর্ণ হৃদয়ে সুখ মন্দিরের দ্বারদেশে উপনীতা।

আজ অনুপমা সরলার দুঃখে কাঁদিল। সরলা বলিল, "না সই আজ সুখের দিনে চোখেব জল ফেলতে নাই। আমাদের সাধ্য কতটুকু বল? আমরা শুধু সহ্য করবাব অধিকারী।"

সন্ধ্যা সমাগমে বসু বাড়ীতে আনন্দ রোল দ্বিগুণ বেগে উথলিয়া উঠিল। গৃহে প্রাঙ্গনে পুকুরের ঘাটে পথে লোক গম্‌গম্ করিতেছে। ডাকে, লোকের হাতে আয়ুবৃদ্ধ্যন্নের বস্ত্র ও মিষ্টান্ন ও নানা জাতীয় উপহার আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। অনুপমাব মা সেইগুলি সকলকে দেখাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিতেছিলেন।

সকলেই ব্যস্ত হইয়া এদিক ওদিক ঘুরিতেছে। অনুপমা একটি নির্জন গৃহে একাকী বসিয়া ভাবিতেছে,—সই আসিবে বলিল, তবে এখনও আসিল না কেন? আহা! সে বড় অভাগিনী। ভগবান কেন তার এমন করিলেন।

এমন সময় একখানি বিষাদ-প্রতিমা বস্ত্রাঞ্চলে কি ঢাকিয়া ধীরে ধীরে সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সবলা বলিল, "সই, বাবাকে ওষুধ দিয়ে আসতে একটু দেরী হয়ে গেল," এই বলিয়া সে অঞ্চলের মধ্য হইতে একখানি বহুমূল্য পার্শি শাড়ী, একটি সিল্কেব জ্যাকেট, একগাছি সোনার হার, এক শিশি দেলখোস্ ও একখানি 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' বাহির কবিয়া বলিল,—"সই, আজ তোমাকে ভাই কত লোকে কত কি দিচ্ছে। আমি তোমার জন্ম-দুঃখিনী ভগিনী আজ এই কয়টি জিনিস তোমাকে দেব ব'লে এনেছি। বিধবার দান মঙ্গল দিনে কেউ ছোঁবে না,—কিন্তু তুমি ফেল্‌তে পাববে না। তাই গোপনে দিতে এসেছি। তুমি ব্যবহার ক'রলেই এগুলি আমার সার্থক হবে। তুমি দেবতার মত স্বামী পাচ্ছ, প্রার্থনা করি চিরদিন স্বামী সোহাগিনী হ'য়ে সুখে সংসার কর।"

অনুপমার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। সরলা অতি ধীরে একবার প্রিয়সখীর মুখ চুম্বন করিল। এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল—অনুপমা। বিষাদ-প্রতিমা ধীরে ধীরে অন্য পথে বাহির হইয়া গেল।

বিনয়ভূষণ সরকার

উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাঠক, আমার স্ত্রীটি কেমন জান ? কি করিয়াই বা বুঝাইব ! এই—ঝিঙে বীচি দেখিয়াছ ? রংটুকু অমনি। কিন্তু তাহা ছাড়া আর সব ঠিক আছে,—ঠোঁট পাতলা চোখ ভাসা ভাসা, হাত পা ছোট গোলগাল, গড়নখানি দুগগা ঠাকরুণটির মত, আঙ্গুলে দশটি চাঁপার কলি ; পিঠ ঢাকা কোঁকড়ান চুল। ঐ যে বল্লাম সব ঠিক, শুধু রংটুকু, বাপ ! যেন অমাবস্যার ঘোর ঘনঘটা। এ হেন ননীচোরারূপিণী বঙ্কিমবর্ণিতা ভ্রমর কোথায় পাইলাম জান ? সেই কথাই বলিতে যাইতেছি।

পাটলা বর্দ্ধমান জেলায় একটি গ্রাম। গ্রামে থাকিবার মধ্যে দিগন্তর মাঠের মধ্যে এক কালীমন্দির তাহার পশ্চিমে জমিদার বাড়ী, আর পূর্ব্বে ক অক্ষর গোমাংস রাম, হরি, শ্যামের মধ্যে গোময়স্তূপে রক্তপদ্মবৎ আমি আর যোগেশ। আমরা কলিকাতা দেখিয়াছি, কলেজে ঢুকিয়া অবধি বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা, স্ত্রী-শিক্ষা, সাকারবাদ প্রভৃতি অনেক নর্তন কীর্তন করা গিয়াছে, তখনো মাথায় হুজুগের ধূয়া পুরামাত্রায় বর্তমান ; গ্রামে কুরীতি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রণঘোষণায় আমি ধূম্রলোচন, যোগেশ ত ততধিক ! আমাদের আবির্ভাবে পাটলায় হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। সার্বভৌম ঠাকুর, চাটুর্য্যে খুড়ো, টোলের পণ্ডিত, পূজারি, দোবে, এমন কি পাচক বামুনের টিকির সঙ্গে আমাদের সর্তেড়ি মস্তকের ঘোর আন্দোলন যদি দেখিতে তবে বলিতে, "হাঁ, যোগেশ নরেশ একটা কেষ্ট বিষ্ণুর মধ্যে কেউ বটে !"

এই রণভূমে হঠাৎ একদিন এক গদা-হস্ত ভীম-সেন আসিয়া হাজির। কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলি ; ইনি গ্রামের জমিদার, বয়স ষাঠের কাছাকাছি। সেইদিন ভোরে উঠিয়া জলখাবার খাইতে খাইতে শুনিলাম, এক ষোড়শীর সহিত তাঁহার বিবাহ ! কি ঘোর পৈশাচিকতা ! যোগেশের অর্দ্ধভুক্ত জীলিপি হস্তচ্যুত হইয়া পদতলস্থ উন্মুখ মার্জ্জারের খর্পরগত হইল ; আমার হস্তের আস্ত পানতোয়াখানা মুখগহ্বর হইতে কণ্ঠের রন্ধ্রমার্গ দিয়া একেবারে পাকস্থলীতে হাজির ! হে আকাশ, তোমার উদরে বজ্র নাই, এই বৃদ্ধ জরদগবের মাথায় নিক্ষেপ কর ; হে জাহ্নবী, তোমার বুকে আশ্বিনে বান নাই, একবার আসিয়া এই লোলচর্ম কুব্জপৃষ্ঠের গতি কর, সন্তপ্ত ভারত শীতল হোক্ ; হে গৃহস্থকুলদেবী পরিচারিকে ! তোমার হস্তে মুড়ো ঝাঁটা নাই, এ মহাপাতকের কুব্জে একবার মুহুর্মুহু সমন্দ্র বর্ষণ কর, আমি স্বদেশ উদ্ধারব্রতী, একবার তাহা দেখিয়া পদভরে মেদিনী কম্পিত করতঃ নৃত্য করি !—কেহই শুনিল না, বিবাহের দিন কাদামাখা কচ্ছপের ন্যায় গুটি গুটি অগ্রসর হইতে লাগিল।

অগত্যা আমি আর যোগেশ পরামর্শ আঁটিতে বসিলাম। প্রায় এক বাক্স ইজিপ্‌সিয়ান সিগরেট ধ্বংস করিয়া গোঁফের আগ পাকাইতে পাকাইতে ছুঁচের মত করা হইল, অবশেষে যোগেশ বলিল, "হয়েছে।"

আমি। কি বল দেখি ?

যো। কালীমন্দিরের মাঠের শুকনো খাল দেখেছ তো ? ঐ খালের যেখানে হোক চেঁচিয়ে কথা বল্লে বিকট প্রতিধ্বনি হয়। ঐ খালে বেটাকে জব্দ করতে হবে।

আমি। ঠিক, ঠিক ; কিন্তু বেটার সঙ্গে যে লোকজন থাকবে।

যো। বেশী থাকবে না, তৃতীয় পক্ষের বে, দু'চারজন বৈ সঙ্গে নেবে না। শুনিছি নাকি কালীর প্রসাদ না খেয়ে ও বেটা কোথাও বেরোয় না, একবার পূজারীটাকে হাত কত্তে পাল্লে হয়।

সেই দিনই গ্রামস্থ কবিরাজ মথুর বাবুর কাছে হাজির হইলাম।

আমি। কবরেজমশাই, গোটাদশেক ভেজাল জোলাপের বড়ি দিতে পারেন ?

কবি। কেন হ্যা ?

আমি। বিশেষ দরকার আছে।

কবি। বেশ তো, নে যাও।

বিবাহের দিন যোগেশ সন্দেশ ভাঙ্গিয়া সেই বড়ী দিয়া মাখিল। কিন্তু পুরোহিতকে হাতে আনিতে কিছু বেগ পাইতে হইয়াছিল। যোগেশ তাহাকে পথে দেখিতে পাইয়া ডাকিল, "ওহে ঠাকুর!"

পুরো। আজ্ঞে ?

যো। একটা ভাবি জাঁকালো গোছের পূজো দিতে হবে হে।

পুরো। বেশ তো, তাব আর ভাবনা কি ?

যো। দেশে আমার স্ত্রীর অসুখ, তাঁবি কল্যাণের জন্য পূজোটা দেওয়া ; কিন্তু তাব আগে আর একটা কাজ আছে।

পুরো। কি কাজ ?

যো। মা কালী স্বপ্ন দিয়েছেন. যে আমি নিজে হাতে সন্দেশ এনে তাই মার প্রসাদ স্বরূপ জমিদার বাবুর বাড়ী তাঁর অজ্ঞাতে পাঠাব, তবেই পূজোব ফল হ'বে।

এবার ঠাকুর একটু কাসিয়া নিরুত্তর বহিল।

যোগেশ বলিল, "ঠাকুর, জমিদার বাড়ী কত পাও ?"

পুরো। আর মশাই, পাঁচটি টাকা মাসে।

যো। কিছু উপরি রোজগার কর না ?

পুরো। হেঁ হেঁ, তা—হেঁ হেঁ হেঁ।

"তাতে দোষ কি ?" বলিয়া যোগেশ তাহার হাতে দুটি টাকা গুঁজিয়া দিল। পূজাবী আব দু'চারবার আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু "অখণ্ডমণ্ডলাকারে ব্যাপ্তং যেন চরাচরং", এ হেন রজতমণ্ডল "করতলগত আমলকবৎ" হাতে পাইয়া অল্পশক্তি মানুষ তাহা ত্যাগ করে, এ চিত্র বড়ই বিরল। সে পূজারী তো ত্যাগ করেন নাই, বরঞ্চ যা আপত্তি করিয়াছিল, তাও তাহা ট্যাঁকে গুঁজিবার পর।

২

গৃহে গৃহে দীপ জ্বালিয়া সন্ধ্যার আরতি হইয়া গেল ; তাহার অনেকক্ষণ পরে জমিদারবাড়ী হইতে বর বাহির হইল। চুলে গোঁফে কলপ, গায়ে ফুলকাটা পাঞ্জাবী, ও জরির গিলে-কোঁচান উড়ানি, পায়ে কালো মোজা, পরনে মিহি চওড়াপেড়ে শান্তিপুরে ধুতি ; সেই ষাঠ বৎসরের বৃদ্ধকে আজ তরুণ যুবক সাজাইবার জন্য কোন সরঞ্জামেরই অভাব ছিল না, শুধু কুঁজটি যেখানকার সেইখানেই রহিয়া গিয়াছে।

মাঝে সেই শালুর ঝালর দেওয়া কিংখাপ মোড়া পাল্কি, আর আগে পিছনে মশাল ধরিয়া

ছাতি লাঠি কাঁধে ছয় সাত জন লোক। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। সেই বিশাল তরুহীন প্রান্তর অন্ধকারে দিক্‌দিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছে, মাঝে মাঝে শুধু কালো কালো কুল কি করমচাব ঝোপ উইঢিবির মত অন্ধকারে পড়িয়া আছে। মাঠের মাঝামাঝি আসিলে বামে একটা শৃগাল ডাকিয়া উঠিল ; বলা বাহুল্য, সে শৃগালটি চতুষ্পদ নহে, যোগেশ। বরযাত্রীদল এই অমঙ্গল চিহ্নে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। জমিদার পাল্কির দরজা খুলিয়া বলিলেন, "ওরে, একবার পাল্কিটা রাখ্‌রে।" পাল্কি নামান হইলে তিনি মথুর কবিরাজকে বলিলেন, "পেটটা ভারি নরম হয়েছে, একবার শৌচে যেতে হবে ;" বলা বাহুল্য, রেচকের কার্য পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল, পেটের অসুখের উপক্রম দেখিয়া কবিরাজকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। মথুর বলিলেন, "তা যান না, এই নীচেই নাবাল, ঐখানে বসুন গে ; দামোদর মশালটা ধচ্চে।" জমিদার ও দামোদর সেই শুষ্ক খালের মধ্যে নামিয়া গেল ; তাহার সম্মুখেই কিয়দ্দূরে কালীবাড়ী। রাত্রি তখন নয়টা।

সরকার বংশী বলিতেছিল, "বাঁদিকে শ্যাল ডাক্‌লো, যাত্রাটা ভাল বোধ হয় না।" একজন বাহক কলিকায় ফুঁ দিতেছিল, সে বলিল, "রাত বিবেত করে আসা ; কালীবাড়ীর সামনে মনিষ্যি এত রেতে কি কখন দাঁড়ায় ?" বংশী বসিয়াছিল, কথাটা শুনিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, সভয়ে বলিল, "রাম. রাম, বাম।" মথুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, হল কি ?"

বংশী। দেখচেন না মশাই, এই দিগন্তর মাঠে কি রকম ফুলের বাস আসছে ! রাম ! রাম ! রাম ! কর্তা গেলেন কোথা ?

বাস্তবিক তখন প্রান্তর নানা জাতীয় নবপ্রস্ফুটিত কুসুমসৌরভে ভরপুর, বেল, জুঁই, চামেলি, গন্ধরাজ, গোলাপ, রমণ, সেফালী প্রভৃতি কত প্রকার ফুলেব সুবাস সংমিশ্রণজাত স্নিগ্ধ গন্ধ স্থির নৈশ বায়ুমণ্ডল মাতাইয়া তুলিতে ছিল। বলা বাহুল্য এও যোগেশের এক খেল ; তখন নূতন কুন্তলীন ও দেলখোস উঠিয়াছে, সে কোথায় মাঠের মধ্যে তাহাই ঢালিতেছিল। বাহক, ভৃত্য, সরকার সকলে সমস্বরে রাম নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল। খালের দিকে মশালের আলো দেখিয়া মথুব বলিল, "ঐ কর্তা আস্‌ছেন।" এই সময় যাহা ঘটিল, তাহা বর্ণনাব অতীত ; সহসা সেই নীরব নিশীথে এক ভীষণ অমানুষিক চিৎকাবে সমস্ত প্রান্তর আলোড়িত হইয়া উঠিল। সে আর্তনাদেব ভীষণতা ভাষায় প্রকাশ করা অসাধ্য ; যেন ভয়ে ও যাতনায় রুদ্ধ ভগ্নস্বরে শত স্ত্রীকণ্ঠের ক্রন্দন এক সঙ্গে চতুর্দিক হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। মুহূর্ত মধ্যে মশাল, কলিকা, পাল্কি, লাঠি, ছাতা, জমিদার, সব ফেলিয়া বাহক ভৃত্য সকলে যেদিকে পারিল, ছুটিল। জমিদার একা সেই অন্ধকারে মন্দিরের দিকে ছুটিতে লাগিলেন। তখন মন্দির হইতে এক অপূর্ব মূর্তি বাহির হইল, তাহার সমস্ত দেহে থাকিয়া থাকিয়া কি এক জ্যোতিঃ জ্বলিয়া উঠিতেছে ; মূর্তি তাহাব আলোকমণ্ডিত বাহু প্রসারিত করিয়া জমিদারের দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। পাঠক ! সে আমি , দুইখানি উড়ানি পাট করিয়া তাহাতে অসংখ্য জোনাকি পুড়িয়া ছুটিতেছিলাম। কয়েক পদ আসিয়া আর জমিদারকে দেখিতে পাইলাম না, দূরে কাহার ভয়-কাতর চীৎকাবধ্বনি ও তৎসহিত যোগেশের বিভীষিকাময় ক্রন্দন শুনিয়া মন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম।

· জোনাকি ভরা উড়ানি মন্দিরে ফেলিয়া আমি দ্রুত চলিতে লাগিলাম ; যোগেশের সেই আকুল ভীষণ স্বর, তাহার শতগুণ প্রতিধ্বনি, আর জনমানবহীন প্রান্তরের কথা স্মরণ করিয়া কণ্টকিত দেহে আমি মাদারিপুরে কন্যাকর্তার বাড়ী আসিয়া যখন পঁহুছিলাম, তখন রাত্রি এগারটা বিবাহের লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যায় যায়। জমিদার আসেন নাই, একপার্শ্বে যোগেশ নিতান্ত নিরীহের মত বসিয়া চুরুট টানিতেছে ; কন্যাকর্তা উদ্বিগ্ন হইয়া শুষ্ক মুখে ছুটাছুটি

করিতেছেন। একজন কুটুম্ব বলিতেছিল "ভদ্রঘরে এই রকম ছোটবৃত্তি! কথা দিয়ে শেষে কিনা জাতটা মাল্লে!" অন্য একজন তদুত্তরে বলিল, "তা যেমন টাকা দেখে মেযের মাথা খেতে গিয়েছিলে! এখন যাকে পাও এনে মেয়ে গছিয়ে দাও, নৈলে ও মেয়ে তো আর পার হবে না!"

এই সময় কোথা হইতে মথুরবাবু আসিয়া উপস্থিত! তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "তার আর ভাবনা কি, এই যে নরেশবাবু আছেন, বিদ্যের জাহাজ, উনি বেশ বড় কুলীন। ভদ্রলোকের মান ইজ্জত যায়, তা দাঁড়িয়ে দেখবার লোক উনি নন। ওঁকেই মেয়ে দাও।" কন্যাকর্তা সজল চক্ষে আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, "আহা আপনি দেবতা; পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।" আমি ত অবাক্; বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "না না, তাও কি হয়; আপনারা পাগল হলেন নাকি?" মথুর আমার কানের কাছে মুখ লইয়া বলিলেন, "নরেশ বাবু, সাবধান। কাল যখন তোমার কারসাজি প্রকাশ হবে তখন কিন্তু—"

সর্বনাশ, সব ফাঁসিয়া গিয়াছে! আমি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, যোগেশ অদৃশ্য! বেগতিক দেখিয়া আমাকে বিপদের হাতে ফেলিয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

বিবাহের সব জোগাড় ছিল; চেলিপরিহিতা কন্যাকে আনিয়া আমার বামে দাঁড় করাইল; আমি সরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই মথুরের ঘূর্ণ্যমান চক্ষু আমাব দৃষ্টি পথে পড়িল। মন্ত্র পডিবার সময় আর একবার পলাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম, কিন্তু মথুর কবিরাজ আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিলেন, "জমিদারের অবস্থা শঙ্কটাপন্ন, আর একজন ত ভযে মাঠে মরে আছে, নবেশবাবু, এখন বিবাহ না কর তো পুলিশে যাবে।" আমার হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, মাথা বন্ বন করিয়া ঘুরিতে লাগিল; আমি কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলাম; বস্ত্রে বস্ত্র বন্ধন, কন্যাব সাত পাক দেওয়া, শুভদৃষ্টি, শঙ্খধ্বনি, স্ত্রী আচাব প্রভৃতি কত কি ছাই পাঁশ উৎকট স্বপ্নেব ন্যায় চক্ষের সম্মুখে চলিতে লাগিল, আমি বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়া কলের পুত্তলির ন্যায় বিবাহ করিলাম। তাহার পর বাসর-শয্যা; আর অবিরাম বর্ষিত হাসি ও বিদ্রূপ। হা ভগ্বান! তুমি কি সত্যই নাই?

শেষ রাত্রে সকলে চলিয়া গেল। তখন আমি চাহিয়া দেখিলাম পার্শ্বে কন্যা শায়িতা; আর—হে প্রজাপতি! আমার কপালে কি এই লিখিয়াছিলে?—লাল চেলির উপর একটি কালো মেহগ্নি দারুবৎ হস্ত পডিয়া রহিয়াছে। ক্রোধে ক্ষোভে উন্মত্ত প্রায় আমি এক লম্ফে উঠিয়া তাহার অবগুণ্ঠন খুলিলাম, অমনি কি অমৃত ধাবা সিঞ্চনে শত বৃশ্চিকদংশন জ্বালার অবসান হইল। কালো রঙে অতরূপ আমি কোথাও দেখি নাই। কি সুললিত দেহ! মুখে চক্ষে কি অপূর্ব শ্রী, কমনীয়তা! আমি নত হইয়া বলিলাম, "বাহ্! এ যে ভোম্‌রা; গোবিন্দলালের ভ্রমর!" বাহিরে কাহারা তাহা শুনিয়া খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল; আমার স্ত্রী লাল চেলীতে আপাদমস্তক ঢাকিয়া সঙ্কুচিতভাবে সরিয়া শুইল।

প্রাতে উঠিয়া দেখি যোগেশ দুই পাটি দন্ত বাহির করিয়া দণ্ডায়মান! হতভাগা স্বার্থপর সত্য সত্যই আমার দুঃখে হাসিতেছিল।

কিন্তু দুঃখ যা তা সেই প্রথমে হইয়াছিল, তার পর সেই কুন্তলীনগন্ধা জটিলালকগুচ্ছা কুচকুচে স্ত্রীটি লইয়া দিন কাটিতেছে মন্দ নয়।

আর একটা কথা; সেই কালীবাড়ীর ভূতের ভয়ে কেহ মরে নাই। সেটা মথুরের চালাকি। বৃদ্ধ জমিদার আজও নাকি পাত্রী খুঁজিতেছে।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

নিয়তি

১

রথযাত্রা, নদীর প্রবাহের ন্যায় জনস্রোত চলিয়াছে। হর্ষকোলাহলে পল্লীগ্রামের বিজন শ্যামল-প্রকৃতি আজ যেন মোহভঙ্গে চৈতন্যের কল্লোলে মুখবিত। তাহাদেব নবীন সাজ, হাসিভরা মুখ, আর তাহার উপর অনাবিল পুলকবিলসিত নীল নয়ন—সরোজবাসিনী সরোবরের শোভাও মলিন করিয়া দিতেছে।

অনিলেন্দ্র ও তনিমা দু'টি ভাই বোন। কল্যাণের জমিদারবাবু কার্তিকচন্দ্র রায়ের দুইটি সন্তান। জমিদার মহাশয়ের অতুলবৈভব—বিস্তৃত সম্পত্তি। অত্যাবশ্যকীয় ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া, ব্রাহ্মণের বার্ষিক কাটিয়া, দেবসেবার নিয়মিত অনুষ্ঠানের ব্যাঘাত ঘটাইয়া, অতিথি সৎকার উঠাইয়া দিয়া তিনি অর্থ সঞ্চয় করিতেন, কিন্তু যথেষ্ট কৃপণতা করিয়াও কিছুতেই তাঁহার বয়সটাকে কমাইতে পারিলেন না। যাহা হউক, সে জন্য তাঁহার বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই; কারণ, যাহার বিত্ত আছে তাহার বয়সও আছে; তাই অনিলের মার মৃত্যুর পর কার্তিক বাবুর ৪৫ বৎসর বয়সেও ষোড়শীর সহিত পরিণয়ে বিঘ্ন ঘটে নাই। তনিমা তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী জগদম্বার গর্ভে জন্মিয়াছে।

গ্রামের অনতিদূরে একটী শ্যামল প্রান্তরে রথের বাজার বসিয়াছে। বিচিত্র পতাকায় সুশোভিত, আটখানি চাকার উপর স্থাপিত রথখানি ঘিরিয়া লোকরাণ্য অবিচ্ছিন্ন ভাবে দাঁড়াইয়াছে। দুব হইতে ইহা দেখিবামাত্র অনিলের ও তনিমার আর আনন্দ ধরে না। সঙ্গে একজন ঝি ও একটী চাকর; তাহারা দুটি ভাই-বোনের আগ্রহ-চঞ্চল উচ্ছৃঙ্খল গতির কিছুতেই শাসন করিতে পারিতেছিল না। ছেলেমানুষ—দুইখানি হৃদয় দুইটি স্বর্গচ্যুত অনাঘ্রাত মন্দার কুসুম! দুইজন দুইজনের চম্পকাঙ্গুলি দৃঢ়ভাবে ধরিয়া অগণিত লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। দুইটি মৃদুকণ্ঠের আনন্দের মত্ত উচ্ছ্বাস সে উচ্চরোলের মধ্যে ডুবিয়া গেল।

তন্বঙ্গী চারুপবিচ্ছদ পরিহিতা তনিমা কত পুতুল, কত ছবি, কত বাঁশী কিনিল; বাজারে যাহা কিছু তাহার চোখে ধরিল, সে ইচ্ছামত সকলই একটী একটী করিয়া ক্রয় করিল। কিন্তু অনিল কিছুই কিনিতে পারিল না। সে যাহা কিছু কিনিতে চায়, ঝি তাহা কিনিয়া দেয় না। মনের কষ্টে অনিলের নয়ন গড়াইয়া এক ফোঁটা অশ্রু পড়িল।

২

সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া তনিমা জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে বসিয়া পিতামাতাকে জিনিসগুলি খুলিয়া দেখাইতে লাগিল। কত আনন্দে, গন্ধে ও কৌতুকে সে বৃহৎ ভবন তখন মুখরিত! অনিল একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ক্ষুদ্র হৃদয়ের গভীর ব্যথায় নিস্পন্দ হইয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল, কেহ তৎপ্রতি লক্ষ্য করিল না। কেবল উপরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও পদতলে বসুন্ধরা অন্ধকার পূর্ণ হইয়া আসিল।

অনিল অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া কাঁদিল, তারপর আর যখন চোখে দেখিতে পাইল না তখন বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল; শৈশবে জননীর স্নেহ ও পিতার আদরের কথা মনে পড়িয়া

গেল। এমন অবহেলা, এত অনাদর, এত উপেক্ষা সে কোনও দিন পাইয়াছে বলিয়া স্মরণ হইল না। তাহার পর জননী নাই তাহা মনে পড়িল, যাহাকে মা বলিয়া ডাকে, সে যে বিমাতা, তাহা মনে পড়িল। মাতার অন্তিম শয্যায় রুগ্ন করে মাতা তাহাকে সজলনেত্রে সে পিতার করে অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে, কাতর অনুরোধে তাহাকে সৎ থাকিতে এবং শতেক যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিতে বলিয়া গিয়াছেন, তাহাও মনে পড়িল। তাহার পর আর সে মনে করিতে পারিল না। কম্পিত অধরে শুধু একবার বলিয়া উঠিল—মা।

৩

রজনী দ্বিযাম, সকলেই সুষুপ্ত ; ধীর পদবিক্ষেপে অনিল গৃহের বাহির হইল। কোথায় যাইবে, কোন্‌দিকে যাইবে কিছুই জানে না। যে অনিল বিবসনা রজনীর দারুণ বিভীষিকাময়ীমূর্তি মনে করিয়াই শয্যায় কাঁপিত, সে আজ অন্ধকারের রাজ্যে একেলা দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক! সংসারের বিচিত্র নিয়মে নিয়ন্ত্রিত তাহাব জীবন নাটকের এই প্রথম অঙ্কে আজি সে পা দিল। হতাশে অবসন্ন হৃদয় লইয়া সে কোন্‌দিকে যাইতেছে তাহা বুঝিতে পারিল না। অবশেষে ক্লান্তদেহে গ্রামের উপকণ্ঠে বৃক্ষতলে শুইয়া পড়িল ; মৃন্ময় শয্যায়, শ্যাম সুচিক্কণ অন্ধকারের আবরণতলে সে বিরামলাভ করিল। সৌধে যাহার সাধ নাই, ধরণী তাহাকে শান্তি দান করিল! মুহূর্তমধ্যে অনিল অন্তরের বৃশ্চিকদংশন বিস্মৃত হইল।

প্রভাতে তরুশীরে অরুণিমা নূতন প্রভাত জাগাইয়া তুলিল। বৃক্ষে বৃক্ষে পাখীর কলকণ্ঠে, কুসুমের নির্মল পরিমলে, পবনের শীতল সঞ্চারণে, আনন্দ ও আশীর্বাদ কর্মময় জগতে ঝরিয়া পড়িল। অনিল তখনও নিদ্রার ক্রোড়ে তাপিত মন ও ক্লান্ত দেহ জুড়াইতেছিল।

ফরিদপুর জেলায় সে সময় চা-করের আড়কাটীর উৎপীড়নে সকলে সন্ত্রস্ত। গৃহস্থকে নানা রূপ প্রলোভনে ভুলাইয়া, অনাথাকে সবলে বাঁধিয়া, পথিকের পথ ভুলাইয়া, তাহারা কুলি ও কুলিরমণী সংগ্রহ করিত। তাহাদেরই প্রলোভনে ভুলিয়া নিয়তির কঠোর অনুশাসনে সংসারজ্ঞান রহিত বালক অনিল আসামের চা-বাগানের ক্রীতদাস হইল।

"নীলদর্পণে"-র ন্যায় চা-বাগিচার নূতন জীবনে প্রবেশ করিয়াও অনিল মাতার অন্তিম আজ্ঞা সর্বদা পালন করিতে চেষ্টা করিত। সকল জ্বালা যন্ত্রণা সে বুক পাতিয়া নীরবে সহ্য করিত। গোপনে দুই-এক বিন্দু অশ্রু শীতান্তে শুষ্ক পত্রের ন্যায় নিঃশব্দে মাঝে মাঝে ঝরিয়া পড়িত। কোমল গণ্ডে শুধু শুষ্ক রেখামাত্র রাখিয়া সকলই মিলাইয়া যাইত। কিছুদিন এইরূপে কাটিল।

অনিলের আশৈশব লেখাপড়ার অনুরাগ। তাই সে যখন সময় পাইত তখনি অভিনিবেশ পূর্বক তাহার আলোচনা করিত। একদিন বড় সাহেবের মেম কোন বন্ধুর আলয় হইতে ফিরিয়া অসিতেছিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল যে একটী কিশোর বয়স্ক কুলি নিরতিশয় মনোযোগের সহিত একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র কুড়াইয়া লইয়া পড়িতেছে। কুলি আবার কাগজ পড়ে। কৌতূহলের বশে তিনি ধীর-পদবিক্ষেপে তাহার পশ্চাতে যাইয়া দাঁড়াইলেন, এবং শুনিতে পাইলেন, সে মৃদু মধুরস্বরে ইংরাজী পড়িতেছে, তিনি ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ করিলেন ; এবং রমণীসুলভ করুণায় আর্দ্র হইয়া সস্নেহে তাহার কর ধরিয়া তুলিলেন। আধ বাঙ্গালায় ও আধ ইংরাজীতে মিশাইয়া উভয়ের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হইল। মেমসাহেব অনিলের সকল অবস্থা আনুপূর্বিক অবগত হইলে অজানিতে

দুই চারি ফোঁটা অশুর তাঁহার ইন্দিবর বিনিন্দিত নয়নে ঝরিয়া অনিলের উত্তর দিল, মেমসাহেব তাহাকে লইয়া বাঙ্গালায় গেলেন। সেখানে সাহেবকে সমস্ত বিষয় বিবৃত করিয়া নির্ব্বন্ধাতিশয্য সহকারে অনিলের মুক্তিভিক্ষা করিলেন। মুক্তি লাভ করিয়া অনিল মেমসাহেবের একটি বন্ধুর কেরানী নিযুক্ত হইল।

৪

পিতামাতার আদরের তনিমা এখন বেশ বড়সড় হইয়াছে। মস্তকে থরে থরে কুঞ্চিত কেশদাম, নয়নে পরিপূর্ণতার চলদরশন ; লোহিত অধবে ললিত হাসি, আর সলজ্জ চঞ্চলতা তাহার পিতামাতার মনে বিবাহের জন্য সর্বদা ব্যাকুলতা আনিত ; কন্দর্পের মত রূপ, কুবেরের মত ধন, আর ইন্দ্রের মত পুরী থাকিবে এরূপ একটী রাজপুত্রর অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। পিতামাতা স্নেহের তুলিতে কল্পনাব পটে বিচিত্র আলেখ্য আঁকিতে লাগিলেন। কিন্তু বিস্তর চেষ্টাতেও তনিমার ভাগ্য প্রসন্ন করিতে কোন রাজপুত্র আসিল না। ভ্রান্ত ধনবান রাজকুমারেরা নিশ্চয়ই অজ্ঞতায় অন্ধ হইয়া থাকিবে, নতুবা এমন পরিণয় হেলায় উপেক্ষা করে ?

এত চেষ্টাও যে ব্যর্থ হইতেছিল তাহার কারণ, তনিমা একটু কানে খাট বা বধির এবং পিঠে খাট বা কুঁজো ছিল। বারাণসীর শাড়ীতে আর সাটিনের কারুকার্য্য বিশিষ্ট বডিসে তাহাব বঙ্কিম দেহ ঢাকিতে গেলেও ঢাকা পড়িত না। কানে ১০ ভরি সোনার কান তৈয়ার করিযা দিযা বধিবতা ঢাকিলে পিতামাতা সেজন্য ত্রুটি করিতেন না, বিধাতার ত্রুটি মানুষের সাধ্য কি সংশোধন করে ? কাজেই রাজপুত্রও আসিল না, জমিদার পুত্রও মিলিল না।

এতদিনে পিতামাতার চেতনা হইল। মনোমন্দিরের উজ্জ্বল জ্যোতি নিবিয়া গেল। ধূসব সন্ধ্যায় ম্লান মুখ কমলিনীর ন্যায় তনিমার মুখে বিষাদের ছায়া পড়িল। বাড়ীতে আনন্দের স্থলে নিরানন্দ, অশান্তিব কেতন উড়াইয়া দিল।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বহিয়া গেল। বিবাহ স্থির হইল না দেখিয়া অবশেষে সকল আশায় বিসর্জন দিয়া, বয়সের দুর্নিবার গতির বিশ্রাম ঘটাইতে না পারিয়া এক বিপত্নীক গৃহশূন্য ঘর-জামাতা স্থিবীকৃত হইল। জামাইটির গুণের মধ্যে কুলীনত্ব, বিদ্যার মধ্যে সঙ্গীত বাদ্য, বুদ্ধির মধ্যে পাখী ধবার কৌশল, আর শীলতার মধ্যে অকথ্য গালাগালি বর্ষণ—এই কুলক্ষণ চতুষ্টয় সম্বল। প্রজাপতির নির্বন্ধ কে খণ্ডাইতে পারে ? শুভদিনে সুর্তাহিবুক্‌যোগে শঙ্খ ঘণ্টার বিপুল নিক্কণের মাঝে তনিমার পরিণয় যথাযথ নিষ্পন্ন হইল।

৫

কার্ত্তিকবাবু যথেষ্ট চেষ্টা করিযাও জামাইটিকে মানুষ কবিতে পাবিলেন না। পারদর্শী শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে, সহরের শিক্ষিত সভ্যতায়, কিছুতেই তাহাকে শিষ্ট এবং সংযত করা ঘটিল না। তনিমার নীরব রোদন আর সখীদের নিকট সকরুণ বিলাপ জীবনের দোসর। তাহার জীবন একটী স্থানুবৎ জড় হইয়া পড়িতে লাগিল। জীবনের রমণীয় বয়সে রমণীর কমনীয় হৃদয়ে এ আঘাত প্রস্তরফলকের লেখা অপেক্ষাও নির্ম্মম। প্রতি রজনীতে স্বামীর অবজ্ঞা ও কঠোর ব্যবহারে তনিমাব অহঙ্কার-দৃপ্ত হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার রুক্ষ কেশ, উদাসিনীর ন্যায় মলিন বেশ দেখিয়া পিতামাতা সতত অন্তরের বিষম দাহ

অনুভব করিতেন। নিয়তির নিয়ম অলঙ্ঘ্য। তনিমা যাহা সহ্য করিবে বলিয়া কোনদিন কল্পনাও করে নাই আজ তাহা সে অবাধে সহিতেছে। সোনার সংসার পলে পলে বিনষ্ট হইতে লাগিল।

অনেকদিন পরে এই নিদারুণ তীব্র যাতনার অভ্যন্তরে কার্তিকবাবুর আজ অনিলের কথা মনে পড়িল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সজলনেত্রে বলিয়া উঠিলেন, "আর কি তাহাকে দেখিতে পাইব ?"

৬

আজি চারি বৎসর পর অনিলের আবার এক বিপদ ! অনিল সাহেবের কেরানীগিরি করিত। তাহার কার্যনিপুণতায় সাহেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। এমনকি, সাহেবের অর্থ ও সংসার সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্যের ভার অনিলের উপর দিয়া তিনি নিরুদ্বিগ্ন ছিলেন। অনিলকে সাহেব এতখানি ভালবাসিতেন দেখিয়া আফিসের অন্যান্য কেরাণীরা হিংসায় জ্বলিয়া মরিত। তাহারা অনিলের নানারূপ অনিষ্ট চিন্তা করিয়াও কিছু করিতে পারিল না। গুণের মহিমা কুসুমের পরিমলের ন্যায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

সাহেব একদিন শিকারে বাহির হইলেন , অনিল সঙ্গে চলিল। নিবিড় গুল্মলতাপরিবৃত অটবীর প্রান্তে সন্নিকটবর্তী গ্রামের কতকগুলি লোক সমবেত হইয়া ব্যাঘ্রের ভীষণ দৌরাত্ম্যের কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়াছিল। প্রায় প্রতিদিনই গ্রামে ব্যাঘ্র ঢুকিয়া কাহারও গরু, কাহারও ছাগল এবং কখন কখন মানুষও মারিত। এইরূপে গ্রামে এত ব্যাঘ্রভীতি জন্মিয়াছিল যে সকলেই রাত্রিকালে আগুন জ্বালিয়া আশঙ্কায় জাগ্রত থাকিত।

অনন্তর সকলে নির্ভীকচিত্তে সাহসে ভর করিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিল। প্রতি পল্লব, লতা, তরু তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল, বাঘ মিলিল না। সাহেব কতবার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিলেন, লাঠি ও বল্লমের সন্তাড়নে কানন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইল, তবুও বাঘ দেখা গেল না। শেষে যখন সকলে হতাশ হইয়া ফিরিবে, এমন সময় একটি বৃক্ষের শাখা হইতে ব্যাঘ্র সাহেবের মস্তকে লাফাইয়া পড়িল। এই অতর্কিত আক্রমণে প্রাণভয়ে অনুচরবর্গ যে কে কোথায় পলাইল, তাহার খোঁজ পাওয়া গেল না। শুধু বিশ্বস্ত অনিল সাহেবের শেষ মুহূর্ত দেখিয়া আর থাকিতে পারিল না। সন্তর্পণে বৃক্ষান্তরাল হইতে লাফাইয়া আসিয়া ব্যাঘ্রের কবল হইতে সাহেবক রক্ষা করিবাব জন্য তাহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু অনিলের চেষ্টা বৃথা হইল, ব্যাঘ্র তাহাকে হতচেতন করিয়া ফেলিয়া সাহেবকে মুখে করিয়া লইয়া বনের অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

৭

অনিল অজ্ঞান—প্রভাত পর্য্যন্তও অজ্ঞান। একদল দস্যু সেই রাস্তায় যাইতে যাইতে, হঠাৎ দলপতির পায়ে কি যেন কঠিন পদার্থ বাধিল। মশালের সাহায্যে দলপতি দেখিতে পাইলেন, একটি যুবক অজ্ঞান অবস্থায় শোণিতাপ্লুত দেহে তথায় পড়িয়া আছে। কাহারও তখন বুঝিতে বাকি রহিল না যে অনিল কোন শ্বাপদ কর্তৃক আহত হইয়াছে। দলপতি ইহাতেই সন্তুষ্ট রহিলেন না। অনিলের মুখে তাঁহার একমাত্র মৃতপুত্রেব সাদৃশ্য দেখিয়া সেই পাষাণ কঠিন পাষণ্ডের কঠোর চিত্তও বাৎসল্যে বিগলিত হইল ; তিনি সস্নেহে অনিলকে

বুকে তুলিয়া গৃহে লইয়া চলিলেন।

অনিলের শুশ্রূষার জন্য দলপতি যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। দুগ্ধফেননিভ শয্যা, বিস্তীর্ণ গৃহ ; প্রয়োজনাতিরিক্ত দাসদাসী তাহার সেবা করিতে লাগিল। এইরূপ আদর ও যত্নে অনিল শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিল।

অনিল এখন কিছুতেই বুঝিতে পারে না যে, সে কেমন করিয়া এখানে আসিয়াছে। এ দস্যু সহবাস তাহার আদৌ ভাল লাগিত না। দলপতি নিরন্তর পুত্রস্নেহে তাহাকে পালন করিলেও সে এইরূপ আশ্রয় ঘৃণা বোধ করিত। প্রত্যহ দস্যুদের গুপ্তমন্ত্রণা ও চৌর্য দেখিয়া তাহার বড়ই বিরক্তি জন্মিয়াছিল। সে একাকী এক নির্জন কক্ষে বাস করিত। দস্যুরা সারা দিন স্ব স্ব কাজকর্ম করিয়া রাত্রে সশস্ত্র দল বাঁধিয়া কোথায় চলিয়া যাইত।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল। অনিল সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে, একদিন মধ্যাহ্নে আহার করিয়া দলপতি অনিলের প্রকোষ্ঠে বসিয়া নানারূপ গল্প করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনিল তুমি কি করিতে ভালবাস?" অনিল বলিল, "লেখাপড়া করিতে পারিলে কিছুই চাই না। লেখাপড়ায় আমার বড় আমোদ বোধ হয়।"

দলপতি। আচ্ছা অনিল, তুমি আমাদের এ ব্যবসায় কিরূপ মনে কর?

অনিল। পিতা, আপনি পুত্রাধিক স্নেহে আমাকে ভালবাসেন। আমার ন্যায় হীন, পরিত্যক্ত অভাগাকে ধূলিরাশির মধ্য হইতে রত্ন ভাবিয়া সাদরে কুড়াইয়া আনিয়া অতি যত্নে পালন করিতেছেন, সত্য বলিলে আপনি কষ্ট পাইবেন, তাই আজ ইহার উত্তর জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমি আপনার নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞ।

দলপতি। অনিল, বাপু সত্য অপ্রিয় হইলেও তাহার অপলাপ করিও না। আমি দস্যু স্বীকার করি, কিন্তু মিথ্যার প্রলোভনে আমার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। তাই এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছি। তুমি যাহা ভাল মনে কর, নির্ভয়ে বল, আমি বীরত্বের উপাসক, নির্ভীকতা বড় ভালবাসি।

অনিল। পিতা, যদি অভয় দিয়াছেন তবে বলি, আমি এ বৃত্তি অতিশয় ঘৃণা করি, এবং যেখানে সতত ইহারই আলোচনা হয় সে আবাস নরকতুল্য মনে করি।

দলপতি। অনিল তুমি কি ইচ্ছা কর যে এ সংসারে শুধু এক শ্রেণীর গুটিকতক বড়লোক থাকিয়া সহস্র দরিদ্রকে উৎপীড়ন করিবে? সকলেই মানুষ, তবে এ বৈষম্য কেন? আমি তাই বড়লোকের বিপুল ধনসম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া অনাথ আতুরকে দান করি, প্রবলের অন্যায় অত্যাচার হইতে দুর্বলকে রক্ষা করি ; তস্করের তাড়নে উৎপীড়িত নিরীহ পথিকের ভ্রমণ নিরাপদ করিবার জন্য বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াই। এই বন বিচরণে এক দিন তুমি রক্তাক্ত কলেবরে মাটিতে পড়িয়া আছ দেখিতে পাই এবং আমার মৃত পুত্রের মত তোমাকে দেখিতে, তাই কুড়াইয়া ঘরে আনি। দুরবস্থার জন্য প্রাণাধিক পুত্রের উৎকট পীড়ার চিকিৎসা করাইতে না পারায় আমি মানুষের এই অর্থজনিত অসাম্য তিরোহিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অনিল, আমি সত্যিই কি দস্যুর ন্যায় ঘৃণার যোগ্য?

বাষ্পাকুদ্ধ কণ্ঠে পূর্বকথা স্মরণে দরবিগলিত অশ্রুধারায় সিক্তবদন দলপতি আর বলিতে পারিলেন না। অনিল শুনিয়া স্তম্ভিত হইল, এবং বিস্ময়-বিচলিত চিত্তে দলপতিকে যুক্তকরে প্রণাম করিয়া স্বতঃই বলিয়া উঠিল, "না আমি আপনাকে দস্যু বলিয়া ঘৃণা করিতে পারি না।"

৮

অনিল কলিকাতায় পড়িতে আসিয়াছে। দলপতি সমস্ত খরচ দিয়া, সকল অভাব দূর করিয়া কলিকাতায় পড়াইতেছেন। লেখাপড়ায় অসীম অনুরাগের ফলে অনিল ক্রমশ এফ· এ· পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সহসা সংবাদ আসিল দলপতি কয়েকদিনের জ্বরে মারা গিয়াছেন। অনিল অনেকদিন হইতে পিতামাতার স্নেহ কেমন জানিত না ; দলপতির পিতার ন্যায় স্নেহ, মাতার ন্যায় মমতা, ভ্রাতার ন্যায় দয়া ও পত্নীর ন্যায় পরিচর্যা মনে করিয়া আজ অনিল অধীরতাভরে বিবশ হইয়া পড়িল। অনিলের মাথা ঘুরিতে লাগিল। আর ভাবিতে পারিল না। অশান্ত হৃদয়ে শোকাশ্রু ধারায় শয্যাতল ভিজাইতে লাগিল।

অশান্ত সন্তপ্ত হৃদয়ের আকুলতা প্রশমিত হইলে অনিল এক ধনাঢ্যের আলয়ে তাঁহার পুত্রকন্যাকে পড়াইতে লাগিল। সেই অর্থে ও পরীক্ষা দিয়া যে বৃত্তি পাইত, তাহার সাহায্যে সে বি· এ· পড়িতে আরম্ভ করিল।

অনিলের আদর্শ চরিত্র ও সুশিক্ষার গুণে ভাইবোন ক্রমশ উন্নতিলাভ করিতে লাগিল। কিন্তু মেসের কদর্য আহারে ও অতিরিক্ত পরিশ্রমে অনিলের সৌম্যকান্তি দিন দিন কৃশ ও মলিন হইয়া যাতে লাগিল। অনিলের আর সে উৎসাহ নাই, সে আবেগ নাই। তাহাব পাণ্ডুর বদন দেখিয়া ও ক্ষীণ তৃষিত কণ্ঠের রুক্ষস্বর শুনিয়া সুলেখা একদিন সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "মাষ্টার মহাশয়, আপনি দিন দিন এমন কাতর হইতেছেন কেন ? কোন অসুখ হইয়াছে কি ?" অনিল উত্তর দিল, "তেমন কিছু নয়।" মধ্যে মধ্যে অনিল আর এখন পড়াইতে আসিত না। একদিন না আসিলে পরদিন অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিতি হেতু সে কত ব্যাকুলতা জানাইত। দেখিয়া দেখিয়া সুলেখা মর্মে বড় কষ্ট অনুভব করিত। অবশেষে সুলেখা একদিন জননীকে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিল, "মা, এত লোক আমাদের বাড়ীতে খায়, মাষ্টার মহাশয়কে একটু জায়গা দিলে কি হানি ? হয়ত তখন তিনি আমাদের রীতিমত পড়াইবার অবসর পাইবেন।" অনিলের সৌজন্যে সকলেই খুব প্রীত হয়াছিলেন। তাই জননী কন্যার প্রস্তাবে সম্মতি জানাইলেন। পরদিন হইতে অনিল ঐ বাড়ীতে আশ্রয় লইল। ক্রমে অনিল এই পরিবারের একজন হইয়া উঠিল, শেষে ঘনিষ্ঠতা বন্ধনে পরিণত হইল ; এক বৎসর পরে সুলেখার সহিত অনিলের বিবাহ হইল।

৯

সুখে ও সৌভাগ্যে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। অনিলের একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে। অনিল ওকালতি পাশ করিয়া হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রবাহে আইনের কূট প্রশ্নসমূহের সুন্দর মীমাংসা করিয়া অনিলের অল্পদিনেই খুব পসার বাড়িয়াছে। ধনে ও সম্মানে তিনি এখন একজন গণ্য ব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। সুলেখার ন্যায় গুণবতী ভার্যার সহায়তায় অনিলের গৃহে কোন অভাব ছিল না।

অনেকদিন পর একদিন কাছারী হইতে আসিয়া অনিল জলযোগ করিতেছেন। সম্মুখে তাঁহার লক্ষ্মীস্বরূপিনী সুলেখা ও তনয় বসিয়া, ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত "বিরহের" রূপক লইয়া অনিল ও সুলেখা খুব হাসাহাসি করিতেছেন। গোবিন্দবাবুর সন্দেশ খাইবার ন্যায় প্রণয়িনী সুলেখা অনিলকে সন্দেশ খাওয়াইতে যাইতেছেন। আর অভিনয়-মঞ্চের

ফটোগ্রাফা তোলার ন্যায় অনিলের যষ্ঠিগাছি পৃষ্ঠের দিকে অবনত করিয়া সুলেখা ফটো লইতেছেন। সুবোধ ছেলেটি জননীর চিবুক ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "ও মা জানি ? ঐ যেখানে মস্ত একখানা ছবিতে লেখা আছে,—"পানে মাখ কুন্তলীন, কেশে দাও দেলখোস্, রুমালেতে তাম্বুলীন, ধন্য হবে এইচ· বোস !" ছেলের কথা শুনিয়া জনক জননী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। অনিলের মুখের সন্দেশ মাটীতে আর সুলেখার ফটোতোলা যন্ত্রটা অনিলের পৃষ্ঠে ধপাৎ করিয়া পড়িল। দুইজনে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লেখা আছেরে, নিখু।" নিখিল উত্তর দিল, "রুমালেতে কুন্তলীন, পানে খাও এচ্ বোস, কেশে মাখ তাম্বুলীন, ধন্য হবে দেলখোস্ !" এমন সময় কপাট ঠেলিয় তনিমা বিদ্যুৎবেগে উদাসিনীর বেশে গৃহে প্রবেশ করিল।

সুষমাসুন্দরী দাসী

ভুল

১

জীবনে অনেকেই এমন অনেক ভুল করিয়া থাকেন, যাহা চিরকালের জন্য অনুতাপের কারণ হয়, কিন্তু আমার মত সামান্য আমোদ করিতে গিয়া এরূপ ভুল কেহ কখনও করিয়াছেন কিনা জানি না।

সে আজ প্রায় সাত বৎসরের কথা। তখন আমি প্রেসিডেন্সিতে বি· এ· পড়ি। উইলিয়মস্ লেনের একটি ছোট মেসের দ্বিতলে একটি কাঠের পর্দাযুক্ত কক্ষে আমার বাসস্থান। মেসে আরও অনেকগুলি ভদ্রলোক থাকেন। সকলেই আফিসে কর্ম্ম করেন। বিদ্যার্থীর মধ্যে কেবল আমি ও প্রকাশদা। প্রকাশদা আমার সহোদর না হইলেও, বহুদিনের বন্ধুতায় ও 'গ্রামসুবাদে' আমি তাঁহাকে "দাদা" বলিয়াই ডাকি,—তিনিও আমকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত স্নেহযত্ন করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার ঘরখানিতে আমি শুধু একেলা থাকিতাম। প্রকাশদা ও একটি মার্চেন্ট অফিসের হেড্‌ক্লার্ক একঘরে থাকিতেন। আমাদের মেসের ঠিক সম্মুখে, চারি হস্ত মাত্র দূরে, গুপ্ত সাহেবের প্রকাণ্ড দ্বিতল শ্বেত অট্টালিকা আপনার ঐশ্বর্য্য গর্ব্বে সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান। বাড়ীটি মেসের এত নিকটে যে অনায়াসে একখানা ছোট তক্তার সাহায্যে 'এ ছাদ ও ছাদ' করা যায়। বাড়ীর এ অংশটা বোধ হয় গুপ্ত সাহেবেরা ব্যবহার করিতেন না, কারণ আমার ঘরের সম্মুখের জানালা আমি ত কখনও খুলিতে দেখি নাই; মনুষ্য বাসের চিহ্নও কিছু সেদিকে দেখা যাইত না।

সন্ধ্যার সময় কোন দিন আমার ঘরে কোন দিন বা প্রকাশদা'র ঘরে একটি ছোট-খাটো মজলিস বসিত। অনেকগুলি ভদ্রলোক আসিয়া জুটিতেন ও তাঁহাদের সারাদিনের সঞ্চিত গল্পরাশির বোঝা নামাইয়া যথাসাধ্য আমাদের সান্ধ্য-পাঠের ও সময়ের অযথা ক্ষতি করিয়া দিতেন। তাঁহাদের সে ক্ষুদ্র সভায় চুরুটের ধোঁয়ার সহিত রাজনীতি, সমাজনীতি হইতে, ছোটখাট কোন আলোচনাই বাকী থাকিত না।

একদিন বিকালে কলেজ হইতে বাসায় ফিরিয়া দেখি, গুপ্ত সাহেবের বাড়ীর আমাদের দিকের রুদ্ধ গবাক্ষ সহসা মুক্ত হইয়াছে! প্রায তিন বৎসর এই মেসে আসিযাছি, কিন্তু কখনও এদিকের জানালা খুলিতে দেখি নাই, তাই একটু কৌতূহলের সহিত সেই দিকে

চাহিয়া দেখিলাম। মুক্ত পথে গৃহস্থিত সমস্ত দ্রব্যই বেশ সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। ঘরখানি প্রশস্ত—কক্ষ গাত্র কারুকার্যখচিত. খাঁটি ইংরাজী ফ্যাসানে সজ্জিত। কৌচ, কেদারা, টেবিল, হোয়াট্ নট, পিয়ানো প্রভৃতি সুদৃশ্য বহুমূল্য আসবাবে ঘরটি পূর্ণ। দেওয়ালে খানকয়েক ফটো ও কয়খানি অয়েলপেন্টিং। টেবিলের উপর জাপানদেশীয় কাচের একটি ফুলদানি—তাহার উপর সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলের তোড়া। দেওয়ালের এক পার্শ্বে জাপান দেশজাত বাঁশের ব্র্যাকেটে কতকগুলি দেশী ও বিলাতী গন্ধদ্রব্যের শিশি। মেহগিনি কাঠের দুইটি আলমারিতে সুন্দর বাঁধানো কতকগুলি পুস্তক। মুক্ত বায়ু গৃহস্থিত একটা সুস্নিগ্ধ সুমিষ্ট সুগন্ধ বহিয়া আনিতেছিল। আমি মুগ্ধনেত্রে কক্ষ সজ্জা দেখিতেছিলাম ও মনে মনে গৃহস্বামীর অতুল ঐশ্বর্যের বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম, সহসা গৃহস্থিত একখানা সোফাব উপর আমার দৃষ্টি পতিত হইল ;—দেখিলাম, অর্দ্ধশায়িতভাবে একটি অনিন্দ্যনীয়া সুন্দরী কিশোরী পুস্তক পাঠ করিতেছেন। তাঁহাব তরঙ্গায়িত নিবিড় কৃষ্ণ ঘন কুন্তলরাজি সোফার বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রমণী সুন্দরী—খুব সুন্দরী—সচরাচর সেরূপ সুন্দরী দেখা যায় না। সত্য কথা বলিতে কি, আমাব জীবনে আমি আর কখনও তেমন সুন্দরী দেখি নাই।

আমার যদি তখন প্রেমে পড়িবার সুবিধা থাকিত—তাহা হইলে সেই মুহূর্তেব দর্শনে আমার অদৃষ্টে কি ঘটিত জানি না. কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় আমাব মনের গতিক ঠিক প্রণযের উপযোগী ছিল না। রমণীকে দেখিয়া আমি এমনই ভীত হইযাছিলাম যে, বেত্রহস্তে বাল্যকালেব পাঠশালার গুরুমহাশয়কে দেখিয়াও বোধহয় কখনও সেরূপ ভীত হই নাই। রমণী যদি আমায় দেখিয়া থাকেন, ছি ! ছি ' তিনি কি নিশ্চয়ই মনে করিবেন না যে, আমি তাঁহাকে দেখিবাব উদ্দেশেই দাঁডাইযাছিলাম ' লজ্জিত হইযা ধীবে ধীবে নিঃশব্দে আপনার ঘবেব জানালা বন্ধ কবিযা দিলাম। পাঠক হযত এইখানেই পুস্তকও বন্ধ করিবেন,—কিন্তু কি করিব, আমি ত অকারণ মিথ্যা বলিতে পারিব না।

সেইদিন সন্ধ্যাব সময় হার্মোনিযম কিম্বা পিযানো সংযোগে, (ঠিক বলিতে পাবি না) সুমিষ্ট নাবীকণ্ঠের সুমধুব সঙ্গীতে আমাদের নীবস নির্জীব মেসটাও ক্ষণকালেব জন্য সরস হইয়া উঠিল। গান সম্বন্ধে অনেকেই অনেক বকম মত প্রকাশ করিলেন। প্রকাশদা হাসিযা বলিলেন, "কিহে হিরু, ব্যাপারখানা কি ?" আমি বলিলাম. "ব্যাপাব ত দেখতেই পাচ্ছ। গাচ্চে কে বল দেখি।" প্রকাশদা হাসিযা বহস্যেব সুরে বলিলেন, "স্ত্রীলোকের গলা বলেই ত মনে হচ্ছে ! তোব সঙ্গে কি আলাপ হযেছে নাকি ?" আমি হাসিয়া বলিলাম, "আলাপ না হলেও, আমি দেখেছি। সে দেখতে ঠিক—না বলব না।" প্রকাশদা একটু গম্ভীব ভাবে বলিলেন, "বুঝেছি, সে দেখতে খুব সুন্দর। দেখিস ভাই সাবধান ! যেন প্রেমে পড়িস নে ? উপস্থিত পরীক্ষাব প্রেমে পডাটাই বেশী দবকারী।" আমি ক্রুদ্ধভাবে বলিলাম. "যাও যাও, তোমার আর উপদেশ দিতে হবে না, তুমি নিজে সাবধান হও।"

সেই হইতে আর তাঁহাকে দেখি নাই, যদিও তাঁহার জানালা প্রায়ই খোলা থাকিত, কিন্তু তাহাকে কোন দিন দেখিতে পাই নাই। অবশ্য আমিও তাঁহাকে দেখিবার জন্য কোন চেষ্টা করি নাই, সময় সময় অলঙ্কারের মৃদ সিঞ্জনধ্বনির সহিত আমাদের সম্মুখের মুক্ত গবাক্ষ কিশোবীব আগমন জ্ঞাপন কবিয়া রুদ্ধ হইয়া যাইত। সে বৎসর আমাদেব বি· এ· একজামিন ; আমি তখন বিপুল মনোযোগেব সহিত পড়িতে ব্যস্ত। রমণীর খবর লইবার বড একটা ইচ্ছা বা অবসর ছিল না। কিন্তু প্রকাশদা প্রায়ই রমণী সম্বন্ধে আমায় ঠাট্টা করিতেন,—বুঝিতাম এটা শুধু আমাব অবস্থা সর্বদা স্মরণ রাখিবার জন্য স্নেহের উপদেশ—কিন্তু বুঝিলেও এটা আমার মোটেই ভাল লাগিত না। একদিন কি দুর্বুদ্ধি ঘটিল

জানি না, মনে মনে স্থির করিলাম, প্রকাশদা'কেও জব্দ করিব। দুষ্ট ইচ্ছা সাধনের সুযোগের অভাব হয় না। আমারও হইল না। অচিরেই সুযোগ ঘটিয়ে গেল।

সেদিন বিকালে কলেজ হইতে ফিরিয়া দেখি গুপ্তসাহেবের বাড়ীর জানালা খোলা, এবং গৃহাধিকারিণীও নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ-নিমগ্না। নিঃশব্দে প্রকাশদার ঘরে গেলাম, তিনি সেই মাত্র কলেজ হইতে আসিয়া জুতা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন। আমি বলিলাম, "প্রকাশদা একবার শীগগির এস ত, একটা পাখী ধরব, গোল করো না।" তিনি আমার 'এত বয়সেও ছেলেমানুষি' না যাওয়ার জন্য মৃদু তিরস্কারের উদযোগ করিতেছেন, কিন্তু আমি সে কথায় কর্ণপাত মাত্র না করিয়া, তাঁহাকে জোর করিয়া টানিয়া আনিলাম। গৃহে প্রবেশমাত্রই তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখের খোলা জানালায় পতিত হইল। তিনি মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অস্তগামী রবির স্বর্ণরশ্মি কিশোরীর সুন্দর মুখে পড়িয়াছিল, আলুলায়িত নিবিড় কেশদাম মধ্যবর্তী অনিন্দ্যনীয়া রমণীমূর্তি ঠিক যেন ভাস্কর প্রতিমার মত দেখাইতেছিল। সুচিক্কণ হরিদ্রা বর্ণের রেশমী বস্ত্রে তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। আমি হাসিয়া বলিলাম, 'এইবার প্রকাশদা আর আমার সঙ্গে লাগবে?' সহসা দুইটি উজ্জ্বল কালো চোখের ভৎসনাপূর্ণ দৃষ্টি যুগপৎ আমাদের উভয় অপরাধীর মুখে পতিত হইল। কিশোরী একবার মাত্র নিতান্ত অবজ্ঞাভরে আমাদের দিকে চাহিয়াই গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া দিলেন। আর আমরা দুটি বি এ ক্লাসের ছাত্র লজ্জায় মাটিতে মিশাইয়া গেলাম। প্রকাশদা নিতান্ত ব্যথিতভাবে বলিলেন, "ছিছি, ঠিক ভাল কাজ করলে না।" আমিও তাহা অক্ষরে অক্ষরে বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু তখন আর বুঝিলে ফল কি? মানুষ সহজে নিজের দোষ স্বীকার করিতে ভালবাসে না, মনে মনে আপনাকে অপরাধী বুঝিলেও, বাহিরে শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলাম "তুমি দেখলে কেন?" হায়! কে জানিত সেই মুহূর্তের অবিবেচনার ফল আমার চিরজীবনের অনুতাপের কারণ হইবে?

২

এই ঘটনার পর প্রায় সপ্তাহ কাটিয়া গেল। সে জানালা আর খুলিতে দেখি না—না খুলিলেই ভাল, কিন্তু সেই দিনকার সেই ঘটনার পর হইতেই প্রকাশদার কেমন যেন পরিবর্তিত ভাব দেখিতে লাগিলাম। তিনি যেন সর্বদাই কেমন গম্ভীর চিন্তাকুল—যেন কিসের অনুসন্ধানে উৎসুক। তাঁহার সদাপ্রফুল্ল হাস্যবদন যেন বিষাদের সূক্ষ্ম আবরণে আবরিত। অনেক সময় এমনি অন্যমনস্ক যে তিন চারিবার ডাকিয়াও উত্তর পাওয়া যায় না। কখনও বা অর্থশূন্য দৃষ্টিতে মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে তাঁহার এই পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন, "শরীর খারাপ, তাই কিছু ভাল লাগে না।" আমিও বুঝিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম।

একদিন কলেজ হইতে বাসায় আসিয়া দেখি প্রকাশদা জ্বর করিয়া পূর্বেই আসিয়াছেন। মেসের চাকর শিবু বলিল, "প্রকাশবাবু কাল সারারাত ছাদে বেড়াইয়াছেন, তা আর জ্বর হবে না? এই ভাদ্দর মাসের হিম?" তাড়াতাড়ি বই ফেলিয়া তাঁহার ঘরে ছুটিলাম। গিয়া দেখি জ্বরে তাঁহার সর্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইতেছে। বাহিরে আসিয়া অগ্রে শিবুকে ডাক্তার আনিতে পাঠাইলাম। বিদেশে আত্মীয়স্বজনহীন অবস্থায়ও প্রকাশদার সেবা ও চিকিৎসার কোন ত্রুটি হইল না। মেসের সমস্ত ভদ্রলোকই যথাসাধ্য তাঁহার সেবাযত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই পরের 'চাকর'। ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহাদের কামাই করিবার যো নাই। আমি

কয়দিন সর্বকর্ম পরিত্যাগ করিয়া দিবানিশি তাঁহার নিকটেই রহিলাম। প্রকাশদা আমা অপেক্ষা দুই বৎসরের বড়, কিন্তু তিনি আমাকে ঠিক নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিকাশের মতই স্নেহ ও যত্ন করিতেন। তাঁহার অসুখে আমি বড়ই অভিভূত হইয়াছিলাম। কেহ কেহ বাড়ীতে খবর পাঠাইতে বলিলেন ; কিন্তু অনেক বিবেচনার পর বাড়ীতে সংবাদ দেওয়া স্থগিত রহিল। প্রকাশদার বাড়ীতে তাঁহার বিধবা মা ও আট বৎসরের একটি ছোট ভাই ভিন্ন অন্য অভিভাবক কেহই ছিল না, এ অবস্থায় তাঁহাদের সংবাদ দিয়া অধিক বিপন্ন করা বই কোন ফলই হইবে না।

১৭ দিনের দিন প্রকাশদার জ্বর একেবারেই ছাড়িয়া গেল, আমিও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম, মনে মনে ঈশ্বরের অসীম করুণার জন্য প্রণাম করিলাম। প্রকাশদার অসুখের জন্য আমার কলেজ যাওয়া একেবারেই বন্ধ হইয়াছিল, সে দিন অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্তভাবে কলেজ গেলাম। পীড়িতাবস্থায় প্রকাশদাকে আমার ঘরেই রাখিয়াছিলাম কারণ আমার ঘরটিই কেবল অপেক্ষাকৃত খালি ছিল। প্রকাশদার ঘরে আমাদের দুজনের থাকিবার স্থান হইত না। অপরাহ্নে কলেজ হইতে ফিবিয়া দেখি প্রকাশদা বালিশে হেলান দিয়া একাখানা সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন। আমায় দেখিয়া কাগজখানা রাখিয়া বলিলেন, "হিরু এসেছ, এতক্ষণ একা যেন একটা যুগ বলে মনে হচ্ছিল", আমি বলিলাম, "প্রকাশদা আমারও বড় ভয় হচ্ছিল, যে বাড়ী গিয়ে আবার না জানি তোমায় কেমন দেখব।" তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "তোর ধার আমি কখনও শুধতে পারব না। হিরু, তুই আমার মাব পেটের ভাইয়ের চেয়েও বেশী।" তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, আমারও নির্জল ছিল না। তাই তাড়াতাড়ি বস্ত্রাদি পরিবর্তনের জন্য বাহিরে গেলাম, অল্প পরে আমি ঘরে ফিরিয়া আসিলে প্রকাশদা বলিলেন, "হিরু, দেখত কোথা থেকে সুন্দর ফুলেব গন্ধ আসচে ? এ গন্ধ আরও অনেকদিন আমি পাইযাছি।" এ স্নিগ্ধ সুমিষ্ট সৌরভ আমার পরিচিত, তাই বিনা চিন্তায় বলিলাম, "ও বুঝি ফুলের গন্ধ হল ? ও ত গুপ্তসাহেবের বাড়ীর কুন্তলীনের গন্ধ।" প্রকাশদা পরিত্যক্ত সংবাদপত্রখানা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "তাঁহারা কি জানালা খুলেছেন নাকি ?" আমি হাসিয়া বলিলাম, "তাই ত দেখচি ! আমি আব ওদিকে চেয়ে দেখি না—কাজ কি বাবু 'আদার ব্যাপারির জাহাজের খবরে ?' তিনি কথা কহিলেন না—কিন্তু ক্ষণেকের জন্য তাঁহাব রক্তহীন বিবর্ণ মুখ উজ্জ্বল রক্তিমরাগে রঞ্জিত হইযা উঠিল। পরক্ষণেই তিনি অধিকশ্রান্তভাবে বালিশে মাথা রাখিয়া শয়ন করিলেন।

দেখিতে দেখিতে এক মাস চলিয়া গিয়াছে, সম্মুখেই 'পূজার বন্ধ'—শনিবার কলেজ হইয়া আমাদের ছুটি হইবে—আজ শুক্রবাব, আত্মীয় বন্ধুহীন বিদেশ হইতে স্নেহময় বন্ধুবান্ধবপূর্ণ স্বদেশে যাইতে, জনক জননীর স্নেহকোলে আশ্রয লইবার জন্য প্রাণ কত আকুল হইয়া উঠে, তাহা আমার মত ভুক্তভোগীরাই ভাল জানেন। প্রকাশদা শরীর দুর্বল বলিয়া বাড়ী যাইতে রাজী হইলেন না, বিশেষত, এই বৎসরেই আমাদের এক্‌জামিন, অসুখে পড়াশুনা ভাল না হওযার জন্যও প্রকাশদা যাইতে রাজী হইলেন না, সুতরাং আমার একা যাওয়াই স্থির হইল।

বিকালে কলেজ হইতে ফিরিয়া আপনার আবশ্যকীয় জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিতেছি ; প্রকাশদা আসিয়া বলিলেন, "হিরু, কাল সুবিধা হবে না বলে—আজই জিনিসগুলা কিনে নিয়ে এলুম, মাকে দিও" বলিয়াই তিনি কতকগুলা কাপড় প্রভৃতি টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন। পরক্ষণেই হাসিতে হাসিতে পকেট হইতে একটি সুন্দর সুদৃশ্য এসেন্সের শিশি বাহির করিয়া বলিলেন, "আর এইটি তোমার পূজার উপহার ; গরীব দাদা—" আমি বাধা

দিয়া বলিলাম, "যাও যাও, তোমাকে আর চালাকি কর্তে হবে না।" শিশিটা লইয়াই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলাম, "এইচ বোসের দেলখোস্।" বিনা বাক্যব্যয়ে পকেটস্থ করিলাম। পরদিন যথাসময়ে জিনিসপত্র গুছাইয়া বাড়ী চলিলাম, কথা রহিল, আমার অনুপস্থিতিকালে প্রকাশদা আমার ঘরেই থাকিবেন। যাইবার সময় ইচ্ছা করিয়াই একবার গুপ্তসাহেবের বাড়ীর দিকে চাহিলাম। ঈষৎ-মুক্ত গবাক্ষপথে দুইটি উজ্জ্বলায়ত কৃষ্ণচক্ষু বোধহয় আমার "বিদায় আয়োজন" দেখিতেছিল ; আমি চাহিবামাত্র মৃদু মধুর বলয় ধ্বনির সহিত গবাক্ষ রুদ্ধ হইয়া গেল। প্রকাশদার মুখের দিকে চাহিলাম, তিনি তখন নতনেত্রে জুতার রেশম নির্মিত ফুলের বাহার দেখিতেছিলেন। তাঁহার রোগশীর্ণ মুখে ঈষৎ রক্তিমাভা প্রকটিত হইয়াছিল ; জানি না উহা আমার চক্ষের ভ্রম কি না ! প্রকাশদা ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়া আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিলেন ; ট্রেন ছাড়িলেও, যতদূর দৃষ্টি চলে, তিনি স্নেহপূর্ণ নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

৩

দেখিতে দেখিতে পূজার ছুটি ফুরাইল.—আমার কলিকাতা যাত্রার সময় আসিল। কদিন পিসিমা (প্রকাশদার মা) আমাদের বাড়ী আসিয়া মাথার দিব্য দিয়া প্রকাশদাদাকে বিশেষ সাবধানে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে বলিয়া গেলেন, আরও বলিলেন, হরকুমার দত্তর মেজ মেয়ের সহিত প্রকাশদার বিয়ের একরকম ঠিক করিয়াছেন 'মেয়েটী বড় শান্ত', 'বেশ নরম নরম গড়ন'—আর তারা 'দেবে থোবেও ভাল।' এবার আর কোন ওজর "আপত্যি" তিনি শুনিবেন না, তাহাও বলিয়াছিলেন। 'ভারতে এসে মেয়ে জন্মের কোন সাধই' তাঁর পূর্ণ হয় নি। প্রকাশদা যদি এ বিয়ে না করেন, তহা হইলে তিনি কাশীবাসিনী হইবেন, এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন। বিনা প্রতিবাদে তাঁহার সকল আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইয়া আত্মীয় বন্ধুর স্নেহ ভালবাসা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আবার কর্তব্যের পথে যাত্রা করিলাম। কলেজ খুলিতে আর একদিন মাত্র বিলম্ব আছে।

ষ্টেশনে গাড়ি থামিবামাত্র দুইটি স্নেহ-চঞ্চল চশ্মামণ্ডিত চক্ষু ও একখানি হাস্যজ্জ্বল মুখের জন্য উৎসুক নেত্রে চারিদিকে চাহিলাম, কিন্তু কৈ ? প্রকাশদা আমায লইতে আসেন্নি ত ? আমি ত পূর্বাহ্নেই তাঁহাকে সংবাদ দিয়াছি ; তবে কি তাঁহার 'অসুখ বিসুখ' কবিল নাকি ? চিন্তিতভাবেই বাসায় চলিলাম। আমাদের বাসা শেয়ালদ ষ্টেশনের খুব নিকটেই। পৌঁছিতে অধিক সময় লাগিল না। নিকটে আসিতে গুপ্তসাহেবের প্রকাণ্ড অট্টালিকার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম গাড়ি বারাণ্ডায় খানকতক বড় বড জুড়ি, ব্রূহাম, বেরুচ প্রভৃতি নানা জাতীয় গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। লোকজনও সব ছুটাছুটি করিয়া আসা যাওয়া করিতেছে। ব্যাপার কি বুঝিলাম না,—মনে করিলাম হয়ত ভোজের আয়োজন, কারণ মধ্যে মধ্যে প্রায়ই তাঁহার বাড়ী সাহেববিবির শুভাগমন দেখিতে পাইতাম ; (বাঙ্গালীর ত কথাই নাই।) বাসায় ঢুকিতেই শিবুর সহিত দেখা হইল ; জিজ্ঞাসায় জানিলাম, প্রকাশদা বাডী আছেন এবং ভাল আছেন। শুনিয়া মনে মনে একটু অভিমান হইল। প্রকাশদা তাহলে আমায় আর পূর্বের মত স্নেহ করেন না ! কিন্তু সে অভিমান শীঘ্রই দূর হইল,—ঘরে ঢুকিয়া দেখি প্রকাশদা দ্বারের দিকে সম্মুখ করিয়া কতকগুলা পুস্তক ছড়াইয়া টেবিলের উপর মস্তক রক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন, এতদূর চিন্তিত যে সশব্দে আমার গৃহপ্রবেশেও তাঁহা ধ্যান ভাঙ্গিল না। নিকটে গিয়া দেখি বইগুলা সবই ডাক্তারি !—ব্যাপার কি ? প্রকাশদা ডাক্তারি শিখিবেন

নাকি ! আমি ধীরে ধীরে তাঁহার স্কন্ধে হাত দিয়া ডাকিলাম, "প্রকাশদা ?" সহসা নিদ্রোত্থিতের ন্যায় চমকিতভাবে তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন ; এই এক মাসে প্রকাশদার শরীরের অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে, দীর্ঘকাল রোগে ভুগিয়াও তাঁহার চেহারা এতদূর খাবাপ হয নাই। সেই উন্নত, সরল, সুঠাম দেহ যেন ভাঙ্গিয়া সম্মুখভাগে নত হইয়া পড়িয়াছে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে। আমায় দেখিয়া ঈষৎ অপ্রস্তুতের ভাবে প্রকাশদা বলিলেন, "হিরু, এসেচ ভাই ? আবার আমার শরীব বড়ই খারাপ—তাই তোমায় ষ্টেশনে আন্‌তে যেতে পারিনি।" আমি দুঃখিতভাবে বলিলাম, "সেজন্য কোন ক্ষতি হয়নি, কিন্তু তোমার শরীরেব এই অবস্থা, অথচ আমি প্রত্যেক পত্রে তোমার ভাল থাকার খবর পেয়েচি।" শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ভাল থাকার কথা বলচ্ ? ভালই আমি ছিলাম—আজ কেমন একটু শরীরটা বেভাব মনে হচ্ছে ?" আমি ব্যথিতভাবে বলিলাম, "প্রকাশদা তুমি আমায লুকুচ্চ ? আমি কি তোমায় দেখে বুঝ্‌তে পাচ্চি না ?" "না হিরু, সত্যই আমার অসুখ কিছু হয়নি"—বলিয়াই তিনি বাড়ীর কথা, মা'র কথা, ছোটভাই বিকাশের কথা প্রভৃতি নানাকথায় আমায় ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন ; যথাযথ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলাম। প্রকাশদাব মা তাঁহাব বিবাহেব জন্য যে অনুবোধ করিতে বলিযাছিলেন, কেবল তাহাই বলিলাম না, কারণ তাঁহাব শরীরেব অবস্থা দেখিযা সে কথা বলিবার প্রবৃত্তি হইল না।

রাত্রে আহারেব সময় প্রকাশদাকে দেখিলাম না ; জিজ্ঞাসায় জানিলাম, তাঁহার শরীর ভাল নয় সেইজন্য প্রায়ই তিনি রাত্রে আহার করেন না ; অদ্যও করিবেন না। মেসের অধ্যক্ষ বিপিনবাবু বলিলেন, "প্রকাশবাবুব শরীর দিন দিন অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িতেছে—অথচ ডাক্তার ডাকিতে কিম্বা ওষুধ খাইতে বলিলে হাসিয়া উডান।" শয়নের পূর্বে প্রকাশদা'র ঘরে গেলাম, তাঁহাকে নিদ্রিত বলিয়াই মনে হইল, না জাগাইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

কত রাত্রে ঠিক বলিতে পারি না—বোধ হয় রাত্রি তখন ২৷৷০টা হইবে—একটা ভীষণ কোলাহলে সহসা ঘুম ভাঙ্গিযা গেল ! খানিক চুপ করিয়া শুইয়া রহিলাম। শব্দ ক্রমেই অধিক বাড়িতে লগিল। কাবণ কি জানিবার জন্য তাড়াতাড়ি অন্ধকারে হাতড়াইযা বাহিরে আসিলাম, আসিবাব সময অসাবধানে সহসা হাত লাগিয়া টেবিলের উপর হইতে প্রকাশদা'র স্নেহেব উপহার 'দেলখোসেব' শিশিটী পড়িয়া গিয়া শতধা চূর্ণ হইয়া গেল। এই আকস্মিক ক্ষতিতে বড বিরক্তি বোধ হইল ; সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য করিবাব তখন সময় ছিল না,—তাডাতাডি বাহিবে আসিলাম।

গোলযোগে মেসের সকলেই জাগিযাছেন, কেবল প্রকাশদাকে দেখিলাম না। বাহিরে আসিতেই বুঝিলাম গুপ্তসাহেবেব বাডীব দিক হইতে একটা ভয়ানক ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। সকলেই "হায হায়" করিতেছেন। শুনিলাম গুপ্তসাহেবের একমাত্র শিক্ষিতা রূপবতী কন্যা প্রভাবতী আর এ জগতে নাই। হৃদয়ে একটা দারুণ আঘাত লাগিল। সেই সুন্দরী, সেই লোকললামভূতা লাবণ্যময়ী কিশোরী—এই অল্প বয়সেই মৃত্যুব শীতল ক্রোড়ে শায়িতা ? কথা প্রসঙ্গে জানিলাম, গুপ্ত সাহেবের চারি পুত্র—এক কন্যা। কন্যাটী এতাবৎকাল লবেটো'তে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন—সম্প্রতি স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় বাটী আসিয়াছিলেন। ডাক্তাবেরা বলেন, অল্প বয়সে অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমেই রোগের উৎপত্তি। রোগটা তাঁহারা হৃদরোগ বলিয়াই নির্দেশ করেন। ধনী পিতা একমাত্র কন্যার চিকিৎসায় যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া কলিকাতার প্রধান প্রধান ইংরাজ বাঙ্গালী চিকিৎসক

আনিয়া চিকিৎসা করাইয়াছিলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর ভবিতব্য তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করিযা দিল। অসময়ে স্নেহময় জনক জননীর বক্ষে নিদারুণ শেল বিদ্ধ করিয়া স্বর্গের ফুল ভালরূপে না ফুটিতেই ঝরিয়া গেল।

সে রাত্রে আর কাহারো নিদ্রা হইল না, প্রকাশদা কিন্তু স্বচ্ছন্দে আপনার রুদ্ধ কক্ষে নিদ্রামগ্ন! তাঁহার গৃহসঙ্গী কেরাণীটিও এ সময়ে অনুপস্থিত, সুতরাং তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইবার কেহ ছিল না, সকলেই প্রকাশদা'র এই 'কুম্ভকর্ণ-নিদ্রার' সম্বন্ধে নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। আমি কিছুই বলিলাম না। কিন্তু সত্যিই কি তিনি নিদ্রিত?

ভোর হইতে না হইতেই প্রকাশদা'র ঘরে গেলাম, তখনও ভালরূপে অন্ধকাব ঘুচে নাই, প্রকাশদা ঘরের সমস্ত জানালা খুলিয়া দিয়াছেন। মুক্ত গবাক্ষ দিয়া শীতল বাতাস ঈষৎ শৈত্য বহন করিয়া আনিতেছিল। ঘরে ঢুকিতেই অভ্যাসবশতঃ গুপ্ত সাহেবের বাটীর সেই গবাক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিলাম; গবাক্ষ উন্মুক্ত, লেশসংযুক্ত নেটের পর্দাব ভিতর দিয়া গৃহস্থিত সমস্ত দ্রব্যই দেখা যাইতেছিল; গৃহস্থিত দ্রব্যাদি যথাযথ সমস্তই ঠিক আছে। কিন্তু সেই সকলের অধিকাবিণী সেই সুন্দরী? তিনি আজ কোথায়? দীর্ঘশ্বাস ফেলিযা প্রকাশদার দিকে চাহিযা দেখিলাম। তিনি তখন বাশিকৃত কাগজপত্র কাপডচোপড ছড়াইযা ট্র্যাঙ্ক গুছাইতেছিলেন। আমায় দেখিয়া বলিলেন, "হিরু, কাল তোমায় বলা হযনি—আমাকে এখুনি এলাহাবাদে যেতে হইবে।" আমি বিস্মিতভাবে বলিলাম, "কাবণ?' প্রকাশদা অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "কারণ—বিশেষ কিছু নয়!—হ্যাঁ, কি বলছিলুম, কারণ এই—কাল হবিবাবুর চিঠি পেয়েছি তাঁর বড় অসুখ; তিনি আমায় যেতে বলেছেন।" হরিবাবু প্রকাশদা'র একটী বন্ধু—কিন্তু এতকাল হবিবাবুব প্রতি তাঁহার এ প্রগাঢ় স্নেহের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই, আজ সহসা তাঁহার অসুখের জন্য এই সম্মুখে উদ্যত একজামিনের পড়া বন্ধ রাখিয়া তাঁহাকে দেখিতে যাইবার বিশেষ কি কারণ বুঝিলাম না, তথাপি কোন উত্তর দিলাম না। তাঁহার বন্ধু-দর্শনেচ্ছা যতই থাক, তাঁহাব মুখেব দিকে চাহিয়া আমার কিছুই বুঝিতে বাকি ছিল না। অনিদ্রাশুষ্ক রোদনাবক্ত মলিন মুখ, জীর্ণ-শীর্ণ-বিবর্ণ দেহ আমার সন্দেহের সত্যতা প্রমাণ করিতেছিল। আমায় নির্বাক দেখিয়া প্রকাশদা ধীরে ধীরে অতি অস্ফুট ভাষায় বলিলেন, "হিরু, তুমি কি স্বপ্নে বিশ্বাস কব? আমি করি। তিনি কাল এসেছিলেন।" কাহাব কথা বুঝিযাছিলাম,—উত্তর দিলাম না। তিনি বলিতে লাগিলেন,"সত্যই তিনি এসেছিলেন; আমি এখনও তাঁহাব অঙ্গের স্বর্গীয় সৌরভ অনুভব কচ্চি।" আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "না প্রকাশদা, তুমি ভুল কচ্চ। কাল অসাবধানে আমার "দেলখোসের" শিশিটা হঠাৎ ভেঙ্গে যাওযায, আমাব কাপডচোপড সব ভিজে গেছ্‌ল, এ তারি গন্ধ," প্রকাশদা উত্তব দিলেন না—শূন্য দৃষ্টিতে আমাব মুখেব দিকে চাহিয়া রহিলেন। বুঝিলাম আমার কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে মাত্র,—তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। একজামিনের অদূরবর্তিতা বুঝাইয়া তাঁহার পশ্চিম যাত্রায আপত্তি করিলাম। তিনি বলিলেন, "পড়া সেখানেই বানা হবে কেন?" নানা কথায তাঁহাকে সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করিলাম, তিনি বিষাদের ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "পাগল, আমি কি সেই জন্য যাচ্চি? সে আমার কে? সূর্যজ্যোতি জগতের জীবনস্বরূপ হইলেও সূর্য ধববার সাধ কার হয়?"—এ কথার উপর আর কি বলব? বিশেষত আমি তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতই দেখিতাম—বয়স্যের ভাবে নয়। সেই দিনই ৯টার গাড়ীতে প্রকাশদা এলাহাবাদে চলিয়া গেলেন। বিদায়কালের তাঁহার সেই বিষণ্ণ কাতর দৃষ্টি আমার বুকে শেলের মত বিঁধিতেছিল। তাঁহার এ নিদারুণ মর্মবেদনাব জন্য অপরাধী কে? আমি নই কি? কেন তুচ্ছ

বিদ্রূপের জন্য তাঁহার চিরজীবনের সুখ নষ্ট করিলাম—কেন তাঁহার যৌবনের আশা-কল্পনা-মুগ্ধ নেত্রে রবিকিরণোদ্ভাসিতা মহিমাময়ী লাবণ্য-প্রতিমা অঙ্কিত করিয়াছিলাম ? জীবনের বিনিময়েও যদি সেই মুহূর্ত ফিরাইতে পারিতাম !
বলিবার কথা আর বেশী কিছু নাই। তারপর সুদীর্ঘ সাত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। প্রকাশদা এখন বেরিলিতে ওকালতি করেন, তিন বৎসর হইল তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে। ছোট ভাইটি তাঁহার কাছেই থাকে। বলাবাহুল্য প্রকাশদা আজিও অবিবাহিত, তাঁহার প্রতিজ্ঞা তিনি চিরদিনই অবিবাহিত থাকিবেন, বিবাহে ইচ্ছা নাই ইহাই তাঁহার বক্তব্য। প্রথম প্রথম আত্মীয় বন্ধু সকলেই তাঁহার বিবাহের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন,—অবশেষে সকলেই ভগ্নমনোরথ হইয়া নিরস্ত হইয়াছেন। তাঁহার অকাল বৈরাগ্যের জন্য প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধব সকলেই বিশেষ দুঃখিত, বিশেষতঃ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতৃকুল। কিন্তু আমার কষ্ট সকলের চেয়ে বেশী, আমি জানি আমিই তাঁহার জীবনের সুখ-স্বপ্ন-বিফল করিয়া দিয়াছি। এ ভুলের আর সংশোধন নাই ।।

ইন্দিরা দেবী

বৌদির কাণ্ড

১

যৌবনের প্রথমারম্ভে পাগলামী রোগটা আমার স্কন্ধে আবির্ভূত হইয়াছিল ! ইহাতে আর নূতনত্ব কি ? অনেকেরই তাহা হইয়া থাকে, তবে কিছু ইতর বিশেষ।

তখন সবে বি· এ· পরীক্ষাটি দিয়াছি। বৈশাখ মাসে আমার বিবাহ হইয়া গেল। শুনিলাম রানীর বয়স নাকি ত্রয়োদশবর্ষ অতিক্রম করিয়াছে, এবং সে, দেখিতে খুবই সুন্দরী ! তবে ফুলশয্যার পূর্বে এদেশের বরের ভাগ্যে নবোঢ়া পত্নীর সম্যকদর্শন ঘটিয়া উঠে না ; কাজেই আমি তাহার রূপ ভাল করিয়া দেখিবার অবকাশ পাই নাই।

ফুলশয্যার রাত্রে নানা প্রকার কাব্যালোচনায় রানীর শ্রীমুখ হইতে একটি বাণীও আমার কর্ণে প্রবেশ করিল না দেখিয়া আমি প্রসঙ্গ স্রোতের গতি ফিরাইতে বাধ্য হইলাম। আমি রানীকে কহিলাম, "তোমার বড় দিদিকে আমি কি বলিয়া ডাকিব বল দেখি ?" রানী কোনও উত্তর দিল না ! আমি পুনরায় কহিলাম, "সে দিন বাসরঘরে যিনি আমাকে গান গাহিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন, তিনি তোমার কে হন ?" রানী তথাপি নীরবে বসিয়া রহিল। পরে যখন আমি রানীকে কহিলাম, "তুমি মুখের ঘোমটাটি একবার খোল দেখি ?" তখন রানী যেন কুপিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জিয়া উঠিল, "কেন ?" আমি কহিলাম, "তোমার মুখখানি ভাল করিয়া একবার দেখিব !" রানী কহিল "ছিঃ, তুমি ত ভারি বেহায়া !" আমি কহিলাম, "কিসে বেহায়া ?" রানী কহিল, "ফের যদি তুমি অমন কথা বল, তাহল আমি বাহিরে চলিয়া যাইব।" আমি কহিলাম, "আমাকে মুখ দেখাবে না তবে ?" রানী খুব দীর্ঘভাবে 'না' বলিয়া ঘোমটাটা একটু বেশী টানিয়া দিল। আমার মনে তখন ভারী অভিমান হইয়াছিল। আমার সমস্ত বাক্যবাণ নিষ্ফল হইয়াছে ; আমার একটা কথারও রানী উত্তর দেয় নাই। ক্ষুদ্র একটী বালিকার এত তেজ, এত অহঙ্কার ! আমি ক্রুদ্ধভাবে কহিলাম, "বেশ দেখিতে চাহি না—যতদিন না তুমি সাধিয়া খোসামোদ করিয়া দেখাইতে চাহিবে, ততদিন

আমিও ও মুখ দেখিব না—ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা।"

বহুকাল পূর্ব হইতেই আমি মধুর কবিতার আস্বাদন পাইয়াছিলাম। বিবাহিত জীবনটিকে একটি শুভ্রোজ্জ্বল কাব্য প্রফুল্ল আচ্ছাদনে বেষ্টিত রাখিব, ইহাই আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। সহসা আমার সমস্ত সাধ, আশা ও অভিলাষে এরূপ নির্মম আঘাত পাইয়া বাস্তবিকই আমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছিল। ক্রোধে, দুঃখে ও অভিমানে চক্ষে জল আসিয়াছিল। হায়, এই চিরবাঞ্ছিত, সাধের ফুলশয্যার রজনীর মাধুর্য একেবারে বিফলে কাটিল! প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, প্রথমেই নহবতের ভৈরবী রাগিনী আমাকে আকুল করিয়া তুলিল। আমি পার্শ্বস্থ নবোঢ়া পত্নীর দিকে চাহিলাম; বালিকা ঘুমাইতেছিল।

নহবৎ থামিল। এমন সময়ে পথ হইতে একটা সঙ্গীতেব ধ্বনি আমার কক্ষে প্রবেশ করিল—

"হেসে হেসে গেয়ে গান, দিতে এসেছিলি প্রাণ,
আঁখি-জল সাথে নিয়ে, চলে আয়রে চলে আয়।"

আমি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

২

শ্বশুর মহাশয় একজন সাবজজ। দিন কয়েকেব অবকাশ লইয়া কন্যার বিবাহ দিতে আসিয়াছিলেন। অবকাশকাল সংক্ষিপ্ত কাজেই তাঁহাকে শীঘ্র পবিজনবর্গ লইয়া কর্মস্থলে ফিরিতে হইল। বানীও তাঁহাদের সহিত চলিল।

ফুলশয্যার পরেব রাত্রি হইতে যে কয় রাত্রি রানীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে কয় রাত্রি তাহার সহিত আমাব কোনও কথা হয় নাই। সেও তদ্বিষযে ব্যগ্রতা দেখায নাই, আমিও না!

পরীক্ষার ফল বাহিব হইল। আমি উত্তীর্ণ হইলাম। এ সম্বাদে সন্তুষ্ট হইয়া শ্বশুর মহাশয় ও জ্যেষ্ঠা শ্যালিকা আমাকে পত্র লিখিলেন। শ্যালিকার পত্রের তলদেশে একপার্শ্বে পেন্সিলে লেখা ছিল, "রানীকে চিঠি লেখ না কেন? এবার হইতে লিখিও।" এই লেখাটুকু যেন ভিন্ন হস্তেব বলিয়া বোধ হইল। তবে কি ইহা রানীর হস্তলিপি?

আমি এম· এ· পড়িতেছিলাম প্রেসিডেন্সিতে, এবং তৎসঙ্গে রিপণে, বি এল· এর লেকচারও attend করিতেছিলাম।

পূজার ছুটিতে শ্বশুর মহাশয়, আমাকে তাঁহার কর্মস্থলে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন, আমি তাঁহার উত্তরে লিখিলাম, "অবকাশকাল সংক্ষিপ্ত। অন্য সময চেষ্টা করিব। আর এই নভেম্বরেই এম· এ-টা দিব মনে করিতেছি" ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্বশুর মহাশয় ইহার উপর আর অনুরোধ করিলেন না।

৩

আমার দাদা মজঃফরপুরে ওকালতি করিতেন। বড়দিনের ছুটিতে বাড়ী আসিলেন। মাঘমাসে বৌদির কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ; সুতরাং বড়দিনের ছুটিব পরে বৌদি আব দাদাব সহিত মজঃফরপুরে যাইলেন না।

আমাদের বাটীর ত্রিতলের একটি কক্ষ আমার রিজার্ভ ছিল। সেই শয়ন কক্ষেই আমার

study, বাহিরের ঘরে বাবার patientদিগের কোলাহলে প্রাতঃকালে আমার পাঠের ব্যাঘাত হইত বলিয়াই এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল।

একদিন প্রাতঃকালে, আমি Kant লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি এমন সময় ধীরে ধীরে বৌদি সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বৌদি ডাকিলেন, "ঠাকুরপো।"

আমি বইখানি টেবিলের উপর মুড়িয়া রাখিলাম ; কহিলাম, "কেন বৌদি ?"

বৌদি। "আমার কথা রাখবে ভাই ?"

আমি। "কি বৌদি ?"

বৌদি। "তোমার হাতবাক্সের চাবিটা একবার দাও দেখি !"

আমি বৌদির অভিপ্রায় বুঝিলাম। মনে মনে একটু হাসিয়া কৌতুকপূর্ণ স্বরে কহিলাম, 'কেন, ব্যাপার কি ?"

বৌদি। "দরকার আছে।"

আমি। "কি দরকার ?"

বৌদি। "নাই বা শুনিলে !"

আমি। "না শুনিলে কোন্ বিশ্বাসে চাবি দিব ?"

বৌদি। "কেন ঠাকুবপো, এতদিন ত অবিশ্বাস ছিল না , আজকাল এত অবিশ্বাস কেন ?"

আমি অপ্রতিভ ভাবে কহিলাম, "না, অবিশ্বাস নয় ; এই নিন !"

হাতবাক্সের চাবি পাইয়া বৌদি প্রফুল্ল ভাবে আমাব বাক্স খুলিলেন। আমি চেয়ারেই বসিয়া রহিলাম। বাক্স খুলিতেই সুমধুর "দেলখোস" এসেন্সের গন্ধ কক্ষ মধ্যে একটা সুরভি হিল্লোল বিকীর্ণ করিয়া তুলিল। বৌদি বাক্সটা "খানাতল্লাসী" কবিয়া এক টুকরা কাগজ মাত্র লইয়া উঠিলেন, বাক্সের চাবি আমার হস্তে দিয়া কহিলেন, "খুব সেয়ানা হয়েছ, যাহোক। বৌয়ের চিঠিগুলো কোথা রেখেছ ?"

আমি কহিলাম, "কোথায় আবার রাখিব ?"

বৌদি, "বল না ঠাকুরপো ! আমার এত যত্ন নিষ্ফল হয়ে গেল ! আমাকে চিঠি দেখাতে লজ্জা কি ?"

আমি। "চিঠি থাক্‌লে তদেখাব ?"

বৌদি। "কি রকম ?"

আমি। "চিঠি আমিও লিখি না, সেও লেখে না।"

বৌদি। "তুমি যে অবাক কল্লে ঠাকুরপো ; আজকালকার ছেলেরা ও বিষয়ে বড় সেয়ানা। আমি ও কথা শুনতে চাই না।"

আমি। "সত্যি বলছি বৌদি, চিঠি লেখালেখি আদৌ চলে না।"

বৌদি। "আমি একথা বিশ্বাস করি না !"

আমি। "আপনার হাতে যে কাগজটা রয়েছে ঐটে পড়লেই বুঝতে পাবেন !"

আমি ডায়েরী লিখিতাম। আমার বাক্সের একপার্শ্বে ডায়েরী লেখা কাগজ খণ্ডগুলি পড়িয়া থাকিত। বৌদি তাহা জানিতেন। তিনি সেগুলি বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করতেন এবং তাহা লইয়া তিনি প্রায় আমাকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, "ঠাকুরপো তুমি একটা মাসিক কাগজ বাহির কর।"

যাহা হউক, বৌদির বুদ্ধি একটু অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ ছিল, কাজেই, ডায়েরী পাঠ করিলেই তিনি যে সমস্ত ব্যাপারটি বুঝিতে পারিবেন, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। তাহাতে

লেখা ছিল,—

"কে বলে বিবাহিত জীবনে সুখ আছে? এত কাল ধরিয়া মনে মনে কল্পনার মদিরতুলিকা দ্বারা যে সুমোহন স্বপ্নরাজ্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, আজ তাহার নির্দয় তাড়নায় আমার সে রাজ্য ভীষণ অরণ্যতুল্য হইয়াছে। বালিকার এত তেজ কেন?...আমি শুভ্র পবিত্র মল্লিকাভ্রমে অসার পলাশপুষ্পকে মস্তকে লইয়াছি!...আমার প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রাখিব।—সে নিজে সাধিয়া মুখ না দেখাইলে আমি সে মুখ দর্শন করিব না—এ জীবনে নহে!...দুঃখ কি? এতদিন যে প্রকৃতিরানীর সুষমাময় কাব্যচ্ছটায় আপনাকে স্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল রাখিয়াছিলাম, নীরবে সেই প্রকৃতিরানীর পূজায় আমাব এ জীবনকাল কাটাইয়া দিব, তাহাতে এমন অসাধারণ বা অমানুষিক শক্তির প্রয়োজন নাই। বিষময়ী রমণী সঙ্গিনী না হইলে কেন চলিবে না? আমার মাধবীলতিকা, আমার বাসন্তীকুঞ্জেব কল্পনাবধূ, তাহাবা তো আমার অবাধ্য নহে।"

ডায়েরী পাঠ করিয়া বৌদি কহিলেন, "দেখ দেখি ছেলেমানুষী! ভাগ্যে আমি দেখলুম, ছিঃ ঠাকুরপো, তুমি এত নির্বোধ?"

আমি কহিলাম, "না বৌদি, নির্বোধ নহি। তবে আপনি ত জানেন আমি কিরূপ অভিমানী! এত সাধ্য সাধনাতেও সে যখন আমার একটা কথাও শুনিল না, তখন আমি এই প্রতিজ্ঞা করিলাম। আমার কোনও দোষ নাই। স্ত্রী যে ওরূপ অবাধ্য হইবে, ইহা অসহ্য!"

আমি বৌদিকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলাম।

বৌদি কহিলেন, "ছিঃ তুমি এই রকম! তা আমি জানতুম না। নূতন বৌমানুষ, একেবারে অচেনা, তার সঙ্গে কি অমন ব্যবহার কর্তে আছে? ফুলশয্যার রাত্রে সে যে অমন করেছিল, তাব কারণ লজ্জা ও ভালবাসা পাবার একটা অভিমান-ভবা ইচ্ছা, তুমি যদি তার পরদিন রাত্রে তাব সঙ্গে একবাব কথা কইতে, তাহলেই সব বুঝতে পার্ত্তে!"

আমি কহিলাম, "না বৌদি আপনি তাকে চেনেন না। আমাব প্রতিজ্ঞা শুনে তাব ত পরদিন রাত্রে আমাকে সাধা উচিত ছিল!"

বৌদি কহিলেন, "কখনই নয়। স্ত্রীলোকের লজ্জাই প্রধান বাধা তা জান! তার মন নিশ্চয় কাতর হয়েছিল, কেবল লজ্জায় সে মুখ ফুটে কিছু বলিতে পারে নাই। তাবপর তোমার শালীর চিঠি দেখে যা বুঝিলাম, তাতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সে তোমাকে চিঠি লিখতে বলেছিল। তুমি যদি সেই সময়েও একখানি চিঠি লিখিতে, তাহা হইলে আর এমন হইত না! তা যাহোক এরকম আর চলছে না! এদিকে আব সময় নাই! আমাকে পরশুদিন নীপুর বিয়ের জন্য বাগবাজারে যেতে হবে। কদিনই বা সেখানে থাকব? ফিরে এসেই সব ঠিক কর্ব, তারপর মজঃফবপুব যাব। তা এর মধ্যে তুমি, ঠাকুরপো, তাকে একখানা চিঠি লেখ না!"

আমি কহিলাম, "আজও আমাকে চিন্তে পাল্লেন না, বৌদি?"

বৌদি কহিলেন, "তা বটে, দাদার ভাই, দুনিয়াতে তুলনা নাই!"

৪

ফাল্গুন মাস! বাগবাজার হইতে ফিরিতে বৌদির কিছু বিলম্ব হইল। বৌদি আসিবার তিন দিন পরেই রানী আসিল। আমি সমস্ত ব্যাপার পূর্ব হইতেই জানিতাম!

সন্ধ্যার সময় বৌদি আমাকে কহিলেন, "ঠাকুরপো আজ আর ঘর থেকে বেরিও না!

আমার একটা কাজ আছে।"

রাত্রে আমাদের আহারাদি হইত দশটায় ! আহারাদি সম্পন্ন করিয়া কক্ষমধ্যে একখানা বই লইয়া বসিলাম। এটা কেবল ভণ্ডামি মাত্র। কারণ আমার মন এক মুহূর্তের জন্যও পুস্তকের উপর ছিল না।

সহসা সিঁড়িতে মলের রুনুঝুনু শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমি "নিবাতনিষ্কম্প" ভাবে বসিয়া রহিলাম। অল্পক্ষণ পরেই দ্বার-পার্শ্বে কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, বৌদি বলিতেছেন, "যা যা বলেছি ঠিক যেন মনে থাকে। না, না ঘোমটা নয় ! এই রকম হাঁ ; কেমন খোঁপা বেঁধে দিয়েছি ! ঘোমটা দিলে খোঁপা খারাপ হয়ে যাবে। মনে রাখিস্, আমার কথার যেন একটু নড়চড় না হয়।" অপেক্ষাকৃত মৃদু-কণ্ঠে উত্তর হইল. "ছিঃ দিদি, আমি পার্ব না ; লজ্জা করে যে !"

বৌদি কহিলেন, "লজ্জা করলে ত চল্‌বে না। এ লজ্জার কাজ নয়। ঠাকুরপোর পাগলামীতে তুই বুঝিস না। আমি যা বলছি তাই কব !"

উত্তর—"না দিদি তোমার পায়ে পড়ি, ভারী বেহায়াপনা হবে।"

বৌদি—"ফের ? আমার কথার উপব কথা কস্‌নে ! লক্ষ্মী দিদিটি, যা বলছি তাই কর ! এ বিষয়ে মেয়েমানুষের লজ্জা কর্লে চলে না ! ঐ দেখ বই নিয়ে বসে আছে ; ঘরে ঢুকেই হাত থেকে বইখানা নিবি। তারপর যে যে কথা বলে দিয়েছি। কেমন পার্বি ত ?"

উত্তর—"দিদি—"

বৌদি—"না পারলে যে চলবে না বোন ! বল, আমাব কথা শুনবি ?"

কিছুক্ষণ পরে উত্তর হইল—"শুনবো !"

বৌদি—"তবে যা। আমিও নিচে যাই।"

রুনুঝুনু শব্দ ক্রমশ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। আমি দ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া ছিলাম। সহসা সম্মুখে একটা ছায়া পড়িল। রানী আসিয়া আমার হাত হইতে বইখানি লইল ; আমি চাহিয়া দেখিলাম। একি ! এ যেন কবিতাসুন্দরী জীবন্ত বালিকামূর্তিতে আমার সম্মুখে আবির্ভূতা। তখন আমার মনে হইতে লাগিল—

চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতমত্ত্বযোগা
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতান্নু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সামে
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশঃ তম্যাঃ ॥

রানী একবোরে আমার হাত ধরিয়া কহিল, "এস শুতে এস।"

আমি কহিলাম, "রানী, তুমি এখানে যে ?"

রানী কহিল, "হাঁ, আমি এখানে। কি দেখছ ? এস বিছানায এস, রাত হয়েছে।"

আমি আবার কহিলাম, "রানী, তুমি ?" দেখিলাম রানীর চক্ষে বড় বড় দুই বিন্দু অশ্রু ! গদগদকণ্ঠে রানী কহিল, "হাঁ, আমি। এখনও কি মার্জনা কর নাই ? তুমি বলিয়াছিলে, নিজে সাধিয়া মুখ দেখাইতে চাহিলে, তবে তুমি আমার মুখ দেখিবে। আজ সাধিতেছি, দেখ চেয়ে দেখ, আমাকে পায়ে ঠেলো না।" রানী হস্তদ্বারা আমার পদস্পর্শ করিল ; আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দ্বারের নিকট হইতে একটা ছায়া সরিয়া গেল। আমি ডাকিলাম, "রানী" রানীর গণ্ড বহিয়া অশ্রুস্রোত নামিল। রানী কহিল, "বড়দিদির চিঠিতে আমি তোমাকে চিঠি লিখতে বলেছিলুম। তুমি তা লেখনি ! আমার মনে কত কষ্ট হয়েছিল, তা বলতে পারি না। আমার লজ্জা কর্ত, তাই আমি লিখ্‌তে পারিনি ! তুমি যদি একটি কথা লিখ্‌তে ! শুধু লিখ্‌তে, রানী

আমি ভাল আছি, তাহলে তুমি তখনই আমাব উত্তর পেতে। তাতে সব কথা লিখতুম ! পূজার ছুটির সময় যখন তুমি গেলে না তখন তোমার সেই প্রতিজ্ঞার কথা আমার মনে পড়িল। সেই সময় হইতে আমি কি মনের দুঃখে কাল কাটাইয়াছি, তাহা আমিই জানি ! এখন বল আমাকে মার্জনা করেছ ? আমি সে রাত্রে তোমার না শুনিয়া তোমার মনে বড় কষ্ট দিয়াছিলাম, কেন জান ? শুধু দুটা মিষ্ট আদরের কথার প্রত্যাশায় ; তুমি যদি তারপরের রাত্রে আমাকে আর একবার 'রানী' বলে ডাকতে, তাহলে সেইদিনই সব বুঝতে পারতে !"

আমি সাদরে রানীর অধরে চুম্বন করিয়া কহিলাম, "রানী আমাকে ক্ষমা কর। আমি বুঝিতে পারিয়াছি সবই আমার দোষ ! তুমি আমাকে মাপ কর রানী !"

এমন সময বৌদি কক্ষমধ্যে প্রবেশ কবিয়া কহিলেন, "ওগো কবিমশাই, শুধু কবিতা লেখ, মাথামুণ্ডু কিছু বোঝ না ! এখন স্ত্রীচরিত্রটা বুঝলে তো ? এতদিনে মিলনটা হল ত ? এখন ত চোখের আঁধারের ধাঁ ধাঁ কেটেছে ?"

আমি সস্মিতভাবে কহিলাম, "বৌদি এ আপনার কি কাণ্ড ? Policy-তে দেখছি, Salisbury-ও আপনার কাছে হার মানে ! কক্ষের মধ্যে সেলফের উপর এক শিশি "কুন্তলীন" ছিল। বৌদিদি দ্রুতগতিতে শিশিটা লইয়া তাহা হইতে খানিকটা তৈল আমার মাথায ঢালিযা দিযা কহিলেন, "মাথাটা ঠাণ্ডা হোক্ ' জানলি ভাই, ছোট বৌ, ঠাকুরপোর মাথাটা বড শীঘ্র গবম হযে ওঠে ! ভাবুক লোক কিনা !"

আমি কহিলাম, "কি কল্লেন বৌদি, এই রাত্রে মাথায় খানিকটা তেল ঢেলে দিলেন ? এইটা কি আপনার উচিত হল ?"

বৌদি কহিলেন, "কেন হবে না উচিত ? খুব উচিত ! কি জানি আবাব যদি মাথা গবম হয়ে ওঠে।" আমি কহিলাম, "যান বৌদি, আর জ্বালাবেন না। আমিই না হয ধরা পডেছি, কিন্তু আমার মতন বুদ্ধিমান অনেকেই আছেন ! যাহোক আপনাব এ নাটকখানিতে একটা defect রহিয়া গেল। সব যদি না জানিয়ে কর্তে পার্লেন, দোবের পাশের পরামর্শটা শোনাবারই বা কি এত আবশ্যক ছিল ?"

বৌদি হাসিতে হাসিতে কহিলেন "সেটা আর বুঝতে পার্লে না ? তা এখন ওসব কথা থাক ! ছোট বউ, যা যা শিখিয়েছি মনে আছে ত ? ঠাকুরপো, নাও ভাই, এখন দুজনে বোঝাপড়া কর ; আমি চল্লুম !"

এই কথা বলিযা বৌদি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

আমি রানীর হাত ধরিয়া বিছানার উপর বসাইলাম ; নিজেও পার্শ্বে বসিলাম। একটা পুলক-তাডিত আমার সর্বাঙ্গে প্রবাহিত হইয়া আমার ক্ষুদ্র হৃদযখানিকে বিমলসুখে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিল ! পার্শ্বের বাড়ীতে তখন ললিতকণ্ঠে কে গাহিতেছিল,—

"হায় ! মিলন হ'ল ;
যখন নিভিল চাঁদ, বসন্ত গেল।"

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

অষ্টম বৎসর

সন্ন্যাস

(১)

আমার ষোল বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, এবং তাহার পূর্বেই কিঞ্চিৎ ইঁচড়ে পাকিয়া গিয়াছিলাম। বিবাহের পূর্বে যখন দাদা পাঠদ্দশায় বিবাহ করা উচিত নয় বলিয়া একটু আপত্তি তুলিবার উপক্রম করিতেছিলেন, তখন সম্মুখে গলদশ্রুলোচনা পিসিমাকে অবস্থিত দেখিয়া অগত্যা তাঁহাকে সম্ভাবিত আপত্তির প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে হইয়াছিল।

পিসিমা বলিলেন, "ও কি আমার অদৃষ্টে বাঁচ্‌বে ? তাতে আবার ওর লেখাপড়ার জন্য এত শাসন ! এ বিয়েতে আর অমত কোর না বাবা ; মেয়েটি সুন্দরী, বিয়েটা হলে আমিও নরুর ছেলে মেয়ের মুখ দেখে সুখে মরতে পারি।"

অতএব পিসিমার এই কথায় প্রতিপন্ন হইল পিসিমার অদৃষ্ট অতিশয় মন্দ, এবং তাঁহার অদৃষ্টের দোষেই আমার বাঁচিবার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। যখন বাঁচিবার সম্ভাবনা অল্প তখন লেখাপড়া নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়, এবং বিবাহটা একান্ত প্রয়োজনীয়, বিশেষ যখন মেয়েটি সুন্দরী। এ পর্য্যন্ত বেশ পরিষ্কার বোঝা গেল ; কিন্তু আমার ছেলে মেয়ের মুখ দেখিয়া মরা পিসিমার পক্ষে এত সুখকর কেন, সেইটিই বুঝিতে আমার কিছু গোলমাল ঠেকিতেছিল।

যাহা হউক, দাদা এই সকল অমোঘ যুক্তির বিরুদ্ধে আর কোন আপত্তি উত্থাপনের সাহস করিলেন না। অতএব নির্বিঘ্নে সুষমার সহিত আমার উদ্বাহ-বন্ধন সুসম্পন্ন হইল। কিন্তু এহেন পিসিমার বর্তমানে যে জীবনটা নিরবচ্ছিন্ন সুখের নয় তাহা পরে জানিয়াছিলাম।

(২)

আমার বৌদিদির অনেক দোষ ছিল। প্রথম দোষ তিনি সর্বদাই হাস্যমুখী, তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেই বোধ হইত তিনি হাসিতেছেন। মেয়েমানুষের এত হাসি কেন ? পিসিমার দিকে চাহিয়া দেখ দেখি তিনি কত গম্ভীর ! তা ছাড়া বৌদিদির অন্যান্য দোষেরও সীমা ছিল না ; বৌদিদির দোষেই পিসিমা অন্যমনস্ক হইয়া পা দিয়া দুধের বাটি প্রভৃতি ফেলিয়া দিতেন, হাত হইতে তেলের ভাঁড় পড়িয়া যাইত, পিসিমা দুধ জ্বাল দিতে গেলেই বৌদিদির দোষে কড়ার সমস্ত দুধ উথলাইয়া পড়িত। মানুষের শরীরে আর কতই সহ্য হয় ? কাজেই এ সমস্ত ঘটনা ঘটিলে পিসিমা বৌদিদিকে তিরস্কার করিতেন ; তা বৌ ঝি-র দোষ দেখিলে শাসন না করিলে কি চলে ? তাহাতেই পাড়ার দগ্ধাননীরা পিসিমাকে বৌকাঁট্‌কি বলিত। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি পিসিমা যখন শাসন করিতেন, বৌদিদি তখন তাঁর সম্মুখে ঘাড় হেঁট করিয়া ভিজা বিড়ালটির মত দাঁড়াইয়া থাকিতেন (এ উপমাটি পিসিমা প্রদত্ত)। তখনও তাঁহার মুখ তেমনি হাস্যময় দেখিতাম। বৌদিদির সর্বাপেক্ষা দোষ, তিনি আমার উপর সর্বদা গুরুগিরি করিতেন। আমি তাঁর চেয়ে দু'এক বছরের ছোট হইলেও হইতে পারি, তাই বলিয়া মেয়েমানুষের কাছে উপদেশ লইতে হইবে নাকি ? একে বৌদিদির উপদেশ, তারপর দাদার বকুনি ! কথা বলিতে তো খরচ লাগে না, কাজেই দাদা অনর্গল বকিয়া যাইতেন। (এ কথায় যেন কেহ মনে না করেন—দাদা কৃপণ)।

দাদার সেই সমস্ত বাক্যব্যয়ের ফলে আমি সে দিন দাদার কিছু খরচ বাঁচাইতাম, অর্থাৎ খাইতাম না, সুতরাং পিসিমাও অনাহারে থাকিতেন, অগত্যা বৌদিদি বেচারিরও খাওয়া হইত না।—দেখিয়া শুনিয়া সংসারে আমার নিতান্ত বিরাগ উপস্থিত হইল।

তখন পিসিমা বৌদিদিকে ডাকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ গা বৌমা ! তোমাদের কেমন আক্কেল বল দেখি ?" বৌদিদি শঙ্কিত হইয়া উত্তর করিলেন, "কি হয়েছে পিসিমা ?" "হবে আবার কি ? চোখে কি কিছু দেখ্‌তে পাও না ? নরু আমার দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। বে দিলে, তা বৌ কি আন্‌বে না ? আজ যদি তোমার শাশুড়ী থাক্‌তো তো দেখ্‌তে পেতে নরুর বৌয়ের কত আদর ! আহা, নরু আমার বাঁচবে তার আবার বৌ হবে একথা স্বপনের অতীত।" শেষ কথার সঙ্গে পিসিমার চক্ষে অশ্রুর আবির্ভাব হইল। বৌদিদি ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "আমি তো পিসিমা আন্‌বার কথা বলেছিলাম ; তা ঠাকুরপোর পরীক্ষাটা হয়ে গেলে—"

"পরীক্ষে তো সেই ফাল্গুন মাসে ! তা বলে তদ্দিন ঘরের বউ ঘরে আন্‌বে না ?"

দিন দেখিয়া ২/৩ দিন পরে সুষমাকে বাড়ী আনা হইল।

লোকে বলিত, "আহা দুটি জায়ে কেমন ভাব, যেন মায়ের পেটের বোনের মত আছে দুটিতে।"

কিন্তু পিসিমা সর্বদাই বলিতেন, "ওর শাশুড়ী নেই, ওকে আর কে যত্ন করবে ? বউ ? বউ কেবল রাত দিন খাটিয়েই নিতে পারে, তা না করে খাওয়ার যত্ন, না করে মাখ্‌বার যত্ন।"

বৌদিদি শুনিয়া হাসিতেন। সুষমা কি ভাবিত জানি না ; কিন্তু দেখিতাম সে রোজ বিকালে পিসিমার পাকাচুল তুলিয়া দিত, এবং রাত্রে তাঁহার পায়ে তেল মাখাইত ; সন্ধ্যাবেলায় বৌদিদি যখন রাঁধিতেন তখন তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিত। এই সব দেখিয়া শুনিয়া বোধ হইত সুষমা নিতান্ত বোকা। বার বৎসর বয়সেও তাহার এ জ্ঞানটুকু হইল না যে, অমূল্য জীবনটা পাকাচুল তুলিয়া, পায়ে তেল ঘসিয়া ও রান্নাঘরে গল্প করিয়া কাটাইবার জন্য নহে ; তবে, বৌদিদির বুদ্ধির পরিচয়ও কিঞ্চিৎ পাইয়াছিলাম ; শনি ও রবিবারে দুপুরবেলায় যখন সুষমা খোকাকে লইয়া আদর করিতে মহাব্যস্ত থাকিত, তখন বৌদিদি তাহাকে টানিয়া আনিয়া আমার ঘরের দুয়ার পর্যান্ত দিয়া যাইতেন। ইহাতে পিসিমাও কথঞ্চিৎ প্রসন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন, "বড় বৌমার ত বেশ বুদ্ধিশুদ্ধি আছে !"

আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, একে ত স্ত্রীলোকমাত্রেই বোকা, তার উপর সুষমা আবার বিষম বোকা ; আমার মত ব্যক্তির জীবনের সহচরী হইবার জন্য উহার কিঞ্চিৎ জ্ঞানবৃদ্ধির প্রয়োজন। অতএব দোকানে গিয়া একখানি দ্বিতীয় ভাগ ও একখানি কথামালা কিনিয়া আনিলাম।

কিন্তু ক্রমশ বোধ হইতে লাগিল, সুষমা নিতান্ত বোকা নয়। খনির গর্ভে হীরকের ন্যায় উহার অভ্যন্তরে কিছু জ্ঞানরত্ন আছে, একটু ঘসিয়া মাজিয়া লইতে পারিলেই হয়। তবে বৌদিদির সঙ্গে তাহার অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া আমার ভয় হইত সেও বা বৌদিদির নিকট হইতে গুরুগিরি বিদ্যাটা শিখিয়া লয় ! আমি মাথার লম্বা চুল রাখিয়াছিলাম সেগুলি কাটিয়া ফেলিলাম, এবং খুব উৎসাহের সঙ্গে সুষমাকে রাত্রে ও মধ্যাহ্নে পড়াইতে আরম্ভ করিলাম, এদিকে আমার পরীক্ষার সময়ও ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইতে লাগিল।

(৩)

সেদিন বৌদিদি সুষমাকে লইয়া কাহাদের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছেন, দাদা আফিসে গিয়াছেন, ছেলেদের গোলমাল নাই, বাড়ী নিস্তব্ধ, বাইরের ঘরে ক্ষুদিরাম চাকর নাক ডাকাইতেছে, পিসিমার ঘরে পিসিমা মালা হাতে করিয়া ঢুলিতেছেন, এবং আমার ঘরে আমি কলেজ-পলাতক রূপে নীরবে খাটের উপর তাকিয়া হেলান দিয়া শুইয়া আছি, আর আমার সম্মুখে সুষমার কথামালা ও মানে লেখার খাতাখানি সুষমার বিরহে কালীর দাগ গায়ে মাখিয়া মলিনভাবে পড়িয়া আছে। জানালা দিয়া বাহিরে চাইয়া দেখিলাম, "সজল নিবিড় ঘন, সরস বরষা।" বৃষ্টি বিন্দুগুলি আকাশ হইতে ঝরিয়া পাতায় পাতায় পড়িতেছে, আবার পাতা হইতে ঝরিয়া পাতায় পাতায় পড়িতেছে,—তাহাই অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলাম। তাহার পর সুষমার বই ও খাতাখানির দিকে দৃষ্টি পড়িল। ছাত্রী অনুপস্থিত, কি আর করি? মানের খাতাখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া মনে মনে নিজের শিক্ষকতার প্রশংসা করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে দেখিলাম মানের খাতার এক কোণে ছোট ছোট অক্ষরে কি লেখা আছে। পাঠ্যপুস্তকে বাজে কথা লেখা অন্যায় ; এ বিষয়ে সুষমাকে শিক্ষা দিয়াছি, তথাপি ছাত্রীর এরূপ অবাধ্যতা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। লেখাটি পড়িযা দেখিলাম, "এ বুঝি তোমার কুন্তলীন কিনে দেওয়া? আমি ত এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয় ভাগ শেষ করেছি।" অবশ্য যে শিক্ষক পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া পরিশেষে পুবস্কার প্রদানের কথা বিস্মৃত হন তিনি দোষী বটে একথা স্বীকার করি ; কিন্তু পাঠ্যপুস্তকে সে সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা কোন ছাত্রীরই কর্তব্য নহে।

রাত্রে সুষমাকে বলিলাম "কেমন নিমন্ত্রণ খাইলে?"

"কেমন আবার?"

"নিমন্ত্রণ খাইতে খাইতে এত দিন যাহা শিখিয়াছ তাহাও তো খাইয়া ফেল নাই? মানে লেখার খাতাখানি একবার নিয়ে এস দেখি!"

সুষমা আশ্চর্য হইয়া বলিল, "কেন?"

"কেমন লিখিযাছ দেখিব।"

সুষমা বলিল. "সে হারাইয়া গিয়াছে।" স্ত্রীলোকের নীতিজ্ঞান কি কম! স্বচ্ছন্দে মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিল।

প্রাতে উঠিয়াই বাজারের দিকে চলিলাম। আমার বাসস্থান মুঙ্গের, কাজেই কুন্তলীন কিনিবার জন্য একটু অনুসন্ধান করিতে হইল। বেলা ১২টাব সময় বাড়ী ফিরিলাম, পিসিমা ভাবিয়াছিলেন, আমি গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া গঙ্গায় ডুবিযা মরিযাছি ; কাজেই তিনি কাঁদিতেছিলেন, এবং সেটা কিছু অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু সেদিন যে মাসের শেষ শনিবার তাহা আমার স্মরণ ছিল না, কাজেই দাদাকে সম্মুখে দেখিয়া এবং তাঁহার গম্ভীর মুখ দেখিয়া আমার মত সাহসীরও হৃদয় বিচলিত হইল।

দাদা জলদ গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন, "নরেন!"

বুঝিলাম বড সুবিধার কথা নহে। ভয়ে ভয়ে দাদার নিকটস্থ হইলাম : ছেলেবেলার গুরুমহাশয়কে স্মরণ হইতে লাগিল, কিন্তু মনকে প্রবোধ দিলাম দাদা কখনই আমাকে বেত মারিবেন না।

আমি দাদাকে রাগ কবিতে জীবনে দু'তিন বারের বেশী দেখি নাই ; আজ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম দাদা বাগ করিয়াছেন। রাগ করিলে দাদা অধিক কথা বলিতেন না, আজও

বলিলেন না। দুই চারি কথার পর শেষে বলিলেন, "পরীক্ষা দিয়া যত দিন পাশ না করিতে পার, ততদিন আমার সম্মুখে আসিও না।"

প্রবেশিকা সাগর সন্তরণ দিয়া পার হওয়া আমার দুঃসাধ্য। কি করিব ভাবিতে ভাবিতে শেষে শয়নগৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম ; তখন সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। সুষমা উপুড় হইয়া বালিসে মুখ লুকাইয়া শুইয়াছিল। আমি ভাবিলাম বোধ হয় জ্বর হইয়াছে, নতুবা সে এ অসময়ে শুইয়া থাকিবে কেন ?

সুষমাকে ডাকিয়া বলিলাম, "সুষমা উঠ, তোমার জন্য কি এনেছি দেখ !" সুষমা উঠিয়া বসিল। তাহার চোখ মুখ লাল হইয়াছে ও চোখের পাতা ফুলিয়া উঠিয়াছে, সম্ভবতঃ জ্বরটা খুব বেশীই হইয়াছে। কিন্তু স্ত্রী-জাতির কি কৌতূহল ! এত জ্বরেও সে কি আনিয়াছি তাহা দেখিবার জন্য উঠিয়া বসিল !

আমি পকেট হইতে দুটি কুন্তলীনের শিশি বার করিয়া তাহার হাতে দিলাম, সুষমা তৎক্ষণাৎ শিশিদুটিকে টেবিলের নীচে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। ঝন্ ঝন্ করিয়া কাঁচগুলি শত খণ্ডে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, গৃহ সুগন্ধে পূর্ণ হইয়া গেল।

(৪)

বৌদিকে বলিলাম, "বৌদিদি, বৌকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। এখন আমার পরীক্ষার সময়, পরীক্ষাটা হইয়া গেলে আনিও।" বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন, "বৌ কাছে থাকিলে পরীক্ষা দেওয়া যায় না, এ জ্ঞান তোমার কবে থেকে হ'ল ? সুষমার সঙ্গে কাল বোধ করি ঝগড়া হয়েছে, না ?"

আমি গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "ছি বৌদিদি, এসব গম্ভীর বিষয় নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করা ভাল নয়।"

বৌদিদি আর বিশেষ কিছু বলিলেন না, বোধ হয় সুষমার নিকট ব্যাপার জানিতে গেলেন। বৌদিদি সম্ভবতঃ দাদাকে একথা বলিয়া থাকিবেন, কারণ তাঁহাকে কিছু প্রসন্ন দেখিলাম। কিন্তু সুষমার বাপের বাড়ী যাইবার কথা শুনিয়া পিসিমার অশ্রুবর্ষণ আরম্ভ হইল।

মন অত্যন্ত উদাসীন হইয়া উঠিল, বাজারে গিয়া একখানি 'বেদান্তদর্শন' কিনিয়া আনিলাম।

সুষমার বাপের বাড়ী যাওয়াই স্থির হইল। আমি ঘরে বসিয়াছিলাম, বৌদিদি সুষমাকে সেখানে রাখিয়া গেলেন, দেখিলাম, সুষমা কাঁদিতেছে !

সুষমাকে বলিলাম, "সুষমা, আমি যদি মরিয়া যাই, তুমি কি আমাকে মনে রাখবে ?" সুষমা কোন উত্তর দিল না চোখের জলটা আরও বেশী বাড়িল দেখিলাম ; কিন্তু আমার উপায় কি ?

ভাবিলাম, সংসার মায়াময়, এ মায়ার বন্ধন হইতে যাহাতে শীঘ্র মুক্তি পাইতে পারি তাহাই করিতে হইবে।

সুষমা গিয়া বৌদিদিকে প্রণাম করিল, বৌদিদি তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। বৌদিদির চোখেও জল পড়িতেছে দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম।

বারান্দায় বসিয়া পিসিমা বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতেছিলেন, "পূজা সম্মুখে, এমন সময় কে কোথায় ঘরের বৌ পাঠায় ? নরুর মা যদি বেঁচে থাক্‌তো, তা হলে কি এমন দিনে বৌ

পাঠাতে দিত ? আমি কে যে আমার কথা ওরা শুনবে ?”

গাড়ী চলিয়া গেল, জানালায় দাঁড়াইয়া দেখিলাম। তারপর শয্যায় শুইয়া পড়িলাম। তখনও ঘরখানি সুগন্ধে ভরপুর ! সে কি কুন্তলীনের গন্ধ, না সুষমার অঙ্গ সৌরভ, না তাহারই স্মৃতি, সৌরভের মত আমার চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে ? দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, “মায়া ! সমস্তই মায়া !” তাহার পর টেবিলের উপর হইতে ‘বেদান্তদর্শন’ খানি আনিয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিলাম।

(৫)

আমার ধর্মভাব যে পূর্ব হইতেই একটু প্রবল ছিল, দীর্ঘ কেশরাশিই তার প্রমাণ। কিছুদিন ভস্মাবৃত বহ্নির ন্যায় প্রচ্ছন্ন থাকিয়া আমার ধর্মবৃত্তি আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

বৌদিদিকে বলিলাম, “আমি আর মাছ খাব না।” বৌদিদি বলিলেন, “পরীক্ষা পাস হইতে হইলে বুঝি মাছও ছাড়িতে হয়।”

আমাদের একটি প্রকাণ্ড ছাত্রসমাজ ছিল, সভ্যসংখ্যা ১৭ জন। সভার সভাপতি আমি স্বয়ং। সভায় প্রস্তাব করিলাম, “প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া সময় নষ্ট করা অপেক্ষা, সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়া হিমাচলে গিয়া ভগবানের ধ্যান করা অনেক ভাল। কেন না, পরীক্ষা দিয়া অসার উপাধি লাভে বাহিরের প্রতিষ্ঠামাত্র ; তদপেক্ষা, যাহা একমাত্র সার সেই ভগবানের চরণ লাভেব উপায় চিন্তা করাই সর্বাগ্রে উচিত।”

আমার এই সাধু প্রস্তাবে ১৪টি সভ্য সম্মতি প্রকাশ করিলেন, আর তিন জন যদিও এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন না কিন্তু এ সমস্ত কথা গোপন রাখিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

জলখাবারের পয়সা জমাইযা ক্রমশঃ ১৪ খানি কম্বল সংগ্রহ করা হইল, এবং ১৪টি ত্রিশূলের জন্য কামারবাড়ী বায়না দেওয়া হইল। চুল ছাঁটা বন্ধ করিলাম, কাজেই চুল ক্রমেই লম্বা হইতে লাগিল। এইরূপে সন্ন্যাসেব পূর্বসূচনা আরম্ভ হইল।

ইতিমধ্যে পাঠ্য পুস্তকগুলিকে ডেস্কের মধ্যে বিশ্রাম করিতে দিয়া ‘বেদান্তদর্শন’ ও ‘গীতা’ পাঠে মনোনিবেশ করিলাম।

আমাদের সন্ন্যাস সভাটি ধীরে ধীরে উন্নতিলাভ করিতে লাগিল। ত্রিশূল প্রস্তুত হইয়া আসিল, গৈরিক বস্ত্রও সংগৃহীত হইল। চৌদ্দখানি ত্রিশূল যখন সূর্য কিরণে ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল, আমাদের উৎসাহও সেই সঙ্গে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! ব্রহ্ম-অন্বেষণে গমনের জন্য মন ততই উতলা হইয়া উঠিল, কোন ক্রমে এখন এই পথটা অতিক্রম করিয়া হিমালয়ে গিয়া ধ্যান আরম্ভ করিলেই হয়। অবশেষে একদিন রাত্রে গৃহত্যাগ করিলাম। যাইবার পূর্বে ডেস্কের উপর একখানি কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলাম, তাহাতে লেখা ছিল—

“কোথায় সে জন, জানে কোন জন,
যে জন সৃজন লয় করে’—
তাঁহারি উদ্দেশে চলিলাম।”

যখন আমরা চৌদ্দজন তরুণ সন্ন্যাসী নিশীথের অন্ধকারে জঙ্গলের পথ ধরিলাম, সে সময়টার কথা একবার ভাবিয়া দেখ। সেই নীরব রাত্রি, সেই নীরব পৃথিবী, সেই নীরব আকাশে নক্ষত্রেরা নীরবে আমাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, সমস্তই আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ।

মনে হইতেছিল যেন দেবতারা তারার আলোকে আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছেন। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে গিয়া কেবলই পথ হারাইতে লাগিল। ধরা পড়িবার ভয়ে সোজাপথ ছাড়িয়া জঙ্গলের পথ ধরিয়াছিলাম, ইচ্ছা ছিল জঙ্গলপথে চলিয়া ক্রমশঃ নেপালের দিকে অগ্রসর হইব। কিন্তু জঙ্গলে বাঘ ভাল্লুকের ভয় ও অনাহারে মৃত্যুর ভয় আসিয়া আমাদের চিত্তকে আক্রমণ করিতে লাগিল। ধর্মপথের বিঘ্ন অনেক, তাহা না হইলে যে গৃহ-কারাগার পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গমের মত অসীম জঙ্গলে ঘুরিতেছি, ব্রহ্মচিন্তার পরিবর্তে সেই গৃহ-কারাকূপের চিন্তা সর্বদাই মনে উদয় হয় কেন ? বুঝিলাম, মায়ার বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পাওয়া বড় সহজ নহে। আবার কয়েকদিন বন ভ্রমণের পর পায়ে এত ব্যথা হইল যে বৃক্ষতলে পড়িয়া থাকা ভিন্ন অন্য উপায় রহিল না। অগত্যা তখন ষ্টীমারপথে চলাই উচিত মনে হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় টিকিট ক্রয় করিবার জন্য কম্বল কয়খানি বিক্রয় করিতে হইল!

ষ্টীমারে আসিয়াও বিপদ অল্প নহে। যাত্রীগণ হাঁ করিয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। বোধ হয় তাহারা আমাদের সেই ভস্মাবৃত তেজঃপুঞ্জ কলেবরে কোন অসাধারণ দীপ্তি দেখিতে পাইয়াছিল, নহিলে অমন করিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া থাকিবে কেন ? দুই একটা সাহেব যেন আমাদের দিকে কট্‌মট্ করিয়া চাহিতে লাগিল ; আমার আশঙ্কা হইল হয়ত তাহারা আমাদের রাজনৈতিক সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিতেছে। এই জন্য আমাদের পলায়ন সম্বন্ধে খবরের কাগজে কোন বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে কি না দেখিবার ইচ্ছা থাকিলেও খবরের কাগজ পড়িবার সাহস হইল না।

রাজঘাটে ষ্টীমার থামিল। দেখিলাম জন কতক লোক ষ্টীমারে উঠিলেন, সারেং-এর সঙ্গে তাঁহাদের কি কথা হইল। আমি রেলিং-এর উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, সারেং হাত বাড়াইয়া আমার দিকে দেখাইয়া দিল। লোকগুলি উপরে উঠিয়া আসিলেন।

আমাদের কাছে আসিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের নাম বলিতে বোধ হয় কোন আপত্তি নাই ?"

আমি উত্তর করিলাম, "সন্ন্যাসীর পরিচয়ে প্রয়োজন কি ?"

"সম্ভবতঃ আপনারা মুঙ্গের থেকে আস্‌ছেন।"

"হইলেও হইতে পারে!"

তখন তিনি আমার সম্মুখে একখানি কাগজ ধরিলেন,—সেটি দাদার টেলিগ্রাম।

৬

অবশেষে কিনা বিশ্বাসঘাতক উমেশ আমাদের ধরাইয়া দিল। হায়, কোথায় গেল এতদিনের সন্ন্যাসের সাধ ? আবার কিনা সেই গৃহপিঞ্জরে আসিয়া প্রবেশ করিতে হইল! ধরণীকে মনে মনে বলিলাম, "তুমি দ্বিধা হও আমি তোমার ভিতর প্রবেশ করি, তাহা হইলে আর আমাকে দাদার নিকট মুখ দেখাইতে হইবে না।" কিন্তু পৃথিবী আমার সে মিনতি শুনিলেন না ; কলেরাব নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু সে-ও আমার প্রতি নির্দয় হইল ; বিষ ও ছুরির কোন সুবিধাও করিতে পারিলাম না ; অগত্যা সুস্থ শরীরে আবার সেই চিরপরিচিত বাড়ীর দুয়ারে গাড়ী হইতে নামিলাম। পিসিমা "ওরে বাপ নরুরে! এমন করে কি প্রাণবধ করে যেতে হয় রে!" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন।

দাদা একবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, একটু বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "এখন একটু কান্নাকাটি থামাও। খেয়ে দেয়ে হতভাগাটা আগে ঠাণ্ডা হোক, তারপর যত পার কেঁদো।"

যাহা হউক, অনেক দিনের পর বৌদিদির হাতের রান্না খাইয়া শরীর স্নিগ্ধ হইল।

আহারান্তে বৌদিদি বলিলেন, "ঠাকুরপো, 'সে জনের' কোন সন্ধান পেলে কি ?"

"যাও যাও বৌদি ! তোমরা সে সব কথা কি জান্‌বে ?"

"তা জানি আর নাই জানি, কিন্তু চেহারাখানি তো বেশ সন্ন্যাসীর মতই করেছ দেখ্‌ছি ! পা দুখানিরই বা বাহার বেরিয়েছে কি !"

বৌদিদির এই কথা শুনিয়া মনে করুণ রসের আবির্ভাব হইল ; সকরুণভাবে পথের দুর্দশা কাহিনী বৌদিদির নিকট বর্ণনা করিলাম।

★ ★ ★ ★ ★

পর বৎসর পরীক্ষায় আমি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলাম। যে দিন ফল বাহির হয তাহার পরদিন দুই শিশি কুন্তলীন ও এক শিশি দেল্‌খোস কিনিয়া আনিলাম। সুষমার হাতে দিয়া বলিলাম, "সুষমা এবারও কি ভাঙ্গিয়া ফেলিবে ?" সুষমা কুন্তলীনের শিশি দুটির গায়ে "ঋণ শোধ" ও দেলখোসের শিশিটির উপরে "সুধ শোধ" লিখিয়া দিল, এবং শিশি কয়টী টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিল।

ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখি হাস্যমুখী বৌদিদি আমাব সম্মুখে !

বৌদিদি বলিলেন, "ঠাকুবপো ! সন্ন্যাসী হয়ে তো 'সে জনের' কোন সন্ধান পেলে না, এখন ঘরে বসে বোধ করি সন্ধান পেয়েছ।"

পিসিমা সেদিন অনেক ব্রাহ্মণ খাওয়াইলেন ও হরির লুট দিলেন।

সর্বাপেক্ষা সুখের বিষয় এই যে, দাদা সেদিন আদর করিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইযা দিয়াছিলেন।

বিন্দুবাসিনী দাসী

মুক্তি

(১)

সেদিন রবিবার। ভোর হইতেই বৃষ্টি হইতেছিল। শীতল পবনেব দৌরাত্ম্যও অতিরিক্ত বাড়িয়াছিল। দোতালার বৈঠকখানার সার্শি প্রভৃতি রীতিমত আঁটিয়া চুরুটের ধূমের সহিত বাঙ্গলা মাসিকপত্রের দেশোন্নতি বিষয়ক নানা গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের ভাবগুলা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। কলিকাতার রাস্তাগুলি ছোটখাট নদীর মত হইয়া উঠিয়াছে ! দুই একটা দুরন্ত পল্লীবালক কলার ভেলা জলে ভাসাইয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে সন্তরণ দিতেছিল ; তাহাদের সন্তরণের শব্দ ও উচ্চ কণ্ঠের কলরোল মধ্যে মধ্যে আর্দ্র বায়ু প্রবাহে ভাসিয়া আসিয়া আমার মনকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিতেছিল।

এমন সময়ে বেহারী আসিয়া কহিল, "একটি বাবু এসেছেন।"

এই বর্ষায় বাবু ! কোন দুরদৃষ্ট মক্কেল ছাড়া আর কে ?—"উপরে নিয়ে আয়" বলিয়া ভৃত্যকে আদেশ করিলাম, এবং ফ্লানেল সার্টের বোতামগুলি আঁটিয়া ও গলাবন্ধে গলাটা একটু যত্নের সহিত জড়াইয়া অতিথির জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিলাম। আগন্তুক কক্ষে প্রবেশ করিল। আরে, এ যে প্রিয়বন্ধু সতীশ ! আমি সোৎসাহে চেয়ারখানা ঠেলিয়া দিয়া দুই হাত সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"কি হে সতীশ যে ! কবে এলে আগ্রা থেকে ?" সতীশ আগ্রায় ডাক্তারী করে।

"এই চার পাঁচ দিন হল ;" "তা এত বৃষ্টিতে কষ্ট করে এলে কেন ? আর কি সময় ছিল না ?" "না ভাই, বেশী দিন থাকতে পারব না ! বিশেষ দরকারে পড়েই আসতে হয়েছে—আবার পরশু বোধ হয় যেতে হবে ! এ ক'দিন আসতেই পারিনি ; আবার যাবার সময় একবার শ্রীরামপুর হয়ে যেতে হবে।"

—শ্রীরামপুরে সতীশের শ্বশুরালয় !

"Family-ট্যামিলি কোথায় ?" "আগ্রায়।"

তাহার পর অনেক কথাবার্ত্তা হইল। আশৈশব বন্ধুযুগলের সে সকল কথা উদ্ধৃত্ত করিয়া কাহারও বিরক্তিভাজন হইতে ইচ্ছা করি না। সে আজ প্রায় দশ বার বৎসরের কথা। সতীশের পিতা তখন হুগলির সবজজ ছিলেন ; সতীশেরা আমাদের প্রতিবেশী ছিল। পরস্পরের ছাড়াছাড়ির পর সতীশের সঙ্গে আমার কংগ্রেস মণ্ডপে যা দু' একবার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

অনেক কথা ও কুশল প্রশ্নাদির পর সতীশ কহিল, "কাব্যচর্চা চলছে কেমন ?"

সতীশ লোকটা কবি, সাহিত্য সমাজে তাহার প্রতিপত্তি নিতান্ত অল্প নহে।

আমি কহিলাম, "মোটে নয় !"—বিস্ফারিত নয়নে সতীশ কহিল, "বল কি হে ?"

আমি কহিলাম, "হ্যাঁ গুরুদেব ! সে রোগ হইতে মুক্তি পাইয়াছি !"

সতীশ কহিল, "হঠাৎ ?"—আমি কহিলাম, "তেমন হঠাৎ নয় হে ভায়া ; গূঢ় কারণ আছে !"

"কি, বলেই ফেল না।" সিগারের বাক্সটা সতীশের নিকট অগ্রসর করিয়া আমি কহিলাম, "তবে শোন !"

(২)

এই স্থলে সাধারণের গোচরের জন্য একটি প্রাচীন প্রসঙ্গের অবতারণা কর্তব্য।

যখন সতীশ ও আমি এন্ট্রান্স ক্লাসে পড়ি, তখন প্রায়ই Literary Association-এ সতীশ স্বরচিত কবিতা পাঠ করিয়া সকলের নিকট বাহবা পাইত। সেই সময় ব্যগ্র কৌতূহলে একদিন সতীশকে বলিয়াছিলাম, "আমাকে Poetry লিখিতে শিখাবে ?" সতীশ হাসিয়া বলিয়াছিল, "একটু ভাবতে শেখ, আপনিই লিখতে পারবে ! ঐ দেখ চাঁদ, ঐ দেখ গঙ্গার ঢেউ, ঐ দেখ মেঘের ছুটোছুটি। একটু ভাব ; দেখবে ওসকলে কত কবিত্ব।" আমি গদ্‌গদ্ ভাবে ভক্ত শিষ্যের মত, সতীশের কথা শিরোধার্য করিয়া লইলাম। কিন্তু হায় অদৃষ্ট ! সমস্ত চাঁদখানা নিঙড়াইয়া সেই ছেলেবেলাকার "কাপাশে বুড়ি"র গল্প ছাড়া আর কিছুই ভাব পাইলাম না ; ক্ষুব্ধচিত্তে ভাবিলাম, আমার Brain-টা কি Dry !

লোকে বলে যত্ন করিলে রত্ন মিলে ! চেষ্টায় আজ অসভ্য জাপান সভ্যতার শীর্ষস্থানে আরোহণ করিয়াছে ! এবং চেষ্টার বলেই নাকি বণিকের জাতি ইংরাজ পৃথিবীর সর্বত্র

আপনার আমোঘ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। দুর্লভ তপস্যানুগতা কবিতাদেবীও দীর্ঘকাল আমার কালী কলমের অত্যাচার নীরবে সহিতে পারিলেন না ; তাঁহাকে দর্শন দিতে হইল !

সেদিন ভাল বাঁধান খাতায় সযত্নে ও বেশ স্পষ্ট করিয়া লিখিলাম,

"হে প্রতাপ ভারতের বীরচূড়ামণি।
অদ্ভুত বীরত্ব তব কেমনে বাখানি ?"

সেইদিন হইতেই আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে কোথা হইতে একটা গুরুত্ব আসিয়া আমাকে বেষ্টন করিল। সতীশ কবিতা দেখিয়া কহিল, "বাঃ, এই যে কিছু কিছু ভাবতে শিখেছ ! বুঝলে ভাই, Poetry লেখার প্রধান mystery-ই হচ্ছে Thoughtfulness ভাবুকতা, তন্ময়তা।" আমি বিজ্ঞের ন্যায় মাথা নাড়িয়া কহিলাম, "সে কথা খুব বুঝি—আমাকে আর কি বুঝাবে ভাই ?"

তাহার পর দ্রুত Succession-এ,

"হে ঈশ্বর ! অব্যক্ত, অচিন্ত্য,
ধরণী না রহিলে কে তোমাকে জান্‌ত ?"
"ওগো নদী ! কোথা যাও কুলু কুলু বেয়ে !
কাহার উদ্দেশে কহ, কোন্ গান গেয়ে ?"
"ওগো সুন্দরী নীলবসনা।
শিথিল কববী, কুন্দ ঝরিছে,
কি করিছ অয়ি শোভনা !"

প্রভৃতি রাশি রাশি কবিতা আমার মগজ হইতে বাহির হইয়া খাতাব পৃষ্ঠায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন আমাকে বাধা দেয় কাহার সাধ্য ? গিবিদেহ ভেদ করিয়া একবার যখন স্রোতস্বতী ছুটিযা চলিযাছে. তখন কে তাহার গতিরোধ করে ? আমার কবিতা-প্রবাহিণীতে প্রকৃতই বান ডাকিয়াছিল ; কিন্তু কেমন কবিয়া ভাঁটা পড়িল, তাহাই এখন বলিতে বসিয়াছি।

(৩)

সতীশ চুরুট ধরাইয়া কহিল, "বল, আমি মনোযোগ দিয়া শুনিতেছি।"

আমি বলিতে লাগিলাম,—"এন্ট্রান্স পাশ করিয়া তুমি লাহোব চলিয়া গেলে, আমিও প্রেসিডেন্সিতে পড়িব বলিয়া কালকাতায় গেলাম। হোস্টেলে না থাকিয়া বেনেটোলায় একটা মেসের কক্ষ অধিকার করিলাম, এ সকল সংবাদ আব নূতন কবিয়া কি দিব ? তুমি তো সকলি জান।

এফ. এ. ক্লাসটায় আমার প্রতিভা তেমন স্ফূর্তি পাইল না। নূতন কলিকাতায় যাইয়া মিটিং এ্যাটেণ্ড কবিয়া ও থিয়েটার দেখিয়া কাব্যচর্চাব বিশেষ একটা অবকাশ মিলিত না ; সেই জন্য এফ. এ. পরীক্ষার ফলও কিছু ভাল হইয়াছিল, পরে যখন বি. এ. পড়িতে লাগিলাম এবং কলিকাতার নাগরিক জীবনে একটু অভ্যস্ত হইয়া পড়িলাম, সহরের মত্ততা ও ব্যস্তভাব অবসাদের তুফান তুলিয়া আমাকে আকুল করিল, তখন আবার আমার সেই মরোক্কো বাঁধান সুদৃশ্য খাতাখানি খুলিয়া কাব্যচর্চায় মনোযোগ করিলাম। মেসের সকল ছাত্রই এই আকস্মিক প্লাবনে অল্পাধিক চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই মেসে আমার পার্শ্বের কক্ষেই গোপাল নামে একটি নিরীহ ছাত্র বাস করিত। সে রিপণ কলেজে পড়িত। বেচারীর

বাড়ী বারাসতে। আমার কবিতা প্লাবন তাহাকেও কিঞ্চিৎ বিহ্বল করিয়াছিল,—সে যেন তন্ময় হইয়া আমার কবিতা পাঠ করিত, এবং প্রশংসমাননেত্রে আমার প্রতি চাহিয়া কহিত, "মন্মথ, এটার ত বড় Excellent ভাব!" কিন্তু সত্যনাথ নামক একটি ছাত্র তাহা শুনিয়া নিতান্ত অধীরভাবে বলিয়া উঠিত, "ভাব ব'লে ভাব! একেবারে যাদু বনে' যেতে হয়। এ ভাব যখন বেশ জমাট বাঁধবে তখন হেম নবীন রবি যে কোথায় ভেসে যাবে তা'র ঠিকানা নাই!"

আমি মনের ভাব মনে চাপিয়া রাসকেলের মৃত্যু কামনা করিতাম; এবং সেই অবসরে গোপালেব সঙ্গে সত্যনাথের একটা ছোটখাট কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধিয়া যাইত। সত্যনাথ দূর সম্পর্কে বড়বৌদির কিরকম ভাই হইত, সুতরাং আমি তাহার তীব্র মন্তব্যগুলি নিঃশব্দে গলাধঃকরণ করিতাম।

শুধু এইটুকু করিয়াই যদি ক্ষান্ত থাকিতাম তাহা হইলে বুঝি পরে আর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না। কিন্তু আমি মাত্রা ছাড়াইয়া চলিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র ও মেরিকরেলি হইতে আরম্ভ করিয়া কাব্যোপন্যাসিক পরাণ চন্দ্রের পুস্তক পর্য্যন্ত সবই আমি ক্রয় করিতে লাগিলাম। পাঠ্য পুস্তকগুলোকে নিতান্ত তাচ্ছিল্য করিয়া দূরে ফেলিয়া রাখিতাম।

উপন্যাস প্রভৃতি পাঠ করিয়া আমি "প্রেমিকা" নামে একখানা নাতিবৃহৎ কাব্য লিখিয়া ফেলিলাম। গোপাল তাহা পড়িয়া পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়াই কহিল, "ওঃ, it is second বিদ্যাপতি।" সত্যনাথ কিন্তু দু'পাতা উল্টাইয়াই কহিল,

"চণ্ডালের হাত দিযা পোড়াও পুস্তকে!
ভস্মরাশি করে ফেল কর্মনাশা জলে।"

আমি মনে মনে সত্যনাথের আদ্যশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিয়া কম্পিত ক্রুদ্ধস্বরে কহিলাম, "ষ্টুপিড, রাস্কেল্, তুমি যদি কখনও আমার লেখা পড়, ত' তোমার অতি বড় দিব্য আছে।" গোপাল আমার প্রতি সহানুভূতি দেখাইযা কহিল, "সত্যটার মত হিংসুটে যদি দুটি থাকে!" সত্যনাথ কহিল, "তা বলে তোমার মত খোসামুদি করে আমি কারও মাথা খেতে পারি না।"

যাক—তুমি এটা বেশ জান উপন্যাসের আর একটা নাম প্রেমের শ্রাদ্ধ! এই কতগুলা প্রেমকাহিনীর চর্চা করিয়া আমার হৃদযের যে কিছুমাত্রও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, তাহা মনে করিও না। একে রোমান্সের কবি, তাহার উপর এই সকল রাশীকৃত উপন্যাসের পুঞ্জীভূত প্রেম বিদ্রোহী হইয়া আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। আমি সর্বদা শঙ্কিত থাকিতাম, কখন আমার এই স্কন্ধদেশ পরিব্যাপ্ত সুরক্ষিত কুঞ্চিতকেশগুচ্ছে পরিশোভিত কবিজনোচিত মাধুর্যপূর্ণ মুখখানির উপর কোন কিশোরী তাহার কজ্জলকৃষ্ণ নয়নের একটা কটাক্ষশর নিক্ষেপ করিয়া আমাকে সম্পূর্ণ জখম করিয়া ফেলে। এ জগতে তরুণ কবিকে অনেকদিক সামলাইয়া চলিতে হয়।

এই স্থানে চুরোটিকার ক্ষুদ্র জীবন ভস্ম হওয়ায় একটি নবীন চুরোটিকা গ্রহণ করিতে হইল।

৪

সতীশ ব্যগ্রভাবে কহিল, "তারপর?" আমিও চুরোটটিকে দু' এক মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া লইয়া একটা দীর্ঘ 'আকর্ষণের' পর কুণ্ডলীকৃত ধূম উড়াইয়া কহিলাম, "তারপর আর কি? একদিন রবিবাবুর সেই

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে ?"

গানটার অর্থ মর্মে মর্মে অনুভব করিলাম।

আমাদের মেসের সম্মুখেই একখানি প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা ছিল। তাহার অধিকারী নন্দবাবু। হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত উকীল নন্দবাবু। সন্ধ্যার সময় তাঁহার বাটি হইতে একটি সুমিষ্ট কণ্ঠের সঙ্গীতোচ্ছ্বাস আমাদের মেসস্থ ছাত্রগণের পাঠের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মাইল। আমার কক্ষ হইতে নন্দবাবুর দ্বিতলের হল ঘরটা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। গোপাল ছুটিয়া আসিয়া আমাকে বলিল, "মনু, শুনচ কে গাইছে ভাই, দিব্যি গলা।" আমি জানালার কাছে দাঁড়াইয়াছিলাম ; কহিলাম, "ঐ যে একটি মেয়ে গান গাচ্ছে।" বালিকা তখন গাহিতেছিল,

"অলি বার বার ফিরে যায়,
অলি বার বার ফিরে আসে,
তবে ত ফুল বিকাশে।"

গান শুনিয়া নন্দবাবুর পরিবারবর্গের সঙ্গে আলাপ করিতে বড় ইচ্ছা হইল। আমার কোন সহপাঠীর নিকট নন্দবাবুর পুত্র শরৎকুমারের নাম শুনিয়াছিলাম ; শরৎ মেডিকেল কলেজের থার্ড ইয়ারেব ছাত্র। তাঁহার সহিত আলাপের বেশ একটু সুযোগও ঘটিল। একদিন ফুটবলেব ম্যাচ দেখিব বলিয়া মেস হইতে বাহির হইয়াই দেখি শরৎকুমারও ম্যাচ দেখিবার জন্য বাহির হইয়াছেন। অযাচিত ভাবে তাঁহার সহিত আলাপ করিলাম। কোন্ কোন প্লেয়ার ভাল খেলে, কোন্ দলেব জিতিবার সম্ভাবনা—প্রভৃতি। অল্পকালের আলাপে শরতের সহিত বেশ একটু সৌহৃদ্য জন্মাইল। একদিন সন্ধ্যার সময় গোলদিঘিতে বেড়াইতে বেড়াইতে আমি শরৎকে কহিলাম, "আপনাদের বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে গান হয, শুন্‌তে পাই। আপনি কি গাইতে পারেন ?" শরৎ কহিল, "ওঃ, আপনি গানের কথা বলছেন ? ও লীলা গায় ; আমার ছোট বোন্! হাঁ, নেহাৎ মন্দ গায় না!" আমি কহিলাম, "মন্দ কি ? সে ত বেশ সুন্দর গায়। আমি ত পড়াশুনা ছেড়ে গান শুন্‌তে বসে যাই।" শরৎ কহিল, "সে গান আপনার এত ভাল লাগে। বেশ কাল রাত্রে আমাদের বাড়ী আপনার নিমন্ত্রণ রহিল ; গান শুনতে যাবেন, আর যদি আপত্তি না থাকে তা হলে ঐখানেই কিঞ্চিৎ জলযোগ করবেন।"—কিরূপ পুলক-কম্পিত স্বরে শরৎকুমারকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছ।

(৫)

"শরৎ হার্মোনিয়মে সুর প্রদান করিয়া লীলাকে কহিল, "লীলা রবিবাবুর সেই গানটা গাও ত!" লীলা প্রথমে একটু সঙ্কোচের ভাব দেখাইল। আমি কহিলাম, "গাও না! লজ্জা কি ?" এই কয়টি কথা বলিতেই আমার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

অবশেষে লীলা আমার কথায় একটুও মনোযোগ না করিয়াই গাহিতে লাগিল,

"সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন-ফুলহার!
তুমি অনন্ত নববসন্ত অন্তরে আমার।"

সেই সরলা বালিকার সরল কণ্ঠোচ্ছ্বাসে যে অপূর্ব বীণাধ্বনি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল তাহাতে আমি আত্মহারা হইয়া পড়িলাম। আমার মানস-নয়নের সম্মুখে একটি মহিমামণ্ডিত স্বপ্নপুরী

ফুটিয়া উঠিল। জগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া বালিকার অস্তিত্ব ভুলিয়া আমি মনে করিলাম, কোথায় কোন্ সুখময় নিভৃত কোণে একটি প্রণয়িনী নায়িকা তাহার সুন্দর হৃদয়রঞ্জন নায়কের উদ্দেশ্যে তাহার প্রাণের অপূর্ব ভক্তি-উচ্ছ্বাস নিবেদন করিতেছে। অনেকগুলি গান হইল বটে, কি "সেই হৃদয়রঞ্জনের" বন্দনাগীতির অপূর্ব বীণাস্বর মোহের তুফানে আমাকে নিবিড়ভাবে আবিষ্ট করিয়া ফেলিল।

মন্ত্রচালিতের মত মেসে ফিরিলাম। সে রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া বারবার বালিকার কথা ভাবিতে লাগিলাম। বেশ মেয়েটি, যেমন সুন্দরী তেমনি গুণবতী। আহা, লীলার সহিত যদি আমার বিবাহ হয়। আমার মনে হইল, তাহা হইলে বুঝি আমি জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুখী হই ; এবং আমার এই মরোক্কো বাঁধা কবিতার খাতাখানি সমস্ত কবিতাসমেত লীলার অঙ্গুলি হেলনে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিতে পারি। মনে করিলাম, সকালে গোপালকে ডাকিয়া স্পষ্টই বলিব, "আমি লীলাকে ভালবাসি ; তাহারা আমাদের পাল্টাঘর, বিবাহে বাধা নাই ; কোন রকমে যোগাড় করিয়া তাহার সঙ্গে আমার বিবাহটা ঘটিয়ে দাও।" কিন্তু সকালে গোপাল যখন আমার ঘরে চা-পান করিতে আসিল, তখন তাহাকে দেখিযা ভাবিলাম,—ছিঃ ছিঃ, একথাগুলো একে বল্লে এখনই আমাকে পাগল মনে করে হেসে উড়িয়ে দেবে। আট বৎসরের মেয়ে লীলা, তাকে দেখে একজন কবির প্রেম ! মেসশুদ্ধ একটা কেলেঙ্কারী হয়ে পড়ছিল আর কি ! ছিঃ ছিঃ, ভারি লজ্জার কথা।

ইহার দুই একদিন পরে ষ্টার থিয়েটারে অনেকে মিলিয়া "মলিনা-বিকাশ" ও "বিবাহ-বিভ্রাটের" অভিনয় দেখিতে গেলাম। পরদিন অভিনয়ের সমালোচনা হইতেছে এমন সময় সত্যনাথ কহিল, "ওর ভিতর 'বিবাহ-বিভ্রাট'টা খুব ভাল, 'মলিনা-বিকাশ'টা স্রেফ্ গাঁজাখুরি। খালি প্রেম, প্রেম জ্বালাতন করে মেরেছিল !" আমি কহিলাম, "কি ? প্রেমটা গাঁজাখুরি হল। এমন না হলে আর বিদ্যে !" সত্যনাথ হাসিতে হাসিতে কহিল, "গাঁজাখুরি নয় ত' কি দাদা It is the production of an idle brain; কই এ পর্যন্ত কাহাকেও ত প্রেমে পড়তে দেখলুম না !" আমি কহিলাম, "কবিদের কথাগুলো তবে উড়িয়ে দিতে চাও। কালিদাস, সেক্সপিয়র, বঙ্কিমবাবু এঁরা প্রেম নিয়ে এত মাথা ঘামালেন—" এই সময় আমার মুখের কথা লুফিয়া লইয়া গোপাল বলিয়া উঠিল, "সে সব হল গাঁজাখুরি আর আমাদেব সত্যনাথবাবু যা বললেন তা ধ্রুব সত্য !" আমি গদগদ স্বরে কহিলাম, "প্রেম মিথ্যা ?—আহা, যদি জগতে কিছু সত্য থাকে ত সে প্রেম।" সত্যনাথ আবার হাসিতে হাসিতে কহিল, "কি হে ভায়া ! এত রাগ কেন ? কারুব প্রেমে পড়েছ নাকি ?" আমি মুখ বিকৃত করিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলাম, "যাও, যাও, তোমার সকল কথায় চালাকি ভাল লাগে না।"

বাস্তবিক, প্রেমের মহিমায় আমি যেন একটু অধীব হইয়া পড়িয়াছিলাম।

মানুষের স্বাভাবিক দৌর্বল্যবশতই হউক বা যে কারণেই হউক, যে গোপাল আমাকে উচ্চমঞ্চে চড়াইয়া প্রশংসাকুলনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া থাকিত, আমি সেই উচ্চমঞ্চে বসিয়াই সেই নিরীহ বেচারার কর্ণমর্দন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতাম না। বাস্তবিক ইদানীং আমি গোপালের উপর যথেষ্ট উপদ্রব করিতাম ; একদিন সন্ধ্যার সময় একটা সামান্য তামাসায় গোপালের সহিত আমার ঝগড়া হইয়া গেল। হতভাগা গোপাল, যাহাকে আমি প্রথমভাগের গোপালেরই মত সুবোধ ও শান্ত মনে করিতাম, সেই কিনা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সত্যনাথকে সব কথা বলিয়া দিল। এইজন্যই কথায় বলে ভবিতব্য অখণ্ডনীয়।

পরদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া অন্যমনস্কভাবে আপনার কক্ষে বসিয়া আছি, এমন সময় সত্যনাথ আমার কক্ষে প্রবেশ করিল ; সত্যনাথ কহিল, "হ্যাঁরে মনু, এ কি শুনচি ?" আমি বিরক্তভাবে কহিলাম, "কি আবার ?" সত্যনাথ কহিল, "শুন্‌চি তুই নাকি প্রেমে পড়ে গেছিস ?" আমি উদ্ধতভাবে কহিলাম, "মিথ্যে কথা। কে বল্লে ?" সত্যনাথ কহিল, "গোপাল বল্লে, তুই নাকি তাকে সব কথা বলেছিস্ ?" আমি ক্রুদ্ধস্বরে কহিলাম, "পাজী শুয়ার মিথ্যা কথা বলেছে।" সত্যনাথ হাসিতে হাসিতে কহিল, "আমিও ত তাই বলি। দেখিস ভাই, হুঁসিয়ার ; সামনেই একজামিন ; প্রেমে পড়তে হয় ত একজামিনের পরে পড়িস, এখন নয়।" আমি কহিলাম, "দেখ সত্যনাথ, আমার সম্বন্ধে তোমার এত মাথাব্যথা করাটা আমার বড় খাবাপ লাগে ; কেন তুমি আমাকে জ্বালাতন কর ?" সত্যনাথ গম্ভীরভাবে কহিল, "কারণ তোমাদের সঙ্গে আমার একটু সম্পর্ক আছে ; আমি প্রকৃতই তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী।" আমি উত্তেজিতভাবে কহিলাম, You are too impertinent ! তোমার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক আমি স্বীকার করি না।"—সত্যনাথ ধীরে ধীরে আমার কক্ষ ত্যাগ করিল।

৬

"সেবারে পূজার ছুটিতে বাড়ী গেলাম না , দাদাকে লিখিলাম, "বাডীতে নানা গোলমালে পড়ার ক্ষতি হইতে পারে, এখানে থাকিলে পড়াশুনা নির্বিঘ্নে চলিবে আশা হয়"—ইত্যাদি। দাদা লিখিলেন, "যাহা ভাল বুঝিবে তাহাই করিও।"

তখন নূতন 'কুন্তলীন', 'দেল্‌খোস' উঠিয়াছে ; বিজয়ার দিন আমি এক বাক্স "দেলখোস", এক শিশি "কুন্তলীন" ও একখানি রবিবাবুর গানের বহি লইয়া শরতদের বাড়ী চলিলাম। শবতের সহিত দেখা করিয়া এসেন্সের বাক্সটা দিয়া কহিলাম, "ভাই, পূজার উপহার।" শরত হাসিয়া কহিল, "এ আবার কি পাগলামি ! এসব কেন ?"

আমি কহিলাম, "পূজার দিনে আত্মীয়বন্ধুকে উপহার দিতে হয়।" পরে "কুন্তলীনের" শিশি ও গানের বহি বাহির করিয়া কহিলাম, "লীলা কোথায় ?" "কেন ? ওগুলি দেখি !"—শিশির গায়ে ও বহিখানার উপর লেখা ছিল, "শ্রীমতী লীলার জন্য পূজার উপহার।"—শরত কহিল, "লীলাকে আবার এসব দেওয়া কেন ?" সত্যই ত শরতকে উপহার দিবার অধিকাব আছে, কিন্তু লীলাকে কেন ? ইহার কি সদুত্তর দেওয়া যায় ? সত্য কথাটা বলিব কি ? ছিঃ !

সহসা একটা উত্তব যোগাইল। তাড়াতাড়ি কহিলাম, "সে বেশ গান গাহিতে পারে কি না, তাই তারই appreciation করে তাকে পুরস্কার দেওয়া যাচ্ছে—এক শিশি "কুন্তলীন" ও একখানা রবিবাবুর গানের বহি।"

এমন সময়ে লীলা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। লীলা কহিল, "বড়দা, বাবা তোমাকে উপরে ডাকছেন—আমাদের ভাসান দেখাতে নিয়ে যেতে হবে।" শরৎ, "ওরে লীলা তোর জন্য মনুবাবু কি প্রাইজ এনেছে দেখ্" বলিয়া চলিয়া গেল।

আমি তখন লীলার হস্তে উপহার দ্রব্য দিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলাম, "লীলা, এগুলি তোমার।" লীলা প্রফুল্লভাবে কহিল, "বাঃ এ বেশ ত। এটা বুঝি কুন্তলীন ? বড়দি-টড়দি মাখে বেশ গন্ধ না মনু বাবু ?" আমি কহিলাম, "হাঁ।" অল্পক্ষণ পরেই লীলা কহিল, "কিন্তু মনু বাবু, ছোটদা জানতে পারলে আমাকে মেরে ধরে এ তেলটা কেড়ে নেবে। সেদিন বড়দা

আমাকে একটা পুতুল কিনে দিয়েছিল, ছোটদা কেড়ে নিয়েছে। ছোটদা বড় মারে আমাকে।" আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলাম, "না না, কেড়ে নেবে না, আমি শরৎকে বলে দেব অখন।" "হাঁ তাই দেবেন" বলিয়া লীলা তেলের শিশিটা দেখিতে লাগিল। মৃদু বায়ু তাহার চূর্ণকুন্তলগুচ্ছ উড়াইয়া তাহার কপালের উপর ফেলিতেছিল, আমি মৃদুভাবে তাহা দেখিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে কম্পিতকণ্ঠে আবার ডাকিলাম, "লীলা।" "কেন মনুবাবু ?" "তুমি আমাকে ভালবাস ?" "হ্যাঁ।" "কত ভালবাস ?" "খু-উ-ব্ !" হায় সরলা বালিকা এ ত প্রেমিকার কথা নয় ! এ কথাটা আমার দিকে চাহিয়া অম্লান বদনে কহিয়া ফেলিলে ! একটু সংকোচ হইল না ? প্রেম যে সংকোচময় ; হায় ! এটা বুঝি তবে উপহারদানের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ একটা শুষ্ক নীরস কর্তব্যপালন। আমি নাছোড়বান্দা ভাবে কহিলাম, "লীলা, আমি তোমার বিয়ের জন্য খুব ভাল সম্বন্ধ করছি।" "ধেৎ !" বলিয়া লীলা ছুটিয়া পলাইল ; অবশ্য পলাইবার সময় উপহার দ্রব্যগুলি লইয়া যাইতে ভুল করিল না। হায়, এ জগতে নারীহৃদয় কি স্বার্থপর !

ইহার পরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বলিয়া লই। "গায়িকা" কাব্যখানা লিখিতেই অনেক সময় কাটিযা গেল ; ইহাব ফলে এই দাঁড়াইল যে, সে বৎসর পরীক্ষায় তিনটি বিষয়েই Equilateral traingle এব তিনটি Side-এর মত সমানভাবে ফেল করিয়া বসিলাম ! সত্যনাথ ডবল অনার লইয়া পাশ করিল। ফেল হইযা যখন জানিলাম, যে গোপালটাও ফেল হইয়াছে, তখন কিছু আশ্বস্ত হইলাম। সে হতভাগা যদি পাশ হইত, তাহা হইলে আমাকে আত্মহত্যা করিতে হইয়াছিল আর কি।

(৭)

দাদা বলিলেন, "আমাদেব বংশে কেহ কখনও ফেল হয় নাই, তুমিই প্রথম ফেল হইলে !" আমি অবনতমস্তকে কহিলাম, "বি. এ.-টা আজকাল বড় stiff হয়েছে, পাশ করাটা কেবল chance." দাদা। "সে জন্য তুমি ফেল হওনি ! তোমার ফেল হবার কারণ, একটুও তুমি পড়নি।"

আমি কিছু বলিলাম না। দাদা আবার বলিলেন "খালি ছাইভস্ম লিখলে কি চলে ? ও সব পাগলামি যাবে কবে ? যদি একটুও লিখতে পারতে তা হলেও না হয় কথা ছিল, কবি হওয়া যতটা সহজ ঠাওরাও, তত সহজ নয়।" দাদা আবার বলিতে লাগিলেন, "তোমার উপর অনেকটা বিশ্বাস করেছিলাম, কিন্তু তুমি তেমনি শাস্তি দিয়েছ। বেশ, বড় হয়েছ, বুদ্ধিও হয়েছে, যা' ভাল বুঝিবে, তাই করো।"

দাদা চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বাহিরে মেজদাদার কথা শুনিলাম। মেজদাদা বলিলেন, "খালি বকামি করবে, তা' পাশ হবে কেমন করে ? এত ছেলেখেলা নয় ; তুমি কান দুটো ধরে থাবড়াতে পারলে না ?" দাদা গম্ভীরভাবে কহিলেন, "অত বড় ছেলেকে মারতে লজ্জা করে যে ! আর যার নিজের একটু আত্মসম্মানজ্ঞান নেই তাকে মেরেই বা ফল কি ?" মেজদা বলিলেন, "এবার হুগলিতেই পড়ুক অমন ছেলেকে কলিকাতায় পাঠিয়ে আর বিশ্বাস নেই।" কি এত বড় কথা ! একে ফেল হওয়ার অসহ্য দুঃখ, তাহাতে একবিন্দুও সান্ত্বনা নাই, কেবল লাঞ্ছনা ! আমি বড়ই ক্ষুব্ধ হইলাম ; প্রবল ধিক্কার আসিয়া আমার সমস্ত দুঃখ অতিক্রম করিল। আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

ইতিমধ্যে বৌদি কক্ষে মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "ছিঃ ভাই ঠাকুরপো ! কাঁদতে

আছে কি ? ফেল কে না হয় ? ও সব অদৃষ্ট।" রুদ্ধস্বরে আমি কহিলাম, "না বৌদি অদৃষ্টের কোনও দোষ নাই; আমার নিজেরই সমস্ত দোষ।"

বৌদি অঞ্চল দিয়া আমার অশ্রু মুছাইয়া কহিলেন, "তোমার দাদা বড় দুঃখ করছিলেন; তিনি বলছিলেন, তুমি যে ফেল হবে এটা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। ওসব পাশ ফেল হওয়া অদৃষ্টে করে ভাই; তার জন্যে কাঁদে না; ছিঃ, এ বছর হয়নি আর বছর হবে।"

আমি কহিলাম, "না বৌদি, দাদার কাছে কি বলে মুখ দেখাব! মেজদা কত গাল দিলেন।"

বৌদি—"মেজ ঠাকুরপো রাগ করেছে তার কারণ আছে। তোমাদের মেসের একটা ছেলে বড়দিনের সময় ওকে লিখেছিল যে, তুমি নাকি কোন উকীলের মেয়েকে বিয়ে করবে বলে খেপেছ। তার নামে পদ্য লেখ; কুন্তলীন-মুন্তলীন কত কি উপহার দাও; তাদের বাড়ী গান শুনতে যাও; পড়াশুনা কর না, সেইজন্যই ওসব কথা বলেছে। সত্যি এ রকম ঠাট্টা করা তার পক্ষে ভারী অন্যায় হয়েছিল।"

বৌদি'কে আমি মাতার ন্যায় ভালবাসি। তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া আমি লজ্জায় মস্তক অবনত করিলাম; আমার মনে হইল আজ বুঝি বিশ্বের লোকলাঞ্ছনার দণ্ড তুলিয়া আমাকে চূর্ণ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

রুদ্ধস্বরে আমি কহিলাম, "বৌদি, আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, এ বৎসর সব আমোদ আহ্লাদ বিসর্জন দিব; হুগলিতেই পড়ব। যদি পাশ হই তবেই সকলের সঙ্গে মিশব নচেৎ"—আমি অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলাম না।

বৌদি কহিলেন, "এখন এস, তোমাকে ডাকবার জন্য মা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। আমার কথা তুমি কোন দিন অগ্রাহ্য করনি—আমাকে তুমি চিরকাল ভালবাস,—আমার উপর কখনও রাগ কর না; এস লক্ষ্মী ভাইটি, এস স্নান করবে এস।"

বৌদি'র অমূল্য স্নেহে আমি তাঁহার ক্রীতদাস—তাঁহার স্নেহের অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না।

সেই রাত্রে শয়ন করিবার পূর্বে আমি শ্রীমতী কবিতাসুন্দরী ও শ্রীমান প্রেমসুন্দরকে প্রণাম করিয়া কহিলাম, "দোহাই দেবী, দোহাই দেব, এ লাঞ্ছিত দীন-দরিদ্রকে মুক্তি দাও। আমাকে লইয়া যথেষ্ট খেলা করিয়াছ; এখন অনুগ্রহ কর মুক্তি দাও।" বলিব কি, তাহার পরদিন হইতে উভয়েই অন্তর্দ্ধান হইলেন।

তবে শ্রীমতী জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন,শ্রীমান কিন্তু বেলা দেবীর অঞ্চল ধরিয়া আসিয়া আবার আমার স্কন্ধে ভর করিয়াছেন।

সতীশ কহিল, "আর লীলা ?" আমি কহিলাম, "আমার বিবাহের ছয় মাস পরে আমারই যত্নে ও আগ্রহে আমার একমাত্র শ্যালক সুন্দরের সহিত তাহার পরিণয় সম্পাদিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর মেয়ে ডেঁপোমীর জন্য চিরপ্রসিদ্ধ, এ কথাটা কেউ বোধহয় অস্বীকার করে না,—সেই ত লীলা, এখন শ্বশুরবাড়ী গেলে তারই Practical joke-এর চোটে আমাকে ত্রাহিমধুসূদন ডাক ছাড়তে হয়। —হ্যাঁ ভাল কথা হে। আজ এইখানেই খেয়ে যাও না। বৃষ্টির দিনে পোলাও কারী হচ্ছে; শ্রীমতি বেলা নিজের হাতে সব তৈবী করেছেন ও তুমি না মাংসের একজন ভক্ত উপাসক ?

সতীশ কহিল, "হাঁ—সে কথা ভুলে গেছ না কি ? যা হোক, তোমার এ নিমন্ত্রণটা ভারী

we-coming মধ্যে বেশ একটু Romantic comedy-র যোগাড় করে তুলেছিল !" আমি হাসিয়া কহিলাম, "হ্যাঁ তবে comedy-টা কিছু facical !"

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ছুটি

১

প্রবাসে আত্মীয়হীন মুন্‌সেফ হীরালাল মিত্র যখন পীড়িতা পত্নী ও ছয় মাসের শিশুকন্যার তত্ত্বাবধানে প্রতি মুহূর্তে বিপন্ন হইয়া উঠিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পিতার আমলের বৃদ্ধ ভৃত্য রাইচরণ দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে অনেকটা মুক্তিদান কবিল। পশ্চিমে বাঙ্গালী ঝি পাওয়া যায় না, হিন্দুস্তানী দাসী লইয়া কাজ চালানো যে কতদূর শ্রমসাধ্য ও কষ্টকর, তাহা পশ্চিমপ্রবাসী বাঙ্গালীমাত্রেরই অল্পবিস্তর জানা আছে। তাই রাইচরণ যখন স্বেচ্ছায় মাতৃদুগ্ধ-বঞ্চিতা শিশুর সেবার ভার গ্রহণ করিল তখন বাবু অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলেন, "রাইচরণ, ওকে তোমায় দিলুম।" রাইচরণ মনিবেব কথায় একটু হাসিযা ক্ষুদ্র শিশুটিকে আপনার বক্ষের মধ্যে গ্রহণ করিল।

অনেক দিনের কথা, সে আজ প্রায় ২০ বৎসর হইবে—রাইচরণের ক্ষুদ্র কুটীরেও একদিন এমনি একটি ক্ষুদ্র বালিকাব আবির্ভাব হইয়াছিল ; সে আজ নাই, অনেক দিনেব পর তাহার স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয় আজ আবার নতূন করিয়া সেই পরলোকগতা দূহিতাব বিয়োগ-শোক অনুভব করিল। —সে এই মাতৃস্নেহ-বঞ্চিতা শীর্ণদেহা গৌরাঙ্গী দুহিতার অসাধারণ সাদৃশ্য দেখিতে পাইল। ইহার হাস্যে ও রোদনে এবং প্রত্যেক কার্যে তাহার শিশুকন্যার স্মৃতি পরিস্ফুট হইল। রাইচরণের বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম কবিয়াছিল ; তাহার স্বাস্থ্যও তত ভাল ছিল না। সম্প্রতি দেশে ম্যালেরিয়ায় ভুগিযা তাহাব জীর্ণ দেহ একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। দেশে রাইচরণের এক উপযুক্ত পুত্র ও দুই ভ্রাতা ব্যতীত কেহই ছিল না ; পত্নী ক্ষেমঙ্করী এয়োতির চিহ্ন লইয়া ইতিপূর্বেই তাহাব গৃহশূন্য কবিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিল।

রাইচরণ এই ক্ষুদ্র শিশুকন্যাটিকে এমনি স্নেহে পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, সম্ভবত বালিকার প্রসূতিও তাহাকে অধিকতর স্নেহযত্ন করিতে পারিতেন না। পা ছড়াইয়া বসিয়া ঝিনুকে করিয়া দুগ্ধ পান করান হইতে তাহার ছোটখাট সমস্ত কার্যই সে অতি যত্ন ও নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করিত ; এবং কখন কোলে লইযা দোলাইতে দোলাইতে, কখনও বা বুকে করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে, মৃদু-গুঞ্জনে ঘুম—পাড়ানির গান করিযা শিশুর নিদ্রা আনয়ন করিত। সমস্ত রাত্রি বিহঙ্গ-মাতা যেমন করিয়া পক্ষ আচ্ছাদনে তাহার শাবকটিকে রক্ষা করে, তেমনি করিয়া সে এই শিশুটিকে আপনার বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রাখিত। মেয়েটিও খুব শান্ত হইয়াছিল, প্রায়ই কাঁদিত না। রাইচরণ আদর করিয়া তাহার নাম দিয়াছিল লক্ষ্মী। পিতামাতা পছন্দ করিয়া কন্যার নাম রাখিয়াছিলেন স্নেহলতা। কিন্তু পাছে রাইচরণ মনঃক্ষুণ্ণ হয়, তাই সে নামে কেহই তাহাকে ডাকিত না। বালিকার লক্ষ্মী নামই বহাল রহিল।

দুই বৎসর রোগে ভুগিয়া গৃহিনী যখন সুস্থ দেহে কন্যার পালনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন সহসা রাইচরণের মনে হইল তাহার সমস্ত কার্য ও কর্তব্য ফুরাইয়া গিয়াছে। দুই বৎসর লক্ষ্মীকে লইয়া এমনিভাব সে আপনাকে অভ্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল যে, সে ইচ্ছা হইতে মুক্ত হইবার তাহার ইচ্ছা বা সাধ্য ছিল না। দুই বৎসরের পরে আবার নূতন করিয়া সংসারের কাজকর্ম করা তাহার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব বলিয়াই মনে হইল। এক কার্য করিতে গিয়া সে অন্য কার্য করিয়া ফেলিত। কর্তার জন্য চা তৈয়ারী করিতে গিয়া দেখিত লক্ষ্মীর জন্য দুধ লইয়া আসিযাছে। বাজার করিতে গিয়া দেখিত মাঠাকুরাণী যাহা বলিয়া দিয়াছেন সে তাহা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছে। অবশেষে অপ্রতিভ হইয়া নিরস্ত্র হইত। গৃহিণী যদি কখনও রাগ করিয়া বলিতেন, "রাইচরণ, তুমি দিন দিন যেন কি হয়ে যাচ্চ!" রাইচরণ অল্প হাসিয়া বলিত, "আর মা! বুড় হলুম. ১৪, ১৫ গণ্ডা বয়েস হল, আব কি শরীরে জোর আছে, না কিছু মনে থাকে, এখন যম ডেকে নিলেই হয়।" কিন্তু লক্ষ্মীর জন্য কোন কার্যেই তাহার শ্রান্তি বা ভুল দেখা যাইত না। সংসারে কাজ সারিয়া অবকাশ কাল লক্ষ্মীকে লইয় খেলা করাই তাহার প্রধান সুখের সময় ছিল। বালিকা লক্ষ্মীও মাতৃহস্ত হইতে উদ্ধার পাইলেই ছুটিয়া রাইচরণের ক্রোড়ে গিয়া লুকাইত। তাহার দুগ্ধ পান, পোশাক পরা. এবং রাত্রে নিদ্রার অনুষ্ঠান রাইচবণ না হইলে কোন মতেই সম্পন্ন হইত না। লক্ষ্মী রাইচরণকে "চন্নদা" বলিয়া ডাকিত—যদিও ইহা কেহই তাহাকে শিখাইয়া দেয় নাই; ইহাতে তাহার মাতা পিতা আশ্চর্যান্বিত না হইলেও রাইচরণ কিন্তু এই প্রকার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিল। অবশেষে রাইচরণের বিস্ময় বৃদ্ধি করিয়া লক্ষ্মী যখন বাপকে 'বাবা' ও মাকে 'মা' বলিতে আরম্ভ কবিল, এবং হিন্দুস্থানী চাকরদের অনুকরণে নানারূপ ভাষা ও ক্রীড়ার অভিনয় দেখাইতে লাগিল, তখন রাইচরণ তাহার জাঁবনাশায় এক প্রকার হতাশ হইয়া পড়িল। কিন্তু শিশু লক্ষ্মীর পালনভার গ্রহণ করিয়া দুই বৎসর সে দেশে যায় নাই। ইতিমধ্যেই দেশ হইতে তাহাকে যাইবার জন্য অনেক অনুরোধপত্র আসিয়াছে। রাইচরণের পুত্র বামাচরণ তাহাকে কর্মে জবাব দিয়া যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছে; উপযুক্ত পুত্র থাকিতে এই বৃদ্ধ বয়সে দাসত্বের কোন প্রয়োজন নাই তাহাও সে লিখিতে ত্রুটি করে নাই। রাইচরণ কিন্তু প্রতি পত্রেই কর্মত্যাগ বিষয়ে স্বীয় অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া জানাইয়াছে যে, শীঘ্রই সে যাইবার জন্য ছুটী লইবে। কিন্তু মনিবকে ছুটীর জন্য কোন দিনই জানায় নাই, কি জানি যদি ছুটী চাহিলেই পাইয়া যায়! তখন সে কেমন করিয়া লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া থাকিবে? তাহার অবর্তমানে না জানি লক্ষ্মীর কত কষ্টই হইবে! সেই ক্ষুদ্র বালিকা তাহাকে যে মায়াজালে বদ্ধ করিয়াছিল তাহা ছাড়াইবার শক্তি ও ইচ্ছা তাহার ছিল না। সেবার দুই বৎসরের পর দেশে গিয়াও রাইচবণ পনের দিনের অধিক থাকিতে পারে নাই। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "মনিব ছাড়েন না।" কিন্তু বাস্তবিক মনিব ছাড়িলেও তাহার ছাড়িয়া যাইবার সাধ্য ছিল না। এদিকে বয়সের সহিত তাহার সম্বাস্থ্যও দিন দিন ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল।

২

বাবু বলিলেন, "রাইচরণ, তোমার শরীর দিন দিন ভেঙে যাচ্ছে, দিন কতক না হয় বাড়ী থেকে ঘুরে এস, আমি তোমায় ছুটী দিচ্ছি।" মনিবের কথায় রাইচরণ নতশিরে সম্মতি জ্ঞাপন করিল, কিন্তু তাহার মুখে সন্তোষের বিন্দুমাত্র চিহ্নও দেখা গেল না। বাবু চলিয়া

গেলে রাইচরণ আপনার বস্ত্র প্রান্তে চক্ষু মার্জনা করিল। লক্ষ্মী এখন বড় হইয়াছে ; রাইচরণকে আর তাহার কোন কাজই করিতে হয় না। বরং লক্ষ্মীই এখন রাইচরণের তত্ত্বাবধান করে, তাহার আহারের সময় আপনি কাছে গিয়া বসে, এবং 'চন্নদার' কেন একখানা মাছ বলিয়া ব্রাহ্মণীর সহিত ঝগড়া বাধায়। দুপুর বেলা আহারান্তে 'চন্নদার' পাকাচুল তুলিতে গিয়া তাহার কেশবিরল মস্তক অধিক কেশশূন্য করিয়া ফেলা লক্ষ্মীর একটা প্রধান ও নিত্য কার্যের মধ্যে ছিল। রাইচরণ তন্দ্রা-জড়িত অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্রে তাহাদের দেশের কথা, তাহার নাতি ক্ষেতু ও নাতনী মেনুর কথা ও আরও অনেক সামান্য অসামান্য বিষয়ের গল্প করিত ; আর এই মুগ্ধা বিশ্বস্তহৃদয়া প্রবাসিনী বালিকা পরম আগ্রহের সহিত তাহা শ্রবণ করিত। কল্পনা নেত্রে সেই গোময়লিপ্ত বা আলিপনাচিত্রিত মৃৎকুটিরগুলি, সরিষা ফুলেব হরিৎ ক্ষেত্র ও বঙ্গবাসিনী পল্লী বালিকা ও বধূদের কথা চিন্তা করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিত। সেই এক কথাই প্রতিদিন বলিত, তথাপি এই বৃদ্ধ বক্তা ও বালিকা শ্রোত্রীর তাহাতে বিরক্তি বা শ্রান্তি ছিল না। কোন দিন মাকে লুকাইয়া তাঁহার কেশ রচনার "কুন্তলীন" আনিয়া রাইচরণের সহস্র অনুনয় উপেক্ষা করিয়া সে তাহার কেশবিরল শুভ্রমস্তকে অতি যত্নের সহিত মাখাইয়া দিত ; এবং পরম বিশ্বস্তভাবে প্রতি মুহূর্তে চন্নদার শুভ্র মস্তকে নবোদ্ভূত কৃষ্ণ কেশের আর্ভিবের প্রতীক্ষা করিত। রাইচরণ কৃত্রিম রাগ করিয়া বলিত. "তুই আমায় এমন কোরে জ্বালাতন কচ্ছিস্, চল্, মাকে বলে দিযে আসি"—লক্ষ্মী হাসিয়া বলিত, "না চন্নদা. তোমার দুটি পায়ে পড়ি মাকে বলো না। আর কখন করব না।" কিন্তু পরদিনই সে তাহার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলিয়া গিয়া সেই অপরাধেরই অপরাধিনী হইত।

ছুটী পাইলেও আজ-কাল করিয়া দিন কাটিযা যাইতে লাগিল ; রাইচরণের দেশে যাইবার কোন আগ্রহ বা আয়োজন দেখা গেল না। বাবুর খানসামা নফর বলিলেন, "সর্দাব দা, বাবু যে তোমায় ছুটী দিলেন, তা দেশে গেলে না ?" কথাটায় রাগের কোন কারণ ছিল না ; কিন্তু রাইচবণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, সে মনিবের নিমক খায়, মনিব ভাল, ছুটী দিযাছেন, তা' বলিয়া অপরের মত মনিবের সুবিধা অসুবিধা না দেখিয়া সে যাইতে পারে না (ইতিপূর্বে নফর মনিবের অসুখের সময় বাড়ী গিয়াছিল।)

অবশেষে রাইচরণ যখন দেশে যাইতে কৃতসংকল্প হইয়া দিন স্থির করিল, তখন সহসা লক্ষ্মী আসিয়া বলিল, "চন্নদা, তুমি নাকি দেশে যাবে ?" রাইচরণের চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিয়াছিল, সে বলিল, "হ্যাঁ দিদি এবার আমায় যেতেই হবে !"

লক্ষ্মী ম্লান মুখ করিয়া বলিল, "না চন্নদা, তা হবে না, তুমি দেশে যেতে পাবে না।" কথাটা রাইচরণের খুব মনোগত হইলেও সে সহসা কঠিন ভাবে বলিল, "না দিদি, আমায় যেতেই হবে, বাবু আমায় ছুটী দিয়েছেন যে।" কথাটা এমনিভাবে বলিল যেন বাবু ছুটী দিয়া তাহাকে বাধ্য করিয়া পাঠাইতেছেন ; নচেৎ তাহার যাইবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। পিতার বিরুদ্ধে কথা বলা বালিকার স্বভাব বিরুদ্ধ, তাই সে করুণভাবে বলিল. "কিন্তু শীগ্‌গির তোমায় ফিরে আসতে হবে ; আসবে চন্নদা ?"

রাইচরণ অশ্রু মুছিয়া সম্মতি জানাইলে, লক্ষ্মী তাহার অঞ্চলের মধ্য হইতে একটি ছোট শিশি ও গুটিকতক কাচের পুতুল বাহির করিয়া বলিল, "চন্নদা. এগুলি তুমি বাড়ি নিয়ে যেও, ক্ষেতু মিনিকে দিও। এ শিশিতে কি আছে জান ? একে দেলখোস্ বলে, আমার দ্বিতীয় ভাগ শেষ হয়েছে, তাই বাবা আমাকে কিনে দিয়েছেন ; আবার তৃতীয় ভাগ শেষ হলে এইচ্ বোসের কুন্তলীন দেবেন ; এ দিশী তা জান ? এর খুব চমৎকার গন্ধ।" রাইচরণ কতদূর

বুঝিল সেই জানে, কিন্তু লক্ষ্মীর সেই দান প্রত্যাখ্যান করিবার সাধ্য তাহার ছিল না। লক্ষ্মীর অদর্শনকালে তাহার এই ক্ষুদ্র স্নেহপূর্ণ স্মৃতিচিহ্নটুকুই তাহার আনন্দের সম্বল হইবে ভাবিয়া সে তাহা সাগ্রহে গ্রহণ করিল।

৩

পরদিন হঠাৎ গলা ফুলিয়া লক্ষ্মীর জ্বর দেখা দিল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, 'রোগ সাংঘাতিক, বিউবনিক প্লেগ !' সে বৎসর পাটনায় ভয়ানক প্লেগ হইতেছিল, প্রতিদিন শত সহস্র লোক প্লেগে প্রাণ হারাইতেছিল। অনেকে দেশ ছাড়িয়া পলাইতেছিল ; চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। মুন্সেফবাবুও স্ত্রীকন্যাকে দেশে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় লক্ষ্মী ঐ ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইল। ব্যাপার দেখিয়া ভৃত্যবর্গ কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। ছুটীপ্রাপ্ত রাইচরণের আর দেশে যাওয়া হইল না ; সে ইচ্ছা করিয়াই দেশে গেল না।

গৃহিণী কাঁদিয়া বলিলেন, "রাইচরণ, লক্ষ্মী বুঝি আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে যায় !" লক্ষ্মীর রোগ-যাতনা-মসীলিপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া এই স্নেহকাতর বৃদ্ধের বুকের পঞ্জর এক একখানি করিয়া বসিয়া পড়িতেছিল, তথাপি সে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "ভয় কি মা, ভগবানকে ডাকুন, দিদি আমার ভাল, দিদিকে আমি ধরে রাখব" বলিয়াই সেই যন্ত্রণাকাতর অচৈতন্য বালিকাকে ছয় মাসের শিশুর মত সে আপনার বক্ষে ধারণ করিল ; যেন সেখান হইতে কেহই তাহাকে ছাড়াইয়া লইতে পারিবে না। ছয় দিন ছয় রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় অক্লান্ত শুশ্রূষায় সে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিল। সেই জরাজীর্ণ বৃদ্ধদেহে তখন যেন নব যুবকের বলের আবির্ভাব হইয়াছিল। পিতামাতাও সেরূপ ভাবে শুশ্রূষা করিতে পারিতেন না। অবশেষে স্নেহেরই জয় হইল, ভগবান ভক্তের আহ্বান শুনিলেন। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, "আর ভয় নাই, রোগী সারিয়া উঠিয়াছে—কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি , এমন প্রভুভক্ত ভৃত্য আমি জীবনে কখনও দেখি নাই—এ দুশ্চিকিৎস্য রোগ শুধু সেবায় আরোগ্য হইয়াছে।"

মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়া রাইচরণ লক্ষ্মীকে কাড়িয়া লইলেও আপনাকে অক্ষত রাখিতে পারিল না। লক্ষ্মী একটু চলিয়া বেড়াইয়া আরম্ভ করিতেই সে শয্যাগ্রহণ করিল। এতদিন মনের বলে সে দাঁড়াইয়াছিল। এখন তাহার স্নেহের ধনকে বিপন্মুক্ত ও নিরাপদ বুঝিয়া সে আপনাকে ছাড়িয়া দিল। প্রথমে সামান্য জ্বর দেখা দিয়া অবশেষে সেই সামান্য জ্বর প্লেগে পরিণত হইল। ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন, "রোগ কঠিন বৃদ্ধের জীবন-আশা চব্বিশ ঘণ্টার অধিক নাই।" প্লেগ রোগীর শুশ্রূষা যতদূর হওয়া সম্ভব রাইচরণের জন্য তাহার ত্রুটি হইল না। ডাক্তার বলিলেন, "রোগ সংক্রামক, রোগীকে হাঁসপাতালে চালান করা হউক।" হীরালাল বাবু মাথা নাড়িয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "রাইচরণ দুবার আমার মেয়েকে বাঁচিয়েছে, ওকে আমি হাঁসপাতালে পাঠাইতে পারিব না।" ডাক্তার বাবু আর আপত্তি করিলেন না। রাইচরণ জ্বরে ও যন্ত্রণায় অচৈতন্য হইয়াছিল, তাহার কিছু বলিবার ও বুঝিবার শক্তি ছিল না। শুধু মাঝে মাঝে বিকারের ঘোরে বলিতেছিল, "দিদি, আমার ছুটী হয়েছে, আমি বাড়ী যাই !" অনেক রাত্রে চৈতন্যপ্রাপ্ত রাইচরণ যখন ক্ষীণস্বরে জল চাহিল, তখন সেখানে জল দিবার কেহই ছিল না। কিন্তু পরক্ষণেই নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া কে অতি মৃদু পদসঞ্চালনে তাহার মাথার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কুন্তলীনের স্নিগ্ধ গন্ধে রাইচরণ অনুভব করিল ঘরে কেহ আসিয়াছে। সে ক্ষীণস্বরে অভ্যাসের বশে বলিল, "কে ? দিদি, এলি !" লক্ষ্মী ধীরে

ধীরে তাহর রোগশীর্ণ শীতল কোমল হস্তখানি বৃদ্ধের উত্তপ্ত ললাটে রাখিয়া বলিল, "চন্নদা, আমি এসেছি। সারাদিন কেউ আমায় আস্‌তে দেয়নি ; এখন সব ঘুমিয়ে পড়েছে, তাই আমি চুপি চুপি পালিয়ে এসেছি।" বালিকার স্নেহপূর্ণ কথায় বৃদ্ধের দুই কোটর প্রবিষ্ট চক্ষে দুই বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িল, সে অতি কষ্টে তাহার উত্তপ্ত হস্ত মস্তকে রাখিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, "দিদি আমার ! সুখী হও ; রাজরানী হও, আর আমার মরণে দুঃখু নাই।" পরক্ষণেই অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া চুপ করিল। লক্ষ্মী ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, "চন্নদা, তুমি ঘুমিয়ে পড়, সব কষ্ট কমে যবে, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।" রাইচরণ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দিদি আমি বাড়ী যাই, আমার ছুটী হয়েচে।"

প্রভাতে হীরালাল বাবু যখন ডাক্তার লইয়া রোগীর গৃহে প্রবেশ করিলেন তখন চারিদিক পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে ; পথে লোক চলিতে আরম্ভ করিয়াছে ; প্রভাত রবির স্বর্ণ-রশ্মি রাইচরণের ক্ষুদ্র গৃহে প্রতিদিনের মত প্রবেশ করিতে গিয়া রুদ্ধ সার্সি ভেদ করিবার নিষ্ফল চেষ্টায় ইতস্তত সঞ্চারণ করিয়া ফিরিতেছিল। ডাক্তার ঘরে প্রবেশ করিয়াই বিস্মিতভাবে বলিলেন, "একি মা লক্ষ্মী ! তুমি এখানে কেন ?" লক্ষ্মী পিতার দিকে ফিরিয়া সকরুণ মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিল, "বাবা, চন্নদা ঘুমিয়ে পড়েছে ওকে জাগিয়ো না ; চন্নদা কাল সারা দিন ঘুমায়নি।" ডাক্তার রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "না মা, আর ওকে জাগাতে হবে না, ভগবান ওর সব কষ্ট দূর করে দিয়েছেন ; বেচারার ছুটী হয়ে গ্যাছে।"

ইন্দিরা দেবী

দলিল চুরি

(১)

'ঠেঙামারা' চরের অধিকার সাব্যস্ত লইয়া যখন কুণ্ডু বাবুদের সহিত রায়চৌধুরীদের মোকদ্দমা চলিতেছিল, তখন হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে রহিমপুরে জনরব উঠিল যে, রায়চৌধুরীরা স্বপক্ষের প্রমাণস্বরূপ যতগুলা দলিল আদালতে দাখিল করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একখানা খোয়া গিয়াছে ! আধুনিক কুণ্ডু জমিদার পক্ষের লাঠিয়াল, উকীল, ব্যারিষ্টার ও স্তূপীকৃত অর্থ, বনিয়াদী রায়চৌধুরীদের কয়েকখানি দলিলের ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে বলিয়া স্থির ছিল। এই অভাবনীয় ব্যাপারে কুণ্ডু জমিদার পক্ষের জয়োল্লাসের উচ্চধ্বনিতে হৃতসম্পদ লুপ্তগৌরব রায়চৌধুরীদের করুণ আর্তনাদ কেহ শুনিল না, তাঁহাদের বৃহৎ ভগ্ন অট্টালিকার চারিদিকে বিষাদের অন্ধকার যেন আরো ঘনীভূত হইয়া আসিল। 'ঠেঙামারা' জমিদারীটুকুই যে তাঁহাদের বৃহৎ পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র সংস্থান !

আদালতে লুপ্ত দলিলের অনেক অনুসন্ধান হইল। দোষীর পরিবর্জ্জন, নির্দোষীর নির্য্যাতন ইত্যাদি সবই ক্রমে হইয়া গেল, কিন্তু দলিলখানি আর পাওয়া গেল না। রায়চৌধুরীরা, হাকিম ডেপুটি বাবুকে জানাইলেন, মোকদ্দমার সকল কাগজপত্রই সেরেস্তাদারের নিকট থাকে ; প্রতিপক্ষ কুণ্ডুদের ধনবল প্রচুর, তাহারাই সরকারী কর্মচারী

সেরেস্তাদারকে অর্থ সাহায্যে বশীভূত করিয়া, দলিলখানি নষ্ট করিয়াছে। এই অভিযোগের পোষকে যে প্রচুর পরিমাণ আছে, তাহাও আদালতকে জানানো হইল।

ঘুষ গ্রহণ গবর্নমেণ্ট কর্মচারীর পক্ষে একটা বৃহৎ অপরাধ, তার উপর আবার ঐ প্রকার একখানি দলিল নষ্ট করা। ডেপুটি বাবু অভিযোগ শুনিবামাত্র সেরেস্তাদারকে সাস্‌পেণ্ড করিয়া ফৌজদারি সোপর্দ করিলেন।

কেবল মাসিক ত্রিশ টাকা বেতন বহুপুত্রকন্যাময় পরিবারের একমাত্র অবলম্বন ছিল। এই আকস্মিক বিপদে সেরেস্তাদার পুলিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় সংসার অন্ধকার দেখিলেন। জ্যেষ্ঠ ছেলেটি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় এফ্‌· এ· পড়িতেছে, তাহার খরচপত্র দিয়া পুলিন বাবু কোনক্রমে শিশু পুত্রকন্যাগণের ভরণপোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। বাসস্থান বহরমপুরে যাহা একটু ব্রহ্মোত্তর জমিজমা ছিল, সে'ত পৈতৃক-ঋণেই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে ; আছে কেবল গৃহদেবতা গোপীনাথ ঠাকুরের সেবার জমি। কিন্তু তাহাতে তো পুলিন বাবুর হস্তক্ষেপণ করিবার সাধ্য নাই। আজ দশ বৎসর তিনি বাড়ী ছাড়া, জ্ঞাতিগণ সেবাইৎ রূপে গোপীনাথ ঠাকুরকে চালকলা উপহার দিয়া প্রকাশ্যে মহারোলে শাঁখ্‌ বাজাইয়া, অপ্রকাশ্যে নীরবে সকলই ভোগ করিতেছিল।

(২)

রহিমপুর মহকুমাতে স্থায়ী ভদ্র-অধিবাসীর সংখ্যা অতি অল্প। আদালতের কর্মচারী, উকীল, মোক্তার, ডেপুটি, মুন্‌সেফ্‌ লইয়াই গ্রাম। ব্যাধিবিপত্তি, পুত্রের অন্নপ্রাশন, উপনয়নাদি সুখদুঃখের সকল ঘটনায় পরস্পরের সাহায্য করিয়া, প্রবাসীগণ-সকল যেন একই পরিবারের অঙ্গীভূত বলিয়া মনে করিতেন। আত্মীয়হীন প্রবাসে প্রতিবেশীগণ বিপদে সম্পদে সহানুভূতি না দেখাইলে, আর কে সাহায্য করিবে ?

পুলিনবিহারীর সততা ও ভদ্র ব্যবহারে ক্ষুদ্র আম্‌লাপল্লীর সকলেই মুগ্ধ ছিলেন, কিন্তু ইহা একটা আদালতসংক্রান্ত গুরুতর ব্যাপার এবং প্রতিবেশীগণের মধ্যে সকলেই আদালত সংশ্লিষ্ট লোক, কাজেই ইহাতে প্রকাশ্য সাহায্যপ্রাপ্তি অসম্ভব। তথাপি সকলেই অযাচিতভাবে তাঁহাকে যথাসম্ভব সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন।

পুলিনবিহারীর বিচারের দিন নিকটবর্তী হইতে লাগিল ; কিন্তু কি উপায়ে যে রায়চৌধুরীদের অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রয়োগ করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। দশ বৎসর সরকারি কার্যের সুযশ ও নিজের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ভিন্ন তাঁহার দ্বিতীয় প্রমাণ ছিল না।

বিচারের চারদিন পূর্বে রাত্রি নয়টার সময় প্রতিবেশী বনমালী নাজির পুলিন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিলেন, স্থানীয় উকীল মোক্তার মাত্রেই জমিদারদিগের পক্ষে নিযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন। এই দলিলখোয়া মকদ্দমার যোগ থাকায়, কোন উকীলই পুলিনবাবুর পক্ষ অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না। এখন সদর হইতে উকীল আনা ব্যতীত আর উপায় নাই। কিন্তু টাকা কোথায় ?

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, বনমালীবাবু সবে হুঁকাটি রাখিয়া শয়নের উদ্যোগ করিতেছেন, সদর দরজায় কে ডাকিল, "দাদা !"

দিবসব্যাপী পরিশ্রমের পর আমলা-পল্লী রাত্রি নয়টার অধিক সজাগ থাকে না। বনমালী নাজির মহাশয় আজ কয়েক বৎসর হইতে বাতের ব্যারামে আফিং ধরিয়াছেন, সহজে নিদ্রা

হয় না, গৃহিণীর সহস্র নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও তাহাকে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত জাগিয়া থাকিতে হয়। নাজিরপত্নী গৃহের এক প্রান্তে বসিয়া তখনও বোন্‌ঝির তত্ত্বের জন্য চুলের দড়ি পাকাইতেছিলেন।

বনমালী কণ্ঠস্বর চিনিলেন,—কেবল "দাদা" সম্ভাষণে লোক চেনা তাঁর পক্ষে পড় কঠিন ছিল, কারণ পল্লীর অনেকেরই তিনি দাদা! বনমালী উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "কে হে পুলিনভায়া নাকি? যাই একটু দাঁড়াও।"

নাজির মহাশয় তাডাতাড়ি বালাপোষ মুড়ি দিয়া পুলিনবাবুকে সঙ্গে আনিয়া শয়নগৃহে বসাইলেন. এবং হুঁকা হইতে কলিকা নামাইয়া তামাক সাজিতে বসিলেন।

পুলিন বলিলেন, "দাদা, তুমি একটু ব'স, আমার একটা কথা আছে। আমি কাল প্রাতে দেশে যাচ্ছি, দেখা যাক্ সেখানে কিছু টাকা পয়সা সংগ্রহ করিতে পারি কিনা। দিদিকে বল্‌ছি, আর তোমাকেও বল্‌ছি, ছেলেপিলেগুলাকে একটু দেখো। মোকদ্দমার আগের দিন—এই রবিবারে নিশ্চয়ই ফির্‌চি।"

নাজিরপত্নী অন্তরাল হইতে বলিলেন, "আহা! একথা বলবার জন্য, এই রাত্রে কি এমন কষ্ট করে আস্‌তে হয়? আমরা কি তোমার ও সইয়ের পর? আমি কাল ভোরে তোমাদের বাসায় যাব। সইকে বোল। তোমাদের বিপদে আমার প্রাণ যে কি কোচ্ছে, তা কেমন করে বল'ব?"

পুলিনবিহারীর স্ত্রী অনেক দিন হইতেই নাজিরপত্নীর সই। উভয় পরিবারের মধ্যে যাওয়া আসা, আদানপ্রদান আনুগত্যও সেই জন্য খুব বেশী। সেই জন্যই পুলিন আজ অসঙ্কোচে নাজিরের নিকট সাহায্য প্রার্থনায় উপস্থিত।

(৩)

পুলিনবাবুর অনুপস্থিতিতে, আসন্ন বিপৎপাতের আশঙ্কায় বিষণ্ণ ও অবসন্ন পরিবার মধ্যে লক্ষ্মীস্বরূপিনী নাজিরপত্নী যেন অতুল শক্তি আনিয়া দিলেন। খুব গোছালো বলিয়া পুলিনবাবুর পত্নীর প্রসিদ্ধি ছিল, কিন্তু উপস্থিত বিপদে তিনিও হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন। দু'দিন গোয়ালিনী দুধ দিতে আসে নাই, ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি যেন শুকাইয়া গিয়াছে! রান্নাঘর আঙ্গিনা আবর্জনায় পূর্ণ। চাকরটা বাজার কবিবার জন্য প্রাতে বাহির হয়, দ্বিপ্রহরের পূর্বে তাহার আর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

নিঃসন্তান নাজিরপত্নীর আজীবন সঞ্চিত স্নেহের উৎস যেন শতমুখে খুলিযা গেল। তাঁহার যত্ন ও উৎসাহে সংসারের মলিনতা ও বিষাদ যেন কতকটা তরল হইয়া আসিল। আসন্ন ঝটিকাশঙ্কিত মাতৃপক্ষপুটান্বেষী পক্ষীশাবকের ন্যায়, পুলিনবাবুর শিশুপুত্র কন্যাগণ মাতার চারিদিকেই দিবারাত্রি ঘুবিত। তাহাদের চঞ্চলতা, তাহাদের নিরর্থক হাস্যকোলাহল এবং সহস্র আব্‌দার, আজ কয়েক দিন হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছিল; হাস্যময়ী নাজিরপত্নীর আবির্ভাবে তাহারা যেন নূতন প্রাণ পাইল।

সকালে সকালে স্নানাহার করাইয়া, নাজিরপত্নী জোর করিয়া পুলিনবাবুর স্ত্রীকে বসাইয়া, তঁহার চুল আঁচ্‌ড়াইতে লাগিলেন। আজ কয়েক দিনেই রুক্ষ কেশে জট বাঁধিয়া গিয়াছে।

পুলিনবাবুর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সই, আমরা কি এই বিপদ থেকে উদ্ধার হ'ব? আমাদের কি উপায় হবে দিদি?"

নাজিরপত্নী বলিলেন, "আজও আকাশে চন্দর-সূয্যি উঠচে সই! তোমরা তো কোন

দোষেই দোষী নও ? তোমাদের ভাবনা কি ভাই। জগদীশ্বর আছেন, তুমি একটুও ভেবো না।"

সইয়ের সান্ত্বনাবাক্যে পুলিনবাবুর স্ত্রী কতদূর আশ্বস্ত হইলেন, জানি না। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় ইহা ভিন্ন তাঁহার অন্য সান্ত্বনা ছিল না।

পুলিনবাবুর সাত বৎসরের কন্যা বীণা আজ সকালে সকালে স্কুলে গিয়াছে। আট দশ দিন মা যথা সময়ে রন্ধন করিতে পারেন নাই, স্কুল কামাই হইয়াছে। আজ মাসীমা (নাজিরপত্নীকে ছেলেরা মাসীমা বলিত) তাহাকে দশটার মধ্যে নাওয়াইয়া খাওয়াইয়া পড়িতে পাঠাইয়াছেন। স্কুলে গিয়া সে শুনিল যে, তাহার সই ডেপুটীকন্যা অশোকার পুত্রের সহিত তাহার নিজের কন্যার যে বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছিল তাহার আট দিনের অনুপস্থিতিতে তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তখন বীণা মনে মনে সইকে খুব ধিক্কার দিল। কিন্তু রাগ হইল অধিক তাহার মায়ের উপর। সে মনে করিল,—এই ক'টা দিন সব চুপচাপ বসিয়া না থাকিয়া মা যদি মথাসময়ে স্কুলে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, তবে এ গোলযোগ তো মোটেই হইত না। বাবার চাকরি গেছে,—সই অশোকার বাপ্‌ই তো হাকিম। এ বিবাহটা হলেই ত সব গোল চুকে যেত ! অতএব বীণা মায়ের উপর খুব রাগ করিল এবং প্রতিজ্ঞা করিল খোকাকে কোলে করিতে বলিলেই সে তাঁহাকে নিশ্চয়ই দশ কথা শুনাইয়া দিবে।

৫

আজ রবিবার বীণা বড ব্যস্ত। সইয়ের পুতুলের সহিত তাহ;ব নিজেব পুতুলের বিবাহ সম্বন্ধ কাল স্কুলের ছুটীর পর বাড়ী ফিরিবার সময়েই আবার নূতন কবিয়া পাকাপাকি হইয়া গিয়াছে। কাল সোমবারে বিবাহ। কিন্তু লোক যে সে নিজে একা ! ছোট বোন্‌টা ত কোন কাজেরই নয়, কোন কাজ করিতে বলিলেই সে পুতুলেব বাক্সটা ওলট্-পালট করিয়া কাজ আরও বাড়াইয়া তোলে। বালিশগুলা সেলাই হইয়াছে, কিন্তু বরকে যে কাঁথাখানা দেওয়া হবে, তাহাতে এখনো হাত পড়ে নাই।

অশোকার পিতা হরেনবাবুর দিবাযাপনের প্রধান সহায় তাঁহার ছোট ছোট পুত্রকন্যাগুলি। মধ্যাহ্ন আহারের পর শয্যাতল আশ্রয় করিলেই, তাহারা সবগুলিতে আসিয়া বিছানার চারিদিকে ঘেরিয়া বসে। কেহ মাথার পাকাচুল তুলে, কেহ গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া পিতাব নিদ্রাকর্ষণের সাহায্য করিতেছে ভাবিয়া নিদ্রাদেবীকে সেদিনের মত ঘর হইতে তাড়াইয়া দেয়। অশোকার সহিত তাহার ছোট বোনের মোটেই বনিত না,—মাথা টিপিতে টিপিতে সে যদি কোনক্রমে, তাহার দিদির অধিকৃত রাজ্য পিতৃবাহুতে হস্তক্ষেপ করিত, তবে এই অনধিকার চর্চা লইয়া তুমুল কলহ বাধিয়া যাইত। শেষে তন্দ্রালু হাকিম-পিতা ছুটীর দিনে শয্যাতলে বিচারক হইয়া, আসামী ফরিয়াদীর মোকদ্দমা অচিরাৎ নিষ্পত্তি না করিলে বাড়িতে আর কেহ টিকিতে পারিত না।

শয়নগৃহের দরজার নিকট কে ডাকিল, "সই"। অশোকা তখন বোনের সহিত কি একটা খুঁটিনাটি বাঁধাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি দরজার নিকট গিয়া বলিল,"সই নাকি, আয় লো !"

অশোকার পাঁচ বছরের বোন বলিল, "বেলা দিদি এয়েছে।" "বীণা" শব্দটার সে বিশুদ্ধ উচ্চারণ জানিত না।

ইহার পূর্বে বীণা যতবার অশোকার বাপের নিকট আসিয়াছে, সে অশোকার মত নিঃসঙ্কোচে আসিয়াই দাঁড়াইত। সইয়ের বাপকে আবার লজ্জা কি ? আজ সে নতমুখী হইয়া অশোকার পশ্চাতে পশ্চাতে গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একটি টিনের বাক্স।

বসিয়াই বীণা বলিল,—"সই, তোমার ছেলেকে কি কি দেব, তা একবার দেখাতে এসেছি।"

বীণা একে একে টিনের বাক্স হইতে, সাটিনের জামা, ছেঁড়া কাপড়ে প্রস্তুত বালিস, কাঁথা, রাঙতার গহনা, পুঁতির মালা—সব বাহির করিয়া অশোকাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"সই, পছন্দ হবে তো ?"

বীণার পুতুলের রঙ্‌বেরঙের পুঁতির মালার উপর অশোকার অনেকদিন অবধি দৃষ্টি ছিল। ঐ প্রকার মালা কিনিবার জন্য বাজারে খোঁজ করিয়াও পায় নাই। আজ সহজে সেই ইপ্সিত সামগ্রী, স্বীয় পুত্রের বরাভরণ স্বরূপে হস্তগত হইবার সুযোগ দেখিয়া সে খুব খুশী হইয়া বলিল,—"বেশ দিয়েছ সই, আবার কি দেবে ?"

ভাবী বেহানের মনস্তুষ্টি হইয়াছে দেখিয়া, বীণা তাড়াতাড়ি কাপড়ের মধ্য হইতে একটি সুন্দর ঠোঙা বাহির করিয়া বলিল,—"সই আর একটা জিনিস তোমার ছেলেকে দেব।"

অশোকা বলিল, "বাঃ এ যে কুন্তলীনের ঠোঙা, বেশ।" অশোকার ছোট ভাই বোনগুলি খুব কলরব করিয়া বরের যৌতুকের চারিদিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। নিদ্রার সহিত অশোকার পিতার বহুক্ষণ বিচ্ছেদ হইয়াছিল। আর নিমীলিতনেত্রে কোলাহলের মধ্যে থাকিতে না পারিয়া, তিনি গৃহত্যাগের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই বয়সে পৌত্র দৌহিত্রের বিবাহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার তাঁহার আদপে ইচ্ছা ছিল না।

শিশু ছেলেমেয়েগুলি শয্যার নিম্নে যে স্থলে কৌতূহলনেত্রে সোৎসুকে, বীণার সংগৃহীত যৌতুক দেখিতেছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈবাহিক ব্যাপারের তুমুল আন্দোলন করিতেছিল, অশোকার পিতা ধীরে ধীরে সেখান দিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন,—"কি রে, তোদের বিয়েটা হচ্ছে কবে, আমাকে নিমন্ত্রণ করবি তো ?"

অশোকা তাড়াতাড়ি বলিল, "আমার যে ছেলের বিয়ে। সইয়ের মেয়ের বিয়ে। বিয়ের দিন তো মেয়ের বাড়ীই ঘটা,—সইকে জিজ্ঞাসা কর।"

তখন বীণা নিবিষ্টমনে কুন্তলীনের ঠোঙার মধ্যে হইতে বরের উপহার বাহির করিতে ব্যস্ত ছিল। প্রথমে ঠোঙা হইতে একটি রঙিন নেক্‌ড়ার পুঁটুলী বাহির হইল। সেই রকম বেরকমের বস্ত্রাবরণ উন্মুক্ত হইলে নানা বর্ণের কাগজ ও ভালমন্দ ছবির কাগজের মোড়ক খুলিয়া, বীণা একটি সুন্দর শিশি অশোকার হাতে দিয়া বলিল,—"এটাও তোমার ছেলেকে দিব। দাদা পূজার সময় এই দেল্‌খোস আমাকে এনে দিয়েছিল।"

দেলখোসের শিশিটা বালিকার অতি প্রিয় সামগ্রী ; জিনিসটা খারাপ হইবে আশঙ্কা করিয়া সে যেখানে যত ভাল ছবির কাগজ, রঙ্গিন নেক্‌ড়া পাইয়াছে, সে শিশির গায়ে জড়াইয়া সেটিকে স্ফীত করিয়া তুলিয়াছে। আজ বীণা সেই বহুকালের সযত্ন রক্ষিত প্রিয় সামগ্রীটি জামাতাকে উপহার দিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে।

ছোট ছেলে মেয়েরা শিশির গায়ে জড়ানো রঙ্গিন কাগজগুলি ও সেই কাগজমণ্ডিত দেল্‌খোসের ঘ্রাণ লইয়া মহা কোলাহল করিতে লাগিল। অশোকার পিতা ডেপুটিবাবু সেই কাগজগুলির মধ্যে একখানি উঠাইয়া লইয়া তাহা কৌতূহলের সহিত দেখিতে লাগিলেন। ছেলেদের আনন্দকোলাহলে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না।

বীণা আজ অসম্ভব গম্ভীর। কিয়ৎকাল নতমুখে থাকিয়া সে অশোকাকে চুপি চুপি

বলিল—"সই, আমার মেয়ের বিয়েতে তোমাদের সকলের নিমন্ত্রণ, কিন্তু তোমার বাবাকে নিমন্ত্রণ করব না। তোমার বাবা, আমার বাবাকে—"

অশোকার প্রতি সেই কাগজখানি হইতে চক্ষু উঠাইয়া বীণার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "বীণা, তোমার বাবা কোথায় ?"

বীণার স্বর আরো গম্ভীর হইল, মুখ আরো নিচু হইল। আরক্তমুখী বালিকা বলিল, "কি জানি ? টাকার জন্য নাকি কোথায় গিয়াছে। তুমি বাবাকে কেন আপিস্ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ ? আমরা তোমার কি করেছি ?"

এ প্রকার তীব্র তিরস্কার ডেপুটিবাবু বোধ হয় তাঁহার উপরওয়ালার নিকট হইতেও কখন লাভ করেন নাই।

অশোকার পিতা বলিলেন, "তোমার বাপের আর কোনও ভয় নাই। তোমার মাকে ব'লো।"

বালিকার দুই চক্ষু তখন জলে পূর্ণ। অশোকার পিতা অভিমানিনী বালিকার দুই হাত ধরিয়া নিকটে আনিয়া বলিলেন, "বীণা তুমি এই কাগজখানা কোথায় পেয়েছিলে, মা ?"

বীণা বলিল, "কেন, এ ত বাবার কাগজ ! বাবা যেখানে লেখাপড়া করেন, সেখানে টেবিলের তলায় এটা পড়েছিল। আমি ছবি দেখে নিযে রেখেছি। তুমি ওখানা নিয়ো না, বাবা যদি খোঁজ করেন ?"

দেলখোসের শিশি জড়ানো কাগজখানিই সেই সেরেস্তাদার পুলিনবিহারীর সর্বনাশের মূল কারণ লুপ্ত দলিল ! উহাতে মহারানীর মুখচ্ছবি অঙ্কিত লাল বর্ণের লতাপাতা-কাটা ষ্ট্যাম্প (Stamp) দেখিয়া বালিকা তাহাব প্রিয় দেলখোসের শিশিটাকে তাহা দিয়া জড়াইগা বাখিয়াছিল। গুরু কার্যভারাক্রান্ত কর্মচারীগণ আপিসের নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করিতে না পারিয়া, অনেক সময় আদালতের কাগজপত্র বাড়ীতে আনিয়া কার্য শেষ করেন। পুলিনবাবু ঐ প্রকাব মোকদ্দমার নানা কাগজেব সহিত দলিলখানাও বাড়ীতে আনিয়াছিলেন,—তা'র পর সেটা কোন প্রকারে স্খলিত হইয়া টেবিলের নিচে পড়িয়া গেলে কন্যা বীণার হস্তগত হইয়াছিল।

ডেপুটিবাবু সব বুঝিলেন, তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না। কাগজ হাতে করিযা বীণাকে বলিলেন, "বীণা, কাগজখানি আমাব কাছেই থাক্, আমিই তোমার বাবাকে দিব।"

৬

আজ সোমবাব পুলিনবাবুব মোকদ্দমার দিন। দলিল খোযা যাওয়াতে রায়চৌধুরীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইযাছিলেন। তাঁহাদের পক্ষে একজন ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। কুণ্ডুদের পক্ষে অনেক উকীল মোক্তার তদ্বিরের জন্য উপস্থিত। বিচারগৃহে লোকারণ্য ! সকলে ভাবিতেছে, পুলিনবাবু অতি নিরীহ ভদ্রলোক, তাঁর অদৃষ্টে কি আছে, কে জানে ?

পৈতৃক ভিটা বন্ধক রাখিয়া অতি কষ্টে তিন শত টাকা কর্জ করিয়া পুলিনবাবু গত রাত্রে ফিরিয়া আসিয়াছেন। স্থানীয একজন উকীল তাঁহার পক্ষসমর্থন করিতে প্রস্তুত। প্রতিপক্ষের প্রমাণের জোর দেখিয়া সদর হইতে ভাল উকীল আনা হইবে। হাকিম ডেপুটিবাবু এজলাসে আসিলেন। যথাসময়ে মোকদ্দমা উঠিল। ফরিয়াদি রায়চৌধুরীদের পক্ষের ব্যারিষ্টাব মামলার বিবরণ বলিতে উঠিলেন। বিচারক তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "এ মোকদ্দমা আর চলিতে পারে না, আমি অপহৃত দলিল খুঁজিয়া পাইয়াছি। আমি ইহার

সাক্ষী। আসামী বেকসুর খালাস।"

ব্যারিষ্টার মুখ বিকৃত করিয়া বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎকালের জন্য জনপূর্ণ বিচারগৃহ নিস্তব্ধ হইল। তারপর আনন্দকোলাহলের সহিত সকলে বাহির হইয়া গেল।

৭

সেই রাত্রেই পুলিনবাবুর বাসায় মহাসমারোহে বন্ধু ভোজন হইয়া গেল। রাজিব নাজিব মহাশয়ের ও বাড়ীর ভিতরে লক্ষ্মীস্বরূপিণী নাজিবপত্নীর যত্নে কাযের কোনই বিশৃঙ্খলা হইল না। বীণার পুতুলের বিবাহও সেইদিন হইয়া গেল। অশোকার বাপ ডেপুটিবাবুকে বীণা পরে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি তিনি দৌহিত্রের বিবাহে নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে আসেন নাই,—কেবল বরের মা অশোকা আসিয়াই সকাল সকাল বিবাহ সারিয়া চলিয়া গিয়াছে।

চারিপাঁচ দিন পরে নাজিবপত্নী যখন নিজের বাসায় ফিরিয়া যাইবার জন্য বীণার মায়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসিলেন,—তখন তিনি সইয়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—'দেখ বোন, আমি তো বলেছিলাম আজও চন্দর সূয্যি মাথার উপর উঠচে। তোদের কি অনিষ্ট হইতে পারে? তোরা চিরকাল সুখে থাকবি।'

পুলিনবিহারীর স্ত্রীর গণ্ডস্থল বাহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু ভূপতিত হইল।

জগদানন্দ রায়

ঘড়ি-চুরি

(১)

সকাল ছয়টা। আকাশটা তেমন পরিস্কার ছিল না, এজন্য সকালবেলা বাড়ী হইতে বাহির হই নাই। শেখরবাবু তখন রাস্তার দিকের জানালার কাছে ইজিচেয়ারখানি সরাইয়া লইয়া একখানি বই হাতে করিয়া একমনে পড়িতেছিলেন আমি তাঁহার সোফাখানি অধিকার করিয়া ছিলাম। তখন সবে মাত্র চায়ের পিয়ালা খালি হইয়াছিল, সেটি আমার সম্মুখের টিপায়ার উপর পড়িয়াছিল।

ঘরখানি ইংরাজী ফ্যাসানের ঘরের মেঝে মাদুর মোড়া চেয়ার টেবিল কৌচে ঘরখানি পরিপূর্ণ, একপাশে একটি আলমারী সেটি নতুন পুরাতন নানাবিধ পুস্তক সংবাদপত্র প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। এই ঘরটি শেখরবাবুর বসিবার ঘর।

শেখরবাবুর পূর্ণ নাম সুধাংশুশেখর বসু। আমরা উভয়ে বাল্যকালে একত্র খেলা করিয়াছি, একই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছি, এবং আজ পর্যন্ত তাঁহাকে যেমন ভালবাসি এমন আর কাহাকেও বাসি কিনা সন্দেহ। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি এমন দুর্বোধ্য যে, আমিও এতদিনেও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তিনি যখন স্কুলে পড়িতেন তখন কাহারও সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন না। কিন্তু সকলের সঙ্গেই অমায়িক ভাবে ব্যবহার করিতেন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি দেখিয়া শিক্ষকগণ চমৎকৃত হইতেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে সকল বালক বিদ্যাবুদ্ধিতে তাঁহার অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট, (তার মধ্যে আমি একজন) তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট স্বাস্থ্য বিসর্জন ও উপাধি অর্জন করিয়া বিদায়

লইল, কিন্তু তিনি তাহার কিছুই করিতে সমর্থ হন নাই। তারপর শেখরবাবু পুলিশের ডিটেক্‌টিভ বিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; যে কয়েক বৎসর তিনি কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহার খ্যাতির সীমা ছিল না, কিন্তু কেন জানি না, অবশেষে তিনি স্বেচ্ছায় কাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন।

শেখরবাবু বইখানি রাখিয়া দিয়া আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মহেন্দ্রবাবু আসছেন দেখছি। তুমি বোধ হয় ওঁকে চেন।"

শেখরবাবু মধুর হাস্যের সহিত মহেন্দ্রবাবুর সংবর্দ্ধনা করিলেন, তাহার পর তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মহেন্দ্রবাবু, আজিকার সকালটা বড়ই বাদ্‌লা, খানিকটা চা আনিতে বলিব কি ?"

মহেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি নাই। কিন্তু সম্প্রতি একটা বড় দরকারী কাজের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি বোধ হয় জানেন আমি এখন পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্টের ডিটেক্‌টিভ। এই ভদ্রলোকটি একটি ঘড়ি পার্শেল করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সেটি চুরি গিয়াছে, এ পর্যন্ত তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই।"

শেখরবাবু আগন্তুক ভদ্রলোকটির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বসুন মহাশয়, ব্যাপারটি কি ঘটিয়াছে সমস্তই আপনি বিস্তারিত করিয়া বলুন।"

"ব্যাপার এমন বিশেষ কিছু নয়। যেটি হারাইয়াছে সেটি অতি উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান ঘড়ি, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অধিক ক্ষতির কথা এই যে সেটি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মৃতিচিহ্ন। আপনি ঘড়িটি উদ্ধার করিয়া দিতে পারিলে আমি চিরদিন আপনার নিকট ঋণী থাকিব।" শেখরবাবু তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "ঘড়ি চুরি সম্বন্ধে কি বলিতেছিলেন ?"

"ঘড়িটি আমার দাদার নিকট থাকিত। সম্প্রতি দাদা রাজবাড়ী যাইবার সময় ঘড়িটি একটু খারাপ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মেরামত করিয়া পাঠাইয়া দিবার জন্য আমার কাছে রাখিয়া যান। ঘড়ি মেরামত হইয়া গেলে, আমি তাঁহার নিকট ডাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। ফেরৎ ডাকে তাঁহার যে পত্র আসিল, তাহা পড়িযাই আমি অবাক হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "তুমি ঘড়ি পাঠাইয়াছ এবং আমিও ঘড়ি পাইয়াছি বটে, কিন্তু সে ঘড়ির বদলে একটি অতি অল্পদামের বাজে ঘড়ি পাইয়াছি।" "এই দেখুন, তাঁহার পত্র।" বলিয়া তিনি একখানি খামে ভরা পত্র শেখরবাবুর হাতে দিলেন।

শেখরবাবু খামখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "আপনার দাদা বোধ হয় রেলওয়ে আফিসে কাজ করেন ?"

"হ্যাঁ, তিনি রাজবাড়ীর স্টেশনমাষ্টার। আপনার সঙ্গে কি তাঁর পরিচয় আছে ?"

"না, খামখানি দেখে এইরকমই অনুমান হচ্ছে।"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "খাম দেখে অনুমান হচ্ছে ?"

শেখরবাবু খামখানি তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখুন না, খাম দেখে কিছু বুঝা যায় কিনা ?"

মহেন্দ্রবাবু অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে খামখানির চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহার পর বলিলেন, "ভায়োলেট কালিতে লেখা নাম ও ঠিকানা, আর এখানকার ও বাজবাড়ীর পোষ্টমার্ক, ইহা ভিন্ন খামে এমন কোন চিহ্ন নাই, যাহা হইতে পত্রপ্রেরক কি কাজ করেন, তাহা বুঝা যায়।"

"পোষ্টমার্কটি ভাল করিয়া দেখিয়াছেন।"

"হাঁ, পোষ্টমার্কে রাজবাড়ীর পর R.S. লেখা আছে বটে, কিন্তু অন্য লোকেও ত ষ্টেশনে চিঠি দিয়া যাইতে পারে।"

"চিঠিখানা কোন সময়ে সেখান থেকে রওনা হয়েছে সেটা বুঝতে পেরেছেন ?"

"ঠিককথা, চিঠিখানা দেরিতে রওনা হয়েছে, কিন্তু 'লেট ফি'র ছাপ নাই।"

শেখরবাবু বলিলেন, "এর থেকেই অনেকটা অনুমান হয় নাকি যে, যিনি চিঠি লিখেছিলেন, তিনি লেট ফি না দিয়েও চিঠিখানা পাঠাতে পারেন ?"

"তিনি ষ্টেশনের কর্মচারী না হয়ে পোষ্টাল কর্মচারীও ত হতে পারেন।"

"ঠিক কথা। ভায়োলেট রংয়ের কালী সচরাচব কোথায় ব্যবহার হয় বলুন দেখি।"

মহেন্দ্রবাবু আশ্চর্যহইয়া শেখরবাবুর মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন, "শেখরবাবু আপনি ঠিক বলিয়াছেন, এই কালি কপিং ইঙ্ক নামে রেলষ্টেশনে ব্যবহারের জন্য আজকাল চলিত হইয়াছে।"

শেখরবাবু বলিলেন, "রেলের ষ্টেশনে দরকারী কাগজপত্রের নকল রাখিবার জন্য যে কালির ব্যবহার, তাহা ডাকঘরে লইয়া গিয়া তাহাই পত্রে ব্যবহার কবিয়াছে, এরূপ যুক্তি নিতান্ত অসার।"

(২)

চিঠিখানি এতক্ষণ খামের মধ্যেই ছিল, এখন শেখববাবু খামের ভিতর হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া পড়িবার পূর্বে একবার নাকে আঘ্রাণ লইলেন, তারপব কাগজখানি মহেন্দ্রবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন, "কাগজটা দেখে আপনার কি মনে হয় ?"

"বেশ মোটা রুলটানা কাগজ, হাফসিট। কাগজখানি ছিঁড়িবার সময় বোধহয় তাড়াতাড়ি ছেঁড়া হইয়াছিল, কেন না পরিষ্কার ছেঁড়া হয় নাই। চিঠির এক পৃষ্ঠা ভায়োলেট কালিতে লেখা, অপর পৃষ্ঠায় কাল কাল দাগ আছে। কাগজখানি দেখিয়া বোধ হয়, কোন একখানা লেখা চিঠির এক পৃষ্ঠা সাদা ছিল, সেই সাদা কাগজখানি ছিঁড়িয়া লইয়া এই চিঠিটা লেখা হইয়াছে।"

শেখরবাবু সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন, "বেশ মহেন্দ্রবাবু, আপনি ঠিকই ধবিয়াছেন। এখন বলুন দেখি, যে চিঠির এক পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া লওয়া হইয়াছে সেই চিঠিখানি স্ত্রীলোকের কি পুরুষের ? আপনার কি বোধ হয় ?"

"চিঠির অপর পৃষ্ঠায় লেখার যে দাগ পড়িয়াছে সেটা বাংলা লেখার ছাপ বলিয়া বোধ হয় বটে কিন্তু তাহা হইতেই স্ত্রীলোকের চিঠি বলিয়া ঠিক করা অনেকটা কষ্টকল্পনা। পুরুষেও তো বাংলায় পত্র লিখিয়া থাকে।"

"নিশ্চয়ই লেখে, কিন্তু চিঠিখানি যে পুরুষের লেখা নয় সে বিষয়ে কষ্টকল্পনা ব্যতীতও অনেক পরমাণ পাওয়া যায়। চিঠিখানি একবার নাকের কাছে ধরুন দেখি।"

"বাঃ, চমৎকার গন্ধ।"

"গন্ধটা দেল্‌খোসের গন্ধ। ডিটেক্‌টিভ বিভাগে কাজ করিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন সুগন্ধেব পার্থক্য অনুভব করিবাব ক্ষমতা বিশেষ আবশ্যক। দেল্‌খোস প্রভৃতি যে সকল গন্ধ দ্রব্যের ব্যবহার সেগুলির সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা নিতান্ত প্রয়োজন। এখন ভাবিয়া দেখুন, স্ত্রীলোকের পক্ষেই হাতবাক্সে এসেন্স রাখিবার অধিক সম্ভাবনা। লিখিবার সময় কালি ব্লট না করার জন্য কাগজের অপর পৃষ্ঠায় ছাপ পড়িয়াছে, এরূপ অপরিষ্কার লেখাও পুরুষ অপেক্ষা

স্ত্রীলোকের পক্ষেই অধিক সম্ভব। তাহার পর হাতের লেখা সম্বন্ধে আমি অনেক আলোচনা করিয়াছি, তাহাতেই লেখার এই উল্টা ছাপ দেখিয়া নিশ্চয় বলিতে পারি ইহা স্ত্রীলোকের লেখা।"

হরিভূষণ বাবু বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, এই ডাকের কাগজ দেখে এখন আমার মনে হচ্ছে, বৌদিদি , এইরকম ডাকের কাগজ ব্যবহার করেন। সম্ভবত তাঁহারই চিঠির আধখানা কাগজে দাদা এই চিঠি লিখে থাকবেন। কিন্তু আপনার এই অদ্ভুত ক্ষমতা এই সমস্ত বৃথা বিষয় লইয়া অপব্যবহার হইতেছে, ইহাতে চুরির কোন সন্ধান হইতেছে না।"

শেখরবাবু বলিলেন,"চুরি সম্বন্ধেও কতক সাহায্য হইল কি! এই সমস্ত দেখিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি রাজবাড়ী ষ্টেশনে পার্শেল পৌঁছিয়াছে ও সেখানে আপনার দাদাও উপস্থিত ছিলেন, অতএব সেখান হইতে ঘড়ি চুরি যাইবার সম্ভাবনা খুব অল্প। আপনি ঘড়ি কিরূপে কাহাকে দিয়া পাঠাইয়াছিলেন ?"

হরিভূষণবাবু বলিলেন, "ঘড়িটা রেজিষ্ট্রী কি ইনসিওর করিয়া পাঠাই নাই, বেয়ারিং পার্শেল কখন খোওয়া যায় না জানিতাম, তাই বেয়ারিং পাঠাইয়াছিলাম, ঘড়ি আমি নিজে হাতে প্যাক করিয়া আমাদের বাড়ীর বিশ্বাসী ঝির হাতে দিয়া পোষ্টাফিসে পাঠাইয়াছি। পার্শেলে যে ঘড়ি আছে তাহা ঝির জানিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। তার পর ঘড়ির সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধ নাই।"

শেখববাবু হরিভূষণবাবুর কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার দাদার চিঠি দেখিতেছিলেন। বলিলেন, "আপনার দাদা লিখিয়াছেন চলন্ত ঘড়ি পড়িয়াছিলেন, আপনি কি এখানে ঘড়িতে চাবি দিয়া দিযাছিলেন।"

"হাঁ, আমার মনে কেমন একটা খেয়াল হইযাছিল যে এখান হইতে দম দিয়া পাঠাইলে ঘড়ি চলন্ত অবস্থায় পৌঁছায অথবা কোন সময় বন্ধ হয় তাহা পবীক্ষা কবিব, সেই জন্য আমি ঠিক দশটার সময় দম দিয়া দিই, এবং দাদাকেও ঘড়ি চলিতেছে অথবা কয়টা বাজিয়া বন্ধ হইয়াছে তাহা জানাইতে লিখিয়াছিলাম।"

মহেন্দ্রবাবু বলিয়া উঠিলেন, "শেখরবাবু, আপনি বোধ হয় ঝির উপরেই সন্দেহ করিতেছেন। কিন্তু আমি ঝির ও তাহার আত্মীয়গণ কলিকাতায যে যেখানে আছে তাহাদের এমন ভাবে অনুসন্ধান করিয়াছি যে তাহারা চুরি করিলে নিশ্চয় ধরা পড়িত।"

হরিবাবু বলিলেন, "আমারও মনে হয না যে বামা চুরি করিয়াছে। সে আমাদের অতি বিশ্বাসী ঝি। বিশেষতঃ পার্শেলে যে ঘড়ি আছে তাহাই সে জানিত না।"

শেখরবাবু বলিলেন, "অবশ্য আপনি কাহাকেও বলিয়া দেন নাই যে পার্শেলের ভিতর ঘড়ি পাঠাইতেছেন, কিন্তু পার্শেলের ভিতর একটা চলন্ত ঘড়ি পাঠাইলে, যাহার হাতে পড়ে সেকি আব বুঝিতে পাবে না ?"

"ঘড়িটা প্যাক করার পর ওকথা আমার মনে হইয়াছিল, সেই জন্য পাঠাইবার আগে কানের নিকট ধরিয়া খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম কিছুই শুনা যায় না।"

শেখরবাবু বলিলেন, "ঘড়ির শব্দ অনেক সময় কানে শোনা অপেক্ষা স্পর্শের দ্বারা বেশী বুঝা যায়। আপনি যদি পার্শেলটা চারিদিকে ফিরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতেন তাহা হইলে কোন না কোন অবস্থায় ঘড়ির শব্দ শুনিতে পাইতেন। এই দেখুন, এই ঘড়িটার উপর এই ছড়িখানি ছোঁয়াইয়া রাখিলাম অন্য দিকটা আপনি দাঁতে করিয়া ধরুন। শব্দ পাইতেছেন ?"

হরিবাবু মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন। তাহার পর দাঁতের ছড়িটি ফেলিয়া দিয়া

বলিলেন, "একটা কথা আপনাকে আগে বলি নাই, ছড়ির সঙ্গে আমি একটা থার্মোমিটারও পাঠাইয়াছিলাম।"

"তাহা হইলে তো এ বিষয়ে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে থার্মোমিটারের খাপের একদিক ঘড়িতে ও অন্যদিক টিনের কৌটার গায়ে লাগিয়াছিল, সেই দিকে হয়তো হঠাৎ চোরের হাত পড়িয়াছিল, এবং তাহাতেই সে চুরি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবে।"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "এই সব প্রমাণে বামার উপরেই সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু বামা ঘড়ি পাওয়ার ১৫ মিনিট পরেই পোষ্টাফিসে দিয়া আসিয়াছে এ খবর আমি ঠিক জানিতে পারিয়াছি। যদিও ঘড়ি ডাকে দিতে যাইবার সময় তাহার ভাইপোর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, তথাপি তাহার দ্বারা এ কাজ হয় নাই সে বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।" শেখরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার তবে কাহার উপর সন্দেহ হয়?"

"আমার অনেকটা এইরকম বিশ্বাস হইয়াছিল, আর এখনও মনে হয় হরিবাবুই পাঠাইবার সময় একটা গোলমাল করিয়াছেন।"

হরিবাবু ম্লান ভাবে হাসিলেন, বলিলেন, "আজকাল পুলিশে যাওয়া বিষম বিড়ম্বনা। যিনি অভিযোগ করিতে যাইবেন পাকে প্রকারে তাঁহাকেই অভিযুক্ত হইতে হইবে। মহেন্দ্রবাবু যেরূপ ভাবে আমাদের বাড়ী খানা-তল্লাসী করিয়াছিলেন, তাহাতে উনি যদি আমার বিশেষ বন্ধু না হইতেন তবে উহার সঙ্গে আমার বিষম মনোবিবাদ হইত।"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "কর্তব্যের অনুরোধেই আমাদের এই সব অসন্তোষকর কার্য করিতে হয়।"

"যে ঘড়িটি পাওয়া গিয়াছে সেটি কোথায়?" হরিবাবু পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া বলিলেন, "এই ঘড়িটা দাদা ফেরৎ পাঠাইয়াছেন।"

"কবে পাঠাইয়াছেন?"

"তিনি ঘড়ি পাইয়াই যখন দেখিলেন তাঁহার ঘড়ি নয়, তখন যে ট্রেনে তাঁহার চিঠি ফেলিয়াছিলেন সেই গাড়ীর গার্ডের হাতে আমার নিকট ফেরৎ দিবার জন্য ঘড়িটি দিয়াছিলেন। গার্ড আমাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

পোষ্টাফিসে সন্ধান করে কি জানিতে পারিলেন?" মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "পোষ্ট অফিস থেকে চুরি যাওয়া সম্ভব নয়, তাহা অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন। পোষ্টমাষ্টার রাজকৃষ্ণ বাবুর নিকট জানিতে পারিলাম যে তিনি দুটার সময় দারজিলিং মেলে দিবার জন্য পার্শেল রওয়ানা করিয়া দিয়াছিলেন।"

শেখরবাবু বলিলেন, "তিনি ১২ টার সময়েও তো ডাক রওনা করিয়া নির্দোষ হইতে পারিতেন।"

তাহার পর আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বড় ছেলের নাম রাজকৃষ্ণ নয়?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, তিনি তো পোষ্টাফিসে কাজ করেন।"

শেখরবাবু ভাবিতে ভাবিতে ঘড়িটির চারিদিক মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষণ করিতে করিতে অবশেষে একটু চিন্তিতভাবে হরিবাবুকে বলিলেন, "আপনার ঘড়িটি ফেরৎ পাইলেই আপনি বোধহয় সন্তুষ্ট হন। চোরকে ক্ষমা করিতে বোধ হয় আপনার আপত্তি নাই। কারণ যে চুরি করিয়াছে তাহার বয়স অতি অল্প, এ সময় তাহাকে জেলে দিলে তাহার ভবিষ্যৎ চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যাইবে।"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আপনার কথা শুনিয়া আমার বড়ই আশ্চর্য বোধ হইতেছে। চোর

ধরা না পড়িলে ঘড়িটি কি করিয়া পাইবেন বুঝিতে পারিতেছি না, আর আপনি কোন অনুসন্ধান না করিয়া এ সমস্ত কথা কি প্রকারে জানিলেন।

শেখরবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "এই ঘড়িটাই চোরকে দেখাইয়া দিতেছে।"

মহেন্দ্রবাবু এই কথা শুনিয়া ব্যগ্র-ভাবে ঘড়িটি হাতে লইলেন ও খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখিতে লাগিলেন।

"ঘড়ির উপর কতকগুলি দাগ পড়িয়াছে এবং ঘড়ির রিংয়ে একটু সুতা বাঁধা আছে দেখ্‌তে পাচ্ছি, চিহ্নের মধ্যে তো এই!"

শেখরবাবু বলিলেন, "উপরের দাগ কিছুই নয়, ঘড়ির সঙ্গে এক পকেটে টাকা কি অন্য রকম পদার্থ ছিল দাগ দেখিয়া তাহাই বুঝা যায়। বরং ঘড়ির ভিতরে যেখানে ঘড়িতে চাবি দেওয়া হয় সেখানে যে দাগ পড়িয়াছে তাহা দেখিয়া অনুমান করিতে পারেন যে ঘড়ির অধিকারীর মদের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে। মাতালদের হাত কাঁপে বলিয়া চাবি দিবার সময় ঘড়িতে এইরূপ দাগ হয়। তবে রিংয়ে যে সূত্র আছে সেটিও একটি সূত্র বটে, কিন্তু সর্বপ্রধান সূত্র এখনও আপনি ধরিতে পারেন নাই। যাহা হউক, পোষ্টমাষ্টার বাবুকে কাল চারিটার সময় পাঠাইয়া দিবেন। আমি তাঁহার নিকট অনুসন্ধান করিয়া ঘড়ির সম্বন্ধে মীমাংসা করিব। আপনাদের কাহারও তাঁহার সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই।"

(৩)

পরদিন বেলা ৪টার সময় পোষ্টমাষ্টার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শেখরবাবুর সদাপ্রসন্ন মুখখানি আজ একটু বিমর্ষ বোধ হইল। রাজকৃষ্ণবাবুকে বাড়ীর সংবাদ প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পকেটে হাত দিয়া যেন আশ্চর্য ভাবে বলিলেন, "আমার ঘড়িটা কোথায় গেল?" তারপর রাজকৃষ্ণ বাবুকে বলিলেন, "আপনার ঘড়িটি দিন তো সময়টা দেখি।" রাজকৃষ্ণ বাবু ঘড়িটি বাহির করিয়া দিলেন। ঘড়িটা একটা কাল রং-এর কারে বাঁধা ছিল। শেখরবাবু ঘড়ি না দেখিয়া ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়া কারের গিরা বাঁধা জোড়াব জায়গাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন।

পরীক্ষা শেষ হইলে রাজকৃষ্ণ বাবুকে বলিলেন, "আপনার পিতা আমাদের সকলের সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, আপনি সেই দেবতুল্য পিতার সন্তান। কোলকাতায় আসিয়া ও নতুন চাকরিতে প্রবেশ করিয়া আপনার স্বভাবের এইরূপ অধঃপতন হইয়াছে দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। একথা নিশ্চয় জানিবেন যে, পাপ কখন লুকানো থাকে না। আমাদের কর্তব্য আপনাকে রাজদ্বারে সমর্পণ করা, কিন্তু আপনার বয়স অল্প, ক্ষমা পাইলে আপনার স্বভাব ক্রমশঃ সংশোধিত হইতে পারে এইরূপ বিবেচনা করিয়া এবার আপনাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ফণিভূষণ বাবুর ঘড়িটা অবশ্যই আপনি ফিরাইয়া দিবেন।"

পোষ্টমাষ্টার বাবু ইতস্তত করিতে লাগিলেন, একটু পরে বলিলেন, "আপনারা যে কেন আমাকে এরূপ বলিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না।"

শেখরবাবু বলিলেন, "আমি বুঝাইয়া দিতেছি। এই ঘড়িতে যে রেশমটুকু বাঁধা আছে সেটা ঐ কারের, আর ঘড়ি পাঠাইবার সময় তাড়াতাড়িতে আপনি খুলিতে না পারিয়া কারটি কাটিয়া ফেলিয়াছেন। তারপর দেখুন, ফণিবাবু যে ঘড়ি পাঠাইয়াছেন সেটি তখন চলিতেছিল, চলন্ত অবস্থাতেই তিনি ফেরৎ পাঠান, এখানে আসিয়া একটা বাজিয়া ঘড়িটি বন্ধ হয়, কাল আমি ঘড়িটিতে চাবি দিয়া দেখিয়াছি ঘড়িটি ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা সময় রাখে।

অতএব একটার সময় ঘড়িটির চাবি দেওয়া হইয়াছিল বেশ বুঝা যাইতেছে। মহেন্দ্রবাবু আমাকে বলিয়াছেন পোষ্টাফিসের খাতাপত্রে প্রকাশ এবং আপনিও স্বীকার করিয়াছেন ঘড়ি দুটা পর্যন্ত আপনার কাছেই ছিল, তাহার পর তাহা মেলে পাঠাইয়াছেন, অতএব আপনি একটার সময় ঘড়িটি চাবি দিয়া প্যাক করিয়া পাঠাইয়াছেন। এই প্রমাণ যে কোন আদালতে আপনাকে দোষী করিবে তাহা বুঝি এখন বুঝিয়াছেন।"

পরদিন বৈকালে মহেন্দ্র এবং হরিবাবু উপস্থিত হইলেন। মহেন্দ্রবাবু একটু বিদ্রূপের সহিত বলিলেন, "শেখরবাবু ব্যাপার কি ? সেই অল্পবয়স্ক চোর ও চোরাই ঘড়ির কোন সন্ধান পাইয়াছেন নাকি ?"

শেখরবাবু হাসিয়া বলিলেন, "চোরটির সন্ধান আপাততঃ দিতে পারিতেছি না, ঘড়িটির সন্ধান পকেটেই আছে"—বলিয়া পকেট হইতে ঘড়িটি বাহির করিয়া দিলেন।

সরলাবালা দাসী

"আভা"

"আভি ! আভি ! বলি এখনও কি তোর ঘুম ভাঙ্‌বে না ?" আভাময়ী তখন সাংসারিক কার্যে একটু সাবকাশ পাইয়া, নিজের ঘরে দরজা ভেজাইয়া দিয়া বইখানি পড়িবার জন্য সবে মাত্র হাতে করিয়াছে, এমন সময় তাহার বিমাতাঠাকুরাণী মাধ্যাহ্নিক সুদীর্ঘ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া বকিতে বকিতে আভার ঘরে প্রবেশ করিলেন। বিমাতার মধুর কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হইবামাত্র আভা তাড়াতাড়ি বইখানি লুকাইয়া রাখিতে গেল, কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা হাত হইতে মেঝেয় পড়িয়া গেল। দেখিয়া বিমাতা তো রাগিয়াই আগুন ! তিনি স্বীয় স্বাভাবিক কর্কট কণ্ঠস্বর আরও কর্কশ করিয়া সক্রোধে কহিলেন, "আ মোলা যা ! পোড়ামুখীর বুঝি আবার বিবি হতে সাধ গিয়েছে। আমি সারা দিন খেটে খেটে মুখে রক্ত উঠে মরব, আর উনি বসে বসে কেবল লেখাপড়া করবেন ; কি আদব রে ! লেখাপড়া করে মেয়ে আমার রোজগার করে এনে দেবেন ! ওঠ্ বলছি, ঘরের কাজ কর্ম দেখ গে।"

বিমাতার নিকট অনর্থক তিরস্কৃতা হইয়া বালিকা আভা নতমুখে ভয়ে ভয়ে বলিল, "এখন তো বেলা ঢের আছে মা ! আর এ সময় ত কোন কাজ ছিল না, তাই একটুখানি বসেছিলাম।"

গৃহিণী। "তোমার আর কি কাজ আছে বল, মরতে তো একা আমিই আছি। খোকা যে সেই অবধি কাঁদছে, তা তা'কে একটু দুধ খাইয়ে উপকার করবার মমতা কারুর নেই। ওর যেমন বুদ্ধি ! আমাকে জ্বালাবার জন্য একটা বুড়ো মেয়ে ঘরে পুষে রেখে দিয়েছে। আর যে চমৎকার গুণের মেয়ে, তা' নেবেই বা কে ? এ আপদ বিদেয় হলে বাঁচি যে।"

রাগে ফুলিতে ফুলিতে গৃহিণী চলিয়া গেলেন। আভা গোপনে দুই বিন্দু অশ্রু মুছিয়া খোকাকে দুধ খাওয়াইতে গেল, গিয়া দেখিল খোকা তখন ঘুমাইতেছে।

আভা যখন আট বৎসরের বালিকা, তখন তাহার মাতা স্বর্গারোহণ করেন। আভার পিতা রামনাথ চট্টোপাধ্যায় স্ত্রীবিয়োগের কিয়দ্দিবস পরেই পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

নূতন বিবাহের পর কিছুদিন অবধি আভা পিতার নিকট পূর্ববৎ আদর স্নেহ পাইয়াছিল,

কিন্তু রমানাথবাবুর নূতন গৃহিনীর গুণে ক্রমে ক্রমে কন্যার প্রতি সে স্নেহ মমতার হ্রাস হইতে লাগিল। মাতৃহীনা বালিকা তাহার প্রতি পিতৃ স্নেহের অভাব বুঝিতে পারিয়া পৃথিবী অন্ধকার দেখিল। বিমাতার তাড়নায় সরলা কোমল প্রকৃতি বালিকাব হর্ষোজ্জ্বল মুখখানি দিন দিন বিষাদ ছায়ায় মলিন হইতে লাগিল।

২

আভা ক্রমে বয়স্থা হইয়া উঠিল. রমানাথ বাবু কন্যার বিবাহ দিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার অবস্থা তেমন ভাল নহে, সে জন্য এ পর্যন্ত বহুতব সম্বন্ধ আসিলেও একটিও সুপাত্র পাওয়া গেল না। এ কারণেও আভাকে বিমাতার নিকট সর্বদা গঞ্জনাভোগ করিতে হইত। যেন তাহারই সব অপরাধ।

বিমাতার কঠোর আচরণে আভা ব্যথিত হৃদয়ে প্রত্যহই রাত্রে স্বর্গীয়া জননীর স্নেহময়ী মূর্তিখানি মনে করিয়া অশ্রুধারায় নিষিক্ত হইত। আজও রাত্রে আভা শয়ন করিয়া মায়ের কথা মনে করিয়া কাঁদিতেছিল।

আকুল হৃদয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনেক রাত্রে আভা ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম ঘোরে আভা স্বপ্ন দেখিল— যেন আকাশে একটি খুব বড় নক্ষত্র উঠিয়াছে. তত বড়, তেমন উজ্জ্বল নক্ষত্র আভা আর কোন দিন দেখে নাই। সে বিস্মিত হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল ; সহসা দেখিতে পাইল, সেই বৃহৎ উজ্জ্বল নক্ষত্রটির মধ্যে তাহার স্বর্গীয়া জননী জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে দণ্ডায়মানা হইয়া স্নেহাপ্লুত মধুব স্বরে কহিতেছেন, "আভা। মা আমার! আর কাঁদিস্ নে মা! আমি আশীর্বাদ করছি, তোর এ দুঃখ যন্ত্রণার শীঘই অবসান হবে।"

মাতাকে দেখিয়া আভা কাঁদিয়া উঠিল। ক্রন্দন বেগে তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। আভা উঠিয়া দেখিল, প্রভাত হইতে আর বিলম্ব নাই, তখন সে উদ্দেশ্যে মাতৃমূর্তিকে প্রণাম করিয়া, অন্যান্য দিন অপেক্ষা অনেক আশ্বস্ত হৃদয়ে গৃহকর্মে মনোনিবেশ করিল।

পরদিন বৈকালে রমানাথবাবু বহির্বাটিতে বসিয়া আছেন এমন সময় ভৃত্য ছুটিযা আসিয়া সংবাদ দিল জজবাবুর গাড়ী বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে ; জজ নরেন্দ্র বাবুর সহিত রমানাথ বাবুর মৌখিক আলাপ পরিচয় না থাকিলেও তিনি রমানাথ বাবুর নিতান্ত অপরিচিত ছিলেন না। নরেন্দ্রবাবুর আগমন সংবাদে তিনি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বাহিরে আসিলেন। দুটি সুন্দর শ্বেতবর্ণ অশ্বসংযোজিত সুদৃশ্য ব্রুহাম হইতে নরেন্দ্রবাবু ও আর দুইজন ভদ্রলোক অবতীর্ণ হইলেন। বিশেষ সমাদরে সম্বর্দ্ধনা করিয়া রমানাথ বাবু তাঁহাদিগকে বৈঠকখানায় বসাইলেন।

উভয়ের শিষ্টাচার ও দুই একটি কথাবার্তার পর নরেন্দ্রনাথ রমানাথ বাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রমানাথ বাবু! অদ্য কোন বিশেষ কারণে আমরা আপনাকে সংবাদ না দিয়া সহসা আপনার বাটীতে উপস্থিত হইয়াছি, আশা করি আপনি আমাদিগের সে ত্রুটি ক্ষমা করিবেন।"

রমানাথ ব্যতিব্যস্ত হইয়া সবিনয়ে কহিলেন, "সে কি কথা মহাশয়? এ গরীব ব্রাহ্মণের বাটীতে আপনাদের পদধূলি পড়িয়াছে, আজ আমার বড় সৌভাগ্য! ইহার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া আমাকে লজ্জিত করিতেছেন কেন? আপনাদের শুভাগমনের উদ্দেশ্য বলিয়া কৃতার্থ করুন।"

নরেন্দ্রবাবু কহিলেন, "শুনিয়াছি মহাশয়ের একটি অবিবাহিত কন্যা আছে, কন্যাটি পরমা

সুন্দরী ; আপনাবা আমাব স্বজাতি ও পালটা ঘব, আমাব পুত্রেব শুভবিবাহ এই মাসেই দিবাব ইচ্ছা আছে, কিন্তু এ-পর্যন্ত আমাদের মনোনিত পাত্রী একটিও পাইলাম না। যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আপনাব কন্যাটিকে একবাব দেখাইযা বাধিত কবিবেন কি ?"

রমানাথ সাহ্লাদে বলিযা উঠিলেন, "বলেন কি ? ইহা তো অতি সামান্য কথা। আমি এখনই আমাব কন্যাকে আপনাদেব সাক্ষাতে উপস্থিত কবিতেছি।"

আশাতিত আনন্দে উৎফুল্ল হইযা বমানাথ বাবু অন্তঃপুবে প্রবেশ কবিলেন।

বমানাথবাবু হর্ষোৎফুল্ল বদনে গৃহিণীকে কহিলেন, "আভা কোথায গেল ?" বমানাথ—"আভাকে যে নবেন্দ্রবাবু দেখতে এসেছেন।"

গৃহিনী ব্যগ্র হইযা কাহিলেন "নবেন্দ্রবাবু —কোন নবেন্দ্রবাবু ?" বমানাথ সহাস্যে বলিলেন "জজ।" গৃহিণীব মুখখানি সহসা যেন বর্ষাব মেঘেব মত অন্ধকাব হইযা গেল , তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হইযা ভগ্ন কণ্ঠে কহিলেন,"তুমি কি পাগল হলে নাকি ? নবেন্দ্রবাবু বডলোক তাঁব সঙ্গে কুটুম্বিতা কবা কি তোমাব সাধ্য ? তুমি ভেবেছ বুঝি তাবা শুধু তোমাব মেযেটি পেযেই খুশি হযে যাবে ? আব না হয বাডী ঘব সব ঘুচিযে মেযেব বিযে দিযে ফতুব হযে বসে থাক।"

তাই তো ! একথাটা যে বমানাথ এতক্ষণ একবাবও ভাবেন নাই। বমানাথবাবুব প্রসন্ন বদন গম্ভীবভাব ধাবণ কবিল , তিনি কিযৎক্ষণ ভাবিযা বলিলেন, "সেসব কথা তো এখনও কিছুই হয নাই। আব আভাকে একবাব দেখালে ক্ষতি কি ? তাঁবা যদি আভাকে পছন্দ কবেন, তাহলে আমাব অবস্থাটা স্পষ্ট জানালেই হবে। মেযেটাব অদৃষ্টে যদি সুখ থাকে, তাহলে তাবা ওমনিই বিযে দিতে বাজী হবেন। এখন তুমি আভাকে ভাল কবে সাজিযে দাও তো।"

গৃহিনী বাগে ফোঁস ফোঁস কবিতে কবিতে আভাকে সাজাইতে গেলেন, কিন্তু সাজান তো খুবই হইল ! চুলগুলি পর্যন্ত বাঁধা হইযা উঠিল না। সাজসজ্জাব মধ্যে শুধু একখানি পবিষ্কাব কাপড আভাব অঙ্গে উঠিল , কিন্তু তাহাতেই আভাকে কেমন সুন্দব দেখাইল ! লজ্জায জডসড হইযা অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে আভা পিতা কর্তৃক নবেন্দ্রবাবুব সম্মুখে আনীতা হইল। আভাকে দেখিযা নবেন্দ্রবাবু ও সঙ্গীদ্বয মুগ্ধ হইলেন।

নবেন্দ্রবাবু ব্রীডাবনতমুখী আভাকে সম্বোধন কবিযা কহিলেন, "তোমাব নাম কি মা ?" আভা অবনত বদনে মৃদুস্ববে উত্তব কবিল, "আভাময়ী" "বাঃ বেশ নামটি তো !" বলিযা নবেন্দ্রবাবু প্রফুল্ল মুখে সঙ্গীদ্বযকে কহিলেন, "তবে ধীবেনেব বিবাহ এখানেই স্থিব কবা হউক আপনাদেব কি মত ?"

তাঁহাবা বলিলেন, "নিশ্চযই স্থিব কবা উচিত ! এমন সুন্দবী ও সুলক্ষণা পাত্রী আব পাইবেন কি ?"

বমানাথ বাবু একটু অন্যমনস্কভাবে কি চিন্তা কবিতেছিলেন।

তাঁহাকে চিন্তা কবিতে দেখিযা নবেন্দ্রবাবু সাগ্রহে কহিলেন, "আপনাব এ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে কি ? যাহা বলিবাব থাকে স্বচ্ছন্দে বলিতে পাবেন।"

বমানাথ বাবু কিছু অপ্রতিভভাবে বলিলেন, "আমি কন্যাব বিবাহ দিবাব জন্য বহুদিন হইতে ব্যগ্র হইযাছি, আব আমাব সৌভাগ্যক্রমে এমন সুপাত্র ও সুঘব পাইযাও ইতস্তত কবিতেছি, তাহাব কাবণ শুধু আপনাব মত সম্ভ্রান্ত লোকেব সহিত আমাব মত দবিদ্র লোকেব কুটুম্বিতা কবিতে সাহসী হওযা স্বীয ক্ষমতাতীত বলিযা।" নবেন্দ্রবাবু ঈষদ হাস্যে কহিলেন,

"রমানাথবাবু ! ক্ষমা করিবেন, আপনার কথায় আমি স্পষ্ট বলিতে বাধ্য হইতেছি, দেখুন, আমি অর্থের প্রত্যাশী হইয়া আপনার নিকট আসি নাই ; আপনি শুধু আপনার কন্যাটিকে দান করিবেন, ইহা বোধহয় আপনার ক্ষমতাতীত নহে।"

আশাতিরিক্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া রমানাথবাবু গাঢ় স্বরে, "নরেন্দ্রবাবু ! আজ আপনি আমাকে যেমন সুখী করিলেন ভগবান আপনাকে ইহা অপেক্ষা শতগুণে সুখী করিবেন।"

অতঃপর বিবাহ সংক্রান্ত অন্যান্য কথোপকথনের পর নরেন্দ্রবাবু সঙ্গীদ্বয় সহ বিদায় লইলেন। রমানাথ বাবু গৃহিণীকে এ সুসংবাদ প্রদান করিতে অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন।

৪

নির্দিষ্ট দিবসে নরেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র ধীরেন্দ্রকুমারের সহিত আভাময়ীর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের পর শ্বশুরালয় গমন কালে আভা সজল নয়নে বিমাতার চরণে প্রণাম করিল, ছোট ভাইটিকে লইয়া স্নেহভরে মুখ চুম্বন করিল। আভার শ্বশুর প্রদত্ত বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গৃহিণী আশীর্বাদের পরিবর্তে মনে মনে বলিলেন, "মেয়েটার কি কপালজোর ! বিনা চেষ্টায়, বিনা অর্থব্যয়ে এমন ঘরে বিয়ে হয়ে গেল ! এ দুঃখ যে আমার মলেও যাবে না।"

আভা পিতার চরণে বিদায় লইতে গেল, রমানাথবাবু তখন স্বীয় নির্জন কক্ষে পালঙ্কোপরি অর্দ্ধশায়িতভাবে করদ্বয়ে বদনাবৃত করিয়া কি ভাবিতেছিলেন ; তাঁহার মৃত্যুশয্যায় শায়িতা স্বর্গীয়া পত্নীর সেই শেষ অনুরোধ—"আমার আভাকে দেখ, দুঃখিনী মা হারিয়ে যেন তোমার আদর যত্নে না বঞ্চিত হয়।" বহুদিন পরে আজ সেই করুণ অশ্রুমাখা কথাগুলি নতুন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছিল। পত্নীর অন্তিমের সে কাতর প্রার্থনা তিনি রাখিয়াছেন কি ? স্মৃতির তাড়নায় অধীর হইয়া রমানাথ অনুতপ্ত কাতর হৃদয়ে নিভৃতে অশ্রুবিসর্জন করিতেছিলেন, এমন সময় আভা ধীরে ধীরে ডাকিল, "বাবা !" কন্যার আহ্বানে রমানাথ বাবু উঠিয়া বসিলেন, অতিরিক্ত অশ্রুপাতে তাঁহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে, বিমর্ষ মুখমণ্ডলে মর্মান্তিক যন্ত্রণারাশি পরিস্ফুট হইতেছে, দেখিয়া আভা বড় ব্যথিত হইল, সে কাতর হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে পিতার চরণে প্রণতা হইল। রমানাথবাবু এবার কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বাষ্পারুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "আভা ! মা আমার ! আজ হতে তুই পর হয়ে গেলি ! মা ! তোর এ নিষ্ঠুর পিতার নিকট তুই একদিনের জন্য একটু আদর একটু যত্ন পাস নি ; আশীর্বাদ করি, স্বামীগৃহে রাজরাণীর মত চিরদিন সুখে কালযাপন কর।" রমানাথবাবু প্রবল হৃদয়াবেগ দমনে অসমর্থ হইয়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না। আর আভা ?—বহুদিন পরে পিতার সেই মধুর স্নেহ সম্ভাষণে দুঃখিনী আভার নয়নযুগলে অশ্রুপ্রবাহ বহিল। চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে আভা পিতার চরণে বিদায় লইল।

আভা শ্বশুরালয়ে আসিল। পুত্রবধূর চাঁদমুখ দেখিয়া আভার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর আহ্লাদ সাগর উথলিয়া উঠিল। তিনি যখন স্নেহভরে আভার মুখচুম্বন করিয়া প্রীতিপূর্ণ মমতা বিজড়িতকণ্ঠে আহ্লাদে কহিলেন, "এ যে আমার সোনার প্রতিমা বৌমা হয়েছে ! মা লক্ষ্মী আমার ! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি জন্ম এয়োস্ত্রী হয়ে সুখে ঘরকন্যা কর, দেখে আমরা জীবন সার্থক করি ;" তখন পরলোকগতা জননীর স্নেহ আদর স্মরণ হওয়ায় আভার চক্ষে জল আসিল। শ্বশুর করুণাময়ী মূর্তিখানিতে আভা স্বীয় মাতৃমূর্তির ছায়া দেখিতে পাইল।

৫

বিবাহের পর কয়েক বৎসর অতীত হইয়াছে। একটি সুন্দর সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে আভাময়ী একাকিনী বসিয়া কি লিখিতেছিল। আভার সেই অযত্নবর্দ্ধিত সৌন্দর্যরাশি এক্ষণে মাতৃসমা স্নেহময়ী শ্বশ্রূর স্নেহে যত্নে, স্বামীর অতুল আদরে সোহাগে দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া অভিনব শোভা ধারণ করিয়াছে ; সে নিরুপম রূপরাশিতে সেই নির্জীব কক্ষটি পর্যন্ত যেন হাসিতেছিল। আভার নব লাবণ্যোদ্ভাসিত সুষমাময় মুখখানিতে মধুর প্রীতি ক্রীড়া করিতেছিল। সে একমনে বসিয়া লিখিতেছিল, এমন সময় তাহার স্বামী ধীরেন্দ্রকুমার সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন ; আভাকে নিবিষ্টচিত্তে লিখিতে দেখিয়া তিনি নিঃশব্দে তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাহার লিখিত কবিতাটি পাঠ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে আভা সহসা পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বামীকে দেখিতে পাইল : তাঁহাকে দেখিবামাত্র সে কাগজখানি ক্ষিপ্রহস্তে লুকাইয়া ফেলিল।

ধীরেন্দ্রকুমার হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আর এখন লুকালে কি হবে আভা ? আমি অনেকক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে আছি, আর তোমাব কবিতাটিও পর্ড়েছি। তুমি এমন লিখ্‌তে শিখ্‌লে কোথায় আভা ?"

আভা সলজ্জভাবে নতমুখে কহিল, তুমি এতক্ষণ চোরের মতন লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিলে কেন ?"

ধীরেন্দ্রকুমার সহাস্যে কহিলেন, "লুকিয়ে না দেখলে কি তোমায় এতক্ষণ দেখতে পেতাম ? আমাকে দিনের বেলা দেখলেই যে তুমি মার কাছে পালাও। আজকের এই কবিতাটি কার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে আভা ? কে এমন সৌভাগ্যবান ? আভা অবনত মুখে মৃদু হাসিয়া উত্তর কবিল, "যে সকলের চেযে দুষ্টু !" ধীবেন্দ্রকুমার পত্নীব মধুর প্রীতিপূর্ণ সুন্দর মুখখানি অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে দেখিতে প্রেমাদর পরিপ্লুত কণ্ঠে কহিলেন, "আভা ! তোমাকে যখন পেয়েছি, তখন আমি সত্যিই বড় সৌভাগ্যবান।'

আভা লাজভরে স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইল। প্রেমভরে পত্নীর মুখচুম্বন করিয়া ধীরেন্দ্রকুমার কহিলেন, "দেখ আভা ! তোমার জন্য আজ কেমন জিনিস এনেছি।" ধীরেন্দ্র একশিশি কুন্তলীন ও একশিশি দেল্‌খোস বাহিব করিয়া একটুখানি দেলখোস আভার অঞ্চলে ছিটাইয়া দিলেন, দেলখোসের সুমধুর সৌরভে মুগ্ধ হইয়া আভা বলিল,"কি সুন্দর গন্ধ !"

"তুমি যে আজ ঘরেই ফুল বাগান ত'যের করলে দেখছি।" এই কথা বলিয়া প্রেমে ও পুলকে আভা স্বামীর ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল। সুশীতল বায়ুহিল্লোল দেলখোসের মনোহর স্নিগ্ধ সৌরভ গৃহ আমোদিত করিয়া সুখনিমগ্ন দম্পতিযুগলেব প্রীতি বর্দ্ধন করিতে লাগিল।

পূর্ণশশী দেবী

আমার ডাক্তারি

(১)

ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যেদিন বাড়ী ফিরিলাম সেদিন কি সুখের দিন ! জীবনে তেমন সুখ আর কখনও ঘটে নাই, তাই সেদিনকার কথা এমন উজ্জ্বলরূপে মনে আছে। সংসার সেদিন স্বর্ণমণ্ডিত এবং জীবন উৎসাহে ও কল্পনায় অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল।

আমার গ্রামখানির নাম চণ্ডীপুর ; বাবা গ্রামস্থ জমিদারের বাটীতে নায়েবী করিতেন ; ২০টি মাত্র টাকা তাঁহার বেতন ছিল। পল্লীগ্রামের লোকের অল্প খরচে চলে আমাদেরও সংসারে কোন কষ্ট ছিল না। আমার মাতুল কলিকাতায় 'টমসন্' কোং-র অফিসে উচ্চ বেতনে কার্য করিতেন, তাঁহারই চেষ্টায় ও যত্নে আমি কলিকাতায় থাকিয়া ডাক্তারি শিক্ষা করিতাম। আমার অধিকাংশ ব্যয়ভারই মাতুল বহন করিতেন। এবং পাশের বাজারে ডাক্তারি পরীক্ষোত্তীর্ণদিগের উপযুক্ত যৌতুকসহ তিনিই কোন সাবডেপুটীর সুন্দরী কন্যার সহিত আমার পরিণয় কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

একটা শুভদিন দেখিয়া পিতামাতার স্নেহময় হৃদয়ের অজস্র আশীর্বাদ লইয়া কলিকাতায় ডাক্তারি করিতে গেলাম। পটলডাঙ্গার একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল বাটী ভাড়া লইয়া নীচে ডিস্পেন্সারি খুলিয়া ডাক্তারিতে ভর্তি হইলাম। দ্বারদেশে তাম্রফলকে—'ডাক্তার শ্রীবিপিনবিহারী সোম' খোদিত হইয়া শোভা পাইল। অনুষ্ঠানেব কোন ত্রুটিই রহিল না, কিন্তু ফলেও কোন কার্য হইল না ; রোগী জুটিল না। ক্রমে বৎসরের পর বৎসরও চলিয়া গেল, তথাপি আমার উপার্জনের কোনই সুবিধা হইল না।

যখন আমার আত্মগৌরব সম্পূর্ণরূপে ধূলিসাৎ ও জীবন ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র মনে হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে এমন একটা ঘটনা ঘটিল যাহাতে আমার বিমুখ ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন মুখে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। অদৃষ্টাকাশে যেখানে একখণ্ড কালো মেঘ জমাট বাঁধিয়া ছিল অনুকূল বাতাসে সরিয়া গিয়া সেখানে পূর্ণচন্দ্রেব রশ্মিরাশি প্রকাশিত হইল। সমস্ত দিনে দীর্ঘ বিশ্রামের পর সবে মাত্র বাহিরে যাইবার অভিপ্রায়ে বেশবিন্যাস করিতেছি, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "বাহিরে একটি বাবু দেখা কর্তে চান।" জিজ্ঞাসায় জানিলাম বাবুটি অপরিচিত ও নবাগত। বামাচরণ আরও বলিল, "বাবুটি খুব বড়মানুষ, আর মস্ত বড় গাড়ী কোরে এসেছেন।" একটু তাড়াতাড়ি বেশবিন্যাস সারিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম।

ভদ্রলোকটি আমার consultation রুমে বসিয়াছিলেন, আমার পদশব্দে ফিরিয়া অভিবাদন করিলেন। লোকটির বয়স ২২-২৪-এর অধিক নয়। দীর্ঘায়ত, গৌরদেহ, মস্তকের কেশরাশি অবিন্যস্ত, পরিধানে সূক্ষ্ম দেশী ধুতি, অঙ্গে কালো কোট, অঙ্গুলিতে বহুমূল্য সমুজ্জ্বল হীরকাঙ্গুরি, চক্ষে স্বর্ণমণ্ডিত চশমা। আমি একখানা চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিয়া বলিলাম, "মহাশয়ের প্রয়োজন !" আগন্তুক সে কথার উত্তর না দিয়া তাঁহার চশমা মণ্ডিত চক্ষুর দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিলেন, "আপনি ডাক্তার ? আমি পাগল হইব কি না বলিতে পারেন কি ?" হরি হরি ! আমার সকল আশা ফুরাইল ! বুঝিলাম লোকটা আস্ত পাগল। আমি কিছু বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয়ের রোগটা কি ?' তিনি আমার মনোভাব বুঝিতে পারিলেন, একটু ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন, 'রোগ আমাব শিরঃপীড়া, এমন যন্ত্রণা যে সময় সময় মনে হয় আমি পাগল হইয়া

যাইব।' আগন্তুকের নাড়ী দেখিয়া ও যন্ত্র সাহায্যে তাঁহার শরীর পরীক্ষা করিয়া দুর্বলতা ভিন্ন কোন অসুখই বুঝিতে পারিলাম না। পূর্বে তিনি অনেক বড় বড় ডাক্তার দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস বড় ডাক্তারেরা তেমন মনোযোগী হইয়া চিকিৎসা করে না। তাই কোন বন্ধুর মুখে আমার কথা শুনিয়া আমার কাছেই আসিয়াছেন।

ভদ্রলোকটির নাম 'শরৎচন্দ্র মিত্র', পিতা মোহিনীমোহন মিত্র ঢাকার সাবজজ। শরৎ পিতার এক সন্তান। শরৎ এম, এ ক্লাসের ছাত্র; বড়লোকের ছেলে, বিশেষত অভিভাবকহীন অবস্থায় কলিকাতা বাসে যেরূপ প্রকৃতি লাভ হয়, শরৎ সে শ্রেণীর লোক নয়। পৃথিবীর মধ্যে তাহার প্রিয় ও একমাত্র আবশ্যকীয় দ্রব্য ছিল পুস্তক। পাঠে তাহার কখনও অতৃপ্তি ছিল না। শরতের বাল্যজীবন কিছু অতিরিক্ত সাবধানতার সহিত রক্ষিত হইয়াছিল। সেই জন্যই এই অতিরিক্ত মানসিক শ্রম সহ্য হইল না। দুরন্ত শিরঃপীড়া অল্পে অল্পে তাহাকে অধিকার করিল। প্রথমে সে তাহা গ্রাহ্য করে নাই; অধিকন্তু ক্লেশ নিবারণের জন্য দ্বিগুণ মনোযোগের সহিত পুস্তক পাঠ আরম্ভ করিয়াছিল। অবশেষে যন্ত্রণা যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন সে বিশেষ আগ্রহে চিকিৎসা আরম্ভ করিল। কিন্তু পাছে একেবারেই পড়া বন্ধ হয় সেই ভয়ে কোন ডাক্তারের নিকটেই আপনার অধ্যয়নের কথা প্রকাশ করিয়া বলিল না। এরূপ চিকিৎসার ফল যাহা হয় তাহাই হইল; কোন উপকারই হইল না, অধিকন্তু নানা রূপ ঔষধ ব্যবহারে মস্তিষ্ক অধিক গরম হইয়া উঠিল। অনেক চিকিৎসাতেও কোন উপকার না পাইয়া স্বাভাবিক ভীরু স্বভাব শরৎচন্দ্র যখন আরোগ্যের আশায় সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ।

(২)

সমস্ত দিন ধূলা খাইয়া শ্রান্তদেহে ক্লান্তপদে শূন্য হস্তে যখন ঘরে ফিরিলাম, তখন পত্নী সুরবালা শয়ন-কক্ষের মেজেয় মাদুর বিছাইয়া পরম নিশ্চিন্তমনে নিপুণ হস্তে বেণী রচনায় নিযুক্তা ছিলেন। সেদিন শরীর ও মনের অবস্থা বড় স্বাভাবিক ছিল না, তাই বিনা বাক্যব্যয়ে খাটের উপর শুইয়া পড়িলাম। আমাকে অসময়ে একরূপ ভাবে শয়ন করিতে দেখিয়া সুরবালা কিছু চিন্তিতভাবে শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিল, 'অমন কোরে শুলে যে! অসুখ কচ্চে নাকি?' আমি বলিলাম, 'না অসুখ কিছু করেনি।' পত্নীর সেকথা বিশ্বাস হইল না, সে উঠিয়া আসিয়া মাথায় হাত দিয়া দেখিয়া বলিল, 'অসুখ যদি নয় তবে কি?' আমি তাহার উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, 'যার জীবনটাই মহা-অসুখ, তার আবার সুখ কোথায় সুর?' যে আপনার স্ত্রী-পুত্রকে খাওয়াতে পারে না,—"আচ্ছা গো আচ্ছা! আর বক্তৃতার দরকার নেই, ওসব বক্তৃতা পুরানো হয়ে গেছে।" বলিয়াই পরম নিশ্চিন্তভাবে আবার পূর্বস্থানে গিয়া ললাট হইতে কেশ-বন্ধন-রজ্জু মুক্ত করিয়া সে অসমাপ্ত কেশ রচনায় মনোনিবেশ করিল। আমার বাক্যের ভাবার্থ তাহার অজ্ঞাত ছিল না। আমি একটু গম্ভীর হইয়া বলিলাম, 'সত্যি বলচি সুর, তোমার জন্য ভাবনায় আমি অস্থির হয়েচি, আজ পুর দু'বৎসর ডাক্তারি কচ্চি এখনও যখন কিছু কর্ত্তে পাল্লুম না, তখন আর কেন, এর চেয়ে যদি চাষবাস কর্তুম সেও ভাল ছিল,' পত্নী মুখ না তুলিয়াই মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'তোমার দেখ্‌চি ভেবে ভেবে মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্চে, কাল থেকে স্নানের সময় কুন্তলীনটা মেখো দেখি! মাথা বেশ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' আমি বলিলাম, 'তা'হলে আর ভাবনা ছিল না, সকলেই কুন্তলীন মাখত, ডাক্তার খরচটা বেঁচে যেত।' সুর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কেন বিশ্বাস হল

'না বুঝি, তুমি ত তুমি ! তোমার সেই মাথা পাগ্‌লা রুগীটাও কুন্তলীন মাখতে আরম্ভ কর্লে এতদিনে সেরে উঠ্‌তো।"

—সুরবালার কথাটা আমার মনে লাগিল।

পরদিন রোগী দেখিতে গিয়া শুনিলাম, পূর্ব রাত্রে তাঁহার শিরঃপীড়া কিছু বাড়িয়াছিল, তখনও পর্যন্ত তিনি বাইরে বাহির হন নাই। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, চারিদিকে দরজা জানালা বন্ধ এবং মোটা ছিটের পর্দা দিয়া বায়ু ও আলোক প্রবেশের পথও রুদ্ধ করা হইয়াছে। আমার পদশব্দে তিনি অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "কে ডাক্তার বাবু !" আমি একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলাম, বিরক্তভাবে বলিলাম, "শরৎবাবু করেছেন কি ? আপনি এই রকমে বহুমূল্য জীবনটা নষ্ট কর্ত্তে চান নাকি ?" তিনি কোন উত্তর করিলেন না, খুব সম্ভব আমার কথার সম্পূর্ণ অর্থও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। তাঁহার অনুমতির অপেক্ষা মাত্র না করিয়াই সমস্ত জানালা দরজা খুলিয়া দিলাম। সকালবেলার স্নিগ্ধ রৌদ্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ঘরের ঠিক নীচেতেই মস্ত ফুলের বাগান, গাছগুলি সুন্দররূপে কেয়ারি করা, লাল ইঁটের খোয়া ফেলা সরু রাস্তার দুই ধারে অনতিউচ্চ ঝাউ ও বিলাতি ক্রোটন গাছেব সারি। দুইজন কণ্ঠিধারি উড়েমালী গাছের গোড়ায় জল দিতেছিল, আর একজন ক্ষিপ্রহস্তে বাবুর জন্য ফুলের তোড়া প্রস্তুত করিতেছিল। বাতাসে রজনীগন্ধা ও জুঁইয়ের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। আমি ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম, 'দেখুন দেখি, ইচ্ছে কোরে কি কষ্টটা ভোগ কচ্ছিলেন ?' তিনি কিছুই বলিলেন না ; শুধু কৌতুকপূর্ণ নেত্রে আমায় দেখিতেছিলেন। আমি বলিলাম, "দেখুন শরৎবাবু, চিকিৎসিত হইতে হইলে, চিকিৎসকের মতে চলাই সম্পূর্ণরূপে কর্তব্য। আপনাকে আমার বিশেষ অনুরোধ, এমন কোরে বদ্ধ ঘরে কখনই থাক্‌বেন না। বাহিরের মুক্ত বাতাস শিরঃপীডাক্রান্ত রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ধন্যবাদ, আপনার উপদেশেই চলিব।"

মস্তকে ব্যবহাবের জন্য সে দিন একটা ডাক্তারি লেবেল আঁটা নূতন তৈল আনিয়াছিলাম। তাহা ব্যবহারেব যথাযুক্ত উপদেশ দিয়া এবং রুদ্ধ ঘরে থাকিতে বার বার নিষেধ করিয়া সেদির্নকার মত বিদায় গ্রহণ করিলাম।

(৩)

সপ্তাহকাল রোগীর আর কোন সংবাদই পাইলাম না। ভাবিলাম, হয়ত তিনি চিকিৎসা ও চিকিৎসক পরিবর্তন করিয়াছেন। এই সময়ে আমারও চারিদিকে ডাক আসিতে ছিল। শরৎ মিত্রের প্রকাণ্ড জুড়ী যে প্রায়ই আমার দ্বারদেশে দাঁড়াইত, তাহাতেই আমার সৌভাগ্য সূচিত হইল। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় শরৎ বাবু আপনি আসিয়া উপস্থিত ; জিজ্ঞাসা না করিতেই বলিলেন, "ডাক্তার বাবু আপনার এবারকার ঔষধে ও ব্যবস্থায় আমি কিন্তু বিশেষ উপকার বুঝিতে পারিতেছি। এখন একটু আশা হয়, বুঝি আমার এ রোগও আরাম হবে।"

আমি বলিলাম, "আরাম নিশ্চয়ই হবে। তবে কিছুদিন পর্যন্ত মানাসিক পরিশ্রম কিছু কম রাখতে হবে।"

অনেকক্ষণ কথাবার্তায় কাটিয়া গেল। যাইবার সময় তিনি বলিলেন, "মস্তকে ব্যবহারের তেলটা ফুরাইয়া গিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "সেটা আমার নিজের কাছে নেই, বাজার থেকে আনিয়ে পাঠিয়ে দেব।"

শরৎ বাবু গাড়ীতে উঠিতেছিলেন, ফিরিয়া বলিলেন, "ওটা আমার জন্যই তৈরি না বলেছিলেন ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "পরীক্ষক আমি, সেই হিসাবে কথাটা বলেছিলাম।" তিনি হাসিতে হাসিতে গাড়ীতে উঠিলেন।

★ ★ ★ ★

খানিক পূর্বে খুব একপশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার রাস্তায় স্থানে স্থানে জল জমিয়া গিয়াছে। স্কুল ও কলেজের ছেলেরা ছাতা ও জুতা হাতে, বই বগলে হাটুর উপর কাপড় তুলিয়া অতি কষ্টে দলে দলে বাড়ী ফিরিতেছিল। দুই একটা ছোট ছেলে কদাচিৎ জলে পড়িয়া জল ও কর্দমসিক্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছিল। সেদিন কোন কার্যানুরোধে একবার হ্যারিসন্ রোডে যাইতে হইয়াছিল। ফিরিবার সময় পথে হঠাৎ শরৎ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি এতদিন কলিকাতায় ছিলেন না ; সম্প্রতি আসিয়াছেন। শরৎ বাবু বলিলেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন ; পথে দেখা হওয়ায় বড়ই সুখী হইলেন। অনেক কথাব পর শবৎ বাবু তাঁহার আরোগ্যের জন্য বার বার বিনীতভাবে আমার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম, 'মাপ করবেন শরৎবাবু, আমি অত প্রশংসার যোগ্য নই, আমি উপলক্ষ মাত্র ; যদি প্রশংসা করিতে হয়, তাহা হইলে তৈলের আবিষ্কারকের করুন।'

তিনি স্মিত হাস্যে চশমামণ্ডিত চক্ষু তুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আবিষ্কারকটা কে ?'

আমি বলিলাম, "আপনাব উপকার হইবে বলিয়া আমি কুন্তলীন ব্যবহার করিতে দিয়াছিলাম।"

শরৎ বাবু চক্ষু হইতে চশমা খুলিয়া বিস্ফারিত নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আপনি কি তবে বলতে চান সে ঔষধটা কুন্তলীন ?'

'নিশ্চয়ই'। 'তবে ডাক্তারি ঔষধরূপে পরিচয় দিলেন কেন ?'

'আপনার বিশ্বাসের জন্য ; ডাক্তারি না বলিলে আপনার শ্রদ্ধা হইত না—হয় ত ব্যবহারই করিতেন না'—তিনি বিস্ময়সূচকভাবে চশমা জোড়াটা যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন।

সেদিন বাড়ী ফিরিবার সময় সুরবালার জন্য একশিশি 'কুন্তলীন' ও একশিশি 'দেল্‌খোস' কিনিয়া লইলাম। কারণ আমার বিশ্বাস আমার চিকিৎসক জীবনের উন্নতির কারণ সেই-ই।

প্রতিভা দেবী

মণির সন্ন্যাস

(১)

মৃদুমন্দ মধুময় প্রভাত সমীরণভরে হেলিয়া দুলিয়া একখানি সুসজ্জিত বোট ভাগীরথী বক্ষ তরঙ্গিত করিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া চলিতেছিল, গঙ্গার সেই ঈষৎ লোহিতাভ বারিরাশি

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্মিমালারূপে বোটের গাত্রে লাগিবামাত্র চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছিল ; ইহাতে তটশালিনী গঙ্গার স্বাভাবিক শোভা সমধিক শোভাময়ী হইতেছিল। দূরে বেলাভূমে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষরাজি উন্নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উপরে মহাশূন্য, তদুপরি অনন্ত আকাশ, স্থানে স্থানে সুনীল বর্ণাঙ্কিত, কোথাও বা ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘরাজি—যেন উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ! পূর্বাকাশ উজ্জ্বল করিয়া সমুজ্জ্বল তরুণ অরুণের স্নিগ্ধ হাস্যময় হেম জ্যোতিঃ নিম্নে জনকোলাহলপূর্ণ অবনীতে বিকীর্ণ হইয়াছিল।

এই সময়ে একখানি সুদৃশ্য বোট আরোহীসহ গঙ্গাবক্ষে ভাসিতেছিল, সুসজ্জিত দুইটি কক্ষ, একটি কক্ষে বাতায়ন পার্শ্বে উপবিষ্টা একটি সুন্দরী রমণী অবনত মুখে গঙ্গার অনন্ত বারিরাশির দিকে চাহিয়াছিলেন। অন্য কক্ষে একখানি পালঙ্কে সুকোমল শয্যায় একটি পীড়িত দুর্বল যুবক শয়ান, পার্শ্বে চৌকীতে তাঁহার সমবয়স্ক একটি যুবা উপবিষ্ট। উভয়েই অনেকক্ষণ নীরব। অবশেষে উপবিষ্ট যুবক পীড়িতের প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "আজ কি পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুস্থবোধ করিতেছেন ?"

সুদীর্ঘ একটি নিশ্বাস ত্যাগ কবিয়া পীড়িত যুবক বলিলেন, "মনে হয়, আজ একটু ভালই আছি ; বেলা কি অধিক হইয়াছে ?"

যুবক। না—এই প্রভাত হইতেছে, গতবাত্রি ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারেন নাই বুঝি ?

পীড়িত যুবক ধীরে ধীরে বলিলেন, "কি জানি কেন ঘুমাইতে পারি নাই।"

যুবা হাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনার মনে কোন বেদনা আছে। আপনি যে সে দিন বলিয়াছিলেন একদিন আপনার পূর্ববৃত্তান্ত আমাকে বলিবেন—আজ তাহা বলিবেন ?"

পীড়িত যুবক বন্ধুর কথা শুনিয়া যেন কিছুকাল অন্যমনস্ক থাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তবে শুনুন, কিছু বিশেষ নহে, কেবল দুঃখপূর্ণ কাহিনী।"

পীড়িত যুবক বলিতে লাগিলেন, "আমার নাম মণিমোহন, অতি শৈশবেই মাতৃহীন হই, পিতা স্নেহে মায়ের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আমি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাড়ী ফিরিযা আসি, এই সময়ে পিতার পুরাতন বন্ধু সুরেনবাবু সস্ত্রীক একটি পুত্র ও একটি অনুপম রূপলাবণ্যবতী প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা লইয়া আমাদের বাড়ীর সন্নিকটে বাস করিতেন—"

যুবক বলিলেন, "তাহার পর ?"

মণি। আমাকে দেখিযা সুরেনবাবু বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং স্ত্রী-কন্যার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। তাহার পর একদিন পিতার মুখে শুনিলাম তাঁহাদের উভয়ের এই দীর্ঘকালব্যাপী বন্ধুত্বকে গাঢ় করিবার জন্য, সুরেন বাবুর কন্যা নিরুপমাকে তিনি পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে চান। প্রায় মাস দুই তিন পরে আমাদের বিবাহের কথা ঠিক হইয়া গেল।

*　　　　*　　　　*　　　　*

তখনও বিবাহ হয় নাই, আমার জন্মদিন উপলক্ষে আমার বন্ধুবান্ধব আমাকে একদিন নিমন্ত্রণ কবিলেন, সাদরে তাঁহারা আমাকে অনেক কিছু উপহার দিয়া গিয়াছিলেন, এই সকলেব মধ্যে দুইটি জিনিস পাইয়া আমি বড় আনন্দিত হইয়াছিলাম। একশিশি সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত "দেলখোস", একটি বোতল তবল স্বচ্ছ পদ্মগন্ধ "কুন্তলীন"। শিশি ও বোতলদুটি আমি নিরুকে উপহার দিব বলিয়া সযত্নে সঙ্গে লইলাম, ঘরে আসিয়া তাহাদের গায়ে সাদা কাগজের উপর লাল কালিতে লিখিলাম—

To Miss Nirupama, with love. পরদিন সান্ধ্যভ্রমণের পর যথাসময়ে

উপহারসামগ্রী হাতে লইয়া সুরেনবাবুর বাটী গমন করিলাম, একজন পরিচারিকা বলিল, "তিনি নূতন বাগানে আছেন ;" আমি সেইদিকে ছুটিলাম—কিন্তু সেখানে আমার মনোরথ পূর্ণ হইল না ; ঘুরিতে ঘুরিতে সুশীতল পবন হিল্লোলিত, সোপনশ্রেণী বিশোভিত একটি সরসীর তীরে আসিলাম ; অশোক বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া আমি কি দেখিলাম !! আমি দেখিলাম সোপান শ্রেণীর সর্বনিম্নপ্রান্ত যথায় তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে সেইখানে একটি স্ত্রী ও একটি পুরুষ মূর্তি ! স্ত্রী মূর্তিকে আমি চিনিলাম, সে রূপবতী নিরুপমা, কিন্তু পুরুষ মূর্তিকে আমি চিনিলাম না। তাহারা কি আলাপ করিতেছিল, আমার কানে গেল , নিরুপমা বলিতেছে, "এ বিবাহ কখনই হইবে না, আমি তাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি ; জানি সে আমাকে খুবই ভালবাসে, কিন্তু আমি তাহাকে ঘৃণা না করিয়া থাকিতে পারি না। তুমি—" বোধ হয় নিরুপমা আরও কিছু বলিত, কিন্তু বাধা দিয়া অপরিচিত যুবা বলিল, "তবে কি হইবে নিরু ! ইহার উপায় কি ?"

নিরুপমা বলিল, "তাহা আমি জানি না তুমি একথা বাবাকে জানাইও, নচেৎ—কিন্তু আমি এ বিবাহে কখনই মত দিব না।"

যাহা শুনিয়াছি তাহাই যথেষ্ট, ক্রোধে ও অপমানে আমি আত্মহারা হইলাম, তখনই "কুন্তলীন" ও "দেলখোসে"র শিশি নিরুপমাকে লক্ষ্য করিয়া সবেগে নিক্ষেপ করিলাম ; সঙ্গে সঙ্গে বিকৃতস্বরে বলিলাম, "নিরুপমা ! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তুমি সুখী হও।"—আর সেখানে দাঁড়াইলাম না।

বাড়ী ফিরিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া দেশত্যাগের সঙ্কল্পে সেই দিনই সুপ্তিমগ্ন গভীর রাত্রে একাকী পথে বাহির হইয়া পড়িলাম ; এক বৎসর পথে পথে ঘুরিয়া একদিন জলপথে নৌকারোহণে বাহির হইয়াছিলাম, কিন্তু সেই কালবৈশাখীর ভীষণ তুফানে দ্বিপ্রহর নিশীথে নৌকা গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হয়,—তাহার পরের ঘটনা আর কিছুই মনে পড়ে না।"

(২)

বহুক্ষণ উভয়েই নীরবে রহিলেন। পরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া শ্রোতা বলিলেন, "ভাই মণি ! তোমাকে আমি জলমগ্ন অবস্থায় মৃতপ্রায় দেখিয়া বোটে তুলিয়াছি ও আমরা সস্ত্রীক শুশ্রূষার দ্বারা তোমার চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছি , কিন্তু তুমি কি আমার একটা কথা বিশ্বাস করিবে ?"

মণিমোহন সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ সন্দেহ কেন বন্ধু ?

সতীশ বাবু বলিলেন, "তবে বিশ্বাস কর ভাই। সেই সন্ধ্যাকালে পুষ্করিণী তটে যাহাকে নিরুপমার সহিত কথা বলিতে দেখিয়াছ, সে ব্যক্তি অন্য কেহ নহে, সে আমি ! হায় আমারই স্বকৃত অপরাধে নিরুপমা প্রিয় ভগ্নী আমার এরূপ নিগৃহীতা !"

কথা শুনিয়া বিস্ময়ে ধৈর্য ধারণ করিতে না পারিয়া মণিমোহন ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না, নিরুপমা কি সত্যই নির্দোষী ? সকল কথা খুলিয়া বলুন।"

"মণি ! সেই দিন সন্ধ্যার সময়ে আমার একজন সহপাঠী বন্ধু নিরুপমার মনোগত অভিপ্রায় কি, তাহা জানিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল ; বলা বাহুল্য নিরু ইহাকে চিনিত এবং পূর্বে খুড়া মহাশয় (সুরেন বাবু) তাহাকে জামাতৃ-পদে বরণ করিবার অভিলাষও জানাইয়াছিলেন, আমার কথা শুনিয়া ক্রোধ ও ঘৃণার সহিত তাহারই বিপক্ষে বেচারা

নিরুপমা ঐ সকল কথা বলিয়াছিল ; ভাই ! তোমাকে সে উপেক্ষা করে নাই, তাহার পুষ্পদামতুল্য শোভাময় শরীর যেরূপ পবিত্র, তাহার অন্তঃকরণও সেইরূপ নির্মল, সরল, পবিত্র।

মণি। আমার পিতা ও সুরেনবাবুরা সপরিবারে কেমন আছেন, নিরুপমা কেমন আছে ?

সতীশ। সংসারের সকলই মঙ্গল, কিন্তু, বেচারা নিরুপমার বড় অসুখ তাহার বর্ণ কালিমাবৃত, তাহার দেহের শোভা কর্দমাক্ত নলিনীতুল্য ! ইতিপূর্বে তোমার মিলন সংবাদ আমি সেখানে পাঠাইয়াছি। নৌকা কোন মুখে যাইবে ?

অনুতপ্ত মণিমোহন বলিলেন, "দেশে গিয়া যদি নিরুকে দেখিতে পাই !—পাইব কি সতীশ বাবু ? তাহা হইলেই বোট সেই দিকেই যাক্।"

সেই দিনই বোট সতীশচন্দ্র ও মণিমোহনের বাসস্থান লক্ষ্য করিয়া উজানে বাহিযা চলিল।

(৩)

নৌকা হইতে নামিয়া লজ্জিত ও অনুতপ্ত প্রাণে মণিমোহনকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, বন্ধু সতীশচন্দ্র তাঁহার হস্ত আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "চল ভাই মণি ! শীঘ্র বাড়ী চল, নিরুপমা বোধ হয় তোমার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া ব্যস্ত ও ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে, হয় ত তাহার শরীর ও মন ইহাতে অবসন্ন হইয়া পড়িবে।" উভয়েই ব্যস্তভাবে গৃহে গমন করিলেন।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, গৃহে গৃহে প্রদীপালোক দৃষ্ট হইতেছে, পুষ্পকাশনে রাশি রাশি মুকুল ফুটিয়া উঠিতেছে, সুগন্ধে দিক্ আমোদিত—মৃদু মধুর শীতল বাতাস সে সৌরভ দূর দূরান্তরে বহিয়া লইয়া যাইতেছে, ঊর্ধ্বে নীলচন্দ্রাতপতুল্য প্রশান্ত বিস্তৃত নীলাকাশ, তাহাও শুভ্র সমুজ্জ্বল হীরকখণ্ডের ন্যায তারকা-কুসুম-খচিত, জ্যোতির্ম্ময়রূপে বিশোভিত, তন্মধ্যে তুষারশুভ্র পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান হইয়া স্বর্গমর্ত সে আলোকে একাকার কবিয়া দিতেছে , নিম্নে অদূরে স্রোতস্বতী তাহার স্বভাবসিদ্ধ কল্ কল্ ছল্ ছল্ কুলু কুলু রবে প্রবাহিতা।

এমনি সময়ে সতীশচন্দ্র মণিমোহনের সহিত গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। শীর্ণদেহা, বেদনাতুরা, ব্যথিতা সুন্দরী নিরুপমার নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল, মণিমোহন, অপরাধীর ন্যায় নতমস্তকে নীববে দণ্ডায়মান রহিলেন।

(৪)

নিরুপমা ও মণিমোহনের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের বিবাহিত জীবনের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা জানাইয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব।

বিবাহের কয়েক সপ্তাহ পরে মণিমোহন সস্ত্রীক মুঙ্গেরে বাস করিতেছিলেন, সেইখানে থাকিতে থাকিতে কথা প্রসঙ্গে একদিন নিরুপমা মণিমোহনকে বলিল, "বল দেখি, সন্ন্যাস সুখের, কি সংসার সুখের ? দুইটাতেই ত তুমি অভ্যস্ত।"

পূর্বকৃত অপরাধে লজ্জিত মণিমোহন উত্তর করিলেন, "নিরু ! তোমার মতন স্ত্রী হইতে পৃথক হইয়া সন্ন্যাস ত বহু দূরের কথা, যদি স্বর্গে যাই, তবে আমি বলিতে পারি, সেখানেও আমি তিলার্দ্ধ সুখ বা শান্তি পাইব না।"

নিরুপমা। কেন ! এই যে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়াছিলে ?

কথা শেষ করিয়া নিরুপমা হাসিল ;—মণিমোহন বলিলেন, "তা' বুঝি জান না নিরু ! সে কেবল একান্তে আমার হৃদয়ের দেবীর পূজা করিবার জন্য।" নিরুপমা আপনার সুগৌর সুগোল দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধ দেখাইয়া বলিল, "বল দেখি, এ ক্ষতচিহ্ন কিসে হইল ?"

মণিমোহন সেই গভীর ক্ষতচিহ্ন দেখিয়া সবিস্ময়ে নিরুপমার প্রতি চাহিলেন ; নিরুপমা হাসিতে হাসিতে বলিল, "মনে নাই, তুমি প্রীতি-উপহার দিযাছিলে ! কুন্তলীনের বোতলটি ভাঙ্গিয়া আমার হাত কাটিয়া গিযাছিল, দেলখোসের শিশিটা কিন্তু এখনও বেশ আছে। কি মধুর গন্ধ ! আমাকে আবার আনাইয়া দিও।"

ব্যথিত মণিমোহন সাদবে বলিলেন, "নিরু ভাই, আমাকে ক্ষমা কর।" নিরুপমা তাড়াতাড়ি স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া প্রেম গদগদ স্বরে বলিল, "ছি ছি ! ও কি কথা, তুমি আমার দেবতা। ইহা কি নির্দয়তার চিহ্ন ? ইহা ত স্নেহের স্মৃতিচিহ্ন।"

নগেন্দ্রবালা বসু

নবম বৎসর

(১)

রায়গঞ্জের উমাচরণ বসু যখন ইহলোক ত্যাগ করিযা পবলোকে পত্নীব সহিত মিলিত হইলেন, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিনোদচন্দ্র বিবাহিত , সবেমাত্র সে এফ, এ পাশ কবিযাছে ! কনিষ্ঠ প্রমোদচন্দ্র পিতার মৃত্যুতে ও বিধবা পিসিমাব আদরে ঘুড়ি লাটাই লইযা দ্বিগুণ উৎসাহে মাতিয়া উঠিল এবং তাহার শৈশবের অমূল্য সমযটুকু রায়গঞ্জের জমিদার বাবুদের এন্ট্রান্স স্কুলে অতিবাহিত না হইয়া বামধন মুদি ও মদন কলুর দোকানঘরেই কাটিতে লাগিল। বিনোদচন্দ্র কৃষ্ণনগরে শ্বশুরের বাসায় থাকিয়া বি, এ, পডিত, এবং মহার্ঘ অবসরটুকু বৃথা নষ্ট না করিয়া জরিব ফিতা, পশম, "কুন্তলীন", "দেলখোস" প্রভৃতি উপহার দ্বারা আপনার বালিকা পত্নীর হৃদয়রাজ্য অধিকার কবিবার মহৎ সংকল্পে অহরহ ব্যস্ত থাকিত।

অবশেষে ওকালতি পরীক্ষায় পাশ হইয়া বিনোদচন্দ্র ওকালতি করিবার জন্য রায়গঞ্জেব জেলাকোর্টে সামলা মস্তকে বহির্গত হইল ; আর চতুর্থ শ্রেণীতেই মা সরস্বতীব কাছে বিদায় লইয়া প্রমোদচন্দ্র নিশ্চিন্ত মনে ঘবে বসিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্ন পবিপাক কার্যে মনঃসংযোগ করিল। বিনোদচন্দ্রের পত্নী শ্রীমতী মোহিনীসুন্দরী প্রথম হইতেই এই অকর্মণ্য দেবরটিকে তেমন স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারিত না ! পিসিমার ভয়ে সে কখনও আপনার হৃদয়ের অপ্রীতি ব্যক্ত কবিতে না পারিলেও, প্রমোদচন্দ্র বুঝিয়াছিল যে তাহার চালচলন কথাবার্তা প্রভৃতি সমস্তই বধূঠাকুরাণীর নিকট অত্যন্ত অশোভন দেখাইতেছে ; এজন্য আন্তরিক দুঃখিত হইয়া সে বেচারা রামধনের দোকানে গান গাহিয়া ও তবলা বাজাইয়া দিবসের অধিকাংশ সময়ই অবাধে ক্ষেপণ করিতে লাগিল। তারপর পিসিমার অশ্রু, অনুরোধ ও

আবেদন প্রভৃতির মধ্যে পড়িয়া, শঙ্খরোলে সমগ্র পল্লী সচকিত করিয়া প্রমোদচন্দ্র একদিন নববধূ গৃহে আনিল।

বধূটির নাম লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর রূপে এমন স্নিগ্ধ লাবণ্য বিকশিত হইতেছিল যে, তাহা দেখিয়া পল্লীবাসিনীগণ সকলেই প্রশংসা করিল! চক্ষু দু'টিতে এমন কমনীয় করুণভাব ও সমগ্র দেহশ্রীর মধ্যে এমন সলজ্জ-সংকোচ বর্তমান ছিল যে, মেয়েটিকে ভাল না বাসিয়া থাকা যায় না! স্বর্গগত ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার উদ্দেশ্যে দুই বিন্দু অশ্রু বর্ষণ করিয়া পিসিমা সাদরে নববধূকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। বিনোদচন্দ্র আসিয়া বধূর মস্তকে হস্ত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন। কেবল বধূর রূপের প্রশংসায় মোহিনীর হৃদয়ে হিংসার বহ্নি প্রধূমিত হইতে লাগিল!

(২)

তাহার পর আরও পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এ কয় বৎসরে বিনোদচন্দ্রের সংসারে কতকগুলি পরিবর্তন ঘটিয়াছে; পিসিমার মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

পিসিমার মৃত্যুর পর মোহিনীর হৃদয়সঞ্চিত বহ্নিকণাটুকু দীপ্যমান হইয়া শত সহস্র ছিদ্রপথ দিয়া আপনাকে বিকীর্ণ করিতে উদ্যত হইল।

রাত্রে শয্যায় পড়িয়া লক্ষ্মী যখন নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিত, তখন প্রমোদ আসিয়া সাদরে তাহার অধরে চুম্বন করিয়া অশ্রু মুছাইয়া কহিত, "গুরুজনের কথায় দোষ ধরিতে নাই। ছিঃ লক্ষ্মী, কেঁদ না! সব সহ্য করে থাকো।" এই আদরে লক্ষ্মীর সমস্ত হৃদয়ের সমস্ত বন্ধন যেন শিথিল হইয়া যাইত, এবং সে স্বামীর বক্ষে মস্তক রাখিয়া অশ্রু প্রবাহ মুক্ত করিয়া দিত। প্রমোদ কহিত, "আমার সঙ্গে বিয়ে না হয়ে, আর কারুর সঙ্গে যদি তোমার বিয়ে হত, লক্ষ্মী তা হ'লে তুমি কত সুখী হ'তে!" এই কথায় লক্ষ্মী স্বামীর বক্ষ হইতে মস্তক তুলিয়া সবেগে বলিয়া উঠিত, "যাও, তোমার ও কথা ভারি অন্যায়"—লজ্জায় হঠাৎ লক্ষ্মীর মুখ অবনত হইত, সে আর কিছুই বলিতে পারিত না!

একদিন মোহিনীর চট্ করিয়া মনে পড়িল যে তাহার নির্বোধ স্বামীটির প্রতি চতুর দেবর বড়ই অবিচার করিতেছে! একজন ললাটের ঘর্ম মুছিয়া অর্থোপার্জন করিবে, আর একজন নিশ্চিন্ত মনে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করিবে, ইহা ভাবিয়া তাহার নিরপেক্ষ দয়ার্দ্র নারী-হৃদয় বড় ব্যথিত হইয়া উঠিল। সেদিন দেবর যখন ভোজন কার্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তখন মোহিনী নিকটে বসিয়া কহিল, "ঠাকুরপো, একটা কথা আছে!"

"কি কথা বৌদি!"

"এই গিয়ে তোমার দাদা তোমাকে চাকরির চেষ্টা দেখ্‌তে বল্‌ছিলেন।"

মৃদু হাসিয়া প্রমোদ কহিল, "এতদিন পরে চাকরির চেষ্টা যে!"

মুখটা একটু ঘুরাইয়া মোহিনী কহিল, "কি জানি ভাই, তবে উনি বল্‌ছিলেন যে, 'আমি একা কাঁহাতক পেরে উঠি? একা কতই বা উপার্জন করবো?"

প্রমোদ কহিল "ছেলেবেলা থেকে আমার চরিত্রটা এমন করে গ'ড়ে তোলা হয়েছে যে, সুস্থির হ'য়ে কোন কার্যে লেগে যাব, এমন ত মনে হয় না! চাকরি আমাকে কে দেবে বল ত বৌদি?"

মোহিনী নেত্রযুগল বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "তা আমি মেয়েমানুষ সেকথা কি জানি

বল ?—তবে উনি বল্‌ছিলেন কি না যে, 'হাত পা আছে ত ! আপদে বিপদে স্ত্রী পুত্রের জন্যে আমাকে ত একটা সংস্থান করতেও হবে' !"

প্রমোদ গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, "তা হলে দাদা কি আমাদের ত্যাগ করবেন নাকি ?"

মোহিনী কোন কথা কহিল না।

আহারের পর জলের গ্লাস মুখ হইতে নামাইয়া প্রমোদ কহিল, "দাদা যদি এমন কথা বলে থাকেন, আজ থেকে চাকরীর চেষ্টায় থাকবো !"—অভিমানে প্রমোদচন্দ্রের স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

এদিকে মোহিনীসুন্দরী নির্বোধ স্বামীর বুদ্ধি মার্জিত করিতে একটুও নিশ্চেষ্ট ছিল না। কৃষক যেমন কঠিন মৃত্তিকাকে অবিরত বারিবর্ষণ দ্বারা উর্বর ও বীজ বপনের যোগ্য করিয়া তোলে, এই বুদ্ধিমতী রমণীটিও তেমনিই তাহার স্বামীর হৃদয় ক্ষেত্রটিকে কখন অশ্রু-বর্ষণে কখন উপদেশ ধারা সেচনে ক্রমশঃ উর্বর করিয়া তুলিতে লাগিল। রাত্রে মোহিনী স্বামীকে কহিল, "ঠাকুরপো বল্‌ছিল চাকরি করবে !"

বিনোদচন্দ্র তখন মনোযোগ সহকারে একটা আপীলের 'খসড়া' দেখিতেছিল ; তাহার উপর হইতে চক্ষু না তুলিয়াই কহিল, "বটে, চাকরি দিচ্ছে কে ?"

মোহিনী ধীরে ধীরে কহিল, "কলকেতায় কে ওর বন্ধু আছে, সেই নাকি করে দেবে।"

বিনোদচন্দ্র কাগজ দেখিতে দেখিতে কহিল, "হুঁ, পাগল আর কি ! চাকরি ত আর গাছের ফল নয় যে পেড়ে দেবে ! কি লেখাপড়া জানে যে চাকরী করবে ?"

ছোট একটু ভ্রূকুটি করিয়া মোহিনী কহিল, "ঐ তোমার এক কথা বাবু ! ও ত আর বলছে না যে জজ হব ! যেমন বিদ্যে তেমনি চাকরি করবে বলেছে !"

বিনোদচন্দ্র কহিল, "কেন এত কি অভাব হয়ে উঠ্‌ল যে, চাকরীর জন্য মাথা ব্যথা ধরেছে।"

পানের ডিবেটা বিনোদচন্দ্রের সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিয়া মোহিনী কহিল, "কেন প্রায়ই ত বলে, পরের ভাত খেয়ে আর থাকতে পারি না ! নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াবো, কারুর কাছে কোনও জবাবদিহি থাকবে না।"

বিনোদচন্দ্র আপীলের কাগজখানা রাখিয়া দিল, কোন কথা বলিল না।

মোহিনী কহিল, "ও ছোট বৌকে বাঘের মত ভয় করে ! ছোট বৌ কি কম শোনায় ? ছোট বৌ কত বল্‌ছিল, 'পুরুষ মানুষ হয়ে পরের ভাত খেতে লজ্জা করে না ? যার খেটে খাবার সাধ্যি নেই তার আবার বিয়ে করা কেন ?'—তা আমি বললুম, 'বড় ভাইয়ের খাবে, বড় ভাই কি পর হল !' শুনে আমাকে এমন মুখ ঝাপটা দিয়ে উঠল !"

বিনোদ—"প্রমোদ কি বললে ?"

মোহিনী—"ঠাকুরপো বল্‌লে 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ,' সবাইকে জানি ! চাকরী একটা জোটাতে পারলে কি এখানে পড়ে থাকি ?"

"বটে !" বলিয়া বিনোদ খুব গম্ভীর হইয়া রহিল।

(৩)

অনেক সময়েই দেখা যায় মানুষ যখন কোনও অশুভ সংকল্পে আপনার সমস্ত শক্তি পরিচালিত করে, তখন বিধাতাপুরুষ অলক্ষ্যে থাকিয়া এমন একটি নিগূঢ় জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেন যে, এক দিন তাহা বজ্রের ন্যায় পাপীর হৃদয়ে আঘাত করিয়া তাহার সমস্ত

সংকল্প বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। যখন মোহিনী এই ভ্রাতৃত্ববন্ধন ছেদন ও গৃহবিচ্ছেদ কার্যে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে তাহার শিশুপুত্র নলিন তাহার সুকোমল হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা দিয়া কাকাবাবু ও কাকিমাকে নিবিড় বন্ধনে বেষ্টন করিয়াছিল। তাহার প্রতি কাকাবাবুর ও কাকিমার স্নেহের সীমা ছিল না। কাকাবাবু যেখানে যাইবে নলিনকে সঙ্গে লইতেই হইবে, নচেৎ সে কাঁদিয়া কাটিয়া হুলুস্থুল বাধাইয়া দিবে।

এইরূপে ছোট বড় প্রত্যেক বিষয়ে নলিন কাকাবাবুর নিত্য সহচর হইয়া উঠিল। পুত্রের এই বিসদৃশ ব্যবহারে মোহিনী বিরক্ত হইত, মধ্যে মধ্যে তাহাকে তিরস্কারও করিত ; কিন্তু পুত্রের সুখস্বাচ্ছন্দের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিত না।

সেদিন নলিন কাকাবাবুর সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছিল। যখন ফিরিয়া আসিল তখন বেলা দশটা বাজিয়াছে। বিনোদও সেদিন একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্যে বাহিরে গিয়াছিল, নলিনকে লইয়া প্রমোদ ফিরিয়া আসিলে মোহিনী বাতাসের সহিত কলহ আরম্ভ করিল, "ছেলেটাকে আর বাঁচ্‌তে দেবে না দেখ্‌ছি! এত বেলা অবধি ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হ'ল! ওটা ত মরেও না, দু' চক্ষুর বিষ হয়ে আছে! কেন রে বাবু, তোর বিষয়ের বখরা নিতে যাচ্ছে না কি ? আর ছেলেটাও তেমনিই হয়েছে! 'কাকাবাবু' বল্‌তে অজ্ঞান, কাকাবাবু ছাতা দিয়ে মাথা রাখবেন!" ইত্যাদি ;—

লক্ষ্মী প্রমোদকে কহিল, "শুনছ ?" "কি ?" "দিদি কি বলছে!"

ঈষৎ হাসিয়া প্রমোদ কহিল, "তোমার দিদির মাথা গরম হয়েছে, 'কুন্তলীন' ভিন্ন দেখচি এমন গরম মাথা ঠাণ্ডা হবে না!"

সন্ধ্যার পর বিনোদ বাটী ফিরিল। সেদিন কোর্টে একটি মোকদ্দমায় হারিয়া সে বিপক্ষ পক্ষের উকীল কর্তৃক বড়ই লাঞ্ছিত হইয়াছিল, তাই মনটাও ভারী খারাপ ছিল। গৃহে ফিরিতেই মোহিনী প্রভাতের ক্ষুদ্র ঘটনাটি নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া স্বামীর কর্ণে উপহার প্রদান করিল। শয়তান ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া সরলা ইভকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়াইতে সমর্থ হইয়াছিল ; এই মায়াবিনী মোহিনী যে প্রখর রূপের মোহে ও সুসম্বদ্ধ বচনবিন্যাসে বিনোদচন্দ্রের মত একটি পত্নীপরায়ণ যুবকের দুর্বল চিত্ত বশীভূত করিবে, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কি আছে ?

মন্ত্রদীক্ষিত বিনোদ বাহিরে আসিয়া গম্ভীর স্বরে ডাকিল, "প্রমোদ!"

"যাই দাদা!" বলিয়া প্রমোদ বাহিরে আসিল।

বিনোদ কহিল, "তুমি চাকরীর চেষ্টা দেখ্‌বে বলছিলে, তাই দেখ ; এ বাড়ীতে সকলের অসুবিধা হচ্ছে, অন্যত্র থাক্‌লে ভাল হয় ; দিবারাত্রি 'খিটিমিটি' আর আমার সহ্য হয় না!"

অবনত মস্তকে প্রমোদ কহিল, "বল, কোথায় যাব!" বিনোদ একনিশ্বাসে কহিল, "এ বাড়ীর অংশ যা পাবে তার ন্যায্য দাম দেব, তা ছাড়া আর কিছু টাকা দেব ; চাকরীর চেষ্টা দেখ। অবশ্য বাড়ীর অংশ—"

বিনোদের কথায় বাধা দিয়া প্রমোদ কহিল, "কিছু দরকার নেই দাদা! সে সব নলিনকে আমি দিয়ে গেলুম।"

বিনোদ কহিল, "না, না, তুমি খাবে কি করে ?"

প্রমোদ কহিল, "সেসব কিছু ভেবো না দাদা! আমি সব ঠিক করে নেব।"

"মনে করো' না প্রমোদ, আমি তোমাকে ফাঁকি দেব।"

"এমন কথা কোন দিন আমার মনে হয়নি দাদা! আমাদের জন্য তুমি অনেক কষ্ট করেছ,

তোমার ঋণ কখনও শোধ দিতে পারবো না। আমার সহস্র দোষ আছে, ছোট ভাই ব'লে মাপ করো।"

★ ★ ★ ★

নানাবিধ উপকার সহায়তা প্রভৃতির দ্বারা প্রমোদ সমগ্র পল্লীর হৃদয় অধিকার করিয়াছিল ; তাহার আবার আশ্রয়ের অভাব কি ? সেই রাত্রেই উত্তম মণ্ডলের খাপরার ঘর ঠিক করিয়া আসিয়া দাদাকে প্রণাম করিতে গেল ; কহিল, "দাদা আশীর্বাদ কর, যেন কখনও মনুষ্যত্ব না হারাই !"

বিনোদ চুপ করিয়া রহিল। অনুতাপে যন্ত্রণায় তাহার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল ; কতবার সে ভাবিল "প্রমোদের দুই হাত ধরিয়া ফিরাই, বলি অভিমান ক'রে কোথায় যাচ্ছিস ভাই ?"—কিন্তু ধিক লজ্জা ! মোহিনীকে প্রণাম করিয়া প্রমোদ কহিল, "বৌদি, তুমি গুরুজন হচ্ছ, বড় হচ্ছ, রাগ রেখো না, আমাদের মাপ করো।"

লক্ষ্মী কহিল, "নলিনকে একটিবার দেখতে দেবে দিদি ?"

"না ভাই, সে এখন ঘুমুচ্ছে, তা'কে আর জাগিয়ো না।"

"সে ঘুমুচ্ছে, তবে থাক্ দিদি !—এইখান থেকেই তাকে আশীর্বাদ করে যাচ্ছি, সে যেন চিরজীবী হয়ে থাকে !"

প্রমোদ ও লক্ষ্মী সরিয়া আসিলে মোহিনী কহিল, "একবার ডাইনে মায়ায় ছেলেটাকে ঘিরে রেখেছে গা। এবার ছেলেটা বাঁচবে বলে ভরসা হচ্ছে !" কথাগুলা প্রমোদের কর্ণে প্রবেশ করিল ! সে শিহরিয়া উঠিল, মনে মনে কহিল, "হে ভগবান, এ সমস্ত অকল্যাণ হ'তে নলিনকে রক্ষা করো ! কোন অমঙ্গল যেন তাকে না স্পর্শ করে !" পরে লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া সেই গভীর নিস্তব্ধ নিশীথে প্রমোদ তাহার অশেষ সুখ দুঃখের স্মৃতি-মণ্ডিত আজন্মের গৃহ ত্যাগ করিল। দারুণ বেদনায় তাহার অস্থিপঞ্জর শতধা চূর্ণ হইয়া যাইতে ছিল !

(৪)

পরদিন প্রভাতে নলিন যখন তাহার কাকাবাবু ও কাকিমাকে কোথাও দেখিতে পাইল না, তখন সে 'কাকাবাবু !' 'কাকাবাবু' ! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। মাতা আসিয়া পুত্রকে প্রহার করিয়া কহিল, "কাকাবাবুর উপর যে ভারী টান দেখছি !"—বিনোদ কহিল, "কেন ছেলেটাকে মারছ ?" পিতাকে দেখিয়া নলিন কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "কাকাবাবুল কাতে দাব বাবা !"

সেদিন নলিন তাহার কাকাবাবু ও কাকিমাকে অনেকবার খুঁজিল, পরে তাহাদের অভাব তাহার অসহ্য বোধ হইল ! মনের কষ্ট ও দুর্ভাবনায় একদিন অপরাহ্নে নলিনের জ্বর আসিল, পরে সেই জ্বর প্রবল বিকারে পরিণত হইল। বিকারের ঘোরে শিশু বার বার তাহার কাকাবাবুকে ডাকিতে লাগিল। মানসিক দুর্বলতার জন্য বিনোদ অপরাধী ; প্রমোদকে ডাকিতে তাহার সাহস হইল না। অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলা রোগতপ্ত শিশু তাহার মানব জীবনের সমস্ত অভিনয় অসমাপ্ত রাখিয়া, শুভ্র অকলঙ্ক হৃদয় লইয়া ভগবানের চরণপ্রান্তে শান্তিলাভ করিল।

যেদিন নলিন ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিল, তাহার পরদিন প্রভাতে প্রমোদ নিতান্ত

অপরাধীটির ন্যায় বিনোদচন্দ্রের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। শিশুর পীড়ার সংবাদ কেহই তাহাকে জানায় নাই ;—সে এ দুর্ঘটনার বিষয় কিছু জানিত না। অনেক দিন নলিনের সংবাদ না পাইয়া তাহার ব্যাকুল চিত্ত অতিশয় অশান্ত হইয়া উঠিতেছিল ; তাই প্রমোদ আজ কম্পিত-হৃদয়ে নিতান্ত অপরাধীর ন্যায়, যে গৃহ হইতে সে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারই দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। সমস্ত সংকোচ দূরে ঠেলিয়া ধীরস্বরে বাহির হইতে ডাকিল, "নলি !"—কোন উত্তর নাই ! একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। দ্বারের নিকট আর একটু অগ্রসর হইয়া প্রমোদ কম্পিতকণ্ঠে আবার ডাকিল, "নলি !"—এবারেও কোন উত্তর নাই !—'তবে কি নলিনের অসুখ করিয়াছে ?—হে ভগবান, তাহাকে সুস্থ করিয়া দাও !' প্রমোদ আর একটু অগ্রসর হইয়া অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকিল, "দাদা !" তবুও কেহ উত্তর দিল না ! অবশেষে সাহসে ভর করিয়া প্রমোদ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ধীরে ধীরে ডাকিল, "বৌদি !"—সহসা পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে কাহার রোদনধ্বনি শ্রুত হইল। আশঙ্কায় ভাবনায় অস্থির হইয়া প্রমোদ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। মোহিনী বসিয়াছিল প্রমোদকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল ! কহিল, "ঠাকুরপো, এসেছ,—এস ভাই বস !" প্রমোদের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল ; তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল ; সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "নলিকে একবার শুধু দেখতে এসেছি !" মোহিনী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "তোমার নলিকে তুমি ফিরিয়ে আন ঠাকুরপো ! ফিরিয়ে আন"—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রমোদ কহিল, "কোথায় গেছে নলি ?"

"সে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে গো। তাকে তুমি ফিরিয়ে আন। ঠাকুরপো ফিরিয়ে আন : আমার পাপের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে গো—"

"এ্যাঁ : সে কি কথা !" প্রমোদ স্তম্ভিতভাবে বসিয়া পড়িল। মোহিনী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "আহা, শেষ পর্যন্ত সে তোমাকে দেখতে চেয়েছিল, তবু আমি হতভাগী তোমাকে ডাকিনি !"

"উঃ।" বলিয়া প্রমোদ চোখের জল মুছিল। এমন সময়ে আর্দ্র কণ্ঠে বিনোদ ডাকিল, "প্রমোদ !"—"দাদা !" বলিয়া প্রমোদ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল ! জড়িত কণ্ঠে বিনোদ কহিল, "প্রমোদ বাড়ী এস ভাই ! আমি দাদা হচ্ছি, আমার কোন অপরাধ রেখো না ! ছোট বৌমাকে নিয়ে এখনই বাড়ী এস !"

প্রমোদ কিছু কহিল না—তাহার কথা কহিবার শক্তি ছিল না। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, নলি এ জগতে নাই !—সে কি কথা ? বিনোদ কহিল, "আমার মতিভ্রম হয়েছিল, সেসব কথা মনে রেখো না ভাই ! ছোট বৌমাকে নিয়ে এস গে।" বিনোদের মুখের দিকে চাহিয়া বাষ্পজড়িত কণ্ঠে প্রমোদ কহিল, "দাদা !"—"ভাই !" বলিয়া বিনোদ প্রমোদকে সুদৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিল। কেহই অবিরল অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। উভয়েরই চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মোহিনী চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে কহিল, "আমার মত পাপী নেই গো ! এসব আমারই পাপের শাস্তি। নলি আমাকে খুব শাস্তি দিয়ে গেছে। ঠাকুরপো আমাকে মাপ করো ভাই ! যাও, ছোট বৌকে এখনই নিয়ে এসো, আমি আর এ শূন্য পুরীতে থাকতে পারচিনে।"

অসহ্য শোকের মধ্যে আজ যে অপূর্ব শান্তি সঙ্গীত উত্থিত হইতেছিল, তাহা বিধাতার আশীর্বাদের ন্যায়ই পবিত্র ও নির্মল ! আজিকার এই অশ্রুধারায় বহুদিনের সঞ্চিত হিংসাবহ্নি নির্বাপিত হইয়া গেল। কিন্তু হায়, যে ক্ষুদ্র শিশু তাহার সুকোমল নির্মল প্রাণপুষ্পটি মৃত্যুর

অনলে আহুতি দিয়া এই বিচ্ছেদাহত সংসারটিতে পুনর্মিলনের নিবিড়তা দান করিয়াছে,—সে এখন কোথায় ?

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দান

(১)

একটি সুন্দর অট্টালিকা সংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে, সরোবরে সোপানে একটি বালিকা বসিয়াছিল।—তখন প্রায় সন্ধ্যা, অস্তোগমনোন্মুখ দিনমণির কণক কিরণ উদ্যানস্থ সুশ্যামল বৃক্ষ পল্লবে নিপতিত হইয়া মধুর শোভাবিস্তার করিতেছিল, পুষ্করিণীর শ্যাম বক্ষে প্রতিফলিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রীড়া-চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করিতেছিল। মধুর সান্ধ্য সমীরণ মৃদু মৃদু বহিয়া উদ্যানের কোরককুসুম গুলিকে, বালিকা হৃদয়ে নবপ্রেম বিকাশের ন্যায় ধীরে, অতি ধীরে অলক্ষ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। নীড়াভিমুখে ধাবমান বিহঙ্গ মুকুলের সুমধুর কলরবে সেই শান্ত নীরব সান্ধ্য প্রকৃতি মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল। বালিকা সরসী তীরে বসিয়া অন্য মনে কি ভাবিতেছিল। এমন সময় একটি যুবতী ধীরপদবিক্ষেপে তাহার পার্শ্বে আসিয়া ডাকিলেন, "জ্যোতি !" অন্যমনস্কা জ্যোতি চমকিত হইয়া উত্তর দিল, "কেন দিদি ?"

যুবতী জ্যোতির পাশে বসিয়া পড়িয়া তাহার বিমর্ষ মুখখানির পানে চাহিয়া সস্নেহে কহিলেন, "একলা বসে কি ভাবছিস, জ্যোতি ?" জ্যোতি একটু হাসিয়া কহিল, "না, দিদি ! ভাবব আবার কি ? এ সময় বাগানের কি সুন্দর শোভা হয়েছে, ব'সে ব'সে তাই দেখছিলাম।"

যুবতীর নাম ছায়াময়ী। ছায়া স্বীয় সুললিত বাহু দ্বারা জ্যোতির গ্রীবা বেষ্টন করিয়া সাদরে কহিলেন, "তুই যে দেখ্‌ছি একজন ভাবুক হয়ে উঠলি বোন!" জ্যোতি বিস্মিতভাবে কহিল, "এ কি দিদি ! এমন সুন্দর সুগন্ধ আসছে কোথা থেকে ? এতক্ষণ এই বাগানে বসে রয়েছি, কিন্তু এমন সুন্দর মিষ্ট গন্ধ তো পাই নাই ; তোমাকে দেখে বাগানের সব ফুল এক সঙ্গে ফুটে উঠল নাকি !"

ছায়া হাসিয়া বলিলেন, "তোর দিদির এমনই গুণ ! হাবি কোথাকার ! এ বুঝি ফুলের গন্ধ ?"

জ্যোতি—"তবে কি দিদি ?"

ছায়া—"আজ যে 'কুন্তলীন' এনেছেন, এ তারি গন্ধ ; তোর জন্যও তো এক শিশি এনেছেন, দেখিস্‌নি ?"

জ্যোতি সরসীর অন্ধকারময় বক্ষে দৃষ্টি সংযত করিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, "আমার জন্যে !"—জ্যোতির সুন্দর মুখখানি সহসা লোহিতাভায় রঞ্জিত হইল।

তাহার এ ভাব ছায়া লক্ষ্য করিলেন। ছায়ার প্রভাত কমলের মত প্রফুল্ল বদন মলিন হইয়া গেল ; তিনি ভাবিলেন, "আমার অনুমান, তবে কি সত্য হইল ?" প্রকাশ্যে কহিলেন, "সন্ধ্যে হয়ে এল, জ্যোতি ! চুল বাঁধ্‌বিনে ? আজ 'কুন্তলীন' দিয়ে তোর চুল বেঁধে দিইগে

চল্ ।"—তখন উভয়ে উদ্যান ত্যাগ করিয়া অট্টালিকা-কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

(২)

জ্যোতির্ময়ী পিতৃমাতৃহীনা দরিদ্রা ব্রাহ্মণ কন্যা। দারুণ কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া জ্যোতির পিতামাতা যখন ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন, তখন ছায়ার স্নেহময়ী জননী সেই পিতৃমাতৃহীনা সাত বৎসরের বালিকাটির পালনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। তাহার পর আরও ছয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে; ছায়ার জননীর স্নেহে, যত্নে বালিকা জ্যোতির্ময়ী এক্ষণে কৈশোর সীমায় উপনীতা।

সম্প্রতি ছায়ার মাতাঠাকুরাণী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তাই ছায়া জ্যোতিকে নিজ স্বামীগৃহে লইয়া আসিয়াছেন।

ছায়ার স্বামী শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট্ । শরৎচন্দ্র এ জগতে প্রকৃতই সুখী ছিলেন; প্রচুর ধনসম্পত্তি, যথেষ্ট মানসম্ভ্রম, লক্ষ্মীস্বরূপিনী প্রেমময়ী সাধ্বী পত্নী ছায়াময়ী; ঈশ্বর কৃপায় তিনি সকলই লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু কুক্ষণে জ্যোতি তাঁহার সুখময় ভবনে পদার্পণ করিল!

শরৎ দেখিলেন,—জ্যোতির নির্মল শারদীয় জ্যোৎস্না সম্পাতে বিকশিত কুসুমদলের মত অপরূপ মাধুরীময়, ঈষৎ ম্লান, সুন্দর মুখখানি, নবস্ফুট যৌবনের অভিনবশ্রী, মনোহর রূপলাবণ্য!—দেখিয়া শরৎ মুগ্ধ হইলেন। জ্যোতির অসামান্য রূপরাশি ও ততোধিক মধুর সরল স্বভাবে, শরতের হৃদয়স্থিত অনুরাগ দিন দিন বদ্ধমূল হইতে লাগিল।

আর জ্যোতি? ভালমন্দ না বুঝিয়া সরলা মুগ্ধা জ্যোতি মজিল;—সে মরিল!

বুদ্ধিমতী ছায়া সবই বুঝিলেন। তাঁহার প্রীতিপ্রফুল্ল সুখস্বপ্ন-বিভোর হৃদয় বিষাদ তিমিরাচ্ছন্ন হইল। তিনি হৃদয়ের অশান্তি রাশি গোপন রাখিলেন; তাঁহার অসহ্য হৃদয় বেদনা কেহই জানিতে পারিল না।

(৩)

একদিন ছায়া স্বামীকে কহিলেন, "জ্যোতির বিবাহের কি স্থির করিলে?" শরৎচন্দ্রের প্রসন্ন বদন বিষণ্ণ হইল; হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল; তিনি স্বীয় ভাবান্তর গোপন করিবার বিশেষ যত্ন করিলেন; কিন্তু ছায়ার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিলেন না। শরৎ কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "কি করি বল, ছায়া! আজ কালকার দিনে সুপাত্র পাওয়া যে কত কঠিন ব্যাপার, তা'ত জানই? তা'তে আবার তুমি রূপ, গুণ, বিদ্যা,—সবই একাধারে চাও!"

ছায়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া মৃদু হাস্যে বলিলেন, "আমি একটি সুপাত্র স্থির করেছি। তোমার মত হলেই বিয়ের জোগাড় করে ফেলি।"

শরৎচন্দ্র সবিস্ময়ে কহিলেন, "সেকি? ছায়া! তুমি পাত্র স্থির কল্লে কোথায়?"

ছায়া অবনত মস্তকে বলিলেন, "হাঁ করেছি?"

শরৎ সাগ্রহে কহিলেন, "পাত্রটি কে?"

ছায়ার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি সহসা গম্ভীরভাব ধারণ করিল, ছায়া স্থির স্বরে কহিলেন, "সে পাত্র?—সে পাত্র তুমি!"

শরৎ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া, নীরবে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ছায়া পুনর্বার কহিলেন, "কেন! এ বিবাহে কি তুমি অসম্মত?"

শরৎ সজল নয়নে কাতরভাবে বলিলেন, "ছায়া! ছায়া! আর কেন যন্ত্রণা দাও?"

ছায়া তাঁহার কোমল বাহুবল্লরী দ্বারা স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া প্রেমাপ্লুত কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "না প্রাণাধিক্! আমি তোমায় যন্ত্রণা দিতে আসি নাই; তোমার অশান্ত হৃদয়ে শান্তিদান করিতে আসিয়াছি। আমি জানি—আমার দৃঢ়বিশ্বাস, জ্যোতিকে বিবাহ করিয়া তুমি সুখী হইবে; নতুবা তোমার ও জ্যোতির উভয়েরই জীবন অশান্তিময় হইবে। তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও।"

শরৎ স্বীয় উদ্বেলিত—আবেগপূর্ণ হৃদয়ে ছায়াকে ধারণ করিয়া রুদ্ধ প্রায় কণ্ঠে কহিলেন,—

"ছায়া! আমি যতই নরাধম হই না কেন, কিন্তু এতদূর নিষ্ঠুর নই যে, তোমার কোমল প্রাণে আঘাত দিয়া নির্মম পিশাচের মত আত্মসুখে মগ্ন হইব। ছায়া,—আমি তোমার নিকট অপরাধী; কিন্তু তুমি দেবী,—এ হতভাগ্যকে ক্ষমা কর।"

(৪)

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ প্রায়। শরৎচন্দ্র নিজ শয়ন কক্ষে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। আজ ছায়ার চক্ষে কিন্তু নিদ্রা নাই; সেই সুকোমল দুগ্ধফেননিভ সুখশয্যায়, প্রিয়তম স্বামীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া ছায়া নিদারুণ রোগ যন্ত্রণায় পীড়িত রোগীর ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন। হায়! অভাগিনীর প্রাণে আজি কত নিদারুণ যন্ত্রণা, তাহা অন্যে কি বুঝিবে?

বহুক্ষণ নিদ্রার অপেক্ষায় শয়ন করিয়া অবশেষে বিরক্ত হইয়া ছায়া উঠিয়া বসিলেন।

রজনী জ্যোৎস্নাময়ী, নির্মল নীলাকাশে বিমল শশাঙ্ক শুভ্র স্তিমিত-জ্যোতি নক্ষত্রমণ্ডলী-বেষ্টিত হইয়া মধুর হাসিতেছেন; সে হাসিতে জগৎ হাসিতেছে।

চন্দ্রমার স্নিগ্ধ রজতকিরণ মুক্তগবাক্ষপথে প্রবিষ্ট হইয়া শয্যাতল আলোকিত করিয়াছে; শরতের সুন্দর প্রশান্ত বদনমণ্ডলে তাহা যেন প্রীতিভরে ক্রীড়া করিতেছে। সেই জ্যোৎস্না-সমুজ্জ্বল মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া ছায়া আকুল হৃদয়ে বলিলেন, "প্রিয়তম, হৃদয়দেবতা! আমার জন্য—এই অভাগিনী ছায়ার জন্য তুমি জীবন বিষময় করিবে?" না না, আমি তোমায় সুখী করিব, তোমার হৃদয়ের বিষাদ কালিমা নিজ হৃদয়ে তুলিয়া লইব। ভগবান! অমরনাথ! অবলার দুর্বল হৃদয়ে বল দাও।"

ছায়া সজল নয়নে সেই জ্যোৎস্না-পুলকিতা শুভ্রবসনা ধরিত্রীর পানে চাহিয়া রহিলেন।

তখন সেই নীরব রজনীর ঘোর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, স্তব্ধ নৈশ-গগন আলোড়িত করিয়া, দূরে কে বাঁশি বাজাইতেছিল; বাঁশির সকরুণ সুমধুর, নৈরাশ্যময় সুস্বর লহরী, যেন প্রাণের অসহ্য বেদনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল;—দুঃখিনী মর্মপীড়িতা ছায়ার ব্যথিত, অবসাদ মথিত হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রী সজোরে আলোড়িত হইতেছিল। "আমার না ছিল কি? ছায়া ভাবিলেন, সুখ, ঐশ্বর্য, দেবতার মত স্বামীর হৃদয়ভরা প্রেম, জগতে আসিয়া রমণীর আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সকলই তো পাইয়াছিলাম। তবু যে এত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, সে শুধু আমার অদৃষ্টের দোষ! আমি অভাগিনী,—তাই এ অশান্তির বোঝা হৃদয়ে বহিয়া অহর্নিশি মনাগুণে দগ্ধ হইতেছি। তাই বুঝি আমার যেন মনে হয়, এত আদর, এত ভালবাসা, সবই মৌখিক,—আমার হৃদয়-সর্বস্বের হৃদয়ে আমার আর স্থান নাই!"

ভাবিতে ভাবিতে ছায়ার নয়ন যুগলে অশ্রু প্রবাহ বহিল।

ছায়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগে, অধীরভাবে নিদ্রিত স্বামীর চরণযুগল বক্ষে ধারণ করিলেন ; অশ্রুধারায় ভাসিতে ভাসিতে কহিলেন, "তুমি,—তুমি সত্যই কি আর আমার নও ? তবে কি লইয়া এ সংসারে থাকিব ? না, না, এ মিছে সন্দেহ ; জীবনে মরণে, জাগ্রতে, স্বপনে তুমি চিরদিন আমারই !"

(৫)

"জ্যোতি ! উনি কোথায় ?"

যখন প্রভাতের সুবিমল স্নিগ্ধ রশ্মি নৈশ অন্ধকার বিদূরিত করিয়া সমগ্র জগৎ আলোকিত করিতেছিল, মধুর-স্পর্শ সুখকর প্রভাত সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল, তখন রোগ-শয্যাশায়িতা ছায়া পার্শ্বোপবিষ্টা জ্যোতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্যোতি ! উনি কোথায় ?"—আজ এক সপ্তাহ, ছায়া সাংঘাতিক রোগে শয্যাশায়িনী।

ছায়ার সেই চিরপ্রফুল্ল মুখকান্তি মলিন হইয়া গিয়াছে ; অধরে সে হাসি নাই, নয়নে সে দীপ্তি নাই ; দুরন্ত রোগের প্রভাবে সকলই বিলুপ্ত হইয়াছে।

শরৎ অহর্নিশি ছায়ার শিয়রে বসিয়া তাঁহার সেই রোগযন্ত্রণা-ক্লিষ্ট বিশুষ্ক মুখখানির পানে স্নেহপূর্ণ কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন ; জ্যোতি তাহার স্নেহময়ী দিদির পীড়ায় ব্যাকুল হইয়া আহার নিদ্রা ভুলিয়া অবিশ্রান্ত তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিয়াছে ; কিন্তু হায়, সকল যত্নই বুঝি নিষ্ফল হয় ! ছায়ার জীবন সঙ্কটাপন্ন, জ্যোতি ছায়ার রোগ-তপ্ত ললাটে হস্তার্পণ করিয়া কহিল, "ডাক্তার ডাকতে গিয়েছেন, দিদি ! এখন কেমন আছ ? একটু ভাল বোধ হচ্ছে না ?"

ছায়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জ্যোতির মুখপানে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "জ্যোতি ! আমি আর বাঁচব না বোন !"

জ্যোতির চক্ষুদ্বয় অশ্রুভারে আর্দ্র হইয়া উঠিল ; সে কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া কাতর কণ্ঠে কহিল, "ও কি কথা দিদি ! তুমি শীঘ্রই ভাল হ'বে, ভাবনা কি ?"

ছায়ার ওষ্ঠাধার নিরাশার ম্লান হাস্যে রঞ্জিত হইল। তিনি সস্নেহে কহিলেন, "পাগল কোথাকার ! এ রোগ কি কখন ভাল হয় ? কিন্তু তবু তুই এত যত্ন করছিস জ্যোতি ! আমার মায়ের পেটের বোন থাকলেও বোধকরি এতদূর পারত না।"—বলিতে বলিতে ছায়ার চক্ষে জল আসিল।

এই সময় শরৎচন্দ্র সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। জ্যোতি ইতিপূর্বে শরৎকে দেখিয়া কত লজ্জিত হইত, তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতেও কুণ্ঠিত হইত , কিন্তু ছায়া পীড়িত হওয়া পর্যন্ত সে লজ্জা, সে সঙ্কোচ দূরে পলায়ন করিয়াছে। সে শরৎকে দেখিবামাত্র সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল, "কই, ডাক্তার এলেন না ?"

"না, তিনি ঘণ্টাখানেক পরে আসিবেন। সেই ঔষধটি আর একবার দিতে বলিলেন। "বলিয়া শরৎ ছায়ার শয্যা পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ছায়ার রোগশীর্ণ উত্তপ্ত হস্তখানি স্বীয় হস্তে ধারণ করিয়া সাদরে কহিলেন, "কেমন আছ ছায়া ?"

ছায়া ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলেন, "বড় কষ্ট বোধ হচ্ছে, তুমি আমার কাছ থেকে আর কোথাও যেও না ; আমি আর বাঁচব না।"

দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু ছায়ার কপোল বাহিয়া উপাধানে পতিত হইল, সে নৈরাশ্য পূর্ণ

কণ্ঠস্বরে শরতের হৃদয় যন্ত্রণায় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ছায়ার জীবনদীপ নির্বাপিত প্রায় ; তাই ভবিষ্যতের যন্ত্রণাময়, বিষাদ তমসাচ্ছন্ন চিত্রখানি তাঁহার নয়ন সম্মুখে জাগিয়া উঠিয়া তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিতেছিল।

"আমিই কি শেষে ছায়ার মৃত্যুর কারণ হইলাম!" ভাবিতে ভাবিতে শরৎ অসহ্য অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিল ; বহু চেষ্টায় কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া শরৎ কহিলেন, "ছি ছায়া, ও কথা কি বল্‌তে আছে?"

জ্যোতি ঔষধ লইয়া আসিল, ছায়া ঔষধ খাইতে প্রথমে অসম্মত হইলেন ; কিন্তু শরৎ ও জ্যোতির অনুরোধে অবশেষে কিঞ্চিৎ পান করিলেন, পরে শরতের বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "আর সময় নাই! আমার শেষ অনুরোধ রাখ্‌বে?"

শরৎ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অজস্র অশ্রুধারায় তাঁহার বদন মণ্ডল প্লাবিত হইয়া গেল। তিনি অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে কাতরভাবে কহিলেন, "কি অনুরোধ ছায়া? তোমাকে আমার অদেয় কি আছে?"

ছায়া ইঙ্গিতে জ্যোতিকে নিকটে আসিতে বলিলেন ; জ্যোতি তখন অদূরে বসিয়া দুঃখপীড়িত হৃদয়ে অশ্রুধারায় নিষিক্ত হইতেছিল, ছায়ার আহ্বানে সে অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন ছায়া ধীরে ধীরে বিকম্পিত হস্তে জ্যোতি ও শরতের করদ্বয় পরস্পর সংলগ্ন করিলেন ; পরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "জ্যোতি! আমার সর্বস্ব আমার হৃদয়রত্নকে তোমায় দিলাম ; আশীর্বাদ করি, সুখী হও।" পরে অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "শোকে দুঃখে অধীর হ'য়ে, জ্যোতিকে,—আমার স্নেহের জ্যোতিকে কখন কষ্ট দিও না!"

* * * *

সেই দিন, যখন সন্ধ্যার শান্ত ধূসর ছায়া পৃথিবীতে ধীরে ধীরে ঘনীভূত হইতেছিল, অসীম নভোমণ্ডলে অসংখ্য তারকা-কুসুমগুলি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল,—সেই সময় পুণ্যময়ী দেববালা ছায়ার পবিত্র আত্মা নশ্বর জগৎ ত্যাগ করিয়া শূন্যে মিশাইয়া গেল।

পূর্ণশশী দেবী

পুরস্কার

ভাল ছেলে বলিয়া স্কুলে সুশীলের প্রশংসা থাকিলেও বাড়ীতে তাহার দৌরাত্ম্যের সীমা ছিল না। ছেলে হইয়া বাঁচে না, তাই "অনেক দুঃখের সুশীল" বাবা ও ঠাকুরমার নিকট বেশীমাত্রায় আদর পাইয়া, দুষ্ট ঘোড়ার মত দুর্দান্ত হইয়া উঠিতেছিল। প্রতিবাসী বা সহপাঠী, কোন বালকের সহিতই তাহার সদ্ভাব ছিল না। তাহার বোন লীলাকেও তাহার সমস্ত আবদার ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইত, লীলার মত সহিষ্ণু সঙ্গীও তাহার দ্বিতীয় ছিল না। লীলা বড় শান্ত মেয়ে ; তাহার ঘন পক্ষ্ম পরিবেষ্টিত বড় বড় কালো চোখ দুটিতে তাহার হৃদয়ের নির্মলতা ফুটিয়া উঠিত। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টি করুণা ও ভালবাসায় পূর্ণ ছিল। দাদার নিকট অকারণে লাঞ্ছিত হইয়া সে তাহার বিরুদ্ধে কখনও অভিযোগ করিত না ; পাছে

মা জানিতে পারিয়া ভর্ৎসনা করেন, সেই ভয়ে কাঁদিতেও সাহস করিত না। সুশীল অন্যায়রূপে দাসদাসীদের প্রতি অত্যাচার করিলে সে সঙ্কুচিতভাবে মিষ্ট কথা বলিয়া তাহাদের তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত, এবং ইহা কদাচিৎ সুশীলের চক্ষে পড়িলে এই অমার্জনীয় অপরাধের জন্য সে 'যথাবিহিত' শাস্তি গ্রহণ করিত ; তবুও দাদাকে ছাড়িয়া কোথাও থাকিবার তাহার ক্ষমতা ছিল না। মা যদি সুশীলের উপর রাগ করিয়া কোন দিন তাহাকে সুশীলের নিকট যাইতে নিষেধ করিতেন, তবে তাহার পক্ষে তাহা শাস্তি স্বরূপই হইয়া উঠিত। সুশীল যে লীলাকে ভালবাসিত না এমন নয় ; কিন্তু সে ভালবাসার মর্মগ্রহণ করা সকলের পক্ষে সহজ হইত না। সে নিজে ভগ্নীর প্রতি যথেষ্ট দৌবাত্ম্য করিত, তাই বলিয়া অন্য কেহ কিছু বলিবে কেন ? তাই সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাথা খুঁড়িয়া অনর্থ করিয়া তুলিত। জলখাবারের পয়সা জমাইয়া জলছবি, চিনে মাটির পুতুল, লজঞ্চুস প্রভৃতি আনিয়া ভগ্নীকে উপহার দিত ; আবার রাগের সময় সমস্ত ভাঙ্গিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেও ত্রুটি করিত না। লীলা তাহার পুতুলগুলির শোচনীয় পরিণামে মনে মনে ব্যথিত হইলেও প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না ; এবং ক্রোধোপশমে সুশীল যখন গঁদ ভিজাইয়া,—গালা গলাইয়া, পরম গম্ভীর মুখে চূর্ণবিচূর্ণ পুতুলগুলির সংস্কার কার্যের নিষ্ফল চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিত, তখন লীলা অত্যন্ত প্রশংসামান চক্ষে দাদার মুখেব দিকে চাহিয়া চুপ কবিয়া দেখিত।

মা'র অনুরোধে সুশীল লীলার বিদ্যাশিক্ষার ভার গ্রহণ করিল। লীলাও প্রথম প্রথম দিন কতক খুব উৎসাহের সহিত 'ক'য়ে আকার কা' আর 'ক',—'কাক' প্রভৃতি বানান ক্রমশঃ বালীর কাগজের খাতায় মোটা সরের কলম দিয়া রুল টানিয়া আঁকা বাঁকা অক্ষরে যথেষ্ট কাটাকুটি করিয়া ও কালি ফেলিয়া 'সুশীল সুবোধ বালক' প্রভৃতি পাঠ লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিল ; এবং পুস্তকোল্লিখিত সুশীল বালককে আপনার অগ্রজের আসনে বসাইয়া মনে মনে পরম প্রীতিমিশ্রিত গর্ব অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাহার উৎসাহ কমিয়া আসিল, তথাপি দাদাকে খুসী করিবার জন্য একদিনের জন্যও সে লেখাপড়ায় আলস্য করিল না। সমস্ত দুপুর বেলাটা গলদ্‌ঘর্ম হইয়া কোনও গতিকে আঁকা বাঁকা অক্ষরে এক পৃষ্ঠা মাত্র লেখা শেষ করিয়া উৎসাহিত হৃদয়ে তাহা দাদাকে দেখাইত, কিন্তু 'আহা' কি লেখার ছিরি ! যা তোর কিচ্ছু হবে না।' ইত্যাদি রূপে ভর্ৎসিত হইয়া সে ম্লানমুখে খাতাখানি রাখিয়া দিত ; এবং পরদিন যথাসময়ে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত লিখিতে বসিত। উৎসাহটা আরম্ভে যতটা থাকিত, বসিলে ততটা থাকিত না।

অবশেষে ছয় মাস কাল নিন্দিত, প্রহারিত ও অনবরত পাঠে গলদ্‌ঘর্ম হইয়াও যখন দ্বিতীয় ভাগ শেষ হইল না ; এবং ধারাপাত পড়িয়া এক টাকায় ৮টা আধুলি ও ৬ দ্বিগুণে ৭০ প্রভৃতি বলিয়া লীলা অঙ্ক শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল ; তখন প্রবল অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া সুশীল একদিন তাহাকে জানাইয়া দিল যে, ইতিপূর্বে এত বড় মূর্খ সে আর কখনও দেখে নাই, লীলার ভবিষ্যতে যে আর কিছু হইবে, সে ভরসাও তাহার ছিল না, সুশীলের এ বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা যথেষ্ট ছিল তাহা নহে। কিন্তু দাদার কথা লীলার কখনও অবিশ্বাস হইত না, তাই সে আপনার হীনতার ও মূর্খতার বিষয় ভাল করিয়া অনুভব কবিতে পারিল, এবং অচির কালের মধ্যেই লেখাপড়া ছাড়িয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

লেখাপড়ায় মন না থাকিলেও সংসারের কাজকর্মে তাহার আলস্য ছিল না। দাদার কাপড় ঠিক করিয়া রাখা, স্কুল হইতে সুশীল ফিরিয়া আসিলে তাহার বইগুলি গুছাইয়া রাখা, মার হাত হইতে জলখাবারের রেকাবিখানি লইয়া আসন পাতিয়া দাদাকে খাইতে দেওয়া,

এবং ছুটির দিন মাকে লুকাইয়া সুশীল যখন কাঁচা আম পাকা নোড়ের সন্ধানে দুপুরের রোদে আঁক্‌শী হাতে বাগানে বাগানে ঘুরিত, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকা ; প্রভৃতি ছোট, বড়, অনেক কাজই তাহাকে করিতে হইত। সকালবেলা ঠাকুরমার পূজার যোগাড় করিয়া দিয়া একখানি ছোট ডালায় চন্দন চর্চ্চিত ফুলগুলি লইয়া 'পুণ্যি পুকুর' 'হরির চরণ' ইত্যাদি ব্রত করিয়া দাদা বাবা মা ঠাকুরমা সকলের মঙ্গলের জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করিত। এবং সুশীলেব আহারের সময় প্রবীণা গৃহিনীব মত 'ওটা খাও' 'এটা খেলে না' বলিয়া অনুনয় করিত। অভ্যাসের বশেই হউক, আর যে কারণেই হউক, লীলাকে না হইলে সুশীলের একদণ্ডও চলিত না। অথচ সে যখন কোনও সস্নেহবাক্যে আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভালবাসা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে যাইত, অমনই অর্দ্ধপথে 'যা যা তোর আর গিন্নিপণা করতে হবে না', বলিয়া থামাইয়া দিত।

(২)

দেখিতে দেখিতে লীলা নয়-উত্তীর্ণ হইয়া দশে পড়িল। আর নিশ্চিন্ত থাকা যায় না, তাই হেমাঙ্গবাবু কন্যার বিবাহেব জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। হবিশপুরের রায়েদেব বাড়ী হইতে একদিন তাহাকে দেখিতে আসিল। বাঙ্গালীর মেযেবা অল্প বয়স হইতেই অভিভাবিকাদিগের নিকট শ্বশুরবাড়ীর প্রতিকূলে নানারূপ ভীতিপ্রদ মন্তব্য শুনিয়া শুনিয়া একটি আদর্শ ঠিক করিযা রাখে। লীলারও যে এ বিষয়ে অল্প অভিজ্ঞনা না জন্মিযাছিল এমন নহে, তাই মা যখন জবি জড়াইয়া, আঁট করিয়া, তাহার সুবাসিত কুন্তলীনসিক্ত, ঘনকুঞ্চিত. কেশরাশিকে কবরীবদ্ধ কবিয়া, অলঙ্কারবস্ত্রে তাহাকে যথাসাধ্য মণ্ডিত করিয়া তাঁহার মনের মত সাজাইয়া তাহার স্বাভাবিক শ্রীকে, বিলুপ্ত করিয়া তুলিতে অনেকটা কৃতকার্য হইলেন, তখন লীলা অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে মার ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া জানাইল, সে বিবাহ করিবে না। কন্যার কথায় কন্যাব আসন্ন বিরহ বেদনা মার মনেও জাগিয়া উঠিয়াছিল ; তাঁহার চক্ষুপল্লবও অল্প আর্দ্র হইয়া আসিয়াছিল। তথাপি তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ছিঃ মা, ওকথা বলতে নেই, জন্ম এয়োস্ত্রী হয়ে চিরদিন সেই ঘর কর।" মেয়ে জন্মিলে যে বিবাহ অনিবার্য, তাহা যে ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না, তাহাও তিনি তাহাকে বুঝাইতে ত্রুটি করিলেন না। সুশীল এতক্ষণ ভগ্নির সজ্জাপ্রিযতা ও জননীর অজ্ঞতা সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল ; এবং চুল বাঁধিবার জন্য মা লীলাকে আটক করিয়া রাখায় অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিতেছিল। মার কথায় সে প্রবল আপত্তি করিয়া বলিল, 'সে হবে না লীলা কিছুতেই বিয়ে করবে না।' মা রাগ করিয়া বলিলেন, 'এমন অলক্ষুণে ছেলেও তো দেখিনি ! ও কথা বল্‌তে নেই।' সুশীল মার কথায় কর্ণপাত না করিয়া লীলার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, 'তুই উঠে আয়, তোকে বিয়ে কর্তে হবে না'—ইত্যাদি।

(৩)

তথাপি লীলাকে বিবাহ করিতে হইল। পাত্রপক্ষ খুব বডমানুষ। ছেলেটি 'দোজবরে' হইলেও বয়স বেশী নয়। 'দোজবরে' বলিয়া অল্প পয়সায় শুভকার্য সমাধা হইল। লীলা নয় উত্তীর্ণ হইয়া দশে পড়িয়াছে মাত্র ; এ বয়সে মেয়ে রাখা যায় না এমন নয়, তবে উপস্থিত ত্যাগ করাটাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তাই বুদ্ধিমান হেমাঙ্গবাবু অল্প পয়সায় কন্যাদানের

এমন শুভ অবসর ত্যাগ করিলেন না, অগ্রহায়ণের প্রথমেই একটা ভাল দিন দেখিয়া শুভকার্য সম্পন্ন করিলেন। সুশীল প্রথম প্রথম আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু কেহই যখন সে বিষয়ে মন দিল না তখন সে কাগজের মালা ও ফানুস তৈয়ারী কার্যে মনোযোগ দিল। লীলা এ কয়দিন ম্লানমুখে ছায়ার মত দাদার পশ্চাতে ফিবিতেছিল, দাদার তখন সে দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর ছিল না।

বিবাহের পরদিন নবজামাতা ও কন্যাকে আশীর্বাদ করিয়া বস্ত্রালঙ্কারমণ্ডিতা চন্দন চর্চিতা বধূবেশিনী লীলার কম্পিত শীতল হস্ত জামাতার হস্তে রাখিয়া 'আমার ধন তোমায় দিলুম' বলিতে বলিতে রুদ্ধ কণ্ঠে হেমাঙ্গবাবু যখন মুখ ফিরাইয়া অশ্রু মোচন করিলেন, তখন সমাগত সকলের চক্ষুই আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। লীলাও সকাল হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুশীল অত্যন্ত গম্ভীরমুখে এক পাশে দাঁড়াইয়া এই বিদায়দৃশ্য দেখিতেছিল। ক্রন্দনাকুলা লীলা যখন মা, বাবা ও দাদার চরণ বন্দনা করিয়া পাল্কীতে আরোহন করিল, তখন সুশীলের সহস্র চেষ্টা উপেক্ষা করিয়া অশ্রুবাশি চক্ষু রুদ্ধ করিয়া দিল। অশ্রুজলের কুয়াশার মধ্য দিয়া লীলাব পাল্কী দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেলে সে ধীরে ধীরে অন্য মনে পড়িবার ঘরে ফিরিয়া আসিল।

সমস্ত দিন কোন কাজে, খেলায়, সে মন দিতে পারিল না; আপনাকে অত্যন্ত একা অসহায় মনে করিতে লাগিল; চারিদিকের সমস্ত দ্রব্য সেই ক্ষুদ্র বালিকার সহস্র স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতে লাগিল। স্কুল হইতে ফিরিবার সময় অভ্যাসবশতঃ দ্বারেব দিকে দৃষ্টি পড়িল, আজ আর দুইটি উজ্জ্বল, আনন্দোৎফুল্ল, ঘন পল্লবমণ্ডিত, কালো চোখ, তাহাব পথ চাহিয়া অপেক্ষা করিয়া নাই;—পড়িবার ঘরে পাঠ্যপুস্তক অযত্নে বিক্ষিপ্ত, কেহই তাহা গুছাইয়া রাখে নাই; উৎসবেব অবসানে বিদায়-প্রাপ্ত রশুনচৌকির দল আপনার ইচ্ছামত বিদায়ের সুর বাজাইয়া যাইতেছিল। মুক্ত বাতায়ন দিয়া সুদূর প্রসারিত ধান্যক্ষেত্র অশ্বত্থ ও তিন্তিড়ী বৃক্ষের ছায়াচ্ছন্ন অসমতল 'মেটো' রাস্তায় কদাচিৎ দুই একজন পথিক, ও অদূববর্তী শৈবালাচ্ছন্ন পুষ্করিণীতে মৎসলোলুপ দুই একটা উলঙ্গ ধীবর বালককে দেখা যাইতেছিল। সুশীল দৃষ্টি ফিবাইয়া লীলার পুরাতন মলাট-ছেড়া, আঁকা-বাঁকা অক্ষরে পরিপূর্ণ বালীর কাগজের খাতাখানি লইয়া অন্য মনে পাতা উল্টাইতে লাগিল, সহসা একটা জায়গায় দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। লীলা তাহার চিরপরিচিত বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে, 'দাদা আজ আমায় এক শিশি দেলখোস দিয়েছে; গন্ধ কেমন জানি না, দাদা যখন দিয়াছে তখন খুব ভালই হইবে।' তলায় তাহাব নাম। অতি বৃষ্টির অবসানে ডাল নাড়া দিলে, যেমন ঝর ঝর করিয়া পত্রসঞ্চিত সমস্ত জল ঝরিয়া পড়ে, সুশীলেব যত্নরুদ্ধ উচ্ছ্বসিত অশ্রুরাশি তেমনই ঝরিয়া পড়িল। এই কযটা কালীর অক্ষরে তাহার বালিকা ভগিনীর হৃদয়ের ছবি সে আজ পূর্ণরূপে প্রকাশিত দেখিল, তাহার প্রত্যেক অক্ষরে যে বিশ্বাস, যে স্নেহ ও সরলতা, যে কৃতজ্ঞতা, ফুটিয়া উঠিতেছিল, জন্মাবধি একত্র অবস্থানেও সে যে কেন তাহা অনুভব করিতে পারে নাই, তাহাই ভাবিয়া সে আশ্চর্য হইল। কষ্টের মধ্যে এমন আনন্দও সে জীবনে কখনও পায় নাই!

বিদায়ের দিনে লীলার অশ্রুপরিপ্লুত, বিষণ্ণ মুখচ্ছবি, স্নেহমণ্ডিত মহিমাময়ী দেবীর মুখশ্রীর মত তাহার মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সুশীল ত্রস্ত হস্তে চক্ষু মুছিয়া লীলার অসমাপ্ত ডায়ারীর নীচে বড় বড় অক্ষরে লিখিল, "লীলা খুব লক্ষ্মী মেয়ে সে এবার ফিরিয়া এলে আর কখনও তাহাকে কিছু বলিব না, এবার হইতে তাহাকে খুব ভালবাসিব।"

ইন্দিরা দেবী

মুকুল

(১)

যখন আমার বিবাহ হয়, তখন আমার বয়স এগার বৎসর। কিন্তু বয়স অল্প হইলেও, আমার শাশুড়ী না থাকায় বিবাহের এক বৎসর পর হইতেই আমাকে নিয়মিত রূপে স্বামীর ঘর করিতে হয়। শ্বশুর ও স্বামী ভিন্ন শ্বশুরালয়ে আমার অন্য কোন অভিভাবক ছিলেন না।

বিবাহের পাঁচ ছয় বৎসর পরে একদিন রাত্রিতে আমি আমার আট মাসের ছোট মেয়েটিকে কোলে লইয়া বসিয়া আছি, স্বামী সম্মুখে বসিয়া গল্প করিতেছেন ; বাহিরে ভয়ানক দুর্যোগ, যেমন ঝড় তেমনি মুষলধারে বৃষ্টি এমন সময় বাহির হইতে শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, "সুবোধ, একবার এদিকে এসো।" স্বামী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন। আমি কৌতূহল সংবরণ করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম। একটা দ্বারের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইলাম। বোধ হয় আমার আসিবার পূর্বেই তাঁহাদের দুই-একটা কথা হইয়া গিয়াছিল। আমি একটা কথা শুনিলাম, কিন্তু হঠাৎ মর্ম বুঝিতে পারিলাম না। শ্বশুর মহাশয় বলিতেছিলেন, "এরকম বিপদে একজন কুলীন ব্রাহ্মণে পালটা ঘরের আর একজন কুলীন ব্রাহ্মণের মান রক্ষা না করিলে আর কে করিবে।"

স্বামী। "আপনার আদেশ আমার অবশ্য পালনীয়, কিন্তু বাবা—"

শ্বশুর মহাশয়। "তাহা জানি সুবোধ, কিন্তু বুঝিয়া দেখ আমার অন্য কোন সন্তান নাই যে তাহাকে দিয়া এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইব।"

অনেকক্ষণ কথা নীরব ছিল, সহসা তৃতীয় ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "আপনাদেরই আশ্রিত প্রতিপালিত আমি, এ বিপদে কোথায় দাঁড়াইব ? আমার উপায় করুন, সুবোধ বাবু !"

শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, "কি বল সুবোধ ? একমাত্র তোমার মতামতের উপর এই শুভকার্য নির্ভর করিতেছে।" স্বামী অনেকক্ষণ নির্বাক ছিলেন, অবশেষে বলিলেন, "কি আর বলিব ? আপনার যেমন অভিরুচি আপনার আদেশে আমি বলিদানে প্রস্তুত।" তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি গম্ভীর—অতি ধীর।

"আমি বুঝিতেছি এ কাজটা খুব যুক্তিযুক্ত নয়, কিন্তু দুর্যোগের রাত্রিতে অন্য উপায় আর কি আছে ? আজ ব্রাহ্মণের জাতি যায়।"—শ্বশুর মহাশয়ের কথা শেষে অপরিচিত ব্যক্তি অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, "আমায় রক্ষা করুন সুবোধবাবু, এ বিপদে আমাকে উদ্ধার করুন।"

অতি মৃদুস্বরে আরও দুই চারিটা কথার পর সকলে নীরব হইলেন। পদশব্দে চমকিত হইয়া আমি ফিরিয়া দ্রুত পদে আমার দ্বিতলস্থিত কক্ষে প্রবেশ করিলাম। অল্পক্ষণ পরেই স্বামী ফিরিয়া আসিলেন, বিরস বদনে রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "আজ রাত্রে বাড়ী ফিরিব না।" আমি তাঁহার বসনাগ্র চাপিয়া ধরিলাম, বলিলাম, "কোথায় যাও ?"

স্বামী উত্তর করিলেন না, ক্ষুণ্ণভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। শেষে আমি আপনা হইতেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিয়ে করতে যাবে ?"

তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "না মরিতে !"

আমার বড় রাগ হইল ; বলিলাম, "কেন বিয়ে করবে ? তোমার ত স্ত্রী এখনও মরে নাই।" "বাবার আজ্ঞা।". এইমাত্র সংক্ষিপ্ত উত্তর পাইলাম। তাঁহার কথা শুনিয়া

আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল ; রাগ করিয়া বলিলাম, "বাবার আজ্ঞায় তুমি আবার বিয়ে করবে ? কি পিতৃভক্তি !"—স্বামী কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

রাগে দুঃখে অভিমানে আমার কণ্ঠ রোধ হইয়াছিল, তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য আমি কোনও চেষ্টা করিলাম না ; কপাট বন্ধ করিয়া মেঝের উপর শুইয়া পড়িলাম। মনে হইল মরণ হইলে বাঁচিতাম ! কিন্তু না মরিয়া কেবল ভাবিতে লাগিলাম—'এমন মানুষ তো উপন্যাসের বাহিরে কোথাও দেখি নাই, বাবার এক কথাতেই আবার বিবাহ করিতে চলিলেন, আমি কেহ নহি !' শেষে কনের বাপের ওপর গিয়া সব রাগ পড়িল, বুড়ো আর কোথাও জায়গা পেলে না, মরতে এখানে এসেছিল ! যদি মেয়ের বরই না মিলাতে পারবি, তবে গঙ্গার জলে মেয়েটাকে ফেলে দিলি না কেন ?—বোধহয় শেষ রাত্রে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, প্রত্যূষে যখন বুড়ি কাঁদিয়া উঠিল তখন আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল ; স্বপ্নে দেখিতেছিলাম, স্বামী বিবাহ করিয়া বাড়ী ফিরিযাছেন, নবাগতা বধূ আমাকে প্রণাম করিতেছে। কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গে দেখিলাম, সেসব কিছুই নয় ; বুড়িকে কোলে লইয়া শুইয়া আছি !

(২)

বিবাহ করিয়া স্বামী পরদিন বাড়ী ফিরিলেন, দেখিলাম নবাগতা বধূ বালিকা নহে, সে যুবতী। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম সে মুখখানি অতি সুন্দর ! আমি আমার দুঃখ ঢাকিয়া আবার তাহার মুখ দেখিলাম ; কি সুন্দর ! যেন সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পস্তবক, তাহার সৌন্দর্যের মধ্যে একটি সুন্দর সরল কমনীয় মাধুর্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা দেখিলেই বিমুগ্ধ হইতে হয়, মুখখানি আবার দেখিতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু আমার প্রাণের বেদনা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না ; রাগে, যন্ত্রণায় আমি তাহার দিকে চাহিলাম না। সে আসিয়া আমায় প্রণাম করিল, তাহাকে আমি একটা কথাও বলিতে পারিলাম না। ঘরে গিয়া দেখিলাম স্বামী বসিয়া আছেন ; আমাকে দেখিয়া তিনি হাসিলেন, বলিলেন, "তোমার বোধহয় খুব রাগ হয়েছে, না ?" আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম, "তুমি ভাল্‌বাসতে পারবে তো ! কোন অপরাধে আমাকে পর করলে ?" স্বামী সস্নেহে আমার অশ্রু মুছাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "না, তোমাকে পর করিব কেন ? কিন্তু মুকুলকেও যত্ন করতে হবে।" আমি কোন উত্তর করিতে পারিলাম না, তাঁহার হাত ছাড়াইয়া দূরে দাঁড়াইলাম। স্বামী বলিতে লাগিলেন, "মুকুলের কাল রাতেই বিয়ের লগ্ন স্থির হয়েছিল, কিন্তু ঐ রকম ঝড় বৃষ্টিতে বর আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই, লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যায় দেখিয়া মুকুলের বাবা আমাদের এখানে এসেছিলেন।" আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "থাক, ও সব আমি জানি।" সে দিন এই পর্যন্ত হইয়া রহিল।

বিবাহের এক সপ্তাহ পরে মুকুল বাপের বাড়ী চলিয়া গেল, আর এক সপ্তাহ পরে শ্বশুর মহাশয় তাহাকে লইয়া আসিলেন। আমি বিরক্ত হইয়া স্বামীকে জানাইলাম, "আমি এখানে থাক্‌ব না, বাপের বাড়ী পাঠাবে ত পাঠাও, নইলে গলায় দড়ি দিয়া মরিব।" তিনি প্রথমে চমকিয়া উঠিলেন, তারপরই সংযত স্বরে বলিলেন, "অমন কর ত আমি মরিব। দেখ, বন্দুকে গুলি ভরিয়া রাখিয়াছি, আবশ্যক বুঝিলেই এই গুলি খাইয়া প্রাণত্যাগ করিব।"

কি নিষ্ঠুর কথা ! শুনিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। ও মরিবার বাসনা তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হইল। আমার বাপের বাড়ী যাওয়া হইল না ; শেষে মুকুলের সহিত খুঁটিনাটি লইয়া

ঝগড়া আরম্ভ করিলাম ! কিন্তু দেখিলাম, মুকুল আমার কাছে অকারণে তিরস্কৃত হইয়া একটাও উত্তর করে না ; নতমুখে আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া যায় ! একা আর কতই বকিয়া মরিব, তাহলে ত কার্য সিদ্ধ হইবে না ! মুকুল ত ইহাতে বাড়ী ছাড়িবে না। অবশেষে একটা বুদ্ধি আঁটিলাম, কণ্টক যাহাতে সহজে উৎপাটিত হয় তাহার চেষ্টায় রহিলাম, একদিন সন্ধ্যার সময় মুকুলের ঘরে ঢুকিলাম, দেখিলাম মুকুল জানালার সম্মুখে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, আমি ডাকিলাম, "মুকী !" মৃদু হাস্যে ওষ্ঠাধর অনুরঞ্জিত করিয়া মধুর কণ্ঠে মুকুল বলিল, 'কেন দিদি ?'

আমি বলিলাম, 'তোর সঙ্গে গোটা কত কথা আছে।'

'বল না দিদি, কি কথা !' মুকুল আমার হাত ধরিয়া শয্যায় বসাইল।

'আমার স্বামী তোমাকে বিবাহ করেছেন, কিন্তু তোমাকে ভাল বাসেন কি ?'

মুকুল। 'কেন দিদি, একথা বলছ ? তিনি ত খুব যত্ন করেন।'

আমি। 'না, তিনি তোমায় একটুও ভালবাসেন না।'

মুকুল। 'তা, কি করবো ? আমার বাবাকে তিনি যে বিপদ হতে উদ্ধার করেছেন, এই যথেষ্ট ; ভালবাসা না বাসা তাঁহার ইচ্ছা।'

সেকি ! তুই এই অবস্থাতেই সুখী ? আমার কথার উত্তরে মুকুল নত মুখে বলিল, "হাঁ," আমি বুঝিলাম, এ বড় সহজ মেয়ে নয় ! তাহার চোখের উপর স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিলাম, "তোমাকে এ বাড়ী ছাড়তে হবে, তার কি ?

ভয় চকিত নেত্রে মুকুল আমার দিকে চাহিয়া কম্পিত স্বরে বলিল, "কেন দিদি ?"

"আমার স্বামীতে আমার পুরো দখল, তুই রাক্ষসী, তার মাঝে কে ?" বলিয়াই আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। মুকুল ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি দিদি ! কি হয়েছে বল না।"

আমি বলিলাম, "তুই যত শীঘ্র হয় বাড়ী ছাড়িয়া যা, নহিলে আমি বড় অনর্থ ঘটাব, কিন্তু সাবধান, যদি এই সব কথা বাহিরে প্রকাশ পায় ; তবে তোর অদৃষ্টে বিস্তর দুঃখ আছে।"

মুকুল বলিল, "স্বামীকেও জানাইব না দিদি ?"

"স্বামী ! তোর স্বামী কিসের ?" আমার কথা শুনিয়া এবার মুকুল কাঁদিয়া ফেলিল। আমি সেখানে আর না দাঁড়াইয়া সে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলাম।

রাত্রিতে শ্বশুর মহাশয় আহারে বসিয়াছেন। মুকুল ও আমি সম্মুখে বসিয়া আছি, কিছু পরে মুকুল অতি বিনীতভাবে বলিল, "বাবা !"

শ্বশুর মহাশয় সস্নেহে কহিলেন, "কেন মা লক্ষ্মী !"

মুকুল একবার আমার দিকে চাহিল, তাহার পর দৃষ্টি ফিরাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমাকে বাপের বাড়ী পাঠাবেন কি ?"

কিয়ৎকালের জন্য আহার স্থগিত রাখিয়া শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, "কেন ?"

মুকুল একটা নিশ্বাস ফেলিল, বলিল, "অনেক দিন বাপের বাড়ী যাইনি, তাই বল্‌ছি।" শ্বশুর মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, সুবোধকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিব।" তাহার পর আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বড় বৌমা ! তোমার কি মত ?"

আমি নতমস্তকে গম্ভীর ভাবে বলিলাম, "আপনার মতের উপর আর আমার কথা কি ?"

মুকুলের পিত্রালয়ে যাওয়া স্থির হইল, শুনিলাম স্বামীরও মত আছে ; বড় দুঃখের পর নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। বিদায়ের সময় আসিল, মুকুল স্বামীর কাছে বিদায় লইতে গেল ; আমি গোপনে দেখিলাম, তাঁহার মুখে মৃদু হাসি, কিন্তু নয়নে দুই ফোঁটা অশ্রু ! সে ভক্তিভরে

অবনত মস্তকে স্বামীকে প্রণাম করিল। পদধূলি লইয়া মাথায় দিয়া আবেগপ্লুত কণ্ঠে বলিল, "আমাকে আজিকার মত বিদায় দাও ; আবার মরিবার দিন বিদায় লইব।" বলিতে বলিতে তাহার নয়নেব সঞ্চিত অশ্রু সুকোমল গণ্ডে গড়াইয়া পড়িল। মুকুল একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অনিমেষ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"এত শীঘ্র ও কথা বলিতে নাই মুকুল, আমরা এখনও অনেক দিন বাঁচিব।" বলিয়া স্বামী আদরে তাহার মুখ চুম্বন করিয়া সস্নেহে তাহার মস্তক বক্ষে ধারণ করিলেন, দেখিলাম উভয়েই নির্বাক, আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

(৩)

মুকুল শ্রাবণ মাসের শেষ ভাগে পিত্রালয়ে গিয়াছিল, ইহার মধ্যে সে আর এখানে আসে নাই। আসিবার চেষ্টাও করে নাই ; করিলে কি হইত, কে জানে ? শুনিতাম তাহার সমবয়স্করা জিজ্ঞাসা করিত, "তুই এবার শ্বশুরবাড়ী গেলিনে কেন ?" সে হাসিতে হাসিতে বলিত, "তোরা যেমন বোকা ! কে আবার সাধ করে সতীন-ঘর করতে যায় ?" গুরুজনের কেহ একথা জিজ্ঞাসা করিলে সে নতমুখে গম্ভীরভাবে বলিত, "বুড মা-বাপ আর ক'টা দিনই বা আছেন, এই বেলা তাঁদের সেবা করে নিই।" যাহা হউক, আমার চক্রান্তটা একেবারেই চাপা পডিয়া গিয়াছিল।

আশ্বিন মাসের পূজার সময় মুকুলের দাসী একখানা পত্র লইয়া আসিল, মুকুল লিখিয়াছে, "দিদি, অনেকদিন তোমায় দেখি নাই , দেখিতে বড় ইচ্ছা করে। সে কথা যাক, এই পূজার সময় 'মা' তত্ত্ব করিলেন ; ইহার সঙ্গে আমি দুই শিশি 'দেলখোস' পাঠাইলাম ; তাহা তুমি লইও। আমার দাদা এবার পূজায় এই দুইটা আমাকে দিয়াছিলেন, কিন্তু দেখিলাম আমার ইহাতে কোনই দবকার নাই, দিদি আমার দান বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিও না ; অনুগ্রহ করিয়া লইও। শুনিয়াছি 'দেলখোস' খুব ভাল গন্ধ দ্রব্য। আমার প্রণাম গ্রহণ করিও।"

আমি শিশি দুইটি হাতে লইয়া উপরে উঠিতেছি, স্বামী তখন নীচে নামিতেছেন, আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "তোমার হাতে ও কি ?" আমি শিশি দুইটি তাঁহাকে দিতে গেলাম, মধ্যে হইতে চিঠিখানা পড়িয়া গেল, তিনি তাড়াতাড়ি চিঠিখানি তুলিয়া লইয়া পডিতে লাগিলেন ; পত্রপাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি বলিলেন, "মুকুল 'দেলখোস' দিয়াছে।" সঙ্গে সঙ্গে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, আমাকেই দিয়াছে।"

স্বামী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমি পূজার সময় প্রতিদানে তাহাকে কি দিবে ?" আমি ঘৃণায় মুখ ফিরাইলাম। তিনি দ্রুতপদে নিচে নামিয়া গেলেন।

অগ্রহায়ণ মাসে আমি পিত্রালয়ে চলিয়া গেলাম। আমার বাবা বর্মায় কাজ করিতেন ; এই সময় তিনি বাড়ী আসিয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমরা কয় ভাই বোনে মিলিত হইয়াছিলাম।

আমি পৌষ মাসটা সেইখানেই রহিলাম , গয়ায় সে বৎসর ভয়ানক প্লেগ হইতেছিল ; সুতরাং আমার শীঘ্রই গয়ায় যাওয়া হইল না। মাঘ মাসের শেষে একটা নূতন সংবাদ পাইলাম। হিংসা দ্বেষে আমার দেহ মন জর্জরিত হইয়া উঠিল ; স্বামী লিখিয়াছেন, "সেদিন মুকুলের একটি ছেলে হইয়াছে। আমি দেখিতে গিয়াছিলাম ; ছেলেটি বড়ই সুন্দর হইয়াছে তাহাকে দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে,....।"

রোষে ক্ষোভে আমি তাঁহার এ পত্রের উত্তর দিলাম না ; আমার মেয়েটিকে বুকে তুলিয়া লইলাম।

ফাল্গুন মাসে বড় দুর্ঘটনা ঘটিল, শ্বশুর মহাশয়ের পত্রে শুনিলাম, স্বামী প্লেগাক্রান্ত। ভয়ে বিষাদে আমার শরীরের রক্ত শুকাইয়া গেল, আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। কিন্তু শ্বশুর মহাশয় প্রতি পত্রে লিখিতেছিলেন, "বৌমা যেন এখন এখানে না আসেন।" তাঁহার নিষেধাজ্ঞা মানিয়া চলা আমাদের একান্ত কর্তব্য, কাজেই যাওয়া আর হইল না। তিন সপ্তাহ পরে আমি মুকুলের একখানি পত্র পাইলাম। সে প্রথমে লিখিয়াছে, "দিদি আমার চিঠি পড়িবে কি ?" তাহার পর লিখিয়াছে, "দিদি, তোমার স্বামী আজকাল অনেক ভাল আছেন, আমি শ্বশুর মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছি, যাহাতে তুমি শীঘ্র আসিতে পাও ; তুমি আসিলে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হই।"

বুঝিলাম সে এখন শ্বশুরালয়ে, তাহা হইলে সে স্বামীর এই দুঃসময়ে তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছে, বোধ করি সমস্ত দিন রাত জাগিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছে। আমার মন কি জানি কেন অনেকখানি নরম হইয়া গেল, হঠাৎ মনে হইল তাহার উপর আমি বড় অন্যায়াচরণ করিয়াছি।

(৪)

বৈশাখ মাসে শ্বশুরমহাশয়ের পত্র পাইয়া আমি গযায় উপস্থিত হইলাম। "দিদি এসেছ ?" বলিতে বলিতে মুকুল আমাকে প্রণাম করিল। লজ্জায় ঘৃণায় আমি কোনও কথা কহিতে পারিলাম না। মুকুল আমার হাত ধরিয়া উপরে লইয়া চলিল, যে ঘরে স্বামী শয়ন করিয়াছিলেন, সেই ঘরে লইয়া গিয়া মুকুল মৃদুস্বরে বলিল, 'দেখেছ, দিদি এসেছেন।"

নিমীলিত চক্ষু উন্মীলিত করিয়া স্বামী আমাকে দেখিলেন, বলিলেন, "এসেছ ? বড় কষ্টে এবার বাঁচিয়াছি ! যদি মুকুল কাছে না থাকিত, তবে বুঝি এবার রক্ষা পাইতাম না। শুধু মুকুলের অবিশ্রান্ত সেবায় স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়াছ।"

এবার আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, স্নেহ ভরে মুকুলকে চুম্বন করিলাম, তাহার কণ্ঠ ধারণ করিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। স্বামী বিপদে আমাদের উভয়েরই যে সমান বিপদ।

মুকুল আপনার অঞ্চলে আমার অশ্রু মুছিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "কেন কাঁদ দিদি ; এখন ত আমরা বিপদ থেকে উদ্ধার হইয়াছি ; যে বিপদে পড়িয়াছিলাম ! মা রক্ষা না করলে, এতদিনে কে কোথায় পড়িতাম দিদি !"

আমি দেখিলাম, মুকুল এবার ভয়ানক দুর্বল, শরীর বড়ই শীর্ণ। আমি বলিলাম, "তুই এত রোগা হয়েছিস্ কেন ? মুকুল তোর ছেলে কোথায় ?"

মুকুল বলিল, "দিদি, ছেলেকে বাপের বাড়ী রেখে এসেছিলাম। শ্বশুর মহাশয় কি এখানে আনতে দেন ? সেখানে আমার বড় বোনের কাছে সে থাক্‌ত ; আজই তাকে এনেছি।"

মুকুল চলিয়া গেলে স্বামী বিষণ্ণ মুখে বলিলেন ; "মুকুলের ভয়ানক অসুখ, এই বেলা তাকে একটু যত্ন কর, সে আর বেশী দিন বাঁচবে না।" আমি ভয়ে চমকিয়া বলিলাম, "কি অসুখ ?"

স্বামী কাতরস্বরে বলিলেন, "তার যক্ষ্মা হয়েছে।"

শুনিয়া আমার কষ্ট হইল, আমি মনে করিয়াছিলাম, এবার তার সঙ্গে আর মনান্তর ঘটাব

না, দুইজনে মিশিয়া ঘর করিব। মুকুল ছেলে কোলে করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "দিদি, একে তোমায় দিলাম, আমার ছেলেয় কাজ নাই।" সেই সুন্দর শিশুটিকে কোলে লইতে হাত বাড়াইলাম ; মুকুল আমার কোলে তাহাকে দিল, বুকে চাপিয়া ধরিয়া আমি তাহার মুখ চুম্বন করিলাম।

স্বামী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "দাও আমাকে।" আমি তাঁহার কোলে ছেলেকে দিলাম, মুকুল বাহিরে চলিয়া গেল।

যখন নির্জনে মুকুলের কাছে দাঁড়াইলাম ; তখন সে একটা নিশ্বাস টানিয়া অতি কষ্টে বলিতে লাগিল, "দিদি এবার আমি মরিব, আমার সব কাজ ফুরাইয়াছে ; আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি !" সে একটা বাক্স খুলিয়া ফেলিল ; একটি স্নিগ্ধ গন্ধে কক্ষ আমোদিত হইয়া উঠিল ; মুকুল বলিল ; "দিদি আমার শরীর যখন খুব খারাপ হ'য়ে পড়েছিল, তখন স্বামী একটা না একটা কিছু হাতে করিয়া প্রায়ই সেখানে আমাকে দেখিতে যাইতেন। তাঁহার উপহারগুলি অতি যত্নে তুলিয়া রাখিয়াছি ; দেখ এই কাপড়, সেমিজ, জ্যাকেট, কুন্তলীন, দেলখোস, আতর, ল্যাভেণ্ডার, চিক্ বাজু, ইয়ারিং, সবই তিনি দিয়াছেন। আমি তোমাকে দিলাম। আর তার কাছে যা' পেয়েছি দিদি, তা' আমার বুকে লুকান আছে।" সে শেষের কথাগুলি বড় আর্দ্র স্বরে বলিল।

আমি বলিলাম, "মুকুল, তুমি বার বার ও কথা কচ্ছ কেন, এবার আর আমি তোমাকে কিছু বলিব না।"

মুকুল বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল, "দিদি এবার আমাকে যেতেই হ'বে।"

মুকুল কথা শেষ করিয়া, একটি নিশ্বাস ফেলিল, তাহার অশ্রুপূর্ণ চক্ষু অঞ্চলে মার্জনা করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। ভয়ে আমার দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, তাহার কাছে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া সস্নেহে বলিলাম, "মুকুল, বোন, তোমার কি খুব অসুখ করছে ?"

"দিদি, একবার স্বামীকে দেখিব।" বলিতে বলিতে মুকুল রক্ত বমন করিল। আমি ছুটিয়া স্বামীকে ডাকিতে গেলাম, ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, মুকুল অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। সে পুনঃ পুনঃ রক্ত বমন করিতে লাগিল।

স্বামী আসিয়া তাহার মস্তক কোলে লইয়া বসিয়া পড়িলেন, মুকুল ধীরে ধীরে হাত দুইখানি তুলিয়া স্বামীর পায়ের উপর রাখিল, বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, ম্লান হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "দিদি, বিদায় !"

তাহার চক্ষু আপনা হইতে মুদ্রিত হইয়া আসিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মুকুল চিরনিদ্রায় অভিভূত হইল।

মুকুল সত্যই সব ফেলিয়া চলিয়া গেল ! স্বামী কাঁদিতেছেন, শ্বশুর মহাশয় কাঁদিতেছেন, আমি মুকুলের রোরুদ্যমান শিশুকে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। পাষাণী আমি মরিলাম না কেন ?

নগেন্দ্রবালা বসু

অমৃতে গরল

(প্রথম পরিচ্ছেদ)

রাত্রি নয়টা বাজিয়াছে। প্রসিদ্ধ ধনী রায় শরৎচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের বালিগঞ্জস্থ মনোরম উদ্যান বাটীর সুসজ্জিত বিস্তৃত প্রাঙ্গন উজ্জ্বল তড়িতালোকে হাসিতেছে, প্রাঙ্গনের চারিদিকে টবে বসান নানাবিধ নয়ন তৃপ্তিকর বৃক্ষলতা, প্রাচীর গাত্রে বিবিধ বিচিত্র বর্ণের পতাকামালা ঐ সকল লতা পাতার মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র স্ফটিক গোলকের মধ্যস্থিত শুভ্র উজ্জ্বল আলোকগুলি শোভিতেছে, চারি কোণের চারিটি ক্ষুদ্র ফোয়ারার মুখ-নিসৃত মুক্তা-সদৃশ জলবিন্দুগুলি আলোক সম্পাতে ঝিকিমিকি করিতেছে। প্রাঙ্গণ মধ্যে ঊর্দ্ধে বহু শাখা বিশিষ্ট ঝাড় ঝুলিতেছে। নিম্নে গোলাকার বৃত্তের মধ্যে কৃত্রিম তুষার-পর্বত হইতে অবিরত শীতল বাষ্প উঠিতেছে, আর ঐ বাষ্প অবিরাম ঘূর্ণায়মান তাড়িত পাখার স্নিগ্ধ বাতাসে মিশ্রিত হইয়া প্রাঙ্গণের চতুপার্শ্বস্থিত বিবিধ সুন্দর চেয়ারে উপবিষ্ট রাজধানী ও নিকটবর্তী স্থান সমূহের নিমন্ত্রিত বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ইংরাজ ও মুসলমান ভদ্রলোকগণকে উভয় পার্শ্বে বিলম্বিত নবমল্লিকা ও কুটজ কুসুমের স্নিগ্ধ কোমল পরিমল বিতরণ করিতেছে। আর সেই আলোকোজ্জ্বল সুসজ্জিত আসরের প্রস্ফুটিত লতাপুষ্প সমলঙ্কৃত কারপেটের উপর সালঙ্কারা , সুবেশা সুকণ্ঠা নর্তকী ইলাহিজান বাইজি সুন্দর সলমা চুমকির কারুকার্য মণ্ডিত ওড়না শোভিত লাবণ্যবিকশিত নিজ সুকোমল ললিত দেহলতা দোলাইয়া নাচিয়া, ঘুরিয়া উঠিয়া, বসিয়া মধুরতর তালে বীণানিক্কনবৎ মধুর কণ্ঠে—"পিয়া পিয়া বাউত পাপিয়ারা বোলে"— গান গাহিতেছে।

সেই গীতবাদ্যমুখরিত, প্রমোদমদিরোচ্ছ্বসিত আসরে উজ্জ্বল রজত সালবোটে করিয়া তুষারশুভ্র চাপকান পাগড়ি পরিহিত , মুসলমান ও উড়িয়া খানসামাগণ অবিরত সুবাসিত তাম্বুল ও চুরুট বিতরণ করিতেছে। শরৎবাবুর সহোদর অবনীবাবু মাঝে মাঝে আতর, গোলাপ, পুষ্প ও পুষ্পমালাপূর্ণ রজত পাত্র হস্তে এদিক ওদিক ঘুরিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে যথোচিত সম্মান সহকারে বিতরণ করিতেছেন। কোন বিষয়ের কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। সকলেই শরৎবাবুর সাদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হইতেছেন।

শরৎবাবুর পুত্র সুধাংশুকুমার এখনও নাচসভায় আগমন করেন নাই। তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট সুশোভিত আসন শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। ইলাহিজান হিন্দী গান শেষ করিয়া কয়েকজনের কথায় একটি বাঙলা গান ধরিল,—

'দিবস রজনী আমি যেন কার
আশায় আশায় থাকি।
(তাই) চমকিত মন চকিত শ্রবণ
তৃষিত আকুল আঁখি।"

এই সময় সহসা বাটীর মধ্য হইতে বিষাদব্যঞ্জক অস্ফুট কোলাহল ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল। সকলেরই মন সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। নৃত্য বন্ধ হইল, গীত থামিল। কি ঘটিয়াছে জানিবার জন্য সকলেই উদগ্রীব ও নীরব। সংবাদ আসিল, সুধাংশুকুমার অকস্মাৎ চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। প্রমোদময় রম্য প্রাঙ্গণ অশান্তিতে সহসা আকুল হইয়া উঠিল।

কিরূপে সুধাংশুকুমারের এবম্প্রকার আকস্মিক মৃত্যু ঘটিল তাহা কেহই অবগত নহেন। শরৎবাবু যখন পুত্র সমীপে উপস্থিত হন, তখন প্রাণবায়ু দেহ ত্যাগ করিয়া অনন্ত শূন্যে মিশিয়া গিয়াছে। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সুধাংশুকুমার অনাবৃত দেহে একখানি নীলবর্ণের সিল্কে মোড়া কৌচে শায়িত রহিয়াছেন। অবসন্ন হস্তের অনামিকায় হীরকাঙ্গুরীয় ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে। দুই তিন জন ভৃত্য জোরে সমস্ত শরীরে বাতাস করিতেছে। তাহাদের মুখে কেবলমাত্র শুনিলেন, প্রায় দশ মিনিট হইল শরীরে ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভূত হওয়ায় তিনি তাহাদিগকে বাতাস করিতে বলেন। শরৎবাবু অঙ্গ স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, দেহ শীতল ; বদন শুষ্ক, উজ্জ্বল প্রফুল্ল কান্তি একেবারে ম্লান কালিমাময় হইযা গিয়াছে। শরৎবাবু আর কিছুই দেখিতে পারিলেন না , জিজ্ঞাসা করিতেও পারিলেন না। অবসন্ন হৃদয়ে সেই কঠিন মর্মব মণ্ডিত গৃহকুট্টিমে বসিযা পড়িলেন।

সমাগত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সহরের দুই তিন জন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা তাড়াতাড়ি আসিয়া সুধাংশুকে দেখিলেন। বেশ করিয়া বুক পিঠ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, সে দেহে জীবনের আর কোন চিহ্নই নাই। তাঁহারা কতকটা অনুমান করিলেন, কোন প্রকাব উৎকট বিষ ভোজনের বা আঘ্রাণের সহিত দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মৃত্যু হওয়াই সম্ভব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম গ্রীষ্মের সুপ্রভাত। নবীন রবির লোহিতোজ্জ্বল প্রথম কিরণ রেখা পূর্ব আকাশের গায়ে যখন ছড়াইয়া পড়িতেছিল, যখন সেই কনক দ্যুতি কলিকাতার উচ্চ চিমনির শীর্ষসমূহ সবে মাত্র স্পর্শ করিতেছিল, যখন উর্ধ্বে পার্শ্বে চতুর্দিকে কাকেব কা-কা ববের সহিত ক্ষুদ্র মক্ষিকাগুলি বেগুনি রংয়ের ফুলগুলির নিকট গুন্ গুন্ করিয়া উড়িতেছিল, যখন নব নির্মিত নহবৎখানা হইতে ভৈরবী রাগিনীতে সানাইয়ের মিলন গান প্রভাত সমীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল ; এবং পরিণত বয়স্ক ঘোষ সাহেব আনন্দ উল্লসিত মনে চুরুটের ধুম টানিতে টানিতে ব্যস্তভাবে এদিক ওদিক ঘুরিয়া অনুচব বৃন্দকে বিবিধ কার্যের ভার অর্পণ করিতেছিলেন, তখন একজন হিন্দুস্থানী বেয়ারা তাঁহাকে সেলাম কবিয়া একখানি লেফাপা তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। ঘোষ সাহেব অবনীবাবুর পত্র পাঠে মর্মবিদারক বিষাদময় সংবাদ অবগত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সমীপবর্তী একখানি ইজিচেয়ারে বসিয়া পড়িলেন ! তাঁহাব আশালতিকা একেবাবে চিববিদায়িত হইল। কিন্তু মনে মনে জগদীশ্বরকে শত ধন্যবাদ দিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করিলেন

ঘোষ সাহেবের একমাত্র কন্যা, অতুল ধনের উত্তরাধিকারিনী মিস্ অমিয়ার সহিত প্রসাদপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার শরৎচন্দ্র সিংহের পুত্র বিলাত প্রত্যাগত উচ্চ শিক্ষিত যুবক সুধাংশুকুমারের অদ্য পরিণয় স্থির হইয়াছিল। তাঁহার আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে কন্যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ঘোষ সাহেবের কল্পনা একেবারে গোলমাল হইয়া গেল।

ঘোষ সাহেব একেবারে সমাজ পরিত্যক্ত না হইলেও, অনেক হিন্দু তাঁহার সমাজ বিগর্হিত আচরণের জন্য তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি অবশ্য অবগত ছিলেন যে, অর্থে প্রায় সকল বিঘ্ন, সকল দোষ বিদূরিত হয় ; তথাপি তিনি শরৎবাবুর পুত্রের সহিত নিজ দুহিতার পরিণয় সম্বন্ধে যথেষ্ট আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, সে জন্য ভবিষ্যতে তাঁহাকে কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। তিনি প্রথম নির্বাচিত হেমেন্দ্রনাথের প্রণয়

স্মৃতি তনযার হৃদয-মন্দিব হইতে অপসাবিত কবিযা তৎপবিবর্তে সুধাংশুকুমাবকে অমিযাব প্রণয-সুধাংশু কিবণতলে সংস্থাপিত কবিবাব জন্যই যে কৌশল অবলম্বন কবিযাছিলেন, তাহাবই ফলে সুধাংশুকুমাবকে জামাই পদে ববণ কবিবাব পথ সুগম হইযাছিল। ঘোষ সাহেব অমিযাব বিবাহেব জন্য এখন চিন্তিত নন। তিনি জানেন অন্য সৎপাত্রেবও অভাব হইবে না। কিন্তু সুধাংশুকুমাবেব এই কল্পনাতীত ভীষণ পবিণাম দর্শনে তিনি যাবপব নাই দুঃখিত হইলেন।

(তৃতীয় পবিচ্ছেদ)

শোকেব প্রথমবেগ সংববণ কবাই সর্বাপেক্ষা দুকহ, উহা একবাব সহিতে পাবিলে আবাব সব সহিযা যায, হৃদযেব ভীষণ আলোডনেব আবাব নিবৃতি হয। অবশেষে কাল তাহাব পবম করুণাময হস্তে সকল দুঃখ, শোক, তাপ, হবণ কবে।

কালপ্রবাহে শবৎবাবুব শোকেব পবিমান অনেক পবিমাণে প্রশমিত হইযাছে, কিন্তু একটা অপবিহার্য অথচ অকিঞ্চিৎকব পবিতাপ এখনও সমযে সমযে তাঁহাকে যাতনা প্রদান কবিযা থাকে তিনি প্রাণাধিক প্রিযপুত্রকে মৃত্যুব পূবে একবিন্দু ঔষধ দিতে পাবেন নাই, উৎকট হলাহলে তাঁহাব প্রাণ বিযোগ ঘটিযাছে ইহা মনে হইলে তাহাব প্রাণ নিতান্ত ব্যাকুল হয, এবং এক গুরুতব সন্দেহ মনোমধ্যে উপস্থিত হইযা থাকে। নির্বিবাদী, নিবীহ ভদ্রলোক শবৎবাবু এই অদ্ভুত মৃত্যুব কোন সন্তোষজনক কাবণ নির্ণয কবিতে না পাবিযা, ইহাব মূলে কোনও গুপ্ত বহস্য নিহিত আছে কিনা জানিবাব জন্য কলিকাতা পুলিশেব সুপ্রসিদ্ধ সুনিপুণ ডিটেকটিভ দেবেন্দ্রনাথ মিত্রকে অনুসন্ধানার্থ নিযুক্ত কবিলেন।

সন্ধ্যা হইতে অল্পই বিলম্ব আছে অস্তন্মুখ সূর্যেব কনক প্রবাহে চাবিদিকেব বৃক্ষ, অট্টালিকা হাবদ্রাবঞ্জিত দেখাইতেছে। শবৎবাবু একাকী ধীবে ধীবে বাটীব সম্মুখস্থ উদ্যান মধ্যে পদচাবণ কবিতেছিলেন একজন প্রৌঢ ভদ্রলোক তাঁহাব উদ্যানেব ফটক মধ্যে প্রবেশ কবিলেন শবৎ বাবু সম্ভাষণ পূবক তাঁহাকে বাটীতে লইযা গিযা সম্মুখেব মাববেল শোভিত সোপান সন্নিহিত বাবাণ্ডায একখানি কাষ্ঠাসনে উপবেশন কবিতে বলিযা স্বযং আব একখানি টানিযা নিকটে বসিলেন পবে সোৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা কবিলেন কি মহাশয! কিছু সুবিধা কবিতে পাবিলেন কি?"

এই আগন্তুকেবই নাম দেবেন্দ্রনাথ মিত্র। তিনি বলিলেন 'সুবিধা দূবেব কথা, আমি ক্রমেই নিকৎসাহ হইতেছি বিজ্ঞ চিকিৎসকগণেব কথা মিথ্যা বলিতে পাবি না তবে মৃতদেহ বিশেষরূপে পবীক্ষিত হয নাই, মনে হয এই মৃত্যু স্বাভাবিক হইলেও হইতে পাবে। আব যদি অনুমান সত্যই হয তবে সম্ভবতঃ অজ্ঞাতে আহায দ্রব্যেব সহিত কোনও বিষাক্ত দ্রব্য উদবস্থ হইযা থাকিবে।"

না মহাশয, তাহা সম্ভব নয কোন খাদ্য দ্রব্যেব সহিত যে বিষ উদবস্ত হয নাই বলিযাই এখনও নিশ্চেষ্ট হই নাই জানিবেন। আচ্ছা, সুধাংশুবাবু নিযমিতরূপে কোন ঔষধ ব্যবহাব কবিতেন কি, বা আপনাব বাটীতে এমন কোন বিষাক্ত ঔষধ এমনভাবে ছিল কি যাহা ভ্রম বশতঃ তিনি খাইযা ফেলিতে পাবেন বলিযা অনুমান হয?"

"না, সে কোন ঔষধ ব্যবহাব কবিত না। আমাব বাটীতে কোন ঔষধ বাখি না, এমন কি বাটীব কোন লোক আফিং পর্যন্ত ব্যবহাব কবেন না। আব আপনি যে বিমলাচবণকে সন্দেহ কবিতেছিলেন, উহা অনর্থক। তাহাকে আমি বেশ জানি, সে অতি সচ্চবিত্র এবং সুধাংশু-ব

অকপট সুহৃদ। তদ্ভিন্ন এ ভয়ানক পাপ কার্যে তাহার লাভ কিছুই নাই। যাহা হউক, আপনি এখন কি স্থির করিয়াছেন। বিমলাচরণের সন্ধান না করিয়া এ বিষয়ে নিরস্ত হইবেন না মনে করিয়াছেন কি ?"

"আর একটু দেখিব, এতটা পরিশ্রম কি একেবারে বিফল হইবে ? হইতে পারে বিমলাচরণ নিরপরাধ, কিন্তু অকপট সুহৃদকেও কখন কখন শত্রুর অপেক্ষা গর্হিত কার্য করিতে দেখা গিয়া থাকে ! যখন ঠিক সেই দিবস তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিরুদ্দেশ হন এবং আপন কাজ কর্ম ত্যাগ করিয়া এখনও সেই অবস্থায় রহিয়াছেন, তখন একবার অন্ততঃ তাঁহাকে বাহির করা প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন একবার অন্য পথেও একটু অনুসন্ধান করিব মনে করিয়াছি। আমাকে এখন একবার সুধাংশুবাবুর ঘর, বাক্স, আলমারি প্রভৃতি দেখাইতে হইবে।"

সচরাচর যে সকল হত্যাকাণ্ড সভ্যজনপদে সর্বদা পরিলক্ষিত হয়, প্রেম, অর্থ ও ক্রোধই অধিকাংশ স্থলে তাহার মূল কারণ। দেবেন্দ্রনাথ একে একে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন ; হতাশ প্রেমের অসহ্য হৃদয় বেদনা, বা অর্থলাভের দুর্দমনীয় লালসা কিংবা দুর্দম ক্রোধের অপবিত্যাজ্য পরিণাম এই নৃশংস কাণ্ডের মধ্যে নাই। অনেক সময় গুপ্ত লিপি ও ডায়েরির সাহায্যে অনেক গোপনীয় জটিল হত্যারহস্যের মূল সূত্র পাওয়া যায়। সুধাংশুকুমার বিলাত প্রত্যাগত পাশ্চাত্য শিক্ষিত নব্যযুবক, অতএব তাঁহার দৈনন্দিন লিপি থাকার খুবই সম্ভাবনা। এ পর্যন্ত চেষ্টা করিয়া দেবেন্দ্রবাবু যাহার কোনও সূত্র পান নাই, গোপনীয় ডায়েরির সাহায্যে যদি তাহার কোন সূত্র ধরিতে পারেন, এই আশায় তিনি সুধাংশুকুমারের ঘর অভিপ্রায় জানাইলেন।

(চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

শরৎবাবু দেবেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া উপরের যে ঘরে সুধাংশুকুমার সর্বদা বসিতেন দাঁড়াইতেন, তথায় লইয়া গিয়া তাঁহার আলমারি, ড্রয়ার, বাক্স প্রভৃতি দেখাইয়া বলিলেন, "মহাশয় ! আপনার যাহা যাহা ইচ্ছা বেশ করিয়া দেখুন। আমি আর এখানে ও সকল দেখিতে পারিতেছি না। আমি পার্শ্বের ঘরে বসিতেছি, যখন যাহা প্রয়োজন হয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন।"

বিচিত্র আলমায়রায় কত মূল্যবান গ্রন্থ ; দেওয়ালে কত ফটোগ্রাফ, কত প্রবাসের-স্মৃতি চিহ্ন, টেবিল চেয়াব যেখানে যেমনটি ছিল ঠিক রহিয়াছে। 'কর্নার র‍্যাকে' সযত্ন সংগৃহীত ক্ষুদ্র বৃহৎ বিচিত্র সংগ্রহ 'এ্যালবামে' কত দেশ বিদেশের ছবি, কত দেশীয় বিদেশীয় বন্ধুর স্বহস্ত গৃহীত ফটোগ্রাফ ! সকলই ঠিক রহিয়াছে। কক্ষের সমস্ত বস্তুই যেন সুধাংশু-আসে উৎকণ্ঠিতভাবে চাহিয়া রহিয়াছে। কিন্তু হায়, কোনও পদার্থ সামান্য ইঙ্গিতেও দেবেন্দ্রনাথকে হত্যাকারীর সন্ধান বলিয়া দিল না।

দেবেন্দ্রনাথ পীড়িত হৃদয়ে সকল স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে একটি টানার মধ্যে কতকগুলি পত্র পাইলেন। একে একে সকলগুলি পাঠ করিলেন। এই সকল পত্রের কতকগুলি ওয়াল্‌টার ও চাল্‌স্ এলফ্রেড্ কর্তৃক লন্ডন হইতে লিখিত ; অবশিষ্টগুলির মধ্যে গোবিন্দলাল ঘোষ, (ঘোষ সাহেব) সুধীররঞ্জন মিত্র, রাধারমণ দত্ত ও বিমলাচরণ বসুর স্বাক্ষরিত কয়খানি ; অবশিষ্ট দুই খানি পত্রের লেখিকা মিস্ অমিয়া ঘোষ।

দেবেন্দ্রনাথ এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমেই জানিয়াছিলেন, বিমলাচরণ ও রাধারমণ

মৃত যুবকের বন্ধু। তিনি রাধামরণবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিমলাচরণ বাবুর সন্ধান না পাওয়ায়, বিশেষতঃ ঘটনার দিবস হইতে তিনি নিরুদ্দেশ, একথা জানিয়া মনে মনে তাঁহার উপর কেমন একটু সন্দেহ হইয়াছিল, হয়ত বা সে কপট বন্ধু, হত্যা রহস্যে জড়িত থাকিতে পারে। যাহার বিশেষ কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সামান্য কারণও সে স্থলে প্রবল বলিয়া মনে হয় দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন, সর্বাপেক্ষা শেষ পত্র যাহা সুধাংশুকুমারের হস্তগত হইয়াছিল, তাহা বামাচরণবাবুর স্বাক্ষবিত ইংরাজি পত্র। পত্রখানির অনুবাদ এই,—

২৮ নং ফুলবাগান লেন,
তারিখ ১৬ এপ্রিল, বেলা ৪টা।

প্রিয় সুধাংশু,

আমাব নিতান্ত দুর্ভাগ্য, আমি তোমার বিবাহোৎসবে যোগ দিতে পারিতেছি না, এ জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। বাঁকিপুব হইতে এইমাত্র টেলিগ্রাফ সংবাদ আসিয়াছে যে সেখানে আমার ভগিনীপতির অকস্মাৎ কঠিন পীড়া হইয়াছে। আমাকে অবিলম্বেই সেখানে যাইতে হইবে। আমার এখন এমন সময নাই যে, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি। ৫৷৷টাব মেলেই যাত্রা করিব।

প্রেরিত উপহার বাক্সটি আশা কবি এই দরিদ্র বন্ধুর প্রণয়োপহার স্বরূপ গ্রহণ করিযা সুখী করিবে। কতদিনের কত সাধ ছিল, তাহা আমার ভাগ্যে মিটিল না। ভবসা করি অমিয়াকে আমার কথা স্মরণ কবিয়া দিতে ভুলিবে না।

হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে প্রার্থনা করি, তোমাদের নূতন জীবন সুখময় ও গৌরবপূর্ণ হউক এবং ঈশ্বরের মঙ্গলাশীর্বাদ তোমাদের উপব বর্ষিত হউক।

তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী—বিমলা।"

দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে যে ক্ষীণ আশার আলোক মিটিমিটি জ্বলিতেছিল এই পত্র পাঠে তাহাও নির্বাপিতপ্রায় হইল। তিনি শরৎবাবুব অনুমতি ক্রমে পত্রখানি সঙ্গে লইযা বিদায় হইলেন।

পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ তাঁহাব মনে হইল,—এই যে উপহারেব বাক্স, কে জানে উহার ভিতর কি ভয়ানক জিনিষ ছিল। ইউরোপ ও আমেবিকায়, পার্শেলের মধ্যে বিষের ও ক্লোরফর্মের সাহায্যে এবং আবও কত অদ্ভুত ও বৈজ্ঞানিক উপাযে নবহত্যার সংবাদ মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে দেখা যায়। বুদ্ধিমান, শিক্ষিত বিমলাচরণ সেই প্রকাব কোন বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করেন নাই ত! তিনি এই প্রকার চিন্তা কবিতে কবিতে স্থির করিলেন, বাঁকিপুর যাইয়া বিমলাচরণেব সন্ধান করিবেন। কিন্তু অগ্রে তাঁহার ভগিনীপতির নাম জানা চাই!

দেবেন্দ্রবাবু ফুলবাগান লেনে বিমলাচরণের বাসায় গিযা দেখিলেন, তাহার ঘরে তালা বন্ধ! বাসার অন্যান্য ভদ্রলোকদিগকে জিজ্ঞাসা করায় কেহই বিশেষ কিছু বলিতে পারিলেন না। কেবল মাত্র জানিতে পারিলেন তাঁহার বাটী বানাঘাটে; বাঁকিপুরে তাঁহার যে ভগিনীপতি আছেন, তিনি সেখানকার আদালতের উকীল নাম কি—সরকার।

দেবেন্দ্রবাবু অতঃপর বাঁকিপুর চলিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেখানে অল্পায়াসেই বিমলাচরণবাবুর ভগিনীপতির সন্ধান পাইলেন। তাঁহাব নাম কালীপ্রসন্ন সরকার। দেবেন্দ্রবাবু আত্মপরিচয গোপন করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে যাহা জানিলেন, তাহাতে বড়ই

বিস্মিত হইলেন ! কালীপ্রসন্নবাবু বলিলেন ইতিমধ্যে তাঁহার কোনও কঠিন পীড়া হয় নাই বা তিনি বিমলাচরণবাবুকে কোনও টেলিগ্রাফ করেন নাই !

টেলিগ্রাফ আফিসে টেলিগ্রাফ করা সম্বন্ধে ঠিক সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে বিবেচনা করিয়া দেবেন্দ্রবাবু সেখানে অনুসন্ধান লইয়া জানিলেন, ঐ নামে কোনও টেলিগ্রাফ পাঠান হয় নাই ! ইহা শুনিয়া তাঁহার সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, বিমলাচরণের পত্র মিথ্যা। তিনি যে কোন টেলিগ্রাফ পান নাই ইহা যখন সত্য, তখন তিনি নিশ্চয়ই দোষী, নচেৎ প্রিয় সুহৃদকে এ সকল মিথ্যা কথা লিখিবেন কেন ?

(পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

বিমলাচরণের দ্বারা এই খুনের কোনও কারণই দেখিতে না পাইলেও, তাঁহার বিরুদ্ধে এক্ষণে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এরূপ জটিল হত্যা রহস্যের নিরুদ্দিষ্ট নায়কের বিরুদ্ধে প্রথমে ইহা অপেক্ষা আর অধিক প্রমানের আশা করা যায় না। অতঃপব তাঁহাকে কোন গতিকে একবার গ্রেপ্তার করিতে পারিলেই অবশিষ্ট প্রমাণাদি সংগ্রহ হইতে পারিবে, এইরূপ মনে করিয়া দেবেন্দ্রনাথ বিমলাচরণেব নামে ওয়ারেন্ট বাহির করিবার জন্য সেই দিনই কলিকাতায় ফিরিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া দেবেন্দ্রবাবু পুলিসকোর্ট হইতে আবশ্যকীয় ওয়ারেন্ট গ্রহণ করিয়া রাণাঘাট গমন করিলেন। বিমলাচরণ এখানে আসিয়াছিলেন কিনা স্থানীয় পুলিসের সাহায্যে প্রথমে গুপ্তভাবে তাহার সন্ধান লইলেন। যখন জানিতে পারিলেন, তিনি প্রায় মাসাধিক কাল এখানে আসিয়াছেন, তখন তিনি দুইজন পুলিস কর্মচারীকে ছদ্মভাবে বাটীর বাহিরে থাকিতে বলিয়া স্বয়ং প্রকাশ্যভাবে তাঁহার বাটীতে গমন করিলেন,—

"মহাশয়, বিমলাচরণবাবু বাটীতে আছেন কি ?"

"বাটীর মধ্যে আছেন ; তিনি পীড়িত, প্রায় একমাস জ্বরে ভুগিতেছেন। অদ্য পথ্য পাইয়াছেন।"

"তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ করা বিশেষ প্রয়োজন, অনুগ্রহপূর্বক একবার তাঁহাকে ডাকিয়া দিন।"

"তিনি শয্যাগত, উঠিয়া নীচে আসিবার ক্ষমতা নাই।"

"যদি তিনি একান্ত না আসিতে পারেন, তবে আমাকে একবার তাঁহার নিকট লইয়া চলুন।"

বৃদ্ধ প্রথমে বিরক্ত হইয়া দেবেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবে আপত্তি করিতেছিলেন ; কিন্তু যখন তিনি পুলিসের লোক বলিয়া পরিচয় পাইলেন, তখন আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ বিমলাচরণকে সংবাদ দিয়া, পরে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া উপরে গেলেন ; এবং, রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিতে বলিলেন।

বিমলাচরণবাবু সুন্দর যুবা পুরুষ, রোগে তাঁহার শরীর জীর্ণ ও শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া দেবেন্দ্রবাবুর মনে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন,—

"মহাশয়, আপনারই নাম বিমলাচরণ দত্ত ?"

"আজ্ঞা হাঁ, আমারই নাম। আমাকে আপনার কি প্রয়োজন ?"

"আপনার যেরূপ শরীরের অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে এক্ষণে আপনাকে বলিতে ইচ্ছা না হইলেও, আমরা পুলিসের কর্মচারী, কর্তব্যানুরোধে আপনাকে বড় অশুভ সংবাদ দিতে

হইতেছে। কলিকাতার রায় শরৎচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের পুত্র সুধাংশুকুমার সিংহের হত্যার অভিযোগ আপনার উপরেই আরোপিত হইয়াছে। সে সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণাদিও সংগ্রহ হইয়াছে। আপনার কোন কথা বলিবার আছে কি?"

বিমলাচরণ বসিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িয়া উপাধানে মুখ ঢাকিলেন। কিয়ৎকাল পরে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন,—

"মহাশয়! সুধাংশু যে পৃথিবী ছাড়িয়া গিয়াছে তাহা আপনার মুখে এই প্রথম শুনিলাম! সুধাংশু আমার সহোদর অপেক্ষা প্রিয়, আমি তাহাকে হত্যা করিব!' তাঁহার ন্যায় পরোপকারী দেবচরিত্র লোককে কেহ হত্যা করিতে পারে, সে বিশ্বাসও আমার মনে স্থান পায় না।"

"সুধাংশুবাবুর মৃত্যুসংবাদ আমার নিকট প্রথম শুনিলেন, সত্য হইতে পারে। কিন্তু আপনি যে দোষ শূন্য তাহার কি প্রমাণ আছে?"

"আপনাদের নিকট অসম্ভবও সম্ভব! যাহার মৃত্যু দেখিলাম না বা শুনিলাম না, তাহাকে আমি হত্যা করিলাম, ইহা কি প্রকারে সম্ভব তাহা আপনারাই বলিতে পারেন।"

"মহাশয়ের সন্দেহ দূর করিতেছি; আচ্ছা, দেখেন দেখি এ পত্র কাহার লেখা?" দেবেন্দ্রনাথ জামার পকেট হইতে সেই পত্রখানি বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন।

বিমলাচরণবাবু পত্রখানি পাঠ করিয়া বলিলেন,—"এ পত্র কাহার লেখা আমি জানি না।"

দেবেন্দ্রবাবু তখন বিমলাচরণের স্বাক্ষরিত অপর পত্রগুলি দেখাইয়া বলিলেন,—

"এ পত্রগুলিও কি আপনি লেখেন নাই? সকল গুলিই ত এক হস্তের লেখা।"

"হাঁ, এগুলি সবই আমার লেখা। এ পত্রখানিতেও লেখার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতেছি। কিন্তু কে আমার নাম দিয়া এরূপ জাল চিঠি লিখিয়াছে তাহা আমি জানি না।"

"কাহাকেও কিছু না বলিয়া হঠাৎ আপনার এখানে চলিয়া আসিবার কারণ কি?"

"আমার খুল্লতাতের নাম দিয়া, কোনও দুষ্ট লোক আমার মাতাঠাকুরাণীর কঠিন পীড়া হইয়াছে, টেলিগ্রাফে এই মিথ্যা সংবাদ আমাকে প্রেরণ করে। যখন টেলিগ্রাফ পাই, তখন বাসায় কেহ ছিল না, সুতরাং কাহাকেও না বলিয়াই আমি তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসি। তৎপরে এখানে আসিয়া অবধি জ্বরে ভুগিতেছিলাম, সুতরাং যাইতে পারি নাই।" সেই টেলিগ্রাফখানি বাহির করিয়া দেবেন্দ্র বাবুর হস্তে দিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ বিমলাচরণের শারীরিক অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন এ অবস্থায় উহাকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া কঠিন। তিনি দুই চারি দিন রাণাঘাটে থাকিয়া, বিমলাচরণ বাবু কিছু বল লাভ করিলেই তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন স্থির করিয়া, রাণাঘাটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বিমলাচরণকে পুলিশ নজরবন্দী রাখিল।

(ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

তিন দিবস অতিবাহিত হইল, অদ্য দেবেন্দ্রনাথ বিমলাচরণ বাবুকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবেন মনে করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার নামের একখানি রেজেষ্ট্রীপত্র কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রেরিত হইয়া আসিল। তিনি নিম্নলিখিতরূপ পাঠ করিলেন;—

"দেবেন্দ্রবাবু, শুনিয়াছি আপনি একজন প্রসিদ্ধ ডিটেকটিভ। সুধাংশু বাবুর 'কেশে' আপনি যথেষ্ট বাহাদুরি দেখাইয়াছেন, হয়ত আমার জন্যও ভবিষ্যতে এই প্রকার বাহাদুরি

দেখাইবেন। যাক্ এখন সে কথা। এক্ষণে আপনাকে নিবেদন, আর নিরপরাধ নিরীহ ভদ্রলোক বিমলাচরণবাবুকে অনর্থক পীড়ন করিবেন না। তিনি এ রহস্যের কিছুই জানেন না। যদি কেহ সুধাংশু বাবুর হত্যাকারী থাকে, তবে সে আমি। আমার চেষ্টায়, আমারই চক্রান্তে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আমার নিজের স্বার্থের জন্য, তিনি জীবিত থাকিলে পাছে আমার সকল সুখের পথ অবরুদ্ধ হয় এইজন্য একাজ করিয়াছি। বিমলাচরণ বাবু যে টেলিগ্রাফ পান, তাহা জাল। টেলিগ্রাফ অফিসের একজন লোককে কিছু অর্থ দিয়া তাহার দ্বারা একখানা ফর্মে একটা ছাপ মারিয়া ও ঐরূপ লেখাইয়া আমিই উহা পাঠাইয়াছিলাম। যে উপহারের কথা চিঠিতে পড়িয়াছেন, তাহা আমার দ্বারাই প্রেরিত হয়। ঐ উপহার আর কিছুই নহে একটি গরলপূর্ণ অমৃত ভাণ্ড!

"আমাকে ধরিবার চেষ্টা বৃথা হইবে, কারণ যখন আপনি এ পত্রখানি পাইবেন তখন আমি এ বিশাল ভারতবর্ষের বাহিরে গিয়া পড়িব। আমি আমার নাম লিখিতেও ভয় করি না জানিবেন। ইতি—"

মিস্ অমিয়া ঘোষ।"

এই পত্র পঠে দেবেন্দ্রবাবু স্তম্ভিত হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী টেলিগ্রাফ অফিসে গমন করিয়া জানিলেন, প্রকৃতই সেখান হইতে কোন টেলিগ্রাম যায় নাই। তখন অবিলম্বে কলিকাতায় রওনা হইলেন। শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছিয়া একেবারে শরৎবাবুর বাটীতে গমন করিলেন। শরৎবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, কোনও কথা বলিবার পূর্বে তাঁহার নিকট অনুমতি লইয়া সুধাংশুকুমারের পরিচ্ছদাগারে প্রবেশ করিলেন। তথায় অন্যান্য বিবিধ উৎকৃষ্ট সামগ্রীর মধ্যে একটি অতি উৎকৃষ্ট মেহগ্নী বাক্স দেখিতে পাইলেন। খুলিয়া দেখিলেন, 'চামেলী', 'কুন্তলীন' হইতে আরম্ভ করিয়া কলগেট, গ্রসস্মিথ, লুবিন্, গস্নেলের 'হোয়াইট রোজ,' ক্যাশমিয়াব বোকের, কিছুই তাহাতে অভাব নাই। দেখিতে দেখিতে একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র মনোরম কাগজের বাক্স তাঁহার চক্ষে পড়িল, দেখিলেন তাহার উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইংরাজী অক্ষরে লেখা আছে, 'এই সামান্য উপহার সুধাংশুকুমারকে সাদরে প্রদত্ত হইল :—বিমলা।' হাতে লইয়া দেখিলেন উহাব মধ্যে এক শিশি 'দেলখোস' অল্প মাত্র খরচ হইযাছে। তিনি বুঝিলেন ইহাই সেই গরলপূর্ণ সুধাভাণ্ড ; উহারই আঘ্রাণে সুধাংশুকুমার ইহধাম পবিত্যাগ করিয়াছেন। তখন দেবেন্দ্রনাথ ঐ শিশি লইয়া রাসায়নিক পরীক্ষার্থে মেডিক্যাল কলেজে চলিলেন। পরীক্ষায় জানা গেল যে ঐ শিশির ভিতরস্থিত তরল পদার্থ প্রাণ মনোবিমোহন 'দেলখোস' নহে, উহা প্রাণহারী উৎকট বিষ!

দেবেন্দ্রনাথের অনেক সন্দেহ দূর হইল, এইবার অমিয়ার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য তৎক্ষণাৎ একখানি ঠিকাগাড়ী ভাড়া করিয়া ঘোষ সাহেবের বাডী চলিলেন, ঘোষ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র, তিনি তাড়াতাডি চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমি এই মাত্র আপনার নিকট লোক পাঠাইতেছি। শরৎবাবুব ন্যায় আমাবও হরিষে বিষাদ হইয়াছে। আমার বড়ই দুরদৃষ্ট, গত সোমবার আমার কন্যা অমিয়া বিবাহের পূর্বদিন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াও তাহার কোন সন্ধান করিতে পারি নাই। আপনাকে তাহাব অনুসন্ধানের ভার লইতে হইবে। যদি আবশ্যক হয় এই তাহার ফটো লউন।"

এই বলিয়া একখানি সুন্দর কার্ডে আঁটা ততোধিক সুন্দর ফটো পকেট হইতে বাহির করিয়া, ঘোষসাহেব দেবেন্দ্রবাবুর হস্তে অর্পণ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন এক

নিরুপমা সুন্দরীর আলেখ্য !

দেবেন্দ্রনাথ পরে বহু চেষ্টায় ফরাসী অধিকৃত কোচিন হইতে অমিয়ার প্রণয়ী হেমেন্দ্রনাথের সহিত তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া থাকেন।

হরিহর শেঠ

উইল

১

সেদিন প্রাতঃকালে জলযোগ করিয়া উনি যখন হাসপাতালের কাজে যা'বার উদ্যোগ করিতেছিলেন, আমি তাঁকে বলিলাম, "আমি আর ত পারিনে। আজ তোমার খাবারের লুচি কম পড়ে গেল, সেই দুপুরের আগে ত আর ফিরবে না, না খেয়ে কেমন করে থাকবে ! রোজই বলি চাল ডাল ঘি ময়দাটা কিছু বেশী করে কিনে রেখো। তুমি ভাবো আমার হাতে খাবার জিনিস এলেই সব বিলিয়ে দিই।"

আমার স্বামী সহাস্যে বলিলেন,—"স্বয়ং অন্নপূর্ণাকে যখন ঘরে বেঁধেছি, এ সন্দেহ ত হতেই পারে ; কিন্তু দেবীর কৃপায় যে কখন অন্নের অভাব ভোগ করবো না, এ ভরসাটা পূর্ণ মাত্রাতেই আছে। ভয় কেবল দেবীর অনুচর চাকরবাকরগুলা আর ঐ বামুনটাকে।"

বলা বাহুল্য আমার নাম শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী, নামটা লইয়া স্বামী একটা বেশ পরিহাস করিয়া ফেলিলেন। সেদিন আমার মনটা মোটেই পরিহাস গ্রহণোপযোগী ছিল না ; প্রাতে শয্যাত্যাগ করিবামাত্রই যখন ঝি আসিয়া বলিল, কাল যে কয়লা ও চাল কেনা গিয়াছিল তাহা ফুরাইয়া গেছে, তখন স্বামীর উপর বড় রাগ হয়েছিল। তার উপর যখন মেথরটা তাহার প্রাপ্য তিন মাসের মাহিনার মধ্যে অন্ততঃ একমাসের টাকাটার জন্য তাগিদ দিতে লাগিল, তখন আর থাকিতে পারিলাম না। সংসারের একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করিবার জন্য উঁহাকে বলিবার জন্য আসিতে হইয়াছিল। কিন্তু কথাটির সূচনামাত্রেই স্বামীর ঐ প্রকার ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া বড় রাগ হইয়া পড়িল।

আমি বলিলাম—"একটা কাজের কথা পাড়লেই তোমার যত ঠাট্টা রসিকতা এসে পড়ে। কতবার বলেছি, আমার জ্যাঠামশায়ের কাছে কিছু টাকা চাহিলে, সংসারটি বেশ গুছাইয়া লইতে পারি। আর তোমার ডিস্‌পেনসারিটা চৌরঙ্গির সেই বাড়িটাতে নিয়ে যেতে পার। সংসারে কিসে কি যে হয় তার দিকে তোমার মোটেই নজর নেই।"

স্বামী এবারে আমার মেজাজটা বেশ বুঝিয়া খুব রাগের সঙ্গে বলিলেন— "আবার ঐ কথা। আমি আমার উন্নতির জন্য পরমুখাপেক্ষী হব না। একথা জানিয়াও তুমি কেন আমাকে জ্বালাতন কর ? চৌরঙ্গীতে ওষুধের দোকান খুলতে হয় ত, তার উপায় আমি দেখবো।"

আর একবার জেঠামশায়ের নিকট কিছু টাকা চাহিবার প্রস্তাব করায় আমি তিরস্কৃত হইয়াছিলাম, তাহা তখন আমার মনে ছিল না। নূতন কলহের সূত্রপাত দেখিয়া কিয়ৎকাল স্তম্ভিত থাকিতে আমি স্বামীর পদধারণ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু মুখ উঠাইয়া দেখিলাম তিনি ঘরে নাই। বড় কষ্ট হইল, কেন কথাগুলা বলিতে গেলাম ! আজ দেড় বৎসর জ্যাঠামহাশয় আমাকে বিবাহ দিয়াছেন ; এই সুদীর্ঘকালে সকলই ত জানিতে

পারিয়াছি। স্থির আয়, কাঁকুড়গাছির হাসপাতালে ডাক্তারি করায় মাসিক একশত টাকা ব্যতীত ত আর কিছুই নয়।

২

সেদিন উঁহার সকালের আহারটা সুবিধামত হয় নাই, স্বয়ং রন্ধনশালায় গিয়া খাবার প্রস্তুত করিলাম এবং নিজে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইব বলিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। স্বামী-স্ত্রীর কলহে জয়মাল্য প্রায়ই স্ত্রীকণ্ঠ সংলগ্ন হয় সত্য, কিন্তু স্ত্রীকেই তাহার অনুতাপটা পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিতে হয়। এটা বোধ হয় আমাদের স্ত্রী স্বভাবসুলভ একটা দুর্বলতার ফল।

বারোটা বাজিয়া গেলে স্বামী ফিরিলেন। বাহিরে রোগী দেখিতে তাঁহার প্রায়ই যাইতে হয় না, অন্যদিন এগারোটার পূর্বেই তিনি বাসায় উপস্থিত হন। মনে বড় কষ্ট হইল, একটা কথা বলিলেই স্বামী বলেন, "তুমি বোঝ না।" সাংসারিক অব্যবস্থা দেখিয়া বিবাহের পূর্বে যখন জ্যাঠামহাশয়কে একটা চাকর ও একটা বামুন রাখিতে বলিতাম, তখন তিনিও বলিতেন, "তুই বুঝিস নে।" আমার বোধশক্তির উপর বয়োবৃদ্ধ গুরুজনগণের এই সর্ববাদিসম্মত সন্দেহ কি সত্য?

আমি বিছানায় শুইয়া বালিশে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মনে হইল সত্যই আমি কিছুই বুঝি না, আজ আমারই মুখরতায় স্বামী বিরক্ত হইয়া বাসায় আসিতেছেন না।

আমার শৈশবের ধাত্রী বামার মা আসিয়া বলিল, —"খাবার তৈয়ার হয়েছে, তোর খাবার কি উপরে আসবে? বাবু ত এখনো এলেন না।"

আমি বলিলাম— "একটু পরে খাবো।" উত্তর শুনিয়া বুড়ি মনে মনে কি বকিতে বকিতে নীচে নামিয়া গেল।

৩

বেলা তিনটার সময় বেহারা আসিয়া একখানা চিঠি আমার হাতে দিয়া গেল। শিরোনামায় স্বামীর হস্তাক্ষর দেখিয়া, তাড়াতাড়ি সেখানা খুলিয়া দেখিলাম, চিঠি তাঁহারই বটে। চিঠিতে লেখা ছিল,—

প্রাণাধিকাসু,

মনোহরপুরের মহারাজার পীড়ার চিকিৎসার জন্য শ্যামলালবাবুরা আজ পশ্চিমে যাচ্ছেন। আমাকে তাঁর সহকারী হয়ে যেতে হচ্ছে। ফিরতে আট দশ দিন দেরি হ'তে পারে।

কানাই বেহারার কাছে খরচের টাকা রহিল। ইতি—

তোমার শ্রীনলিনী।

পুনঃ—প্রাতে তোমার মামা ভুবনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি বল্লেন, আজ দিন চারেক হল, কাশীতে তোমার জেঠামশায়ের মৃত্যু হয়েছে।

মাতুল প্রায়ই আমাদের বর্দ্ধমানের বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন, এ খবর কখনও ভুল হতে পারে না। জেঠামহাশয় এক বৎসর ধরিয়া নানা রোগে ভুগিতেছিলেন, এ যাত্রায় যে

তিনি রক্ষা পাইবেন না, তাহা আমরা জানিতেম। তিনিও তাহা বেশ বুঝিয়াছিলেন এবং কাশী প্রাপ্তির আশায় আজ তিন মাস তিনি কাশীবাস করিতেছিলেন।

কিন্তু কি বিপদ। এদিকে স্বামীর আকস্মিক গৃহত্যাগের উৎকণ্ঠা, তা'র উপর পিতৃস্থানীয় জেঠামহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ। আমি সংসার অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। জেঠামহাশয়ের অযাচিত স্নেহেই আমি প্রতিপালিত। শোকে ও অবসাদে আমি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম।

৪

পরদিন কিঞ্চিৎ বিস্তুতর হইয়া শয্যাত্যাগ করিলাম। বৃদ্ধা বামার মা যে কাল বলেছিল "জেঠামহাশয় চিরকাল থাকে না।" ভাবিয়া দেখিলাম, সেটাই আমার এখনকার একমাত্র সান্ত্বনা। গৃহকার্যে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

বেলা দশটার সময় আজও বেহারা একখানি পত্র আমার হাতে দিয়া গেল। ভেবেছি . বাবুর চিঠি। কিন্তু শিরোনামায় হস্তাক্ষর দেখিয়া নিরাশ হইতে হইল তার পর দেখি সেটা রেজিস্টারি চিঠি। তাড়াতাড়ি পত্রটা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম— লেখক কলিকাতার বিখ্যাত এটর্নি সোলোমন কম্পানি। ইংরাজী লেখা পড়িতে ও বুঝিতে পারিতাম, পত্রখানার স্থূল মর্ম এই যে,—জেঠামহাশয় তাঁহার শেষ উইলে আমাকে দুই লক্ষ টাকা দান করিয়া গেছেন। আমার স্বাক্ষরযুক্ত রসিদ পাইলেই, বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ঐ টাকা আমাকে বা আমার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনও কর্মচারিকে দিবেন।

পত্রপাঠ করিয়া আমি ত অবাক। জেঠামশায়ের ভূসম্পত্তি ও নগদ টাকা প্রচুর ছিল তাহা আমি জানিতাম। কিন্তু তাঁহার ন্যায় অতিরিক্ত হিসাবী লোক যে, আপন পুত্রকন্যার অংশ খর্ব করিয়া এতগুলা টাকা আমাকে দিয়া যাইবেন, তাহা আমি কখন কল্পনাও করিতে পারি নাই। বাহিরের চালচলনের সহিত প্রকৃত মনুষ্যত্বের সম্বন্ধটা যে কত অল্প, জেঠামহাশয়ের ব্যবহারে সেদিন আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম।

বাসায় বিশ্বাসী আত্মীয় কেহই ছিল না। এ সময়ে বাবুও বিদেশে, আজ তিনি উপস্থিত থাকলে এই আকস্মিক সৌভাগ্যে আমরা সেদিন কতই সুখী হইতাম। মাতুলের ঠিকানা জানিতাম, উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহাকে আসিবার জন্য একখান পত্র লিখিয়া দিলাম। দারোয়ানকে বলিয়া দিলাম, সে যেন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়াই আনে

মাতুল বিকালে বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জেঠামহাশয়ের মৃত্যুর আনুপূর্বিক বিবরণ শ্রবণের পর তাঁহাকে সোলোমন কম্পানির চিঠিটা দেখাইলাম।

তিনি বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চিঠিটার আগাগোড়া পড়িয়া বলিলেন,— "অ্যাঁ, দুই লাখ টাকা।" পরমুহূর্তেই একটু সংযত হইয়া একটু কাশিয়া বলিলেন— 'তা হবে না কেন তোমার জেঠামহাশয়কে লোকে কৃপণ বলিত বটে, কিন্তু তা তো ছিলেন না। আর তুমি তাঁর মেয়েদের অপেক্ষাও—

আমি মাতুল মহাশয়ের কথায় বাধা দিয়া বলিলাম—"সে সকল কথায় এখন সময় নষ্ট ক'রে কাজ নেই। আমি বেঙ্গল ব্যাঙ্ক হ'তে জেঠামহাশয়ের প্রদত্ত দুই লক্ষ টাকা বাহির করিতে চাই। আপনিই আমার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি বলিয়া এই চিঠিটা ব্যাঙ্কের কর্তাকে লিখেছি। অবিলম্বে আপনি ব্যাঙ্কে সন্ধান লউন। আজ না হয়, অন্ততঃ কাল সব টাকা আমার নিশ্চয় পাওয়া চাই।"

আর দ্বিরুক্তির অবকাশ না দিয়া, পত্রসহ মাতুল মহাশয়কে বিদায় করিয়া দিলাম।

যাইবার সময় বলিয়া দিলাম চৌরঙ্গীতে হার্মট্‌ কোম্পানির যে একটা বড় বাড়ি বিক্রয় আছে, প্রত্যাগমন কালে তাহার মূল্যাদি সম্বন্ধে সকল ব্যাপার যেন তিনি ভাল করিয়া জানিয়া আসেন।

৫

পরদিন দ্বি প্রহরে মাতুল মহাশয় সহাস্যে দুই তাড়া নোট্‌ আমার হাতে দিয়া কহিলেন—"এই লও তোমার টাকা, দুই লক্ষ টাকাই আছে। গুনিয়া সাবধানে রাখিয়া দাও.—টাকাগুলার কোম্পানির কাগজ করিলে হয় না কি?"

আমি সে প্রশ্নেব কোন উত্তর না দিয়া বলিলাম, "টাকা দিয়াই আপনার নিষ্কৃতি নাই। অনেক কাজ আছে। আচ্ছা—চৌরঙ্গীর সেই বাড়ী খানাব সন্ধান করিয়াছিলেন কি?"

মাতুল বলিলেন,— "হ্যাঁ কালই তা'র দর দস্তুর শেষ করেছি। সাহেবটা পঞ্চাশ হাজার টাকা চায়। বাডীখানা খুব বড বটে, বাস্তার সেবা বাড়ী, প্রায় নতূন।"

বাড়ীব দাম শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম, কিন্তু সেটা ক্রয় করিতেই হইবে, পঞ্চাশ হাজাব টাকার নোট গুনিয়া মাতুলের হাতে দিয়া বলিলাম, "আপনি বাড়ীখানা আমার জন্য কিনিয়া লউন। দেখবেন কালই যেন লেখাপড়া হয়। আর একটা কথা, বসবাস কবিবার জন্য গঙ্গার ধাবে যদি একটা বাড়ির সন্ধান পান, তবে তাহাবও মূল্যাদির কথা জানিয়া আসিবেন।"

পবদিন চৌবঙ্গীর বাডী ক্রয় করা হইয়া গেল। বারাকপুর নদীর ধাবে একখানা খুব বড বাড়ীরও সন্ধান মাতুল মহাশযেব নিকট জানিলাম। আমরা সকালে সকালে আহাবাদি কবিয়া দু'খানা বাডীই দেখ্‌তে বাহির হইলাম।

চৌরঙ্গীর বাড়ীখানা সম্বন্ধে মামা যাহা বলিয়াছিলেন সবই সত্য দেখিলাম। খুব বড় বাড়ী এবং সম্পূর্ণ নূতন।

মামাকে বলিলাম— "দেখুন আপনার কাজ এখনো অনেক আছে! এই বাডীর নিচেব তলাটা, একটা ভাল সাহেবী ওষুধের দোকানের মত করে দুদিনের মধ্যে সাজিয়ে দিতে হইবে। আর বিক্রয়ের জন্য ঔষধপত্র প্রচুর পরিমাণে গুদামে রাখতে হবে। দেখবেন বাহিরের সাজসজ্জায় ডিসপেনসাবি যেন কোনও সাহেবী দোকান অপেক্ষা হীন না হয়।"

মাতুল বলিলেন— "একটু বিলম্ব করলে হয় না?"

"সে বিলম্ব সহ্য হবে না। দু'দিনের মধ্যে আপনাকে ডাক্তারখানাটি ঠিক করে দিতেই হবে। উপরের ঘবগুলি সাজাইবার জন্য, যে সকল আসবাব-জিনিস আবশ্যক, তাহাব একটা তালিকা আপনাকে দিচ্ছি, কিন্তু যাহাতে কাল না হয় পরশু এগুলোকে সম্পূর্ণ সাজান দেখতে পাই, তাব একটা ব্যবস্থা এখন থেকেই করুন।"

৬

এই সকল কাজ বেলা প্রায় তিনটা বাজিয়া গেল। আমরা আর বিলম্ব না করিয়া বারাকপুরের বাড়ী দেখিতে চলিলাম। চৌরঙ্গীর বাড়ীর জিনিসপত্রের তালিকা পথিমধ্যে প্রস্তুত হইয়া গেল।

বারাকপুরেব বাড়ীটা দেখিলাম অতি সুন্দর। গঙ্গার ধারে খোলা মাঠের উপর এক দ্বিতল

গৃহ। সর্বাপেক্ষা এই বাটী সংলগ্ন বাগানটিকে আমার বেশ লাগিল। যেটি চাহিতেছিলাম, ঠিক তাহাই পাইলাম। কালই যাহাতে বাড়ীখানি ক্রয় করা হয়, তৎসম্বন্ধে মাতুল মহাশয়কে যথোচিত পরামর্শ দিয়া, এ বাড়ীর জন্য যাহা জিনিসপত্র আবশ্যক তাহারও এক তালিকা প্রস্তুত করিলাম।

তালিকা দুইটি মাতুলের হাতে দিয়া বলিলাম— "দেখুন, কাল দুই বাড়ীতেই আসবাব পৌঁছান আবশ্যক, পরশু সাজানো যাবে।"

মাতুল সেই তালিকা দুইটি আদ্যোপান্ত পড়িয়া বলিলেন, —"টাকা খবচ করলে, একদিনেই দুই বাড়ী সাজিয়ে দিতে পারি, কলিকাতা সহরে জিনিস ও লোকের অভাব নাই। তবে একটা কথা, —তোমার ফর্দে সকল জিনিসেবই পরিমাণ এত অসম্ভব বেশী কেন,—কুন্তলীন দুই বাড়ীব ব্যবহারের জন্য মোট পঞ্চাশ শিশি, দেলখোস চল্লিশ শিশি, জাপানী পশমের—।"

আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, —"আপনি বুঝেন না। এইচ বসুর সুগন্ধ দ্রব্য কলিকাতায় কেন—নিতান্ত পাড়াগাঁয়ের ক্ষুদ্র দোকানেও যে পাওয়া যায় তা আমি জানি। কিন্তু ব্যবহাবের সময জিনিষটি আনাইবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করা অপেক্ষা সেটিকে হাতের গোড়ায় রাখা সুবিধাজনক নয় কি ? তা ছাড়া দেখুন, কুন্তলীন দেলখোস ত নষ্ট হবার জিনিস নয়, প্রতি দিনেবই ব্যবহার ইহার আবশ্যক।"

বাড়ী ফিরিতে রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়া গেল। আসিয়া দেখিলাম, স্বামী টেলিগ্রাম করেছেন, আর চারি দিন পরে তিনি কলিকাতায় ফিরিবেন।

বাঁচা গেল। এ কয়েকটা দিন তাঁহার কোন পত্রাদি না পাইয়া বড়ই উৎকণ্ঠিত ছিলাম।

৭

তিন দিনের মধ্যেই অনেক কাজ হইয়া গিয়াছিল, বাড়ী-ঘর সাজানো চাকর বাকর নিয়োগ সবই একপ্রকার শেষ। মাতা ঠাকুরাণী ও বুড়ী বামাব মাকে কাশী পাঠাইবাব জন্য যাহা ব্যবস্থা আবশ্যক তাহাও ইতিমধ্যে শেষ কবিয়াছিলাম। বামাব মা ত কাশীবাসের ব্যবস্থার কথা শুনিয়া কাঁদিয়াই আকুল। সে আমাকে বলতে লাগলো— "আহা তোদের কাছে অনেক আশা কবতাম। এই পোড়া কপালেরই দোষে ভগবান সে আশায় ছাই দিযাছিলেন। তোদের লক্ষ লাভ হোক, আমি কিন্তু এখন বিশ্বেশ্বরেব পাদপদ্মে শুয়ে চক্ষু বুঁজ্‌লেই বাঁচি।"

আমি তাহাকে ধমকাইয়া বলিলাম,—"তুই এখান থেকে একটু যা' দেখি। আমার অনেক কাজ আছে।'

বাস্তবিক সেদিন আমি বড় ব্যস্ত ছিলাম। আজ সন্ধ্যার গাড়িতে উঁহার কলিকাতায় ফিরিবার কথা আছে। আবার আহারান্তে এই বাসায় তালা বন্ধ করিয়া আমরা সকলেই বারাকপুরের বাড়ীতে যাইব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম।

জিনিষপত্র বোঝাই গাড়ী অনেকক্ষণ বারাকপুব রওনা হইয়া গেছে। আমাদের যাইবার গাড়ি দরজায় দণ্ডায়মান, দু'একটা ছোট বাক্স হাতে করিয়া গাড়িতে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় মাতুল মহাশয় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিলেন, —"তোমাব জেঠা মহাশয়ের এটর্নি সোলোমন্ কোম্পানি, তোমার কাছে দুজন লোক পাঠাইয়াছেন। ভদ্রলোক দু'টি বৈঠকখানায় বসিযা আছেন, তোমাকে তাঁরা কি বলতে চান।"

কি বিপদ ! তাড়াতাড়ি বৈঠকখানার পাশের কুঠুরিতে পরদার আড়ালে দাঁড়াইলাম। বামার মা দরজায় দাঁড়াইয়া ভদ্রলোক দু'টিকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল— "ঠাক্‌রুন এসেছেন. আপনাদের কি বলবার আছে বলুন।"

দুইটি বাবুর মধ্যে একজন পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির কবিয়া বলিলেন— "আমাদের অধিক কিছুই বক্তব্য নাই। হরলাল চট্টোপাধ্যায় শেষ উইলে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, উইল হইতে কেবল সেই অংশটুকু পড়িলে আপনারা সকলি বুঝিতে পারিবেন। এই কাগজখানিই সেই মূল উইল। ইহাতে লেখা আছে :—

"প্রকাশ থাকে যে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে আমার যে দশ লক্ষ টাকা গচ্ছিত আছে, তন্মধ্য হইতে আমাব ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী কেবল এক সপ্তাহের জন্য এই দুই লক্ষ টাকা পাইবেন। এই সপ্তাহকালে তিনি উক্ত টাকার বিনিময় যাহা কিছু ক্রয় করিবেন বা দান করিবেন, তাহা তাহারই থাকিবে। কিন্তু উক্ত সময়ের শেষে ঐ টাকার মধ্যে যাহা নগদ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা আর তিনি ভোগ করিতে পারিবেন না, অবশিষ্ট সমস্ত টাকা আমার পুত্রগণকে প্রত্যার্পণ করিতে হইবে। আরও প্রকাশ থাকে যে, উইলের একজিকিউটরগণ যেন এই শর্তসকল. সপ্তাহকাল অতীত হইবার পূর্বে শ্রীমতীর নিকট ঘুণাক্ষবে প্রকাশ না কবেন।"

হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম, বুঝিতে কিছুই বাকি রহিল না। আমি জেঠামহাশয়কে প্রায়ই বলিতাম— "দেখ, আমার হাতে যদি টাকা দাও, তবে কেমন ক'রে সংসার চালাতে হয় দেখাতে পারি।"

বৃদ্ধ ভাবিতেন, টাকা হাতে পাইলে. তাহাব বক্ষার জন্য মানুষ মাত্রেই তাঁর মত কৃপণ না হযে থাকতে পাবে না. তাই জেঠামহাশয়ও সহাস্যে প্রাযই বলিতেন-- "আচ্ছা, দেখা যাবে। তুই নিজের হাতে টাকা পেলে কেমন খবচ করিস।"

তাই এই পরীক্ষা। কিন্তু পরীক্ষার ফল দেখিলে জেঠামহাশয় নিশ্চয়ই চমৎকৃত হইতেন।

দুই লক্ষ টাকার মধ্যে খরচ খরচা বাদ, দেখিলাম মোট ৫৩৫ ৸৶ ১০ পাঁচশত পঁয়ত্রিশ টাকা পনেরো আনা দুই পয়সা মাত্র অবশিষ্ট আছে। তৎক্ষণাৎ খরচের রসিদ ও হিসাবসহ ঐ টাকা সোলোমন কোম্পানির লোকের নিকট মাতুল মহাশয়ের দ্বাবা পাঠাইয়া দিলাম।

* * * * *

দারোয়ানেক বলিয়া আসিযাছিলাম বাবু সন্ধ্যাব সময় বাসায ফিরিলেই. সে যেন তাঁহাকে সঙ্গে লইযা অবিলম্বে বাবাকপুরের বাড়ীতে উপস্থিত হয। আমি সেদিন সন্ধ্যা হইতেই বাগানের ফটকেব দিকে তাকাইয়া স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

নির্দিষ্ট সময়েব প্রায় এক ঘণ্টা পরে গাড়ী দেখা দিল। উনি গাড়ী হইতে নামিযা একেবাবে উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তখন তাঁহাকে সম্বোধন করিবার ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া তাঁহার পদযুগল ধরিয়া বসিয়া পডিলাম।

তিনি আমার হাত ধরিযা উঠাইয়া বলিলেন,—"আমি সব শুনেছি,—আজকাব ঘটনাও মাতুলের কাছে শুনলাম। আমাদের নতুন ডিস্‌পেনসারি দেখতে গিয়ে এতটা দেরি হয়ে

গেল। আমি কি সাধে বলি, আমার সংসারে অন্নপূর্ণা চিবকালের জন্য বাঁধা আছেন।"

জগদানন্দ রায়

মুক্তি

১

মজঃফরপুরে প্লেগের আবির্ভাবে সহরবাসীগণ যখন ভারি ব্যস্ত ও বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় আমি ডাক্তারী করিতে মজঃফরপুরে আসি।

এখানে সহরের মধ্যে অতি কষ্টে একটি ছোটখাট দ্বিতলবাটী সংগ্রহ কবিয়া যথাসম্ভব তাহা পরিষ্কৃত ও সজ্জিত করিয়া জাঁকাইয়া বসিলাম, দ্বারের উপর সাইনবোর্ড শোভা পাইল "Dr. R.N. Datt." আমার নাম রমেন্দ্রনাথ দত্ত। ক্রমে ক্রমে দু'পাঁচটি বন্ধুও সংগ্রহ করিলাম ; সকালে চা চুরুট, ও রাত্রে পাশা ও দাবার আড্ডা জমিতে লাগিল। কিন্তু প্লেগের দিনে কেহই ডাক্তাব ডাকিতে চায না ; জ্বর হইলেই প্রাণত্যাগ করিয়া পলায। দেখিয়া শুনিয়া ভাবিলাম, এমন দেশেও লোকে ডাক্তারি কবিতে আসে!

২

প্রায় একমাস হইয়া গিয়াছে, আমি মজঃফবপুরে আসিয়াছি, আজকাল শীতেব ও প্লেগের দৌরাত্ম্যে বন্ধুবাও বড় কেহ আসে না। কাজেই আমি নিষ্কর্মা, আমার সময কাটান বড়ই কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। যখন কার্যাভাবে আমার বিষম অচল হইযা দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় সহসা একদিন ঈশ্বর আমাব ঘাড়ে এক বিষম কার্যভার চাপাইযা দিলেন। এক মেঘলার রাত্রে গরম কাপড়গুলাকে অতি কষ্টে অঙ্গচ্যুত কবিযা লেপেব আশ্রয লইবার আয়োজন করিতেছি, এমন সময নীচে সদর দ্বারে করাঘাত করিযা উচ্চকণ্ঠে কেহ ডাকিল, "বাবু! ডাংদার বাবু হ্যায়?"

আমি কোটের বোতামগুলা আঁটিয়া দিলাম, 'টাই'টা একটু ফিরাইয়া স্বস্থানে স্থাপন করিলাম। ভাবিলাম, "ব্যাপার কি?"

ভৃত্য আসিয়া বলিল, "বাবু এক আউরৎ আয়া, আপকা সাথ মূলাকাৎ করনে মাঙ্গতা।"

নীচে আসিলাম। দেখিলাম হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে এক বৃদ্ধা দাঁড়াইয়া আছে, আমাকে দেখিয়াই সে ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "জলদি চলো, ডাংগদারবাবু! বাবুকে বড়া বোখার আয়া।"

জ্বর? প্লেগ নয়তো! এ শীতে কে যায়? বলিলাম, "সকালে যাবো ; এতরাত্রে যাইতে পারি না।"

কিন্তু সেই বৃদ্ধা দাসী কিছুতেই ছাড়ে না, পুনঃ পুনঃ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা আমি যাইতে স্বীকৃত হইলাম।

৩

ক্ষুদ্র একতালা খাপরার ঘর। মিট্‌মিটে প্রদীপের আলোয় আমি দেখিলাম, একপাশে একটি খাটিয়ার উপর এক ব্যক্তি শয়ন করিয়া আছে, আর তাহার পায়ের কাছে অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া একটি রমণী বসিয়াছিল। আমি আসিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি দাসীকে আলো ধরিতে বলিয়া সন্তর্পণে রোগীকে স্পর্শ করিলাম—উঃ গায়ে কি উত্তাপ! বহুক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম; দাসীর দ্বারা তাহার স্ত্রীকে সমস্ত লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম, নিঃসন্দেহে প্লেগ!

আমি উঠিয়া বাহিরে আসিলাম; দাসীকে দিয়া কাগজ কলম চাহিয়া লইয়া দু'খানা প্রেশ্‌ক্রিপসন লিখিয়া তাহাকে ঔষধ আনিতে বলিয়া আবার ঘরের মধ্যে আসিলাম। রমণীকে বলিলাম, "ঔষধ আসিলে একঘণ্টা অন্তর খাওয়াইয়া দিবেন। মালিসটা গলায় কর্ণমূলে লাগাইতে হইবে। আমি চলিলাম।"

স্ত্রীলোকটি দ্রুতপদে আমার কাছে আসিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, "আজ থাকুন, আমি বড় বিপন্ন।"

একি! এ কার স্বব? না আমার ভুল! আমি প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলাম, "আমি কি করিযা এখানে থাকিব! তবে কাল সকালে আবার আসিব স্বীকার করিয়া যাইতেছি। ভয় নাই; প্লেগেরও চিকিৎসা আছে।"

"ওমা এঁর তবে প্লেগই ঠিক হয়েছে?" এই বলিয়া রমণী মাটিতে বসিয়া পড়িল। তারপর সহসা আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাতরকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "ডাক্তারবাবু! আপনার পায়ে ধরি আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন! আমার স্বামীকে বাঁচান।"

বিস্ময়ে কিছুক্ষণ আমি নির্বাক হইয়া রহিলাম। তারপর ধীরে ধীরে তাহার হাত হইতে পদদ্বয় মুক্ত করিয়া লইয়া কম্পিতস্বরে বলিলাম, "সরলা তুমি? তোমার আজ এই অবস্থা! তুমি ওঠ, আমি এইখানে থাকিয়া তোমার শুশ্রূষা করিব।"

পরদিন প্রত্যূষে আমার বাসা হইতে পরিষ্কার বিছানা, পর্দা, গরম কাপড় আনাইয়া মলিন বস্ত্রসকল পবিবর্তন করিয়া দিলাম। সিবিল সার্জনকে আনিয়া দেখাইলাম। আমার যতদূর সাধ্য তাহা আমি করিলাম। কিন্তু কিছুতেই বিপিনবাবু বাঁচিলেন না, সন্ধ্যাকালে তাঁহার যাতনাক্লিষ্ট দেহ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণবায়ু অনন্ত বায়ুতে মিশিয়া গেল।

আমি দূরে সরিয়া দাঁড়াইলাম, সরলা তাহা বুঝিতে পারিল,—সে নিঃশব্দে স্বামীর পদতলে লুটিয়া পড়িল। হায় অভাগিনী আজ একেবারেই অনাথিনী হইল।

সরলা কে? তাহার একটু ইতিহাস বলা আবশ্যক। আমার বয়স যখন দশ বৎসর, সরলাব তখন চার, তখন হইতে আমাদের বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছিল। সরলা গরীবের মেযে আমি বড়লোকের ছেলে। তথাপি এ বিবাহে আমার অভিভাবকদের মত ছিল। তাহার কারণ সরলার অতুলনীয় রূপ।

মা বলিতেন, "এমন সুন্দর মেয়ে আর কোথাও নাই। রাজকন্যা পেলেও আমি এ মেয়ে ছাডবো না।"

সরলা ছোটবেলা আমায় তার খেলাঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া ধূলার ভাত ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খাওয়াইত। আমি তাহাকে জলছবি ও পুতুল, পুঁতির মালা কিনিয়া দিতাম; সে সকলকে দেখাইয়া বলিয়া বেড়াইত, "বল দিয়েছে।" ক্রমে আমি বড় হইলাম। এফ, এ পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে পড়িতে গেলাম। হায়, তখনো জানিলাম না সুখের স্বপ্ন এমন ভাঙ্গিয়া

যাইবে ! পূজার সময় বাড়ী আসিলাম, সরলার জন্য কুন্তলীন দেল্‌খোস আরো কতই জিনিষ আনিলাম। —প্রতি বৎসরই এমনি আনিতাম।

কিন্তু শেষে সকল আশার শেষ হইয়া গেল। শুনিলাম যক্ষ্মাকাশে সরলার বাপ মারা গিয়াছেন। আমার পিতা একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন, বলিলেন, "যে বংশে এমন কঠিন রোগ আছে সে বংশের মেয়ে কি করিয়া লই !"

মা প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন কিন্তু শেষে বাবার কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়াই বুঝিলেন। সরলার মা এসব কথা শুনিলেন, শুনিয়া অনাথা একেবারে চারিদিক শূন্য দেখিলেন।

আমি আর কি করিব ? কঠোর অধ্যয়নের মধ্যে সরলার প্রেম বিসর্জন দিলাম। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল।

শুনিয়াছিলাম আমার পিতারই চেষ্টায় একজন বিপত্নীক প্রৌঢ় ব্যক্তি সরলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি পশ্চিমাঞ্চলে কোথায় কর্ম করেন। আমি সরলাকে আর দেখি নাই। তাহার পর এই সাক্ষাৎ !

৪

বিপিনচন্দ্র ঘোষ পোষ্টাফিসে ২৫৲ টাকা বেতনে কর্ম করিতেন। সরলারও সংসারে কেহই নাই। সরলার মা কয় বৎসর হইল মারা গিয়াছেন। সংসারে সরলা আজ একা, অসহায় ! সে আজ কোথায় দাঁড়াইবে ?

ভগবান্‌ ! এ কি হইল ? সেই সরলা ? সে আজ অনাথিনী, সে আজ ভিখারিনী ! আর আমার ঐশ্বর্যের অভাব নাই ! তবু আমি তাহাকে আশ্রয় দিতে পারিব না ? আমি কেমন করিয়া ইহা সহ্য করিব ? সরলার এ অবস্থা দেখিয়া আমি কেমন করিয়া স্থির থাকিব ? পরদিন খুব প্রত্যূষে আমি সরলার কাছে গেলাম। সরলার ক্ষুদ্র কুটীর শূন্য ! মাটির মেঝেয় পড়িয়া সরলা নীরবে কাঁদিতেছে। বৃদ্ধা প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতে গিয়া আপনিই কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। রাত্রে আমার লোকজনেরা অনেক কষ্টে লোক সংগ্রহ করিয়া মৃতের দাহ কার্যাদি সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছে। সরলাকেও সঙ্গে যাইতে হইয়াছিল।

আমি গিয়া সাশ্রুনেত্রে সরলার কাছে বসিলাম। অল্পক্ষণ নীরবে থাকিয়া ডাকিলাম, "সরলা !"

সরলা মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিল, বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলিল, "তুমি আমার জন্য অনেক করেছ। কিন্তু আর কেন ? এ বাড়ীতে আর এসো না ! প্লেগ যে বাড়ীতে হয় সে বাড়ীতে আসা উচিত নয়, তুমি যাও !"

আমি বলিলাম, "যাই সরলা ! তুমিও চলো ! এখানে একা কি করে থাকবে ?"

সরলা বড় বড় চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল। পরে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবো ?"

আমি বলিলাম, "আমার বাড়ী !"

সরলা অনেকক্ষণ কি ভাবিল, তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "চলো ! বৌদিদির সেবা করবো, তাঁর দাসী হয়ে থাকবো আমার তো কেউ নেই।"

সরলার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। কম্পিতস্বরে বলিলাম, "সরলা, বৌদিদি কাকে বলচো ?"

সে উত্তর করিল, "কেন আপনার স্ত্রী !"

আমি সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে কহিলাম, "আমি বিয়ে করিনি !"

সবলা মুখ ফিরাইয়া লইল। আমি উঠিয়া গেলাম। ঘণ্টাখানেক পরে আসিয়া বলিলাম, "সবলা এখন আমার বাসায় চলো। তোমার বাড়ীওয়ালা তোমায় উঠিয়ে দিতে এসেছিল।" সবলা ব্যগ্রভাবে বলিল, "আমার বালা দুটো বিক্রি কবে ভাড়া চুকিয়ে দাও, যেন আমায় ওঠায় না।"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সেকি, তুমি এখানে থাক্‌বে! আমার বাসায় যাবে না?"

সবলা তাহার অলঙ্কারহীন হাত দুটি যোড করিয়া সাশ্রুনেত্রে উত্তর করিল, "আমায় মাপ করিও।"

"কেন সবলা?" সে সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, "তুমি দেশে যাইবার সময় দয়া করিয়া লইয়া যাইও। দেশে কাহারো বাড়ী দাসী হইয়া থাকিব।"

আমি সবিষাদে বলিলাম, "কি বলচো সরলা, পবেব দাসীগিরি কেন কবতে যাবে? আমাব সঙ্গে এসো, ভাই যেমন স্নেহে অসহায়া বোনকে আশ্রয় দেয়, আমি তেমনি তোমায় রক্ষা করিব। এমন অসহায় অবস্থায় তোমায় আমি ফেলিয়া রাখিতে পাবিব না।"

সবলা দৃঢ় স্বরে বলিল, "যত দিন তুমি বিয়ে না কবিবে, ততদিন আমি তোমাব বাডী গিয়া থাকিতে পারি না, তুমি বাড়ী যাও।"

দুঃখিত হইয়া আমি চলিয়া আসিলাম।

৫

বড় বিপদেই আমি পড়িয়াছি। এই অনাথিনীকে কেমন করিয়াই বা একা ফেলিয়া রাখি, আর কেমন করিয়াই বা এই সুন্দরী যুবতীকে গৃহে আনি। আব সে তো আসিতেও চাহে না!

হা অদৃষ্ট! সরলাকে কোথা হইতে আমাব মাঝখানে টানিয়া আনিলে? আমি এখন কি করি? এ কি বন্ধন!

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়াই সরলাব কাছে গেলাম। আজ দৃঢ় সংকল্প হইয়া গিযাছিলাম যে, তাহাকে সঙ্গে আনিবই। সে এখানে থাকিতে না চাহে. তাহাকে লইয়া দেশে যাইব।

দ্বারে গাডী রাখিয়া আমি ভিতবে প্রবেশ করিযা ডাকিলাম, "সরলা!" কেহ উত্তব দিল না। ঘরেব মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সরলা শুইয়া আছে।

আমার পদশব্দে সরলা মাথা তুলিয়া দেখিল। আমি কাছে গিয়া চমকিয়া উঠিলাম, "এ কি সবলা!"

সবলা কষ্টের সঙ্গে হাসিয়া ক্ষীণস্বরে উত্তব করিল, "বড় সুখেব দিন রমেশ! বড় সুখের দিন! আমার ভাগ্যে যে এত সুখ ছিল তা' জানতেম না! আশীর্বাদ কর মরে যেন স্বামীর কাছে যেতে পাই; তাঁর পদসেবা করতে পাই! তুমি সুখী হও।"

"সরলা! সর! কেন কাল আমার সঙ্গে গেলে না? এই হলো; শেষে এই আমায় দেখতে হোল?"

আমি মাটিতে বসিয়া পড়িলাম।

সরলা মৃদু হাসিয়া কহিল, "কেন অধীর হচ্চো? আমার তো আজ মুক্তি, তোমারও আজ মুক্তি!"

আমি তৎক্ষণাৎ সিভিল সার্জনকে লইয়া আসিলাম, তিনি দেখিয়াই বলিলেন, 'প্লেগ, রোগীর বাঁচা কঠিন।"

আমি সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত যত্নে চেষ্টা করিয়াও তাহাকে রাখিতে পারিলাম না। গভীর রাত্রে একটু সুস্থির হইয়া সরলা ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল "আমার শেষ অনুরোধ রাখিবে?"

আমি কাঁদিয়া বলিলাম 'বল সরলা'

সে বলিল 'তুমি বিয়ে করবে বল।'

আমি চুপ করিয়া থাকিলাম, সরলা ধীরে ধীরে চোখ মুদিল। আর চাহিল না।

রাণী দেবী

চিঠি চুরি

(প্রথম পরিচ্ছেদ)

বেলা একটার সময় কলেজ প্রত্যাগত রৌদ্রতপ্ত সুরেন্দ্রনাথ মেসে আসিয়া তাহার চৌকীর উপর হস্তস্থিত বইগুলি সজোরে নিক্ষেপ করিল, পরে দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া সটানভাবে চৌকীর উপর শুইয়া পড়িল। কক্ষে অপর এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল, সে সুরেন্দ্রের কার্যকলাপে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিল না। দু একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সুরেন্দ্র কিছুক্ষণ পরে বলিয়া উঠিল, 'আর ত পারা যায় না সুরেশ।'

সুরেশচন্দ্র তখন কক্ষস্থিত আর একটি চৌকীর এককোণ অধিকার করিয়া কি একটা কার্যে ব্যস্ত ছিল। সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড বইয়ের পাতা খোলা। উভয় পৃষ্ঠার মধ্যদেশে একটা লাল ও নীল রঙের পেন্সিল স্থাপিত। চারিদিকে নানান রকম বই ছড়ান, কতক পাঠ্য, কতক অপাঠ্য। উপন্যাস, নাটক, বইয়ের ক্যাটালগ, থিয়েটারের প্রোগ্রাম ইত্যাদি চৌকীর চারিদিকে শোভা করিতেছে।

মুখে কলমটা চাপিয়া ধরিয়া, বইয়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মুখ না ফিরাইয়া সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, পারা যায় না কি? বলনা কি হয়েছে?

আজ কলেজ গেলিনে কেন? যাবার সময় তোর কত খোঁজ করলুম, চুলের টিকিও দেখতে পেলাম না। কোথায় গিয়েছিলি আজ? সাহেব তোর জন্য আজ কত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।'

"সাহেব কি বল্লে?'

সুরেন্দ্র শুইয়া ছিল, উঠিয়া বসিল। সুরেশ কোলে একটা বালিশ রাখিয়া ভাল করিয়া বসিল। মুখে আগ্রহের চিহ্ন।

সুরেন্দ্র গ্রীষ্মাধিক্য বশতঃ পাখা নাড়িতে নাড়িতে আরম্ভ করিল, 'ক্লাশে পড়ান হয়ে যাবার পর সাহেব তার রচিত কবিতা "To my Ideal" (মানসীর প্রতি) আজ আমাদের শুনাইয়াছে। কবিতাটি শোনবার পর, সাহেব কাকে লক্ষ্য করে এ কবিতাটি লিখেছে জানবার জন্য আমরা সবাই মিলে তাকে ধরেছিলুম, সাহেব কিছুতেই বল্লে না। আমি বল্লাম, 'স্যার, তোমার মল্লিনাথ সুরেশচন্দ্র আজ অনুপস্থিত, সেই জন্যই বোধকবি তুমি আজ বড় অন্য মনস্ক ছিলে'—সাহেব হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা কল্লে, আজ কাল সে খুব ব্যস্ত বুঝি। সামনে পূজো, জিনিসপত্র কিনতে ও বাড়ীতে চিঠিপত্র লিখতে খুব ব্যস্ত বুঝি। তার উপর নূতন বিয়ে করেছে।—কলেজে আসবার সময় তাকে কি করতে রেখে এলে? স্ত্রীকে চিঠি টিঠি লিখছিল?

সাহেবের কথার উত্তুরে আমি ঘাড় নাড়লুম। সাহেব হেসে উঠল। সাহেব সকলকেই ঠাট্টা করে"—

সুরেন্দ্রে কথা শেষ হইতে না হইতে হঠাৎ সুরেশ তাহার ঘাড়ে পড়িয়া সজোরে তাহার পৃষ্ঠদেশে দুই কিল বসাইয়া কহিল "মিথ্যাবাদী। তুই আমাকে চিঠি লিখ্‌তে দেখে গিয়েছিলি, পাজী ? সাহেবকে মিথ্যা কথা কেন বল্লি ?"

"আমি বুঝি বল্লাম ! আমি ত শুধু ঘাড় নেড়েছিলুম। তারপর সাহেব আমায় একদিকে টেনে নিয়ে কি বল্লে শোন্"—সুরেশ পাশে বসিল ; মুখ আরক্তিম। "সাহেব বল্লে, 'দেখ, (সুরেন্দ্র একটু কাশিয়া লইল) তোমাদের শাস্ত্রেই আছে ব্রহ্মচর্য শেষ না করে গার্হস্থ্য অবলম্বন কর্তে নেই, তোমরা কিন্তু ঠিক তার উল্টা কর। তোমরা ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য এক সঙ্গেই সম্পন্ন কর্তে চাও, কোনটাই রক্ষা হয় না। এই সুরেশের case-ই ধর না, কেমন ভাল ছেলে, বি এ-তে দুটি অনারে প্রথম হয়ে এসেছে। এম এ তেও প্রথম হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু যে energy-টা'— সাহেবের কথা আটকে গেল। আমি বল্লাম, 'স্ত্রীকে চিঠি লিখতে খরচ করে'—সাহেব হাসিয়া উঠিল। বল্লে, 'ঠিক তাই।'

সুরেন্দ্রে মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। গল্পটা প্রায় সম্পূর্ণ তাহারই বানানো, সুরেশ বুঝিতে পারিল না। সুরেশ ক্রুদ্ধ হইয়া হঠাৎ সুরেন্দ্রের কর্ণ দুইটি আমূল রক্তবর্ণ করিয়া দিল। "আর বল্‌বি পাজী, সাহেবকে চিঠি লেখবার কথা ?" "আমি যেন সেধে বলতে গিয়েছিলুম !"

সুরেন্দ্র উভয় কর্ণে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে খুব উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল। "সাহেবও নিজেই জিজ্ঞাসা করেছিল, আর সাহেব মিথ্যেই বা এমনকি বলেছে—বলিয়া সুরেন্দ্র চকিতে সুরেশের বিছানাস্থিত ডিক্সনারীর ভিতর হইতে ঈষদৃষ্ট সোনালি পাড়যুক্ত একটি রঙ্গীন কাগজেব পাতা বাহির করিয়া বলিল, "প্রমাণ হাতে হাতে !"

সুরেশ ফস্ করিয়া সুরেন্দ্রের হস্ত হইতে চিঠিটা কাড়িয়া নিজের মুঠার ভিতর রাখিল। "ও বুঝি আজ আমি লিখেছি ?" "ফের মিথ্যে কথা ! নগেনের ডিক্সনারীটা কাল ওঘরে ছিল, আজ হঠাৎ তোর কাছে এল কেন ? ডিক্সনারীর ভেতর চিঠি রেখে লেখবার খুব সুবিধে, কেউ এলে ঝপ করে পাতাগুলো বন্ধ করে দেওয়া যায়। মনোযোগী ছাত্র যেন কত মনোযোগের সহিত ডিক্সনারী দেখ্‌ছিলেন ! সুরেশ, বিয়ে করাটা কি ঝঞ্ঝাট ! এক স্ত্রীকে শুধু চিঠি লেখবার জন্যে কত মিথ্যে কথাই কইতে হয়।"

— "হ্যাঁ, যা যা, আগে বিয়ে কর্ তারপর সব বুঝতে পার্বি !"

সুরেশ কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল। সুরেন্দ্রের ইচ্ছা সুরেশের চিঠিটা দেখে ! সে তখন সুরেশের কাছ ঘেঁসিয়া তাহার গলায় দুই হাত জড়াইয়া বলিল, "কি এত গোপনীয় চিঠি। আমায় দেখাবি নে ভাই ? কত দিন বলেছি তোকে। আমাদের apprentice হয়ে তোদের কাজ দেখে শিখে নিতে দিবি নে। শেষে যে একেবারেই পার্ব না, সাহায্য কর্ ভাই !" সুরেন্দ্র নাটকীয় সুরের কতকটা অনুকরণ করিল।

নব বিবাহিত স্বামী স্ত্রীর চিঠি পত্র বন্ধু বান্ধবদের দেখা উচিত নহে এবং তাহারা যদি এ বিষয়ে অন্যায় দাবী করে, তাহার প্রশ্রয় দেওয়াও যে উচিত নহে, সুরেশ এ কয়টা কথা বেশ ধীরভাবে সুরেন্দ্রকে বুঝাইয়া দিল। সুরেন্দ্র কথাগুলো একেবারে উড়াইয়া দিয়া কহিল, "চিরকাল বন্ধু বান্ধব বিয়ে করে নিজের স্ত্রীর চিঠিপত্র বন্ধু বান্ধবদের দেখিয়ে আসছে, তোর কাছে বুঝি সে নিয়মের ব্যতিক্রম হ'তে চল্লো ? আচ্ছা, তুই না দেখাস্ আমি জোর করে দেখবই দেখব। এতে তুই যাই মনে কর। তোর লেখা চিঠি দেখব না ; কিন্তু তোর স্ত্রী যে

তোকে চিঠি দেয় তা দেখবই দেখব। দেখি তুই কি কর্তে পারিস !" শেষের কথা কয়টায় সে খুব জোর দিল।

সুরেশ গম্ভীর ভাবে কহিল, "আচ্ছা, কেমন পার তুমি আমিও দেখব !" সুরেশ অনেক বৎসর পরে এই প্রথম সুরেন্দ্রের সহিত 'তুমি' বলিল !

দুই বন্ধুতে একটু মনান্তর ঘটিবার উপক্রম হইল। সুরেন্দ্রের কিন্তু সেরূপ ইচ্ছা ছিল না। সে সুরেশের মন ফিরাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কৃতকার্য হইল না। অবশেষে উভয়ে আপন আপন শয্যা অধিকার করিয়া নিস্তব্ধভাবে শয়ন করিয়া রহিল। কেহ কোন কথা বলিল না। কক্ষে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ তাহাদের এইরূপে কাটিল।

বেলা তখন প্রায় চারটা বাজে ! কিছুক্ষণ পরে মেসের অন্যান্য বালকেরা কলেজ ও স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিল।

"ঝি কোথায়, জলখাবার কই !" ইত্যাদি চিৎকারে ও কোলাহলে মেস নবজীবন পুনঃপ্রাপ্ত হইল।

সুরেন্দ্র ও সুরেশের ঘরে অভূতপূর্ব নিস্তব্ধতা অনুভব করিয়া মেসের কয়েকটি ছাত্র সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত। তাহারা দেখিল, সুরেশ চিন্তা ক্লিষ্ট, সুরেন্দ্র হাস্যমুখে শয্যাবলম্বী। তাহারা হঠাৎ ইহার কোন কারণ ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। সুবেন্দ্র ইসাবা করিয়া সকলকে নিজের বিছানায় বসিতে বলিল। নিজে উঠিয়া বসিল। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। সুরেশ তখন সকলের নিকট আসিযা বসিল। সুরেন্দ্র সকলের পশ্চাতে রহিল।

সুরেন্দ্র বন্ধুগণকে কথাগুলি খুলিয়া বলিল। সে সুরেশের চিঠি দেখিবাব জন্য যে জেদ করিয়াছিল তাহা সঙ্গত বলিয়া প্রায় সকলেই মত প্রকাশ কবিল : কেবল দুই একজন 'বিবাহিত' ছাত্র ভীত হইয়া সুরেশের পক্ষ লইল। তখন চিঠি দেখা বিষয়ে উভয় পক্ষে বিষম তর্ক বাধিয়া গেল ! শেষে স্থির হইল যে সুরেন্দ্র যদি সুরেশের স্ত্রীর চিঠি দেখিতে পারে ও সকলকে দেখাইতে পারে, তাহা হইলে কাল সুরেশ সুবেন্দ্রেব দলকে পেট ভরিয়া খাওয়াইবে। ও সর্বসমক্ষে পরাজয় স্বীকাব করিবে।

(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

উক্ত ঘটনার পর, প্রায় দিন পনের কাটিয়া গিয়াছে। সুরেন্দ্র ও সুরেশ তাহাদের পূর্বের 'তুই'-ই সম্ভাষণ বজায় রাখিযাছে। পূর্বোক্ত ঘটনাটি মেসের নানা বিচিত্রময়ী ঘটনার মধ্যে কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেছে, ঘটনাটি সকলেই প্রায় এক প্রকার বিস্মৃত হইয়াছিল, কিন্তু প্রধান দুইজন অভিনেতা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ। সুরেশ সুরেন্দ্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না। সে ট্রাঙ্কের চাবি অত্যন্ত সাবধানে বাখিতে আরম্ভ করিল। বইয়ের ভিতর চিঠিগুলা সহসা দুর্লভ হইয়া উঠিল। ডাকঘরের পিয়ন আসিলেই তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কি ফুস্‌ফাস করিত। সুরেন্দ্র বুঝিত সুরেশের কি জন্য এই সতর্কতা। একদিন সুরেন্দ্র সুরশকে স্পষ্ট করিয়া বলিল, "সুরেশ অত সাবধানে দরকার কি ভাই ? আমি ত তোর চিঠি ট্রাঙ্ক থেকে চুরি কর্তে যাচ্ছিনে, আর পিয়নের হাত থেকে তোর চিঠি কেড়ে নেব এমন দুরাকাঙ্ক্ষাও রাখিনে ; আমি ত কাঁচা ছেলে নই !"

সুরেশ কিছু বলিল না। সে এই কয়দিনে বড় অল্পভাষী হইয়া পড়িয়াছিল। সুরেন্দ্র কিন্তু ঠিক তদ্বিপরীত। তারও সময় অসময় নাই, সে সুরেশের চৌকীতে গিয়া তাহার সহিত

একত্রে শয়ন করে। নানাবিধ গল্প হয়, বিশেষতঃ সুরেশের স্ত্রীর বিষয়ে। সুরেশ অপ্রসন্নভাবে অল্পসল্প উত্তর দিত।

একদিন কথায় কথায় সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা স্ত্রীকে তুই কি বলে সম্বোধন করে চিঠি লিখিস ? 'প্রিয়তমা' না নব্যতর আর কিছু ?" সুরেশ চুপ করিয়া রহিল।

"আচ্ছা নীচে আপনার নামের উপরে কি লিখিস্ ?"

"আন্দাজ কর্ না ?"

"আমরা কি করে জানব বল দিকি ! তবে প্রণয়াকাঙ্ক্ষী প্রণয়প্রার্থী এই রকম কিছু হবে টবে বোধহয়।"

"শেষটাই।"

"আচ্ছা স্ত্রী তোকে কি বলে আরম্ভ করে ?" সুরেশ সুরেন্দ্রের চক্ষে অবিশ্বাসের চিহ্ন দেখিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিয়া উঠিল, "কেন, সে চিঠি দেখবার ভার ত আপনার উপরেই মহাশয় !" সুরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর অন্যান্য অনেক কথা আসিয়া পড়িল। স্নানের বেলা হইয়া যাইতেছে বলিয়া বিছানা হইতে উঠিবার সময় সুরেন্দ্র সুরেশকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই আট ন'দিন পরেই ত পূজার জন্য কলেজ বন্ধ হবে, বাড়ী যাচ্ছিস কবে ? আর 'অসারে খলু সংসারে'—সেটা ত পড়ে আছেই ; স্ত্রীকে চিঠিপত্র দিয়েছিস ত ?"

সুরেশ বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "এত স্ত্রীপরায়ণ হয়ে উঠিনি ? যে রোজ রোজ চিঠি দেব !" সুরেন্দ্র জানিত সুরেশ কল্য তাহার স্ত্রীকে পত্র দিয়াছে। সে অল্প হাসিল।

সুরেন্দ্রের হাসি দেখিয়া সুরেশের মাথায় ঝাঁ করিয়া একটা কথা মনে হইল। মনে করিল, এত দিন এ কথাটা ভাবে নাই, এই আশ্চর্য ! সেই দিবসই দ্বিপ্রহরে স্ত্রীকে সংক্ষিপ্ত একখানি পত্র লিখিল যে ইহার মধ্যে তাহাকে তাহার চিঠি পত্র দিবার আর সম্ভাবনা নাই। ছুটী হইলে একেবারে যাইয়া দেখা করিবে। সেও যেন তাহাকে ইহার মধ্যে পত্রাদি আর না দেয়।

(তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

তাহার পর কয় দিবস কাটিয়া গেল। পূজার ছুটীও ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইল। মেসে প্রবাসী বালকদিগের মধ্যে আনন্দ তরঙ্গ বহিতে লাগিল। বাড়ী যাইবার মুখে সুরেশ একদিন নিজের ঘরে যখন একাকী বসিয়া ধীর ভাবে ট্রাঙ্ক গুছাইতেছিল, এমন সময় পার্শ্বের কক্ষে একটা তুমুল হাস্যধ্বনি শোনা গেল। তাহা যেমনি হঠাৎ তেমনি ক্ষণিক। সুরেশ কিছু বুঝিতে পারিল না। ইচ্ছা হইল একবার দেখা দিয়া আসে। শেষে ভাবিল, ঘরে কেহ আসিলে জিজ্ঞাসা করা যাইবে, খোলা ট্রাঙ্ক ফেলিয়া তাহার অন্যত্র যাওয়া অসম্ভব।

তাহাকে যাইতে হইল না। কক্ষে কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্রনাথের প্রবেশ। ওষ্ঠ প্রান্তে তখন হাসির শেষ রেখাটি মিলাইয়া গিয়াছে। সুরেশ দ্বারের দিকে পৃষ্ঠ করিয়া উঁচু হইয়া বসিয়া ট্রাঙ্ক গুছাইতেছিল। সুরেন্দ্রের আগমন সে জানিতে পারে নাই। সুরেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিয়াই মিহি সুরে ডাকিল, "সুরেশ ভাই ! কি কচ্ছিস্ ?"

ঝপ করিয়া ট্রাঙ্কের ডালাটা বন্ধ করিয়া মুখ ফিরাইয়া সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?"

সুরেন্দ্র হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না। বলিল, "একটা নূতন খবর আছে, সুরেশ"। হস্ত দুইটি তাহার পশ্চাতে লুক্কায়িত ছিল।

সুরেশ ট্রাঙ্কের নিকট বসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছিস ?" উঠে আয় না, তোর স্ত্রীর চিঠি চিঠি করেই ক্ষেপলি যে ! আমি তোর ট্রাঙ্ক খুলতে যাচ্ছি নে !" সুরেশ একটু অপ্রস্তুত

হইযা উঠিযা আসিল, উভযে দুইটা চৌকীব উপব মুখোমুখি হইযা বসিল। সুবেশ বলিল, "কই দেখি ?"

"দেখি কি বকম ? আমি বল্লাম, একটা নূতন খবব আছে, তুই বলছিস, দেখি স্বপ্ন দেখছিস নাকি ? ওঃ বুঝেচি ! তুই জানিস বুঝি ! তোব স্ত্রী আমায চিঠি লিখেছে। এই নে চিঠি।"

সুবেশেব মুখ এক মুহূর্তে পাংশুবর্ণ হইযা গেল। তাব স্ত্রীব এই কাণ্ড ! সে কখনও বিশ্বাস কবিতে পাবে না। নিজেকে সামলাইযা লইযা সে সুবেন্দ্রেব মুখেব উপব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বাখিযা বলিল, "এ কক্ষোনো হ'তে পাবে না ! এ একেবাবে অসম্ভব। কিন্তু কই কাব চিঠি দেখি ?"

সুবেন্দ্রনাথ খামশুদ্ধ চিঠিখানা দিল। খামেব উপব সুবেন্দ্রনাথেব নাম পবিষ্কাব কবিযা লেখা ! টিকিটেব উপব মুঙ্গেব ডাক ঘবেব স্পষ্ট ছাপ। মুঙ্গেবে সুবেশেব অবসব প্রাপ্ত শ্বশুব পুত্রকন্যা লইযা থাকিতেন।

সুবেশ চিঠিখানি পডিতে লাগিল। তাব স্ত্রীব লেখাইত বটে ! পডিবাব সময ভ্রূ কুঞ্চিত ও মুখ আবক্তিম হইযা উঠিল। কপালে ঘর্মবিন্দু দেখা দিল। চিঠিটা একবাব শেষ হইলে, আবাব সে পডিতে লাগিল,—

মুঙ্গেব

প্রিযতম এখানে আসবাব আগে তুমি আব আমায চিঠি দেবে না লিখেছিলে, কিন্তু হঠাৎ তোমাব পত্র আজ সকালে পেযেছি। পেযে যে কি আনন্দ হযেছিল বলতে পাবি নে। কিন্তু চিঠি পডে দেখলাম, আহ্লাদ কববাব চিঠি এ নয। তুমি গেলবাবে যে বকম আশা দিযে আমায নিবাশ কবেছিলে এবাবেও দেখছি সে বকম কর্তে যাচ্ছ তোমবা ভাবি নিষ্ঠুব কিন্তু এই এক বছবেব ওপব হতে চল্লো তোমাব আশায আমি চেযে বযেছি তুমি এবাবে আসবেই আসবে। আমাব মাথাব দিব্যি বইল। আমাব প্রণাম নিও তুমি কেমন আছ ? আমি ভাল আছি। কলেজ কবে বন্ধ হ'বে ? আমাব দু জন সই এই পূজোব সময এখানে আসবে তাদেব দেব সেজন্য কিছু এসেন্স আনতে লিখেছি, শুদ্ধ "কুন্তলীন" না এনে "পদ্ম গন্ধ কুন্তলীন" চাব শিশি ও এসেন্স "দেলখোস" চাবশিশি আব "অসে ও ছাযা" ও "স্বর্ণলতা" এনো। ইতি -

তোমাবই প্রভাবতী।

পডা শেষ হইলে সে চিঠিটা অনেক বাব ওলট পালট কবিযা দেখিল সুবেন্দ্র এ চিঠি পাইল কি কবিযা ? আবো একটা কথা, সে ত ইতিমধ্যে স্ত্রীকে কোন চিঠি পত্র দেয নাই, অথচ স্ত্রী পবিষ্কাব লিখিযাছে, সে সুবেশেব পত্র পাইযাছে ! কিছু বুঝিতে পাবিল না। মনেব মধ্যে সব ওলট পালট হইযা যাইতেছিল। সুবেশেব চিঠি পডিবাব সময জানালাব আশেপাশে অনেকগুলা কাল মুণ্ড ও চক্ষু ঘুবিতেছিল সুবেশেব চিঠিপডা শেষ হইলে সব কযটি হুডমুড কবিযা ঘবে আসিযা যে যেখানে পাবিল বসিযা পডিল। একটা হাসিব তুফান বহিযা গেল। সুবেশ চৌকীব এক পার্শ্বে বিমর্ষভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ ভাবে বসিযা বহিল। তাহাব অবস্থা উত্তবোত্তব সঙ্গীন হইযা উঠিতে লাগিল। সুবেন্দ্রকে বলিল, সত্য বলিতে কি, আমি ত ইহাব বিন্দুমাত্র বুঝিতে পাবিতেছি না। চসমাটা খুলিযা সে কাপডেব একটা কোন দিযা বাবম্বাব উহা পবিষ্কাব কবিতে লাগিল

তখন সকলে সুবেন্দ্রেব দিকে চাহিল।

সুবেন্দ্র সুবেশেব কাছ ঘেসিযা আসিযা তাহাকে সম্বোধন কবিযা আবম্ভ কবিল—"এ চিঠি

যে তোর স্ত্রীরই লেখা, তা আর অস্বীকার কর্তে পারবিনে। যাক্‌, কিন্তু আমায় তুই যতটা অপরাধী ভাবছিস্‌ আমি ঠিক ততটা নই। তোর স্ত্রী তোকেই চিঠি দিয়াছে। মধ্য হতে ওটা আমি পেয়েছি মাত্র। যখন দেখলুম তুই বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস, তখন আমি তোর লেখা নকল করে তোর বৌকে এক চিঠি দিলুম। তোর কাছে এর আগে শুনেছিলুম পূজোর মধ্যে তুই আর বৌকে চিঠি দিবিনে ; এতে আমার পক্ষে খুব সুবিধাই হোল। তোর কোন চিঠির সঙ্গে আমার এ চিঠির গোলমাল হবার কোনই সম্ভাবনা রইল না। কিন্তু একটা কথা ভারি আশ্চর্যি ত, চিঠি ত তোর নামেই গেল, কিন্তু আমি তার উত্তর কেন পেলাম ? এর উত্তরটা অত্যন্ত সহজ। আমি জানতুম, তুই বউকে চিঠি লেখবার সময়, উত্তর পাবার আশায় নিজের নাম ঠিকানাশুদ্ধ খাম পাঠাতিস্‌, কারণ আমি আমার ডাক পিয়নের হাতে তোর লেখা খাম কবার দেখেছি। আমি তোর বৌকে চিঠি লেখবার পর সেই রকম কল্লুম। তুই যে রকম খাম পাঠাস্‌, তাই একখানা চিঠির ভেতর দিলুম। সবই ঠিক হোল—কেবল—কেবল নামটা (খামে) বদল করে দিলুম। তার ফলে আজ এই চিঠি আমি পেয়েছি। আমি চিঠিতে কি লিখেছিলুম, তোর বৌয়ের এই চিঠি দেখলেই বুঝতে পারবি। একটা কথা এখানে বলি, তুই এত বিদ্বান্‌, তোর বৌকে একটু আধটু করে ইংরাজী শেখাস, অন্ততঃ তোর নামটা পড়তে পারে যেন—নইলে সে আবার, কখন কি বিপদ আপদ ঘটিয়ে বস্‌বে ! অন্ততঃ যত দিন না ইংরাজী শেখে এরকম খাম পাঠান বন্ধ রাখিস। এ পথ যে কতদূর বিপদসঙ্কুল, অন্ধ প্রণয়ী, তোরা এর কিছুই দেখতে পাস্‌ না। আজ এই রকম চিঠিই ত তোর পরাজয়বার্তা বহন করে এনেছে।"

আবার একবার হাসির ধূম পড়িয়া গেল। চিঠিটা চারু সকলের সমক্ষে আর একবার পাঠ করিল। সুরেশ নিতান্ত বিমর্ষভাবে এক পার্শ্বে বসিয়া চুপ করিয়া বন্ধুবান্ধবদের কীর্ত্তি দেখিতেছিল। বেচারাকে এই অর্দ্ধঘণ্টার ভিতর অত্যন্ত কাহিল দেখাইতে লাগিল।

তাহাকে ম্রিয়মাণ দেখিয়া নগেন্দ্র তাহাকে উৎসাহ দিবার জন্য বলিয়া উঠিল, "এতে আর হয়েছে কি সুরেশ ! অমন চুপ করে বসে রইলে কেন ? যেমন ট্রাঙ্ক গোছাচ্ছিলে গোছাও না, আমরা দেখি। আর সময়ও ত নেই। পরশু ত কলেজ বন্ধ হচ্ছে। বল ত আমরা গুছিয়ে দিই।"

নগেন্দ্র তাড়াতাড়ি ট্রাঙ্কের ডালাটা খুলিয়া ফেলিল। সুরেশ কিছু বলিল না। ট্রাঙ্ক খুলিয়া নগেন্দ্র দেখিল, তখনও 'কুন্তলীন' ইত্যাদি কিছুই কেনা হয় নাই। ফস্‌ করিয়া তাহার মাথায় একটা খেয়াল চাপিল। সে বলিল, "সুরেশ, এখনো তুমি কিছু কেননি ! আমার ইচ্ছা আমরা কয়জন মিলে এই পূজোর সময় তোমার স্ত্রীকে তাঁহার ফরমাস মত জিনিসগুলি কিনিয়া 'পূজোর উপহার' দিই।" সকলে সম্মতি জানাইল। সুরেশ কিছু বলিতে পারিল না।

তখন সকলে মিলিয়া 'কুন্তলীন' 'দেলখোস্‌' ইত্যাদি কিনিয়া আনিল। প্রত্যেকটির উপর লাল কালি দিয়া লিখিয়া দিল, "সুরেশের স্ত্রীর জন্য।"

তারপর সকলে মিলিয়া তাহার ট্রাঙ্ক গুছাইতে বসিয়া গেল। সুরেশ চুপ করিয়া দেখিতে লাগিল। ট্রাঙ্ক গুছান হইলে মেসের বিদূষক 'বসন্তক' সকলকে খাওয়াইবার কথাটা মনে করাইয়া দিল। সকলে বলিল, "তাইত ! এত বড় Itemটা ভুলে যাওয়া হচ্ছিল হে, বসন্তক !"

পর দিবস বাটী যাইবার অগ্রে মহা ধূমধামে সুরেশ সকলকে খাওয়াইল। সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু সুরেন্দ্রকে পারিবার যো নাই। দেশে গিয়া সে মুঙ্গেরে সুরেশকে লিখিয়া

পাঠাইল, "বৌদিদির জিনিষ পত্র মনের মত হইয়াছে ত ?"

যোগেশচন্দ্র মজুমদার

প্রায়শ্চিত্ত

১

নরেন্দ্রপুরের জমিদার বিজয়কৃষ্ণ চৌধুরীর একমাত্র পুত্র সতীন্দ্রনাথের পত্নীর অসময়ে স্বর্গারোহণে—কন্যা ভারগ্রস্ত পিতৃকূলের লুব্ধ দৃষ্টি যুগপৎ-তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। পত্নী বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই সতীন্দ্রনাথের পুনরায় বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। কিন্তু বিপত্নীক সতীন্দ্র তাহার তিন বৎসরের শিশুপুত্রকে বক্ষে লইয়া দ্বিতীয়বার দ্বারপরিগ্রহে দৃঢ় কণ্ঠে আপত্তি প্রকাশ করিল। বেশী দিন নয়, আজ ছয় মাস মাত্র তাহার প্রিয়তমা পত্নী নিরুপমা—তাহার স্বামীপুত্রকে ছাড়িয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছে।

শ্মশান হইতে সবে মাত্র প্রত্যাগত সতীন্দ্র যখন আপনার শূন্য কক্ষে প্রবেশ করিল—তখন সুধীর কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিদ্রিত পুত্রের সেই রোদনারক্ত বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া তাহার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল ! পুত্রকে বক্ষে লইয়া সতীন্দ্র বালকের মত কাঁদিয়া উঠিল !

সেই গৃহ তেমনিই আছে! কেবল গৃহ অধিষ্ঠাত্রী—তাহার জীবন-সর্বস্ব নিরুপমা—চিরদিনের মত তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। সত্যই কি নিরুপমা নাই ? সত্যই কি সতীন্দ্র স্বহস্তে তাহার স্বর্ণ-প্রতিমা ভস্ম করিয়া আসিয়াছে ? সতীন্দ্র কি স্বপ্ন দেখে নাই ? না—না—সেই অতি-নিষ্ঠুর দৃশ্য অতি সত্যি ? তখনও আলনায় নিরুপমার স্বহস্তে "কোঁচানো" সাড়ীগুলি—টেবিলের উপর রৌপ্যময় ফুলদানিতে 'দেলখোস্'—বাসিত কৃত্রিম ফুলের তোড়া, আল্‌মারিতে তাহার সখের জিনিষগুলি—তেমনই ভাবেই শোভা পাইতেছে ! বিছানায় তেমনি ভাবে—তাহার কবরীসিক্ত কুন্তলীনের স্নিগ্ধ গন্ধ মৃদু সৌরভে সতীন্দ্রের চিত্তকে বিহ্বল করিয়া তুলিতেছিল ! পূর্ণিমার রাত্রি পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না লইয়া—তাহার শয়নকক্ষে অবাধে প্রবেশ করিতেছিল ! বাগানেব ফুলের গন্ধ লুণ্ঠন করিয়া—বায়ু তেমনই বহিতেছিল ! সবই আছে—শুধু সে-ই নাই !

বিছানার উপর একরাশি চামেলী ফুলের মত শুভ্র সুন্দর শিশু নিদ্রিত ! শুধু তাহার নিদ্রিত মুখখানির দিকে চাহিয়া দুইটি স্নেহ-চঞ্চল চক্ষু ও একখানি হাস্য-প্রফুল্ল মুখ—তাহার নিদ্রাভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতেছে না! কোথায় তুমি নিরুপমা—একবার ফিরিয়া এস,—একবার তেমনি করিয়া হাসিয়া বল, "এই যে আমি ?" সতীন্দ্র আর সহ্য করিতে পারে না।

কিন্তু সময়ে সকলই হ্রাস পায়, শোক কিছু চিরকাল থাকে না, বিশেষতঃ পত্নীশোক ! সতীন্দ্র আবার কাজকর্মে মন দিল। কিন্তু তাহার দিবসের অধিকাংশ কাল সুধীরের সহিত খেলায় ও গল্পে কাটিত।

সেদিন কোন কাজে সতীন্দ্রকে গোপালনগর যাইতে হয়। বর্ষার গঙ্গা তাহার গৈরিক জলরাশিতে কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। একখানা 'বোঝাই' নৌকা পাল তুলিয়া আপন মনে চলিয়া যাইতেছিল। মাঝিরা সুর করিয়া "ও মন বেয়ে যাওরে আমার মনের নাও",—পবনের উলটা বেয়ে যাও রে' ইত্যাদি তাল লয় হীন সঙ্গীতে অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছিল। জলের ধারে শিকড় বাহির করা বৃহৎ ডুমুর গাছের উপর বসিয়া একটা "চোক গেল" পাখী অবিশ্রান্ত চিৎকারে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নকে সজাগ করিয়া তুলিতেছিল। ওখন পরপারে বৃষ্টি বিধৌত ঘনসন্নিবিষ্ট নারিকেল বৃক্ষের মাথার উপর সূর্য অস্ত যাইতেছিল। তাঁহার রক্তিম চঞ্চল রশ্মি চঞ্চল জলতরঙ্গের উপর নৃত্য করিতেছিল। আর জলের ধারে দাঁড়াইয়া একটি অচঞ্চল বালিকা তাহাই দেখিতেছিল। বালিকা বাল্য ও যৌবনের সন্ধিস্থলে উপনীতা। তাহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে, অনিন্দনীয় মুখশ্রীতে, পরিপূর্ণ অঙ্গাবয়বে এমনি একটা স্নিগ্ধ লালিত্য ছিল যাহা একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা যায় না পুনঃপুন দেখিতে ইচ্ছা হয়। তীরে ঘাসের উপর একটি জলপূর্ণ পিত্তল কলস সূর্যালোকে তাহার নিপুণ হস্তের পরিচ্ছন্নতার সাক্ষীস্বরূপ সুবর্ণদীপ্ত প্রকাশ করিতেছিল।

নৌকা হইতে নামিয়া সতীন্দ্র চিনিতে পারিল সেই বালিকা পুরোহিত কন্যা মালতী। মালতীকে সতীন্দ্র ছেলেবেলা হইতেই জানিত। কিন্তু আজ এই নির্জন নদীতীরে, অস্তগামী সূর্যালোকে, সিক্ত বসনা নিরাভরণা যৌবনাগতা কিশোরীকে দেখিয়া তাহার নূতন করিয়া মনে হইল, "মালতী কি সুন্দর।" ডুবিবার পূর্বে সূর্য তাঁহার সবটুকু কিরণ মালতীর লজ্জানত মুখে ঢালিয়া দিয়াছিল। মুগ্ধ সতীন্দ্র দেখিল, কি সুন্দর! দ্বিতীয়বার বিবাহে বিরোধী সতীন্দ্র যখন স্বেচ্ছায় মালতীকে বিবাহ করিতে চাহিল,—তখন "গরিবের ঘর" বলিয়া চৌধুরী মহাশয় কোনও আপত্তি করিলেন না সতীন্দ্র পুনরায় "সংসারী' হইবার সংকল্পে অনেকেই মনের সহিত হর্ষ প্রকাশ করিলেন। যাঁহারা মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারাও মুখে বলিলেন, "আহা— তা' হোক—হোক।"

কথাটা যখন সকলেই শুনিল—তখন সুধীরেরও শুনিতে বাকি রহিল না। পিতার বিবাহের অর্থটা সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। বিবাহের নামে—আলো বাজনা ফুলের ঝাড় এবং রৌসনচৌকির বাদ্যের সহিত সুসজ্জিত পিতৃমূর্তিই তাহার মনে হইল। সম্প্রতি তাহার এক পিতৃব্যপুত্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরবেশী পিতৃমূর্তি কল্পনায় বড় মানাইল না, তথাপি সে হর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিল "মধু আমিও বিয়ে করতে যাব।" কিন্তু পরক্ষণেই তাহার এই স্বার্থপরতায় পাছে মধু মনঃক্ষুণ্ণ হয় তাই তাড়াতাড়ি বলিল "তুমিও যাবে, আমরা দুজনে যাব। কিন্তু আবার বিবাহার্থী মধুর মলিন বস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় একটু চিন্তিত ভাবে বলিল তোমার ভাল কাপড় নেই। বাবাকে বলবো তোমার ভাল রাঙা কাপড় আর জরীর টুপী কিনে দেবে।' মধু চৌধুরী বাড়ীর বহু পুরাতন ভৃত্য এবং সুধীরের একান্ত প্রিয়তম সঙ্গী। অবশেষে মধু যখন জানাইল, "বিয়ে করে বাবা টুকটুকে নূতন মা আনবে। —তখন মুহূর্তে তাহার হাসিখুসী ফুরাইয়া গেল, মুখমণ্ডল গম্ভীর বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। 'নতুন মা' র কথায় তাহার স্বর্গগত জননীর স্নেহমণ্ডিত মুখচ্ছবি মনে পড়িল।

অপরাহ্নে বেশভূষা সারিয়া সুরভিত স্নিগ্ধ 'দেলখোসে" রুমাল ভিজাইয়া লইয়া সতীন্দ্র যখন আপনাকে সান্ধ্য ভ্রমণের উপযোগী করিয়া লইতেছিলেন তখন সহসা সুধীর আসিয়া ভজনসিং তেওয়ারির নামে অভিযোগ করিল। তেওয়ারী দেউড়ির দ্বারবান। বালকের

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ ও আর্দ্র চক্ষুপল্লব তখনও রোদনের-চিহ্ন প্রকাশ করিতেছিল। সে আসিয়াই বলিল, "বাবা তেওয়ারী বড় মিথ্যা কথা কয়, না বাবা ?"

সতীন্দ্র যদিও তেওয়ারীর মিথ্যাপ্রিয়তার ইতিপূর্বে বিশেষ কোন প্রমাণ পান নাই, তথাপি পুত্রের সন্তোষের জন্য বলিলেন, সে ভারি দুষ্টু—তা'কে আর লাঠি খেল্‌তে দেব না—তা'হলেই খুব জব্দ হয়ে যাবে !" তেওয়ারির এই কঠিন শাস্তি সুধীরের মনঃপুত হইল. সে চক্ষু মুদিয়া বলিল, "বাবা তেওয়ারী ব'লে তুমি 'নূতন মা' আন্‌বে। তেওয়ারী ভারি মিথ্যে কথা কয়। মিথ্যে বল্‌লে পাপ হয়, না বাবা ?" পরক্ষণেই পিতার মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বলিল, "বাবা আমি 'নূতন মা' নেবনা—আমি মার কাছে যাব।"

৩

সমস্ত দিন বর্ষণের পর বৃষ্টি আসিয়াছে। শ্রাবণের আকাশে খণ্ড মেঘের অন্তরাল দিয়া সপ্তমীর চাঁদ সতীন্দ্রের বাতায়ন নিম্নে খর্জুর গাছের মাথার উপর উদিত হইয়াছেন ! খোলা জানালার সূক্ষ্ম 'নেটের' পর্দা আন্দোলিত করিয়া বর্ষার বাতাস শেফালিকার গন্ধ বহন করিয়া অবাধে গৃহে প্রবেশ করিতেছিল। বেহারা ঘরে তখনও আলো দিয়া যায় নাই। বৃষ্টির জন্য মক্কেল ও বন্ধু বান্ধব কেহই জুটিতে পারেন নাই। সতীন্দ্র আপনার নিভৃত কক্ষে শয়ন করিয়াছিল—ভাবিবার জন্য। সতীন্দ্র কি ভাবিতেছিল বলা কঠিন, কারণ সে এক বিষয় ভাবে নাই। সহস্র চিন্তার মধ্যে—সহস্র চিন্তাকে নিস্প্রভ করিয়া দিয়া—সেই আর্দ্রবসনা সুন্দরীর মানসী মূর্তি যে তাহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "খোকা বাবুর বড় অসুখ" —কর্তা বাবু তাঁহাকে ডাকিয়াছেন। সতীন্দ্রের মোহের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল ! সহসা চকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন ;—তাঁহার মনে হইল, এ কয়দিন সে তাহার নিকট বড় আসে নাই। যাহার আহার, নিদ্রা, খেলা পিতা ভিন্ন সম্পন্ন হইত না : সে কেমন করিয়া পিতাকে ছাড়িয়া রহিয়াছে। সতীন্দ্র ভাবিয়া পাইলেন না যে, কি কুহকে তিনি পুত্রকে ভুলিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃগর্বে আঘাত লাগিল, মনে হইল বালকের ক্ষুদ্র হৃদয় ইতিমধ্যেই পিতৃস্নেহের অভাব অনুভব করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, সহর হইতে ডাক্তার আনিতে লোক গিয়াছে,—সুধীরের কলেরা হইয়াছে। সমস্ত রাত্রি নিদ্রাহীন সতীন্দ্র পুত্রের মাথার কাছে বসিয়া কাটাইয়াছেন। ডাক্তার বলিয়াছেন—"বিশেষ ভয়ের কারণ আছে, রোগ আসল !"

দারুণ তৃষ্ণায় বালক ক্রমাগত 'জল', 'জল' করিয়া একটু পূর্বে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার রোগশীর্ণ মুখে ঈষৎ শান্ত জ্যোতিঃ প্রকাশিত ! নিবিড় পক্ষ্মাচ্ছাদিত কৃষ্ণতারাচক্ষু দুইটি অর্দ্ধ নিমিলীত ! রোগের যন্ত্রণায় বালক যখন "মা-মা" বলিয়া ডাকিতেছিল—তখন সতীন্দ্রের দুই চক্ষু শোণিততুল্য তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। দারুণ রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও বালক বার বার বলিয়াছে "বাবা—আমি 'নূতন মা' নেবনা !"—এখন সতীন্দ্রের কানের ভিতর—প্রাণের ভিতর বাজিতেছিল "বাবা—আমি 'নূতন মা' নেবনা।" নানা সুধীর তোমার 'নূতন মা' লইয়া কাজ নাই ! সতীন্দ্রের মোহ কাটিয়া গিয়াছে। অদূরে ডাক্তার সাহেব ঔষধের খালি শিশি লইয়া উদ্বিগ্নভাবে নাড়িতেছিলেন। সতীন্দ্র জানিত না যে প্রথমবার ভেদের সহিত সুধীরের নাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে। তাই পুত্রকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিয়া তাহার চিন্তারেখাঙ্কিত ললাট অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু মনুষ্যবুদ্ধির অনধিগম্য যে বিপুল কারণরাশি কার্য

করিতেছে—তাহার প্রতিবিধান করিবে কে ? নিভিবার পূর্বে দীপশিখা যেমন উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করে,—সুধীরের নির্বাণোন্মুখ জীবনদীপও তেমনি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তন্দ্রা-ত্যাগে বালক পিতার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল—"বাবা—আমি মার কাছে যাই ; মা আমাকে ডাকছে ! সেখানে কত ফুল, কত আলো, কত কি আছে। তুমি যাবে না বাবা ?" বলিতে বলিতে শ্রান্ত হইয়া সুধীর চুপ করিল।

শ্রাবণের অকাল-সন্ধ্যা যখন চারিদিকে ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল—দূরে গোপালজীউর মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা ও কাঁসরের শব্দ স্তব্ধ সন্ধ্যাকে সজাগ করিয়া তুলিতেছিল—ঠিক সেই সময়টিতে সুধীরের সমস্ত রোগ-যন্ত্রণার অবসান হইয়া গেল ! তাহার পুষ্প পুট তুল্য সুন্দর মুখে একটি শান্তির স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল !

প্রতিভা দেবী

দশম বৎসর

অসংযত

১

শশিভূষণ যখন তৃতীয়বার পঞ্চম শ্রেণীতে পড়িতেছিল, তখন কোন কারণে সে মাষ্টার মহাশয় কর্তৃক অত্যন্ত প্রহৃত হয়। সে দিন বাড়ী যাইয়া তাহাব জ্বর আসে।

শশিভূষণের ঠাকুরমা, মাষ্টাব মহাশযের ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের আহার্যের সুব্যবস্থা কবিয়া বলিলেন, "দরকার নেই বাপু তোর ইস্কুল গিয়ে, বেঁচে থাক তোর দাদারা, তোব ভাবনা কি ?" শশিভূষণের বড় দুই দাদা,—একজন স্থানীয় জমিদারের ম্যানেজার, আর একজন উকিল,—সে কথা শুনিলেন , কিন্তু কিছু বলিলেন না। বোধ হয় তাঁহারা শশির মত বুদ্ধিমান বালকের জন্য অর্থ ব্যয়টাকে নিতান্তই নিরর্থক ভাবিতেন, না হয়, পিতৃমাতৃহীন শশির ভার ঠাকুরমার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন,—এবং তাঁহার উপর কথা কহা অনধিকাব চর্চা ভাবিতেন।

জ্বর সারিতে শশিভূষণের বিলম্ব হইল না—বিশেষ যখন ইস্কুল না যাওয়া রূপ এতবড় একটা প্রীতিপ্রদ ভবিষ্যৎ তাহাব সম্মুখে বর্তমান ! এরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া সে নিজেকে অত্যন্ত সুখী বোধ করিল , এবং সহসা তাহার এই সৌভাগ্যোদয়ে নাকি তাহার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুব সহিত বিচ্ছেদের উপক্রম হইয়াছিল।

শশিভূষণের প্রকৃতিটা অদ্ভুত রকমের ছিল। ক্লাসে যখন মাষ্টার মহাশয় অঙ্ক বুঝাইতে গলদ ঘর্ম হইতেন, তখন সে অত্যন্ত মনোযোগ-সহকারে তাহাদের ইস্কুল ঘরের সম্মুখস্থ বাঁশ বনের প্রত্যেক পাতার কম্পনটি পর্যন্ত দেখিতে ব্যস্ত ! সে অত্যন্ত নিরীহ ছিল, এমন কি মাষ্টার মহাশযের কঠিনতম শাস্তি পর্যন্ত নির্বাকভাবে সহ্য করিত ; কিন্তু যে দিন ঘন-ঘোর মেঘ তাহাদের ইস্কুলঘরের ছাদ হইতে বাঁশ বনের মাথা এবং নদীর কূল পর্যন্ত ছাইযা ফেলিত, সে দিন মাষ্টার মহাশযেব অত্যন্ত খরতর দৃষ্টি লঙ্ঘন করিয়াও সে ভাঙ্গন ধরা নদীর কূলে, বটগাছের তলায় চুপচাপ করিয়া গিয়া বসিত ! সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ধীরে ধীরে নামিয়া আসিত, তখন সে মুগ্ধ হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত ! শশির দাদার বন্ধুদেব

মধ্যে কেহ কেহ বলিতেন, ছোঁড়াটা বড় sentimental হবে, কেহ বা বলিতেন, পাগল হওয়া ছাড়া তার অন্য কিছু হওয়ার লক্ষণ দেখা যায় না।

ইস্কুল ত্যাগ করিয়া ক্ষুধিতের মত সে প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। সেই পুরাতন বাঁশ বন. আমবাগান, বটগাছ, আঁকা বাঁকা নদী, কিন্তু তাহাদেরই উপর কি অপূর্ব নেশা! তাহাদেরই ভিতর সে সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াইত, এবং যখন শ্রান্তি বোধ করিত তখন নদীর কূলে গিয়া বসিত। সেখানে দেখিত বড় বড় নৌকা ভাসিয়া আসিতেছে—তাহাদের মাঝিবা তালে তালে দাঁড় ফেলিতেছে, আর সেই শব্দে সুব মিলাইয়া কাঁপাগলায় আপনাদেব সুখ দুঃখের গান গাহিতেছে।

এমনি করিয়া সে জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান দিন কয়টা নদীর কূলে, ও গাছের তলায় কাটাইয়া দিল। ঠাকুরমার যে অঞ্চল তাহাকে পৃথিবীর ঝঞ্ঝাবাত হইতে রক্ষা করিতেছিল, বেচারা জানিত না, যে দিন তাহা অপসাবিত হইযা যাইবে, সে দিন তাহার আশ্রয়হীন মস্তককে বজ্রপাত হইতে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।

কিন্তু এখানেও যদি শেষ হইত, তাহা হইলে না হয় সে এক রকম করিয়া তাহার জীবনটাকে কাটাইয়া দিতে পারিত ; কিন্তু তাহাও হইল না। মৃত্যুব তিন মাস পূর্বে ঠাকুরমা ধূম ধাম করিয়া শশির বিবাহ দিলেন। তাহাব পব একদিন সন্ধ্যায় শশিকে আশীর্বাদ কবিতে করিতে ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

২

থিযেটারে যেমন মুহূর্তের মধ্যে অট্টালিকা, উপবন, অন্তর্হিত হইয়া তাহাব স্থানে ভীষণ প্রান্তর আসিযা উপস্থিত হয়, ঠাকুরমাব মৃত্যুব পর সংসার তাহার সমস্ত সৌন্দর্য ত্যাগ কবিয়া তেমনি শশির সম্মুখে ভীষণ ভাবে দেখা দিল! আজ প্রথম শশি নিজেকে ভাল করিয়া দেখিবার অবসর পাইল! এই দীর্ঘ সংসাব যাত্রার জন্য সে কি পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছে? হায়, সে তাহাব জীবনযাত্রার জন্য অত্যাবশ্যকীয় যাহা, তাহাও জুটাইতে পারে নাই!

তাহার উপব তাহাব দাদাদেব উদাসীন ভাব তাহাকে দগ্ধ কবিতে লাগিল ' উহা যেন তাহার অযোগ্যতাকে তাহার নিকট শতগুণে স্পষ্ট করিয়া তুলিল! তাহাব মত অপদার্থ লোককে দু'মুঠা খাইতে দিয়াই কি তাঁহারা যথেষ্ট করেন নাই? সে তাহার উপর এমন কি সুকৃতি করিয়াছে যে, তাঁহাদের সহিত মিশিবার যোগ্য হইতে পারে?

শশি চাকুরীর জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল,—কে তাহাকে চাকুরী দিবে? চাকুরীর আশায় শ্বশুরকেও অনুরোধ করিল ; তিনি কোন উত্তরই দিলেন না। অবশেষে সে বাব টাকা বেতনে স্থানীয় জমিদারের গোমস্তা নিযুক্ত হইল।

পাখী যেমন কুলায়ের ভিতর থাকিয়া ঝঞ্ঝা হইতে আপনাকে রক্ষা করে, তেমনি শশি কাছারির সময় ভিন্ন সকল সময়ই আপনার ক্ষুদ্র গৃহে আপনাকে পৃথিবীর ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্য হইতে রক্ষা কবিত!

৩

শশির শ্বশুর শুনিলেন, জামাতার চাকুরী হইয়াছে ; সুতরাং কন্যা সুভাকে জামাতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

যে তাহাব জীবনের চিরসঙ্গিনী—আজ সন্ধ্যার পর তাহার সহিত দেখা হইবে ! শশীর জীবনেও যে আজ একটা নূতন দিন, তাহা সে অনুভব করিল।

একটি ছোট বেতের বাক্সে করিয়া এক শিশি কুন্তলীন, দেলখোস, এবং একখানা কবিতার বই লইয়া, শশি তাহাব গৃহে প্রবেশ করিল। সুভাব কাছে গিয়া বলিল,

'সুভা তোমার জন্যে এনেছি',—বলিয়া এক এক করিয়া সুভার হাতে দিতে গেল।

পাথরে যেমন দাগ পড়ে না, তেমনি সুভার মুখ একটুও পরিবর্তিত হইল না, পাশের টেবিল দেখাইয়া বলিল, 'রাখ'।

কলের পুতুলের মত শশি তাহার উপর জিনিস কয়টা রাখিয়া দিল।

তাহার পর সুভা কথা কহিল, 'ক টাকা মাইনে হ'ল'?

শশি একবার সুভাব মুখের দিকে চাহিয়া মাথা নীচু করিয়া বলিল 'বার'।

'ওমা ছি ! বার টাকার মাইনের চাকরী ক'ত্তে লজ্জা হ'ল না ! মাসান্তে একটা লোকের কাপড চোপড়েই ত' বার টাকা কুলোবে না।'

দম্পতির এই প্রথম আলাপ ! শশিভূষণ কাঠেব পুতুলেব মত চাহিযা রহিল !

*   *   *   *   *

প্রতি রাত্রে তাহাদের মধ্যে যে আলাপ হইত, তাহাতে কোন বৈচিত্র্য ছিল না। সুভা বসিয়া বসিয়া নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিত। তাহার জায়েদের অবস্থা কত ভাল, আব সে তাহাদেব দাসীব মত হইবাব যোগ্যও নহে। যাহাব পত্নীকে স্বচ্ছন্দে রাখিবাব ক্ষমতা নাই, সে বিবাহ কবে কেন? বাব টাকায তাহার কি হইবে? সে তাহার পিতা-মাতাব আদরেব কন্যা. শশিব হাতে পডিয়া তাহাব কি দুর্দশা—বলিয়া সুভা কাঁদিতে থাকিত. এবং শশিভূষণ মৃতের মত ঊর্ধ্বপানে চাহিয়া নিজের বিছানায় পডিয়া থাকিত।

সংসাবের অবহেলা হইতে শশিভূষণ নিজের গৃহে নিজেকে রক্ষা কবিত, কিন্তু সেখানেও অগ্নিস্পর্শ হইয়াছিল ; সুতবাং সে বাহিরে বাঁচিবার উপায় খুঁজিতে বাহির হইল। খুঁজিয়া খুঁজিয়া সে যে উপায আবিষ্কাব কবিল, তাহার কথা না লিখিলেই ভাল হইত।

শশির এক বন্ধু এক গ্লাস মদ দিয়া কহিল, খেয়ে দেখ ভাই, এতে কোন দুঃখ, কোন কষ্ট থাক্‌বে না ; সব জ্বালা যন্ত্রণা ভুলে যাবে।'

অমৃতেব মত সাদরে গ্রহণ করিয়া শশি বলিল 'সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ সত্যি।' তখন শশি তাহা নিঃশেষ করিল।

সে দিন সমস্ত রাত্রি শশি নেশায় অভিভূত হইযা রহিল। অন্য দিনেব মত সুভা তাহার বিষ উদগীরণ করিতে লাগিল ; কিন্তু সে দিন আব তাহা কাহাকেও দগ্ধ করিতে পাবিল না। সে দিন উগ্রতর গরলের তেজে শশিভূষণ সুভার বিষ ব্যর্থ করিয়া দিল।

এ অমৃতেব নেশা শশি ত্যাগ করিতে পারিল না।

যে তাহাকে মুহূর্তেব জন্যও সংসারেব জ্বালা ভুলাইয়া দেয়, সে তাহার পরম মিত্র ! তাই প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে যখন দীর্ঘ রাত্রির ভবিষ্য কাহিনী শানিত তরবারির মত তাহার মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িত, তখন সে সাদরে তাহার সুধা পান করিত।

৪

মাসান্তে শশি সুভার হাতে ছয়টি টাকা আনিয়া দিল।

টাকা দেখিয়া সুভা বলিল 'আর ছ'টাকা ? বারটি বইত টাকা নয়, তাও আবার সব নয়, এও না দিলেই হ'ত! কোথায় গেল বাকি টাকা ?

আঘাতের পর আঘাত পাইয়া শশির হৃদয়ও আজ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। সে স্থির করিয়াছিল আর যাহাই হউক, সে আজ আর মিথ্যা বলিবে না ; সত্য কথা তাহার জন্য যদি তীব্রতর অভিশাপ বহন করিয়া আনে সে তাহাই গ্রহণ করিবে। তাই কোন ভূমিকা না করিয়া বলিল,—

'বাকি টাকায় মদ খেয়েছি।'

বজ্রাহতের মত চমকিত হইয়া সুভা কহিল, 'মদ খেয়েছ কেন ?'

শশি স্থির করিয়াছিল সব কথা খুলিয়া বলিবে, বলিবে, 'পিশাচি তোর জন্য, তুই যদি মানুষ হইতিস ত এই বার টাকায় আমরা রাজার মত সুখে থাকিতাম।' কিন্তু সবটা বলিতে পারিল না, শুধু বলিল, 'তোমার জন্যে—'

সুভা নিজের বিছানা ছুড়িয়া ফেলিল এবং মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, 'আমি তোমার কি কল্লাম, আমার নামে এ কলঙ্ক কেন ? এত বড় দুর্নাম দেবার আগে আমাকে মেরে ফেল্লে না কেন ? ওগো আমার কি দোষ গো—' ইত্যাদি।

খানিক পরে উঠিয়া সে শশির নিকট গেল, বলিল, 'দিব্বি কব কাল আর মদ খাবে না, কাল থেকে ছেড়ে দেবে।'

শশি বলিল, 'হাঁ দিব্বি কচ্ছি।'

তাহাব পরদিন সন্ধ্যাকালে শশি যখন ঘরে আসিল, তখন সুভা দেখিল সে, আবাব মদ খাইয়াছে। সে দিনও সুভা তাহাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিল, এবং পূর্বেরই মত শশী প্রতিজ্ঞা করিল যে, আর সে এমন কাজ করিবে না।

তাহার পর সমস্ত দিনটা তাহার প্রতিজ্ঞার কথা মনে রহিল ; কিন্তু যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, তখন যেন একটা মহাদৈত্য জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া, মদের দোকানের সামনে দাঁড় করাইয়া দিল, এবং সে অনন্যোপায় হইয়া সেই দোকানে প্রবেশ করিল। যখন বাহির হইয়া আসিল, তখন পৃথিবীর সুখ দুঃখ তাহার নিকট নিতান্ত তুচ্ছ মনে হইতে লাগিল।

৫

এমনি করিয়া আরো পাঁচ ছয় দিন গেল।

সে দিন যখন শশি আবার মদ খাইয়া আসিল, তখন সুভা তাহাকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিল, বলিল, 'তোমার লজ্জা করে না! একে ত তুমি নিজে অপদার্থ, তাহার উপর নিজেকে এমন করিয়া পশু করিয়া ফেলিতে তোমার এতটুকু সঙ্কোচ বোধ হয় না ? তুমি ভদ্রসন্তান, তার উপযুক্ত কি এই ব্যবহার ? ছিঃ ? তুমি যখন কিছুতেই আমার কথা শুনলে না, তখন তোমার দাদাদের ব'লে দেব, দেখি তাঁরা কি করতে পারেন।'

সে দিন সমস্ত রাত্রি শশির ঘুম হইল না। সে ভাবিতে লাগিল সুভা সত্যই বলিয়াছে। আমি শুধু দোষ করিয়াছি তাহা নয়, বাস্তবিকই পশুর মত হইয়া গিয়াছি ; সামান্য একটা

অভ্যাস, ইহার জন্য আমি আমার বংশে পর্যন্ত কলঙ্ক দিতেছি, এটুকু আমার বল নাই যে আমি তাহা ত্যাগ করি। আর যদি সুভা দাদাদের বলিয়া দেয়—আর, তাঁহারা আমাকে তাড়াইয়া দেন—তাহা হইলে? হয় ত ভগবানের ন্যায় বিচারে আমিই দোষী স্থির হইব!—দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

শেষ রাত্রে শশিভূষণ ধীরে ধীরে আপনার শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল, সুভার বিছানার নিকট গিয়া বলিল, 'সুভা, জেগে আছ?'

সুভা উত্তর করিল, 'হ্যাঁ'।

খানিকটা থামিয়া শশি বলিল, 'সুভা, আমাকে বিশ্বাস কর, তোমার গা ছুঁয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আর মদ খাব না।'

সুভা খানিকটা সরিয়া গিয়া বলিল, 'ঢের হয়েছে, যে মদ খায় সে আবার আমার গা ছুঁতে আসে কোন্ লজ্জায়! তুমি ত রোজই প্রতিজ্ঞা কর, সে ত আর নূতন কথা নয়।'

কোনরূপ চোখের জল নিবৃত্ত করিয়া শশিভূষণ বাহিরে চলিয়া গেল, তখনও ভাল করিয়া ভোর হয় নাই।

৬

তৃতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্রের পাণ্ডুকিরণ বারান্দায় সুভাব মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। আজ সমস্ত দিন শশিভূষণ একবারও বাড়ীতে আসে নাই। তাই বোধ হয় শশিব জন্য আজ সুভার মন কেমন করিতেছিল! শশির জন্য সুভার মন যে এতটুকু ব্যাকুল হইতে পারে, আজিকার সন্ধ্যার পূর্বে সুভা সে কথা কখন বোঝে নাই, সহসা এই অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্নার ভিতর সে নিজের কেমন একটা অভাব বোধ করিতে লাগিল! আজ সে শশির দাদাদের মদ খাওয়ার কথা বলিয়া দিয়াছিল, শঙ্কা হইতে লাগিল, আবার যদি সে মদ খাইয়া আসে, না জানি তাঁহারা কি শাস্তি দিবেন। আর যদি না খায়! সুভার চক্ষে জল ভরিয়া আসিল। 'হে ঠাকুর তাই যেন হয়—'

এমন সময় পার্শ্বে ছায়া পড়িল; সুভা দেখিল শশিভূষণ টলিতে টলিতে আসিতেছে।

সুভা তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'আবার আজ খেয়েছ।'

শশিভূষণ ঘাড় নাড়িল, 'না সুভা আজ আর খাইনি; তোমাকে ছুঁতে দেও, তোমার কোলে মাথা রাখতে দেও বলছি।'

ক্ষুদ্র বালকের মত শশিকে নিজের বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া সুভা কহিল, 'আঃ, খাওনি ত?'

শশি জোর করিয়া চাহিয়া বলিল, 'না আজ আর খাইনি। সন্ধ্যাবেলা তৃষ্ণা যখন আকণ্ঠ হয়ে এল—তখন সুভা।'—

শশীর মুখর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সুভা কহিল, 'তখন?'

ধীরে ধীরে চোখ বুজিয়া শশী কহিল, 'বিষ খেয়েছি।'

শুনিয়া সুভা চিৎকার করিয়া মূর্চ্ছা গেল; এবং সেই শব্দে যখন শশির দাদারা শশিকে ভর্ৎসনা করিতে ছুটিয়া আসিলেন, তখন সে অস্তমান চন্দ্রের শেষ পাণ্ডুর কিরণে তাহার উপেক্ষিত জীবনেব ক্ষুদ্র কাহিনীটুকু শেষ করিয়া ফেলিয়াছে.

সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সুপ্তি ভঙ্গ

১

সুবোধ বাবুর অনতিক্ষুদ্র ইষ্টকালয়ের, দ্বিতলের একটি কক্ষে, তাঁহাব সহোদরা লতিকা কৌতূহলপূর্ণ চিত্তে, একখানি ডিটেকটিভ উপন্যাস পাঠ করিতেছিল। কিন্তু তাহার অত একাগ্রতা, আদরের ভ্রাতুষ্পুত্রীর ভাল লাগিতে ছিল না। বালিকা, ক্রমাগত পুস্তকখানি ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল। ইচ্ছা, পুস্তক ফেলিয়া পিসীমা তাহাকে আদর কবে। কিন্তু পিসী, তখন গল্পের মধ্যভাগের বিচিত্র ঘটনাবলীর ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল। ভ্রাতুষ্পুত্রীব আবদারের প্রতি লক্ষ্য ছিল না। ব্যর্থ মনোরথ বালিকা, অবশেষে তাহার অমোঘ অস্ত্র, ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া দিল। তখন পুস্তক রাখিয়া "না না খুকুমণি রাগ করো না, চল তোমাব মার কাছে যাই।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

দুপুরবেলায় ভ্রাতৃজায়ার কক্ষ দ্বার অর্গলাবদ্ধ দেখিয়া লতিকার কৌতূহল জন্মিল। ছিদ্র দ্বারা উঁকি দিয়া দেখিল, ঘরের মেঝের এক পার্শ্বে কতকগুলি সূতা ও অপব দিকে একবাশি তুলা, মধ্যস্থলে ভ্রাতৃজায়া চরকা লইয়া সূতা কাটিতেছেন! লতিকা বিস্মিত হইয়া খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "ও কি বউ, ঘরের দবজা বন্ধ করে ও কি হচ্ছে লো?"

বধূ বড় অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। ননদ বয়সেব ঐক্যতা সূত্রে আবদ্ধ, প্রগাঢ় প্রণয়। তাহার নিকট গোপনেব প্রয়োজন না থাকিলেও বধূব ইচ্ছা ছিল, কার্যশেষে তাহাকে একেবারে বিস্মিত করেন। কিন্তু লতিকা সমস্ত দেখিয়া ফেলিয়াছেন। অগত্যা দ্বাব খুলিযা দিলেন।

লতিকা কহিল, "বউ, এত সূতা কাটিতেছিস্ কেন ভাই?" বধূ নির্মলা মৃদু হাসিয়া কহিল, "আমি ভাই একটা ব্রত নিয়েচি।" "ব্রত নিয়েছিস তা এত লুকোলুকি কেন? এতে বুঝি স্বামী বশ হয়?" নির্মলা উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, "তা হলে ভাই তোকে আগে শেখাতুম।" লতিকা ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল, "আচ্ছা তবে বলবিনি?"

নির্মলা কহিলেন, "বলব না কেন ভাই? তোরা ঠাট্টা কববি, তাই বলিনি; তা যেমন ভাই তেমনি বোন। স্বদেশী আন্দোলনের কোনও খববই রাখে না। জানিসনি মহিলাসভায় অনেকে প্রতিজ্ঞা কবিয়াছে যে, এবার পূজার সময় স্বহস্ত প্রস্তুত বস্ত্র পবিধান করিয়া প্রতিমা দর্শন করিবে।"

"ও তাই তুমি সূতা কাটচো! আচ্ছা ওতে দেশের কি উপকাব হবে?" "নয় কেন বোন্, দেখ সকলে যদি এই রকম ঘরে ঘরে চরকা কাটতে ও তাঁত বুনতে শিখে, তাহলে অভাব স্থলে তাদের লজ্জানিবারণের জন্য, স্বামী পুত্রকে আব বিদেশীর দ্বারস্থ হতে হয না। স্বদেশী বস্ত্রের অপ্রতুল দেখচো তো?"

"তবে আমাকেও শিখতে হোল।" বলিয়া চরকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে লতিকা বলিল, "দেখ ভাই, তিনি তোমার বড় সুখ্যাতি করেন। এখানে আসিবার সময় কেবল বলেন, "তোমাব বৌদিদির কাছে সব শিখবে।"

নির্মলা লজ্জিতা হইয়া কহিলেন, "ঠাকুরজামায়ের কথা ছেড়ে দাও। তিনি নিজের মত সকলকেই ভাল দেখেন।"

কন্যাকে কোলে লইয়া নির্মলা জানালার নিকট দাঁড়াইলেন। তাঁহার শয়নকক্ষের

পশ্চাদ্ভাগে একটি স্বচ্ছসলিলা ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর ইষ্টক নির্মিত বাঁধা ঘাট, একটি ঘনপল্লবিত শেফালি বৃক্ষ ও একটি শাখাবহুল অশ্বত্থবৃক্ষের ছায়াবরণে স্নিগ্ধ সুশীতল বাটী হইতে ঘাটে যাইবার পথটির উভয় পার্শ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পবৃক্ষগুলি গৃহস্বামীর রুচিকুশলতার পরিচয় প্রদান করিতেছিল। পুষ্করিণীর অপর পারে একটি অর্দ্ধভগ্ন পতনোন্মুখ বাটী পুষ্করিণীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। পার্শ্ব দিয়া রাজপথ চলিয়া গিয়াছে। বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য নিষ্প্রভ ও লোহিত মূর্তি ধারণ করিয়াছিল। নির্মলা রাজপথের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কহিলেন, "ঠাকুরঝি, আজ সতু এখনও এলো না কেন?"

সতু বা সত্যপ্রিয় সুবোধ বাবুর প্রথমপক্ষের পুত্র।—নির্মলা তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী।

২

সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিযাছে। তথাপি সত্যপ্রিয়কে স্কুল হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইতে না দেখিয়া সকলেই উদ্বেগাকুল হইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যা অন্ধকার চতুর্দিক যত আচ্ছন্ন হইতেছিল, তাঁহাদের চিন্তাতুর হৃদয়ের চিন্তা-মেঘ ততই গাঢ় হইয়া আসিতেছিল।

ভৃত্য রামধন সত্যপ্রিয়ের সহপাঠিদিগের নিকট হইতে সংবাদ আনিল যে, স্কুল হইতে প্রত্যাগত হইবার সময় কতকগুলি ছাত্র "বন্দে মাতরম্" বলিয়া চিৎকার করিতেছিল। থানার নিকট পুলিস প্রহরীগণ তাহাদের "বন্দে মাতরম্" বলিতে নিষেধ করে। তাহারা সে কথা গ্রাহ্য করে নাই। এ জন্য পুলিস প্রহরীগণ বালকদিগকে আক্রমণ করে। ছাত্রেরা সকলে পলায়ন করে। কেবল দুই চারিজন পলায়নাক্ষম নির্দোষী ধৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ সত্যপ্রিয়ও তাহাদিগের সহিত ধৃত হইয়াছে।

সংবাদ শ্রবণে সত্যপ্রিয়ের বৃদ্ধা পিতামহী শয্যা গ্রহণ করিলেন। এবং তাঁহাবা উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন লহরীতে শান্ত নীরব সন্ধ্যা মুখরিত ও পল্লিবাসীর গৃহে গৃহে সে বার্ত্তা প্রচারিত হইল।

পল্লীবাসীর সহিত সুবোধ বাবুর তেমন সদ্ভাব ছিল না। কারণ তিনি বড় অসামাজিক লোক। বহির্বাটীতে তাঁহার একটি বসিবার ঘর, বা বৈঠকখানা ছিল বটে, কিন্তু সেখানে তাঁহাকে কদাচিত দেখা যাইত। নিষ্প্রয়োজনে বাটীর বাহির হইতেও তাঁহাকে সচরাচর দেখা যাইত না! আফিস হইতে আসিয়া তিনি শয়নকক্ষে আশ্রয় লইতেন। তথায় আলবোলা ও সংবাদ-পত্র তাঁহার সহায়। তিনি পল্লীবাসীর সহিত মিশিতেন না, বা তাহাদের বিপদাপদের সংবাদ বাখিতেন না। বিশেষতঃ সম্প্রতি স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী-জ্ঞানে পাড়ার উৎসাহী যুবকেরা তাঁহাব প্রতি আরও চটিযাছিল। এত সভাসমিতি, এত উৎসাহ, এত একতা—দেশের আবালবৃদ্ধ যাহাতে তন্ময়, তিনি সে সকলেব কিছুতেই যোগ দিতেন না। ববং তাঁহার বাক্যে ও ব্যবহারে বিপরীত ভাবই প্রকাশ পাইত। সুতরাং তাঁহার এই আকস্মিক বিপদের সংবাদে তাহারা দুঃখিত হইল কি তাঁহার শিক্ষালাভের আশায় সন্তুষ্ট হইল, বলিতে পারি না।

সুবোধ বাবু গৃহে আসিয়া বস্ত্র পরিবর্তনের অবসর পাইলেন না। দুগ্ধপোষ্য বালকদিগের প্রতি অন্যায় অত্যাচাবে তিনি পুলিস প্রহরীগণের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন কাবীদিগের প্রতি অত্যধিক বিরক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে নেতাদিগকে নানারূপ ভদ্রোচিত বিশেষণে বিশেষিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য।

তাঁহাকে অধিক দূর যাইতে হইল না। তিনি যাহাদিগকে স্বদেশী আন্দোলন রূপ সকল অনিষ্টের মূল বিবেচনা করিয়া গালি দিতেছিলেন, পথিমধ্যে তাঁহার পুত্রকে সেই সকল নিষ্কর্মা, হুজুকপ্রিয়, অশিষ্ট যুবকগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিলেন ; এবং পুত্রের মুখেই জ্ঞাত হইলেন যে, তাহাদিগেরই অশেষ চেষ্টায়, অর্থব্যয়ে ও অজস্র বাক্‌বিতণ্ডায় সে মুক্তিলাভ করিয়াছে এবং আহারাদি করিয়া সুস্থ হইয়াছে।

৩

রাত্রে আহারাদির পরে সুবোধ বাবু শয্যায় শয়ন করিয়া তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন। মেঝেতে মাদুর পাতিয়া পুত্র সত্যপ্রিয় একখানি পুস্তক হস্তে বসিয়াছিল। বালক আজ আর পাঠে মনোনিবেশ করিতে পারে নাই। বৈকালের ঘটনাবলীর প্রভাব তাহার চিত্তে আধিপত্য বিস্তারকরিতেছিল। বহুক্ষণ আশঙ্কা ও ক্ষুৎপিপাসাজনিত ক্লেশভোগের পর, এক্ষণে তাহার বিশ্রামের আবশ্যক হইয়াছিল। বিশেষতঃ পিতার অশ্রান্ত তিরস্কার ও উপদেশ-ভারে সে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। পিতা, তাহার অসৎসঙ্গ ও অসতর্কতাই অদ্যকার বিপদের কারণ নির্দেশ করিয়া তিরস্কার করিতেছিলেন ; সঙ্গনির্বাচনে যে তাহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না, বালক তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু অতগুলি সহপাঠীর মধ্যে কে কখন "বন্দে মাতরম" বলিবে, পূর্ব হইতে কি উপায়ে জ্ঞাত হইয়া সাবধান হওয়া যায়, তাহা কোন ক্রমেই সত্যপ্রিয়ের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের আয়ত্ত হইতে ছিল না ! বেচারী উপায়ান্তর না দেখিয়া পলায়নের অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু অনামনস্ক হওয়া দূরে থাকুক, আজি তাহারই প্রতি পিতার অখণ্ড মনোযোগ ; সুতরাং সুযোগ হইতেছিল না।

নির্মলা গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "আহা, ওকে আবার শুধু শুধু বকিতেছ কেন ? যাও সত্তু, তুমি শোওগে।"

সত্যপ্রিয় যখন দুই বৎসরের শিশু তখন নির্মলার বিবাহ হয়। সেই সময় হইতে তিনি তাহাকে পুত্রবৎ পালন করিয়া আসিতেছেন। অকৃত্রিম স্নেহে বালক তাহাকে গর্ভধারিণী জননী বলিয়াই জানিত। সত্যপ্রিয়ের সকল কথা, সকল আবদার নির্মলার নিকট। পিতা তিরস্কার করিলে বালক মায়ের নিকট আশ্রয় লইত। তাহাকে লইয়া মধ্যে মধ্যে স্বামী-স্ত্রীতে বাদবিসম্বাদও হইয়া যাইত। সুতরাং মাকে দেখিয়া সত্তুর চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া আসিল। সে একবার তাহার অশ্রু-ভারাকুল নয়ন যুগল মায়ের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া ধীরে ধীরে শয়ন করিতে গেল।

সুবোধ বাবুর সম্মুখে পানের ডিবাটি রাখিয়া, নির্মলা প্রদীপ উসকাইয়া দিয়া, তাঁহার প্রতি রোষপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "একে তো ছেলে ভয়ে ক্ষিদেয় তেষ্টায় সারা হয়ে গেছে, ওকে কি আবার বকিতে হয় ? আর ওর দোষই বা কি ?"

সুবোধ বাবু পান তুলিয়া লইয়া নির্মলার সুন্দর মুখখানির প্রতি চাহিয়াছিলেন। বাস্তবিক নির্মলা বড় সুন্দরী। তাঁহার কাল কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি কপালের উপর পরিপাটী রূপে, ফুলের পাপড়ীর মত থরে থরে স্থাপিত হইয়া আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। সেমিজ ও খয়ের রংয়ের সাড়ীখানি তাঁহার বিকশিত যৌবন-গৌরব সম্পূর্ণ আবরিত করিতে পরে নাই। গঠনগুণে অলঙ্কারগুলিও সুন্দর মানাইয়াছিল। নির্মলার, কাচপোকার টিপ-শোভিত ললাটস্থিত অলকস্পর্শী নিবিড় ভ্রূযুগ-তলে, কৃষ্ণোজ্জ্বল নয়নের রোষদীপ্ত কটাক্ষে, সুবোধ বাবু প্রমাদ গণিলেন। আমতা আমতা করিয়া কহিলেন, "না না বকি নি, তবে সাবধান করে

দিচ্ছিলুম, যেন ওসব ছেলেদের সঙ্গে না মেশে।"

নির্মলা কহিল, "তুমি পুলিসের দোষ না দেখে কেবল ছেলেদের দোষ দেখচো! 'বন্দে মাতরম' বলাটা এমন কি দোষের কাজ যে পুলিস ছেলেদের আটক করে? আচ্ছা, পুলিসের কনষ্টেবলরা না হয় ছোট জাত, অশিক্ষিত। কিন্তু অনেক ভদ্র সন্তানও পুলিস বিভাগে কর্ম করেন, তাঁহাদিগের ছেলেপুলে আছে, তাঁহারা কি করিয়া এই সকল অন্যায় কার্যের প্রশ্রয় দেন?" "কর্তৃপক্ষের নিকট যেরূপ আদেশ পান, তাঁহারা সেইরূপ কার্য করেন, তাঁহাদের অপরাধ কি?" সুবোধ বাবু এই উত্তর দিলেন।

"তাঁহাদের অপরাধ কি! চাকরী করিবে বলিয়া কি ধর্মাধর্ম ন্যায়ান্যায় সব বিসর্জন দিতে হইবে?"

"স্ত্রী পুত্র প্রতিপালনের জন্য তাহাও করিতে হয় বৈ কি!"

নির্মলা অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "তার চেয়ে মুটেগিরি করিয়া স্ত্রী পুত্র পালনও সম্মানজনক। আর অত স্বার্থ বিচারের জন্য ইতস্তত: করিয়া, অন্যায আদেশ পালন অপেক্ষা, তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করিতে সকলে যদি প্রস্তুত হইতে পারেন, এবং কোন স্বার্থান্ধ যদি সে পদ গ্রহণে লোলুপ না হয়, তা হইলে, কর্তৃপক্ষের অন্যায় আদেশও যে অনেকটা সংযত ভাব ধারণ করে, তাহার সন্দেহ নাই। আপনার আত্মসম্মান জ্ঞান থাকিলে অপরে তাহাকে অবহেলা করিতে সাহস করে না।"

"সে কথা বড মিথ্যা নয়," পত্নীর চিবুক ধারণ করিয়া সুবোধ বাবু কহিলেন, "তাই তো নির্মল! তুমি এত কথা কোথায় শিখিলে?"

নির্মলা কহিলেন, "ঠাট্টা কর আর যা' কর, তুমি কিন্তু ছেলেকে, জন্মভূমিকে মা বলে ডাকতে মানা করতে পারে না। 'বন্দে মাতরম' বলিলে যদি দোষ হয়, তবে মাকে মা বলিয়া ডাকলেও দোষ হ'তে পারে।"

সুবোধ বাবু নির্মলার অপূর্ব যুক্তি শুনিয়া কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া কহিলেন, "কিন্তু রাজার নিষেধ যে।"

"মিথ্যা কথা, রাজা কখনও এমন অন্যায় আদেশ করিতে পারে না।"

সুবোধ বাবু অগত্যা নিরুত্তর হইলেন। তাঁহার মতামত যাহাই হউক, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীটি তাঁহার আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাহিরে। গৃহে তাঁহার স্বাধীন মত টিকিত না।

বাহিরে তিনি শত ব্যক্তির অনুরোধ সুযুক্তি উপেক্ষা করিয়া, দুই চারি আনার সুবিধার জন্য, বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু গৃহে পত্নীর ভ্রূকুটি তাঁহার সহ্য হইত না। শিক্ষিতা ভার্যার নিকট আপনার সঙ্কীর্ণ মত ব্যক্ত করিতে সাহস না করিয়া তিনি তাঁহার উদার মতাবলম্বনে বাধ্য হইতেন। এই মৌখিক মতানুবর্তন, আন্তরিক পরিবর্তনের সূচনা আরম্ভ করিয়াছিল কি না বলিতে পারি না।

পত্নী ও পুত্রের অনুরোধে সুবোধ বাবু পরদিন পল্লীবাসী যুবকবৃন্দকে নিমন্ত্রণ ও পরিপাটী রূপে আহার করাইতে বাধ্য হইলেন। তদুপলক্ষে সুবোধ বাবুর সহিত তাঁহাদের এরূপ সদ্ভাব স্থাপিত হইল যে, যাত্রাকালে তাহারা স্বদেশী ভাণ্ডারের চাঁদা স্বরূপ তাঁহার নিকট কিছু আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছিল। পূর্বে তিনি অযথা হুজুকের প্রশ্রয় দান জ্ঞানে, এরূপ দানের বিরোধী ছিলেন।

পূজার আর বিলম্ব নাই। উদ্বোধন আরম্ভ হইয়াছে। পূজার ফর্দ উপলক্ষে, সুবোধ বাবুর গৃহে সকলে একত্রে সমবেত হইয়াছেন। বৎসরান্তে শারদীয়া পূজোপলক্ষে আত্মীয়স্বজন সকলের তত্ত্ব লইতে হইবে। গৃহিণী স্বয়ং উপস্থিত আছেন। ফর্দ লেখা সমাপ্ত হইয়াছে। ভ্রম সংশোধনার্থ তাহা পুনঃপঠিত হইতেছিল। যথা,—

"সত্যের জরীপাড় ধুতি, একখানা
" সিল্কের পাঞ্জাবী, একটা
" সিল্কের উড়ানি, একখানা
" ডসনের জুতা, এক জোড়া।

সত্য সহসা পাঠে ব্যাঘাত দান করিয়া কহিল, "না বাবা, আমার ডসনের জুতা চাই না। ইস্কুলের ছেলেরা সব দেশী জুতা কিনেচে। সে বেশ দেখ্‌তে।"

দ্বারের অন্তরাল হইতে, নির্মলা একবার প্রশংসাব্যঞ্জক নয়নে, পুত্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া স্বামীর প্রতি কি ইঙ্গিত করিলেন। তৎক্ষণাৎ "ডসনের" মস্তকে বজ্রাঘাত হইল।

বাজার করিয়া ফিরিতে রাত্রি হইল। গৃহিণী তখন ঠাকুরের সন্ধ্যারতির উদ্যোগ করিতেছিলেন। লতিকা ও নির্মলাকে আহ্বান করিয়া সুবোধ বাবু কহিলেন, "এই বেলা দেখিয়া লও, অপছন্দ হইলে জিনিস ফেরৎ যাইবে।"

তাঁহারা এক একটি দ্রব্যের আবরণ উন্মোচন করিয়া পরীক্ষা ও সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। কাপড় চোপড়, দেশী সাবান, দেলখোস, কুন্তলীন, প্রভৃতি দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

সুবোধ বাবু স্বহস্তে আবরণ উন্মোচন করিয়া দুইটি জ্যাকেট বাহির করিয়া কহিলেন, 'দেখ, দেখি!'

কারুকার্য খচিত সিল্কের জ্যাকেট দুইটি অর্দ্ধহস্ত পরিমিত লেস্ সংযোগে বাস্তবিক বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। লতিকা আগ্রহভরে কহিল, "সত্যি, জামাদুটি বড়ই সুন্দর।" আশান্বিত নয়নে সুবোধ বাবু নির্মলার দিকে দৃষ্টি করিলেন।

নির্মলা অপ্রসন্ন স্বরে লতিকাকে কহিলেন, "এই বুঝি বড় ভাল জিনিস!" ভাই বোনে বিস্মিত ভাবে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। নির্মলা কহিলেন, "সতু ছেলে মানুষ, তবু সে যাবার সময় বিদেশী জিনিস কিনতে মানা করলে, কিন্তু তুমি বড় বড় লেস দেখে ভুলে গেলে? ছি!"—ধিক্কারে সুবোধ বাবু মরমে মরিয়া গেলেন। লজ্জিত হইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "দোকানদার বল্লে এ খাঁটি স্বদেশী কাপড়ে তৈয়ারি, আর তুমিও পূর্বে বড় লেস দেওয়া জ্যাকেট পছন্দ করতে, তাই অত আর মনে নেই।"

নির্মলা কহিলেন, "ছোট ছেলেকে একটা উজ্জ্বল বিষাক্ত দিলেও সে লইতে আগ্রহ প্রকাশ করে। তাই বলিয়া জ্ঞান জন্মিলে আর সে ভাব থাকে কি?"

লতিকা কহিল, "না দাদা, তুমি ও জ্যাকেট ফেরৎ দাও।"

রামধন আসিয়া সংবাদ দিল স্বর্ণকার আসিয়াছে। বাকবিতণ্ডা স্থগিত রাখিয়া সকলে অলঙ্কার দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ষষ্ঠীর দিন ; ভোরের সময় হইতে সানাইয়ের ললিত রাগিণী । শুভ্র নির্মল শারদ প্রকৃতির দিগ্বলয় মুখরিত, ও গৃহে গৃহে দেবীর আগমন বার্তা বিজ্ঞাপিত করিতেছিল । তৎসঙ্গে একটি অনির্বচনীয় অব্যক্ত আনন্দ-স্রোত বঙ্গবাসীর হৃদয় মধ্যে হিল্লোলিত হইতেছিল । পদদলিত, বেদনাতুর বঙ্গসন্তান মাতৃদর্শনাশায় হর্ষে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল ।

নির্মলা ও লতিকা, জ্ঞাতিগৃহে প্রতিমা দর্শনোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন । পাল্কী আসিযাছে । গৃহিণী প্রস্তুত হইতে তাড়া দিতেছেন । লতিকা উপরে আসিয়া দেখিলেন, নির্মলা তাঁহার প্রকোষ্ঠস্থিত পূর্বপরিহিত কাচের চুড়ি চূর্ণ করিতেছেন । লতিকা কহিল, "ওকি বউ !" "বৎসরের দিন বিদেশী চিহ্ন লইয়া মাতৃ-দর্শনে যাইতে নাই ।" নির্মলা এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন ।

উভয়ে বেশ বিন্যাস করিয়া, স্বহস্তনির্মিত বসন পরিধান করিলেন । সুবোধ বাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "একি ! এ কাপড়ে কেন ?"

লতিকা কহিল, "এ বৌদিদির নিজের হাতে তৈয়ার করা কাপড় ।"

সুবোধ বাবু অবাক হইয়া রহিলেন । নির্মলার অদ্ভুত আচরণের সকল সময় তিনি মর্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন না । বিশেষতঃ স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত নির্মলা তাঁহাব নিকট আরও দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন ।

ভাব বুঝিয়া নির্মলা কহিলেন, "এ বস্ত্র পরিধান করিয়া দেবী প্রণাম করিলে, স্বামী পুত্রের, বৈদেশিক বিলাসবিহ্বল মন, জন্মভূমিব চরণে নত হয় ।"

বিজয়ার রাত্রে সুবোধ বাবু প্রণাম গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "নির্মলা, তুমি সে হার পর নাই কেন ? তাহাতে তো বিদেশের কোনও সংস্রব নাই ।"

নির্মলা অবনত মুখে নীরবে রহিলেন । তাঁহাকে নিরুত্তব দেখিয়া সুবোধচন্দ্র ক্ষুণ্ণস্বরে কহিলেন, "হার পছন্দ হয় নাই ?"

নির্মলা মৃদুস্বরে কহিল, "তা নয় ; তোমাব প্রদত্ত উপহার আমার বড ভালবাসার দ্রব্য । প্রিয়বস্তু, প্রিয়জনকে দান করিতে বড় আনন্দ । তাই আমি প্রিয়তমা জন্মভূমির উদ্দেশে তাহা "মাতৃভাণ্ডারে" দান করিয়াছি ।"

বিস্ফারিত অনিমিখ নয়নে, মহিমাময়ী পত্নীর লজ্জানত আননের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সুবোধ বাবু প্রসন্নস্বরে কহিলেন,—

"নির্মলা, তোমার দেবীপ্রণাম সদ্যই ফলপ্রসূ হইয়াছে । তোমার আদর্শে, তোমার স্বামীর চিত্ত আজ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে, আজ আমার সুপ্তিভঙ্গ হইয়াছে ।"

হায মা বঙ্গজননী, কতদিনে তোমার প্রতি গৃহে নির্মলার মত বধূ আসিয়া তোমার মুখ উজ্জ্বল করিবে ?

প্রমীলা দত্ত

অন্ধের দিব্যদৃষ্টি

১

সহসা আমি অন্ধ হইলাম। কয়েক বৎসব হইতে ক্রমাগত চক্ষুর পীড়াতে কষ্ট পাইতেছিলাম। চক্ষুর দৃষ্টি ক্ষীণ হইতেছিল, আমার পিতা অনেক ডাক্তার বৈদ্য দেখাইলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। সকলেই অস্ত্র করিতে হইবে বলিলেন। অগত্যা বাধ্য হইয়া আমায় অস্ত্র করাইতে হইল। আমায় ক্লোরোফরম করিতে করিতে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। যখন জ্ঞান হইল তখন আমি একেবারে অন্ধ হইয়াছি। দুটি চক্ষু সুদৃঢ়ভাবে পটিতে বাঁধা রহিয়াছে। শুনিলাম এক পক্ষকাল আমায সেইভাবে থাকিতে হইবে, নতুবা একেবারে অন্ধ হইতে হইবে।

আমি অস্ত্র করার সপ্তাহ অতীত হইবাব পব একদিন সন্ধ্যার সময আমার বসিবার কক্ষে জানালার পাশে বসিয়া আছি। কি কবিব ভাবিযা পাই না। অন্ধের কি জ্বালা চক্ষু নাই কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। আমাব পিতাব জন্য এক জোড়া পশমেব মোজা বুনিতে আরম্ভ করিলাম, দাসীকে হাতে ঠিক কবিয়া ধরাইয়া দিতে বলিযা ধীবে ধীরে বুনিতে লাগিলাম। সহসা মনে পড়িল আজ আমাব জন্মদিন। দুই বৎসব পূর্বে ইহা কত সুখময় দিন ছিল। তখন আমার স্নেহময়ী জননী জীবিতা ছিলেন, গৃহে মস্ত পার্টি হইযাছিল। সেই আলোকিত, সুসজ্জিত মনুষ্যসমাগমে পরিপূর্ণ গৃহ আজি জনশূন্য। আমার হৃদয ভেদিযা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। এমন সময় সোপানে চিবপবিচিত পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। পিতা আসিতেছেন, আমার মন আবাব একটু প্রফুল্ল হইল। পিতা আমাব হস্তে কয়েকটা দ্রব্য দিয়া বলিলেন, "মীনা, এই তোমার জন্মদিনের উপহাব।" স্পর্শে বুঝিলাম, খুব বড় বড় প্রস্তব খণ্ড ; সবিস্ময়ে বলিলাম, "বাবা এতগুলা হীরা?"

"হাঁ ইহা মহামূল্য হীবা, আজ হ্যামিলটনেব দোকানে বাজাদেব গহনা নীলাম হইতেছিল, আমি এগুলি কিনিলাম, তোমাব একটা নেকলেস গড়াইযা দিব।"

'রাজাদের গহনা? ইহার দাম কত বাবা?"

"দাম শুনিলে আশ্চর্য হইবে, বার হাজাব টাকা।"

"সে কি? এত মহামূল্য দ্রব্য কেন কিনিলে বাবা?"

তিনি কোনও উত্তর দিলেন না। এইখানে বলিযা বাখি, আমার পিতা বহুধনশালী ও মার্চেন্টের কাজ করেন। আমিই তাঁহাব ঐশ্বর্যেব একমাত্র অধিকাবিণী। পিতা কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "তোমাকে একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিযাছি, আজ প্রভাতকুমাব আসিবেন। তোমাব তাঁহাকে মনে আছে ত?"

প্রভাতকুমারকে আর আমাব মনে নাই? আমাব সেই শৈশবেব সহচব, কৈশোরেব বন্ধু, যৌবনের একমাত্র উপাস্য দেবতা, তাঁহাকে মনে নাই? তাঁহাব আমাকে মনে আছে কি না কে জানে! আমাদের প্রায ছয বৎসর হইল সাক্ষাৎ হয নাই। তিনি বিলাতে পরীক্ষা দিতে গিয়াছেন, তাহারও দুই বৎসর পূর্ব হইতে দেখা সাক্ষাৎ নাই। আমাদের দুই পরিবারে যাওয়া আসা বন্ধ হইয়াছে। প্রভাতকুমারের পিতার সহিত, আমার পিতার ঘোবতর মনান্তর হইয়াছিল। অবশ্য তাহা কারবার লইয়া হইয়াছিল, সেই পর্যন্ত যাওয়া আসা, দেখাশোনা, চিঠি পত্র লেখা সব বন্ধ হইয়াছিল। প্রভাতকুমার বিলাত গিয়া প্রথমে আমাকে দু' একখানা

পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু আমি সাহস পূর্বক উত্তর দিতে পারি নাই। সে অনেক দিনের কথা। সম্প্রতি প্রভাতকুমারের পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, সেই শোক সংবাদ পাইয়া প্রভাতকুমার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। পিতা সকল কথা ভুলিয়া পিতৃহীন প্রভাতকুমারকে ক্ষমা করিয়াছিলেন ; স্বদেশে আসিবার সংবাদ পাইয়া গৃহে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। অদ্য প্রভাতকুমার আসিবেন। কিন্তু হায়—আমি যে অন্ধ, আমার চক্ষে যে দৃষ্টিশক্তি নাই, আমি ত আজ তাঁহাকে দেখিতে পাইব না।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া পিতা বলিলেন, "কি মীনা তা হলে প্রভাতকুমারকে মনে নাই ?"

সলজ্জ আমি উত্তর করিলাম, "আছে বই কি ?"

পিতা বলিলেন, "দাও মীনা, ওই হীরাগুলা তুলে রাখি। আমার একটু কাজ আছে, তাহা এখনি সারিগে। ওঃ যা, প্রভাতকুমার তোমাকে যে কি একটা জিনিষ পাঠিয়েছে ;—এই নাও।"

আমি কম্পিত হস্তে হীরকগুলি তাঁহার হস্তে দিলাম, তিনি আমার হস্তে একটি চৌকোনো বাক্স দিলেন, অনুভবে বুঝিলাম না, কি। তবু মৃদুকণ্ঠে কহিলাম, "এটা কি বাবা ?"

বাবা পুনরায় আমার হস্ত হইতে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "এটা সেন্ট কেস, দেখি কি ! এ যে এদেশী, বাঃ কলিকাতার তৈয়েরী হোয়াইট রোজ, দেলখোস, বেশ মজা ত ! এই নাও, আমি চলিলাম, এখনি আসিব।"

পিতা চলিয়া গেলেন, আমি সেই অমূল্য উপহাব আদরে তুলিয়া লইলাম। আমার কল্পনারাজ্যে প্রভাতকুমারের মুখচ্ছবি সেই মধুর সৌরভের মত ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। আবার দেখিব, আবার সেই চিরপ্রিয় কণ্ঠস্বর শুনিব। কিন্তু আমি যাঁহার কথা এত ভাবিতেছি তিনি কি আমায় এইরূপ ভাবিতেছেন ? ভাবুন না ভাবুন, আজ আবার দেখিব। দেখিব ? হায়, আজ যে আমার চক্ষুতে দৃষ্টি নাই, আমার হৃদয় বিষাদ-সাগরে ডুবিয়া গেল। কতক্ষণ বসিযা ভাবিতেছিলাম জানি না, সহসা পিতার উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া উঠিলাম, তাহার পর সহসা এক বিকট চিৎকার গৃহে প্রতিধ্বনিত হইল। আমি অন্ধতা, দৃষ্টিহীনতা, সব ভুলিয়া অগ্রসর হইয়া চলিলাম। তাহার পর পিতার বসিবার কক্ষদ্বারে প্রবেশ করিলাম। পিতার যন্ত্রণাব্যঞ্জক কণ্ঠস্বরের কাতরোক্তি শুনিলাম, সহসা কক্ষ তীব্র গন্ধে আমোদিত হইল, বুঝিলাম ক্লোরোফরম। আমি ত্রস্ত হইয়া ব্যস্তভাবে চক্ষের পটি খুলিয়া ফেলিলাম, দেখিলাম পিতা কক্ষতলে পড়িয়া আছেন, এক ব্যক্তি তাঁহার নিকটে বসিয়া নাসিকার কাছে একটা শিশি ধরিয়া আছে ! সহসা আমার পদশব্দে সে মুখ তুলিয়া চাহিল। কি বিকট দৃষ্টি ! চক্ষু দুটি যেন জ্বলিতেছে, আমি মূর্চ্ছিত হইয়া সেই স্থানে পড়িয়া গেলাম।

২

আমার যখন জ্ঞান হইল, আমি তখন শয্যাগত। দুইটি কণ্ঠস্বর শুনিলাম, প্রথম কণ্ঠস্বরে কে যেন বলিতেছেন, "বলুন ডাক্তার, এ জন্মে কি মীনার চক্ষে দৃষ্টি শক্তি হইবে না ?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, "সে আশা আর নাই, আজন্মই দৃষ্টিহীন হইতে হইবে।"

প্রথম ব্যক্তি করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "ও কথা বলিবেন না।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন, "ছিঃ প্রভাতকুমার, তুমি অত অধীর হইতেছ কেন, তুমি কাঁদিতেছ, ছি ছি।"

প্রভাতকুমার, তবে কি আমি স্বপ্ন দেখিতেছি ? না ;—সহসা সব কথা মনে পড়িল, আমার পিতা, তাঁহার কি হইল ? আমি শয্যায় উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলে, আমায় সবলে কে ধরিয়া ফেলিল ; আমি বলিলাম, "আমার চক্ষু যাক্ আমার ক্ষতি নাই বাবার কি হইল তা বলুন ।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "তিনি ভাল আছেন, সেজন্য তোমার ব্যস্ত হইতে হইবে না ।"

আমি অতিশয় ব্যাকুল হইয়া বলিলাম, "আমি তাঁহার নিকট যাইব, আমায় লইয়া চলুন. আমি তাঁহাকে দেখিব ।"—হায় অন্ধ নয়নে দেখিবার সাধ !

প্রভাতকুমার সস্নেহে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "মীনা, তুমি অত অধৈর্য হইও না, আমি আসিয়াছি, আমি তোমার হইয়া সেবা করিব ।"—আমার অন্ধনয়নে অশ্রু ফুটিয়া উঠিল ।

ডাক্তারবাবু প্রভাতকুমারকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন । কিয়ৎক্ষণ পবে পিসিমা সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন । তাঁহার সহিত দু চারিটি কথার পর আমি সমস্ত ঘটনাব কথা শুনিলাম । ইহার মূল সেই হীরক খণ্ড । হায়, সে অশুভ হীরা বাবা কেন আনিলেন । সে দিন কাটিয়া গেল, সন্দেহে, উদ্বেগে, আমার হৃদয় অস্থির হইল । পরদিন শুনিলাম পিতাব জীবনেব আব আশা নাই, অল্প জ্ঞান হইয়াছে, দু-একটি কথা বলিতেছেন, আমি প্রভাতকুমারকে অনেক অনুনয় করিয়া তাঁহার সহিত পিতার কক্ষে প্রবেশ করিলাম । সে কক্ষ নিস্তব্ধ. আমি অন্ধ, আমাব মনের যাতনা যেন চক্ষের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায়, একবার সেই স্নেহময় মুখ দেখিতে সাধ হইল, একবার দুটি স্নেহের বাণী শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম ।

কতক্ষণ পরে সহসা পিতার কণ্ঠস্বর শুনিলাম, আকুল আগ্রহে ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন. "কে মীনা ? মা, এস ।" আমি সেই অন্ধ নয়নেই অনুভব কবিয়া অগ্রসব হইযা পিতাব হাত ধরিলাম, চক্ষের জলের আর বাধা রহিল না । পুনরায় পিতা কহিলেন, "কই প্রভাতকুমার কোথায় ? একবার তাঁকে ডাক ।"

পিসিমা কহিলেন, "এই যে দাদা, প্রভাতকুমার ।"

প্রভাতকুমার অগ্রসর হইলেন. পিতা বলিলেন, "প্রভাতকুমার তোমার হাত দাও, এই লও মীনাকে লও, আমার প্রাণের ধন মীনাকে তোমায় দিলাম তুমি দেখিও ।" আর কথা সরিল না প্রভাতকুমারের কম্পিত শীতল হস্তে আমার হস্ত স্পর্শ হইল । অশ্রুজলে অন্ধ হইয়া শয্যাতলে মুখ রাখিলাম । তাহার পর আর কি ? আমি জন্মের মত পিতৃহীন হইলাম । অকুল সংসার-সমুদ্রে একাকী ভাসিলাম ।

৩

সময় ত কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না ; শোকও সময়ে হ্রাস হইয়া আসে । পিতার মৃত্যুশোক ভাবিয়াছিলাম, কিছুতেই সহিতে পারিব না । কিন্তু যে অলক্ষ্য হস্তে হৃদয়ে এই নিদারুণ আঘাত পাইয়াছিলাম, সেই অলক্ষ্য হস্ত হইতে শান্তিধারা বর্ষিত হইয়া আবার হৃদয় শান্ত হইল । পিতা আমায় একাকিনী এই বিশাল সংসারে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন । আমি অন্ধ আমায় আবার কে এ অবলম্বন দিল । প্রভাতকুমারের অসীম ভালবাসায়, যত্নে, আদরে. আমার নিরাশা ব্যথিত হৃদয়ে পুনরায় আশার সঞ্চার হইল । এই দুঃখময়, শোকময় পৃথিবী পুনরায় নবীনতাময় মনে হইল, আমার অন্ধ হইয়াও বাঁচিতে সাধ হইল । পিতার অনুরোধে প্রভাতকুমার সকল বিষয় কার্যের ভার লইলেন । পিসিমা আমায় দেখিবার জন্য বাটীতে

রহিলেন।

এক বৎসর অতীত হইবার পর আমাদের বিবাহের কথা উঠিল। এই বৎসরে আমার আর জানিতে বাকী ছিল না যে, প্রভাতকুমার আমাকে আন্তরিক ভালবাসেন। তাঁহার গভীর ভালবাসা, তাঁহার অসংখ্য আত্মত্যাগ, আমি সকল বিষয়েই অনুভব করিতাম। তবু পিসিমার সেই একদিনের কথা আমার হৃদয়ে শেলের মত বিদ্ধ হইল। তিনি বলিলেন, "ও কি তোমায় অমনি বিয়ে কর্বে, এত ঐশ্বর্যের লোভ এ কি কম কথা ? এতে লোক শুধু অন্ধ কেন, ঘোর কুৎসিতাকেও বিয়ে কর্তে পারে। তোমার মত সুন্দরী মেয়ের জন্য প্রভাতকুমার কেন, ঢের ভাল বর পাওয়া যাইত।"

আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার মত হইল, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, অন্ধ চক্ষে ধারা ছুটিল। আমি মুখ ফিরাইয়া লইলাম। পিসিমা কার্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় আমি পরিচারিকার সহিত আমাদের উদ্যানে চলিলাম। আমাদের বাড়ীটা বালিগঞ্জের কাছে, বাড়ীর চারিদিক অনেক গাছ-পালায় বেষ্টিত। সেইখানে একটি ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান ছিল ও কয়েকটি কাষ্ঠাসন, লৌহাসন ছিল। দাসীর সাহায্যে আমি সেই কাষ্ঠাসনে গিয়া বসিলাম, আমার মর্মে যেন এক অভিনব বেদনা ফুটিয়া উঠিতেছিল। এমন সময় প্রভাতকুমার আসিয়া আমার হাত ধরিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মীনা, আজ তোমার মুখ অমন দেখাচ্ছে কেন ? ও কি কাঁদছ, কি হয়েছে ?" আমি—আর কথা বলিতে পারিলাম না, আমার দুটি হাত বদ্ধ, চক্ষের জল কপোলে গড়াইয়া পড়িল। তিনি আমায় বাহুপাশে বন্দী করিয়া আমার অন্ধ নয়ন চুম্বনে মুদ্রিত করিলেন। সেই প্রথম আদরে সোহাগে আমার হৃদয় গলিয়া গেল, আমি সুখে দুঃখে আত্মহারা হইয়া সেই প্রিয় বক্ষে মস্তক নত করিলাম। তিনি সস্নেহে আমার মুখ তুলিয়া বলিলেন, "মীনা কি হয়েছে, আমায় তুমি কি গোপন করিতেছ ?"

আমি মৃদুকণ্ঠে বলিলাম, "আমি অন্ধ, তবু তুমি আমায় কেন বিবাহ করিবে ?"

"এত দিনে বুঝি এই কথা ?" তাঁহার কণ্ঠ যেন অভিমানে পূর্ণ হইয়াছিল। আমি বলিলাম, "আমায় লইয়া কি তুমি সুখী হইবে ?"

তিনি বলিলেন, "আমি সুখী হই আর নাই হই, এখন সত্য বল দেখি তুমি কি আমায় লইয়া সুখী হইবে ? সারা জীবনের সঙ্গী করিতে বিশ্বাস করিবে ?"

"তোমা ছাড়া আমার আর কি আছে ?"—তিনি বলিলেন, "আমারই বা আর কি আছে ?" "আমি যে অন্ধ"। প্রভাতকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার দুটি চক্ষুতে কি তোমার হইবে না ?"

"তুমি আমার চক্ষের মণি হইবে আর আমি তোমার চিরদাসী হইব।"

"তবে এত দুঃখ কেন ?"

"যদি পরে তোমার অনুতাপ হয়।"

"মীনা, আমি তোমার অন্ধতায় ত আজ তোমায় ভুলে যেতে পারি না। তুমি কি এখনো আমার মন বুঝ নাই ? তোমার পিতা যাইবার সময় আমার হস্তে তোমায় দিয়া গিয়াছেন, তুমি কোন সাহসে সে অধিকার ফিরাইয়া লইবে ? তবে তুমি যদি আমায় ভাল না বাস, তাহা হলে আমি তোমায় ইচ্ছার পথ রোধ করব না।"

আমি আনন্দে পুলকিত হৃদয়ে তাঁহাকে বলিলাম, "আমায় ক্ষমা কর ?" তিনি আমার আর কথা কহিবার পথ রাখিলেন না।

৪

আমার বিবাহ হইয়া গেল। বিশেষ কোন সমারোহ হয় নাই। বিবাহের পূর্বে প্রভাতকুমার আমায় বলিয়াছিলেন, "সে হীরাগুলিতে তোমার একটি নেকলেস করিয়া দিব।" আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, "সে অপেয়ে হীরাতে আমার কাজ নাই!" তাহার পর আর সে কথা উত্থাপিত হয় নাই। বিবাহের পর আমাকে লইয়া বিদেশ ভ্রমণে যাইবার কথা হইল। আমার স্বামী অতিশয় উৎসুক হইলেন, প্রথমে আমি কোন মতে সম্মত হই নাই। অবশেষে আমাকে সম্মত হইতে হইল।

আমরা কয়েকদিন পরেই জাহাজে করিয়া সমুদ্রভ্রমণে বাহির হইলাম। সে কয়েকদিন প্রভাতকুমার কেবল আমার সুখ ও স্বচ্ছন্দতার জন্য ব্যস্ত ছিলেন।

আমরা যখন ফিরিতেছিলাম, সেই সময় জাহাজে একজন বিখ্যাত ডাক্তারের সহিত তাঁহার ভালরূপে আলাপ পরিচয় হইবার পর, তিনি একদিন আমার চক্ষু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "আমি অপারেশন করিয়া দুই সপ্তাহের মধ্যেই চক্ষু নীরোগ করিয়া দিব, নিশ্চয়ই দৃষ্টি ফিরিয়া পাইবেন।" পুনরায় অপারেশন করিতে হইবে শুনিয়া ভয় পাইলাম বটে, কিন্তু দৃষ্টি ফিরিয়া পাইবার বাসনা আমার হৃদয়ের তলে তলে জ্বলিতেছিল, আমি অপারেশনের জন্য চঞ্চল হইলাম। প্রভাতকুমার প্রথমে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কিন্তু আমার আগ্রহে সম্মত হইলেন।

আমরা ফিরিয়া আসিলাম, তাহার কয়েকদিন পরেই অপারেশনের দিন ধার্য হইল। আবার ক্লোরোফরম করিয়া আমার চক্ষে অপারেশন করা হইল। সপ্তাহকাল আমি শয্যাগত রহিলাম। সপ্তাহ অতীত হইবার পর ডাক্তার আসিয়া একটি অন্ধকার কক্ষে আমায় লইয়া গিয়া আমার চক্ষের পটি খুলিয়া লইলেন। আমি আনন্দে আত্মহারা হইলাম, আমি দৃষ্টিহীন হইবার পর চক্ষে যে সর্বদা অন্ধকার দেখিতাম, ইহা তাহা নহে। আমি যে অন্ধকার দেখিতেছি আমি তাহা অনুভব করিলাম। ডাক্তার চক্ষে পটি বাঁধিয়া দিলেন। তাহার পর সপ্তাহখানেক প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সেই প্রকার চক্ষের পটি খুলিয়া দিতেন ও ক্রমে আমি গৃহের বাহিরে ক্ষীণ প্রদীপের শিখা দেখিতে পাইলাম। তখন ডাক্তার আমায় বলিলেন, "কাল আপনি সন্ধ্যার পর পটি খুলিয়া ফেলিবেন।"

প্রভাতকুমার নিয়মিত সময়ে তাঁহার কার্যে চলিয়া গেলেন। কলিকাতা হইতে বালিগঞ্জ দূর হয়, সেজন্য প্রত্যহই তাঁহার আসিতে দেরী হয়। আমি সেদিন আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছিলাম না। দাসীকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম কখন আসিবেন। দাসী আসিয়া বলিল যে তিনি আসিয়াছেন, বস্ত্র পরিবর্তন করিতে গিয়াছেন। আমি গৃহের বাহিরে আসিয়া চক্ষের পটি খুলিয়া ফেলিলাম। কি আনন্দ! সমস্তই চক্ষের সম্মুখে দেখিলাম, সেই পুরাতন চির-প্রিয় ঘর দ্বার; এখনি তাঁহাকে দেখিব, লজ্জায় আমার হৃদয় কম্পিত হইল। দু'চারি পদ অগ্রসর হইতে না হইতে আমার পিতার বসিবার কক্ষে একটা দেরাজ টানিবার শব্দ পাইলাম। তিনি সেই ঘরে আছেন বলিয়া আমি গৃহে প্রবেশ করিতে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার মুখ হইতে অস্পষ্ট ধ্বনি হইল। দেরাজের উপর ঝুঁকিয়া তিনি একটা শিশি হাতে করিয়া আছেন, আমায় দেখিবা মাত্র হস্ত কম্পিত হইল, শিশি মাটিতে পড়িয়া গিয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল। আমার দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিত হইল; কি দৃষ্টি! সে দৃষ্টিতে শুধু ভয় ও লজ্জা মিশ্রিত রহিয়াছে। এই সেই দৃষ্টি;—আমার পিতা যে দিন সেই অশুভ হীরাগুলি আনিয়াছিলেন; তাঁহার উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে আমি গিয়া যাহাকে

দেখিয়াছিলাম, এ ব্যক্তি সেই ! এই কি প্রভাতকুমার ? আমি বজ্রাহতের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম, তাহার পর আত্মসংযম করিয়া সে কক্ষ ছাড়িয়া, আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম। প্রভাতকুমার আমার পিতৃহন্তা ! সে ভীষণ দুটি চক্ষুর দৃষ্টি আমার মানসপটে অঙ্কিত হইয়া গেছে, তাহা কি ভুলিবার ? আমি তাড়াতাড়ি উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। পিসিমার নিকট চলিয়া যাইব স্থির করিলাম। প্রভাতকুমার পিতৃহন্তা একথা কি প্রকারে ভুলিব ? এমন সময় দ্রুত পদশব্দে আমি আরও চমকিত হইয়া ফিরিতে না ফিরিতে দুটি পরিচিত বাহুর মধ্যে বন্দী হইলাম। "একি মীনা তুমি কোথায় যাইতেছ, আমি তোমায় সারা বাড়ী খুঁজিয়া দেখিতে না পাইয়া কি ভয়ই পাইয়াছিলাম, সৌভাগ্যক্রমে বেহারা তোমায় এই পথে আসিতে দেখিয়াছিল, তাই এত শীঘ্র ছুটিয়া আসিতে পারিয়াছি।" সে মধুর কণ্ঠস্বরে ফিরিয়া চাহিলাম, অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না, তবু এ মুখ কত বিভিন্ন মনে হইল। আমি সাহসে ভর দিয়া সজোরে হাত ছাড়াইয়া বলিলাম, "এই মাত্র বসিবার ঘরে দেখিলে, তবু বলিতেছ দেখিতে পাও নাই ?"

"আশ্চর্য কথা ! আমি ত আফিস হইতে আসিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিতেছিলাম, এমন সময় তোমার চিৎকার শুনিয়া যেমন ছুটিয়া আসিতেছি, দেখিলাম একজন লোক বসিবার ঘরে মাটিতে পড়িয়া গিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। রামু বেহারা আমার সঙ্গে ছিল। সে গিয়া দেখিল, তোমার বাবার দেরাজ খোলা, লোকটা আমার কুন্তলীনের শিশিটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে ; যেমনি পলাইতেছিল অমনি পায়ে খুব কাচ ফুটিয়া পড়িয়া গিয়াছে, হাতেও খুব ফুটিয়াছে, আর তাঁর পাশে কি আছে জান ? সে হীরাগুলা কাগজে মোড়া রহিয়াছে। বেশ ভাল মতলব আঁটিয়া আসিয়াছিল। সে লোকটি কে জান ? আমাদের আপিসের দ্বিতীয় কেরাণী, ভদ্রলোকের এই কাজ। তাহাকে আমি আটকাইয়া রাখিয়াছি, এখনি পুলিসে দিব চল দেখিবে চল, এই লোকটাই তোমার পিতার মৃত্যুর কারণ। ইহারই দ্বারা তোমার পিতা নীলামে হীরাগুলি কিনিয়াছিলেন।"

সে হীরা, সে কেরাণীর কথা আমার কিছুই মনে রহিল না। আমি আমার স্বামীকে অবিশ্বাস করিয়া কি ঘোরতর অপরাধিনী হইয়াছি। মগ্নপ্রায় ব্যক্তি যেমন কূল পাইলে আঁকড়াইয়া ধরে, আমিও সেই প্রকার দৃঢ় মুষ্টিতে আমার স্বামীর হাত ধরিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম। উজ্জ্বল দীপালোকে প্রভাসিত কক্ষে আমার স্বামীর সহিত আমার প্রথম শুভ দৃষ্টি হইল। আমার হৃদয় পূর্ণ হইল। আমি মনে মনে সেই পরম দয়াময় অন্তর্যামীকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। এই দেবতার মত স্বামীকে আমি কি ভাবিয়াছিলাম ? আমি মনের কথা আর গোপন রাখিতে পারিলাম না, তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া বলিলাম, "আমায় ক্ষমা কর।" তিনি সাদরে আমায় উঠাইয়া বলিলেন, "কেন মীনা কি হইয়াছে ? আমায় কি অন্যরূপ দেখিতেছ।"

আমি আমার মনের সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি নীরবে সকল কথা শুনিয়া একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ছি, তুমি আমায় কি করিয়া অবিশ্বাস করিলে ?"

কিন্তু আমার চক্ষের জলে আমি জয়ী হইলাম। আমার মত সুখী আর কে ?

সরোজকুমারী দেবী

ঋণ পরিশোধ

১

রুগ্ন বন্ধুর চিকিৎসায় প্রবোধচন্দ্র যখন আপনার সময়, স্বাস্থ্য এবং অর্থ অকাতরে ব্যয় করিতে আরম্ভ করিল, তখন বন্ধু যামিনীনাথ একদিন লজ্জিতভাবে বলিল, "মাপ কর, প্রবোধ, তুমি আমার জন্য আপনাকে ফেল করিতে বসিয়াছ ?"—ভোরের আলো খোলা জানালা দিয়া যামিনীর রক্তহীন, বিবর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। একখানা বেতের মোড়ার উপর বসিয়া সদ্যনিদ্রোত্থিত প্রবোধচন্দ্র রুগ্ন বন্ধুর জন্য খলে ঔষধ মাড়িতেছিল। বন্ধুর কথায় মুখ না তুলিয়াই বলিল, "কিন্তু তুমি ত জানই, আমি আপনার কর্তব্যটাকেই বেশী বড় মনে করি।"

যামিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কিন্তু বৃথা পবিশ্রম, প্রবোধ, কি সুখের জন্য আমায় বাঁচাইলে !—পৃথিবীতে আমার এমন কে আছে ?—এমন কি আছে যার প্রলোভনের জন্য বাঁচিতে সাধ যায় ? আমার মৃত্যুই ভাল ছিল।" প্রবোধ উঠিয়া বন্ধুকে ঔষধ দিয়া বলিল, "ফের সেই কথা, তা যদি বল, যামিনী, তবে আমারই বা কি আছে, যার জন্য আমায় বাঁচিতে হইবে ; সহায়, আত্মীয়, পিতা, মাতা, ভ্রাতা কেহই ত আমার জন্য নাই ; কিন্তু ভগবানের যখন ইহাই ইচ্ছা, তখন আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব কেমন করিয়া তাঁহার বিধান লঙ্ঘন করিব ? তুমি হয় ত বলিবে, আমার অর্থ আছে ; কিন্তু তাহাই কি চিরস্থির ; অর্থ ত তোমারও ছিল, মোকদ্দমায় জিত হয় আবার ফিরিয়া পাইবে ; জানই ত প্রাতঃকাল মেঘাবৃত থাকিলেও সায়ংকাল অনেক সময় পরিষ্কার থাকে।"

"বৃথা আশা, প্রবোধ, আর তা হয় না, হাইকোর্টে আপিল করিলে কি হইত বলা যায় না।"—বলিয়া যামিনী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল।

প্রবোধ যামিনীর মাথার কাছে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "যামিনী, তুমি পীড়িত ছিলে, তাই সব কথা তোমায় বলিতে সাহস করিতাম না ; আমি হাইকোর্টে আপিল করিয়াছিলাম।"

যামিনী চকিতভাবে মুখ তুলিয়া বন্ধুর মুখের প্রতি চাহিল ; আশা ও আশঙ্কায় যুগপৎ তাহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, ধীরে ধীরে বলিল, "রায় কি বেরিয়েচে ? তা হলে আপিলেও"—যামিনী কথাটা শেষ না করিয়াই বন্ধুর প্রতি আগ্রহের সহিত চাহিয়া রহিল।

প্রবোধ সযত্নে তাহার রুক্ষ্ম চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "তোমার জিত হয়েচে—ও কি ও ! যামিনী, তুমি কি ছেলে মানুষ হলে ? অত অধীর হয়ো না।"

আনন্দের আতিশয্যে যামিনী উঠিয়া বসিয়াছিল। প্রবোধ ধীরে ধীরে তাহাকে শয়ন করাইয়া দিলে, যামিনীর দুই চক্ষে অশ্রুরাশি সঞ্চিত হইয়া উঠিল, সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "প্রবোধ, তোমার ঋণ এ জীবনে শোধ করিতে পারিব না।"

যামিনী ও প্রবোধের মধ্যে রক্তের কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও মনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। বাল্যকাল হইতে দু'জনে একসঙ্গে খেলা, একত্রে লেখাপড়া, একত্র সহবাসে, পরস্পরের প্রতি অতি প্রগাঢ় আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। অল্পবয়সেই দু'জনেই পিতৃমাতৃহীন, তাই পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিও যথেষ্ট ছিল। প্রবোধ ও যামিনী কলিকাতায় মেসে থাকিয়া লেখাপড়া করিত। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন দুইজনে কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ

করিতে ইচ্ছুক, তখন সহসা সংবাদ আসিল, যামিনীর জ্ঞাতি-ভ্রাতা হরশঙ্কর মুখোপাধ্যায় যামিনীর নামে নালিস আনিয়াছে ; সে বলে বিষয় তাহার পিতার, যামিনীর পিতা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মাত্র। অগত্যা যামিনীকে মোকদ্দমার তদ্বিরে ফিরিয়া আসিতে হইল। কিন্তু মোকদ্দমা সহজে মিটিল না। পূর্ণ চারি বৎসর কাল যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িলে, যামিনী একদিন শুনিল, মোকদ্দমায় তাহার হার হইয়াছে। দারুণ মনোকষ্টে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। প্রবোধ খবর পাইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। বাড়ীতে অন্য কেহ না থাকায় যামিনীকে আপনার কাছে লইয়া আসিয়া, সর্ব কর্ম পরিত্যাগ করিয়া চিকিৎসা করাইতে ও স্বয়ং শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আর সেই সঙ্গে হাইকোর্টে নিজের ব্যয়ে যামিনীর মোকদ্দমার আপিল করিল। আপিলের ফল পূর্বেই বলা হইয়াছে।

২

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর শয়ন কক্ষে পালঙ্কের উপর অর্দ্ধ-শায়িত প্রবোধ সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল। অদূরে টেবিলের নিকট একখানা আরাম কেদারায় বসিয়া যামিনী একখানা ফটোগ্রাফ, দেখিতেছিল। ফটোখানা প্রবোধের ভাবী পত্নী সুরবালার। পূর্ব দিন মধ্যাহ্নে দুই বন্ধুতে নীরোদবাবুর কন্যা সুরবালাকে দেখিতে গিয়া ফটোগ্রাফখানা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। প্রবোধের উপার্জনক্ষম না হইয়া বিবাহে বড় মত ছিল না। কিন্তু সুরকে দেখিয়া তাহার মত পরিবর্তিত হইয়াছিল। সুর সুন্দরী, বয়স্থা, তায় সুশিক্ষিতা। প্রবোধের সহিত ইতিপূর্বে আরও দুই একবার সুরের দেখা হইয়াছিল। নীরোদ বাবু প্রায়ই মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন। সেদিন তাঁহারই অনুরোধে তাহারা দুই বন্ধুতে কন্যা দেখিতে যায়। সুরকে দেখিয়া যামিনী মুগ্ধ হইল। পথে দুই একটা কথা কহিয়াই প্রবোধ বুঝিল, যামিনী কিছু অন্যমনস্ক, প্রবোধের সব কথা তাহার কানে যায় নাই, যাহা গিয়াছে তাহার অর্থও ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম হয় নাই ;—অল্প চেষ্টায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রবোধ বন্ধুর মনের ভাব বুঝিয়া লইল। তাই আজ ইচ্ছা করিয়াই সুরের ফটোগ্রাফখানা টেবিলের উপর ফেলিয়া রাখিয়াছিল। বাহিরে বাগানে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। রৌদ্রকাতর উত্তপ্ত প্রকৃতির নীরব ক্লান্তিতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একটা 'কাঠঠোকরা' পুকুর-পাড়ে নোড়গাছের ঘন পত্রের ভিতর লুকাইয়া মধ্যে মধ্যে ঠক ঠক্ শব্দ করিতেছিল। উশৃঙ্খল বাতাসে পথের ধূলা ও শুষ্ক পত্র উড়িয়া উড়িয়া মর্মর ধ্বনি তুলিতেছিল।

যামিনী বলিল, "প্রবোধ, তুমি যথার্থই ভাগ্যবান,—এমন রত্ন সকলের ভাগ্যে ঘটে না।"

প্রবোধ হস্তস্থিত সংবাদপত্র খানা বিছানায় রাখিয়া বন্ধুর প্রতি চাহিয়া দেখিল ; তারপর ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিল, "দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি জহুরী ভাল নই, তাই রত্ন চিনিতে পারিলাম না।"

যামিনী মুখ নত করিয়া সহসা হস্তচ্যুত দেলখোস বাসিত রুমালখানা তুলিতে তুলিতে বলিল, "ঐ তোমার বড় দোষ, সোজা কথাকে ভারিয়ে বাঁকিয়ে বল, আমি তোমার হেঁয়ালির অর্থ বুঝলুম না।"

প্রবোধ সহাস্যে বলিল, "অর্থ অন্য কিছুই নয়, আমি সুরবালাকে কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না, নীরোদবাবুকেও সেজন্য লিখেছি।"

যামিনীর মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল, কি বলিবে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

প্রবোধ বলিল, "তুমি ত জানই আমি বিবাহের পক্ষপাতী নই। নিজের অবস্থার উন্নতি করিতে না পারিলে বিবাহ করিব না। তাই নীরোদ বাবুকে অনুরোধ করিয়াছি, তাঁহার অমূল্য রত্ন আমার প্রিয় বন্ধুকে দান করিয়া আমায় মুক্তি দিন।"

যামিনী উঠিয়া দাঁড়াইল, বিস্মিতভাবে বলিল, "প্রবোধ, আমার ভয় হয় তোমার সব কথা আমি বুঝ্তে পারিনি ; তুমি আমার জন্য যদি—।" হস্তস্থিত সংবাদপত্রটি মাটীতে ফেলিযা অত্যন্ত উদাসীন ভাবে প্রবোধ বলিল, "ব্যস্ত হোয় না, যামিনী, আমার নিকট সুরও যা আর ভবশঙ্করীও তা,—তুমিও জান রমণীর প্রতি আমার কত অবজ্ঞা!"

যামিনী মনে মনে বলিল, "প্রবোধ, তুমি মানুষ নও, দেবতা, তোমার ঋণ জীবন দিয়াও পরিশোধ হয় না।"

৩

প্রবোধের যত্ন ও চেষ্টায় সুরর সহিত যামিনীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। প্রবোধ একদিন জানাইল সে পশ্চিমে গিয়া প্র্যাক্‌টিস্ করিবে স্থির করিয়াছে। নব বিবাহিত যামিনী তাহার প্রস্ফুটিত গোলাপগন্ধ কুন্তলীন-বাসিত মস্তক সবেগে নাড়িযা ঘোবতর আপত্তি উত্থাপন করিলে, প্রবোধ হাসিয়া বলিল, "বুঝ্তে পাচ্চ না, যামিনী, দু'জনে একত্রে থাকায়, তোমার পসারেব বড ক্ষতি হচ্চে ; সংসারী হ'লে, একটু স্বার্থ বুঝতে চেষ্টা কর।"

প্রবোধের কথায় ক্ষুন্ন হইয়া যামিনী বলিল, "তুমি কি আমায় এতই নীচ মনে কব, প্রবোধ ?"

বাধা দিয়া প্রবোধ বলিল, "না ভাই, আমি তামাসা কচ্ছিলুম মাত্র ;—তুমি ত জান আমার স্বাস্থ্য ভাল নয়, বিশেষতঃ পশ্চিমের অবারিত মুক্ত সৌন্দর্য আমাব বড় ভাল লাগে ; আমার বহুদিনের ইচ্ছা সফল হইবে, ইহাতে আপত্তি করিও না!"

যথাসময়ে বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া প্রবোধ পশ্চিমে যাত্রা করিল। যাত্রাকালে অকৃত্রিম বেদনায় দুই বন্ধুর চক্ষুই অশ্রু সিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রবোধ প্রবাসী বন্ধুর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ দেলখোস প্রভৃতি কতকগুলি সৌখিন দ্রব্য সুবর জন্য উপহার দিল।

প্রায এক বৎসর কাল প্রবোধ ভাগলপুরে আসিয়াছে ; কিন্তু এ পর্যন্ত আপনাব কার্যের বিশেষ উন্নতি করিতে পারে নাই। ভাগলপুরের মত উকিল প্রধান দেশে নূতন উকিল প্রবোধের শীঘ্র উন্নতির কোন সম্ভাবনাও ছিল না। বাঙ্গালীটোলায় একখানি ছোট বাংলা ভাড়া লইয়া প্রবোধ আপনার নূতন সংসার পাতাইয়া লইল। সংসারে তাহার আপনাব কেহই ছিল না ; কিন্তু স্বভাবের গুণে অল্পদিনের মধ্যেই অনেকের সহিত বন্ধুতা জন্মিয়াছিল।

প্রবোধের ভাগলপুর আসিবার এক বৎসর পরে, হঠাৎ 'বসন্তের' ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইল। ভয়ে অনেকে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। প্রবোধের বাসার নিকটেই দুই একজনের বসন্ত হওয়ায় বন্ধুবর্গ প্রবোধকে বাসা ছাড়িয়া যাইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু পলাইবার আর সময় রহিল না। সকলে সভয়ে শুনিল প্রবোধের প্রতি 'মা'র 'অনুগ্রহ' হইয়াছে। দুই একজন ভদ্রলোক হাসপাতালে ডাক্তার সাহেবের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। দাসী চাকর ভয়ে চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ডাক্তার সাহেব যখন রোগী দেখিতে আসিলেন, তখন জনহীন অট্টালিকার একটি ক্ষুদ্র কক্ষে দারুণ যন্ত্রণায় হতচেতন প্রবোধচন্দ্রের যন্ত্রণাসূচক আর্তনাদ থাকিয়া থাকিয়া স্তব্ধ অট্টালিকার ইষ্টক প্রাচীর ভেদ

করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। রোগী দেখিয়া সাহেব হাল ছাড়িয়া দিলেন ; তখন রোগীকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়াও অসম্ভব। এমন সময় একজন নবাগত ভদ্রলোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে প্রবোধের জীবন দানের জন্য তাঁহার পাদমূলে পতিত হইয়া প্রার্থনা করিল। সাহেব অতিমাত্র বিস্মিতভাবে তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি প্রবোধের কে হন ? আগন্তুক অশ্রু মুছিয়া জানাইল, কেহই নয়, প্রবোধের নিকট তিনি ঋণী।

৪

"ডাক্তার সাহেব, আপনাকে শত ধন্যবাদ, আপনার কৃপায় আবার আমি সংসারের সুখ, সূর্যের আলোক, স্বদেশের মুখ দেখিতে পাইব ; আপনি আমার জীবন দান করিয়াছেন।"

"থ্যাঙ্ক ইউ বাবু, আমি কর্তব্যের চেয়ে বেশী কিছু করিনি ; ধন্যবাদ দিন তাঁকে—যিনি নিজের জীবন দিয়া আপনাকে বাঁচিয়েছেন।"

শীতের অকাল-সন্ধ্যা চারিদিকে ঘনাইয়া আসিতেছিল। দূরে বুড়ানাথের মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টার শব্দের সহিত ধূপধুনার গন্ধ মিশ্রিত বায়ু দেবতার সন্ধ্যারতি বহন করিয়া আনিতেছিল। একটি প্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষে প্রবোধচন্দ্রের সহিত অদূরে চেয়ারে বসিয়া ডাক্তাব সাহেব কথোপকথন করিতেছিলেন। ডাক্তার সাহেবেব কথায় অতিমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিয়া প্রবোধ বলিল, "বুঝিতে পারিলাম না, আপনি কি আমাব কোন বন্ধুর কথা বলিতেছেন ?" সাহেব ঘড়িব দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঠিক কথা ; আপনি তখন অজ্ঞান ছিলেন। আমি যে দিন মনুষ্যহীন অট্টালিকায় নির্বাণ প্রায় জীবনদীপ আপনাকে প্রথম দেখেছিলাম, সে দিন কল্পনাতেও আজকের কথা মনে আনতে পারিনি। কিন্তু আপনার সেই আত্মীয়েব অক্লান্ত শুশ্রূষায়, অপরিমিত স্নেহে, অদম্য উৎসাহে আপনি মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছেন।"

প্রবোধের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; রক্তহীন বিবর্ণমুখে ঈষৎ রক্তের চিহ্ন প্রকাশ পাইল : সে আগ্রহের সহিত বলিল, "আমার আত্মীয় ! পৃথিবীতে এমন কে আছে যে, আপনার জীবনের উপর মমতাহীন হইয়া এই বিদেশে সংক্রামক রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছে ?" প্রবোধের মনে পড়িল, তাহার অচৈতন্য অবস্থায় সে-ও যেন কাহার স্নেহ হস্তের স্পর্শ অনুভব করিয়াছে ; কাহার বিনিদ্র নত নেত্রের আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি সারারাত্রি তাহার সামান্য ইঙ্গিতের অপেক্ষায় চাহিয়া থাকিত। রোগের উপশমে প্রবোধ মনে করিত, সে বুঝি দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছে। তাহার নিস্তেজ মনোবৃত্তি, লুপ্ত স্মৃতি ধীরে ধীরে সজাগ হইতেছিল। সে অতি উৎকণ্ঠিতভাবে বলিল, "তিনি কোথায় ? আমার সেই জীবনদাতা অসময়ের পরম বন্ধু—আমি কি তাঁহার কাছে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিব না ?"

সাহেব খোলা জানালা দিয়া হিমাচ্ছন্ন দূর প্রসারিত বহিঃপ্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "না বাবু, তিনি এখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনেক ঊর্ধ্বে ! কাল রাত্রি সাড়ে আটটার সময় আপনার সংক্রামক রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে ; মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছেন, "স্বদেশে তাঁহার স্ত্রী-পুত্র আছে, তাঁহাদের সংবাদ লইও।" প্রবোধের রক্তহীন মুখ মৃতের মত বিবর্ণ হইয়া আসিল ; তাহার মনে হইতে লাগিল, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াও বুঝি রুদ্ধ হইয়া যায় ; সমস্ত বিশ্বসংসার একমুহূর্তের মধ্যে ঘন কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া তাঁহার চক্ষুর উপর কৃষ্ণ

যবনিকা টানিয়া দিল ; প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে সচেতন রাখিয়া সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তাঁহার নাম ? আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন,—তাঁহার নাম ?"

সাহেব দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া পকেট হইতে নোট বহি বাহির করিয়া সন্ধ্যার অল্প আলোকে দৃষ্টি সঙ্কুচিত করিয়া দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "যামিনীনাথ মুখোপাধ্যায় ।"

একটা অস্ফুট চিৎকারের সহিত প্রবোধের চেতনাহীন দেহ শয্যাতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল ।

ইন্দিরা দেবী

শাস্তি

১

মাতৃহীন দ্বাদশবর্ষীয় বালক কিশোরীলালের দৌরাত্ম্যে তাহার বৃদ্ধ পিতা শ্যামলালেব কষ্টের সীমা ছিল না । দশমাসের বালককে রাখিয়া তাহার মাতা স্বর্গে গিয়াছিলেন । বৃদ্ধ শ্যামলাল সেই দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকে বহু যত্নে ও বহু চেষ্টায় এত বড়টি করিয়াছে । একে "মা-মরা" ছেলে, তাহাতে পিতার বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র অবলম্বন,—বালক কিশোরীলাল এতদিন কেবল আদর যত্নের মধ্যেই বর্দ্ধিত হইয়াছিল । "শাসন" কাহাকে বলে তাহা সে জানিত না । অগত্যা তাহার "দুরন্তপনায়" বৃদ্ধ অস্থির,—পাড়াব লোক "তিতি বিবক্ত" । কিন্তু পুত্রকে শাসন করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধের নাই । দ্বাদশ বৎসর বয়স হইলেও কিশোবীলাল এখনও বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে একেবারে উদাসীন । শ্যামলালের একখানি বড় গোছের মণিহারীর দোকান ছিল,—তাহাই তাহার উপজীবিকা । দোকানখানি দোতালা,—উপরে শ্যামলালের বাস । বড় রাস্তার উপরই দোকান,—দোতালার রাস্তার দিকের জানালাগুলিতে সব একটি একটি ছোট বারান্ডা সংলগ্ন, অনেকটা বিলাতী 'ব্যালকনির' মত । দোকানটির বেশ একটু মৌলিক সৌন্দর্য ছিল । বৃদ্ধ শ্যামলাল বহু যত্নে অতি হীন অবস্থা হইতে দোকানটিকে এত উন্নত করিয়াছিল । দোকান ঘরের পশ্চাতেই একটি ছোট গলি,—গলির দিকে বাড়ীর সংলগ্ন একটু খোলা উঠান,—এবং একটা "খিড়কি" দরজা । উঠান হইতে দোতালাতে উঠিবার একটা কাঠের সিঁড়ি । সাধারণতঃ দোকানের ভিতর হইতে উপরতালায় যাইতে হইলে দোকানের মধ্যের রেলিং দেওয়া একটা বড় কাঠের সিঁড়ি দিয়াই যাইতে হয় । সিঁড়িটিও দোকান ঘরের অনুরূপ, চিত্র ও রেশমী পর্দার দ্বারা সজ্জিত ।

পুত্রের উৎপাতে ও প্রতিবেশীগণের উৎপীড়নে, পুত্রকে শাসিত করিবার জন্য ও বিদ্যাশিক্ষার জন্য কিশোরীলালকে 'কটন ইনষ্টিটিউসনে' পাঠাইতে শ্যামলাল কৃতনিশ্চয় হইল । কিশোরীলাল যখন শুনিল স্কুলে যাইতে হইবে ও বাড়ীতে সে থাকিতে পাইবে না, তখন গম্ভীরভাবে বলিল, "আমি যাব না ।"

চারি পাঁচ দিন কটন স্কুলের শিক্ষকের সহিত পরামর্শ করিয়া, বৃদ্ধ অবশেষে পুত্রকে স্কুলে পাঠাইতে কৃতসংকল্প হইলেন ।

শিক্ষক মহাশয় নিজে আসিয়া কিশোরীলালের হস্তধারণ করিলেন । শ্যামলাল খুব কঠিন হইবার চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না ; ছল ছল নেত্রে পুত্রের নিকট হইতে দূরে চলিয়া

গেলেন, এবং নির্জনে বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। কিশোরীলাল প্রথমে শিক্ষকের হস্ত ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল ; আঁকিয়া বাঁকিয়া জোর প্রকাশ করিতে লাগিল ; রাগে অভিমানে, অপমানে তাহার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল। শিক্ষক মহাশয় দুরন্ত ছেলে বশ করা বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত ; তিনি বজ্রমুষ্টিতে কিশোরীলালকে ধরিয়া গাড়ীর দিকে লইয়া চলিলেন। কিশোরীলাল গর্জন করিয়া বলিতে লাগিল, "না—আমি যাব না"। কিন্তু যখন দেখিল, তাহাব তর্জন গর্জন জোর জবরদস্তি সকলই বিফল হইল, তখন গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল, এবং "না আমি যাব না" এই একমাত্র কথা বলিতে বলিতে নিতান্ত অনিচ্ছায় গিযা গাড়ীতে উঠিল।

২

কিশোরীলালের অভাব শ্যামলালকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল ; বার বৎসর কাল যে একদিনের জন্যও চোখের আড়াল হয় নাই, আজ তাহাকে দেখিতে না পাইয়া বৃদ্ধের হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইতে লাগিল। খাইতে বসিয়া শুইতে পদে পদে তাহাব প্রাণটার ভিতর একটা মহাশূন্যতা অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু এত কষ্টের মধ্যেও কিশোবীলালকে দূরে পাঠাইয়া তাহার যেন একটু সোয়াস্তি হইল।

একটা ব্যবসায়ে বৃদ্ধের অনেক টাকা লোকসান হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে কিছু দেনাও হইয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধ আকাশ-পাতাল ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিতেছিল না যে, কিরূপে সে দেনার পরিশোধ করিবে। একটা পাপ কল্পনা দুই একবার মনে উঠিয়াছিল, কিন্তু কিশোরীলালের জন্য সে কল্পনা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল ; এখন কিশোরীলাল নাই। সে কল্পনাটা আবার জোর করিয়া তাঁহার মনটা অধিকার করিয়া বসিল। দোকান ঘরখানা মায় আসবাবপত্র অনেক টাকায় বীমা করা ছিল ; শ্যামলালের দেনার জন্য দোকানের পূর্বেই অনেকটা অবনতি হইয়াছিল ; এখন যত টাকার বীমা করা ছিল, দোকানের জিনিসপত্র সব বিক্রয় করিলেও তাহার সিকি টাকাও হইত কি না সন্দেহ। তাই শ্যামলাল ঠিক করিল, দোকানের বহুমূল্য দ্রব্যাদি অন্যত্র সরাইয়া ফেলিয়া জিনিসসমেত দোকান ঘরে আগুন লাগাইয়া দিবে। শ্যামলাল ভাবিয়া চিন্তিয়া, দোকানে আগুন লাগানই স্থিব করিল। পুত্র নিকটে নাই ; বাড়ীর যে একটি ঠিকা দাসী ছিল ; দশটা বেলার মধ্যে কাজকর্ম সারিয়া সে চলিয়া গেল। শ্যামলালও নিজের কার্যসিদ্ধির ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইল। দোকানের ভিতর হইতে দ্বিতলে যাইবার কাঠের সিঁড়িটার উপর মোটা কার্পেট মোড়া ছিল, শ্যামলাল কেরোসিন তৈল দিয়া সিঁড়ির কাষ্ঠ ও কার্পেটখানা উত্তমরূপে ভিজাইল। দোকানের মেজেতে যে ম্যাটীং ছিল, তাহাতেও কেবোসিন ঢালিল। চেয়ার টেবিলের কাঠে, ছবির ফ্রেমে, আলমারীর ভিতর বেশ করিয়া কেরোসিন ও তার্পিন মাখাইল। টুকরো টুকরো কাপড় কেরোসিনে ভিজাইয়া সকল জিনিসের সহিত যোগ করিয়া দিল। একটা কোনস্থানে আগুন ধরিলেই, যাহাতে একসঙ্গে সকল জায়গায় আগুন জ্বলিয়া উঠে, এ ব্যবস্থাটি কেবল সেইজন্য হইল। বেলা প্রায় ৪টা ৫টার মধ্যে সমস্ত কার্য শেষ করিয়া শ্যামলাল হাঁপ ছাড়িল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যার সময় শ্যামলালের দোকানে প্রত্যহই একটি ছোটখাটো সভা হইত। দোকানের সম্মুখে তিন চারি খানি বেঞ্চে বসিয়া, অনেকগুলি ভদ্রলোক ধূমপা· ও নানা বিষয়িনী বক্তৃতায় সময় নষ্ট করিত। সেদিনও যথাসময়ে একে একে পাচ স·াটি

ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্যামলালের চঞ্চল দৃষ্টি, অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়া সকলেই মনে করিল, বৃদ্ধ পুত্রের চিন্তায় এরূপ করিতেছে। সেইজন্য তাহাকে বড় একটা কেহ বিরক্ত করিল না : নিজেরাই পাঁচ রকম কথাবার্তায় মগ্ন হইল। ক্রমে রাত্রি প্রায় নয়টা বাজিল। শ্যামলালের প্রতিমুহূর্ত যুগান্তর বলিয়া মনে হইতেছিল ; যে বন্ধুরা একদিন আসিতে বিলম্ব করিলে তাহার মনে দুঃখ হইত ; আজ তাহারা এখনও যাইতেছে না বলিয়া সে মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইতেছিল। ক্রমে সকলেই উঠিয়া গেল।

হরেন্দ্রবাবু শ্যামলালের সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু ; তিনি চুরুট ধরাইবার নিমিত্ত পকেটে দেশলাই খুঁজিয়া না পাইয়া শ্যামলালকে একবার দেশলাইটা দিতে বলিলেন।

শ্যামলাল দোকানের ভিতর দেশলাই আনিতে যাইল ; তাহার বন্ধুও পশ্চাৎ পশ্চাৎ দোকানে প্রবেশ করিলেন। বাহিরের ফাঁকা হাওয়ায় তাঁহারা কেহই তার্পিন বা কেরোসিনের গন্ধ পান নাই। কিন্তু দোকানে ঢুকিতেই হরেন্দ্রবাবুর নাসারন্ধ্র কেরোসিনের তীব্র গন্ধে জ্বলিয়া গেল। তিনি নাসিকায় বস্ত্রাবৃত করিয়া বলিলেন, "কি হে শ্যামলাল ; এ বিকট গন্ধ কোথা থেকে আস্‌ছে ? তোমার এত বড় মণিহারীর দোকান, এতে কোথা আতর গোলাপ 'দেলখোস' 'কুন্তলীনে'র গন্ধ ভর ভর করবে, না কেরোসিন তার্পিনের ঝাঁজে নাক জ্বলে গ্যাল। ব্যাপারখানা কি বল দেখি ?" প্রশ্ন শুনিয়া শ্যামলালের বুক ধড়াস্ করিয়া উঠিল, মুখখানা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল, সহসা সামলাইয়া শ্যামলাল বলিল, "ল্যাম্পে তেল ঢালিবার সময় চাকর ব্যাটা একটির কেরোসিন ফেলে দিয়েছে। ম্যাটিং কাগজপত্র সব ভিজে মাটি হয়ে গ্যাছে। কি করব বল। যা হয়েছে তাতে আমার ত ভয়ে প্রাণ আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে। কোথাও একবিন্দু আগুন ধরলে আজ আর রক্ষা থাকবে না।" হরেন্দ্রবাবু আলোটালো সাবধানে রাখিতে উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

৩

রাত্রি দ্বিপ্রহর।—এসময় সকলেরই নিদ্রার কোলে শায়িত থাকাই নিয়ম।

কিন্তু তাহা হইতেছে না। পথে লোকে লোকারণ্য, শ্যামলালের দোকান ঘরে আগুন লাগিয়াছে। একে কাঠের ঘর তাহাতে দক্ষিণা বাতাস পাইয়া আগুন হু হু শব্দে জ্বলিতেছে। পথের লোক নির্বাক নিস্পন্দ ভাবে সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরাশির দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে। অগ্নির নিকট যাহার সাধ্য ? পার্শ্ববর্তী গৃহগুলি যাহাতে রক্ষা হয়, সকলেই সেই চেষ্টায় ব্যস্ত। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরাশির অনতিদূরে বৃদ্ধ শ্যামলাল দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে, ও দুই হস্তে মাথার চুল ছিঁড়িতেছে। তাহার এই সর্বনাশে সকলেই তাহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেছে, অনেকেই সান্ত্বনা করিতেছে, কিন্তু শ্যামলাল কিছুতেই শান্ত হইতেছে না। অগ্নি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। পার্শ্ববর্তী বাড়ীর লোকের ব্যস্ততা ও পথের লোকের কোলাহলে সে স্থানটা পূর্ণ হইয়া গেল। সহসা সমস্ত গোলমাল থামিয়া গেল। এমন একটা 'অদ্ভুত' ঘটনা ঘটিল, যাহাতে উপস্থিত সকলেই ভীত, স্তম্ভিত ও নির্বাক হইয়া গেল। শ্যামলালের আর্তনাদও থামিয়া গেল। তাহার সেই বৃদ্ধ চক্ষু যেন কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। প্রজ্জ্বলিত দ্বিতলের বারান্ডা হইতে কে চির পরিচিত ভীত, আকুলস্বরে চিৎকার করিয়া বলিল, "বাবা।" শ্যামলাল সেই স্বরে বজ্রাহতের ন্যায় উপরে চাহিয়া দেখিল ; সেই সঙ্গে উপস্থিত সকলেই চাহিয়া দেখিল, অর্দ্ধজ্বলিত বারান্দায় নগ্নপদে, নগ্নগাত্রে দাঁড়াইয়া, শ্যামলালের নয়নের জ্যোতি, বার্দ্ধক্যের ভরসা, জীবনের সম্বল কিশোরীলাল। বালক

আকুলস্বরে ডাকিতেছে, "বাবা।" শ্যামলাল প্রথমে কেমন হইয়া গেল, পরক্ষণেই একটা বিকট চিৎকার করিয়া, কেহ বাধা দিবার পূর্বেই, সেই প্রজ্জ্বলিত অনল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। বৃদ্ধ সামর্থ্যহীন শ্যামলালের বাহুতে যেন মত্ত হস্তীর বল আসিল। সেই অগ্নি ও ধূমাচ্ছন্ন দোকান ঘরের ভিতর গিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের শ্বাসরোধ না হইতে দিয়া শ্যামলাল কাঠের সিঁড়িটা খুঁজিয়া বাহির করিল। দুই হাতে বক্ষ চাপিয়া সেই স্তূপীকৃত, জ্বলন্ত, অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠরাশি ভেদ করিয়া দ্বিতলের যে কক্ষের বারান্ডায় কিশোরীলালকে দেখিয়াছিল, সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে ঘরখানি ধূমে আচ্ছন্ন ; বৃদ্ধ আর বুঝি পারিল না। দুইবার তাহার দম বন্ধ হইবার মত হইল, তবু সে অসীম মানসিক বলে কোন গতিকে সেই ঘর পার হইয়া যে ব্যালকনিতে কিশোরী ছিল, সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইল। অগ্নিতাপে বৃদ্ধের দৃষ্টিশক্তি তখন লোপ পাইয়াছে বলিলেও হয়। "বাবা কিশোরী, আমি এই যে!" বলিয়া বৃদ্ধ হস্ত প্রসারণ করিল। অর্দ্ধদগ্ধ, অর্দ্ধজ্ঞানশূন্য কিশোরী পিতৃকোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। শ্যামলাল সজোরে কিশোরীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া, সেই অর্দ্ধ অন্ধকারে অর্দ্ধ আলোকে, আন্দাজে আন্দাজে দরজা পার হইয়া সিঁড়িতে আসিল। অতিসন্তর্পণে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া নীচে নামিতে লাগিল। অর্দ্ধপথে একখানা প্রজ্জ্বলিত বরগা ছাদ হইতে খসিয়া শ্যামলালের মাথায় পড়িল, মাথাটা কাটিয়া ভয়ঙ্কর বেগে রক্ত পড়িতে লাগিল ; শ্যামলাল কিশোরীকে আরও জোরে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া নামিতে লাগিল। আর ২/৩ ধাপ নামিলেই দোকানের দরজার কাছে যাওয়া যায়, এমন সময়ে ভীষণ শব্দে প্রজ্জ্বলিত সিঁড়ি পড়িয়া গেল ; বাহিবের লোকেরা বাতুল শ্যামলালেব কার্যকলাপ অবাক হইয়া দেখিতেছিল ; সোপান পতনের ভীষণ শব্দে তাহারা বুঝিল, শ্যামলাল কিশোরী সহিত আজ প্রজ্জ্বলিত অনলে সমাহিত হইল। কিন্তু প্রায় দুই মিনিট পরে সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ, বীভৎস মূর্তি শ্যামলাল, কিশোরীলালকে বক্ষে লইয়া সেই অগ্নি সমুদ্র হইতে বাহির হইল।

শ্যামলাল, কিশোরীলালকে পথের মধ্যে শোয়াইয়া, কিশোরীলালকে পথের মধ্যে শোয়াইয়া দিয়া তাহার পার্শ্বে পড়িয়া গেল। তাহার সেই দগ্ধ মুখে একটি প্রীতির ভাব প্রকাশ পাইল। "ভগবান তোমার সূক্ষ্ম বিচারের তুলনা নাই, আমার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে," বলিতে বলিতে শ্যামলাল চিরদিনের মত চক্ষু মুদিল।

বহু কষ্টে কিশোরীলালকে শ্যামলালের প্রতিবেশীরা বাঁচাইল। সেই অগ্নিকাণ্ডের দিন সন্ধ্যার সময় কিশোরী স্কুল হইতে পলাইয়া আসিয়া খিড়কির দরজা দিয়া চুপে চুপে নিজের ঘরে আসিয়া শুইয়াছিল. শ্যামলাল জানিত না যে, কিশোরীলাল রাত্রে বাড়ী ফিরিয়াছে ; কিন্তু শ্যামলাল না জানিলেও একজনের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে কার্য গোপন ছিল না, এবং তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারে অপরাধের পূর্বেই শাস্তি স্থিব হইয়া গিয়াছিল।

প্রতিভা দেবী

রাখীবন্ধন

১

পিতাপুত্রের কখনও বনিবনাও হইত না। অধিকাংশ সময়েই দেখা যাইত পিতা দুর্গাচরণের মতের সহিত পুত্র আশুতোষের মতের আদৌ মিল হইত না। অধিকন্তু, লেখাপড়া শিখিয়াও কেন যে তাঁহার পুত্র আর্ত ও দীনদরিদ্র ব্যক্তিদিগের সহিত মিশিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিত, তাহা তিনি ভাল বুঝিতে পারিতেন না। এ জন্য দুর্গাচরণকে প্রায়ই আত্মীয়স্বজন ও পাড়ার লোকের কাছে দুঃখ করিতে দেখা যাইত। ধৈর্যশীল আশুতোষের এসব গা-সহা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ যখন তাহাদের জমিদারীর প্রজারা প্রভাতে আসিয়া করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া আশুতোষের দ্বারা দুর্গাচরণকে জানাইল যে তাহারা দুর্বৎসর হেতু এবারে জমির খাজনা দিতে পারিবে না, তখন আর্ত প্রজাগুলির উপর পিতার দুর্ব্যবহার দেখিয়া সে একেবারে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। নিতান্ত কর্তব্য বোধে দুই একটি কথা কহিয়াছে মাত্র, এমন সময় দুর্গাচরণ বলিয়া উঠিলেন, "আজকাল লেখাপড়া শিখিয়া তোমাদের ঐ হইয়াছে বাপু, কেহ কোন দুঃখ জানাইয়া কিছু প্রার্থনা করিলে, তোমাদের চাঁদার খাতায় নাম সহি করিবার ও অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কার্য করিবাব ক্ষমতাটি বিলক্ষণ হইয়াছে, বিশেষ তোমার ত পাত্রবোধে কখন কার্য করা--"

দুর্গাচরণ ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহার উচ্চারিত বাক্যের স্বচ্ছন্দ গতি দেখা যাইত না। সে কারণে এবারকার বক্তব্যটাও শেষ করা হইল না। অবসর বুঝিয়া আশুতোষ জানাইয়া দিল যে প্রজারা যাহা বলিতেছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। দেশের অবস্থা পিতার জ্ঞাত থাকাই সম্ভব, প্রজাদের খাজনাটা এবারে মাপ করিয়া দেওয়া হউক্।

পিতাপুত্রে কথাবার্তা অতি কমই হইত। কিন্তু দুর্গাচরণ কথাবার্তায় কোন বিষয়ে যদি পুত্রের তিল মাত্র অনৈক্য বুঝিতে পারিতেন, তখন কথাবার্তা অন্যরূপ ধারণ করিত। আশুতোষকে লক্ষ্য করিয়া তিনি অনেক কথা শুনাইয়া দিতেন। এবারেও তাহা বাদ গেল না। অতিরিক্ত রাগের ঝোঁকে শেষে তিনি আশুতোষকে বলিয়া উঠিলেন, "নিজে তুমি কখনও কিছু উপার্জন কর নাই, আমার আয় ব্যয় সম্বন্ধে তোমার কথাবার্তা নিতান্তই অশোভন দেখায়। আমি যাহা ভাল বুঝিব, তাহাই করিব। তুমি আপনার লেখাপড়া লইয়া ব্যস্ত আছ, তাহা লইয়াই থাক।"

আশুতোষের প্রতি দুর্গাচরণের এরূপ কঠোর উক্তি তাহার মনে গিয়া অত্যন্ত আঘাত করিল। সে যে পিতার নিকট এরূপ ব্যবহার পাইবে, ইহা কখনও প্রত্যাশা করে নাই। যাহা স্বপ্নের অগোচর ছিল, বাস্তব জীবনে তাহা লাভ করিয়া সে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সে ত বরাবরই পিতাকে স্বীয় উপার্জনের কথা বলিয়া আসিয়াছে। বাল্যকাল হইতে আশুতোষের ইচ্ছা ছিল যে নিজের সমগ্র উপার্জিত ধনে অক্ষম ও দীনদরিদ্রদিগের যথাসাধ্য সেবা ও সাহায্য করিবে। কিন্তু দুর্গাচরণ আশুতোষের সে দিকে কোনও প্রকার মনোনিবেশ যে আদপে পছন্দ করিতেন না, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পুত্র একটু বড় হওয়া অবধি তিনি বরাবরই তাহাকে এ বিষয়ে বাধা দিয়া আসিয়াছেন। বড়লোক জমিদারের পুত্র হইলে কিরূপভাবে জীবনযাপন করিতে হয়, সে বিষয়ে তাঁহার আদর্শ

আশুতোষের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল।

তাই আজ যখন দুর্গাচরণ আশুতোষকে কঠিন কথাগুলি শুনাইয়া দিলেন, তখন সে আজ আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না। পিতার অনলস্রাবী মন্তব্য শেষ হইলে সে জানাইল যে প্রজাদের রক্তশোষণ করিয়া তাহাদের লুণ্ঠিত ধনে তাহার স্পৃহা আদৌ নাই। দুর্বৎসরে প্রজাদের নিকট খাজনা আদায় করা হত্যার নামান্তর মাত্র, সে বুঝিয়াছে। একমাত্র মাতৃহীন পুত্র ননীগোপালকে লইয়া সে আজই অন্যত্র গিয়া থাকিবে। অনবরত কলহের মধ্যে থাকা অপেক্ষা দূরে শান্তিতে জীবনযাপন করা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ। উভয়েরই মন ইহাতে ভাল থাকিবার সম্ভাবনা।

পিতাব অনুমতি পাইলে, আশুতোষ আপনার পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র ননীকে লইয়া নগর ত্যাগ কবিয়া দুই ক্রোশ দূরে একটি গ্রামে গিয়া বাসা লইল।

২

আশুতোষ যে গ্রামটিতে গিয়া বাসা লইয়াছিল, সে গ্রামে তাহার সহপাঠী যতীশ নামে এক পুরাতন বন্ধু থাকিত। চেষ্টা চরিত্র করিয়া সে আশুতোষকে গ্রামের স্কুলে একটা মাষ্টারী জুটাইয়া দিল।

এই মাষ্টারীটি পাইয়া আশুতোষ অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিল। পিতার নিকট যখন সে ছিল, লেখাপড়ার চর্চায় ও একরূপ নিশ্চেষ্টতায় তাহার জীবন কাটাইতে হইত। অধুনা কর্মের আস্বাদন পাইয়া পূর্বের বন্ধন-ভারগ্রস্ত জীবন অত্যন্ত তুচ্ছ বোধ হইতেছিল। অধিকন্তু স্কুলে অধ্যাপনার পর সে যে সময়টি পায়, তখন সে আপনার চিরপোষিত অভিলাষটি পূর্ণ করিবার প্রয়াস পায়। কোথায় কোন দুর্ভিক্ষপীড়িত দরিদ্রের কি অভাব, গ্রামে কাহার কি অসুবিধা, তাহা দূর করাই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। বন্ধনমুক্ত জীবনে যে এত আনন্দ সে পূর্বে জানিত না।

গ্রামের দীন দরিদ্র সকলেরই নিকট আশুতোষের প্রশংসা ধরিল না।

৩

পুত্রকে বিদায় দিয়া দুর্গাচরণ যে বিশেষ মানসিক কষ্ট পাইয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। বরং তাঁহার এরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, এখন তিনি যে সব কার্য করিবেন, তাহাতে বাধা দিবার লোক কেহ থাকিবে না। স্বেচ্ছামত কার্য বাধাবিহীন ভাবে করিলে যে একটা বিপুল আনন্দ পাওয়া যায়, এতদিন তিনি যেন তাহা হইতে বঞ্চিত ছিলেন। আশুর বিদায়ের পর তিনি আপনাকে অনেকটা স্বচ্ছন্দ মনে করিলেন।

কিন্তু একটি ছোট শিশুর স্মৃতি তাঁহার সকল কার্যের ও ব্যস্ততার মধ্যে তাঁহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। পৌত্রবিরহে তাঁহার হৃদয়ে যে বেদনা ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার অন্ত তিনি খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। ননী চলিয়া যাইবার পর দুর্গাচরণের গৃহে বাস করা কঠিন হইয়া উঠিল। তাহাকে বিদায় দিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, একটি সুগভীর নিরানন্দ ভাব সমগ্র বাটীটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। পূর্বে যে বাটীতে শিশুর কলরব ও চাঞ্চল্যের বিরাম ছিল না এখন সে বাটীতে এই শান্তিপূর্ণ নীরবতা ও শব্দবিহীন শূন্যতা অনুভব করিয়া দুর্গাচরণের মন কাতর হইয়া পড়িত।

তিনি আপনার কর্মের মধ্যে, গৃহের মধ্যে কিছুতেই আর বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিতেন না। প্রাতে জমিদারি সম্বন্ধীয় কাগজপত্র দেখিবার সময় দেখিতেন যে চশমাটি পূর্বদিনে যেখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন ঠিক সেই স্থানেই আছে। তাহাকে স্থানান্তরিত করিবার লোক এখন আর কেহ নাই। অগোচরে দোয়াত ও কলম লইয়া পলাইবে এমন লোকও আজকাল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পূজা কবিবার সময় ফুল চুরি করিয়া লইয়াও কেহ পালায় না। দুর্গাচরণের স্নানাহাবও এখন নিতান্তই সঙ্গীবিহীন ভাবে করিতে হয়। নিজের খাইবার সময় ননীর খাওয়া হইয়াছে কি না ভাবিয়া চিত্ত আকুল হইয়া উঠে। তাহাকে না খাওয়াইয়া তাঁহার কখন আহারে পরিতৃপ্তি হইত না। আজকাল সে কথা স্মরণ করিয়া নয়ন প্রান্ত আর্দ্র হইয়া উঠে।

দ্বিপ্রহবে আহারান্তে দুর্গাচরণ একাকী যখন আপনার ঘরে প্রবেশ করিতেন, তাঁহার এক একবার হঠাৎ মনে হইত যেন দ্বারের আড়াল হইতে পরিচিত সুরে, "দাদামশাই—টু" শব্দ শুনিতে পাইবেন। যদিও দুর্গাচরণ জানিতেন যে চারিদিক খুঁজিলেও কাহাকেও পাওয়া যাইবে না, তবুও তাঁহার চক্ষু দুইটি একবার চাবিদিক চাহিয়া দেখিত। দর্শনান্তে তাঁহার চক্ষুপ্রান্ত জলে ভরিয়া আসিত, ভাবিতেন, "কোথায় রে ননী, তুই আজ কোথায় গিয়েছিস, কোথায় ?" সে যে গৃহে নাই, পথে নাই—সে যে তাঁহার অশ্রু অভিষিক্ত হৃদয়টি অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেন না।

ননী চলিয়া যাইবার পূর্বে দাদামশাইয়ের নিকট শয়ন করিত। আজকাল বৃদ্ধ একাকী শয্যায় শয়ন করেন। বিছানায় পার্শ্বের স্থানটি শূন্য দেখিলে শয্যায় বেশীক্ষণ থাকিতে পারেন না; প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে। নিশীথ রাত্রে বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসেন। নিশীথিনীর অন্ধকারে অনুভব করেন যেন তাঁহারই অব্যক্ত বেদনা অগণ্য নক্ষত্রমণ্ডলীতে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে!

৪

দুর্গাচবণকে ছাড়িয়া আসা অবধি ননীরও মন আদপে ভাল ছিল না। দাদামশাইকে ছাড়িয়া কখন যে নূতন বাটীতে উঠিয়া আসিয়াছে সে জানিতে পারে নাই। একদিন হঠাৎ ঘুমের পর জাগিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া দেখে যে নূতন একটি ঘরে সে শুইয়া আছে। শয্যার পার্শ্বে দাদামশাই নাই, কিন্তু তাঁহার পরিবর্তে বাবা সে ঘবে একাকী বসিয়া পার্শ্বের একটি টেবিলে বই রাখিয়া পড়িতেছেন। আশুতোষকে ইহার কাবণ জিজ্ঞাসা করিলে সে জানিতে পারিল যে তাহাদের দুইজনকেই এখানে থাকিতে হইবে। দুর্গাচরণের সহিত ননীর সাক্ষাৎ হওয়া যে আর সম্ভব নহে, সে কথা আশুতোষ আর ভাঙ্গিয়া বলিলেন না। কিন্তু কি জন্য যে ননীর প্রতি এরূপ কঠিন শাস্তি বিহিত হইল, ক্ষুদ্র শিশুজীবনে সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। দুর্গাচরণকে ছাড়িয়া আসা পর্যন্ত তাহার বড় মন কেমন করিতে লাগিল।

খেলায় ও সর্ববিষয়ের সাথী দুর্গাচরণকে ছাড়িয়া পুত্র ননীগোপালের যে কতদূর কষ্ট হইবে তাহা বুঝিতে পারিয়া আশুতোষ পূর্ব হইতেই তাহার জন্য খেলনা ও নানাবিধ ছবির বহি ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। ননী মধ্যে মধ্যে তাহা লইয়াই একাকী ব্যস্ত থাকিত কিন্তু খেলার মধ্যেও সে এক এক দিন অকস্মাৎ গম্ভীর ও বিষণ্ণ হইয়া উঠিত। আশুতোষ তাহা লক্ষ্য করিতেন। তিনি তখন আপনার স্নেহক্রোড়ে তাহাকে টানিয়া লইয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন।

৫

ইহার মধ্যে একটা নূতন ঘটনা হইয়া গিয়াছে। শ্বশুরবাটী হইতে ননীর দিদি নলিনীবালা পূজার পূর্বে বাটী আসিয়াছে। সে-ই এখন ননীকে অনেক সময় ভুলাইয়া রাখে। গল্প বলিয়া ছবির বহি দেখাইয়া তাহাকে আনন্দ-বিহ্বল করিয়া তুলে। নলিনীর এই সবে দুই বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে ; সে তাহার শ্বশুর বাড়ীর কত কথা ছোট ভাইটিকে বলে। সে সব কথা বুঝিত না, কিন্তু দিদির নিকট দ্রব্যাদি লইবার লোভে সে চুপ করিয়া সব শুনিয়া যাইত। চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলে নলিনী ধমক দিত, "যা তোর আর গল্প শুনেও কাজ নেই, আর খেলনা নিয়েও কাজ নেই, সেই যে নূতন বাঁশীটা এনেছি তা আর কাউকে দিলেই হ'বে, তুই ত নিবিনি !"

একটি ফুৎকারে যেমন দীপ হঠাৎ নির্বাপিত হইয়া যায়, তেমনি ননীর মুখ অকস্মাৎ মলিন হইয়া যাইত। দিদি আবার তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া, আদর করিয়া নিজের ভাল বাক্সটি খুলিত। যে জিনিষটি লইবে তাহা ননীকে নিজেই নির্বাচন করিয়া লইতে বলিত।

একদিন এইরূপ করিয়া নলিনী ছোট ভাইটিকে ভুলাইতেছে, এমন সময় ননীর দিদির বাক্সের ভিতর যত্নে রক্ষিত "কুন্তলীন" ও "দেলখোস্" শিশি দুইটির প্রতি দৃষ্টি পড়িল। সে দেলখোসের শিশিটি হাতে লইয়া নলিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "এতে কি দিদি ?" দিদি কহিল, "ওর নাম দেলখোস্, রুমালে মাখতে হয়, খুব ভাল ফুলের গন্ধ এর ভেতর। আর এই যে এটা, এটা মাখলে চুল খুব বড় হয়। তুই নিবি ?" দেলখোসের শিশিটি হাতে লইয়া ননী বলিল, "আমি শুধু এটা নেব।" শিশিটির গন্ধের আঘ্রাণ লইযা সে তাহা পুনরায় দিদির বাক্সের ভিতরই রাখিয়া দিল।

এমনই করিয়া উভয়ের দিন কাটিয়া যাইত। আশুতোষ আপনার কার্যে দিন রাত্রি নিমগ্ন থাকিতেন। কন্যা নলিনী আসা অবধি তিনি ননীগোপালের আর কোন খোঁজ খবর লওয়া আবশ্যক মনে করিতেন না।

৬

দাদামশাইকে এ কয়দিন আব ননীর মনে পড়ে নাই। কিন্তু যখন পূজার কথা সে শুনিল, তখন তাহার মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই পূজার সময় তিনি কত জিনিস তাহাকে দিতেন, কত আদর করিতেন, সব কথা মনে পড়িয়া গেল।

কিন্তু সে পূজাও হইয়া গেছে। এত আশা করিয়াও দাদামশাইয়ের সহিত দেখা না পাইয়া ননীর মন বড় খারাপ হইয়া গেল। দাদামশাইয়ের কথা দিদি ও বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কোনরূপ সন্তোষজনক উত্তর পায় না। দিদি নাকি আবার বলিয়াছে যে দাদামশাই তাহাদের উপর রাগ করিয়াছেন। তাই সে এখন দিদির সহিত তেমন করিয়া হাসিয়া কথা কহে না। এমন কি গল্প শুনিতে তাহার আজকাল তেমন আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না।

নলিনী তাহাকে অনেক প্রকারে ভুলাইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু পারিত না। এমন সময়ে সে আশার একটি উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইল।

যে সময়ের কথা লিখিতেছি তাহার সহিত ইতিহাসের একটু সম্পর্ক আছে। যে ঘটনাটি লিখিতেছি, সেই ঘটনার পূর্বের বৎসরে বঙ্গবিচ্ছেদ হইয়া গেছে। তাহারই বাৎসরিক দিনে ননীদের গ্রামে যে রাখীবন্ধন, সঙ্কীর্তন ইত্যাদি হইবে, তাহার বিষয়ে নানা প্রকার গল্প করিয়া

নলিনী ভ্রাতাকে হর্ষোল্লাসে সঞ্জীবিত রাখিবার চেষ্টা করিত। ননী নানারূপ প্রশ্ন করিত। একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দিদি রাখীবন্ধন কাকে বলে ?" নলিনী রাখীবন্ধনের উদ্দেশ্যটি ছোট ভাইটিকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল। বলিল, "সে দিন ভা'য়ে ভা'য়ে ভাব করিতে হয়। ভাই যদি রাগও করেন, তবুও সব ভুলিয়া তাঁহার হাতে রাখী পরাইয়া দিতে হয়।"

দিদির নিকট রাখীবন্ধনের এই কথা শুনিয়া অবধি একটা ভারি মজার কথা তাহার মনে উদিত হইত, কিন্তু সে কথা দিদিকে প্রকাশ করিয়া জানাইত না।

৭

রাখীবন্ধনের দিনে আশুতোষ যখন গঙ্গাস্নান করিয়া অধিকবেলায় বাটী প্রত্যাগমন করিলেন, তখন ভীতচকিতা নলিনীর মুখে শুনিলেন যে ননীকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। সে নলিনীর সঙ্গে প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল, কিন্তু অর্দ্ধেক পথে গিয়াই সে বাটী ফিরিয়া যায়। কয়দিন হইতে তাহাব শরীর খারাপ বলিয়া সে গঙ্গাস্নান করিতে চাহে নাই। নলিনী বাটী আসিয়া দেখে ননী কোথাও নাই।

আশুতোষ চিন্তিত হইয়া থানায় খবর পাঠাইলেন এবং নিজেও অনুসন্ধান করিতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু কোথাও ননীর খোঁজ পাওয়া গেল না।

৮

"দাদামশাই,—টু !"

বৃদ্ধ দুর্গাচরণ দ্বিপ্রহরে আহারান্তে বাহিরের ঘরের বিছানায় যেরূপ প্রত্যহ শয়ন করেন, আজও সেইরূপ শয়ন করিয়াছিলেন। আশু ও ননীকে বিদায় দিয়া তাঁহার মন যে এত খারাপ হইবে তিনি পূর্বে ভাবেন নাই। সর্বদা মনে হইত যে পুত্র আশুতোষ ও তাঁহার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধক্ষেত্র পড়িয়া আছে। পিতৃ-গর্ব ভুলিয়া তিনি যদি জয়ী হইতে পারেন, তবেই আশু ও ননী উভয়েই তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু সে কথা স্মরণ করিলেই তাঁহাব আশঙ্কা হয়। ফল কি হইবে কে জানে ? তাঁহার পক্ষ হইতে জয়ের ত কোনও আশাই দেখা যায় না। পুত্র যেরূপ আত্মসম্মানপ্রিয় সে যে বাটী ফিরিয়া আসিবে এরূপ আশা দুর্গাচরণ কিছুতেই করিতে পারেন না।

আজ আহারান্তে শুইয়া শুইয়া তিনি এই সব কথাই মনের মধ্যে আলোচনা করিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বরে আপনার নাম শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন। সুমধুর শিশুকণ্ঠে ধ্বনিত পরিচিত আহ্বানবাণীটি হইতে তিনি অনেকদিন বঞ্চিত ছিলেন।

দাদামশাইকে ডাকিয়া ননী আপনার হস্ত দুইটি পিছনে রাখিয়া অপরাধীর ন্যায় দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিল। ভিতরে যাইবার তাহার সাহস কুলাইতেছিল না। যদি দাদামশাই বকেন। তাই অতি ভয়ে ভয়ে, ধীরে ডাকিল, "দাদামশাই,—টু।"

দুর্গাচরণ বজ্রচকিতে বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িলেন। পূর্বে এক এক দিন মনে হইত বটে যেন পরিচিত শিশুকণ্ঠে কে যেন তাঁহাকে ডাকিতেছে, কিন্তু আজ আর কোন ভুল নাই। বৃদ্ধ শয্যা ত্যাগ করিয়া ননীকে ক্রোড়ে তুলিয়া আপনার শয্যায় আসিয়া বসিলেন। বুকে জড়াইয়া

ধরিয়া, চুম্বনে চুম্বনে তাহাকে অস্থির করিয়া দিলেন।

ননী আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া দুর্গাচরণকে প্রথমেই প্রশ্ন করিল, "দাদামশাই, তুমি আমার ওপর রাগ করনি?" দুর্গাচরণ আপনার কম্পিত হস্ত তাহার ক্ষুদ্র মস্তকটির উপরে রাখিয়া বলিলেন, "না দাদা, আমি কি তোমার ওপর রাগ কর্তে পারি?"

"তবে কেন তুমি আমাদের বাড়ী পুজোর সময় যাওনি?"

চক্ষের জলে বৃদ্ধ ঠিক মনোমত উত্তর খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। মনে মনে বলিতেছিলেন, "দাদা, আমি যা পারিনি, তুই আজ তাই করেছিস্।" তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। কোনও কথা তিনি বলিতে পারিলেন না।

"দাদামশাই, এই দেখ তোমার জন্যে আজকে আমি কি এনেছি!" এই বলিয়া ননী তাহার জামার পকেট হইতে শিউলি ফুলের বোঁটায় নিজ হস্তে রঞ্জিত একটি রাখী বাহির করিয়া স্নেহ-সুকোমল হস্তে দুর্গাচরণের শীর্ণ হস্তে পরাইয়া দিল। অপর পকেট হইতে ক্ষুদ্র একটি শিশি বাহির করিয়া সে শয্যার উপর রাখিয়া দিল।

"দাদামশাই, তুমি বড় ফুল ভালবাস, এই দেখ কেমন একটা শিশি এনেছি। এর ভেতর কেমন ফুলের গন্ধ! দিদি বলেছে, আজকের দিনে সবাইকে দিশী জিনিস দিতে হয়। তোমাকে দেবার জন্যে আমি এটা এনেছি। তুমি আমাকে এবার পুজোর সময় কিছু দাওনি—"

এক নিঃশ্বাসে ননী এই কথা কয়টি বলিয়া গেল। এতদিন আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ে যে দারুণ অভিমান লুকাইয়া রাখিয়াছিল, আজ সে অভিমান আর কিছুতেই গোপন রাখিতে পারিল না। রুদ্ধোচ্ছ্বাসে নির্ঝরের ন্যায় বালকের চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। সে ক্রন্দন করিয়া উঠিল।

দুর্গাচরণ অনেক করিয়াও তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিলেন না। অবশেষে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে দুর্গাচরণের ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িল।

৯

ননীগোপাল যে দিন তার দাদামশাইয়ের সহিত দেখা করিতে যায়, সে দিন তাহার কিছুই আহার হয় নাই। আশুতোষ ও নলিনীর অগোচরে সে প্রত্যুষেই নগরের দিকে যাত্রা করিয়াছিল। পথ না জানায় ও রৌদ্র উঠায় কিছুদূর অবধি গিয়া সে আর হাঁটিতে পারে নাই। রাস্তার ধারে বসিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে কাঁদিয়াছিল। অবশেষে একজন ভদ্রলোক দয়া পরবশ হইয়া নিজের গাড়ী করিয়া প্রিয়দর্শন বালকটিকে দুর্গাচরণের বাটীর নিকট নামাইয়া দিয়া চলিয়া যান। কয়দিন হইতে ননীর শরীর ভাল ছিল না। আজ দ্বিপ্রহরে রৌদ্র লাগিয়া তাহার মাথা ব্যথা করিতে লাগিল।

দুর্গাচরণ দেখিলেন, ননীর জ্বর হইয়াছে। সন্ধ্যামুখে বালকের জ্বর শীঘ্র বাড়িয়া উঠায় তিনি ডাক্তার ডাকিতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। নিজে শয্যার পার্শ্বে ননীর ক্ষুদ্র দুইটি হস্ত আপনার হস্তে তুলিয়া লইয়া একাকী বসিয়া রহিলেন।

যথাসময়ে ডাক্তার আসিয়া রোগীকে দেখিয়া ঔষধ লিখিয়া চলিয়া গেলেন। আশার কথা তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না।

বেশী রাত্রে প্রলাপের লক্ষণ ক্রমশঃ দেখা দিল। বালক তখন ভুল বকিতে আরম্ভ করিল।

"দাদামশাই তোমার হাতটা একবার এগিয়ে দাও না রাখীটা পরিয়ে দিই। আমার উপর তুমি রাগ করনি—"

প্রভাতে কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ননী কাহার প্রত্যাশ্যায় ঘরেব চারিদিকে চাহিয়া রহিল। ব্যর্থ মনোরথ হইয়া সে পুনরায় নীরবে চক্ষু বুজিয়া শুইল।

দুর্গাচরণ আশু ও নলিনীকে আনিতে পূর্বেই লোক পাঠাইয়াছিলেন। দ্বিপ্রহরে ডাক্তার আসিয়া বালকের অবস্থা ভাল নহে বলিয়া গেলেন।

সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্বে আশু ও নলিনী যখন আসিয়া পৌঁছিল, তখন নির্বানোম্মুখ প্রদীপের ন্যায় ননী আর একবার সচেতন হইয়াছে।

নলিনীকে দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, "দেখ দিদি, দাদামশাই আর আমাদের ওপর বাগ কর্বেন না বলেচেন, তাঁর সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গিয়েছে, দেখ, কেমন তাঁব হাতে আমি রাখী পরিয়ে দিইচি—"

যোগেশচন্দ্র মজুমদার

অপরাধী

১

সে আজ অনেকদিনের কথা। তখন সবে মাত্র বি, এ, পাশ কবিয়া চাকদালিতে আপনার পল্লীবাসভবনে আসিয়া বসিয়াছি। পিতামাতার স্নেহ হইতে বহু পূর্বেই বঞ্চিত হইয়াছিলাম—গৃহে তেমন নিকট আত্মীয়ও কেহ ছিল না। পাঠেব নেশাটা তীব্রভাবেই আমাকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। সমগ্র জীবনটা পাঠের মধ্যেই নিমগ্ন বাখিব এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিলাম। বিবাহ ?—স্ত্রীর সম্বন্ধে আমার আদর্শটা অত্যন্ত উচ্চ ছিল। আমার হৃদয়ে যে সকল সুমহান সাধ আশা মুকুলিত হইয়া উঠিতেছে কাহার হস্তস্পর্শে সেগুলি বিকাশ লাভ করিবে ? 'অশ্রুভরা নোলকপরা' বার বৎসরের বালিকাকে হৃদয়লক্ষ্মী কবিয়া জীবনের পথে তাহার উপর প্রেমের নির্ভর স্থাপন করিব ? ইহা অপেক্ষা হাস্যাস্পদ আর কি থাকিতে পারে ?

বি, এ, পাশ করিয়া দ্রুমহীন দেশে এরন্ড হইয়া বসিলে আমাব পল্লীবন্ধুগণ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইল। তাহারা প্রবেশিকা রাজ্যের মায়া অতিক্রম করিতে না পারিয়া সরস্বতী দেবীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল—সুতরাং যে শচীন বোস তাহাদের সহিত গাছে উঠিয়া আম পাড়িত, ও বাচখেলায় বিশেষ তৎপর ছিল, সেই শচীন বোসই যে চারি বৎসর কাল দেশান্তরে থাকিয়া একটা দিগ্‌গজ হইয়া উঠিবে—এটা তাহারা ধারণাই করিতে পারিত না! আমি এক দিন তাহাদের একজনকে ডাকিলাম—"বিপিন!" বিপিন নিকটে আসিল। তাহার প্লীহা তখনও নির্দোষভাবে সারে নাই। আমি কহিলাম—"দেশটাকে আমি reform করতে চাই।" বিপিন আর একটু সরিয়া আসিয়া কহিল—"ছেলেবেলা থেকে আমারও তাই ইচ্ছে! ঐ জন্যই ত কিছু হোল না!" আমি কহিলাম—"একটা খবরের কাগজ বের করবো, তুমি Sub-editor হবে?" বিপিন সহর্ষ সম্মতি জ্ঞাপন করিলে আমি কহিলাম "একটা ক্লাব, একটা লাইব্রেরী ও একটা কাগজ এ ত

ভারী দরকার হয়ে পড়েছে !"

আমার ও আমার নিষ্কর্মা সহচরগণের সংস্কারের উত্তেজনায় ক্ষুদ্র গ্রাম সরগরম হইয়া উঠিল। গ্রামের ছাত্রগণের মধ্যেও রীতিমত বিপ্লব বাধিয়া গেল। সময়ে অসময়ে তাহারা স্কুল পলায়ন বিদ্যায় সমধিক তৎপরতা প্রদর্শন পূর্বক গোপনে লাইব্রেরীতে আসিয়া "বিষবৃক্ষ" "দুর্গেশনন্দিনী"র শ্রাদ্ধ করিত ; কেহ বা হস্তপদাদি সঞ্চালনে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া—মাঠে ঘাটে "Mr. President and gentlemen" বলিয়া বক্তৃতা প্রদান করিত। বলা বাহুল্য এই মহদুদ্দেশ্য সাধনে আমরা কয়েকটি অভিভাবকের নিকট হইতে ঈষৎ তিরস্কারও লাভ করিয়াছি, কিন্তু তখন আমাদের উত্তেজনায় বন্যা আসিয়াছিল ; সে গতি রোধ করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে বরং কয়েকটা বাধা পাইয়া তাহা আরও প্রচণ্ড ভাব ধাবণ করিল।

২

রাখাল দত্ত গ্রামের এন্ট্রান্স স্কুলের থার্ড মাষ্টার—ভারী সেকেলে ধরনের লোক গায়ে পিরাণ, বোম্বাই চাদর ও পরিধানে মোটা থান, রং কালো আমার ত' চক্ষুশূল ছিল। ইহার বিশেষ কারণ লোকটা আমায় বড় হিংসা করিত। বাল্যকাল হইতেই আমার বক্তৃতা দিবার সখ—যখন স্কুলের Debating club-এ আকবর ও আরংজেবের রাজত্বের আলোচনা করিয়া দিব্য দৃপ্তভাবে প্রবন্ধ পাঠ করিতাম, রাখাল মাষ্টার সমালোচনা প্রসঙ্গে নিষ্ঠুরভাবে বলিয়া উঠিত "প্রবন্ধটা আগাগোড়া ইংরাজী মাসিক হইতে উদ্ধৃত।" হইতে পারে ইংরাজী মাসিকের প্রবন্ধ লেখকের সহিত আমার মতের মিল আছে কিন্তু তাই বলিয়া এই এতগুলা লোকের সম্মুখে আমার প্রতি চৌর্যবৃত্তির আরোপ করাটা তাঁহার পক্ষে একান্ত গর্হিত নহে কি ? তাহার উপর আবার জ্বালা,—আমার অনুবাদপত্রে ইংরাজীর ভুল কাটিয়া তিনি আমাকে ক্লাশে বড়ই অপদস্ত করিতেন। আমি যে উহারি মধ্যে একটু গণ্যমান্য হইতে চাই। ইহা যেন রাখাল মাষ্টারের চক্ষে অসহ্য ! সেই অবধি রাখাল মাষ্টারের নামে আমার সর্বশরীর জ্বলিয়া উঠে ! সুবিধা পাইলেই তাহার প্রতিকূলাচরণ করিতাম। কিন্তু সে তখন স্কুলের মাষ্টার আর আমি তার ছাত্র। মনে পড়ে এন্ট্রান্স পাশ করিয়া এফ, এ পড়িবার জন্য যে দিন কলিকাতায় আসি তাহার পূর্বরাত্রে একটা প্রকাণ্ড ভোজে স্কুলের সমস্ত মাষ্টার ও দ্বারবান প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করি কেবল রাখাল মাষ্টারকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহার এই সকল অন্যায় অত্যাচারের চূড়ান্ত প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করি। বি, এ, পাশ করিয়া দেশে ফিরিলে, যখন রাখাল মাষ্টারের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলি,—"মাষ্টার মশায় যে ! আপনার আশীর্বাদে এ মূর্খটাও শেষে বি, এ, পাশ করেছে।" "এ সংবাদে বড়ই সুখী হয়েছি"—বলিয়া রাখাল মাষ্টার মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেলে যদু বলিল,—"দেখলে ব্যাপারখানা,—রাখাল মাষ্টারের হিংসেটা।" অবিনাশ কহিল,—"সে ত আগাগোড়া দেখে আসছি।" আমি ডাকিলাম—"শিবু" "কেন হে ?"—"বেটার তেজটা ভাঙা যায় কি করে বল দেখি !"

শিবু দলের মধ্যে Expert। বাল্যকাল হইতেই দুষ্টামিতে বুদ্ধি চালাইতে সে বেশ সক্ষম। শিবুর সহিত পরামর্শান্তে একমুখ হাসিয়া একখানা চিঠির কাগজ বাহির করিয়া একখানা চিঠি লিখিতে বসিলাম,—"ঘটকের মুখে শুনিলাম, মহাশয়ের নাকি একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। কন্যাটি গৌরবর্ণা নহে তবে নাকি বিশেষ সুলক্ষণা। আমাদের

বংশে সুশ্রী অপেক্ষা সুলক্ষণা কন্যার অধিক আদর। যাহা হউক মহাশয়ের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে বিশেষ উৎসুক। বন্দ্যহাটির জমিদারপুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে আপনার বোধ হয় আপত্তি হইবে না। আগামী রবিবার আমরা কন্যা দেখিয়া আসিব। সাক্ষাতে সকল কথা হইবে ; ইতি।

বিনীত
শ্রীহরিহর ঘোষ।"

এখন রাখাল মাষ্টারের কন্যাটির কথা কিছু বলিব। কন্যাটি গৌরবর্ণা ত নহেই এবং যাহাকে আমরা শ্যামবর্ণা নামে অভিহিত করি তাহাও নহে। শিবু বলিত, "আবলুষ কাষ্ঠবর্ণা।" রাখাল এহেন কন্যার নাম নিরুপমা রাখিয়াছেন কি হিসাবে, তাহা লইয়া আমাদের ক্লাবে ঘোরতর আন্দোলন হইত। রাখাল মাষ্টারের উপর আমাদিগের বিদ্বেষের ইহাও একটি কারণ। অমন কবিত্বমণ্ডিত নামটার দুরবস্থা করেন, রাখাল মাষ্টারের এতদূর স্পর্ধা! যাহা হউক, কন্যাটির কিছুতে বিবাহ হইতেছিল না। নানা স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতেছিল কিন্তু কন্যা দেখিয়া সকলেই পলায়ন করিতেন। এই শোচনীয় ব্যাপারটি আমাদের বিদ্রূপের উৎস খুলিয়া দিত। আমরা এমনি আশ্চর্য হৃদয়হীন ছিলাম।

শিবু রাখাল মাষ্টারের প্রতিবেশী। সে অন্তরে যাহাই হউক না কেন বাহিরে যে ভাব প্রকাশ করিত তাহাতে মনে হইত সে যেন রাখাল মাষ্টারের নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী। শিবু ছিল ঘরের বিভীষণ। সে রাখাল মাষ্টারের ঘরেব প্রত্যেক কথাটি আমাদের কাছে বহন করিয়া আনিত এবং আমি যখন তাহার কৌতুককর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম তখন আমার দলস্থ সহচরবর্গ হাসিতে হাসিতে পাকা ফুঁটির মত ফাটিয়া পড়িত। শিবুর মুখে শুনিয়াছিলাম, বাখাল মাষ্টার এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ নিরুপমার রূপহীনতাব উল্লেখকালে সে যে বিশেষ সুলক্ষণা এই সরল সত্যটি পুনঃ পুনঃ সর্বসমক্ষে প্রচারিত করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিত।

৩

সোমবার প্রাতঃকালে শিবু আসিযা একমুখ হাসিয়া কহিল, "বাজিমাৎ হে!" আমি কহিলাম, "বল বল।" শিবু কহিল, "কাল ত রাখাল মাষ্টার বন্দ্যহাটিব জমিদারের জন্যে লুচি কালিয়া সব তৈরী করিয়েছিল। বেচারী আমাকে বলে, 'ওহে আমার ত বিশ্বাস হয় না'। আমি বললুম, 'সন্দেহের ত কারণ দেখছি না'—তারপর আমার কথায় তাদের অভ্যর্থনার জন্যে রীতিমত আয়োজন করে রাত আটটা অবধি বসে থেকে হতাশ হয়ে শেষে আমাদের ডেকে খাওয়ায় দাওয়ায়।" আমি হাসিতে হাসিতে কহিলাম, "আর তোমার নিরুপমা?" "ওঃ—সে সাজানোর চোটটা যদি দেখতে! আমাদের বাড়ী থেকে পার্সী শাড়ী পরিয়ে গহনা দিয়ে তোমার গে 'কুন্তলীন' দিয়ে চুল বেঁধে—আরে বাস্ সে যেন একেবারে লেডি কালিন্দী—ইস্তক হাতে একখানা 'দেলখোস' মাখান রুমাল অবধি। আহা নিখুঁত সুন্দরী নিরুপমার শোভা যা হয়েছিল।" আমরা খুব হাসিতে লাগিলাম। ইহার পর একদিন শিবু কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া রাখাল মাষ্টার একদিন আমাদের ক্লাবে আসিয়া আমার একটা প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গেল। ইহাতে আমার ক্রোধ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। আমি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট, আর পাড়া গেঁয়ে স্কুলের একটা অর্দ্ধ শিক্ষিত মাষ্টারের কি

না এতদূর ধৃষ্টতা যে আমাকে এইরূপে সভার মধ্যে লাঞ্ছিত করে।

শিবু প্রভৃতি সহচরবৃন্দের সহিত গোপনে একটা পরামর্শ হইয়া গেল। শিবু একদিন কহিল, "ওহে শচী"। আমি কহিলাম, "কেন ?" শিবু কহিল,—"রাখাল মাষ্টারের আর কোন গুণ থাক বা না থাক লোকটা বড় সরল—যা বল তাই বিশ্বাস করে। বিশেষতঃ যেখানে বক্তা আমি।" আমি কহিলাম—"আরে ব্যাপারখানা খুলেই বল না।" শিবু কহিল, "মেয়ের বিয়ের জন্য বেচারী ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বেড়াচ্ছে ; প্রায়ই আমাকে সে কথা বলে। কালও অভ্যাসমত ঐ কথা বলছিল। আমি মাথাটা একটু চুলকাইয়া কহিলাম—'মাষ্টার মশায়, একটা কথা আছে—কিন্তু শুনলে সহজে বিশ্বাস হয় না'। মাষ্টার বললে 'কি হে।' আমি বললুম, শচীর বিয়ে হচ্ছে না কেন জানেন ?—ও আশ্চর্য Whimsical—ও একটু বড় মেয়ে চায়। আর মেয়ের রঙ যেমনি হোক্ না কেন যেন বেশ লেখাপড়া জানা থাকে। তা ওকে একবার বলে দেখলে হয় না ?" রাখাল মাষ্টার ত খানিক চুপ করে রইল—কোন কথাই বলে না—আমি একটা ঢোঁক গিলে বললুম—'তা হলে কি বলবো তাকে ?' মাষ্টার বললে, 'তুমি পাগল হয়েছ হে।' আমি বললুম, 'একবার কথাটা পাড়তে আর দোষ কি ? মেয়ে দেখে যাবে বৈ ত নয়।' রাখাল মাষ্টার বললে 'দেখে যাক ক্ষতি কি ! তোমার সঙ্গে ত ভাব আছে বলে দেখ না।' আমি বললুম 'আচ্ছা আমি ভার নোব কিন্তু কারুকে এখন একথা প্রকাশ করবেন না—বিয়ের সম্বন্ধ কি না।' এই রকম ত মাষ্টারকে বলে এসেছি। এখন একদিন চল না হে।" আমি সহাস্যে কহিলাম "তুমি একটি রত্ন হয়ে পড়লে যে।"

তখন একদিন অপরাহ্নে রাখাল মাষ্টারের গৃহে অতিথি হইয়া বিবিধ চর্বচোষ্যে আপনাকে পরিতৃপ্ত করিলাম। নিরুপমার রূপের উপমা নাই সত্য। আমি ঈষৎ কৌতুক অনুভব কবিয়া কহিলাম,—"এ বিষয়ে আমাব মতামত শিবুর কাছে শুনিতে পাইবেন।"

বাড়ী ফিবিয়া শিবুব সহিত পরামর্শ আঁটিলাম। হায়, তখনো যদি আমার নিষ্ঠুর কৌতুকের শোচনীয় পরিণামের বিষয় কিছু ইঙ্গিতে বুঝিতাম। কিন্তু তখন দানবী প্রবৃত্তি আমার সকল জ্ঞান দমিত করিয়া রাখিয়াছিল। শিবু যাইয়া রাখাল মাষ্টারকে আমার যে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল তাহার ফলে রাখাল মাষ্টারের নিরানন্দ পুরী আনন্দের কলহাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিল, বিবাহের দিন স্থির হইল—২রা মাঘ। হা ভগবান, তখনো যদি এ পাপিষ্ঠের মস্তকে বজ্রাঘাত করিতে।

৪

১লা মাঘ শুনিলাম রাখাল মাষ্টারের গৃহ আত্মীয়কুটুম্বাদিতে পূর্ণ হইয়াছে। আমার সুখ্যাতি আর গ্রামে ধরে না। সকলেই বিস্মিত, একি অমানুষিক ব্যপার ! চুপি চুপি হরিদ্রা পাঠানোর ভার শিবুই গ্রহণ করিয়াছিল। ২রা মাঘ বাড়ীতে একটা ভোজের আয়োজন করিলাম। গীতবাদ্য হাস্য কৌতুকে আমার গৃহ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার সময় শিবু আমার প্রতি একটা ইঙ্গিত করিল, আমি একটু হাসিলাম। অবিনাশ কহিল,—"ওহে পোলাওর গন্ধে গান ত আর ভাল লাগে না।" আমি কহিলাম,—"না, না, তা হচ্ছে না। আমি হার্মোনিয়মে সুর দিচ্ছি ; তুমি একটা গান ধর।" তখন কলিকাতার থিয়েটারে "আবু হোসেনের অত্যন্ত পশার। অবিনাশ গান ধরিল,

"আমার সরল প্রাণে ব্যথা লেগেছে
বুঝেছি শিখেছি ঠেকে, আমার—
সোনার স্বপন ভেঙে গেছে।"

এমন সময় কে ডাকিল, "শচী।" আমি নিবিষ্টচিত্তে হার্মোনিয়মে সুর দিতেছিলাম। অবিনাশ গান থামাইয়া দিল। এই আকস্মিক রসভঙ্গে বিরক্ত হইয়া চাহিয়া দেখি দ্বারদেশে রাখাল মাষ্টার দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে "শিবু।" বেচারীর মুখখানি বিবর্ণ। আমি কহিলাম,—"কি মশায়, আপনি যে এখানে ?" রাখাল মাষ্টার একটু সরিয়া আসিয়া কহিল, "আজ ত ২রা মাঘ।" আমি কহিলাম, "তা ঠিক বলতে পারি না। তবে ১৫ই জানুয়ারী বটে।" রাখাল মাষ্টার শুষ্কমুখে কহিল, "তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ্ করিবে যে। আজ ত দিনস্থির ছিল।" কক্ষমধ্যে একটা হাস্যের তরঙ্গ বহিয়া গেল। আমি কহিলাম, "আপনার কন্যাকে বিবাহ ? কৈ এমন কথা ত আপনার সঙ্গে হয়নি।" রাখাল মাষ্টার কহিল, "কথা হয়নি ? সে কি ? শিবু যে—কৈ শিবু বল না বাবা।" কোথায় শিবু ? শিবু তখন পলাতক। আমি কহিলাম, "শিবু যা বলেছে তার জন্য ত আমি দায়ী হতে পারি না—আমার বিষয় আমি এই বলতে পারি যে আমি মশায়কে কখনো এমন কথা বলিনি।" রাখাল মাষ্টার নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি অন্তরের মধ্যে একটা পৈশাচিক আনন্দ অনুভব করিয়া হার্মোনিয়মে সুর প্রদান করিলাম, কিয়ৎক্ষণ পরে রাখাল মাষ্টারের স্বর কর্ণে প্রবেশ করিল। অতিশয় হতাশপূর্ণ স্বরে সে কহিল,—"বিবাহ্ করবে না তবে ?" আমি কহিলাম, "ক্ষমা করবেন ! একান্ত সময়াভাব।" রাখাল মাষ্টার আমার নিকট আসিয়া আমার একটা হাত চাপিয়া ধরিল ; করুণস্বরে কহিল, "শচী আমি বড় দুঃখী—আমার জাত রাখ, মান রাখ—নইলে আমি যে মারা যাই।" আমি কহিলাম, "কি করব বলুন—আমার কোন হাত নাই।" রাখাল মাষ্টার আমার দিকে চাহিয়া কহিল, "এখন কি করি ? আমার উপায় ?" আমি কহিলাম, "এখন ত সবে এই সন্ধ্যে—দেখুন না খুঁজে একটু—পাত্রের অভাব কি দেশে ?" এই কথা বলিয়া আমি রাখাল মাষ্টারের প্রতি কটাক্ষপাত করিলাম, বুঝিলাম তাঁহার চক্ষুদুটি জলভারাক্রান্ত। আমি হার্মোনিয়মে সুর দিতে লাগিলাম। রাখাল মাষ্টার কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া "হা ভগবান।" বলিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল ও পরে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আহা,—সেই কাতর হৃদয়ের মর্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস।

৫

পরদিন প্রাতঃকালে চা-পান করিয়া খবরের কাগজের মোড়কটা ছিঁড়িতেছি এমন সময়ে শিবু আসিয়া উপস্থিত। শিবুর মুখ যেন বিবর্ণ বোধ হইল। আমি কিছু বলিবার পূর্বেই শিবু কহিল, "ওহে ভাবী একটা tragedy হয়ে গেছে।" "কি রকম ?" "রাখাল মাষ্টারের মেয়েটি মারা গেছে।" আমার বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। আমি কহিলাম, "সে কি ? কখন ?" শিবু কহিল, "কাল রাখাল মাষ্টার তোমার কাছে এসে যখন নিরাশ হয়ে ফিরে গেল তখন বাড়ীতে একটা কান্নাকাটি পড়ে গেল। বিস্তর আত্মীয় কুটুম্ব ছিল তারা অনেকে প্রবোধ দেওয়ায় থামে। মাষ্টারের মুখ একেবারে সাদা হয়ে গেছে। এত লোকজনের কাছে মাথা হেঁট।" আমার অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বহির্গত হইল। কহিলাম "তারপর ?" "তার পর সকলে শুতে যায় ; সকালে উঠে নিরুপমাকে আর কেউ দেখতে পায় না। অনেক

খোঁজাখুঁজির পর একটা চিঠি পাওয়া গেছে। আমি সেটা এনেছি এই যে।" "কৈ দাও, দাও।" পত্রখানা পড়িতে লাগিলাম। চিঠিতে অবিকল এইরূপ লেখা ছিল,—
"বাবা, আমার জন্যেই তোমাদের এত কষ্ট এত অপমান, এত লাঞ্ছনা! আমি মলেই সব জ্বালা জুড়োয় না বাবা ? আজ আমি চিরবিদায় নিলুম। আমাকে তোমরা ক্ষমা করো। অনেক পুণ্যে এমন বাপ মা পেয়েছিলুম কিন্তু একদিনও তোমাদের সুখী করতে পারলুম না, এ দুঃখ মলেও যাবে না।

তোমাদের—
আদরের নিরু।"

আমার বুকের উপর কে যেন একখানা প্রকাণ্ড প্রস্তর দ্বারা আঘাত করিল। আমি সহসা দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলাম। শিবু হাত ধরিল ; কহিল "কোথা যাও?" "নিরুকে খুঁজিতে।" শিবু ব্যথিত চিত্তে কহিল, "বৃথা চেষ্টা ভাই। ভোর থেকে বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর বামোড়ের বিলে তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে।" বেশ মনে পড়ে আমি মেজের উপর থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলাম। আমার মাথাব ভিতর আগুন ছুটিতেছিল। হায়, আমার ন্যায় অপরাধীর জন্য কি ফাঁসিকাষ্ঠ নাই ? এখন কি করিব ? কি করিয়া লোকের কাছে মুখ দেখাইব ? আর রাখাল মাষ্টার—নিরীহ দুঃখী রাখাল মাষ্টার! তার সেই সজল কাতর দৃষ্টি—সেই ভারাক্রান্ত হৃদয়ের তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস! উঃ—আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। শিবুকে কহিলাম, "চলে যাও।" শিবু চলিয়া গেল। যদু আসিয়া বলিল, "কাল খাওয়াটা বড় বেশী হয়েছিল হে—রাত্রে একদম ঘুম হয়নি। এস না একটু বেড়িয়ে আসা যাক।" কথাগুলা স্পষ্ট আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি উত্তর দিলাম না। যদু কহিল, "তোমার কি অসুখ কবেছে না কি ?" আমার মস্তিষ্ক স্থির ছিল না। আমি কহিলাম, "যাও, বিরক্ত করো না।" আমার কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক উত্তেজনা ছিল। আমি নিজেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যদু বোধ হয় তাহারি ভয়ে দ্বিতীয় বাক্য ব্যতিরেকে চলিয়া গেল।

সেই দিনই দেশত্যাগ করিলাম। তাহার পূর্বে রাখাল মাষ্টারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছি। তিনি এ হত্যাকারীকে আশীর্বাদের সহিত বিদায় দিয়াছেন। সে আজ কতদিনের কথা। আজ কোথায় রাখাল মাষ্টার জানি না ; বিশেষ চেষ্টাতেও তাঁহার কোন সন্ধান পাই নাই। কিন্তু মনের কণ্টক এখনো বেশ তীক্ষ্ণভাবেই ফুটিয়া আছে। হায়! কারাগৃহের কোন অপরাধী আমা অপেক্ষা হীনতর ? আমার পাপেব প্রায়শ্চিত্ত নাই। হে ভগবান, আমাব তাপিত চিত্তে শান্তি দান কর, আমাকে মার্জনা কর।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ঊষা

সোনাপুরের হরিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের অবস্থা ভাল ছিল। কলিকাতায় প্রকাণ্ড কারবার এবং দেশের ভূসম্পত্তি তাঁহার গৃহে লক্ষ্মী অচলা করিয়া বাখিয়াছিল।

পুত্র ফণিভূষণ দেশের ভূসম্পত্তি দেখিত, এবং হরিভূষণ বাবু কলিকাতার কারবারের তত্ত্বাবধান করিতেন। বৃদ্ধ হরিভূষণ তাঁহার জীবনে অনেক শোক সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু

দুইটা ঘটনা তাঁহার অন্তরে যে বেদনার আঘাত দিয়া গিয়াছে, তাহা তাঁহার জরাগ্রস্ত বার্দ্ধক্যকে নিরন্তর অবসন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। 'আজ চার বৎসরের কথা,—একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁহার পত্নী জীবনের মহাযাত্রার পথে তাঁহাকে একা ফেলিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন এবং এক বৎসর না ফিরিতেই জ্যেষ্ঠপুত্র শশিভূষণও একটিমাত্র পিতৃমাতৃহীন কন্যা রাখিয়া তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন।

এই মহাশোকের কথা ভুলিবার জন্য বৃদ্ধ কলিকাতায় কারবার লইয়া থাকিতেন, কিন্তু গৃহের একটি অতি ক্ষুদ্র বন্ধন—শশিভূষণের পিতৃমাতৃহীন কন্যা উষা—তাঁহাকে বারম্বার গৃহে আকর্ষণ করিয়া আনিত। ফণিভূষণ ও তাঁহার পত্নী শৈলর জন্য বৃদ্ধের মন ততটা কাতর হইত না, যতখানি উষার জন্য হইত। এই নিঃসহায় বালিকাটিকে বৃদ্ধের মৃত্যু-আহত স্নেহ অত্যন্ত নিবিড় ভাবে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছিল।

জীবনের সূর্য যখন পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছিল, এবং মৃত্যুর ছায়া দিন দিন গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল, যখন শোকাহত বৃদ্ধের হৃদয় মহাশক্তির প্রতীক্ষায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল সে সময় কোথা হইতে এই মায়াবিনী তাহার চম্পক অঙ্গুলিঘাতে সংসারের সহিত এই অভিনব বন্ধন সৃজন করিয়া দিল। বৃদ্ধের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে, সমস্ত কর্মের মধ্যে, একটি অনবদ্য শ্রী, সুকুমার আনন বারম্বার ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত। তাই, বাহিরের লোক যখন কোন কারণ খুঁজিয়া পাইত না, তখন বৃদ্ধ হঠাৎ তাহার কর্ম এবং কারবার মাঝপথে পরিত্যাগ করিয়া সোনাপুরের দিকে অত্যন্ত ব্যাগ্রভাবে রওনা হইয়া পড়িত, এবং তাহার পরদিন নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে গৃহের নির্জনতা ভঙ্গ করিয়া ডাক পড়িত "দিদি"!

বর্ষা কাটিয়া গিয়াছে। শরতের বর্ষণ-ক্ষান্ত রৌদ্র-রঞ্জিত লঘু মেঘগুলি ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছিল, নদীর কূলে বিকশিত-পুষ্প কাশগুচ্ছ নদীর জলে হেলিয়া পড়িয়াছিল এবং সমস্ত বাঙ্গালা মহোৎসবের প্রতীক্ষায় পুলক-চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় কারবার কিছুদিনের জন্য বন্ধ করিয়া হরিভূষণ পূজা উপলক্ষে গৃহে আসিলেন।

দ্বিপ্রহরে বৃদ্ধকে উষা রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতেছিল—রামের শোকে দশরথের মৃত্যু-কাহিনী। রাম যখন বনে চলিয়া গিয়াছেন তখন শোক-কাতর দশরথ হা বৎস, হা রাম বলিয়া লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছেন।

হঠাৎ উষা থামিল "দাদামশাই শুনচো না বুঝি ?" বৃদ্ধ চমকিয়া উঠিল, "হাঁ হাঁ তারপর দশরথ কি ব'ললেন ?"

"তুমি বুঝি একটুও শোননি ?"

চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল ; কাপড়ের খুঁট দিয়া মুছিয়া বৃদ্ধ কহিলেন, "না দিদি, আমি শুনিনি।"

উষার চোখ জলে ভরিয়া আসিল,—"তুমি কাঁদছ কেন দাদামশাই ?"

বৃদ্ধ একবার উষার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ও কিছু না।" তারপর যখন অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল তখন বলিলেন, "তোর বাপ মার কথা মনে হল।"

উষা রামায়ণ বন্ধ করিল "আচ্ছা দাদামশাই, আমার মা বাবা আমাদের ছেড়ে গেলেন কেন ?"

বৃদ্ধ অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "তোর আর আমার কপাল দিদি।" তাহার পর সস্নেহে উষার দিকে চাহিয়া বলিলেন "তোমার কাকা আছেন,

খুড়ীমা আছেন, তাঁরাই তোমার বাবা মা।"

দুইজনে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, হঠাৎ হরিভূষণের চোখ দুটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, "হাঁ, হাঁ, ঊষা, তোর জন্যে কলকাতা থেকে এবার কি এনেছি দেখিসনি বুঝি ! নিয়ে আয় ত আমার ব্যাগটা।"

ঊষা ব্যাগ আনিলে হরিভূষণ তাহার ভিতর হইতে একখানি পুস্তক বাহির করিলেন "এই নে—"

ঊষার মুখে হাসি দেখা দিল "কি বই দাদামশাই ?"

"স্বর্ণলতা। আর এটা কি বল দিকিনি ?"

"কি বল না !"

"এটা হচ্ছে একটা গন্ধ—দেলখোস্ ! আর এটা—কুন্তলীন। আমার যখন মাথার অসুখ হয়েছিল, তখন তোর বাবা আমার জন্য এই তেল আনত—সে আজ কতদিন !" বলিযা বৃদ্ধ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

ঊষা ব্যগ্র হইয়া হাত বাড়াইল "বা—বা ! দাদামশাই দেও না !"

বৃদ্ধ ছিপি খুলিয়া খানিকটা ঊষার মাথায় দিয়া শিশিটি তাহার হাতে দিলেন। ঊষা ক্ষুদ্র শিশিটি লইয়া আপনার বুকের ভিতর জড়াইয়া ধবিল, সেই স্নেহের দান তাহার চোখেব সম্মুখে অতীতের একটি মঙ্গলজ্যোতিপূর্ণ প্রেমোজ্জ্বল চিত্র উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল।

আজ দশ দিন হরিভূষণ সংসারেব সহিত সম্বন্ধ শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

দুপুব বেলা—ফণিভূষণ ব্যাগ হাতে বাটীতে ঢুকিল—চোখ দুটা বসিয়া গিয়াছে, মাথাব চুল অবিন্যস্ত।

ঘরে ঢুকিয়া একটা চৌকীর উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। শৈল অদূবে অনেকক্ষণ নির্বাক হইযা দাঁড়াইযা বহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল, "কি হ'ল ?"

ফণিভূষণ অত্যন্ত রুক্ষভাবে বলিল "আর কি হবে! বাবা আমাদের স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকবার সুন্দর উপায় ক'রে গেছেন—কলিকাতা থেকে উপস্থিত এই খবরটা নিয়ে এসেছি। তিনি কাবখানা সংক্রান্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার রেখে গেছেন।"

শৈল বসিযা পড়িল "উপায় ?"

ফণিভূষণ কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল "পথে দাঁড়ান। দেনার টাকা পরিশোধে কারবাবটা বিকোবেই--এমন কি সামান্য জমিদারিটুকুতেও হাত পড়বে বোধ হয়।"

জমিদাবীতে হাত পড়িল—কিন্তু সে দেনার দায়ে নহে। পিতার মৃত্যুর পূর্ব হইতেই ফণিভূষণের মদ্যপান অভ্যাস ছিল—পিতার মৃত্যুর পব তাহা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিত সংসারেব অসুখ আর সহ্য হয় না, তাই মদ খেয়ে দু'দণ্ড ভুলে থাকতে চাই।

কিন্তু সংসারের অসুখ কমিল না। স্বামীর বিপক্ষে শৈল বড় কথা কহিতে পারিত না, আজও তাহাকে বলিতে পারিল না, "এমন করিয়া ধ্বংসকে আহ্বান করিয়া আনিয়ো না।" নেশার ঝোঁকে স্বামী যখন অত্যাচার করিত তখন সে নিঃশব্দে সহ্য করিত, যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করিত তখন তাহার একমাত্র স্নেহের আস্পদ ঊষাকে বুকে জড়াইয়া রোদন করিত।

সন্তান হইতে বঞ্চিত এই অভাগা নারীর একমাত্র সান্ত্বনার স্থল ছিল ঊষা। তাহার

সংসারে যে কালান্তক ঝটিকা উঠিয়াছিল, তাহারই করাল স্পর্শ হইতে ঊষাকে অব্যাহত রাখিবার জন্য অভাগিনী আপনাকে তাহার নিকট বলিদান দিয়াছিল।

ফণিভূষণ পত্নী ও ঊষাকে পূর্বে অনাদর করিত না বটে, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর দৈন্য এবং অমিতাচার তাহাকে অমানুষ করিয়া তুলিয়াছিল। ধ্বংসের জ্বালাময় সুতীব্র দাহ তাহার স্নেহের প্রস্রবণকে শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছিল। পাপের আকর্ষণ তাহাকে পতনের মুখে ভয়ঙ্কর বেগে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল, সে বেগের নিকট পত্নী এবং ঊষা অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল!

সে দিন সন্ধ্যার সময় কোথা হইতে ফণিভূষণ আসিয়া বলিল "একবার চাবিটা দাও দেখি।"

শৈল বলিল, "কেন?"

ক্রুদ্ধ স্বরে ফণিভূষণ কহিল "প্রয়োজন আছে, টাকা নেবো।"

হঠাৎ শৈল অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বলিল "কিসের জন্য টাকা নেবে সেই কথা শুনতে চাই।"

মুখভঙ্গী করিয়া ফণিভূষণ কহিল "সে কথা আমি তোমাকে বলব না,—চাবি দেবে কি না বল?"

শৈল চাবির গোছা মুঠা করিয়া ধরিয়া বলিল "চাবি আমি দোবো না। ঊষা বড হয়েছে, তুমি যতদিন না ঊষার বিবাহের স্থির কর—ততদিন এক টাকা খরচ কত্তে পাবে না। তুমি আমি যা খুসী ক'রে মরতে পারি, কিন্তু ঊষাকে কষ্ট দেবার তোমার কোন অধিকার নেই। তাকে যোগ্য পাত্রে দিয়ে তারপর তুমি আমাকে ভিক্ষার ঝুলি দেও—তাতে আমার আপত্তি নেই। তার আগে এক পয়সা নষ্ট ক'ল্লে তোমার মহা অধর্ম হবে।"

উচ্চ হাস্য করিয়া ফণিভূষণ কহিল "বক্তৃতা রাখ। ঊষার জন্য আমার কোন দায়িত্ব নেই—সে মরে না কেন,—তাব রূপ আছে, সে বাড়ী থেকে—"

দুই হাতে শৈল ফণিভূষণের মুখ চাপিয়া ধবিয়া বলিল, "ওগো সে যে তোমার মেযে!" বলিয়া চাবিব গোছা আঁচল হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ঊষা সব শুনিয়াছিল, সে ঠাকুরের কাছে মাথা খুঁড়িয়া বলিল, "ঠাকুর, তাই কেন হয় না, আমি মরি না কেন? দাদা মশাই অনেক দিন তুমি গিয়েছো, আজ আমাকে তোমার কাছে ডেকে নাও!"

শৈল সমস্ত রাত্রি মেজেতে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল এবং খোলা জানালার ভিতর দিযা ফণিভূষণের বিকৃত গানের আওযাজ বাববার লাঞ্ছনার মত তাহাকে ঘেরিতে লাগিল।

দীনের প্রার্থনা ভগবান শোনেন; সেইরাত্রে ঊষা জ্বরে পড়িল। তাহার পর দু'দিন সে কাহাকেও কিছু বলে নাই, সহজেরই মত ছিল। তৃতীয় দিন যখন জ্বর ধরা পড়িল, তখন তাহার প্রায় সংজ্ঞা লোপ পাইতেছিল।

এমনি করিয়া দশ দিন কাটিল। ডাক্তার বৈদ্যের কোন সংস্পর্শই ছিল না, এমন কি ফনিভূষণ পর্যন্ত একবার দেখিতে আসে নাই। শৈল সমস্ত দিনরাত্রি শিযরে বসিয়া থাকিত।

হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা ঊষা উঠিয়া বসিল।

"কাকিমা!"

"কেন মা?"

"একবার সেটা দেও।"

দাদামশায়ের ও পিতার স্মৃতিমণ্ডিত সেই কুন্তলীনের শিশিটিকে এত দিন সে সযত্নে

রাখিয়াছিল, শোকে যখন অন্তর ভাঙ্গিয়া যাইত ; তখন সে এই ক্ষুদ্র স্নেহের দানটিকে বুকে করিয়া অপূর্ব শান্তি পাইত। অসুখের সময় সে কতবার এমনি করিয়া শিশিটিকে চাহিয়া লইয়াছে।

শৈল শিশিটি তাহার হাতে দিল।

ঊষা শুইয়া পড়িল—হঠাৎ শৈলর পানে চাহিয়া বলিল "কাকিমা, বাবা এসেছেন।"

শৈল বলিল, "না মা, তুমি ঘুমোও।"

ঊষা হাসিয়া উঠিল "ঐ দাদামশাই।"

শৈল হাত জোড় করিয়া বলিল "ঠাকুর, একি হ'ল !"

"কাকিমা, একবার কাকাকে দেখব ! তিনি কি একবার আসবেন ন।"

শৈল ঊষার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল "নিশ্চয় আসবেন, আমি ডেকে আনচি, তুমি চুপ্ ক'রে শোও মা।"

সে দিন ফণিভূষণ তাহার সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণের ব্যবহারে অপমানদগ্ধ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। সে যাহাদের প্রত্যয় করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল, তাহারাই আজ এমনি করিল ! অপমানের ধিক্কারে তাহার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং পূর্বাপর তাহার জীবনের কাহিনী সন্ধ্যার অন্ধকারে বারম্বার আলোচনা করিয়া অনুশোচনায় নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

এমন সময় শৈল তাহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "আজ আমার একটি কথা রাখতে হবে।"

চোখের জল মুছিয়া ফণিভূষণ শৈলব হাত ধরিয়া উঠাইয়া কহিল, "রাখব, কি বল।"

শৈল ব্যগ্রভাবে তাহার দুই হাত ধরিয়া কহিল, "তবে এসো, দেরী ক'রো না, ঊষা বুঝি আর বাঁচে না।"

সহসা ফণিভূষণের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল "ঊষা বাঁচে না শৈল ! সে কথা এতদিন আমাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেওনি কেন ? ঊষা না বাঁচলে কাকে নিয়ে আমরা থাকব, কে নিয়ত দুঃখের মধ্যে শান্তি দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে ?"

রোগীর শয্যাপার্শ্বে গিযা ফণি ও শৈল বসিল। অনেকবার ঊষাকে ডাকিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ততবারই চোখের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল,—কণ্ঠস্বর বাহির হইল না।

শৈল ও ফণিভূষণ বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল—আজ এই মুমূর্ষুর দুর্বল হস্ত তাহাদের মধ্যে অনাবিল প্রেমের যে নিবিড় বন্ধন সৃজন করিয়া দিয়া আপনার স্থানটুকু শূন্য করিয়া দিতে যাইতেছে, তাহারই বেদনা দু'জনকে মুহুর্মুহু নিপীড়িত করিতে লাগিল।

ভাঙ্গা গলায় ফণিভূষণ ডাকিল "ঊষা—"

চ'কিতে একবার ঊষা চোখ চাহিল—"কাকা"—তাহার পর কাহার যেন প্রসারিত বাহুর মধ্যে আপনাকে ন্যস্ত করিয়া ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল।

তখন ফণিভূষণ উন্মাদের মত তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিতে লাগিল "ঊষা ! ঊষা—তোর কাকা আজ তোকে ডাকতে এসেছে—ফিরে আয় মা. ফিরে আয়।"

মৃতের মুখে মহানন্দের অপূর্ব মঙ্গল-জ্যোতি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল !

ভূপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বহ্বারম্ভ

১

আমার নাম সুকুমারী দেবী—বয়স ১৮ বৎসর। শুনিয়াছি আমি বিবাহিতা। স্বামীর কথা আমার মনে নাই। ৭ বৎসর বয়সের সময় পিতা আমায় গৌরীদান করিয়াছিলেন। সে আজ ১১ বৎসরের কথা। বাল্যেব কথা সব মনে নাই। অল্প অল্প মনে পড়ে। একবার মা ও বাবার সহিত কাশী যাই; সেইখানেই একদিন বেনারসী চেলী পরিয়া, গহনা গায়ে দিয়া, কাহারও সহিত অর্দ্ধ নিদ্রিত অবস্থায় আমার বিবাহ হইয়া যায়। তখন বোধ হয় গ্রীষ্মকাল ছিল; কারণ মনে পড়ে একছড়া খুব মোটা যুঁই ফুলের গোড়ের মালা জরির থোপ দেওয়া লাল রাংতা মোড়া আমায় পরাইয়া দিয়াছিল।

তারপর মা স্বর্গে চলিয়া গেলেন। সংসারে বাবা আর আমি। বড় হইয়া শুনিয়াছি আমাব স্বামী নাকি বিবাহ করিতে রাজি ছিলেন না। তিনি নাকি খুব বেশী পণ্ডিত ও ভারী ধার্মিক। বাবার একান্ত জেদে বিবাহে রাজি হইয়াছিলেন। সর্ত ছিল যে তিনি আমায় স্বেচ্ছায় গ্রহণ না করিলে পিতা সে জন্য জোর করিতে পারিবেন না। সই বলে তাঁহার এই সৃষ্টি বহির্ভূত প্রস্তাবে বাবা সহজেই বাজি হইয়াছিলেন। কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাঁহার কন্যাব রূপেই জামাতা মুগ্ধ হইয়া যাইবেন। এই বার বৎসরের অভিজ্ঞতায় তাঁহাব সে ভুল সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

স্বামী আমায় গ্রহণ করা দূরে থাক, একদিনের জন্যও মুখ দর্শন করিলেন না। ৭/৮ বৎসর বাবা আর তাঁহার কোন সংবাদই পান না। তিনি গৃহ ছাড়িয়া দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন, শুনিয়াছি সংসারে তাঁহার আপনার কেহই ছিল না। আমার ভাবনায় বাবাকে সময় সময় বড়ই উন্মনা দেখিতাম। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, স্বামীর জন্য আমাব মনে কোনও দুঃখ ছিল না; সংসারেব কাজ কর্ম করি, বাবাব পূজার আয়োজন করিয়া দেই। মধ্যাহ্নে অবসর কালে তাঁহার নিকট সংস্কৃত, সাহিত্য কাব্য পাঠ করি, আব সন্ধ্যাব সময় তাঁহার স্নেহপূর্ণ উপদেশ—ধর্মকথা শ্রবণ করি। স্বামী বর্তমান—মাছ ভাত খাই, আর সময় সময় সুবাসিত কুন্তলীন দিয়া কেশ রচনাও করি। আর সই আসিলে বহস্যালাপও করিয়া থাকি—আমার দুঃখ কি?

সই বলে আমার স্বামী নিশ্চিত বৃদ্ধ, নচেৎ এত ধার্মিক কেন? হইলেনই বা বৃদ্ধ—বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয়ের তৃতীয় পক্ষীয় বালিকা পত্নীও ত তাহার বৃদ্ধ স্বামীর সেবা করিয়া থাকে; বাবার নিকট শুনিয়াছি স্বামী বৃদ্ধ, অন্ধ, খঞ্জ বা কুরূপ যাহাই কেন হউক না তিনি চিরদিনই ভক্তির পাত্র। আমি শিবপূজা করিয়া উদ্দেশে স্বামীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেই। তবে অন্ধের সূর্য দর্শনের ন্যায় স্বামীর মূর্তি মনে করিতে গেলে শুধু অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। এ ছাড়া স্বামী চিন্তার আমার অবসর ছিল না। সই আজকাল আর আসিতে সময় পায় না তাহার স্বামী আসিয়াছেন। আমার সময় যথেষ্ট; প্রতিবাসীদের রোগীর সেবা করিয়া কার্যের সহায়তা করিয়া তাহাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কিছু কিছু শিক্ষাদান করিয়াও আমার সময় থাকে সেটা প্রায় মুগ্ধবোধ বা **পাণিনি** সূত্র অন্বেষণে কাটাইতে হয়। তাই বলিতেছিলাম আমার অভাব কি।

একদিন প্রাতঃকালে স্নানান্তে পূজায় বসিতেছি, সহসা অসময়ে বাবাকে আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। বাবা বলিলেন, "সুকু এ বৎসর প্রয়াগে কুম্ভমেলা, মনে করিয়াছি এই সময়

তীর্থভ্রমণে যাইব। তোমাব বোধ হয কিছুদিন ইন্দুদেব (ইন্দু আমাব সই) বাড়ী থাকিতে কষ্ট হইবে না। আমি বলিলাম, "না বাবা, তা হবে না, আমায় সঙ্গে নিতে হবে। এত বড **পুণ্যটাতে** আমায বঞ্চিত কবিবেন না।" পিতা প্রথমে আপত্তি কবিযাছিলেন। অবশেষে আমাব অশ্রুজলেব জয হইল। আনন্দে সে বাত্রে নিদ্রা আসিল না।

২

পুবাণবর্ণিত লোকবিখ্যাত বিশ্বেশ্বব-অন্নপূর্ণাব বাসস্থান সর্বতীর্থময়ী **পুণ্যভূমি** এই সেই কাশী। আনন্দপূর্ণ দিনগুলি যেন স্বপ্নেব মত কাটিযা যাইতে লাগিল। মন্দিবে মন্দিবে দেবদর্শন কবি ও পূজা কবি। বন্ধনমুক্তা কুবঙ্গিনীব মত স্বাধীনতাপূর্ণ হৃদযে বাবাব সহিত পদব্রজে ঘুবিযা বেড়াই এবং সন্ধ্যাব সময যুক্তকবে ভক্তিপূর্ণ হৃদযে বিশ্ববাজেব আবতি দর্শন কবি। কি সুখ, কি শান্তি! এখানে আসিযা নূতন কবিযা স্বামীব কথা মনে পড়িযাছিল। এখন যেন অনেকটা বুঝিতে পাবি কি মহাআকর্ষণে, কি মধুব প্রলোভনে তাঁহাব চিত্ত আকৃষ্ট।

প্রযাগে কুম্ভ মেলায স্নান কবিযা আমবা আগ্রা জযপুব হইযা আজমীবে উপস্থিত হইলাম। আগ্রায তাজমহল দেখিলাম। ভালবাসাব এত বড সাক্ষী আব নাই। সাজাহানেব এই অনন্ত প্রেমেব স্মৃতিচিহ্ন বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে চাহিযা দেখিলাম। আজমীবে বাবাব এক সম্পর্কীযা ভগিনী থাকিতেন। আমবা পিসিমাব বাড়ীতেই উঠিলাম। আমি পিসিমাকে এই প্রথম দেখিলাম। আমাদিগকে দেখিযা পিসিমা অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ কবিলেন। পিসিমাব কন্যা কনকমঞ্জবীব সহিত আলাপ হইল। কনক প্রায আমাবই সমবযস্কা। আমায পিসিমাব নিকট বাখিযা বাবা সেতুবন্ধন বামেশ্বব যাত্রা কবিলেন। কথা বহিল পিসিমা আমায পুষ্কবতীর্থে সাবিত্রী দর্শন কবাইযা আনিবেন।

কযেকদিন ঘুবিযা ঘুবিযা আমিও শ্রান্ত হইযাছিলাম। বিশেষত পুরুষগুলাব ব্যবহাবে। তাহাদিগকে দেখিলে মনে হয যেন তাহাবা জীবনে কখনও স্ত্রীলোক দেখে নাই। বাস্তায বাহিব হইলেই সকলে হাঁ কবিযা চাহিযা থাকে, বোধহয গাড়ীচাপা পড়িবাব জ্ঞানও থাকে না। বুঝিতাম আমায লইযা বাবা বড়ই বিব্রত হইযা পড়িতেছেন।

কনকেব সহিত শীঘ্রই আমাব বন্ধুত্ব স্থাপন হইল। তাহাব স্বামী কানপুবে ডাক্তাবি কবেন। কনকেব অধিকাংশ কথাই স্বামীব সম্বন্ধে, স্বামীব বিষযে আমাব কোন অভিজ্ঞতা নাই জানিযা সে এক প্রকাব স্তম্ভিতভাবে চাহিযা বহিল, যেন এত বড আশ্চর্য ঘটনা আব হইতে পাবে না। তাহাব ভাব দেখিযা হাস্য সম্ববণ কবা আমাব পক্ষে কঠিন হইযা উঠিযাছিল।

একদিন শুনিলাম পিসিমাব এক দেববেব পুত্র আসিবেন। কনক বলিল, তিনি অল্প বযসে প্রভূত বিদ্যালাভ কবিযা সন্ন্যাসী হইযাছেন। দিবসেব অধিকাংশ কাল পূজার্চনায অতিবাহিত কবেন। তাঁহাব আপনাব কেহই নাই। পব দিন তিনি আসিলেন। শুনিযাছিলাম সন্ন্যাসী, তাই কৌতূহলাক্রান্ত হইযা দেখিতে গেলাম। যাহা দেখিলাম তাহা স্বপ্নেব অতীত। মনুষ্যেব যে এত রূপ হইতে পাবে তাহা পূর্বে আমাব জ্ঞান ছিল না। অতি সুন্দব সৌম্যদর্শন যুবাপুরুষ, সন্ন্যাসীব লক্ষণ বাঘছাল বা ত্রিশূল বিভূতি কিছুই দেখিলাম না। তিনিও মুহূর্ত মাত্র আমাব দিকে চাহিযা মুখ ফিবাইযা লইলেন। শুনিতে পাইলাম অস্পষ্টস্ববে পিসিমাকে বলিলেন, "এ মেযেটি,' তিনিও সেইরূপ স্ববে উত্তব দিলেন "পবে শুনিবে।" লজ্জিত হইযা

৩

দিনের পব দিন কাটিয়া যায়, নিয়মিত পূজার আয়োজন করি, পিসিমার রন্ধনের সাহায্য করি। কনকের নিকট তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করি আর সন্ধ্যার সময় তাঁহাব মুখে ভগবদ্‌গীতা শ্রবণ করি। সকাল হইতে প্রতি মুহূর্তে সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকি, দিন রাত্রে মধ্যে সেই সময়টুকুই আমার নিকট পরম লোভনীয় বলিয়া মনে হইল। তাঁহার স্বর কি মিষ্ট! পাঠ করিবেন কি, ভক্তিতে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিত, চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িত। আমিও অঞ্চলে চক্ষু মুছিতাম, কি বুঝিতাম জানি না। কানে শুনিতাম শুধু সেই মধুর স্বর : কনককে সম্মুখে রাখিয়া আমি দ্বারের অন্তরালে বসিতাম ; তিনি আমায় দেখিতে পাইতেন না, আমি তাঁহাকে দেখিতাম।

আর কিছুই ভাল লাগে না। কার্যে উৎসাহ নাই, হৃদয় অবসাদপূর্ণ, আমার জীবনের প্রধান সুখ পুস্তকপাঠ তাহাও ভুলিয়া গিয়াছি। কিছুতেই যেন শান্তি পাই না, যেন কি হারাইয়া গিয়াছে। আর যাহা ভাল লাগে তাহা আমার পক্ষে অনুচিত। ভাল লাগে তাঁহার পূজার আয়োজন করিতে ; তাঁহার সুমিষ্ট স্বর শুনিতে, আর দূর হইতে তাঁহার অপূর্ব কান্তি দর্শন করিতে।

পিতার মুখে শুনিয়াছি পর পুরুষের চিন্তা, পরপুরুষের দর্শনেচ্ছা স্ত্রীলোকের পক্ষে মহাপাপ। আমি কি মহাপাপিনী হইলাম? আমার একমাত্র আশ্রয়, একাধারে পিতা মাতা বন্ধু সংসারের সার পিতা—এ অসময়ে তিনিও আমায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, গভীব রাত্রে ভূমিলুণ্ঠিত মস্তকে যুক্ত করে উর্দ্ধস্বরে দর বিগলিত ধারায় ডাকিলাম, "কোথায় তুমি দীনবন্ধু! আমায় রক্ষা কর। যদি পাপেব পথে গিয়া থাকি আমার দুর্বল হৃদয়ে বল দাও, আমায় উদ্ধার কর। চক্ষু মুদিয়াও দেখি সেই সৌম্যকান্তি, সেই সদাই স্নেহময় উদার উন্নত দৃষ্টি! তাহা কি ভুলিবার? যেন তাহা চিরদিনের—চির জীবনের—জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি ; আমি কি পাগল হইব?

৪

চেষ্টা করিয়া তাঁহা হইতে দূরে থাকি। সন্ধ্যার সময় কনক ডাকিলে শিরঃপীড়ার ভান করিয়া শয়ন করি। দৈবাৎ তাঁহার সহিত দেখা হইলে নতমুখে সাবধানে চলিয়া আসি। সরলা কনক আমার পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছিল। সে ভাবিত যথার্থই আমার অসুখ। হায় অবশেষে আমি প্রতারণা করিতেও শিখিলাম। আমার অধঃপাতের আর বাকী কি? একদিন সন্ধ্যার সময় শয়ন করিয়া আপনার অদৃষ্ট চিন্তা করিতেছি। কনক আসিয়া বলিল, "সুকুমারী দেখ এটা কি? তুমি দিন কতক এটা মাথায় দাও তাহা হইলে তোমার মাথার অসুখ সেরে যাবে, একথা নিশ্চয় বলিতে পারি।" টেবিলের উপর উজ্জ্বল কেরোসিন জ্বলিতে ছিল। চাহিয়া দেখিলাম, কুন্তলীন। কনক শিশিটা আমার হাতে দিয়া বলিল "এটা রাখ্‌ দাদা তোমার জন্য এনেচেন, আজ একটা স্বদেশী মিটিং ছিল কিনা তাই আমাদের কিছু স্বদেশী জিনিস উপহার দিতে ইচ্ছে হলো বলে কিনে এনেছেন। আমায় এক শিশি দেলখোস্‌ আর এক শিশি বকুল দিয়েছেন। কাল আমাদের সাবিত্রী দর্শন করাতে নিয়ে যাবেন।" শিশিটার

গায়ে অতি সুন্দর সংস্কৃত অক্ষরে লেখা ছিল, "সুকুমারী দেবীকে প্রীতি উপহার ।" সহসা আহত হৃদয়ে আমি শিশিটা কনকের হাতে ফিরাইয়া দিলাম । হায় তাঁহার উপহার গ্রহণের কি যোগ্য আমি ? বলিলাম, "কনক ওতে আমার প্রয়োজন নাই তোমার ইচ্ছা হয় তুমি নিজে রাখিতে পার ।" কনক বিস্মিতভাবে কহিল, "সে কি ভাই ; রাখু দাদা তোমার জন্য এনেছিলেন তুমি নেবে না ? এ বড় অন্যায় হবে, আর তিনিও তাহা হইলে দুঃখিত হবেন ।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "তিনি সন্ন্যাসী, তাঁর সুখ-দুঃখ নাই ।" "না ভাই, তামাসায় আমার ওসব জিনিসের দরকার নাই ।" কনক বোধ হয় বিরক্ত হইয়াছিল, সে আর কিছুই বলিল না ।

৫

পরদিন প্রাতঃকালে অন্ধকার থাকিতেই আমরা সাবিত্রী দর্শন করিতে গেলাম । একখানা ঠিকা গাড়ী ভাড়া হইল । কনক আমি পিসিমা আর তিনি । আপত্তির উপায় কি ? নিঃশব্দে তাঁহাদের সহিত চলিলাম । খানিক রোদ উঠিতে তিনি গাড়ীর খড়খড়ি নামাইয়া দিলেন । পর্বত গাত্রে আঁকিয়া-বাঁকিয়া সরু পথ, নিম্নে গভীর খাদ, দৈবাৎ ঘোড়ার পদস্খলন হইলে একবারে পর্বত হইতে নিম্নে পতিত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা । পুষ্কর তীর্থে স্নান দান করিয়া আমরা দেবী দর্শনের জন্য পর্বতে আরোহণ করিলাম । পর্বতের উপর মন্দির । মন্দিরে শ্বেত প্রস্তরের দেবী প্রতিমা অতি সুন্দর মূর্তি । দেবীর সহাস্য চক্ষু দেখিলে মনে হয় যেন জীবন্ত প্রতিমা । ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম । মনে মনে বলিলাম, "মা সতীকুল শিরোমণি, দাসীর প্রতি প্রসন্না হও, যেন পথ ভুলিয়া বিপথে না যাই ।" দেবীর পূজা করিয়া মনটা যেন লঘু হইয়া আসিল । আপনাকে অনেকটা সচ্ছন্দ মনে হইল ।
পরদিন. ভোরে উঠিয়া স্নানান্তে পূজার আয়োজন করিয়া পূজায় বসিলাম । ধূপধূনার সহিত রাশিকৃত শেফালি ফুলের গন্ধ মিশিয়া চারিদিক পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল । পূজা শেষে ভক্তিভরে দেবতার চরণে প্রণাম করিয়া উদ্দেশে স্বামীকে প্রণাম করিলাম । যুক্তকরে বলিলাম, "হে নারীজীবনের একমাত্র দেবতা ! যদি দাসী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলে তবে একবার দর্শন দিয়া এ শূন্য মনোমন্দিরে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়া যাও, ইহার অধিক কামনা নাই ।" প্রণাম করিয়া মাথা তুলিতেই মনে হইল দ্বারের উপর কাহার ছায়া পড়িয়াছে, এ অসময়ে এখানে কে আসিল ? চাহিয়া দেখিতেই বিস্মিত স্তম্ভিত হইলাম । দেখিলাম তিনি নিঃশব্দে দ্বারের উপর কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন । চাহিতেই চারিচক্ষে মিলন হইয়া গেল । অতি মধুর স্নেহপূরিত দৃষ্টিতে তিনি চাহিয়াছিলেন । সে দৃষ্টির নীচে আমি মস্তক নত করিলাম । বলিতে গেলাম, আপনি পথ ছাড়ুন আমি চলিয়া যাই, কিন্তু রুদ্ধকণ্ঠ হইতে স্বর বাহির হইল না । তিনি বলিলেন, "অসময়ে আসিয়াছি বলিয়া বিরক্ত হইও না, আমার স্নেহের উপহার ফিরাইয়া দিয়াছ কেন ?"
আমি নতমুখে কম্পিতকণ্ঠে কহিলাম, "বাবাকে না জানাইয়া কাহারও দান গ্রহণ করিবার আমার অধিকার নাই । বিশেষত আমি সন্ন্যাসিনী ওসব জিনিসে আমার প্রয়োজন কি ? আপনি সরিয়া দাঁড়ান আমি চলিয়া যাই ।" তিনি সরিলেন না বরং আর একটু অগ্রসর হইয়া আসিলেন, আমার দেহে তাঁহার নিশ্বাস স্পর্শ অনুভব করিলাম । তিনি বলিলেন, "কেন প্রয়োজন নাই ? সুগন্ধে দেবতা প্রীত হন ; তবে তুমি কেন হইবে না ? আমার স্নেহের আমার ভালবাসার স্মৃতিচিহ্ন গ্রহণ করিয়া আমায় কৃতার্থ করিবে না কেন ? সুকু-সুকু (এ

প্রিয় সম্বোধনে বাবাই কেবল ডাকিতেন) আমায় ক্ষমা কর— তোমায় দেখিয়া পর্যন্ত হৃদয়ের সহিত সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি, তবু তোমায় ভুলিতে পারি নাই ; শুনিয়াছি তুমি বিবাহিতা হইয়াও কুমারী, তবে আমায় ভালবাসিবে না কেন ?" হায় হায়, আমার কপালে এত ছিল। বাণবিদ্ধা কুরঙ্গিনীর ন্যায় অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া দুই হস্তে মুখ চাপিয়া আর্তস্বরে বলিয়া উঠিলাম, "ক্ষমা করুন ওসব কথা বলিবেন না ; আমি আপনাকে ধার্মিক জানিয়া বিশ্বাস করিয়াছি, দেবতা বলিয়া পূজা করিয়াছি, আর কিছু নয়, তার বেশী আর কিছু নয়।" সহসা অগ্রসর হইয়া তিনি আমার হস্তধারণ করিলেন। বলিলেন, "সুকু যদি বিশ্বাস করিয়াছিলে, তবে অবিশ্বাস করিও না। আমি তোমায় যথার্থই ভালবাসিয়াছি, তোমার জন্য এত দিনের সাধনা চিরদিনের সংকল্প ত্যাগ করিয়াছি।"

সহসা অগ্নি স্পর্শ করিলে যেমন সেই স্থানটা দগ্ধ হইয়া যায়, তাঁহার স্পর্শে সেইরূপ যন্ত্রণা অনুভব করিলাম। আমার পাপের ইহাই কি যথেষ্ট দণ্ড নয় ? সবলে হস্ত মুক্ত করিতে চাহিলাম পারিলাম না। ক্রোধে, দুঃখে, ক্ষোভে, কাঁদিয়া ফেলিলাম, বলিলাম, "আপনি দেবতার আকারে পিশাচ, ধার্মিকের আবরণে মহাপাপিষ্ঠ, তাই অনাথা পাইয়া এইরূপ অশ্রাব্য কথা বলিতে সাহসী হইয়াছেন, ভগবান আপনার বিচার করিবেন।" তিনি হাত ছাড়িয়া দিয়া সহসা হাসিয়া উঠিলেন বলিলেন, "সুকু ! অভিশাপ করিও না, আমি দেবতাই হই আর পিশাচই হই তোমার স্বামী ; তুমি পূজা শেষে আমায় ডাকিয়াছিলে এখন গালি দাও কেন ? বিশ্বাস না হয়—পিসিমাকে জিজ্ঞাসা কর। ছিঃ, স্ত্রী হইয়া আপনার স্বামীকে চিন না।"

এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস ! এ কি বিশ্বাসযোগ্য, আমি উঁহার স্ত্রী উঁনি আমার স্বামী ? ভগবান আমায় রক্ষা কর, যেন প্রলোভনে মুগ্ধ না হই। সহসা বাহিরে পিসিমার স্বর শুনিলাম, তিনি বলিতেছিলেন, "সুকুমারী রাখালকে দেখে ভয় পেয়েছ তা তোমারই বা দোষ দেব কি, তুমি ত জ্ঞান হইয়া কখনও দেখ নাই স্বামী বলিয়া চিনবে বা কেমন করে ? রাখু যে আমায় দিব্যি দিয়ে কারুকে জানাতে মানা করেছিল। বলে আমি আগে নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিব। তা এখন হল ত ? রাখুর যে ভারি দেমাক, এখন দর্পচূর্ণ হল ত ?

বাজহত বেতসপত্রের মত আমার সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছিল, আমি পড়িয়া যাইতেছিলাম ; পিসিমা আসিয়া আমায় ধরিলেন। বাবা আসিয়া সমস্ত শুনিলেন, আহ্লাদে তাঁহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। আমিও কাঁদিতেছিলাম। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার জীবনের মহা পরীক্ষায় আমি জয়ী হইয়াছি।

ইন্দিরা দেবী

পলায়ন

১

আমাদের পরিণয়ের পর প্রায় পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সময় যেন সমুদ্রের স্রোতের মত অবিশ্রান্ত দ্রুতবেগে চলিতেছে। আমাদের প্রথম মিলন,—সে তো সেদিনের কথা। কিন্তু ইহারই মধ্যে এতগুলা দিন যে কখন চলিয়া গিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাই নাই। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমি তাঁহার নিকট হইতে ভালবাসা—অপরিসীম

ভালবাসা ভিন্ন আর কিছুই পাই নাই। আর আমি ? উন্মেষিত যৌবনা, আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়খানির মধ্যে তাঁহার জন্য কতখানি আসন ছিল তাহা অন্তর্যামীই জানেন। তাঁহাকে পাইয়া অবধি অনাথিনী আমি শৈশবের অনাদর, উপেক্ষা, দুঃখ, কষ্ট সবই ভুলিয়া গিয়াছি। যে জীবনকে আগে দুঃখপূর্ণ ভাবিয়া অশ্রুজলে নয়ন সিক্ত করিয়াছি, আজ সেই জীবন মধুময় বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।

তিনি যখন অধ্যয়নের জন্য প্রবাসে থাকিতেন, নিয়মিতরূপে একদিন অন্তর একখানি করিয়া পত্র লিখিতেন। চিঠিগুলি পুনঃ পুনঃ পড়িয়াও আমার তৃপ্তি হইত না। সেগুলি কত ভালবাসা কত অভিমান কত প্রেম কত উপদেশপূর্ণ। তাঁহার ভাবনা যখন বিরহক্লিষ্ট হৃদয়কে অত্যন্ত আকুল করিয়া তুলিত, আমি আমার সেই প্রিয় সঙ্গীগুলিকে বক্ষে চাপিয়া ধরিতাম। এক স্নিগ্ধ হর্ষে আমার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া উঠিত। কিন্তু আমার এত সুখ বিধাতার সহিবে কেন ? একখণ্ড কালো মেঘ আসিয়া আমাদের সুখের নির্মল আকাশ, অন্ধকার করিযা দিল।

২

একদিন দিবাবসানে সমস্ত গৃহকর্মের পর পরিশ্রান্ত হইয়া, গা ধুইয়া কাপড় শুকাইতে দিবার জন্য ছাদে উঠিতেছি, এমন সময়ে সিঁড়ির পাশের ঘরে হঠাৎ আমার নাম উচ্চারিত হওয়াতে থমকিয়া দাঁড়াইলাম। কান পাতিয়া শুনিলাম, মা বলিতেছেন, "আর কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখ্‌লে হয় না ?"

শ্বশুর ঠাকুব বলিলেন, "আর কত দিন দেখ্‌বে ? শুধু শুধু দেরী করা বইতো নয়। আমাদের একটি মাত্র ছেলে। বংশে একবিন্দু জল দেবার আর কেউ থাক্‌বে না।"

"তোমার যা ভাল বিবেচনা হয় করো। আহা বৌমা আমার ভারি লক্ষ্মী মেয়ে। সতীশের কি মত হবে ?"

"তার আবার মতামত কি ? আমি যতদিন বেঁচে, আমি যা বোলবো তাই হয়ে আসছে ও তাই হবে—" আমি দাঁড়াইতে পারিলাম না। চারিদিক যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। দারুণ বেদনা অনুভব করিয়া, দুই হাতে মাথা টিপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িলাম। অন্তরের রোদনধ্বনি যদি বাহির হইতে শুনিতে পাওয়া যাইত, তবে সেইদিন প্রদোষে আমার করুন চিৎকারে গগন ও পবন প্রতিধ্বনিত হইত।

সেই রাত্রে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আমি এখন মরে গেলে তুমি আবার বিয়ে কর্বে ?" তাঁহার চিবপ্রফুল্ল সুন্দর মুখখানি মেঘের মত অন্ধকার হইল, কিন্তু আমি তাহাতে গভীর প্রেমের চিহ্ন, স্পষ্ট অঙ্কিত দেখিতে পাইলাম। তিনি আমাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিয়া বলিলেন "ছিঃ ও কথা বোলতে নেই। আজ হঠাৎ ও কথা জিজ্ঞেস কোরছো কেন রমা ?" মুহূর্তের মধ্যে আমি সমস্ত বিস্মৃত হইলাম। প্রেমার্দ্র চক্ষু দিয়া দু ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। অলক্ষিতে তাহা মুছিয়া ফেলিলাম। ছিঃ এই স্বামীকে অবিশ্বাস।

আমি সন্তানহীনা। কিন্তু সে জন্য আর সকলেব এত মাথা ব্যাথা কেন ? বিবাহের পর প্রায় পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে ; কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আমাদের মনে একদিনের জন্যও ত কোন অভাব বা অসুখের সৃষ্টি হয় নাই। আমাদের জন্য পৃথিবীর লোকের এত ভাবনা কেন ? কেন—আমি কি দোষ করিয়াছি ? নিঃসন্তান হইয়াছি বলিয়া কি একটি অসহায় বালিকাকে তাহার জীবনের দেবতা, হৃদয়ের স্বামী, একমাত্র সাধনার ধন হইতে

বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার সর্বনাশ সাধন করিতে হইবে ? এতদিন এই সব নীরবে সহ্য করা ভিন্ন আমার আর উপায়ান্তর কি ছিল ? কিন্তু যে বিপদ স্বপ্নের অগোচর—কল্পনারও বহির্ভূত ছিল ; আজ তাহাই শুনিলাম। অশ্রু জলে বক্ষ প্লাবিত হইয়া গেল। বক্ষের মধ্যে দারুণ ব্যথা অনুভব করিলাম। এতদিনের নিরবচ্ছিন্ন সুখেব বুঝি এইখানেই অবসান।

এক অজানিত শঙ্কায় আমি অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। কি অপরাধ আমার ?—কি অপবাধে ঈশ্বর আমাকে এত দুঃখিনী করিবেন ! হে দয়াময় যদি নারীজন্ম দিয়া পাঠাইলে, তবে মাতৃপদ দিলে না কেন ? একটি প্রাণীর আবির্ভাবে যদি সংসারের এত নির্যাতন এত অশান্তি, সব ঘুচিয়া যায় তবে তাহাতে এত কুণ্ঠিত কেন প্রভু ! সন্তানের মাতা হইতে দাও নাই বলিয়া কি জীবনের প্রারম্ভেই যৌবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইযা ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে ?

যখনই অমঙ্গল আশঙ্কা করিতাম, স্বামীর প্রেমোজ্জ্বল মূর্তি মনের মধ্যে উদিত হইয়া আমাব সব কল্পিত ভয় বিদূরিত করিয়া সমস্ত হৃদয়খানিকে উদ্ভাসিত করিয়া দিত। তাঁহাব অপবিমিত ভালবাসা, অতুলনীয় আদর, অযাচিত করুণা একে একে সমস্তই মনে হইত। লজ্জায় নিজেকে ধিক্কার দিতাম। আমার হৃদয় আবার নবীন ও উজ্জ্বল হইযা উঠিত, তাঁহার দেবচরিত্রেব প্রতি মিথ্যা সন্দেহ করিয়াছি বলিয়া অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা কবিতাম। এত ভাগ্যবতী যে, সে আবাব দুঃখিনী ?

এই সকল নির্যাতনেব মধ্যে স্বামীর চিঠিই আমাব একমাত্র সম্বল ও সান্ত্বনাদাত্রী ছিল। তাঁহার উচ্ছ্বসিত আবেগপূর্ণ পত্র পড়িতে পড়িতে আমি আত্মবিস্মৃত হইতাম। আমাব দুঃখ, কষ্ট, সব আনন্দে পরিণত হইত।

৩

এই ভাবে কিছুদিন কাটিয়া গেলে, একদিন শুনিলাম আমাকে শীঘ্রই পিত্রালয়ে পাঠান হইবে। ইহাব কাবণ জানিতে আমার বেশী দেরী হইল না। একদিন লুকাইয়া শুনিলাম যে শ্বশুর ঠাকুব গোপনে পুত্রের বিবাহ ঠিক করিয়াছেন, তাই আমাকে বিদায় দিবার আয়োজন। পরিণয়েব আব বেশী দেরী নাই ; স্বামী গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী আসিলেই হইবে।

আমি চক্ষেব জল মুছিয়া, নিত্য গৃহকর্ম অবসানের পর রাত্রে নিজ কক্ষে দ্বার রুদ্ধ কবিযা, স্বামীব সমস্ত চিঠি পড়িতে বসিলাম। হাতবাক্স খুলিতেই তলাব এক কোনে রক্ষিত দেলখোসেব শিশিটি চক্ষে পড়িল, হাতে লইয়া দেখিলাম পাত্র সংলগ্ন কাগজে তাঁহাব হস্তাক্ষবে লেখা 'শ্রীমতী রমা' প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে ফুলশয্যাব রাত্রিতে তিনি উহা অভাগিনীকে উপহার দিয়াছিলেন। সেই মধুর রাত্রির ছবি আমাব চক্ষের সম্মুখে উদিত হইল। কথা বলাইবার জন্য সেই সাধা-সাধি,—সেই আদর সেই স্নেহস্পর্শ, সব মনে পড়িল হৃদয়েব গুরুভার কমাইবার জন্য শূন্য মেঝের উপর পড়িয়া কাঁদিলাম। বহুযত্নে রক্ষিত ভাবাভিব্যঞ্জিকা তাঁহার সমস্ত চিঠিগুলি একে একে পড়িলাম। এতবার পড়িয়াছি কিন্তু তবু তেমনি নূতন, তেমনি উদ্দীপক। তাহার প্রদত্ত অ্যালবাম খানি বাহিব করিয়া, তাঁহার ছবি দেখিতে লাগিলাম—তাঁহাকে পাইয়া এখনও যে আমাব তৃপ্তি হয় নাই। আজ আমাদের বিবাহিত জীবনের সমস্ত ঘটনাই একে একে স্মরণপথে উদিত হইতে লাগিল। দুঃখের সময় অতীত সুখের স্মৃতি সর্বাপেক্ষা কষ্টদায়ক। আমাদের মান, অভিমান, মন জানাজানি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলহ, স্নেহালিঙ্গন সবই মনে পড়িল। একবার আমার খুব জ্বর হইয়াছিল আমি যন্ত্রণায়

অধীর হইয়া ছটফট করিতেছিলাম। তিনি আমার সমুদয় নিষেধবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া, সমস্ত রাত্রি আমার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার শীতল হস্ত আমার উত্তপ্ত কপোলে বুলাইতে বুলাইতে কত আগ্রহের সহিত বেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পীড়ার নিবৃত্তি পর্যন্ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্বক আমার শিয়রে বসিয়া থাকিতেন। আর একবারের কথা আমার বেশ মনে আছে। রাত্রে শয়ন কক্ষে আসিয়া আমি প্রত্যহ বালা দুগাছি খুলিয়া বালিসের নীচে রাখিয়া দিতাম। একদিন হঠাৎ জাগিয়া দেখি জানালার মধ্য দিয়া তরুণ অরুণের আলো প্রবেশ করিতেছে। বেলা হইয়াছে দেখিয়া জিভ কাটিয়া কেমন করিয়া বাহিরে যাইব ভাবিয়া লজ্জায় মরিয়া গেলাম। ক্ষিপ্রহস্তে শিথিলবসন সংযত করিয়া বালা পড়িতে উদ্যত হইলে, তিনি পরাইয়া দিতে চাহিলেন। আমি যথেষ্ট আপত্তি করিলাম, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে পারিবে কে ? তিনি কিছুতেই ছাড়িবেন না। আমিও তাঁহার কাছে সর্বদা হার মানিতেই ভালবাসি। তাড়াতাড়ি বালা পড়াইয়া দিতে আমার হাতে একটু লাগিয়াছিল। তিনি তাহার জন্য কত অপ্রতিভ হইয়াছিলেন, কত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। করুণার আবেগে কত আদর করিয়াছিলেন ক্ষমা প্ারর্থনা করিয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "খুব ব্যথা লেগেছে কি ?"

ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল। আমি তাঁহাকে চিঠি লিখিতে বসিলাম। অশ্রুজলে প্রত্যেক বারেই কাগজ ভিজিয়া গেল। চার পাঁচখানা কাগজ নষ্ট করিবার পর অনেক চেষ্টায় কম্পিত হস্তে লিখিলাম।

শ্রীচরণেষু,

কাল তোমাকে একখানা চিঠি লিখেছি। আজ আবার এ চিঠি দেখে বোধ হয় খুব আশ্চর্য হবে। কিন্তু আজ সকাল বেলা থেকে, কি জানি কেন শুধু তোমার কথাই মনে হচ্ছে। তাই তোমাকে চিঠি না লিখে থাকতে পারলাম না। তোমার জন্য আর কখনো আমার মন এত খারাপ হয়নি তোমাকে দেখবার জন্য আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছি। তুমি লিখেছ, যে গ্রীষ্মের ছুটির জন্য ল'ক্লাস বন্ধ হবার আর দশ বারো দিন বাকি আছে। একদিন আগে কি আস্তে পারো না ? যদি পারো নিশ্চয় এস—এস। বাড়ীর সব ভাল। তোমার আশায় রহিলাম। যদি পার আসবার সময় একখানা প্রিয়ম্বদা দেবীর "রেণু" এনো। আমার প্রণাম নিও।

তোমার রমা।

অবশিষ্ট রাত্রিটুকু চিন্তায় কাটিয়া গেল। পরদিন সকালে আমার অষ্টম বর্ষীয়া ছোট ননদকে ডাকিয়া বলিলাম, "ছোট্ঠাকুরঝি ভাই, আমার একটা কাজ কর্বে ? আজ ইস্কুল যাবার সময় আমার একখানা চিঠি ডাক ঘরে ফেলে দেবে ?"

"এই কাল্ তোমার চিঠি দিয়ে এসেছি। রোজই চিঠি !—এত চিঠিও তুমি লিখ্তে পার ? আর আমি পার্বো না। ছেড়ে দাও, ঐ 'বেলা' ডাকছে" এই বলিয়া বালিকা ছুটিয়া পলাইতে উদ্যত হইল। আমি তাঁহার হাত ধরিয়া আনিয়া চুম্বন করিয়া বলিলাম, "লক্ষ্মী বোন্‌টি আমার, যাবার সময় এই চিঠিখানা নিয়ে যেও। আজ বিকেলে কুন্তলীন দিয়ে বেশ করে তোমার চুল বেঁধে দেবো।" কুন্তলীনের লোভে বীণার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বীণার কচি মুখখানিতে একটা ম্লান সৌন্দর্য ছিল, যার কাছে তীব্র জ্যোতি হার মানিত। সে সৌন্দর্য এমনি চিত্তাকর্ষক যে, যে দেখিত সেই তাহাকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারিত না। সে আনন্দে স্বীকৃতা হইয়া মাথা দোলাইয়া বলিল, "দেবে তো ?" আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলাম। "ওই বইটের ভেতর রেখে দাও, নিয়ে যাবো'খুনি" এই বলিয়া সে অন্তর্হিতা

হইল।

চিঠিখানি পাঠাইয়া দিয়া আমার ভারি লজ্জা করিতে লাগিল। ছি! ছি! তিনি কি মনে করিবেন। হঠাৎ আমার প্রবল আবেগপূর্ণ পত্র পাইয়া এরূপ আকস্মিক ব্যবহারের কোন কারণ নির্দেশ করিতে না পারিয়া, কি ভাবিবেন! ক্ষণিক উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া যা তা লিখিয়াছি। কিন্তু এখন ত আব ফিরাইবার উপায় নাই।

দুই তিন দিবস পরে, আমি গৃহ হইতে আনাজের ডালা হস্তে বাহির হইতেছি, এমন সময় বারান্দায় কাহার পদধ্বনি শ্রুত হইল। শব্দটা যেন খুব পরিচিত। আমার শিরায় শিরায় একটা আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইল এবং বক্ষে স্পন্দন অনুভব করিলাম। পরক্ষণেই একজন আসিয়া শ্বশ্রু ঠাকুরানীকে প্রণাম করিলেন। তিনি পুত্রকে অকস্মাৎ আসিতে দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি, আনন্দিত হইয়া স্নেহ পূর্ণ স্বরে বলিলেন, "কিরে সতু হঠাৎ চলে এলি যে? তোদের কলেজ বন্ধ হবার নাকি আট দশ দিন বাকী আছে?"

"আমাদের বাসার পাশে এক বাড়ীতে প্লেগ হয়েছিল। তাই পালিয়ে এলাম" এই বলিয়া আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন 'ব্যাপার কি'। আমি ঈষৎ হাসিয়া ঘোমটা টানিয়া দিয়া সরিয়া গেলাম।

৪

রাত দুপুর বাজিয়া গিয়াছে। সকলেই ঘুমাইতেছে, জাগিযা শুধু আমরা দুজন। স্বামী বলিলেন, "বমা তোমার খুব কষ্ট হবে। পার্বে তো? তোমার এই সুকুমার দেহ, এই বালিকা বয়স—" আমি মুখ চাপিয়া ধবিয়া বলিলাম "যা-ও। কি যে বকছো।" "তবে চল" এই বলিয়া তিনি উঠিলেন। আমি সমস্ত গহনা খুলিয়া বাক্সের ভিতর পুবিয়া চাবিটা বালিসের নীচে রাখিযা দিলাম। হাতে শুধু দুগাছি বালা বহিল। সঙ্গে পরনের দুএকখানা কাপড় ও আমাব অতি প্রিয চিঠিপত্র এবং দ'একটা অত্যাবশ্যকীয দ্রব্য ছাড়া আব কিছুই লইলাম না। মনে মনে গুরুজনদেব প্রণাম কবিযা ও ঈশ্বরেব আশীর্বাদ ভিক্ষা কবিয়া তাঁহার হাত ধবিয়া বাহির হইলাম। খিড়কিব দুয়ার দিযা রাস্তায আসিয়া পড়িলাম। প্রায় পনেবো মিনিট আমবা হাঁটিয়া চলিলাম। যাইতে যাইতে তিনি বাবংবাব জিজ্ঞাসা কবিলেন "বমা তোমাব কি চল্‌তে খুব কষ্ট হচ্ছে?" আমি হাসিযা বলিলাম "না। ইঃ যেন আমি চল্‌তে শিখিনি। কি যে বল তুমি।"

নক্ষত্রখচিত শান্ত আকাশের দিকে চাহিয়া দুজনে চলিতে লাগিলাম। আর একটু দূরে যাইয়াই দেখিলাম আমাদের জন্য একখানি গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে। আমরা আরোহণ করিবামাত্র গাড়োয়ান অশ্ব ছুটাইয়া দিল। আমরা দুজনেই নীরব। গাড়ীতে উঠিয়াই আমার মন কেমন কবিতে লাগিল। অনুতপ্ত চিত্তে ভাবিলাম এখন ফিবি। করিতেছি কি? পাগল হইয়াছি নাকি। আমার জন্য এত কাণ্ড—কি স্বার্থপর আমি। আমার সুখের জন্য স্বামী তাঁহার সব বিসর্জন দিতেছেন। এই কি আমার উচিত? এই কি পতিব্রতা নারীর ধর্ম। চিন্তাস্রোতে তন্ময় হইয়া স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমি তখনও এক চিত্তে ভাবিতেছি। একটু পরেই ট্রেন প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিল। আমাদের জন্য একখানা গাড়ী রিজার্ভ ছিল। তিনি আমার হাত ধরিয়া গাড়ীতে উঠাইলেন। কলেব পুতুলেব মত তাঁহার অনুগামিনী হইলাম। ট্রেন প্রায় ছাড়ে। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। হঠাৎ দাঁড়াইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলাম, "আমি তোমার সঙ্গে যাব না, আমায় নাবিয়ে দাও! চল বাড়ী ফিরি, এখনও

রাত আছে, কেউ জান্‌তে পার্বে না।" স্বামী বিস্ময় বিহ্বল নেত্রে আমার প্রতি চাহিলেন।"

আমি নামিতে উদ্যত হইয়া আবার বলিলাম, "না—না আমি তোমার সঙ্গে যেতে পার্বো না। কেন তুমি অভাগিনীর জন্য তোমার জীবন যৌবন সব নষ্ট করে, এত কষ্ট, এত লাঞ্ছনা ভোগ করবে ? তুমি বড় না আমি বড় ? আমার কিছুমাত্র কষ্ট হবে না, আমি তাকে বোনের মত ভালবাসবো। তুমি আবার বিয়ে কর—"

"আমার এই দেবী থাক্‌তে" এই বলিয়া স্বামী আমার তৃষিত অধরে চুম্বন করিয়া, আমাকে জোর করিয়া বসাইলেন। "ছিঃ রমা, ছেলেমানুষী হচ্ছে। এই কি গোল করবার সময়।" বলিতে বলিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

আমার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল। অভাগিনী আমার জন্য এত ! পূর্ব জন্মে না জানি কত পুন্য করিয়াছি তাই আমার এ সৌভাগ্য। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে বললাম "কেন আমাব জন্যে এত করলে ?"

তিনি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন "কেন ?—ছিঃ রমা তুমি এত নিষ্ঠুর ! তোমাকে মিনতি করি আমাকে ক্ষমা কর। আর আমাকে মুগ্ধ করো না। যেখানে সমাজের নির্যাতন নাই, সেখানে যাই চল। আমরা কোথা যাচ্ছি জান ? করাচি যাচ্ছি। সেখানে আমার একজন বন্ধু এক সাহেবের আফিসে কাজ করেন। তিনি লিখেছেন তাদের একজন উচ্চশিক্ষিত লোকের দরকার। সাহেব আমাকে সে কাজ দিতে চেয়েছে। সমুদ্রের ধারে দুজনে কেমন থাক্‌বো, আবাব নূতন করে জীবন আবম্ভ করব।"

পঞ্জাব মেল বিদ্যুৎগতিতে ছুটিতেছিল। তাঁহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল সুন্দর মুখখানিতে প্রবল প্রেমের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পূর্ণচন্দ্র আসিয়া পড়াতে তাহা আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। আমি তাঁহার বক্ষে মাথা রাখিয় মুগ্ধ নেত্রে তাহা দেখিতে দেখিতে জগৎ বিস্মৃত হইতেছিলাম। আমার একটা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে খুব ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু প্রত্যেক বারই লজ্জা আসিয়া বাধা দিল। সাধ পুরাইতে না পারিয়া লজ্জায় তাঁহাব বুকে মুখ লুকাইলাম।

৫

সুখে দুঃখে আরও তিন চারি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ঈশ্বর আমাদের একটি ফুটফুটে খোকা উপহার দিয়াছেন এখন খোকাই আমাদের ঘর আলো করিয়া থাকে। সমুদ্রের নিকটবর্তী একখানি ছোটো বাংলোতে আমরা থাকি। এ স্থানটি বড় মনোরম। যে দিকে চাওয়া যায়, নীল সিন্ধু ও অনন্ত আকাশ। আমাদের উপরে শ্বশুর ঠাকুরের এখন আর ক্রোধ নাই। সে সমস্ত অনেক দিন মিটিয়া গিয়াছে। সন্তানের উপর রাগ করিয়া পিতা কতক্ষণ থাকিতে পারে। সূর্য ডুবিয়া আসিলে আমি, খোকা ও খোকার বাবা ক্লিফটন্ সি বিচে (Clifton Sea Beach) বেড়াইতে যাই। খোকা এখনও ভাল করিয়া কথা বলিতে শিখে নাই, তাহার সেই কচি মুখের আধ আধ কথা আমার প্রাণে অমিয় বর্ষণ করে। সে দেখিতে খুব সুন্দর হইয়াছে। যেন একটি স্বর্গের ফুল। মুখ খানি ঠিক তার বাবার মত। কি আশ্চর্য সাদৃশ্য। আমরা বালুকার উপর বসিয়া সমুদ্রের নীল জলরাশির বিচিত্র তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখিতে দেখিতে গল্প করি। খোকা এক একদিন খেলিতে খেলিতে তাঁহার কোলে ঘুমাইয়া পড়ে। আমার আর সেলাই করা হয় না। ফ্রক্ রাখিয়া সুপ্ত শিশুর বিমল অধরে চুম্বন করিয়া তাহার

দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকি।

নিরুপমা দাসী

দ্বাদশ বৎসর

উপেক্ষিতা

ছেলেবেলা হইতে বৃদ্ধ লালা আনন্দরাম মোক্তারকে আমাদের বাটীর সম্মুখে একখানি জীর্ণ চালায় বাস করিতে দেখিয়া আসিতেছি। যখন আমি ছোট ছিলাম তখন সে আমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া মিঠাই দিত, এবং আধ' বাঙ্গলায় তাহার আদি বাসস্থানের গল্প বলিত। সেখানকার কোন নদী কোন পাহাড়ের গা দিয়া কেমন করিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, তাহার পাড়ে কোন কোন গ্রাম অবস্থিত, তাহার বাড়ীর কাছে কোন কোন প্রতিবেশীর বাস, চার বৎসর পূর্বে যখন সে দেশে গিয়াছিল, তখন তাহারা কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিল, এবং তাহার শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্যন্ত এই যে সুখে দুঃখে সুদীর্ঘ জীবনটাকে সে শেষ করিয়া ফেলিবার মত করিয়াছে তাহার আরও কত কি কথা! তাহার পর তাহার চশমার পুরু কাঁচ সাফ করিতে করিতে সে তাহার ছেলের কথা পাড়িত। তাহার একমাত্র পুত্র যখন আমারই বয়সী হইয়া উঠিয়াছিল, যখন তাহার খ্যাতি ইস্কুলের সীমা ছাড়াইয়া প্রতিবেশীর মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময়ে একদিন সে আষাঢ়ের এক মেঘ-কৃষ্ণ দিবসে বৃদ্ধের জীবনকে আঁধারতর করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বলিয়া আনন্দরাম নির্বাকভাবে দুলিতে থাকিত, এবং আমি দেখিতে পাইতাম তাহার চোখ দুটা জলে ভ'রে উঠিয়াছে! তাহার পর বোধ হয় যখন তাহার মনে হইত তাহার অশ্রু নবীন শ্রোতার হৃদয়টিকে কতখানি ভাবাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে, তখন সে সূচনা-মাত্র না করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিত, এবং কহিত "তুমি খেলতে যাবে না?" এবং আমার উত্তর পাইবার পূর্বেই উচ্চৈঃস্বরে ডাকিত "লছমী ও লছমী!"

ছিপছিপে গৌরবর্ণ মেয়ে লক্ষ্মী ধীরে ধীরে তাহার পিতার কাছে আসিয়া কহিত "কি বাবা?"

আমার দিকে দেখাইয়া বৃদ্ধ লক্ষ্মীকে কহিত "তোর দাদাকে ডেকে নিয়ে যা' আজ তোরা খেলবিনে?"

সে আজ কতদিনের কথা। আমি লক্ষ্মীকে এত ভালবাসিতাম যে শৈশবের সেই আনন্দোজ্জ্বল স্নেহকরুণ দিবসগুলিতে ভিন্ন বুঝি এত ভালবাসা আর কখনও যায় না! জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া ইস্কুল হইতে ফিরিবার পথে লক্ষ্মীর জন্য পুতুল কিনিয়া আনিতাম, ছবির বই কিনিয়া দিতাম আরও কত কি! একদিন দিদি আমাকে এক শিশি কুন্তলীন দিয়াছিলেন, আমি তাহা পাইবা-মাত্র ছুটিয়া গিয়া লক্ষ্মীকে দিয়াছিলাম, সেই ক্ষুদ্র শিশিটি পাইয়া তাহার মুখে আনন্দের যে নির্মল হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তেমন হাসি আর কখনও দেখি নাই।

সন্ধ্যার সময় খেলা শেষ করিয়া আমি বাড়ী যাইতাম এবং লক্ষ্মী তাহার পিতার বসিবার ঘরে দীপ জ্বালিয়া দিত। সন্ধ্যার সময়ে সেখানে বহু প্রতিবেশী আসিত, এবং বৃদ্ধ তাহাদের হাতে এক একটি বাদ্যযন্ত্র দিয়া গীত আরম্ভ করিত। রঘুজীর চরণ বন্দনা করিয়া আরব্ধ বৃদ্ধের সেই গীত শুনিতে শুনিতে সঙ্গীগণের নিকট সময়ের পার্থক্য দূর হইয়া যাইত, এবং

মনে হইত আজ বৃদ্ধ একা নহে, পরন্তু তাহার দেবতা শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে বসিয়া তাঁহারই বন্দনা গান গাহিতেছে, এবং ভক্তি যত গভীর হইয়া আসিতেছে ততই তাহার উচ্ছল হৃদয় আকুল, এবং কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিতেছে।

পরিবর্তন বলিয়া পৃথিবীতে যে একটা অত্যন্ত দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, বৃদ্ধের শ্বেত-কেশ, কম্পিত-শিথিল হস্ত, নির্বাক ভাবে তাহার প্রভাব স্বীকার করিত, এবং বৃদ্ধের কুঞ্চিত ললাটে তাহার বিজয়-চিহ্ন দৃঢ় অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু এই একান্ত দুর্লঙ্ঘ্য জাগতিক নিয়মকে বৃদ্ধ তাহার ভক্তি দ্বারা জয় করিয়াছিল। দিন দিন যখন অন্তিমের আঁধার ধীরে ধীরে তাহার উপর আসিয়া পড়িতেছিল, তখন সে প্রত্যহ সন্ধ্যায় তাহার দেবতাকে বন্দনা করিয়া গান আরম্ভ করিত, এবং গান করিতে করিতে যখন তাহার দেহ ভক্তিতে লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত তখন তাহার মনে হইত, সে যেন আজ কার মানুষ নহে ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার নববল, তারুণ্য যেন আজ তাহার দেহে ফিরিয়া আসিয়াছে, এবং দর্শকদিগের চক্ষে প্রেমের আলোকে সে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

পূর্ণিমার আলোকে, অমাবস্যার গভীর অন্ধকারে, বসন্তের মলয় বাতাসে, শীতের কম্পনের ভিতর বৃদ্ধের গীত সমানভাবে ধ্বনিত হইত, এবং বর্ষার ঘনঘোর মেঘে যে দিন দিগ্বিদিক আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত, এবং পাকিয়া পাকিযা বজ্রনির্ঘোষ হইতে থাকিত. সেদিনও এই ভীষণ দুর্যোগের মাঝে বৃদ্ধের ভক্তি-করুণ কণ্ঠ অঞ্জলিব নির্মল পুষ্পের মত তাহার দেবতার পানে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে থাকিত। এমনি করিয়া কতদিন গেল। দিবসের সমস্ত ঝঞ্ঝাট, লাঞ্ছনা, অপমান বৃদ্ধের এই শ্বেত মস্তকের উপর দিয়া যাইত, কিন্তু তবু সে মস্তক অবনত হইত না। অবশেষে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার মৌনভাবে বিশ্বের উপর নামিয়া পড়িত, তখন বৃদ্ধের মস্তক তাহার কাল্পনিক দেবতার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িত।

লক্ষ্মী বড় হইয়াছিল, আমি আর তাহার সহিত খেলা করিতে যাইতাম না। যৌবনের প্রথম ধাপটিতে পা দিয়া সহসা অনাহুত ভাবে যে সঙ্কোচ, যে লজ্জা লক্ষ্মীকে বেড়িয়া ফেলিয়াছিল, তাহা আর সকলেই লক্ষ্য করিয়াছিল, কেবল করে নাই, তাহার এই বৃদ্ধ উদাসীন পিতা!

করে নাই, তাহার কারণ তাহার লক্ষ্মীর সহিত দিবসে একবার মাত্র সম্পর্কে আসিতে হইত, সে সন্ধ্যার দীপ জ্বালার সময়। লক্ষ্মী যখন সন্ত্রস্ত হইয়া সঙ্কোচে তাহার বসন দ্বারা দেহলতাকে বেষ্টন করিয়া দ্বীপ হস্তে প্রবেশ করিত, তখন আনন্দরামের ভক্তি-সজল আঁখির সম্মুখে বহু-সহস্র বৎসর পূর্বেকার সন্ধ্যান্ধকার গাঢ় বনের ভিতরকার দুইটি তরুণ তরুণীর অপরূপ রূপ জাগিয়া উঠিত। এবং তখন সে আজকালকার পৃথিবী ও তাহার তুচ্ছ সুখ দুঃখ হইতে বহুদূরে বিচরণ করিত।

লক্ষ্মীর মা অনুযোগ করিতেন "লক্ষ্মীর বিবাহের জন্য চেষ্টা কর না কেন? কোন হিন্দুস্থানীর ঘরের মেয়েকে এতদিন অবিবাহিত থাকিতে দেখিয়াছ কি?" আনন্দরাম ধীর ভাবে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিত, "সবই শ্রীরামচন্দ্র জীউর ইচ্ছা, আমার লক্ষ্মীর বিবাহ কি নারায়ণ না জুটলে হয়? তুমি দেখ্‌তে থাক, একদিন না একদিন আমি লছ্‌মীর জন্যে নারায়ণকে পাবই।"

একদিন বৃদ্ধের সান্ধ্য বৈঠকে একটু বিশেষ আয়োজন দেখিলাম। ঘরটা অতিরিক্ত ধরনের পরিষ্কার এবং বৃদ্ধের ও তাহার সঙ্গীদের সাজসজ্জাতেও একটু নূতনত্ব দৃষ্ট হইল।

এবং তাহার পর তাহার যে তরুণ অতিথিটি আসিয়া বসিল, তাহার বেশ ভূষায় এবং

আদর অভ্যর্থনায় তাহাকে বিশিষ্ট ধনী সন্তান বলিয়া বোধ হইল।

সেদিন বৃদ্ধের গান অনেক রাত্রি অবধি চলিল।

তাহার দু'দিন পরে বাহিরের ঘরে বসিয়াছিলাম এমন সময় আনন্দরাম হাস্যমুখে আসিয়া কহিল "বাবু তোমাদের আশীষে লছমীর নারায়ণের মত বর পেয়েছি"—বলিয়া একটু থামিয়া আরম্ভ করিল "পরশু রাত্রে ফুলহাটের জমিদার বাবু আমার ঘরে পদার্পণ ক'রেছিলেন, কি ক'রে জানিনে, নিশ্চয়ই রামচন্দর জীউব ইচ্ছেয়, সে আমার লছমীকে দেখে, দেখে তার বড় পছন্দ হ'য়েছে। তার এক সঙ্গী আমার কাছে বিবাহের কথা পেড়েছে—বর ঘর সব ভাল, তুমি কি বল বাবু,—তার সঙ্গে লছমীব বিয়ে কেন না দি ?" বলিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি অনুসন্ধান ক'রে যদি এইরূপই বুঝে থাক, ত' এ বিবাহ ত' খুব বাঞ্ছনীয়।"

একমুখ হাসিয়া আনন্দরাম বলিল "বাবুজী, আশীষ কর, তোমার ছোটবোনটি যেন সুখে থাকে—রঘুনাথ যেন তার মঙ্গল করেন।"

তাহার কথার আমি কোনও উত্তর করিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু আমাব সমস্ত হৃদয়ের আন্তরিক আবেদন লক্ষ্মীর মঙ্গলকামনায় ঊর্দ্ধে প্রেরিত হইল।

বৃদ্ধ চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার প্রতি পদক্ষেপে যে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে।

তাহার দিন দশেক পরে আলো ও বাদ্য লইয়া, এবং দেলখোস্ ও পুষ্পের গন্ধে চারিদিক পরিপূর্ণ করিয়া ফুলহাটের জমিদাব লছমীকে বিবাহ কবিতে আসিল। আনন্দরাম কম্পিতকণ্ঠে, আর্দ্রনেত্রে তাহার করে আপনার প্রিয়তমা কন্যাকে সম্প্রদান করিয়া উভয়ের মাথায় হাত বাখিয়া বলিল, "বাছা, তোমাদের শ্রীরামচন্দ্রজী মঙ্গল করুন, রঘুনাথ জীউর শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক।"

বিবাহের পর ২/৩ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আমি তখন সংসারে প্রবেশ করিযাছি, ও কর্মের ঝঞ্ঝাটে লক্ষ্মীর কথা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলাম।

এমন সময় আনন্দরাম একদিন আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার মুখ আমি কখনও গম্ভীর দেখি নাই, কিন্তু সেদিন তাহাকে দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইল কিসেব বেদনা যেন তাহার বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়াছে। আমাকে দেখিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল "বাবুজীর মঙ্গল ?"

আমি বলিলাম "হাঁ, তোমাদেব সব কুশল ?"

বৃদ্ধ তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "রঘুনাথজীউ জানেন।" তাহার পর খানিক থামিয়া হঠাৎ বড় বড় দুইটা চক্ষু আমার মুখের উপর রাখিয়া কহিল "বাবুজী, লছমীকে তোমার মনে পড়ে ?"

আমি হাসিয়া উঠিলাম "লক্ষ্মীকে মনে পড়বে না মোক্তার সাহেব ? তাকে ভুলে গেলে যে আমার ছেলেবেলাটাকেই ভুলে যেতে হয়। সে কেমন আছে, মোক্তারজী ?

আমার মুখের দিকে তেমনি করিয়া তাকাইয়া বৃদ্ধ বলিল "তারই কথা ব'লছিলাম। আজ তিন বছর তাকে বিয়ে ক'রে নিয়ে গেছে একবারও ত' পাঠায়নি, তার উপর চিঠিও বড় বেশী পাইনে। গোড়ায় গোড়ায় লছমী দু'একটা চিঠি দিয়েছিল, কিন্তু ভারি ছোট। তারপর আমার জামাই মাঝে মাঝে খবর দেয় তাঁরা ভাল আছে—এই পর্যন্ত। কিন্তু এই তিন মাস সে

খবরও দেয়নি, আমি রোজ রোজ চিঠি দিচ্ছি তার উত্তুর দেয় না। রামচন্দরজী যা করেন—বাবু আমার মন বড় খারাপ হ'য়ে গেছে। আমি ভাবছি একবার তাকে দেখে আমি।

আমি বললাম "হাঁ, একবার দেখেই এস।" বৃদ্ধ চ'খের জল ঢাকিতে চেষ্টা করিয়া কহিল "আর যদি তা'কে দেখ্‌তে না পাই ?"

আমি সান্ত্বনা দিয়া কহিলাম, "হয়ত' কোন বিশেষ কাজ এসে পড়েছে, তাই তোমাকে চিঠি দিতে পারেনি।"

বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িল "বাবু রামচন্দর তোমার কুশল করুন, কিন্তু বুড়ার মন কিছুতেই মানচে না !"

সেই দিনই আনন্দরাম লক্ষ্মীকে দেখিতে গিয়াছে।

তাহার পর তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে। সে দিন সন্ধ্যাবেলা সমস্ত আকাশ ঘনমেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল এবং দক্ষিণ হইতে শীতল বাতাস হুহু করিয়া বহিয়া আসিতে লাগিল। আজ সমস্ত দিনের কর্ম-ক্লান্ত শরীর এই গাঢ় সন্ধ্যায় যে একান্ত অবশ হইয়া উঠিল, এবং মনের ভিতর যেন কোন অচিন্ত্য বেদনায় মুহুর্মুহু ব্যাথিত হইতে লাগিল।

এমন সময় বৃদ্ধ আনন্দরামের গল্প সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া ধ্বনিত হইযা উঠিল—

"তুহার পদারাঠন্দ ভরসা হামারি।"

চকিতের মধ্যে আমার সমস্ত দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল,—আনন্দরাম ফিবিয়া আসিয়াছে,—লক্ষ্মীর খবর আনিয়াছে ত'। লক্ষ্মীর খবর ? হাঁ তাই বটে। এই কয়বৎসরের পার্থক্য লক্ষ্মীকে আমার নিকট হইতে দূরে লইয়া যাইতে পারে নাই, সুখের দিনে জানিতে পারি নাই। কিন্তু দুঃখের মেঘ যেদিন লক্ষ্মীকে ঘেরিয়া গর্জন করিয়া উঠিল, সে দিন বুঝিলাম লক্ষ্মী আমার পর নহে—সে দিন লক্ষ্মী আমার সম্মুখে ছেলেবেলাকার সেই খেলার সঙ্গীরূপে একান্ত আপনার হইয়া অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রায় ছুটিয়া বৃদ্ধের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম তাহার সঙ্গীগণ কাঠের পুতুলের মত বসিয়া রহিয়াছে, কেবল আনন্দরাম উঠিয়া দাঁড়াইল, আমার হাত ধরিয়া বলিল "বাবু, বস।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মোক্তার সাহেব লক্ষ্মীকে দেখিয়া আসিয়াছ ? সে ভাল আছে ত ?"

আনন্দরাম চকিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "হাঁ, খুব ভাল আছে" তাহার পর তাহার স্কন্ধে রক্ষিত তানপুরাটার উপর মাথা রাখিয়া হা-হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

চ'খের জল মুছিতে মুছিতে কহিল, "সত্যি বাবু, এত সুখে সে কখনও থাকেনি। হতভাগা বুড়ো যে সুখ পেলে না, সে তাই লাভ ক'রেছে, রঘুনাথ জীউর শ্রীচরণ তলে স্থান পেয়েছে।

ঊর্ধ্বে চাহিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল—তাহার পর চ'খের জল মুছিয়া কহিতে লাগিল:—

"যে দিন আমি ফুলহাটের জমিদারের স্ত্রী—আমার লক্ষ্মীকে দেখ্‌তে গেলাম, সে মোটে তিন চার দিনের কথা। অত বড় জমিদার, তার স্ত্রী কেমন ঘরে ছিল জান ? বিশ্বাস করবে না, একটা ভাঙ্গা বেড়ার ঘর। তাতে রোদ, হিম, কিছু আটকায় না। আমার লক্ষ্মী,—সোনার লক্ষ্মী সে তিন বছর সেই ঘরে একটি কথা না বলে কাটিয়ে এসেছে। ফুলহাটের ভাবী

জমিদার বাবু—তিনি তাকে দাসী বলে পরিচয় দিয়েছিলেন—সে সেই অপমান নতমুখে সহ্য ক'রে এসেছে, একমাত্র ভগবানকে সে কথা জানিয়েছিল,—আর কাউকে নয়—এমন কি আমাকেও নয়, পাছে আমি কষ্ট পাই—সেই ভয়ে। এমন মানুষ তোমরা দেখেছ ?"

বলিয়া আনন্দরাম দুই হাতের উপর মাথা রাখিযা খানিকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

"আমি যখন গেলাম, তখন দু'মাস অসুখের পর তার মুমূর্ষু অবস্থা। তার শীর্ণ পাণ্ডু মুখের উপর ভাঙ্গা দেওয়াল দিয়ে পশ্চিম থেকে সূর্যির কিরণ এসে প'ড়েছিল, আমাকে দেখে সে আগে চিনতে পারে নি. তারপর যখন চিনতে পারলে, তখন আমার কোলে মাথা রেখে সে তিন বছরের মেয়ের মত কাঁদতে লাগল। তার সোনার বরণ কালি হ'য়ে গিয়েছিল,—একটা জীর্ণ বিছানায় তাকে শুইয়ে রেখেছিল। অনেকদিন পরে বাপেতে মেয়েতে একসঙ্গে বসে প্রাণ খুলে কাঁদলাম, তারপর ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম, 'লছমী, চল একটা ভাল বাড়ী ভাড়া ক'রে তোর চিকিৎসা করাই, তুই সেরে উঠবি।' সে তার উজ্জ্বল চোখ দুটো আমার পানে তুলে ব'ল্লে 'বাবা, আর আমার বেঁচে লাভ কি ? বেঁচে থাকলে আমি আগেকার সুখ ফিরে পাব ? উপেক্ষিতা হ'য়ে দাসীর মত বাঁচার চেয়ে কি মরা ভাল নয় ? তুমি আমাকে যাঁর হাতে সমর্পণ ক'রেছ, তিনি যদি না চান, তবে মরণের দোর থেকে, কি সাধে কার কাছে ফিরে যাব—বাবা—' আমি তখন কাঁদছিলাম তাই আমার দিকে চেয়ে ব'ললে, 'বাবা, তুমি কেঁদ না, তোমাকে আমি দেবতার মত জানি, তোমার চ'খে জল দেখলে আমার ম'রতে সাহস হবে না। আজ আমার দুঃখ রইল না, স্বামীর ঘরে স্বামীর শয্যায়, সে যতই জীর্ণ হ'ক না, আমার বাবার পায়ের তলায় যদি মরতে পারি, ত' সে মরণ সার্থক।'

"ডাক্তারের দোরে আমি তাকে দু'দিন বাঁচিয়ে রেখেছিলাম, আজ ভোর বেলায় ডাক্তার যখন ব'ল্লে আর কিছুতেই বাঁচবে না তখন আমার সমস্ত শরীর রাগে কাঁপতে লাগল, মনে হ'ল, যে তার এই রকম মৃত্যুর কারণ তাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে ছিঁড়ে ফেলে, বিদ্রোহী পৃথিবীর ওপর পাগলের মত গিয়ে পড়ি, আমার ওপর এ অন্যায়ের প্রতিশোধ নি। আমি তখন পাগলের মত হ'যে গিয়েছিলাম, বোধ হয় ডাক্তারকে ব'লেছিলাম ধর্মে হ'ক, অধর্মে হ'ক এর প্রতিশোধ তুলবই, কেননা দেখলাম সে আমাকে শান্ত হ'তে ব'লছে।

"তারপর আর অল্প বাকী। ডাক্তার চ'লে যাবার এক ঘণ্টা পরেই আমার লছমীর উজ্জ্বল চ'খ নিদ্রাতুর হ'যে আসতে লাগলো, মুখের হাসি যেন ফুটে উঠতে লাগলো। তার মুখের ওপর এলান' চুল এসে পড়েছিল, নিঃশ্বাস দুর্বল হয়ে আসছিল—আমি তখন মেজেয় প'ড়ে তার জন্যে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম, হে ভগবান, হে রঘুনাথ, তাকে ফিরিয়ে দেও, আমার আর সব নাও ! আমি আর কিছু চাইনে, শুধু লছমীকে দেও,—আমি আমাকেও চাইনে !

"দেবীর স্বরে—কেন না লছমী তখন বৈকুণ্ঠের কাছে গিয়েছিল—দেবীর স্বরে লছমী আমাকে ডাকলে 'বাবা'। সেই শেষ ডাক। তাড়াতাড়ি তার মুখের কাছে কান নিয়ে গেলাম, সে আমার দুই হাত ধ'রে বল্লে, 'বাবা, প্রতিশোধ নয়, ক্ষমা ক'রো।' এ স্বর মানুষের নয়—বুড়ো আনন্দরামের মেয়ের নয় ! আমি তার কপালে একশ' বার চুমু খেলাম, চখের জলে সমস্ত মুখ ভিজে গেল, তাকে দুই হাতে বুকের কাছে এনে ব'ল্লাম 'মা আমার, নারায়ণী আমার, তোর কথা রাখব—আজ থেকে ক্ষমা ক'রবো, তোর মুখ মনে ক'রে ক্ষমা ক'রবো। তোর বুড়ো বাবা আর ভুল ক'ররে না।

"লছমী হাসিমুখে সংসারকে ক্ষমা ক'রে চ'লে গেছে—আর আমাকে ক্ষমা করবার পড়া

দিয়ে গেছে। বুড়ো বয়সে পড়া মুখস্থ হ'চ্ছে না, কেবলি ভুল হ'য়ে যাচ্ছে। যদি ক্ষমার দেবতার শরণ নিয়ে লছ্‌মীর দেওয়া পড়া মুখস্থ ক'রতে পারি,—সেই চেষ্টা ক'চ্ছিলাম।" বলিয়া আনন্দরাম তানপুরা তুলিয়া কম্পিত অঙ্গুলীতে সুর দিয়া ভাঙ্গা গলায় গাইয়া উঠিল—

"তুহারি পদারবিন্দ ভরসা হামারি।"

ভূপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রতিষ্ঠা

১

একটা ঘনকৃষ্ণ মেঘে আকাশ ভরিয়া গিয়াছিল ! সমস্ত প্রকৃতি যেন স্তম্ভিত হইয়া প্রলয় ঝটিকার প্রতীক্ষা করিতেছিল, জগতের সজীব কলরব মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। পথে কর্মশ্রান্ত কৃষক আঁটি বাঁধা তৃণ শস্য মস্তকে বহন করিয়া আপনার বলদগুলিকে গৃহে তাড়াইয়া শশব্যস্তে গৃহে ফিরিতেছিল। পাখীর দল ঝাঁক বাঁধিয়া ভীতত্রস্তভাবে নীড়ে ফিরিতেছে। যেন কোথা হইতে একটা দৈত্য নিমেষে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীর সমস্ত শোভা বিনষ্ট করিয়া দিবে, তাই সকলে ভয়চকিত চিত্তে সেই বিপদের মুহূর্তটুকুর জন্য যথাসম্ভব সতর্ক হইতেছে !

ঠিক এমনি সময়ে বাহির গ্রামের একটি কক্ষে স্বামী-স্ত্রীতে বচসা হইতেছিল। আজ কয়দিন ধরিয়া সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া উভয়েব মধ্যে ছোটখাটো কলহ হইতেছিল, তবে ব্যাপাবখানা আজ কিছু ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে !

দেবনাথ কহিল, "যদুর একে অসুখ শরীর, তাকে আমি চুপ করে শুয়ে থাকতে বললুম, তুমি তাকে কোথায় পাঠালে—একে এই ঝড় আসছে—এ তোমার ভারি অন্যায়—"

বীণা কহিল, "দেখ, তুমি আস্কারা দিয়ে দিয়ে চাকরগুলোকে একেবারে মাথায় তুলেছো। সকাল থেকে তাকে আমি ন'পাড়ায় যেতে বলছি, সমস্ত দিনে বাবুর সময় হল না—"

দেবনাথ—"তার যে অসুখ এটা তুমি ভাবছ না—আরো ত লোক রয়েছে—"

বীণা—"তা আছে—কিন্তু আমার হুকুম অমান্য করে তার শুয়ে থাকাটা বেয়াদপি ! মনিবকে গ্রাহ্য না করে আয়েস করাটা—"

পত্নীর কথায় বাধা দিয়া দেবনাথ কহিল, "আয়েস নয় ঠিক : তাব শরীরটা বড় খারাপ বীণা, তাই আমি তাকে শুযে থাকতে বলেছিলুম—"

বীণা কহিল, "জানি, তোমার আস্কারা না পেলে চাকরগুলো কখনো এত মাথায় উঠতে পারতো না ! কখনো লোক রাখনি ত—এমন করে তুমি সব বিষয়ে কথা কইতে এসো না।"

দেবনাথ ডাকিল, "বীণা !"

বীণা কহিল, "কি, চোখ রাঙাচ্ছ যে ! মনে করোনা আমি ভয় পাব ! এতকালেও তুমি মানুষের মত হলে না, আশ্চর্য ! তুমি তাকে আরাম করতে বলেছো বলেই তাকে আমি পাঠালুম ! আমি জানি লোক গুলোকে তুমি একেবারে বাবু করে তুলছ—"

দেবনাথ কহিল, "আমাকে অমান্য করবার জন্যই তাকে তুমি পাঠিয়েছ তা আমি জানি,

আমি বেশ বুঝছি বীণা, আমার এখানে থাকাটা তোমার তেমন পছন্দ হচ্ছে না—প্রত্যেক বিষয়ে খিট্‌খিট্‌ করি—কি করব, আমার স্বভাবের দোষ—সময়ে সময়ে তোমার সঙ্গে এমন মিছে তর্ক করতে হয় যে তাতে আমারি লজ্জা হয়—আজ স্থির জানলুম আমার অমর্যাদা করাই তোমার একমাত্র লক্ষ্য !" দেবনাথের স্বর গম্ভীর !

বীণা কহিল, "ও বাপ্‌রে, অমর্যাদা ! মস্ত মানী লোকটা কিনা,—লজ্জা করে না, এই রকম শ্বশুরবাড়ী পড়ে থাকতে !—"

স্ত্রীর কথায় বাধা দিয়া কম্পিত স্বরে দেবনাথ কহিল, "সে কথাটা এতদিন পরে বুঝতে পারছি ! ভগবান জানেন আমার অপরাধ কি ! তোমার বাবার নির্বন্ধে নিজের কুঁড়ে ছেড়ে অট্টালিকার এসে বাস করেছি—আপনাব আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছি। তোমার বাবা যতদিন ছিলেন, তখনকার কথা ছেড়ে দিই ! তাঁর মৃত্যুর পর থেকে এই অট্টালিকার কি সুখে বাস করছি তা আমিই জানি ! নিজের স্ত্রীর কাছে থেকে ভালবাসা না হোক্‌, একটু সম্মানও কি তার স্বামী প্রত্যাশা করিতে পারে না।"

বীণা কথা কহিল না ; দেবনাথ কহিল, "বীণা সত্য বলছি, তোমাকে আমি ভালবাসি, কারণ তুমি আমার স্ত্রী ! আমি মানুষ হতে পারলুম না, কি করব, অদৃষ্ট ! কিন্তু যখন আমার এখানে থাকাতে তোমার নানান অসুবিধা হচ্ছে তখন আমার এখানে না থাকাই উচিত ! আমি আজ চললাম—তুমি এখন সুখী হও !" দেবনাথের চোখ ছল ছল করিতেছিল। দেবনাথ চলিয়া গেল, আর বীণা ঠিক প্রস্তরমূর্তির ন্যায় নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার চোখে কোন সজীবতা ছিল না, ঠিক যেন পুতুলের চিত্রকরা চোখের মত !

দাসী আসিয়া কহিল, "জামাইবাবু এই ঝড়ে কোথায় আবার বেরুলেন—বারণ করলে না কেন দিদিমণি ?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বীণা কহিল, "আমার দবকার নেই ! তুই যা, এখন জ্বালাসনি।"

হারু আসিয়া কহিল, "জামাইবাবু বললেন তিনি আব আসবেন না, নারাণগাঁ চললেন" দাসী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "ওমা, এই ঝড়ে ?"

বীণা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "কোথায় আবার যাবে ? পেটে ক্ষিধে হলেই ফিরতে হবে।"

দাসী কহিল, "ও কথা বলো না দিদিমণি : জামাইবাবু—"

দাসীর কথা শেষ হইতে না হইতেই তুমুল ঝড় উঠিল। ধূলা খড়কুটা উড়াইয়া একটা প্রকাণ্ড দৈত্য যেন স্বীয় দানবীলীলা দেখাইতে উদ্যত হইয়াছে।

এই প্রবল ঝড়ে বীণার অন্তরখানা ক্ষণে ক্ষণে আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল ! তাহার অন্তর মধ্যেও একটা ভীষণ ঝড় উঠিয়াছে—হায়, কবে এবং কিসে তাহা শান্ত হইবে ! অন্ধকার গৃহের মধ্যে বীণা শয্যায় পড়িয়া অনেক কথা ভাবিতে লাগিল আর বাহিরে বিরাট আকুলতায় পবন হা-হা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেও লাগিল !

২

দেবনাথের বয়স যখন ১০/১১ বৎসর, তখন তাহার বিধবা মাতাও তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেল। হতভাগ্য বালক যখন এই বিশাল জগতে আপনাকে একান্ত অসহায় ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িল তখন্ বাহিরগ্রামের জমিদার শচীপ্রসন্ন বাবু তাঁহাকে আপন আলয়ে

আশ্রয় প্রদান করেন। বালকের পাঠানুরাগ ও নম্র প্রকৃতিতে একান্ত মুগ্ধ হইয়া আপনার একমাত্র কন্যা বীণাকে তাঁহার হস্তে প্রদান করেন। আজ তিন বৎসর শচীপ্রসন্নবাবু ও তাঁহার পত্নী ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু, হায়, অদৃষ্ট যাহার উপর বিরূপ, মানুষ কখনো তাহাকে সুখী করিতে পারে না। বেচারী দেবনাথ পিতামাতার স্নেহ হারাইল না বটে, কিন্তু পত্নীসুখ তাহার অদৃষ্টে ঘটিল না, অশুভ মুহূর্তে বীণার সহিত তাহার প্রথম দৃষ্টি বিনিময় হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। অভিমানিনী আদরিণী বীণার দোষ অনেক ছিল! নম্রপ্রকৃতি দেবনাথের চক্ষে এই অভিমানিনী বালিকার যথেচ্ছাচার ভালো ঠেকিত না—সে তাহার সংস্কারে চিরকালই একটু অতিরিক্ত মনোযোগ প্রকাশ করিত। বীণা একটু উচ্চস্বরে কথা কহে, দাস-দাসীর সামান্য ত্রুটি দর্শনে বা বিনা ত্রুটিতেই বিষম তিরস্কার করে, জিনিসপত্র অনেক সময় আপনার খেয়াল-মত নষ্ট করে—দেবনাথ এইগুলির সংশোধনে একটু অধিকমাত্রায় মনোযোগী। বীণার মতে দেবনাথের পক্ষে এই ব্যগ্রতাটুকু ধৃষ্টতার নামান্তর! এইরূপ খুঁটিনাটি লইয়া প্রায়ই কলহ হইত, তবে, পূর্বেই বলা হইয়াছে আজ ব্যাপার বেশ ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে! এমন যে ঘটিবে দেবনাথ তাহা ভাবে নাই—বীণাও ভাবে নাই দেবনাথ এতটা রুষ্ট হইবে, এমন করিয়া সে চলিয়া যাইবে! এই ভাদ্র মাসে—বাড়ীর একটা কুকুর বিড়ালকেও গৃহছাড়া করিতে নাই, আর তাহার স্বামী, দেবনাথ গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল!

মেঝেয় পড়িয়া বীণা সেই কথাই কেবল ভাবিতে লাগিল। স্বামীর অনেক কথাই তাহার মনে পড়িতেছিল।—এ জগতে নম্র শান্ত প্রকৃতির সম্মুখে উগ্রপ্রকৃতিকে একদিন মস্তক নত করিতে হইবেই।

দেবনাথের নিজের বিরুদ্ধে বীণা অনেক অত্যাচার করিয়াছে, কিন্তু তাহা লইয়া দেবনাথ ত কোনদিন কোন কথা বলে নাই। দেবনাথের দারিদ্র্য প্রভৃতি লইয়া সে কত উপহাস-পরিহাস করিয়াছে কিন্তু দেবনাথ সে সমস্ত নীরবে সহ্য করিয়াছে! দাস-দাসীকে সামান্য দোষে বা বিনা দোষে বীণা তিরস্কার করিলেই দেবনাথের অন্তরে তাহা সূচীর ন্যায় বিদ্ধ হইত, সে তখন স্থির থাকিতে পারিত না—এই কথাটাই আজ বিশেষ করিয়া বীণার মনে হইতেছিল। এবং তাহাতেই নিজের দৈন্য, নিজের হীনতা উপলব্ধি করিয়া তাহার একেবারে মাটির মধ্যে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল! দুই চারিদিবস অতিবাহিত হইল, তবু দেবনাথ ফিরিল না। তখন বীণার সমস্ত দুর্জয় অভিমান একেবারে যেন নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

একদিন রাত্রে যখন একটা ঝাড়া-বৃষ্টির পর চারিধার বেশ শান্ত হইয়া গিয়াছিল। পাশের বাগানে গাছের পাতাগুলা হইতে বৃষ্টির জল টপ্ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল—সোঁ সোঁ শব্দে তালগাছের পাতা কাঁপাইয়া ঠাণ্ডা জলো হাওয়া বহিতেছিল, এবং মধ্যে মধ্যে ভেকের কর্কশ স্বর নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল, তখন বীণা শয়নগৃহের মেঝেতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল,—"এসো, ফিরে এসো! আমাকে ক্ষমা কর,—আমার সমস্ত পাপ সমস্ত অপরাধ ভুলিয়া আজ পায়ে রাখো—তুমি এসো!"

৩

দেবনাথ ধীরে ধীরে নারাণগাঁয়ে আপনার জীর্ণ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধা পিতৃস্বসাকে প্রণাম করিয়া, পিতৃমাতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র অমরকে বক্ষে চাপিয়া আপনার উচ্ছ্বসিত

অশ্রুবেগ রোধ করিল। বালক অমর ‘কাকা’কে পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল।

সে সময় বাঙালীর হৃদয়ে স্বদেশী মন্ত্রের বীজ ফুটিয়া উঠিয়াছে! মহাব্রত-উদ্‌যাপনে বাঙালী আপনার প্রাণ বা মানের প্রতি লক্ষ্য করে না! শুধু নারাণগাঁ ও পার্শ্বস্থ মুসলমান প্রধান গ্রামগুলি এই পুণ্যমন্ত্রপ্রভাবে তখনো আপনাদের শুচিতা সম্পাদন করিতে পারে নাই! দেবনাথ যেন সঞ্জীবনীমন্ত্রপ্রভাবে চতুর্দিকে নবজীবন সঞ্চারিত করিল। তদ্দেশবাসী বাঙালীর তপ্ত হৃদয় এই স্নিগ্ধ পুণ্যধারাস্পর্শে পবিত্র হইয়া উঠিল।

স্বদেশী প্রচারকল্পে দেবনাথ জেলায় এক সভার অধিষ্ঠান করিল। বালকের দল যখন পতাকা হস্তে সভার শোভা বর্ধিত করিয়া ‘বন্দে মাতরম’ ধ্বনিতে মুহুর্মুহু গগন কম্পিত করিয়া তুলিতেছিল ও শ্রোতার দল আবেগোদ্বেলিত হৃদয়ে বিরাট উৎসাহে স্বদেশী গ্রহণে জীবনপণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছিল, তখন পুলিশসাহেব সদলবলে আসিয়া সভাস্থল ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কয়েকজন শ্রোতার সহিত কথায় কথায় পুলিশের ঝগড়া বাধিয়া গেল। অমনি সুসজ্জিত পুলিশের রেগুলেশন লাঠি নিরীহ শ্রোতৃবর্গের উদ্দেশ্যে উত্থিত হইল। কেহ বা প্রাণভয়ে পলায়ন করিল, কেহ বা স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় হস্তস্থিত যষ্টি প্রভৃতি লইয়া সেই যমদণ্ড স্বরূপ রেগুলেশন লাঠির বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। অদূরে একটি যুবক অপর অস্ত্র-শস্ত্র না পাইয়া পুলিশ সাহেবের মুখ লক্ষ্য করিয়া হস্তস্থ দেলখোসের শিশি ছুড়িল। সে বাড়ীর তত্ত্বের জন্য স্বদেশী সাবান এসেন্স প্রভৃতি ক্রয় করিয়া মিটিং শুনিতে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার অব্যর্থ লক্ষ্যে সাহেবের চোখের নীচে কাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্তস্রোত বহিল। পুলিশ তখন কোন দিকে না চাহিয়া দুই হস্তে লাঠি ঘুরাইতে লাগিল। দেবনাথ আসিয়া সাহেবকে কহিল, “এ অন্যায় ‘যুদ্ধ’ কেন?”

সাহেব রুমালে চোখ মুছিয়া একটা অকথা গালি দিয়া কহিল—“—এইযো! পাকড়ো!”

পুলিশ আসিয়া দেবনাথের হাত ধরিল। শ্রোতৃবর্গ তখন পলাইয়াছে—আরো চারি পাঁচজন নির্ভীক স্বদেশবৎসল যুবক আসিয়া আত্মসমর্পণ করিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বিশেষ ভাবিয়া দেখিলেন.—এই গ্রামখানা পূর্বে শান্ত ছিল. তারপর এই শিক্ষাগর্বিত লোকটা এখানে আসা অবধি বেশ একটা গোলমাল আরম্ভ হইয়াছে সুতরাং দেবনাথ ও যুবক কয়টির এক বৎসর সশ্রম কারাবাসের ব্যবস্থা হইল।

৪

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। বাহিরগ্রামের জেল হইতে আজ দেবনাথ ও স্বার্থত্যাগী স্বদেশবৎসল যুবকবৃন্দকে সাদরে অভ্যর্থনা করিবার জন্য চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামবাসী জেলের সম্মুখে উপস্থিত। বাদ্য, পুষ্পমালার অভাব ছিল না।

বীণা সোৎসুকনয়নে বাতায়ন পার্শ্ব হইতে দেখিল, তাহার স্বামীকে চন্দনচর্চিত করিয়া পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া সারা গ্রামবাসী তাঁহাকে পূজা করিতে ব্যস্ত! তাহার স্বামী একবারো তাহার বাতায়নের পানে চাহিল না—নতমস্তকে চলিয়া গেল। এই বাতায়ন পার্শ্বে দুইটি সতৃষ্ণ আঁখি যে তাহার একটি কৃপাকটাক্ষের প্রার্থিনী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার হৃদয়সঞ্চিত ভক্তিঅর্ঘ্যের নিকট এই সকল সমবেত ভক্তমণ্ডলীর পূজা নিবেদন কত তুচ্ছ! কিন্তু দেবনাথ কিছু বুঝিল না—সে নতমস্তকে চলিয়া গেল। বীণার বক্ষপঞ্জর যেন চূর্ণ হইবার উপক্রম হইল! হায়, দেবনাথ এখনো সে অপরাধ মনে রাখিয়াছে!

বীণা দাসী পাঠাইল। সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, “দিদিমণি, জামাইবাবু বললেন তিনি

এখন আসতে পারবেন না, এখনি নারাণগাঁ চলে যাবেন, তাঁর ভাইপোটির সেখানে বড় অসুখ !"

বাণবিদ্ধ পাখীর ন্যায় বীণার অন্তরখানা আকুল আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

হায়, ফাল্গুন মাসের এমন শান্ত পূর্ণিমারাত্রি চন্দ্রের প্রদীপ্ত কিরণচ্ছটা মিথ্যা বিকীর্ণ করিতেছে ! শ্যামসন্ধ্যা বিচিত্র কলভাষে মিথ্যা তাহার অস্ফুট রাগিনী ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিতেছে, মধুর দক্ষিণ অনিল সুরভিসম্ভার মিথ্যা তাহার দ্বারপ্রান্তে বহন করিয়া আনিতেছে—দেবনাথ আসিল না—হায়, বীণার সকলি নিষ্ফল ! এমন বিহ্বলা, আবেশময়ী রজনী— ! কিন্তু, শান্তি কোথা, সুখ কোথা !

বীণা কতদিন হইল তাহার নানা বিচিত্র বর্ণের উৎকৃষ্ট বসন স্পর্শ করে নাই,—তাহার সাধের, শোভার বিচিত্র অলঙ্কার, বাক্সের কোণে অযত্নে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার কুন্তলীনের শিশির গায়ে ধূলা জমিয়া গিয়াছে—সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করে না ! তাহার সে শ্রী নাই, সে সৌন্দর্যও নাই ! অনুতাপের শিখায় তাহার লাবণ্য অন্তর্হিত ! কিন্তু হায়, আজো তাহার দুঃখের শেষ হইল না !

বীণা ডাকিল, "রাজি !"

রাজি দাসী কহিল, "কেন দিদিমণি ?"

বীণা কহিল, "চ', নারাণগাঁ যাব !"

রাজি আশ্চর্য হইল। আহা, সে-ও যে কায়-মনোবাক্যে দেবতার কাছে ইহাই প্রার্থনা করিতেছিল। বীণার সুমতি হউক !

নারাণগাঁয়েব একটি ভগ্ন গৃহকক্ষে একটি বালক রোগশয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে, নিকটে কেহ নাই ! জীর্ণ মলিন শয্যা ; বালক কাতরস্বরে কহিল, ও মা, মাগো, এস মা আর যে পাবি না মা।"

বীণা নিকটে আসিয়া বালকের রোগজীর্ণ শিরটি আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইল ! বালক চোখ বুজিয়াই কহিল, "মা, এসো না মা !"

বালকের ললাটে সস্নেহে চুম্বন করিয়া বীণা কহিল, "এই যে বাবা এসেছি !"

বালক চোখ খুলিয়া কহিল,—"তুমি কে ? কাকাবাবু কোথা ?"

"আমি তোমার মা হই।"

"বড় তেষ্টা পেয়েছে মা—" বালক শুষ্ক ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ নাড়িল।

দুইটি আঙ্গুর লইয়া বীণা বালকের মুখে দিল। বালক আরাম পাইয়া কহিল,—"আঃ বেশ !" বালক ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

বীণা একদৃষ্টে বালকের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। হায় এই দীন মলিন শয্যা, এই জীর্ণ ভগ্ন বাটি—এত কষ্টে ইহারা রহিয়াছে, আর সে এতদিন সোনার পালঙ্কে সুখানুভব করিতেছিল !

দেবনাথ ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "অমর !" সহসা সে বীণাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল ! একি যথার্থই বীণা ! সেই সজ্জিতা, গর্বিতা, সুন্দরী বীণা, আজ তাহার এই দশা ! এই বেশ !

দেবনাথের মনে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। সে বীণার অন্তর নিমেষে বুঝিয়া ফেলিল। আপনার নিষ্ঠুরতা ভাবিয়া সত্যই সে ব্যথিত হইল !

দেবনাথ ডাকিল, "বীণা !"

বীণা থাকিতে পারিল না—ধীরে ধীরে অমরের মস্তক উপাধানে রক্ষা করিয়া, উঠিয়া বীণা স্বামীর চরণে আপনাকে লুণ্ঠিত করিয়া দিল। অশ্রু নয়নপ্রান্ত ছাপাইয়া উঠিল। কম্পিত রুদ্ধ স্বরে বীণা কহিল, মাপ কর আমাকে! হতভাগিনী আমি. তোমার মহত্ত্ব, তোমার মর্যাদা বুঝি নাই! আমার উচিত শাস্তি হয়েছে। আমার সমস্ত দোষ ক্ষমা করে তোমার পায়ে আজ আমায় স্থান দাও! দ

দেবনাথ বীণাকে দুই হাতে উঠাইল; বক্ষে টানিয়া কহিল—"পায়ে কেন, বীণা, তুমি আমার বুকের ধন, বুকে এসো! আমারই অন্যায় হয়েছিল! তুমি অতটা বোঝনি কিন্তু আমার তা বোঝা উচিত ছিল। আমার অত বাগ করাটা ভুল হয়েছিল।"

এমন সময় অমর ডাকিল, "মা!"

"এই যে বাবা আমি!"

দেবনাথ কহিল, "ও তোমাকে চিনেছে?"

বীণা কহিল, "আমি ওর মা। এর অসুখ, তুমি একদিনও ত আমাকে ডাকা প্রয়োজন বোঝনি! তুমি একলা কি কববে। ওব সেবাব ভাব আমাকে দাও! আমি এইখানে থাকবো—এই আমার রাজপ্রাসাদ!"

অপ্রত্যাশিত সুখস্পর্শে বীণার অন্তবখানা আকুল হইযা উঠিযাছিল—তাহার যেন চৈতন্য ছিল না!

দেবনাথ কহিল, বীণা, বাগ কবে আমি কত কষ্ট পেয়েছি তা আমিই জানি। আজ আমার মত সুখী কে? আমাব স্ত্রীকে আজ যথার্থ পবিপূর্ণভাবে আমাব হৃদয়ের মধ্যে লাভ করেছি!"

বীণা স্বামীর বক্ষে শিব লুণ্ঠিত কবিয়া কহিল, "আমাকে তুমি ভালবাসবে?"

বীণার অধরে চুম্বন করিযা দেবনাথ কহিল, "কবে ভালোবাসিনি বীণা—লক্ষ্মী আমার!"

অমর ডাকিল, "কাকাবাবু, মা এসেছে। এবাব আমাব অসুখ সেরে যাবে,—না?"

যতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আত্মোৎসর্গ

বিভার স্বামী বিলাতে সিবিল সার্বিস পাশ করিতে গিয়াছেন। বিভাব সহিত যতীশের যখন বিবাহ হইয়াছিল, তখন তাহাব বয়স বার ছিল, এখন সে সতের বৎসরের হইয়াছে। এই বৎসরেই বিভার স্বামী ফিরিয়া আসিবেন। বিভার পিতা শিবচন্দ্র অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি একদিকে যেমন গভীর বিদ্বান ও তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন, অন্যদিকে তাঁহার স্বভাব তেমনি শান্ত, সেবাপরায়ণ এবং নির্মুক্ত ছিল। কতকগুলি এম এ ক্লাসের ছাত্রকে তিনি সংস্কৃত পড়াইতেন, তাহাতেই তাঁহার সংসার চলিয়া যাইত। জামাতার বিলাত যাইবার প্রস্তাব তাঁহার ভাল লাগে নাই। তিনি বলিতেন, "আমাদের এই দেশের মাটী যেমন, একটুখানি আঁচড় কাটিলেই সোনা ফলে, আমাদের দেশের লোকের মনও তেমনি, এমন নম্রতা ও সহিষ্ণুতা তাহার ভিতর আছে যে সকল প্রকার উৎকৃষ্ট ভাব এবং জ্ঞান তার ভিতরে অতি সহজেই ধরা পড়ে। বিদেশে গেলে, বিশেষতঃ বিলাতে গেলে, আমাদের ছেলেদের মনের সেই গুণটুকু নষ্ট হইযা যায়, কেমন এক প্রকার হৃদয়হীন ঔদাসীন্য ও

অবজ্ঞা লইয়া তাহারা ফিরিয়া আসে।" দেশের উপরে শিবচন্দ্রের গভীর ভক্তি ছিল। অতিথি সৎকার, দরিদ্রসেবায় তিনি তাঁহার গৃহাশ্রম পবিত্র এবং আনন্দময় করিয়া রাখিয়াছিলেন। শিবচন্দ্রের প্রেমময়ী গৃহিণী এ বিষয়ে তাঁহার যথার্থ সহধর্মিণী ছিলেন। প্রতিদিন পুণ্য প্রভাত সময়ে প্রাতঃস্নান করিয়া কৌষেয় বস্ত্র পরিহিত শিবচন্দ্র যখন তাঁহার পূজার ঘরে বসিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বেদপাঠ করিতেন, তখন মনে হইত যেন আবার সেই সুদূর অতীতের দিন ফিরিয়া আসিয়াছে—আর্য ঋষিগণের কণ্ঠ নিঃসৃত বেদমন্ত্রে যেদিন ভারতবর্ষের এই নিস্তব্ধ আকাশ প্লাবিত হইয়াছিল।

শ্বশুরের অনিচ্ছা এবং নানাবিধ বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও যতীশকে কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। সে নিজেদের পুঁজিপাটা যাহা ছিল সব বিক্রয় করিয়া, ধার করিয়া, বিলাতে চলিয়া গেল। তাহার বৃদ্ধ পিতা মাতা সর্বস্বান্ত হইয়া দেশে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। যতীশই তাহাদের একমাত্র সন্তান। তাঁহারা ভাবিলেন যাহাই হোক, যদি ছেলেটি মানুষ হইয়া আসে, তাহা হইলে সব দুঃখ সার্থক হইবে।

পিতৃগৃহের স্নেহছায়ে, শান্তি ও আনন্দে বিভার দিনগুলি কাটিয়া যাইত। বিভা তাহার পিতা মাতার একমাত্র কন্যা ; শিবচন্দ্রের তিন পুত্র, বিভা সকলের ছোট। পিতা মাতা ও ভাইদের নয়নের আনন্দ সে ছিল। শিবচন্দ্র তাহাকে রীতিমত লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি বিভাকে তাহার শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট পাঠাইয়া দিতেন। সেখানেও বিভা যত্ন ও আদর পাইত।

তখন কলিকাতায় খুব স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ উঠিয়াছে। শিবচন্দ্র নিজে চিরকালই "স্বদেশী" ছিলেন ; আন্দোলনের বহুপূর্ব হইতেই তিনি স্বদেশী দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতেন। বিভার দাদা মিটিং করিতে, বয়কট্ করিতে খুব মাতিয়া উঠিল। একদিন বিভার বড়দাদা একখানি বঙ্গজননীর ছবি কিনিয়া আনিয়া, যে ঘরে বিভা ও তার মা শুইতেন সেই ঘরে টাঙ্গাইয়া দিয়া গেল। ছবিখানি অশিক্ষিত হস্তাঙ্কিত হইলেও বিভার মনকে বড়ই স্পর্শ করিল। অন্নপূর্ণারূপে জননী জন্মভূমি অন্ন-বস্ত্র-হস্তে সন্তানদিগকে পরিবেশন করিতেছেন। তাঁহার আপন সন্তানগণ তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহার সেই সস্নেহ দান উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতেছে। দুঃখিনী জননী বিমুখ সন্তানদিগের প্রতি সতৃষ্ণ স্নেহদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন ! বিভা অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই ছবিটি দেখিত—অশ্রুজলে তাহার চোখ ভরিয়া উঠিত।

৩০শে আশ্বিনের পুণ্যদিন আসিল, বিভার মা ঠিক করিলেন সকলে মিলিয়া আজ গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া বাড়ীতে ফলাহার করিবেন। গঙ্গার ঘাটে সেদিন কি দৃশ্য ! দলে দলে বালক, যুবক, বৃদ্ধ নগ্নপদে,—

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান !

এই গান করিতে করিতে চলিয়াছে। গঙ্গাস্নান করিয়া পরস্পর পরস্পরের হস্তে রাখী বাঁধিয়া দিতেছে। বিভার মনে হইল, সেদিন, সেই শুভ্র ঊষার আলোকে, গঙ্গার ঘাটের উপর কিসের যেন একটি আবির্ভাব জলস্থলকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। নব সূর্যের কিরণরাশির ভিতরে তাঁহারা যেন জননীর হাসি দেখিতে পাইয়াছিলেন। মনের ভিতরে একটি অব্যক্ত মধুর ভাব লইয়া তাঁহারা বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

বিভার "স্বদেশী"র দিকে পক্ষপাত দেখিয়া, দুই একটি সমবয়সী বালিকা তাহাকে

বলিয়াছিল, "বিভা, তুমি তো খুব স্বদেশীর ভক্ত হয়ে উঠেছ, কিন্তু তোমার বর সাহেব সেজে বিলাতী বুট পরে এসে যখন দাঁড়াবেন, তখন তোমার এত ব্রত নিয়ম সব কোথায় থাকবে ?" বিভা বলিত "হাজার সাহেব সাজলেও বাঙ্গালীর ছেলে চিরকাল বাঙ্গালীই থাকবে।" সখীরা হাসিয়া বলিত, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে।"

আপাদমস্তক সাহেব সাজিয়া, সাহেবী কেতায় নির্দোষরূপে জ্ঞানলাভ করিয়া, যতীশচন্দ্র সিবিলিয়ান হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই বিভাকে লইয়া নিজের কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময়, বিলাতী দোকান হইতে অসংখ্য বিলাতী ব্যবহার্য দ্রব্য কিনিয়া লইলেন। রাঁধিবার সরঞ্জাম পর্যন্ত খাস বিলাতী হইল। বিভা মৃদুস্বরে একবার বলিল "এত বিলাতী জিনিস কেন কিনিতেছ, এসব জিনিসই ত দেশী পাওয়া যায়, আমার বাবা একটিও বিলাতী জিনিস কেনেন না।" যতীশচন্দ্র মুখ হইতে চুরুট না খুলিয়াই অত্যন্ত অবজ্ঞার স্বরে বলিলেন "রামঃ, দেশী জিনিস আবার মানুষে কেনে !" উত্তর শুনিয়া বিভা চুপ করিয়া গেল।

সিরাজপুরে আসিয়া, সাহেব মহলে এক প্রকাণ্ড বাংলা বাড়ীতে বিভা নির্বাসিত হইল। তাহার শ্বশুর শাশুড়ীকে আনাইবার জন্য অনুরোধ করিল, যতীশ তাহা উড়াইয়া দিল। পুত্রেব প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহারা নিজে আসিয়া একবার পুত্রকে দেখিয়া আবার দেশে ফিরিয়া গেলেন। সিবিলিয়ান পুত্রের নিকট হইতে মাসে মাসে কিছু টাকা এবার তাঁহারা বহুপুণ্যের ফল স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন ! বিভা বেশ বুঝিয়াছিল, তাঁহারাও এখানে টেঁকিতে পারিবেন না। এই মুর্গি, মাংস, অনাচার—তাহার ভিতরে তাঁহারা কি করিয়া থাকিবেন ? তাহাব নিজেব সমস্ত অন্তরাত্মা এই অনাচার, বিলাসিতা, ধর্মহীনতায় বিমুখ হইয়া উঠিত, কিন্তু তবু সে কিছুই বলিতে পারিত না। যতীশ চিরকালই ক্ষমতাপ্রিয় ছিল, আজ কাল সিবিলিয়ান হইয়া সে আরও হৃদয়হীন হইয়া পড়িয়াছে। বিভা স্বামীকে নীরবে ভয় কবিয়া চলিত। তাহার মা তাহার সঙ্গে কিছু বাসন ও দেশী ব্যবহারের জিনিস দিয়াছিলেন, বিভা গোপনে সেইগুলি ব্যবহার করিত। একবার যতীশ বিভাকে দেশী মোটা ফিতায় চুল বাঁধিতে দেখিয়া, টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, ও দোকান হইতে সিল্কের ফিতা আনাইয়া দিযাছিল। বিভা সেইদিন হইতে ফিতা দিয়া চুল বাঁধা পরিত্যাগ করিল।

নির্জন মাঠের মাঝখানে, বাংলা বাড়ীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘরে, কি জানি কেন, বিভার দিন আর কাটিত না। অথচ, কি যে তাহার অভাব, কি যে দুঃখ, তাহা সে বলিতে পারিত না। যতীশ স্থানীয় বাঙ্গালীদের সহিত কখনও মিশিত না। সেজন্য বিভারও প্রতিবেশীদিগের সহিত বিশেষ পরিচয় হয় নাই। সে রোজ সন্ধ্যার সময়, ফিটানে করিয়া যতীশের সঙ্গে হাওয়া খাইতে যাইত। আজ এখানে পার্টি কাল ওখানে পার্টি, পোষাক পরিচ্ছদ, আমোদ প্রমোদের অন্ত ছিল না। কিন্তু বিভার এসব ভাল লাগিত না। যতীশ যখন কাছারীতে চলিয়া যাইত সে আপনার শুইবার ঘরের জানালাটিতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। সম্মুখে দিগন্ত বিলীন, তৃণহীন মাঠ পড়িয়া আছে। সেই জনশূন্য দ্বিপ্রহরে, মাঠের দিকে তাকাইয়া, বিভা তাহার আজন্ম পরিচিত স্নেহময় পিতৃগৃহের কথা মনে করিত। মায়ের অক্লান্ত সেবানিষ্ঠা তাহার মনে পডিত। পিতার সেই পূজার ঘরটি সে নিজে স্বহস্তে মুছিয়া পরিষ্কার করিত। ঘরের দেওয়ালের সেই মাতৃভূমির ছবিখানির কথাও সে বার বার মনে করিত। সেই ছবির নিচে দাঁড়াইয়া, এক পুণ্য প্রভাতে সে সজল নয়নে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহার এই ক্ষুদ্র জীবনে সে জননীর দুঃখ দূর করিবে। কিন্তু কোথায় আজ সে প্রতিজ্ঞা, প্রবল সভ্যতার স্রোতে তাহার স্বামী ভাসিয়া চলিয়াছে, কে তাহাকে জননীর দুঃখের কথা বলিয়া তাহার

কাজে টানিয়া আনিবে ? হায়, বিভার যদি সেইটুকু সাধ্য থাকিত !

পূজার সময় আসিয়াছে—বিভার মা প্রবাসী কন্যার জন্য পূজার কাপড় ও অন্যান্য উপহার পাঠাইয়া দিয়াছেন। সেদিন সান্ধ্য ভ্রমণের সময় বিভা তাহার মাতৃদত্ত নূতন কাপড়খানি পরিয়াছিল। যতীশ গাড়ীতে উঠিয়াই বিভাকে বলিল, "এ কি কাপড় পরেছ ? সিল্কের কাপড় পর নাই কেন ? আবার কি একটা ছাই এসেন্স মেখেছ, দেখি ?" বিভা কম্পিতকণ্ঠে বলিল "মা আমার জন্য এই কাপড় পাঠাইয়া দিয়াছেন, কাপড়ের সঙ্গে এক শিশি দেলখোস দিয়াছিলেন, তাহাই একটু রুমালে মাখিয়াছি।" যতীশ বলিল "এ সমস্ত জঘন্য জিনিসগুলো তুমি কেন ব্যবহার কর, আমি বিলাতী ছাড়া অন্য কোন এসেন্স ছুঁই না।" বিভা একবার তর্কের ছলে বলিল "আমার কিন্তু বিলাতী এসেন্সের গন্ধ ভাল লাগে না।" কিন্তু যতীশের সঙ্গে তর্ক করা সহজ নয়, সে চুপ করিয়া গেল।

আবার ৩০শে আশ্বিন ফিরিয়া আসিল। বিভা নিরাশহৃদয়ে ভাবিল, আজিকার দিনটা বৃথাই যাইবে, যতীশ এসব নিশ্চয়ই nonsense বলিয়া উড়াইয়া দিবে। সকাল হইতে বিভা দেখিল এখানেও দলে দলে ছেলে গান করিতে করিতে চলিয়াছে। কতকগুলি বালক বিভার বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া গান করিতে লাগিল, যতীশ তখন চা খাইয়া বাহিরে গিয়াছে। তাহাদের মধ্য হইতে সকলের চেয়ে ছোট একটি বালক বাড়ীতে ঢুকিয়া, বিভাকে প্রণাম করিয়া বলিল "মা, আজ ৩০শে আশ্বিন, আজ আমাদের মায়ের অনুরোধ, আপনারা অনুগ্রহ করে আজ চুল্লি জ্বালাইবেন না, আজ বাঙ্গালী মাত্রেই ফলাহার করিয়া থাকিবেন।" বিভার দুই চোখে জল আসিল, কি করিয়া ইহাদের জানাইবে, সেও ইহাদের মতই স্বদেশী, এখানে সে বিদেশীর মত আছে বটে, কিন্তু তার বাপের বাড়ীতে সে কত স্বদেশীর অনুরক্ত ছিল। কিছু না বলিয়া পাঁচটি টাকা লইয়া বিভা সেই বালকের হাতে দিয়া বলিল "তোমাদের এখানকার স্বদেশী সমিতিতে এই টাকা দিলাম কিন্তু আমার নাম তোমরা কাহাকেও জানাইও না, এই অনুরোধ।" সম্মত হইয়া বালকেরা ফিরিয়া গেল। বালকদের নিকট হইতে কিছু রাখী চাহিয়া বিভা কলিকাতায় দাদাদের পাঠাইয়া দিল। নিরানন্দ গৃহে ৩০শে আশ্বিনের পুণ্য দিন, আসিল, চলিয়া গেল।

রাত্রে সেদিন বাতাস বন্ধ হইয়া বড় গরম পড়িয়াছিল। তাহার উপরে পাখাটানা কুলিটা ক্রমাগত ঢুলিতেছে। নিদ্রার ব্যাঘাতে বার বার কুলিটাকে ধমক দিয়া উঠাইয়া দিতেছে। অবশেষে এক সময়ে থাকিতে না পারিয়া উঠিয়া গিয়া প্রহারের চোটে কুলিটাকে বারান্দার উপর হইতে নিচে উঠানে ফেলিয়া দিল। পাথর দিয়া কপাল কাটিয়া যাওয়াতে ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। আপনার মলিন বসনে রক্ত মুছিয়া লইয়া, নিরীহ কুলি আবার আসিয়া পাখা টানিতে লাগিল। এই সমস্ত প্রহার বিভার আপনার অঙ্গে যেন বাজিল। বিনিদ্র নয়নে, নিস্তব্ধ হইয়া সে বিছানায় পড়িয়া রহিল। অবশেষে যখন দেখিল যতীশ বেশ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তখন সে নিঃশব্দে উঠিয়া জানালার কাছে বসিল। দিগন্ত প্রসারিত মাঠ, ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে প্লাবিত হইয়াছে। দূরে দূরে দুই একটি গাছ নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, নৈশ বায়ু পাতার ভিতর দিয়া সর্ সর্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। নিকটবর্তী একটি বাড়ীতে ছেলেরা গান করিতেছিল। বিভা শুনিতে পাইল বালকের কণ্ঠে কে গাহিতেছে

কে এসে যায় ফিরে ফিরে, আকুল নয়ননীরে
কে বৃথা আশা ভরে, চাহিছ মুখ 'পরে
সে যে আমার জননীরে !

বিভার দুই চক্ষু দিয়া রুদ্ধ অশ্রু ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। তাহার মনে হইল যেন ঐ

জ্যোৎস্না প্লাবিত মাঠের মাঝখান দিয়া অপমানিতা, পরিত্যক্তা, জননী একাকিনী সন্তানদিগের নিকট হইতে ফিরিয়া যাইতেছেন। যেন মনে হইল নৈশ বায়ু তাঁহার আলুলায়িত কেশপাশ, শুভ্র অঞ্চলপ্রান্ত উড়াইয়া দিতেছে! হায়, জননী, যাইও না। অবোধ সন্তানকে ক্ষমা করিয়া একবার ফিরিয়া এস!

সেই দিন হইতে বিভার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইতে লাগিল। পিতা তাহার অসুস্থতার কথা শুনিয়া তাহাকে নিজের কাছে লইয়া আসিলেন। এক বৎসর পরে বিভা বাড়ী আসিয়াছে, কিন্তু সে বিভা আর নাই। মা তাহাকে বলিলেন "বিভা, তুই এত রোগা হয়ে গিয়েছিস।" বিভা বলিল "কি জানি মা, সিরাজপুরের জল হাওয়া বোধ হয় আমার সহ্য হ'ল না।" বাড়ী আসিবার আনন্দে বিভা দুদিন স্ফূর্তিতে বেড়াইল, কিন্তু ক্রমে সে শয্যা লইল। ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন রোগ আরোগ্য হইবার নহে।

রুগ্ন-শয্যায় শুইয়া বিভা কত কি যে ভাবিত তাহার শেষ নাই। দাদারা এক এক দিন আসিয়া তাহাকে এক একটি খবর দিয়া যাইত। কোন দিন আসিয়া বলিত, অমুকের বিনা দোষে জেল হইল। কোন দিন বলিত, ভয়ানক দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে, কত লোক যে না খাইয়া মরিতেছে, তাহার হিসাব নাই। শুনিয়া বিভা শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত। স্বদেশের দুঃখে তাহার সমস্ত হৃদয় গলিয়া যাইত।

একদিন বিভা দেখিল, তাহার দাদারা তাড়াতাড়ি জল খাইয়া কোথায় যাইতেছে—উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "দাদা, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?" তাহারা উত্তর করিল "কি হয়েছে শুনিস্‌নি? কাল সন্ধ্যায় গোলদিঘিতে পুলিশের সঙ্গে ছেলেদের ভয়ানক মারামারি হয়ে গেছে। একটা বুড়ি সেই ভীড়ের মাঝখান দিয়া যাইতেছিল, পুলিশের অধ্যক্ষ সাহেব তাহাকে ইচ্ছা করিয়া ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয়, কাছে দুটি ছেলে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা বুড়িকে বাঁচাইতে যায়। তাতে তাদের সঙ্গে সাহেবের মারামারি হয়। ছেলে দুটিকে হাজতে লইয়া গিয়াছে—আজ তাদের বিচার হবে।" দুই তিন দিন যাতায়াত করিয়া একদিন ম্লান মুখে তাহার দাদারা ফিরিয়া আসিল। বিভা জিজ্ঞাসা করিল, "কি দাদা, কি হইল?" তাহারা বলিল, "তাদের দু'জনেরই জেল হয়েছে, ১০০্ টাকা করে জরিমানা দিতে হবে, তা না দিলে এক মাস করে জেল।" বিভা জিজ্ঞাসা করিল "দাদা তারা কি ১০০্ টাকা জোগাড় করতে পারবে না?" তাহারা বলিল "সম্ভব নয়, তাদের দুজনের অবস্থাই অত্যন্ত খারাপ।" বিভার মেজদাদা বলিল "বাবাকে বলিলে তিনি এখনই তার যা আছে সব দিয়া দিবেন, কিন্তু তার পবে তিনি বড় কষ্টে পড়িবেন, সেইজন্য তাঁকে বলি নাই। তিনি ত কখনও ধার করিবেন না।" দাদারা আবাব বাহির হইয়া যাইতেছিল, বিভা তাহাদের ডাকিল, বলিল "দাদা, শোন, আমার একটি মুক্তার নেক্‌লেস্ আছে তার দাম প্রায় ২৫০্ টাকা। সেই নেক্‌লেস্‌টি বিক্রয় করে তুমি এদের খালাস করে আন।" বোনের কথা শুনিয়া তাহাদের চোখে জল আসিল—কিন্তু তাহারা বলিল "না, বিভা, যতীশবাবু টের পাইলে তুই মুস্কিলে পড়িবি।" বিভা বলিল, "না, না, তিনি জানিবেন না।" সজল নয়নে, রুগ্ন বিভা এত অনুরোধ করিতে লাগিল যে শুধু তাহাকে সুখী করিবার জন্যই দাদারা নেক্‌লেস্‌টি লইতে রাজি হইল।

অনেকদিন পরে সে রাত্রে বিভা ঘুমাইয়াছিল। কিন্তু তার পরদিন হইতে তাহার জীবনের আর কোন আশাই রহিল না। কাশিতে কাশিতে একবার কতকটা রক্ত উঠিল, তাহাতেই নাড়ী বসিয়া গেল। পিতা মাতা, ভায়েরা বিভার সেই শীর্ণ সুন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিলেন। কি একটি অপার্থিব শান্তি তাহার মুখের উপরে বিরাজ করিতেছিল।

একবার তাহার মা শুনিতে পাইলেন অস্ফুটস্বরে সে কি বলিতেছে, কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া শুনিলেন ক্ষীণস্বরে বলিতেছে, "আহা, আর মের' না মের' না, মরে যাবে।" আর একবার ভাঙা গলায় অস্ফুট স্বরে বলিল,—

"সে দিন প্রভাতে নূতন তপন
নূতন জীবন করিবে বপন
এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন
আসিবে সে দিন আসিবে।"

সেইদিনই বিভার আত্মা, এই ভগ্ন-শরীর-পিঞ্জর ছাড়িয়া দিব্যধামে উড়িয়া গেল। ঠিক সেই সময়ে কতকগুলি ছেলে গান করিতে করিতে বিভাদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই জেল-মুক্ত ছেলে দুটি বিভাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে আসিয়াছিল। বিভার দাদা তাহাদের বিভাকে দেখিবার জন্য উপরে ডাকিয়া আনিল। অসীম শান্তির কোলে বিভা যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মাতৃরূপের অনন্ত অমর সৌন্দর্য তাহার সেই মৃতমুখও অপরূপ শোভায় মণ্ডিত করিয়াছে। স্তম্ভিত হৃদয়ে, ভক্তিপূর্ণ নয়নে তাহারা দেখিতে লাগিল ; একবারও তাহাদের মনে হইল না যে তাহারা মৃতের নিকট দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের মনে হইল যেন এই দেবীমূর্তি বিধাতার হস্ত হইতে এখনই রচিত হইয়া আসিল, স্বর্গের নিশ্বাস পাইলে এখনই বুঝি জাগিয়া উঠিবে। ধীরে ধীরে তাহারা বিভার পদধূলি মস্তকে তুলিয়া লইল এবং অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে গান করিতে করিতে ফিরিয়া গেল।

মা গো যায় যেন জীবন চলে
জগত মাঝে তোমার কাজে বন্দেমাতরম্ বলে।

যতীশচন্দ্র খবর পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। ছুটির অভাবে তিনি বিভাকে দেখিতে যাইতে পারেন নাই। মনের শূন্যতা দূর করিবার জন্য তিনি শীঘ্রই একটি বিলাত ফেরতের কন্যা বিবাহ করিয়া আনিলেন।

সুশীলা সেন

তিরস্কার, না পুরস্কার ?

১

চপলা রেখার ন্যায় ধরণীবক্ষে সঙ্কীর্ণ জলোচ্ছ্বাস উপলরাশি ও শিলাখণ্ড বিক্ষিপ্ত করিয়া দুষ্ট মেয়েটির মত ছুটিয়াছে। দূরে বন্ধুর গিরিশ্রেণী। নদীরেখার উভয় পার্শ্বে প্রকৃতির অসঙ্কোচ স্বাধীনতা. অসংযত শৈল প্রদেশ—উদার উচ্ছৃংখল উল্লাস মূর্তি—শোভা সৌন্দর্যের অনন্ত ভাণ্ডার। উচ্চ উচ্চ বৃক্ষশ্রেণী শোভাময়, কোথায় বা বনরাজি গভীর সুদূর গিরিগাত্রে পুষ্প মালিকা বিছাইয়া রাখিয়াছে। জঙ্গলের ধারে, স্তব্ধতার নিরালা গৃহে নির্ঝর কণিকা রবিকরে ক্রীড়া করিয়া উঠিতেছে।

প্রকৃতির এই নগ্ন সৌন্দর্যের মধ্যে গিরিপ্রান্তবর্তী ক্রমনিম্ন স্থান, যাহা ধরণীর বক্ষে হেলিয়া আছে, তদুপরিস্থিত এক বিস্তৃত উদ্যান মধ্যে, ও সেই ছোট নদীর পার্শ্বে আমাদের বাংলোখানির উপর হিমশীর্ণ প্রভাতের প্রথম রশ্মিপাত আসিয়া পড়িত। পাটল গগনে

সুদূরস্থিত বিস্তৃত গিরিমালার ধূসর রেখাপাতে অনন্তের সীমানা নির্দেশ করিয়া দেয়।
এই স্থান হইতে রাঁচি সহর সাত মাইল। মধ্যে শুষ্ক প্রস্তর। নিম্নস্থানবর্তী দু'দশ খণ্ড শস্যক্ষেত্রের উপর মধ্যাহ্ন আতপে কৃষক হলচালন করিত। ইহাদিগের জীর্ণ-ভগ্ন-কুটির, স্থানে স্থানে দেখা যায়। আমাদের উদ্যান পার্শ্ববর্তী ধূলিপূর্ণ পথটি অসমতল প্রান্তরের উপর দিয়া সহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আমার পিতা এই স্থানের ডিস্ট্রীক্ট অফিসর ছিলেন।
কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ নাসারী হইতে আনীত ফার্নগুলি কাষ্ঠের ফ্রেম নির্মিত বৃক্ষবাটিকায় রক্ষিত ছিল। ইহার ছাদে গুচ্ছবদ্ধ বিগ্‌নোনিয়া লতিকা ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত, ও ফ্রেম অবলম্বনে উত্থিত মর্নিংগ্লোরি আমার কেশ সংস্পর্শ করিয়া দুলিত, যখন আমি উহার পার্শ্ব দিয়া ভ্রমণ করিতাম। ফাল্গুনে শ্বেত পুষ্প রাশি বিছাইয়া যখন বিউমণ্টিয়া স্নিগ্ধ মুগ্ধ সৌরভে দিক্ আমোদিত করিয়া তুলিত, কৌমুদীস্নাত প্রকৃতির মধ্যে ইহার পার্শ্বে আমরা পিতা মাতা ও পুত্রীতে বসিয়া কত কর্মহীন সন্ধ্যায় আনন্দে অবসর ক্ষেপণ করিতাম।
এই উদ্যান ভাণ্ডারে আমার আর কয়টি প্রিয় সামগ্রী ছিল ; তাহা ক্রাইসান্তিমাম ও অরকীড্। আমাদের বাংলোখানি উদ্যানের ঠিক মধ্যস্থলে। ইহার নিম্ন হইতে কার্নিশ পর্যন্ত ক্রিপারএ আচ্ছাদিত থাকিত। প্রবেশ পথের সম্মুখে লতাগুল্মাদি আচ্ছাদিত আর একটি ফার্ন হাউস, ইহার চারিপার্শ্বে পামতরু মৃত্তিকা নির্মিত টবে রোপিত হইয়াছিল।

২

শীতেব প্রভাতে সে দিন উদ্যান পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছি। উদ্যানের এক সীমায় অনেকগুলি লতা স্থানচ্যুত হইয়া লৌহতার বেষ্টনের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে, ইহা মালীকে দেখাইয়া ভর্ৎসনা করিতেছি ; এমন সময় আমার কর্ণে একটি ছোট 'মা' শব্দ আসিয়া পৌঁছিল। আমি মালীর মুখের প্রতি চাহিলাম, সে অবাক হইয়া দেখিতেছিল। সেই 'মা' শব্দ আধ বিজড়িত শিশুকণ্ঠের মত। চারিদিকে দৃষ্টি করিলাম, কেহ কোথাও নাই। আমি সেই পতিত লতাগুলির নিকটে দাঁড়াইয়াছিলাম ; হঠাৎ আমার পরিধেয় বস্ত্রাগ্রভাগ কে আকর্ষণ করিল। নিম্নে চাহিয়া দেখি, আমার চরণ প্রান্তে, আমারই মুখের প্রতি চাহিয়া, একটি সুন্দর সরল শিশু আধ আধ স্বরে ডাকিতেছে 'মা-মা'।
আমার তখন সতের বৎসর বয়স। শত শত আকাঙ্ক্ষা পরিপূরিত অবরুদ্ধ হৃদয়দ্বারে সে বাণী আসিয়া আঘাত করিল। ক্ষুব্ধ, ক্ষুধিতচিত্ত আকুল হইয়া উঠিল। পিতামাতার স্নেহ-বক্ষে লালিতা হইয়া সংসারের স্নেহমমতার মধ্যে আমি অদম্য স্বাধীনতায় বিচরণ করিতাম। আমি হতভাগিনী, বালিকা বয়সেই বিধবা হইয়াছি। কিন্তু নারীজীবনের দায়িত্ব ও পবিত্রতার সহিত ইহা ত একপ্রকার ভুলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু পলে পলে, দিনে দিনে অলক্ষ্যে যে স্নেহ-নির্ঝরহৃদয় অন্তঃপুরে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, যাহা এতদিন অবরুদ্ধ ছিল, আজ এই কোমল আঘাতে—শিশুর মাতৃসম্বোধনে—তাহা মত্ত উচ্ছ্বাসে বাহির হইয়া পড়িল। আমি স্নেহবিচলিত চিত্তে শিশুকে বক্ষের উপর তুলিয়া লইলাম।
শীতবস্ত্রের মধ্যে থাকিয়াও আমার বক্ষের উপর শিশু কাঁপিতেছিল। হঠাৎ মনে হইল এই অসহনীয় সারা হিমানী নিশায় হয়ত বালক লতাগুলির মধ্যে পড়িয়াছিল। তখনই দ্রুত রুদ্ধনিশ্বাসে নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দাসীকে অগ্নিকটাহ লইয়া আসিতে কহিলাম। যখন শিশু অগ্নির উত্তাপে একটু সহজ স্বচ্ছন্দ অবস্থাপন্ন হইল, তখন তাহাকে দুগ্ধ গরম করিয়া পান করাইব, এমন সময় মা আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। শিশুকে

কিরূপে দুগ্ধ পান করাইতে হয় তাহাতে আমি অনভ্যস্ত, এই সময় মাতা এ কার্যে সাহায্য করিলেন। যখন শিশু একটু বল পাইল, তখন তাহার সরল কৌতুকময় উচ্চ হাস্যে সে কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল ; ইহাতে আমি কত পুলকিতা মাতা তাহাই দেখিতেছিলেন। তিনি কৌতূহলচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"নীলিমা ! তুই এ ছেলেটি কোথায় পাইলি ?"

তাহাকে সকল ঘটনা সবিস্তারে কহিয়া, বড় জোর করিয়া বলিলাম—

"মা এ শিশু যাহারই হউক, আমি আর ইহাকে ছাড়িয়া দিব না।"

৩

যখন দিনুয়া তাহার পর দিবস সহর হইতে এই শিশুর জন্য গরম বস্ত্রের পিনো, ফ্রক, ফিডিংবট্‌ল প্রভৃতি নানা বালকোপযোগী দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিল, তখন সে আমাদিগকে এক অদ্ভুত ঘটনার কথা শুনাইল। দিনুয়া বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য। সে কহিল সহরের কোন এক উকিলের বালকভৃত্য তাহার দেড় বছর বয়সের শিশুপুত্রকে বালকদিগের শকটে তুলিয়া বায়ুসেবন করাইতেছিল ও সহর ছাড়িয়া যে পথ আমাদের উদ্যানাভিমুখে আসিয়াছে, সেই পথে আসিতেছিল। ভিন্ন দিক হইতে একটা বুনো মহিষ পাগলা হইয়া ছুটিয়া আইসে। বালকভৃত্য তাহা দেখিয়া বোধ হয় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। মহিষটা ভৃত্যের উপর আসিয়া পড়িলে তাহাকে শৃঙ্গে বিদ্ধ করিয়া সহরের দিকে ধাবিত হয। একজন পুলিশ ভৃত্যের শবদেহ উদ্ধার করে ও মহিষটি পরে ধরা পড়ে। আমাদের উদ্যান হইতে কিছু দূরে একটা জঙ্গলের মধ্যে ভগ্ন শকটখানি ও শিশুর পিণ্ডাকার মৃতদেহ পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছে ও শিশুর অভিভাবকগণের সনাক্তগ্রহণ করিয়াছে। ধন্য পুলিশ প্রভু !

ঘটনা বৈচিত্র্যে শিশু যে উপায়ে রক্ষা পায়, তাহা আমাদের ধারণায় বোধ হয় যে, মহিষের গাত্রস্পর্শে শিশু সহিত শকটখানি উদ্যানের যে অংশে তাহাকে পাওয়া যায়, তাহার সান্নিধ্যে পতিত হয়। শিশু মোটা গাত্রাবরণে আবৃত ছিল, পড়িয়া যাইবার পর বড় আঘাত পায় নাই। পরে হামা টানিয়া লৌহতারের ভিতরে আসিয়া পতিত লতাশয্যায় অবস্থান করিয়াছিল। কোন কৃষক বালক বোধহয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই শকটখানি লোক সমাগমবিহীন জঙ্গলের মধ্যে লইয়া গিয়া থাকিবে ও কোন বন্য পশুর অর্দ্ধভুক্ত কলেবর বালকের মৃতদেহ অনুমান করিয়া পুলিশ রিপোর্ট পাঠায়।

চেষ্টা করিলে শিশুর পিতার সন্ধান পাওয়া যাইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তৃষিতচিত্ত আমার, শিশুর মাতৃসম্বোধনে আত্মহারা করিয়া দিয়াছিল। শিশুকে বক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইতে যাইলে জননী যেমন অপহারকের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া থাকে, আমি যেন সেই উত্তেজনায় আমার পিতামাতার সকল অনুরোধ ব্যর্থ করিয়া দিলাম।

প্রথম প্রথম বাবা আমার প্রতি কিছু বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অচিরে শিশু তাঁহাকে বশীভূত করিয়া লইল। ছোট দুটি রক্তফুল্ল অধরে, বিজড়িত অথচ সুধাময়, আধ আধ অপরিস্ফুট স্বরে যখন তাঁহাকে 'তা—তা' বলিয়া ডাকিতে শিখিল, তখন আমার পিতা তাঁহার আনন্দ রাখিবার স্থান পাইতেন না। এইরূপে শিশু আমার ক্রোড়ে বর্ধিত হইতে লাগিল।

৪

অনির্দিষ্ট উত্তেজনার মধ্যে যে জীবনস্রোত বহিয়া যাইতেছিল, একটি সরল শিশুর মোহ আকর্ষণে জীবনের নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিয়া দিল। অনায়াসলব্ধ মুহূর্ত এই দেবতার দান মিলাইয়া দিয়া যে পবিত্র স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে তাহাতে আমি বিহ্বল। অপরাহ্নের রক্তিম গগনে, সূর্যাস্ত মিশিয়া যাইত, তখন শিশুকে নিত্য বায়ুসেবনার্থ একখানি পারাম্বুলেটারে তুলিয়া চুন্নি দাসী পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। আমি তাহার পার্শ্বে ভ্রমণ করিতাম।

শিশুর জন্য আমি স্বহস্তে নিকার, পিনাফোর, উলের মোজা, ক্যাপ. প্রভৃতি প্রস্তুত করিতাম। ইহাতে আমার অত্যধিক উৎসাহ দেখিয়া আমার পিতামাতা বিস্মিত হইতেন। আমার পর্য্যঙ্কপার্শ্বে বেবি-খাটে শিশু শয়ন করিত। উন্মুক্ত বাতায়নপথে জ্যোৎস্নার বিমল কিরণসম্পাতে নিদ্রামগ্ন শিশুর অধরকোণে মৃদুহাস্য রেখা অঙ্কিত দেখিতাম, তাহা আমার সুপ্তির মধ্যেও স্বপ্ন বিস্তার করিয়া রাখিত।

৫

সারদাবাবু আমার পিতার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁহার পৌত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে পুরুলিয়াতে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। পিতা একটু অসুস্থ ছিলেন বলিয়া যাইতে পারেন নাই। পরদিন ফিরিতে হইবে, অতএব প্রভাতে সারদাবাবুর বাটী পৌঁছিয়া চারি ঘণ্টার বেশী আমাদের তথায় অবস্থান করা হয় নাই। সারদাবাবু অতিশয় ভদ্রলোক, তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর সাদর সম্ভাষণে ও আতিথ্য যত্নে মাতা ও আমি বিব্রত হইয়া পড়ি। কিন্তু একজন অপরিচিত সম্ভ্রান্ত পুরুষ আমাদিগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। যথায় চুন্নি শিশুকে লইয়া পরিভ্রমণ করিতেছিল, সেই ভদ্রলোকটি তাহাদের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিতেছিলেন, আমার তাহা মোটেই ভাল লাগে নাই। লোকটিকে দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হই। তাঁহার বয়স অন্যূন ত্রিশ বৎসর, অনিন্দ্য সুন্দর সুগঠিত মূর্তি। মুখাবয়ব. তাহা চুপি চুপি মনের ভিতর যেন শিশুর সাদৃশ্য অনুভব করিয়া শিহরিয়া উঠি।

নববাসন্তী সন্ধ্যার আবিল জ্যোৎস্না মুক্ত পরিচিত প্রান্তরের উপর সবে ভাসিয়া উঠিয়াছে, আমরা তখন রাঁচি সহর পশ্চাতে বাখিয়া বাংলো অভিমুখে চলিয়াছি। পশ্চাতে ঘণ্টাধ্বনির মত শব্দ বাজিল। তখন কৌতূহল চিত্তে মুখ বাহির করিয়া দেখি. ভদ্রবেশধারী কোন লোক সাইকেলে ছুটিয়া আসিতেছে।

পরদিন শয্যা হইতে উঠিতে একটু বিলম্ব হয়। চুন্নি শিশুকে লইয়া প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়া গিয়াছে। আমি দ্রুত বেশ পরিবর্তনান্তর ভ্রমণে বাহির হইলাম। বালক শকট হইতে অবতরণ করিয়া তৃণাচ্ছাদিত ভূমির উপর দ্রুত ছুটিতেছিল, আমাকে দেখিতে পাইয়া শিশু আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। চুন্নি দাসীর মুখে শুনিলাম আজ প্রাতে বাবার নিকট একজন অপরিচিত লোক আসিয়াছেন। স্নিগ্ধ উদার বায়ু তখন মনের ভিতর পুলক সঞ্চার করিতেছিল, এই সংবাদে কি জানি কেন একটা অবসাদের ছায়া আসিয়া পড়িল।

উদ্যানের ব্যাস দেড় মাইল হইবে। মনের আবেগ তখনও পরিষ্কার হয় নাই। চারিদিক পরিভ্রমণ করিয়া ফার্নহাউসের সম্মুখে আসিয়া সবিস্ময়ে দেখি আমার পিতা এক অপরিচিত যুবকের হস্তধারণ করিয়া, যে লতিকার শাখাটি নিম্নে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, তাহা তুলিয়া

দিতেছেন। ইঁহাকে যে পুরুলিয়ায় দেখিয়াছি, তাহা উপলব্ধি করিতে আমার বিলম্ব হইল না। তাঁহারা হাস্যালাপে মত্ত ছিলেন, ইঁহার সম্মুখে পিতার নিকট অগ্রসর হইতে না পারিয়া, আমি অতি সন্তর্পণে তরু অন্তরালে সরিয়া পড়িলাম। পিতার স্নেহ আহ্বান একবার যেন কর্ণে প্রবেশ করিল।

শিশুর শকট লইয়া চুন্নি আমার পশ্চাৎ আসিতেছিল। একস্থানে দাঁড়াইয়া দূর হইতে দেখি, অপরিচিত ব্যক্তি আমার শিশুকে বক্ষের উপর তুলিয়া লইয়া অসংখ্য স্নেহচুম্বন করিতেছেন।

৬

মাতৃকক্ষে আসিয়া একখানি সোফায় বসিয়া পড়িলাম, কপোলদ্বয় যন্ত্রণায় টিপ্‌টিপ্ করিতেছিল। মাতা শিশি হইতে একটু কুন্তলীন হস্তের উপর ঢালিয়া আমার কপোলে ও শিরে মাখাইয়া দিলেন। অশান্তিময় আশঙ্কা ও উদ্বেগকম্পিত হিয়া চাপিয়া ধরিয়া মাতৃমুখে শুনিলাম, এই নবাগত ব্যক্তি শিশুর জনক। শুনিলাম, শিশুর ঘটনা বৈচিত্র্যময় কাহিনীর আমূল বিবরণ জ্ঞাপন করিয়া পিতার সরল ক্ষমা প্রার্থনা তাঁহার কৃতজ্ঞতা আনয়ন করিয়াছে। তাহাতে আমার কি আসিয়া যায়। স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে মাতা অনেক বুঝাইবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু শিশুকে আমি কেমন করিয়া অর্পণ করিব ? যে গ্রন্থি হৃদয়ের পরতে পরতে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে ; যে সুখ, আদর্শ ও তৃপ্তি এই বৎসরেককাল ধরিয়া মোহ বিস্তার করিয়া দিয়াছে, তাহার উচ্ছেদ সাধন যে আত্মবিসর্জনের তুল্য। আমি মাতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া অনেক রোদন করিলাম।

শুনিলাম তিনি আহারাদির পর আমার বক্ষ হইতে শিশুকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া যাইবেন। আমি শয্যায় গিয়া আশ্রয় লইলাম। সেদিন আমার হৃদয়মধ্যে অশ্রুস্রোত বাধা মানিতেছিল না। এই কক্ষে শিশুর সেই কলহাস্য আর বাজিবে না—হৃদয়মধ্যে তাহার প্রতিধ্বনির লহর আর উঠিবে না ! শিশুর দুটি ক্ষুদ্র বাহুর আলিঙ্গন যে আর আমায় আকুল করিবে না ; হায় ! স্নেহের স্মৃতিগুলি আসিয়া যখন আমায় দংশন করিবে, আমার শূন্য বক্ষের হাহাকার শুনিয়া তখন শিহরিব।

শিশুকে একবার বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া চুন্নির ক্রোড়ে দিয়া অবধি শয্যা হইতে আব উঠি নাই। জননীর সকল সান্ত্বনা ভাসিয়া গিয়াছে ; পিতা আমার কাতর বিলাপ দেখিয়া চক্ষে রুমাল প্রদান করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। শিশু দুইবার ছুটিয়া আসিয়া আমার বক্ষের উপর তাহার বিহ্বল স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়াছে। বিদায়ের শেষ মুহূর্ত বুঝি নিকটবর্তী ; বক্ষের সন্তাপ দারুণ যাতনায় ছটফট করিয়া উঠিতেছে। প্রতি পলে অনুভব হয় গাড়ীর দ্রুত ধাবন শব্দ আমার হৃদয়কে এখনই বিচূর্ণ করিয়া চলিয়া যাইবে।

এমন সময় রুদ্ধকক্ষ উন্মুক্ত করিয়া পিতা বলিলেন "নীলিমা ! তুমি এরূপ কাতর হইয়াছ শুনিয়া তিনি তোমার হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া শিশুকে লইয়া যাইবেন না।"

তিনি শিশুকে তোমায় প্রদান করিলেন, উহাকে বক্ষে তুলিয়া লও। মধ্যে মধ্যে আসিয়া কেবল শিশুকে দেখিয়া যাইবেন মাত্র।"

এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমি তখন বাক্যহারা হইয়াছিলাম। শিশু আমার কপোলে হাতখানি রাখিয়া ক্ষুদ্রবলে টানিতেছিল ; সাশ্রু নয়নে তাঁহাকে বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিলাম।

ইহার পর চিত্ত ক্ষুব্ধ সন্তাপে আকুল হইয়াছে, তাঁহার এই উদার দানের বিনিময়ে আমার সর্ব কৃতজ্ঞতা কি অপ্রকাশ রহিয়া যাইবে ?

৭

পিতার সাগ্রহ নিমন্ত্রণে তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদের বাংলোতে আসিতেন। তাঁহার নাম গিরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। শুনিতে পাই, শিশু জন্মিবার কিছুকাল পরে তাঁহার পত্নী বিয়োগ হয়। তিনি বাগ্মায় ও চরিত্রবান। সুনীতিপূর্ণ বিচার সিদ্ধান্তে, তাঁহার সরল উদারতায়, আচার ব্যবহারে, হাস্য কৌতুকে আমরা অতিশয় প্রীত হইতাম। শারীরিক অকুশলে বা কর্মবিপর্যয়ে তিনি যে দিন আসিতে পারিতেন না, সে দিবস অন্তরের মধ্যে একটা অবসাদের ছায়া অনুভূত হইত , ও পরে তাঁহার দর্শন পাইলে ইহার একটা সন্তুষ্ট উত্তরের জন্য আমার হৃদয় ব্যাকুল হইত।

সে দিন স্বর্ণ-প্রভাতে তিনি আসিয়াছেন। শিশু কোথা হইতে ছুটিযা আসিয়া তাঁহার ক্রোড়ের উপর নির্দিষ্ট স্থানটুকু অধিকার করিয়া লইযাছে, ও বিমল পুলক হর্ষে তাহার অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছে। বাবা চা-পান করিতেছিলেন, মা তাঁহাকে সাদর আহ্বানের পর কুশলাদি জিজ্ঞাসা কবিতেছেন। আমি প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইব, তাঁহার আগমন বার্তায অন্তরের মধ্যে প্রীতিকম্পন অনুভব কবিলাম। কৌমুদীসিক্ত, সুরভিময় শুভ্রনিশায় সুখসুপ্তা সুন্দরীর ক্ষুদ্র কেশগুচ্ছ লইয়া মন্দানিল যেমন অলক্ষ্যে তাহার কপোল প্রান্তে রেখা বিস্তার করিয়া দেয়, সেইরূপ মর্মের মধ্যে যে রুদ্ধ আকাঙক্ষা অব্যক্ত, এমন একটি মুগ্ধ আশ্বাসে হৃদয় মধ্যে মোহ-রাগিণীব সমাবেশ আত্মহারা করিয়া তুলে, যাহার মৌনমূর্চ্ছনা বাসনাব অঙ্কে রেখাপাত করিয়া দেয়---অলক্ষ্যে নিভৃত সঞ্চাবে সুপ্তালজ্জার অজ্ঞাত চেতনায় আমাব মনের মধ্যেও এই প্রথম লজ্জার আধিপত্যে একটি সুখবাসনার অপ্রকাশিত অপরাধ জাগাইয়া যেন চিত্তকে সঙ্কুচিত করিয়া দিল।

আহারাদির সময় তাঁহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারি নাই। যখনি আমার সস্মিত বদন প্রতি নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টির সহিত আমার নয়ন নিমীলিত হইয়া পড়িয়াছে।

মধ্যাহ্নে ড্রয়িংরুমে পিতার সহিত নানা বিষয়ের আলোচনায় তিনি মগ্ন ছিলেন। পরদার পার্শ্ব হইতে একবার কিছু শুনিতে পাই। তাঁহাদিগের প্রসঙ্গ স্বদেশী আন্দোলন হইতে হিন্দুসমাজের সংস্কার ও উদ্ধার সাধন লইয়া বিচার চলিতেছিল। জাতিবিভাগের উচ্ছেদ, স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন, বালবিধবাদিগের পুনর্বিবাহ প্রচলন ও বাল্যবিবাহের পরিবর্জন ভাবী ভারতের পক্ষে শুভপ্রদ। পাশ্চাত্য শিক্ষার সর্বব্যাপী প্রচার ও বিজ্ঞানানুশীলনের বিস্তারের সহিত জ্ঞানোপার্জনের বিঘ্নকারক যে পৌত্তলিকতার মধ্যে ভুয়োভুয়ঃ কুসংস্কার বিজড়িত রহিয়াছে তাহার আমূল পরিবর্তন নিতান্ত আবশ্যক। নব ইঙ্গিত লইয়া যে সময়স্রোত প্রবহমান হইয়াছে, তাহা মুক্তগতি সমীরের মত সর্ব বাধা, সর্ব কুসংস্কার অতিক্রম করিয়া দেশের আবশ্যকমত শুভ পরিবর্তন সাধন করিয়া দিবে ইহা সর্ববাদী সম্মত সত্যের আদর্শস্বরূপ। এই সকল উদার আলোচনায় তাঁহারা কালযাপন করিতেছিলেন।

শিশুকে লইয়া উদ্যানমধ্যে সান্ধ্যভ্রমণে চিত্ত পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন তিনি আমাদিগের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। পূর্ণিমা শুভ্র জ্যোৎস্না মধুর মহিমাব্যঞ্জক শান্ত গম্ভীর সৌন্দর্যে ধরণী সিক্ত করিয়া তুলিয়াছে। বৃক্ষবাটিকার পার্শ্ববর্তী কুঞ্জকুটির মধ্যস্থ বেঞ্চখানির উপর লতাবিচ্ছেদজনিত ছিন্নকৌমুদী আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি উহা নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন—"এই স্থানে একটু বিশ্রাম করিলে ভাল হয় না?"

তিনি অগ্রসর হইয়া তথায় উপবেশন করিলেন। আমি তাঁহার অনতিদূরে প্রস্ফুটিত প্রসূনগুলি চয়ন করিতে লাগিলাম।

চুন্নি ধীরে ধীরে শিশুকে লইয়া বাংলো অভিমুখে যাইতেছিল, আমি তাহাদিগের অনুগমন করিতে যাইব, এমন সময় তিনি আমায় ডাকিয়া কহিলেন—

"নীলিমা! আমার একটি কথা কি শুনিয়া যাইবে না?"

সে কণ্ঠস্বর আমায় ব্যাকুল করিল, সস্মিত নতনেত্রে আমি তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি সাগ্রহে আমার হস্তধারণ করিলেন—সে সুখস্পর্শে আমার বক্ষস্থল কাঁপিয়া উঠিল। সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গগনের প্রতি চাহিয়া দেবলোকবাসিনী কোন পুণ্যময়ীর প্রেমস্মৃতিকাতর অন্তর কাহিনী তিনি বলিতে লাগিলেন। তপ্ত অশ্রুজল তাঁহার আঁখির কোলে ভাসিয়া উঠিল। তাহার পর ধীরে ধীরে আমার প্রতি তাঁহার অনুরাগ, প্রীতিবাসনায় আমার স্মৃতির স্নেহ-পোষকতা,—ক্রমে, আমার প্রতি তাঁহার উদ্বেলিত প্রণয়, সেই স্থির চন্দ্রিকারশ্মিবিধৌত নিশার মুগ্ধ সম্মিলনে—তাঁহার পবিত্রবাসনা, বিশ্বস্ত আত্মহারা চিত্তে সারল্যের স্নিগ্ধ অনুভাব—আমি শুনিলাম।

তখনও আমার হস্ত তাঁহার করমধ্যেই ছিল, আমি নতনেত্রে নিস্পন্দ নতশিরে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলাম। বেতসীলতার ন্যায় কম্পন অন্তর মধ্যে অনুভব হইতেছিল, তিনি তাহা বুঝিলেন কি? অতি মধুর, অতি স্নেহে আমার করপুটে একটি চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিয়া, তিনি কহিলেন—

"নীলিমা! তুমি কি আমার হইবে না? আজি এই প্রস্তাবে তোমার পিতার স্থির সম্মতি পাইয়া নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিয়াছি। তোমায় লজ্জা দিয়া আমি কি কোন অপরাধ করিলাম?"

ভাষায় এমন শব্দ নাই যে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত হইতে পারে। সে কি প্রাণের অনন্ত প্রীতি; উদ্দাম বাসনার পরিপূর্ণ তৃপ্তি? অথবা বিবেকের সহিত বিধবার সামাজিক বিধির উল্লঙ্ঘন লইয়া ঘোর দ্বন্দ্ব?—যাহার বাসনা নাই অথচ তৃপ্তি কোথায়; মৃত্যু নাই তাহার যন্ত্রণা আছে; বুঝি আশাও নাই যাহার জীবন আছে, তাহাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিবে?

আমি নির্বাক চেতনালুপ্তার ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলাম। কৌমুদী স্নিগ্ধতার আবেশ ঢালিয়া দিল, কুঞ্চিত-কৃষ্ণ-কুন্তল-স্তবক মন্দানিলে দুলিয়া উঠিল, অর্দ্ধস্ফুট প্রসূন কলিগুলি ফুটিল, হাসিল। বিশ্বের সর্ব সৌন্দর্য ও সৌরভ একত্রিত হইয়া যখন প্রাণের সজীবতা প্রদান করিল, তখন লজ্জায় মরিয়া চাহিয়া দেখি আমি তাঁহার স্নেহালিঙ্গনপাশে আবদ্ধা রহিয়াছি। ছিঃ!

* * * *

বেশি দিন পরে নয়, ফাল্গুনের এক শুভ নিশায় মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে। পিতা আমাকে তাঁহার করে শুভ লগ্নে সম্প্রদান করিয়াছেন। সেই সরল শিশুটিকে তাহার পিতৃবক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবার অপরাধের ইহা কি তিরস্কার, না পুরস্কার?

সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

সুধা

আজ সুধার এন্‌গেজমেণ্ট ডে। সুধার পিতা সম্পন্ন লোক নহেন বলিয়া তেমন ধুমধাম হয় নাই। বিশেষত এত আর বিবাহ নয়—বিবাহেব পূর্ব সূচনা মাত্র। সেই কারণ আত্মীয় বন্ধু ব্যতীত অপর কাহাকেও নিমন্ত্রণ করা হয় নাই।

তবে আত্মীয়—বন্ধুর সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। সকাল হইতেই জনসমাগম আরম্ভ হইয়াছিল। কাকী পিসি জেঠী ও তাঁহাদের কন্যা পুত্রাদিতেই বাড়ীটি পুরিয়া গিয়াছিল। সুধার বেথুন কলেজের কয়েক জন বন্ধুও আসিয়াছিল। ভাবী বরও বাদ যায় নাই।

সুধা ক'নের মত নিতান্ত চুপ কবিয়া বসিয়াছিল না। বাড়ীর মেয়ের মতই দিব্য এধার ওধার করিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারই যে বিবাহ ইহা অপরিচিতের পক্ষে অনুমান করা সুকঠিন হইত। সে তো আর এগার বৎসরের ক্ষুদ্র ক'নেটি নয়, তাহার বয়স প্রায় উনিশ হইবে। গত বৎসর সে এফ· এ· পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে সুধা তাহার সঙ্গিনীগণের সহিত গল্প করিতেছিল। পিসিমা আসিয়া কহিলেন, "কইরে, সুধা, যতীন কই? তুই তো কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্—বর কোথায়?"

লজ্জাবনতা সুধা চুপ করিয়া রহিল। সুধার পিস্‌তুতো বোন লাবণ্য বলিল, "মা, বর এখন বর্বরের মত খাট্‌চে।" হাসিতে হাসিতে পিসিমা কাজে চলিয়া গেলেন।

প্রতিভা বলিল,"সুধা, এটা তোমার কিন্তু অন্যায় ভাই—আজকের দিনটা অন্তত বেচারাকে ছুটি দেওয়া উচিত। পরে তোমারই তো কাজে চিরকালটা খাট্‌বে।"

ললিতা বলিল, "আজকের দিনটাই বা বাদ যায় কেন? কি বলিস্ সুধা।"

সুধা হাসিতে হাসিতে বলিল, "যা-যা তোর আর জ্যাঠামি করতে হবে না।"

"না ভাই, তুমি বড় স্বার্থপর। তুমি বেশ আরাম করে বেড়াচ্চ, আর যতীন বাবু খেটে খেটে সারা হলেন।"

সুধার আর উত্তরের অবসর রহিল না। সুধার মা সুধাকে ডাকিলে, সুধা কার্যান্তরে চলিয়া গেল।

অপরাহ্নে একে একে সকলে চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। সুধার অন্তরঙ্গ সঙ্গীরাও সুধাকে চুম্বন করিয়া, কন্‌গ্রাচুলেট্ করিয়া সন্ধ্যার সময় বিদায় লইলেন। ড্রয়িং রুমে সুধা একেলা বসিয়া রহিল।

শ্রান্ত যতীনবাবুও বিশ্রামার্থে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, সুধাকে একেলা দেখিয়া কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "কি সুধা, একেলা যে? তোমার বন্ধুরা সব চলে গেছেন?"

অঞ্চলের চাবিগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে সুধা বলিল, "হ্যাঁ লাবণ্য এইমাত্র গেল।"

যতীনবাবু পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তাঁহার ঘর্মাক্ত ললাট পরিষ্কার করিয়া চেয়ার টানিয়া লইয়া নিকটে বসিলেন।

সুধা আবেগভরে বলিল, "আজ তোমার বড় কষ্ট হয়েচে না ? সমস্ত দিনই খাট্‌ছ।"

যতীন সে কথা একেবারে উড়াইয়া দিয়া বলিল, "পাগল আর কি ? এই সামান্য কাজেই ক্লান্ত হয়ে পড়্‌বো ?"

"প্রতিভা আমাকে স্বার্থপর বলে গাল দিচ্ছিল—"

আর কিছু বলা হইল না। সুধার মা আসিয়া পড়িলেন। বেগতিক দেখিয়া যতীন বাবু সরিয়া পড়িলেন।

২

যতীনের উঠিতে দেরী হইয়া গিয়াছিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া চা খাইতে খাইতেই সে বৌদিদির কক্ষে গমন করিল। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া ব্যতীত যতীনের অপর কোন আত্মীয় ছিল না। ভ্রাতৃজায়াকে সে সহোদরার মতই স্নেহ করিত।

যতীনকে দেখিয়া তাহার ভ্রাতৃজায়া ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "কি ঠাকুরপো তোমাদের কালকের সব খপর কি ?"

ঈষৎ লজ্জিত ভাবে যতীন বলিল, "বিশেষ কিছুই নয়। কাল অনেক লোক হয়েছিল। তুমি কিন্তু খুব ফাঁকি পড়লে।

"তাই তো তোমার বে'তে যে ফাঁকি পড়ব সেটা কখনও মনে করিনি।"

"তোমার হাতের বাতটা কেমন আছে ?"

"কই কম্‌চে কই ? কাল ডাক্তার দস্তানা ব্যবহার করতে বলে গেছে। একটা তাই ভাল চামড়ার দস্তানা আনতে হবে।"

যতীন চুপ করিয়া রহিল। বৌদিদি কহিল, "কি ঠাকুরপো, তোমাকে যে একেবারে নিরুত্তর করে দিলুম।"

"না, বৌদিদি, আমি ভাবছিলুম দিশি দস্তানা পাওয়া যায় কিনা ? সাহেবী দোকানে ঢুকতে কেমন লজ্জাবোধ হয়। তবে তোমার যখন বিশেষ দরকার—আজ বিকেলে একজোড়া এনে দেব এখন।"

"বৌদিদির কাছে স্বীকার করলেও যতীনের মন কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সাহেবের দোকানে প্রবেশ করিতে সত্যই কেমন সঙ্কোচ বোধ হয়। আমরা যে কত অপদার্থ, কতটা পরনির্ভরপরায়ণ, সেটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। আমাদের নিজের অভাব পূরণ করিতে আমরা পরের দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াই।

যতীন নানা উপায়ে মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিল। বৌদিদির কষ্ট হচ্চে—ডাক্তার বলে গেছে—না কিনলেই নয়। এ ত আর সখের জন্য বিলাতী কেনা হচ্চে না, নেহাৎ দায়ে পড়ে।

সমস্ত স্বদেশী দোকান ঘুরিয়া অনন্যোপায় যতীনকে অগত্যা বৈকালে হোয়াইট্‌ওয়ের দোকানে প্রবেশ করিতে হইল। কাগজে মোড়া পেটিকাটি লইয়া যতীন কুণ্ঠিত মনে ধীরে ধীরে দোকান হইতে বাহির হইতেছে, ঠিক সেই সময় লাবণ্যের ভাই রমেশের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।

"কি যতীন বাবু আপনি যে হোয়াইট্‌ওয়ের দোকানে ?" আব কিছু বলিবার পূর্বেই ট্রাম

আসিয়া পড়িল। ট্রামে চাপিয়া রমেশ চলিয়া গেল।

যতীন মরমে মরিয়া গেল। একে ত সে অন্তরের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্ষত-বিক্ষত, তাহার উপর আবার রমেশ দেখিয়া গেল যে সে বিলাতী দোকান হইতে জিনিস কিনিয়া ফিরিতেছে! রমেশ নিশ্চয়ই সকলকে বলিয়া বেড়াইবে। সমাজে তাহার মুখ দেখান ভার হইবে।

কিন্তু কি করা যায়? কর্তব্যের জন্য অনেক সহ্য করিতে হয়—ইহা ত সামান্য মাত্র।

তাড়াতাড়িতে সে দিন আর তাহার সুধার নিকট যাওয়া হইল না।

৩

বৈকালে সুধা ও সুধার মা যখন লাবণ্যের বাড়ী বেড়াইতে গেলেন তখন তাহারা সকলে মিলিয়া গল্প করিতেছিল। কাল বিডনস্কোয়ারে পুলিসের সঙ্গে ছেলেদের খুব মারামারি হইয়া গিয়াছে—তাহারই আলোচনা চলিতেছিল।

সুধাকে দেখিয়া লাবণ্য বলিল, "কি সুধা এমন গোলমালে আজ যে তোমরা বেরুলে?"

"গোলমাল এমন বিশেষ কি? পুলিসেব সঙ্গে ছেলেদের মারামারি সে তো হবারই কথা। এতদিন হয় নি, এই আশ্চর্য।"

রমেশ আসিয়া তাহাদের কথোপকথনে যোগ দিল। সুধা বলিল, "রমেশ! অন্যায় অত্যাচার করিলে পুলিসের সঙ্গে মারামারি করতে পারবে তো?"

"হ্যাঁ, কাল নরেনকে মেরেছিল বলে সে সেই পাহারাওযালাকে খুব মেরেচে। ওরূপ অবস্থায় পড়লে আমিও খুব মার দিতাম।"

সুধা হাসিযা বলিল, "এবার তোমাকে কিন্তু বিদেশী জিনিসপত্র ছাড়তে হবে, দেশী এসেন্স বিশেষত এইচ বোসের দেলখোস্ প্রভৃতির কাছে বিলাতী গন্ধদ্রব্যও হার মানে। দুঃখের বিষয় তবু তোমার রুমাল বিদেশী এসেন্সের গন্ধে ভরপুর। এমন সমস্ত দেশী জিনিস থাকতেও যদি তুমি বিদেশী কেন, তবে সকলেই তোমাকে দেশের শত্রু বলিবে।"

ধরা পড়িয়া রমেশ একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল, "কেন যতীনবাবুও তো বিলাতী জিনিস কেনেন।"

সুধা অবাক হইয়া চুপ করিযা রহিল। যতীনের নামে পূর্বে কেহ কখনও এমন বদনাম দেয় নাই।

লাবণ্য ছোট ভাইকে ধমক দিয়া বলিল, "তুই কি করে জানলি যে যতীন বাবু বিদেশী জিনিস কেনেন?"

"বাঃ, কাল বিকেলে দেখলুম যে তিনি হোয়াইট্‌ওয়ের দোকান থেকে বেরুচ্চেন।"
লাবণ্য যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া সুধার মুখের দিকে চাহিল। সুধার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল সে কোনও উত্তর করিতে পারিল না। তাহার হৃদয় যন্ত্রের একটি তন্ত্রী এমনি বিকল হইয়াছিল যে সমুদয় যন্ত্রটি যেন বেসুরো বোধ হইতেছিল।

কন্যাকে অন্যমনস্কা দেখিয়া জননী জিজ্ঞাসা করিলেন "কি সুধা তোর কি মাথা ধরল নাকি? সুধার শিরঃপীড়া অনেকদিন হইতেই ছিল। হৃদয়ের ভাব সংগোপনের উপায়ান্তর না দেখিয়া সুধা বলিল "হাঁ একটু ধরেচে।"

তাঁহারা অচিরেই গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

কাল সুধার বাড়ী যাওয়া হয় নাই বলিয়া আজ রৌদ্র পড়িতে না পড়িতেই যতীন সুধার

বাড়ী হাজির হইল। কিন্তু বাড়ীতে কেহই ছিল না বেড়াইতে গিয়াছে। সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরিবার সম্ভাবনা জানিয়া যতীন উপরের ঘরে অপেক্ষা করিতেছিল।

নভেলের দুই একপাতা উল্‌টাইতে না উল্‌টাইতে গাড়ী থামিবার শব্দ হইল। সুধা ও সুধার মা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া উপরে উঠিলেন।

"এই যে যতীন, তুমি কতক্ষণ এসেচ ? সুধার আজ আবার মাথা ধরেচে।" এই বলিয়া সুধার মা বেশ পরিবর্তন করিতে অন্য কক্ষে চলিয়া গেলেন।

যতীন উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সুধা কখন থেকে তোমার মাথা ধরেচে ? তোমাকে বড় বিবর্ণ দেখাচ্চে।"

সুধা নির্বাকের ন্যায় বসিয়াছিল। যতীন পুনরায় বলিল, "তাইত আজই আবার আমাকে সকাল সকাল যেতে হবে। বৌদির জন্য সাহেব ডাক্তার আস্‌বে। তোমার মাথা ধরাটা কি বড় বেড়েছে সুধা ?"

অন্তরের দ্বন্দ্ব-বিরোধ দলন করিয়া সুধা, অস্পষ্ট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি কাল হোয়াইট্‌ওয়ে লেডলর দোকানে গিয়েছিলে ?"

যতীন ধীর ভাবে বলিল, "হাঁ, কিন্তু আমার জন্য নয়—" সুধার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল—আপনাকে সংযত করিতে না পারিয়া যতীনের কথা শেষ হইতে না হইতে সুধা অল্প কঠোর স্বরে বলিল, "তুমি সাহেবের দোকানে গেছিলে—"

আর কিছু বলা হইল না সুধার পিতা আসিয়া পড়িলেন। বাড়ীতে ডাক্তার আসিবে বলিয়া যতীন শীঘ্রই চলিয়া গেল।

বাহিরে গিয়া দেখিল রাস্তায় অত্যন্ত ভিড় হইয়াছে। চারিদিকেই গোলমাল ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে বিডন স্কোয়ারে পুনরায় মারামারি হইতেছে। পুলিসেরা নির্দোষী পথযাত্রীদের বিনা কারণেই প্রহার করিতেছে। বিডন স্কোয়ারটা ঘুরিয়া যাইবার ইচ্ছাটা যতীনের হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিল। কতকদূর অগ্রসর হইতেই জনৈক ভদ্রলোক বলিল, "মশাই ওধারে আর যাবেন না। পুলিসেরা ভয়ানক মারছে।"

ঠিক সেই সময় আর্তনাদ করিতে করিতে এক বৃদ্ধ তথায় আসিয়া পড়িল। ব্যাপার জানিবার জন্য সকলে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। বৃদ্ধ ভয়ার্ত স্বরে বলিল, "আর মশাই, কিছুই জানি না, আফিস থেকে ফিরছি, হঠাৎ একটা পাহারাওয়ালা পায়ে এমন দু'ঘা লাঠি মারলে—অনেক কষ্টে প্রাণ নিয়ে ফিরেছি।" সত্যই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পা কাটিয়া গিয়াছে, ক্ষতস্থান হইতে রক্তধারা নির্গত হইতেছিল।

বৃদ্ধকে পাল্কী করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া যতীন অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এমন অশ্রুতপূর্ব অত্যাচার চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল।

ভাঙ্গা গ্যাসের আলো সব নিবিয়া গিয়াছিল। অন্ধকার মধ্য হইতে চিৎকার ধ্বনি উঠিল "পালাও পালাও পুলিশ এদিকে আস্‌ছে।"

স্থানটি শীঘ্রই জনশূন্য হইয়া পড়িল। যতীন নড়িল না। অন্ধকারে দেখিল দুইজন গোরা সার্জেন্ট কয়েকজন কন্‌স্টেবল রেগুলেস্‌ন লাঠি লইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। যতীনকে দেখিয়াই একজন সার্জেন্ট বলিল, "বদমায়েস বাবু হ্যায়, পাক্‌ড়ো।"

রেগুলেসনের মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া যতীনকে ধরিতে যাইবে ঠিক সেই সময় আর একজনের হাত হইতে লাঠি ছিনাইয়া লইয়া অগ্রগামী পুলিসকে লক্ষ্য করিয়া যতীন সজোরে প্রহার করিল। আহত পুলিশ ধরাশায়ী হইল। ইতিমধ্যে গোলমাল শুনিয়া আরো ৭/৮ জন কন্‌স্টেবল আসিয়া পড়িল। সকলে মিলিয়া যতীনকে ধরিয়া ফেলিল। হাত পা

বাঁধিয়া উত্তম মধ্যম দক্ষিণা দিয়া, তাহাকে থানায় পাঠাইয়া দিল।

পরদিনই যতীনের বিচার হইল। উকিলদের অনেক কূটতর্ক হইল। যতীনের শান্ত স্বভাব নির্মল চরিত্র সবই সপ্রমাণ হইল। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ছাড়িলেন না। বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া তিনি যতীনের ১৫ দিন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন।

৬

আজ সপ্তমী পূজা। চারিদিকে আগমনীর বাজনা বাজিতেছিল। সুধার হৃদয় আজ আনন্দ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। আজ যতীনের মুক্তির দিন। যতীনকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দেশের নেতারা একটি বৃহৎ সভা আহূত করিয়াছেন। সে সভায় উপস্থিত থাকিয়া যতীনের সেই গৌরব দেখিবার নিমিত্ত সুধা বেশ বিন্যাস করিতেছিল।

গোলাপ গন্ধ কুন্তলীনের সৌরভ যতীনের বড় ভাল লাগিত। তাই অনেকদিন পর সুধা আবার কেশে গোলাপ গন্ধ কুন্তলীন মাখিল। অনেক দিন পর যতীনের দত্ত নীল রেশমী সাড়ীখানি পারিল। যতীনের নামাঙ্কিত ব্রোচটি স্কন্ধে নিবদ্ধ করিল। যতীনের মনোমত সাজে সে আপনাকে সজ্জিত করিয়া তুলিল।

মাঝে মাঝে অনুতাপানলে তাহার অন্তর জ্বলিতেছিল। সে কিরূপ নির্বোধের ন্যায় অকারণে যতীনকে সন্দেহ করিয়াছিল, বিদেশী বলিয়া তাহার প্রতি সে রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল। যতীনের স্বভাব জানিয়াও সে অভিমান করিয়াছিল। আজ আর সে লজ্জাকে স্থান দিবে না। বিনীত ভাবে যতীনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

বেলা ৫টার মধ্যেই গ্রীয়ার পার্ক লোকে ভরিয়া গিয়াছিল। ছাত্রদল যুবক দল দলে দলে সেই উদ্যানে জড় হইতে লাগিল। অবশেষে দেশের নেতাগণ যতীনকে লইয়া সেই সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। মেরী কার্পেণ্টার হলের বারান্দায় সুধাও স্ফীত বক্ষে যতীনের সম্মান প্রত্যক্ষ করিতেছিল।

সভাপতি বলিতে লাগিলেন "যতীন, জেলে যাওয়াটা অনেক সময় হয়ত ঘৃণার কথা। অনেক সময় কারাগার-প্রত্যাগত ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ করিতেও আমরা কুণ্ঠিত হই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভিন্ন ব্যবস্থা। যে কারাগাবে অন্যের পক্ষে ঘৃণাই—সেই কারাগারই আজ তোমার সম্মান বাড়াইয়াছে। যে জেলে একবার প্রবেশ করিলে লোকে চিরকালের জন্য কলঙ্কিত হইয়া যায়, সেই জেলই তোমার সমুদায় কলঙ্ক মুছাইয়া দিয়া তোমাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। তুমি যে অত্যাচারের অপমানের প্রতিশোধ দিয়াছ, তুমি যে কারাগারের যন্ত্রনা লাঞ্ছনা তুচ্ছ করিয়া নিজের মান, দেশের সম্মান করিয়াছ, স্বর্ণপদক তাহার যোগ্য উপহার নয়; তাহা আমাদের দেশের সর্বসাধারণের,—এই সমবেত জনমণ্ডলীর হৃদয়োচ্ছ্বাসের সামান্য নিদর্শন মাত্র। আমাদিগের বিশ্বাস, তোমার নিকট ইহার উজ্জ্বল প্রভা কখনও মলিন হইবে না, জন্মভূমির পবিত্র সম্মান তোমার সম্মুখে কখনও কলঙ্কিত হইবে না।" এই বলিয়া বিনয়-নম্র যতীনের প্রস্ত বক্ষে তিনি স্বহস্তে স্বর্ণপদক পরাইয়া দিলেন। তৎপরে নেতাগণ সকলে একে একে যতীনকে আলিঙ্গন করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কহিলেন, জন্মভূমির সম্মান রক্ষা করিয়া সে যে কেবল আপনাকে মহৎ করিয়াছে তাহা নয়, সে সকলেরই মহত্ত্ব রক্ষা করিয়াছে।

যতীনের গলায় ফুলের মালা পরাইয়া বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিতে করিতে সভাভঙ্গ হইল। সুধার পিতা যতীনকে নিজের গাড়ীতে উঠাইয়া একেবারে বাড়ী লইয়া গেলেন। সুধা ও

তাহার জননী পূর্বেই ফিরিয়াছিলেন।

গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া সুধার আর কিছু ভাল লাগিতেছিল না। সে অন্যমনস্ক ভাবে বারান্দায় পদচারণ করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে ঘড়ি খুলিয়া দেখিতেছিল। কখন বা পদশব্দে চমকিত হইয়া উঠিতেছিল। শকটের শব্দে তাহার বক্ষস্পন্দন দ্রুত হইয়াছিল।

সময় অতিবাহিত করিতে না পারিয়া অবশেষে সুধা হারমোনিয়ম লইয়া বসিল। তাহার অন্তরের রুদ্ধ উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত করিয়া সঙ্গীত যেন আপনি ধ্বনিত হইয়া উঠিল—

"আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিয়ো,
আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি
তুমি যখন মনে পড়ে আসিয়ো।"

সুধা আপন মনে একাগ্রচিত্তে গাহিতেছিল। সে অনুভব করিতে পারিল না যাহাকে উদ্দেশ করিয়া গাহিতেছে তাহার সেই মানসদেবতা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রুদ্ধনিশ্বাসে সেই সুললিত কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন।

সঙ্গীত পুনরায় ধ্বনিত হইল, —

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিয়ো—

গান থামিয়া গেল, প্রতিধ্বনি তখনও বাতাসে কাঁপিতেছিল। সহসা কে পশ্চাৎ হইতে সুধার সেই লোলকবরীচুম্বিত, স্বর্ণ হার বেষ্টিত মর্মরশুভ্র গ্রীবা বেষ্টন করিয়া ললাট চুম্বন করিল।

প্রমীলা দত্ত

বিলাত ফেরত

মিষ্টার কে· কে· ব্যানার্জির কন্যাকে বিবাহ করায় সুধীরের আত্মীয় মহলে একটু আন্দোলন উঠিয়াছিল, তাহার কারণও ছিল।

সুধীর দরিদ্রগৃহে জন্মগ্রহণ না করিলেও চিরদারিদ্র্যেই তাহার শৈশব জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। সুধীরের পিতা তাহার বিপুল সম্পত্তি অসদ্ব্যয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষ করিয়া দিয়া অল্প বয়স্কা বিধবা ও একমাত্র শিশুপুত্রকে পথে বসাইয়া স্বামী ও পিতার কর্তব্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তখন সুধীরের বয়স চারি বৎসর মাত্র।

সংসারে যাহার কেহই নাই, তাহার ভগবান সহায়। সুধীরের এক দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি খুল্লতাত স্বেচ্ছায় এই অসহায় আশ্রয়হীন পরিবারের ভার গ্রহণ করিলেন। সুধীরের মাতা একজন ধর্মশীলা স্নেহপরায়ণা রমণী। তাঁহার কর্তব্যজ্ঞান এবং আত্মসম্মান তাঁহাকে সাধারণ আশ্রিতা নারীর চেয়ে অনেক উচ্চে রাখিয়াছিল। দেবর-গৃহে যথাসাধ্য আপনার শরীর খাটাইয়া এক বেলা এক মুষ্টি আতপ তণ্ডুল গ্রহণ করিয়াই তিনি তুষ্ট থাকিতেন। কেহ প্রতিবাদ করিলে মৃদু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিতেন, "আমার আবার কষ্ট কি ভাই, আর এতো মেয়ে মানুষের কর্তব্য, আশীর্বাদ কর সুধীর যেন মানুষ হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শেখে।"

পরগৃহে, পরানুগ্রহে পালিত হওয়ায় সুধীরের স্বভাব অত্যন্ত বিনীত হইয়াছিল। তাহার বুদ্ধি, দীপ্ত-আগত উজ্জ্বল চক্ষু, সুন্দর সুকুমার মুখে সহজেই সে মানবহৃদয়ের গোপন

স্নেহ-কক্ষে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হইত। স্নেহময়ী জননীর আদর্শ ও উপদেশে শিশুকাল হইতেই তাহার মন, ধর্ম, কর্তব্য জ্ঞানে ও নিষ্ঠাচারে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

বুদ্ধিমান, প্রিয়দর্শন বালককে পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয় হইতে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পর্যন্ত সকলেই সমভাবে স্নেহ দান করিয়া আসিয়াছেন।

দেশের পাঠ সাঙ্গ করিয়া সুধীর যখন কুণ্ঠিত ম্লান মুখে একদিন মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া কলিকাতায় থাকিয়া পড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, তখন বিধবা তাঁহার অসীম আত্মমর্যাদাকে পদদলিত করিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে দেবরের কৃপা ভিক্ষা করিলেন। সুধীর বুঝিয়াছিল, এই ভিক্ষায় মাকে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। গোপনে দুই বিন্দু অশ্রু মুছিয়া মনে মনে বলিল, "মা তোমার ঋণ চিরদিনই অপরিশোধ্য।"

সুধীরের অন্নদাতা বাঞ্ছারাম মুখোপাধ্যায় একজন হৃদয়বান ব্যক্তি। আপনার অসচ্ছল সংসারের বিষয় জ্ঞাত থাকিলেও সুধীরকে মেসের খরচ দিয়া কলিকাতায় রাখিতে সম্মত হইলেন। বলিলেন, "নিজের ছেলেরা ত কেউ মানুষের মত হোল না, বংশের মধ্যে একটা যদি মানুষ হয়, ভগবান তার সাহায্য করিবেন, আমি কে?"

সম্মানের সহিত ১৫্ টাকা বৃত্তি পাইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সুধীর পিতৃব্যের স্কন্ধের ভার অনেকটা লঘু করিয়াছিল। এফ· এ· ২০্ টাকা বৃত্তি পাইয়া বি· এ· একজামিন দিয়া সুধীরের স্বাস্থ্য অতিরিক্ত পরিশ্রমে অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল। এই সময় সুধীরের বন্ধু ইন্দুভূষণের অনুরোধে মা ও কাকার অনুমতি লইয়া সুধীর ইন্দুব সহিত দিন কতকের জন্য মধুপুরে বায়ু পরিবর্তনে গমন করিল। মধুপুরেই তাহার হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল মিষ্টার ব্যানার্জির সহিত প্রথম আলাপ। তিনিও তখন বায়ু পবিবর্তনের জন্য সপরিবারে সেখানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মিষ্টার ব্যানার্জি সম্পূর্ণ সাহেবী চালে চলিয়া থাকেন। এই রূপবান মেধাবি যুবা সহজেই সুবিজ্ঞ আইনজীবীর চিত্তে স্থানলাভ করিয়াছিল। তাহার একটু বিশেষ কারণও ছিল। মিষ্টার ব্যানার্জি অনেক দিন হইতেই এমনি একটি পাত্রের সন্ধান করিতেছিলেন। কারণ তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিয়াছিল।

কথা প্রসঙ্গে মিষ্টার ব্যানার্জি একদিন সুধীরের বিলাত যাইবার প্রবল ইচ্ছা ও অর্থহীনতার বিষয় জানিয়া লইয়া, সুধীরের খুল্লতাতের সম্মতি চাহিয়া পাঠাইলেন এবং সুধীরের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া, কন্যা জামাতাকে যৌতুক স্বরূপ চারি হাজার টাকা দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

সুধীরের বিলাত যাইবার কত সাধ মনে করিয়া জননী জাতিচ্যুতি প্রভৃতির কথা মন হইতে সজোরে ঠেলিয়া ফেলিয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

খুল্লতাত অসন্তুষ্ট হইলেও তাহা প্রকাশ করিলেন না। বন্ধুমহলে অল্প কথায় জানাইলেন যে "ছেলেদেব ইংরাজী শিক্ষা অধিক দেওয়ার যা ফল তা তো জানাই আছে, এ আব নূতন কথা কি। হরি মধুসূদন তোমারই ইচ্ছা।"

সুধীরের সহিত প্রফুল্লবালার শুভবিবাহ যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়া গেল। কন্যার সৌন্দর্য ও কন্যার পিতার মুক্তহস্ততার সম্বন্ধে প্রতিবাসী মহলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রশংসা কবিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই ইঙ্গ-বঙ্গ পরিবারের রীতিনীতি সুধীরের চক্ষে অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকিলেও বিলাত যাইবার প্রবল ইচ্ছাই সুধীরকে বিবাহে সম্মতিদান করিতে বাধ্য করিয়াছিল। বিবাহের ১০ দিন পরেই, জননীর অজস্র অশ্রুজল ও আশীর্বাদে অভিষিক্ত হইয়া সুধীর সুদূর ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন।

২

সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। সুধীরের বিলাত যাত্রার পর ৫ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এই পাঁচ বৎসরে সংসারে কত ঘটনা ঘটিয়াছে কে তাহার হিসাব পাইবে? ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা প্রফুল্ল এখন অষ্টাশদবর্ষীয়া সুন্দরী যুবতী। পিতা গবর্নেস্ রাখিয়া কন্যাকে রীতিমত শিক্ষা দিয়াছেন।

প্রফুল্লের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ ব্যারিষ্টরী পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাতে গিয়াছেন। কনিষ্ঠ হেমেন্দ্র পিতার সাহেবী অনুকরণে পিতার উপর এক কাটি উচ্চ হইলেও সরস্বতীর সহিত তাহার বড় বনিবনা ছিল না। টেনিস পার্টিতে ও সান্ধ্য সম্মিলনে তাহার যথেষ্ট বিলাতী আদর কায়দা দেখা যাইলেও তাহার ইংরাজী উচ্চারণ সকলের হাস্য উদ্রেক না করিয়া পারিত না।

সেদিন মিষ্টার ব্যানার্জির সুবিস্তৃত, সুসজ্জিত প্রাসাদ আনন্দ উৎসবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। জামাতা সিভিলিয়ান হইয়া মাদ্রাজে কার্য পাইয়া বিলাত হইতে দেশে ফিরিতেছেন। জাহাজে তিনি কলিকাতায় ফিরিবেন। প্রফুল্লের বাল্যসখী নলিনীও সে দিন আনন্দে যোগদান করিতে আসিয়া হাস্যকৌতুকে প্রফুল্লকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল।

আশা উৎকণ্ঠায় প্রফুল্লর সুন্দর মুখ ক্ষণে ক্ষণে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল। বিবাহের পর সুদীর্ঘ ৫ বৎসর পরে কাল সে স্বামী দর্শন পাইবে। প্রফুল্লের চক্ষে আজিকার দিন কি ভয়ানক দীর্ঘ, যদিই বা দিন কাটিল রাত যেন কাটিতে চায় না। এই পাঁচ বৎসরে প্রফুল্ল সুধীরের নিকট হইতে যথানিয়মে প্রতি মেলে পত্র পাইয়াছে। সুধীর সযত্নে কত আগ্রহে তাহার লেখাপড়ার সাহিত্য চর্চার হিসাব লইয়াছে। কিন্তু সাংসাবিক জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে সে স্বামীর নিকট কোন উপদেশই পায় নাই। বরং দু'এক স্থানে তাঁর নিজের মনোভাবের ঈষৎ ছায়াদৃশ্যে প্রফুল্লকে অত্যন্ত গোলযোগে পড়িতে হইয়াছে; কারণ স্বামীর মতের সহিত পিত্রালয়ের শিক্ষা দীক্ষা কিছুই মিল খায় না। প্রফুল্ল নিজের অল্প বুদ্ধিতে ধিক্কার দিয়া স্থির করিল, ইংরাজী পত্রের ভাবানুগ্রহে এখনও তার বিলম্ব আছে। এ সম্বন্ধে শিক্ষয়িত্রীর নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। কারণ গবর্নেস্ মিসেস কর্নেল দুই একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন মিঃ মুখার্জি উচ্চ শিক্ষিত হইলেও মিঃ ব্যানার্জির জামাতা হইবার উপযুক্ত উন্নত রুচির তাঁহাতে সম্পূর্ণ অভাব।

সে দিন বাড়ী ফিরিবার সময় নলিনী প্রফুল্লকে কিছু উপহার দিয়া হাসিয়া বলিল, 'ভাই ফুলি, কাল ৩১শে আশ্বিন রাখী-বন্ধনের দিন, কালকের দিনে প্রিয়জনকে স্বদেশী জিনিস উপহার দিতে হয়, তা ভাই কাল আর তোমার দেখা পায় কে, আজই তাই দিয়ে রাখি," বলিয়া একটা কাঠের ছোট বাক্স হইতে এক শিশি দেলখোস বাহির করিয়া প্রফুল্লের গায়ে একটু ছড়াইয়া দিয়া বলিল, "আশীর্বাদ করি তোমাদের ভাবী জীবন যেন দেলখোসের মতই এমনি সৌরভে পূর্ণ হয়। আর কুন্তলীনটা মেখে বিলিতি স্বামীর সাহেবী মেজাজ ঠাণ্ডা মাথায় সহ্য করো।"

লজ্জিতা প্রফুল্ল সখীকে দিবার মত কিছু না পাইয়া তাহার স্বহস্তরোপিত গোলাপ গাছের সদ্য প্রস্ফুটিত প্রথম ফুলটি উপহার দিয়াছিল।

সপরিবারে মিঃ ব্যানার্জি জামাতাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। প্রফুল্লের প্রফুল্ল মুখ তাহার সহস্র চেষ্টা উপেক্ষা করিয়া ক্ষণে ক্ষণে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার সুন্দর ইংলিশ সিল্কের ফিরোজ রংয়ের শাড়ী সুদীর্ঘ লেশ ও কৃত্রিম

পাতাপুষ্প-খচিত সাহেবের বাড়ীর জ্যাকেট এবং সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদযুগলে বিলাতী লাল মখমলের জুতায় তাঁহার অনিন্দনীয় সৌন্দর্যকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেছিল। তথাপি প্রফুল্লের মনে হইতেছিল তাহার বেশভূষা হয়ত তাহার বিলাতপ্রত্যাগত স্বামীর ঠিক মনোমত না হইতেও পারে। তিনি হয়ত প্রফুল্লর শাড়ী জ্যাকেটে তাহাকে কতই অশিক্ষিতা রুচিহীনা মনে করিবেন। প্রফুল্লর দিদি তাহাকে গাউন পরিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সর্বদা অভ্যস্ত না থাকায় প্রফুল্লর পক্ষে সেটা একবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীর রীতিনীতি আচার ব্যবহাব সম্বন্ধে প্রফুল্লের কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। চিঠি পত্রে লেখা পড়ার বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহভাব লক্ষিত হইলেও সাংসারিক ব্যবহার সম্বন্ধে প্রফুল্ল কোন উপদেশই পায় নাই। বিবাহের পর দীর্ঘ পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এত দিন বিলাতে থাকিয়া হয়ত তাঁহার মনের কতই পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বিলাতের সুন্দরীদের দেখিয়া আর কি তাঁহার প্রফুল্লকে ভাল লাগিবে? কিন্তু মিসেস্ কনেলি বলেন প্রফুল্লর শিক্ষা, প্রফুল্লর সৌন্দর্য অনেক সুন্দরীর ঈর্ষাব বিষয়। ঈষৎ গর্বের সহিত সেই কথা কয়টিও প্রফুল্লর মনে পড়িল।

নগ্নপদ, নগ্নগাত্র, ধুতিপরিহিত সুধীবকুমার যখন ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্বশুবেব পদধূলি গ্রহণ করিলেন তখন অতিমাত্র বিস্ময়ে মিষ্টার ব্যানার্জিকে দুই পদ পশ্চাতে সবিয়া যাইতে হইয়াছিল। উজ্জ্বল দিবালোকে শত শত দর্শকের কৌতূহলী চক্ষের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস হইতেছিল না। তাই চশমাটা খুলিযা পরিয়া বার বার করিয়া জামাতার মুখের প্রতি চাহিতেছিলেন। পিতার সেই বিচলিত ভাবে হেমেন্দ্রকে সহজেই প্রকৃতিস্থ করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল। হেমেন্দ্র অগ্রসর হইয়া বলিযা উঠিলেন "হ্যালো মিষ্টার মুখার্জি, সিভিলিয়ানীর প্রথম অভিনয়ে কি ভিক্ষুক সাজেব নিয়ম নাকি?"

সুধীর হাসিযা হেমেন্দ্রের করমর্দন করিয়া বলিলেন, "পোষাকের কথা বলছ, তা আমরা ভিক্ষুক নয় তো কি ভাই—আমাদেব নিজেদের আছে কি? ছোট বেলায় বিলিতি বিস্কুট খেতে খেতে ঠাকুমাকে ছুঁযে দিলে তিনি গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধ হতেন। অসুধের জন্য বিলিতি ঔষধ, সাহেব ডাক্তার, আর শিক্ষাব জন্য বিলাত যাওয়া একই বই আর কি। এখন প্রায়শ্চিত্ত করে মাকে ছুঁতে হবে। কতদিনের পর ঘরে ফিরলেম্ এখন কি আর ওসব ভাল লাগে?" বলিয়া বিস্মিত বিচলিত হেমেন্দ্রের হস্তে হরিদ্রারঞ্জিত সূত্রখণ্ড বাঁধিয়া দিয়া গম্ভীর আবেগপূর্ণ স্বরে বলিলেন "ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, স্বদেশপ্রীতিতে তোমাব সুমতি হোক, আজ ৩০শে আশ্বিনেব বিমল আলোকে তোমার হৃদয় মন আলোকিত হো'ক।"

জামাতার তরুণ তপনের মত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুন্দর শুভ্র মুখে স্বদেশপ্রীতির যে উজ্জ্বল জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া মিষ্টার ব্যানার্জির ক্ষণিক বিবক্তি ভাব দূর হইয়া হৃদয় কোমল স্নেহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে হইল যেন পুরাকালের তপোবনবাসী ঋষি বালক তাহার কঠোর শিক্ষাবসানে দ্বাদশবর্ষ গুরুগৃহে বাসের অবসানে জন্মভূমির স্নেহ অঙ্কে ফিরিয়া আসিয়াছে।

সমাগত আত্মীয় বন্ধুদের যথাযোগ্য প্রণাম সম্ভাষণ সমাপ্ত করিয়া সুধীরকুমার চকিতে একবার পত্নীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। সে দৃষ্টিতে অঙ্কুশাহতার ন্যায় প্রফুল্ল মনে মনে ধরণীকে দ্বিধা হইতে অনুরোধ করিয়াছিল। নিজের বহুযত্নের বহুমূল্যের বেশভূষা কঠিন শৃঙ্খলের মত তাহার সর্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া তাহাকে পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল। সে দুঃসহ লজ্জার হাত হইতে মুক্তির বুঝি আর কোন উপায়ই ছিল না—হায় হায় এত দিনের এত পরিশ্রমে সে তাহার প্রবাসী স্বামীর সুখের জন্য শুধু ভগ্ন কাচখণ্ডই সংগ্রহ করিয়াছে! স্বামীর

চক্ষে সে আজ কত হীন—তাহার ঐ স্নেহ-কোমল দৃষ্টির অভ্যন্তরে কি সুগভীর ঘৃণা লুক্কায়িত নাই ?

বাড়ী ফিরিয়া প্রফুল্ল তাহার সাজসজ্জা দূরে ফেলিয়া একখানা মোটা স্বদেশী মিলের বস্ত্রে আপনার দুঃসহ লজ্জানত শরীরকে আবরণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিয়াছিল। কথাটার মধ্যে কতখানি সত্য আছে বলিতে পারি না, তবে বাঁড়ুয্যে সাহেবের বাড়ীর আনন্দ ভোজটা যে সেবারে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ স্বদেশী দ্রব্যে প্রস্তুত হইয়াছিল সে বিষয়ে আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি।

পরিমল দেবী

নিয়তি

১

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

সরলতার পাল্কীখানি যখন রামলোচন মিত্রের বাড়ীর বাহিরের দুয়ারে নামিল, সে সময় বাড়ীর ভিতর সন্ধ্যার শঙ্খ বাজিয়া উঠিল : সেই শঙ্খধ্বনি শুনিয়া সরলতা চমকিয়া উঠিল। সমস্ত পথ সে পাল্কীর দুয়ারের ফাঁক দিয়া দুই পার্শ্বের মাঠ, বাগান, পুকুর, বাড়ীঘর দেখিতে দেখিতে আসিতেছিল। সে সব যেন সে স্বপ্ন দেখিতেছিল। আট বৎসর পূর্বের কথা তার স্বপ্নের মত মনে হইতেছিল। সে দিনও এমনি বৈশাখের সন্ধ্যায় এই পথ দিয়াই তাহার পাল্কী চলিয়াছিল, সে দিনও বাড়ীর দুয়ারে নামিবামাত্র শুভ শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছিল, তবে সেদিন শুধু শঙ্খধ্বনি নয়, সেই সঙ্গে আনন্দের কলরবে গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। মিত্রগৃহিনী অন্নপূর্ণা যখন আনন্দ-গদ্গদ্ স্বরে সরলতাকে "আমার মা লক্ষ্মী এসেছেন" বলিয়া কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তখন কি তিনি জানিতেন যে সেই গৃহলক্ষ্মীই একদিন আবার অলক্ষ্মীর বেশে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইবে।

আর একদিনের কথা সরলতার মনে পড়িতেছিল, মাতার মৃত্যুর পরে যেদিন তাহার স্বামী শ্রীশচন্দ্র দাদার উপর অভিমান করিয়া কিশোরী পত্নীকে ও শিশু কন্যাকে সঙ্গে লইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীশচন্দ্র বিদায়ের সময় ভ্রাতার চরণে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলেন "দাদা তবে আমি জন্মের মত বিদায় হইলাম।" কিন্তু তিনি সে কথা বলিবার সময় জানিতেন না নিষ্ঠুর নিয়তি তাহাকে সত্য কথাই বলাইতেছে।

উর্মাতারা পাল্কীর ভিতর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সরলতা তাহাকে জাগাইয়া কোলে তুলিল। বাড়ীর ভিতর যাইতে তো আর পা উঠে না। দুয়ার পার হইয়াই উঠানের সেই আম গাছটি —গাছটি এখনও ঠিক তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, তেমনি তাহার সর্বাঙ্গ কাঁচা পাকা ফলে ভরিয়া গিয়াছে। এই গাছের ছায়ায় বসিয়া দুপুরের রৌদ্রে সরলতা তাহার সঙ্গিনীদের সঙ্গে কত আমোদ করিয়া কাঁচা আম খাইত। আবার মিত্রগৃহিণীর মিষ্ট ভর্ৎসনায় লজ্জিত হইয়া ঘরে গিয়া লুকাইত। গাছটিকে দেখিয়াই তাহার সেই সমস্ত কথা মনে পড়িল। গাছটি যেন তার সেকালের বন্ধু, তাই কিছুক্ষণ তাহার অন্ধকার ছায়ায় দাঁড়াইয়া প্রাণের আগুন একটু নিবাইবার ইচ্ছা হইতেছিল।

রোয়াকের উপর বসিয়া আধুনিক মিত্রগৃহিণী অর্থাৎ সরলতার বড় জা আম গাছটি জমা দিলে ভাল হইত কিনা মনে মনে সেই বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন। হঠাৎ আম গাছের ছায়ার ভিতর একটা ছায়ার মত দেখিতে পাইলেন, দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "কে গা?" উত্তব না পাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "উত্তর দিসনে কেন রে? মুচী বৌ নাকি?"

কথার তো ধার থাকে না, তবে কি জানি কেমন করিয়া ছুরির মতন বুকে আসিয়া বেঁধে। সরলতা চক্ষুর জল যত মুছিতেছিল, ততই চোখের জলের ধারা বহিতেছিল, কথা বলিবার চেষ্টা করাতো একেবারেই বৃথা। উত্তর না পাইয়া এবং গ্রীষ্মের প্রাবল্যে মিত্রগৃহিণীব মাথা গরম হইয়া উঠিল, "আ মোলো যা, চোব নাকি, মুখে যে বাক্যি হবে গিয়েছে।"—বলিয়া রণরঙ্গিনীব বেশে রোয়াক হইতে প্রাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। "দিদি আমি।" এই কথাটি মৃদুস্বরে তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন সেই তারের খবরের কথাটা তাঁর মনে পড়িয়া গেল।

"ছোট বৌ নাকি? এমন অসময়ে হঠাৎ কি মনে করে? ঠাকুরপো ভাল আছে তো?" কথাগুলিতে কিছু বিস্ময়ের ভাব নাই। ঘটনাটা যে কি ঘটিয়াছে তাহা যেন তিনি জানিয়া শুনিয়া বলিতেছেন।

সরলতার ধৈর্য আর থাকে না, তাহার সমস্ত শরীর এত কাঁপিতেছিল, সে বুঝি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়ে। মায়েব অবস্থা দেখিয়া উমা কোল হইতে নামিয়া মাকে ছোট ছোট হাত দুখানি দিয়া জড়াইয়া ধরিল। সরলতার দুই চোখ দিয়া নিঃশব্দে অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছিল, পাতার ফাঁক দিয়া শুভ্র জ্যোৎস্না তাহাব শুভ্র কাপড়ের উপর পড়িযা তাহার অবস্থা বিশেষ করিয়া পরিস্ফুট করিয়া তুলিল। উমা মায়ের মুখের দিকে চাহিযা ব্যাকুল ভাবে বলিল, "মা, বাড়ী চল।"

রুদ্ধস্বরে সবলতা বলিল, "এই ত তোমাব বাড়ী বাবা।" দেখিযা শুনিয়া মিত্রগৃহিণী তো অবাক! বলিলেন, "তোমরা কি এখানে থাকবে বলে এসেছ নাকি?"

২

রামলোচন মিত্র যখন আহারে বসিয়াছেন, তখন মিত্রগৃহিণী আসিয়া দর্শন দিলেন। স্বামীর নিকট দাঁড়াইয়া তীব্র বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন "ওগো তোমাদের যে বড়কুটুম এসেছেন, আজ আমাদের বড় ভাগ্যি।"

কন্যা উষাতারা মায়ের কথা শেষ হইতেই বলিল "হ্যাঁ বাবা, কাকীমা এসেছেন। তিনি কত যে কেঁদেছেন, তাঁর চোখ একেবারে লাল হয়ে গিয়েছে। আর বাবা, উমার হাতে মোটে চুড়ী নেই, তাকে আমার মত চুড়ী এনে দিও। আর আমার মত এক শিশি কুন্তলীনও এনে দিও।"

গৃহিণী তীব্র স্বরে বলিলেন "উমাতারার বাপ তোকে কি দিয়েছিল লো?"

রামলোচন, গৃহিণীর রাগ দেখিয়া হাসিলেন। গৃহিণীর ক্রোধের মাত্রাটা যেমন কিছু অতিরিক্ত, মিত্রজা তেমনি কিছু অধিক শান্ত স্বভাব, বিষয়ী এবং হিসাবী লোক। তাই সংসার এতদিন নির্বিবাদে চলিয়া আসিতেছিল। মেয়ের দিকে চাহিয়া রামলোচন বলিলেন, "বুড়ী, সে সব বন্দোবস্ত পরে হবে।"

তাহার পর একটু হাসিয়া গৃহিণীকে বলিলেন "রাঁধুনী মাগী যে করে তোমার নিন্দে গেয়ে

বেড়িয়েছে, নতুন রাঁধুনী যে শীগ্‌গির পাওয়া যাবে তা ত বোধ হয় না। দুদিন ছোট বৌমাকে রাঁধতে দিয়ে দেখনা তিনি কেমন রাঁধেন।"

৩

অতএব সরলতা রাঁধুনীর কাজে বহাল হইল। দিন দুই পরে ঝি-টিও গৃহিণীর সহিত ঝগড়া করিয়া বিদায় লইল। সরলতা "গতর" লইয়া আর কি করিবে, কাজেই গৃহিণী আর ঝি রাখা আবশ্যক মনে করিলেন না। কাজ করিতে হয় বলিয়া সরলতার কোনও দুঃখ ছিল না, পরিশ্রম যখন বড় বেশী হইয়া পড়িত, তখন উমাকে একবার বুকে করিলেই তাহার শ্রান্তি দূর হইত। কিন্তু দুঃখ যত সেও উমারই জন্য। উমা কেবল চার বছরের, ঊষার চেয়ে দু' বছরের ছোট, তবু ঊষা ছেলেমানুষ, আর উমা উঠিতে বসিতে তাহার জেঠিমার কাছে "বুড়ো ধাড়ী মেয়ে" বলিয়া অভিহিত হইয়া গালি খাইত। উমা একে বড় ভীতু, বকুনি খাইবার সময় তাহার চকিত হরিণের মত সেই কোঁকড়া চুলে ঢাকা ভয়ত্রস্ত চোখের ব্যাকুল চাহনি দেখিয়া সরলতার বুক ফাটিয়া যাইত। উমা জেঠাইমাকে এত ভয় করিত যে মার খাইয়াও তাঁহার নিকট ভয়ে কাঁদিত না, কিন্তু মা সরিয়া গেলেই ঊষা আসিয়া যখন তাহার গলা ধরিয়া আদর করিত, তখন তাহার চোখের জল আর বাধা মানিত না। সরলতা তখন উমাকে ফেলিয়া ঊষাকে বুকে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখে চুমা দিয়া বলিত "মা তুমি রাজরানী হও।"

শুধু তাও নয়। রাত্রে যখন সরলতা রাঁধিতেছে, তখন উমা তাহার কোলে শুইয়া ঘুমাইবার জন্য অনবরত ঘুরিতেছে। সরলতা বলিত "উমা, লক্ষ্মী মা, শোওগে যাও।"

উমা বলিত "না মা, তোমার কাজ হয়ে গেলে তোমার কোলে শুয়ে ঘুমোবো।" কিন্তু কাজ কি আর শেষ হয়, এই খাওয়া দাওয়া হলে আবার বাসন মাজা ঘর নিকানো আছে। উমা মায়ের কাছে বসিয়া বসিয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া ভিজা মাটির উপর ঘুমাইয়া পড়িত। ভিজা মাটিতে শুইয়া শুইয়া এক একদিন জ্বর হইত। জ্বরের যন্ত্রণায় উমার কেবল মনে হইত, মার কোলে শুইতে পাইলে সব অসুখ সারিয়া যাইবে। কিন্তু মায়ের কোলে করিবার অবসর নাই, উমা তাহা বুঝিত। সরলতাকে বলিত—"মা তুমি রাঁধ, আমি তোমার আঁচল আমার গায়ে দিয়ে রাখি, তাহলে আমার মনে হবে যে তোমার কোলেই শুয়ে আছি।"

গৃহিণীর দেখিয়া শুনিয়া এসব অসহ্য বোধ হইত ; তিনি সরলতাকে বলিতেন "থাক্ থাক্ তোমার কাজ থাক্, তোমার সাত রাজার ধন মানিক কোলে নিয়ে থাক, তা'হলেই পেট ভর্‌বে এখন। বাবারে বাবা, এ কি মা ন্যাওটা মেয়ে, মা, মা, মা, যেন ছ'মাসের খুকী।"

কিছু বেশী বকা গৃহিণীর বাল্যকাল হইতে অভ্যাস। দিনরাত বকুনি খাইয়াও সরলতা মনে করিত "উনি আমাকে শিখাইবার জন্য বকিতেছেন।"

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর যখন সে উমাকে বুকে করিয়া মলিন শয্যায় শয়ন করিত, তখন তাহার আর দিনের কিছু মনে থাকিত না। খুব ভোরে সরলতা বিছানা হইতে উঠিত। উমার তখনই ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। মাকে উঠিতে দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া বলিত "মা, তোমার পায়ে পড়ি আর একটু থাক এখনতো সকাল হয়নি।"

৪

ফাল্গুন মাসের শেষ, চারিদিক কুয়াসায় আচ্ছন্ন, তখনও খুব শীত আছে। সরলতা

বাঁধিতেছে, কিন্তু তাহার দৃষ্টি চারিদিকে ঘুরিতেছে এই শীতের মধ্যে হয়ত উমা কাঁপিতে কাঁপিতে রান্নাঘরে আসিবে এই কথাই তাহার কেবলই মনে হচ্চে। এমন সময় উমা আসিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুপি চুপি বলিল "মা, আমার বড় অসুখ করেছে, জেঠাইমাকে বোল না, জেঠাইমা শুন্‌লে রাগ কর্বেন।"

সরলতা সস্নেহে তাহার ললাট চুম্বন করিয়া বলিল "অসুখ হয়েছে তো এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

"উষাদিদির সঙ্গে খেলা কচ্ছিলাম মা, সে আস্‌তে দিতে চায় না। এখন তার মাষ্টার মশায় এসেছেন, আর আমি তোমার কাছে চলে এসেছি।"

"যাও তবে তুমি শুয়ে থাক আজ আর অমন করে আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়িও না।"

উমা যতক্ষণ পারিল মায়ের কাছে কাছে থাকিল, শেষে দুইবার বমি করিয়া তাহার ক্ষীণ শরীর এত দুর্বল হইয়া পড়িল যে তাহার আর উঠিবার ক্ষমতা রহিল না। ম্লান মুখে সরলতা মিত্রগৃহিণীকে বলিল "দিদি, একজন ডাক্তার ডাকলে হয় না।"

"ডাক্তার! অবাক কথা! জ্বর বিগারে লোক ডাক্তার দেখাতে পারে না, একটু পেটের অসুখ হয়েছে অম্‌নি ডাক্তার!"

কিন্তু রামলোচনবাবু ডাক্তার আনিলেন। সরকারী ডাক্তারখানা বাড়ীর কাছে। ডাক্তারবাবু অবসর সময়ে উমা ও উষার সহিত খেলা করিতেন। উমাকে বলিতেন "মা" আর উষাকে বলিতেন "শ্বাশুড়ী"। উমার অসুখ শুনিয়া তিনি নিজেই আসিলেন। দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন "কলেরা বলিয়াই বোধ হইতেছে।" গ্রামে তখন অল্প অল্প কলেরা হইতেছিল। রামলোচন সরলতাকে গম্ভীরভাবে জানাইয়া দিলেন "এ রোগী বাড়ী রাখা হবে না, হাসপাতালে পাঠানো হবে।"

মিত্র গৃহিণী তখন চুল বাঁধিতেছিলেন, সরলতা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছে দেখিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন "এই এক আপদ জুটেছে।"

সরলতা আসিয়াই বসিয়া পড়িল, যেন তাহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দিদির পায়ে হাত দিয়া "দিদি"—এইটুকু আর কিছু বলিতে পারিল না। দিদি ঈষৎ বিরক্ত ভাবে সরিয়া বসিয়া বলিলেন "কি আবার হ'ল?"

সরলতা ব্যাকুল ভাবে চোখ মুছিয়া বলিল "দিদি, আমার উমা— উমাকে একটু স্থান দাও, সে যে মা ছাড়া আর কাউকে জানে না।"

গৃহিণী তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, সেই রোদনারক্ত চক্ষুদুটির দিকে চাহিয়া কে জানে কেন তাঁহার প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। তিনি কিছু কোমল ভাবে বলিলেন "কি করি ভাই, রোগ যে ভারী ছোঁয়াচে। উষা আমার সবে মাত্র ধন, সব তাতে'ত আমার ভয় হয়।"

"দিদি চণ্ডীমণ্ডপের কাছে যে চাকরদের ঘরখানা আছে তাতে যদি উমাকে থাকতে দাও।"

"তা না হয় থাকুক, সে তো বাড়ীর বাইরেই।"

কৃতজ্ঞতায় সরলতার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। গদগদ স্বরে বলিল "দিদি কি যে বল্‌বো তোমায়।"

৫

যেমন অনেক পুকুরের ধারে কোনকালে তালগাছ ছিল, তাই তাহার নাম তালপুকুর হয়, চাকরদের ঘরের নামটিও সেই রকম। সে ঘরে আজকাল গরুর খড়, খোল আর কতকগুলি আবর্জনা বোঝাই থাকিত। সেই ঘরেরই একটি পাশে স্থান করিয়া লইয়া সরলতা তাহার প্রাণের ধনকে কোলে লইয়া বসিল। ঘরের সম্মুখে অনেক আমগাছ ছিল বলিয়া ঘরের ভিতর আলো আসিত না, সেই অন্ধকার ঘরে বসিয়া তাহার জগৎ অন্ধকার বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অকূল সমুদ্রে পড়িয়া ডুবিবার পূর্বে লোকে যেমন জলের ভিতর ধরিবার অবলম্বন পাইবার জন্য হস্তসঞ্চালন করে, সরলতার প্রাণের অবস্থাও সেইরূপ। সেই ঘোর দুর্দিনে ভগবানেব দয়ার মত অন্ধকার ঘরের দুয়ারে আসিয়া ডাক্তারবাবু "মা" বলিয়া দাঁড়াইলেন।

জননীর শুশ্রূষায় ও ডাক্তার বাবুর একান্ত যত্নে দুই দিন প্রবল রোগের সহিত যুঝিয়া উমা মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচিল। সরলতা ডাক্তারবাবুকে দেবতা বলিয়া মনে করিত। দুঃখিনী কি বলিয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইবে।

এই দুই দিন সকল কাজের ভার গৃহিণীর উপর পড়িয়াছিল বলিয়া, তিনি সরলতার উপর একেবারে হাড়ে চটিয়াছিলেন। উমাকে একটু সুস্থ দেখিয়া সরলতা আবার যখন নিজের কাজে গেল, তখন তিনি মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন "থাক বাপু, তোমার আমার কাজ করে কাজ নেই, আমার যেমন গেরো, তাই রাঁধুনীকে ছাড়িয়ে দিলাম।"

উমার বিছানা হইতে উঠিবার ক্ষমতা ছিল না, সারাদিন একলা ঘরে পড়িয়া থাকিত। গৃহিণী উষাকে সে গৃহের ধার দিয়াও যাইতে দিতেন না, একটু পদশব্দ শুনিলেই উমা মায়ের পায়ের শব্দ মনে করিয়া চম্‌কিয়া উঠিত। কাজ কর্ম শেষ করিয়া মা যখন তাঁহার খাবারের বাটী হাতে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিত, তখন তাহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

৬

মিত্র গৃহিণীর কুন্তলীন দিয়া চুল বাঁধা আর বেশী দিন রহিল না। একদিন শেষরাত্রে দুইবার ভেদ হইয়াই রামলোচনের জীবনগ্রন্থির সহিত পৃথিবীর বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। এই অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে মিত্রপত্নী জ্ঞানশূন্যার ন্যায় মাটির উপর আছড়াইয়া পড়িলেন। গ্রামের গৃহে গৃহেই তখন মৃত্যুর প্রবল হাহাকার, কে কাহাকে দেখে। উষা বাহির হইতে আসিয়া বমি করিয়া রোয়াকে শুইয়া পড়িয়াছিল, সরলতা তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। ছুটিয়া গিয়া দিদির কাছে বলিল "দিদি ওঠো, ওঠো একবার উষার কাছে এসো।"

উষার নাম শুনিয়া গৃহিণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "ছোট বৌ ; বলিস কি ছোট বৌ, উষার আবার কি হয়েছে ?" বলিয়া উন্মত্তের মত উষার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন, উষা বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে দেখিয়া "ওরে আমার কি সর্বনাশ হল রে।" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সরলতা ব্যাস্ত হইয়া তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিল। বলিল "দিদি কর কি ? ভয় কি, উষা ভাল হবে। ওরকম করলে যে ওর অসুখ বাড়্‌বে।"

গৃহিণী দুই হাতে সরলতার হাত জড়াইয়া ধরিয়া আর্তস্বরে বলিলেন "তুই উষাকে ভাল করে দে, ছোট বৌ, তুই ওকে ভাল করে দে।"

দিদির মুখের দিকে চাহিয়া সরলতার অশ্রু উথলিয়া উঠিল। সে একান্ত মনে ভগবানের কাছে করজোড়ে বলিতে লাগিল "হে ঠাকুর উষাকে বাঁচাও।" কিন্তু ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হইল, উষা কিছুতেই বাঁচিল না।

মিত্রবাড়ী যেন আজ শ্মশান। গৃহিণী ঘরের মেঝেয পড়িয়া গুণ গুণ করিয়া কাঁদিতেছেন, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিবার আর তাঁহার শক্তি নাই সেই যে উষার সুকুমার দেহখানি যখন তাঁহার বুকের ভিতর হইতে সকলে কাড়িয়া লইয়া গেল, সেই অবধি তিনি এই ভূমিশয্যা হইতে উঠেন নাই।

সরলতা মাথার কাছে বসিযাছিল, তাহার চোখের জলে গৃহিণীর চুল ভিজিয়া গিয়াছে, সরলতা সান্ত্বনা দিতে জানিত না, সান্ত্বনার কথা আর কি আছে?

সন্ধ্যার অন্ধকার হইয়া আসিল। সরলতা উঠিয়া উমাকে কোলে লইয়া আসিয়া অতি করুণ কণ্ঠে ডাকিল "দিদি।" সে স্বর শুনিয়া গৃহিণী আবার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "আমার কাছে আয় ভাই, তুই ভিন্ন আমার আপনার জন কেউ নেই, তোকে যে, কষ্ট দিয়েছি সেই পাপেই ভগবান আমার এই শাস্তি দিলেন।"

সরলতা উমাকে তাঁহার কোলের কাছে নামাইয়া মায়ের মত স্নেহে তাঁহার মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "দিদি, ও কথা কি বলতে আছে, আমি তোমার ছোট বোন। তুমি তো আমাকে কোনো কষ্ট দেও নি, যখন নিরাশ্রয় হয়ে এসে তোমার দুয়ারে দাঁড়িয়েছিলাম, তখন তুমিই আমায় আশ্রয় দিয়েছিলে। দিদি, এই নাও উমাকে নাও। ওকে তুমি উষা বলে মনে কোরো।" এই বলিয়া উমাকে তাঁহার কোলে দিল।

গৃহিণী পাগলের মত উঠিয়া বসিলেন। উমার শীর্ণ কঙ্কালসার দেহখানি বুকে লইয়া বলিলেন, "এই দুখের মেয়ে, একেই আমি কত কষ্ট দিয়েছি. ঘেন্না করে কোলে নিইনি। হে ভগবান তুমি আগুন দিয়ে পাথর গলাতে পার তা আজ বুঝেছি।"

উমা বিস্মিত হইয়া জেঠাইমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ক্ষুদ্র শীর্ণ হাতখানি জেঠাইমার মুখের উপর দিয়া ব্যাকুল ভাবে বলিল "জেঠাইমা তুমি কেঁদ না।" শোকের ভিতরেও ভগবানের মঙ্গল আশীর্বাদ তাঁহাদের মস্তকের উপর চিরশান্তিরূপে ঝরিয়া পড়িল।

নির্ঝরিণী দেবী

পূজার চিঠি

প্রিয়তমেষু,

আমরা আজ এলাহাবাদ থেকে এখানে এসেছি। সেখান থেকে বেরুবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত, তোমার চিঠি পাবো এই আশা মনে ছিল। কিন্তু এই রকম করে সুদীর্ঘ পাঁচ ছ'টা দিন ও রাত কেটে গেল তবু তোমার দেখা পেলাম না। রোজ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে "আজ চিঠি নিশ্চয় পাবো" এই বুকভরা আশা নিয়ে উঠি, কিন্তু যখন একে একে সমস্ত ডাকের সময় চলে যায় এবং দিনের আলো নিবে এসে ধরণী ধীরে ধীরে তমসাবৃত হয়, আমার মনটাও একখানা কালো মেঘে ছেয়ে ফেলে দেয়, বুকের মধ্যে ব্যর্থ আশার একটা তীব্র বেদনা অনুভব করি এবং চোখদুটো আপনি আপনি ছলছল করে আসে। পাছে ধরা পড়ি সেই ভয়ে কারু সম্মুখে

মুখ তুল্‌তে সাহস হয় না। মনটা যে কেমন হয়ে থাকে তা আমি জানাতে অক্ষম ; সেটা অনুভব করবার জিনিষ, বোঝাবার অযোগ্য—যেন একেবারে নির্জীব ও স্পন্দন হীন। আমার সে ব্যথা তুমি কখনও বুঝতে পার্বে না। যদি—

"কোনদিন একদিন আপনার মনে, শুধু
এক সন্ধ্যেবেলা
আমারে এমনি করে' ভাবিতে পারিতে যদি
বসিয়া একেলা !"

তবে কতকটা বুঝতে পারতে এবং "শুধু একদিন তরে আমি ধন্য হইতাম, তুমি ধন্য হতে।"

আর, তুমি বোধ হয় এই সময় নিশ্চিন্ত মনে খবরের কাগজের লাইনে মনঃসংযোগ করেছো অথবা নিবিষ্টচিত্তে মনোবিজ্ঞানের জটিল প্রশ্ন ভাব্‌তে ভাব্‌তে পাতা পাল্টাচ্ছো। মন পদার্থটা যে কি এবং তাহার বৃত্তিগুলির অত্যাশ্চর্য ক্রিয়াকলাপ ও বিবরণ জানাবার জন্যে তোমরা যদি মাথামুণ্ডু কতকগুলো তিন চার সের ওজনের বই না পড়ে আমাদের এই বিরহদগ্ধ ও তোমাদের কল্যাণ কামনায় চির-প্রার্থনা-রত মনটার দিকে একবার চেয়ে দেখো, এবং উহার তত্ত্বানুসন্ধানে রত হও, তবে তোমাদেরও যথেষ্ট শিক্ষা ও বিদ্যালাভ হয়, আমরাও বাঁচি। কি ছাই পাঁশ দু'চারখানা ছাপার পুঁথি ঘেঁটে মরো—এতে দেখ্‌বে "নাই সীমা আগে পাছে, যত চাও তত আছে" এবং "যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে।" অযাচিত ও অমনি পাও কি না, তাই বুঝি এত অনাদর—এত উপেক্ষা ! মনে আছে সেই দুজনে একসঙ্গে রবিবাবুর বিদায় অভিশাপে পড়েছিলাম "রমণীর মন সহস্র বর্ষেরি সখা সাধনার ধন।"

যা'ক ওসব কথা, এখানে এসে দেখি তোমার একখানা চিঠি আমার জন্য অপেক্ষা কোর্‌ছে। কোথায় এখানে এসে তোমাকে নিশ্চয় দেখবার কথা, তা নয় কি না একখানা চিঠি পাঠিয়েছো—অত্যন্ত অনুপযুক্ত প্রতিনিধি সন্দেহ নাই। অত আশা দিয়ে আমাকে এমনি করে নিরাশ কোরলে ! এত নির্মম তুমি ? তোমার চিঠিখানা দেখছি এবার অত্যন্ত সংক্ষেপ, কাজের কথা ছাড়া একছত্রও বেশী নাই। এ রকম নিস্তব্ধতা একটা আসন্ন ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ। তুমি লিখেছো যে পরীক্ষা খুব কাছে এখানে এলে পড়ার ক্ষতি হ'বে, তাই এবার আর এখানে আসবে না। এটি তো তোমার মনের কথা নয়। এ সত্যটি কবে আবিষ্কার করলে ?—আমার সেই চিঠিখানা পেয়ে বুঝি ? আমার অন্তরের মধ্যে থেকে একটা প্রতিধ্বনি হোচ্ছে "মিথ্যা অতি প্রকৃত মিথ্যা।" পরীক্ষার আগে তুমি অন্যান্যবার আমার কাছে আসিবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছো। (আমি কাল অনেক রাত পর্যন্ত তোমার সব চিঠিগুলো পড়ছিলাম ; সেগুলো থেকে উদ্ধৃত করে দেবো নাকি ?) এবং আমার সঙ্গে থেকে যথেষ্ট মানসিক বল লাভ কোরতে—একথা তুমিই আমাকে বলেছো, তুমিই আমাকে শিখিয়েছো। এবং কাজেও তাই দেখিয়েছো ; এফ্, এ, ও বি, এ, পরীক্ষার সময় তোমাতে আমাতে এক সঙ্গে ছিলাম, তবে সে পরীক্ষাদুটোতে অতো ভাল করে পাশ কোরলে কেমন করে ? আজ চার বছর তুমি আমাদের সংসারে আনন্দ দান কোর্‌ছো, এ রকম অভিযোগ তুমি কখনো করোনি। আমার কাছে লুকানো বৃথা। এসব কারু মনের কথা নয়—এস এখন গোলমাল ছেড়ে দিয়ে দুজনায় আত্মপ্রকাশ করি। এখানে এবার আসবে না—কেমন ? রাগ হয়েছে বুঝি ? সব জানি গো সব জানি—আমার সেই চিঠিখানা পেয়ে আমার উপরে রাগ (অথবা কৃত্রিম) করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা কর্‌ছো। তোমাকে "অবিশ্বাস" ? পৃথিবীতে আমার দ্বারা আর সমস্তই সম্ভব হতে পারে শুধু ঐটে ছাড়া এটা তুমি জানো—খুব জানো, কারণ আমার

মনের ক্ষুদ্রতম অংশও তোমার কাছে অগোচর নেই : ভালবাসার অত্যুজ্জ্বল কিরণে আমার সমস্ত হৃদয় আলোকিত ও দীপ্তিপূর্ণ করে অতি নিভৃত অংশও তন্ন তন্ন করে দেখে নিয়েছো। তোমার সম্বন্ধেও আমার জ্ঞান এর-চেয়ে কিছুমাত্র কম নয় ; বরং কিছু বেশী, বোধ হয় এ গর্বটুকু কোরতে পারি। আমরা পরস্পরকে এত ভালো করে জানি যে সূর্যে শৈত্য মনে করতে পারি তবু দুজনের মধ্যে কখনো সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ছায়া আস্‌তে পারে তা কল্পনাও করতে পারি না। তবে সেই চিঠিখানা পেয়ে দুর্জয় অভিমানের সূত্রপাত করে আমাকে ভয় দেখিয়ে আসবো না বলে শাসানো হচ্ছে কেন ? আমি তোমাকে খুব চিনি গো, আমাকে আর মিথ্যি মিথ্যি ভয় দেখাতে হবে না। কেমন আসবে না—আচ্ছা দেখবো। পড়া ভাল হওয়া দূরের কথা, এখানে না এলে পড়ার সম্পূর্ণ ক্ষতি হবে, আমি বুঝি আর জানিনে। এবার কিন্তু আমার রাগ করবার পালা, সে কথা মনে থাকে যেন। তুমি যতই রাগ কর না কেন তোমাকে সেই তুমি বলেই জানি। আমি বেশ জানি তুমি আমার সেই চিঠি সত্যি বলে নেওনি। কেন তোমাকে ও রকম লিখেছিলাম বিস্তারিত এখানে এলেই জান্‌তে পারবে, এবং সমস্ত শুনে তুমি খুব হাসবে। জানো ? এসব সুরোদিদির কাণ্ড। কেমন ? মিটমাট হোলো তো ?

তুমি আর একমুহূর্ত দেরী কোর না ; এরকম করে প্রতিদিন আশায় আশায় থাকা কি কষ্ট ! তুমি কথামত ঠিক সময়ে এসোনি দেখে বাবা মা অসুখ হয়েছে ভেবে ভারি ব্যস্ত হয়ে টেলিগ্রাম করেছেন। আর বছর ঠিক এই সময়ে এখানে কত সুখের দিন কেটেছে, মনে করতে কষ্ট হয়। সেই সব স্মৃতি একে একে দ্রুত এসে আমাকে অস্থির করে তুলছে। সেই তোমাতে আমাতে প্রথম একলা দুজনে বেড়াইতে যাওয়ার কথা মনে পড়ে কি ? সেদিন মা কোথায় জানি গিয়াছিলেন, আর তুমি এসে তোমার সাথে বেড়াতে যাবার জন্য ধ'রে বসলে। বাপরে কি লজ্জা ! হৃদয়ে তীব্র বাসনা, বাহিরে বিষম লজ্জা। কিন্তু তবু যেতে হোলো। তুমি যে দুষ্টু তোমার সঙ্গে পার্বে কে ? তুমি হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলে। প্রথম প্রথম লজ্জায় মরে যেতাম, কিন্তু তার পরে কি আশ্চর্য পরিবর্তন ! দু চার দিন যেতে না যেতেই মাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে তোমার সঙ্গে সেই আমগাছ তলায় মিশতাম। একটা বৃহৎ পরিবর্তনের জন্য একটা বৃহৎ আকর্ষণেরই প্রয়োজন। সত্যি আমি ভাবি আমার সে সব আগের লজ্জা, সঙ্কোচ কোথায় গেল ! তুমিই সব গ্রাস করেছ ! এখন সহস্র লোকের মাঝখানে তোমার কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছা করে। আমরা সেদিন আর, মিত্তিরের বাগানের পাশ দিয়ে আসছিলাম। আমার কিন্তু একটুকুও ভালো লাগ্‌ছিল না, শুধু তোমার সঙ্গে এই বাগানে বেড়ানোর কথা কেবলি মনে হচ্ছিলো। সেই দুজনে বেড়িয়ে বেড়িয়ে ফুল তোলা ও গাছতলায় বসা ; তার পরে ফেরবার সময় আমার পায়ে কাঁটা ফুটলো। তুমি আমার শত নিষেধ সত্ত্বেও সেখানে আমাকে বসিয়ে সেটা না তুলে দিয়ে ছাড়্‌লে না। তুমি না থাকাতে আমি এক মুহূর্তও নিজেকে ভাল করে অনুভব কোরতে পারছি না, মনে একটুও শান্তি নাই। আমাদের বেড়ানোর রাস্তাগুলিতে তোমার পদচিহ্ন যেন এখনও অঙ্কিত রয়েছে। সেই গাছ, সেই বাতাস, সেই আকাশ সব সমস্বরে তোমার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। এবার আর চিঠির তলায় শুধু নামটুকু পাঠালে হোচ্ছে না, একেবারে সশরীরে উপস্থিত হওয়া চাই। আসবার সময় একটা জিনিষ আনবে। এলাহাবাদ থেকে আস্‌তে গাড়ীতে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়। তার নাম রেবা। দেখতে বেশ সুন্দরী আর খুব লক্ষ্মী। আমাদেরই বয়সী। তার স্বামী এবার ডাক্তারী পাশ দিয়েছে অল্প সময়ের মধ্যে তার সঙ্গে এত ভাব হয়ে গেল যে সে বৈদ্যনাথে নামবার সময় আমাকে একশিশি "কুন্তলীন", খান কয়েক সাবান এবং আরও

দু একটা জিনিষ দিলে। তারা এ সপ্তাহ পরে এখানে আসবে। তাকে আমি পূজোর উপহার কিছু দিতে ইচ্ছে করি সুতরাং একটা "দেলখোস", একখানা "নৌকাডুবি" এবং তোমার পছন্দমত মেয়েদের দেবার উপযোগী কিছু জিনিষ আনবে। চিঠিখানা খুব বড় হয়ে পড়লো (আমাদের প্রথম মিলনের পরের চিঠিগুলোর চেয়ে ঢের ছোট নয় কি ?) ষষ্টী পুজোর আগে অর্থাৎ বুধবারের দিন আস্‌তে হবে কিন্তু নিশ্চয়। তা না হোলে বুঝতেই পারছো, ভয়ঙ্কর রাগ্—ঘোরতর অভিমান—অশ্রুজলের প্রবল বন্যা। আমাদের এই সময়ের অবস্থা কার্যে যতই কষ্টদায়ক হোক না কেন, বস্তুতঃ আমার কাছে ইহাই সুখের বলে মনে হয়। দূর থেকে এই রকম একটা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আশায় আশায় থাকা, আজ আসবে, কাল আসবে, এলে তোমাকে নিয়ে কত কি করবো, ভবিষ্যৎ সুখের একটা জাল বুনে এই রকম একটা প্রাণের রুদ্ধ আবেগ নিয়ে থাকা, কতো মধুর। মিলনের দিনগুলো কত শীঘ্র কেটে গিয়ে আবার বিরহের ব্যথা এনে দেয়। আমি এই বসে কত দূর থেকে তোমাকে চিঠি লিখছি, কিন্তু তোমার উপস্থিতি ও স্নেহস্পর্শ অনুভব করছি। তুমি ম্যেন্ট্যাল টেলিপ্যাথি (mental telepathy) বিশ্বাস কর না আশ্চর্য ? কেন আর বছর তুমি যখন ট্রাম থেকে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছিলে, আমি ঠিক সেই মুহূর্তে কেমন করে জানতে পেরেছিলাম ?

আগের চিঠিতে আমার জন্যে কি আন্‌বে জান্‌তে চেয়েছিলে। ওসব আমি কিছু জানিনে। শুধু তুমি—তুমি আস্‌বে। ইংরাজী পড়ার বইখানা আমার ছোটভাই ছিঁড়ে ফেলেছে একখানা আনবে। এখানে সব ভাল। আশা করি তুমি ভাল আছ। আমার প্রণাম ও ভালবাসা নিও এবং আরও কিছু। আমি এই বত্রিশ ঘণ্টার প্রত্যেক সেকেণ্ড গুণ্‌ছি মনে থাকে যেন।

তোমার অজিতা
নিরুপমা দাসী

পূজার চিঠি

বন্দে মাতরং

দেখ, তোমাকে চিঠি লিখতে বসলেই ভারি একটা গোলমাল ঠেকে, সেই জন্যই ত দুই মাস ছ' মাসের একখানা চিঠি লেখা হয়ে ওঠে না। কি পাঠ লেখা যায় ? প্রাণনাথ, প্রাণকান্ত, হৃদয়সর্বস্ব, জীবনসখা—এ পাঠগুলো মনে হলেই বোধহয় কে যেন চুলের মুঠি ধরে সবেগে পিঠে শতমুখী চালাচ্ছে ! ও সম্বোধনগুলো যাত্রার দলের গোঁফ কামানো নকল মেয়েদের নাকি সুরেই শোনায় ভাল। এমন কি, একালে উপন্যাস স্বর্গ থেকেও এ সম্বোধনগুলি নির্বাসিত হয়েছে; অতএব আমায় মাফ্ কর, সম্বোধনটা উহ্য রৈল।

ঠাকুরঝি বলেন, প্রিয়তমেষু পাঠটি মন্দ নয়; প্রাণাধিকেষু আরও ভাল। কিন্তু সম্বোধনের এত জাতিবিচারের আবশ্যক ? তুমি আমার প্রাণের 'অধিকেষু' তাতে তোমার সন্দেহ আছে কি না তা তুমিই বলতে পার, কিন্তু আমি যে তোমার প্রাণের 'অধিকেষু' তা আমার এই বৃদ্ধ বয়সে অর্থাৎ বিশ বৎসর বয়সেও যদি বুঝিতে না পারি, তা হ'লে ভগবানের উচিত ছিল আমাকে দাড়ি গোঁফ দিয়ে কেরাণী করে আফিসে পাঠানো। কিন্তু আমার এই কথায় যদি তুমি মনে করে থাক, কেরাণীদের আমি একটি সপুচ্ছ ভারবাহী চতুষ্পদের সঙ্গে

তুলনা করচি, তা হলে বড় অন্যায় হবে। সহিষ্ণুতায় তারা কেরাণী জীবনেব আদর্শ সন্দেহ নাই, কিন্তু বুদ্ধিতে খাটো!

অনেক দিন পত্র লিখিনি বলে গোসা হয়েছে। দেখ্‌চি তুমি ভারি অবুঝ! সংসারে কত কাজ জান ত? বুড়ো শাশুড়ী ভোরে উঠে সংসারের দাসীবৃত্তি করবেন, রাত্রি পর্যন্ত একভাবে খাট্‌বেন, আর আমি দিনের মধ্যে তিনবার সাবান মাখবো, কাপড় বদলাবো, দুপুর বেলায় দেখনহাসি কি বেগুনফুলেব বাড়ী তাসের আড্ডায় মিশবো, আর সন্ধ্যা না হতেই 'সখি, আমায় ধর ধর' অর্থাৎ বিছানায় শুয়ে নবেল না পড়লে বাঁচবো না, এত আবদার আমাদের মত গৃহস্থের বৌ ঝির সহ্য হয় না।

কিন্তু ভগবান ত নারীহৃদয় দিয়ে ভারতে পাঠিয়েছেন, সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর যখন রাত্রে টুনুরাণীকে কোলের মধ্যে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি, তখন কতদিন স্বপ্নঘোরে দেখিছি, তুমি যেন মেঘে চড়ে অন্ধকার ঘরে আমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছ, তোমার চোখে যেন চাঁদের আলো, মুখের হাসিতে যেন কত বাঁশির স্বরমাধুরী, আব নিশ্বাসে যেন ফুলেব গন্ধ! আর তোমার সেই স্বপ্নময় স্পর্শ, সে স্পর্শে যেন কত জন্মজন্মান্তরে বিস্মৃত সুখ মনে পড়ে ; মনে হয়,—

"পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে?
রূপ না দিলে যদি বিধি হে।
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে?"

কিন্তু যাক্ এ সব উৎকৃষ্ট কাব্য, কাব্য প্রকাশের বয়স আর আছে কি? এখন যে আমি ছেলের মা :

তবু সত্যই এক এক সময় মনের মধ্যে হু হু করে, কেন তার কারণ খুঁজে পাইনে ; কি যেন অতৃপ্তি, কি যেন অভাব! কবির ভাষায় কি ইহারই নাম বিরহ? কবি গাহিয়াছেন,

"মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।"

আমি কিন্তু কবি হলে গাইতাম,

বিরহরে, তুঁহু মম প্রাণ সমান।

বিরহ প্রিয়জনের স্মৃতিকে উজ্জ্বল, মধুময় ও উপভোগ্য করে তোলে ; প্রাণই সেই কাঁচা সোনার কষ্টিপাতর। প্রাতঃ সূর্যের লাল আলো, ভিখারীদের মোটা সুরে আগমনী গান, দীঘির পর পারে সুদূর মাঠে বিকশিত কাশ-কুসুমের শুভ্র-শোভা, আব রাত্রে চাঁদের মধুর হাসি—এ সব যেন কেবল মিলনেরই মধুর বার্তা বহন করে আনচে। সুতরাং আমাদের সুখ দুঃখের দেবতা বিধাতা পুরুষ যদি খুব লম্বা দাড়ি গোঁফে সাজসজ্জা করে, পিঙ্গল বর্ণ নিবিড় জটাজালে আচ্ছন্ন হয়ে আপাদ মস্তক ভস্ম মেখে সাধু সন্ন্যাসীর মত আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াতেন, আর দক্ষিণ হাত তুলে বলতেন, 'বল্ তোর কি বর চাই?' তাহলে আমি নিশ্চয়ই তাঁর কাছে হাতজোড় করে বল্‌তাম, 'আমি অমর হতে চাইনে, কেবল আমি যার তার কাছে ইচ্ছামত উড়ে যাবার বর চাই'। নিজ গুণে মাঝে মাঝে ধরা দেও বটে, কিন্তু তোমায় ধরে রাখি এত শক্তি আমার কোথায়?

পূজার ত আর দিন পনের মাত্র দেরি আছে, তুমি আর দশ বার দিন পরে বাড়ী আস্‌চো শুনে আশ্বস্ত হয়েছি। কিন্তু তাও ত এখনও কম দেরি নয়। যদি বিরহের মেয়াদটা লম্বায় দশ দিন হয় তা হলেও সে হচ্ছে দুশো চল্লিশ ঘণ্টা অর্থাৎ চৌদ্দ হাজার বারশো মিনিট! বাসরে! এক একটা দিন যদি চব্বিশ ঘণ্টায় শেষ না হয়ে চব্বিশ মিনিটে কাবার হয়ে যেত,

তা হলে বেশ মজা হতো ; কিন্তু আরও কিছু চাই ; তুমি বাড়ীতে যে কদিন থাকবে, তার এক একটা দিন কুম্ভকর্ণের নিদ্রার মেয়াদের মত লম্বা হ'লে একরকম চলে ! কিন্তু হায়, আমি কি স্বার্থপর ! স্বদেশী মামলায় স্বদেশের গৌরব ও সম্মান রক্ষা কর্তে গিয়ে আজও যাঁরা জেলে দিন কাটাচ্ছেন, এ আনন্দোৎসবের মধ্যে তাঁদের স্ত্রী পুত্র কন্যাদের সুখ ও শান্তির জন্য প্রার্থনায় আমাদের অবসরের যেন অভাব না হয়।

এখানে মেয়েদের দলে স্বদেশী আন্দোলন কেমন চল্‌চে, জানতে চেয়েছে ; দুই এক কথায় ইহার উত্তর দেওয়া যায় না ; আমরা সখীতে সখীতে কি কোন পরিচিত মেয়েদের সঙ্গে দেখা হলে 'বন্দে মাতরম্' বলে সম্ভাষণ করি। সে দিন নদীতে স্নান করতে গিয়ে দত্তদের নিরুপমার সঙ্গে দেখা হলো। সে তার স্বামীর কাছে বরিশালে থাকে, তার স্বামী একজন ডেপুটী। নিরুর সঙ্গে চোখোচোখি হবামাত্র সে একটু হেসে মাথা নুইয়ে আমায় বল্লে 'বন্দেমাতরম্',—শুনে অনেক বৌ ঝি হাসলে ; আমি বল্লেম, 'সে কি লো ! তোর স্বামী যে ডেপুটী, তুই পথে ঘাটে বন্দে মাতরম্ বলছিস্, তাঁর চাকরী থাকবে ত ?' নিরু বল্লে, 'আমি তো আর সরকারের গোলাম নই ; আর সরকারের চাকরী করে বলেই কি ছেলে মাকে সম্মান করবে না ? ওদের কি এতই অধঃপতন হয়েছে মনে করিস্ ?'—শুনে আমার প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। এখানে একটা স্বদেশী মামলা হয়ে গিয়েছে, কয়েকটি ছেলে ফৌজদারীর আসামী হয়েছিল, আমরা মেয়েরা চাঁদা তুলে তার মামলার খরচ চালিয়েছি ; একটি মেয়ের হাতে টাকা ছিল না, সে তার সোনার মাকড়ি কাণ থেকে খুলে দিলে। স্বদেশীতে তোমরা আমাদের জিতে যাবে তা মনে করো না। আমাদের কার্যক্ষেত্র পুলিশের রেগুলেশন লাঠির সীমানার বাহিরে। আমাদের স্বদেশী যারা দমন করতে আসবে, তাদের জন্য মুড়ো ঝাঁটা তুলে রেখেছি, তার এক একটি খিল যেন দধীচি মুনির এক একখানি অস্থি !

নিরু এখানে এসে খুব স্বদেশী প্রচার করচে, এমন কি আমাদের বাড়ীতেও তার প্রচার কার্যের বিরাম নেই ! আমাদের ঝি ভবির হাতে কাচের চুড়ি ছিল, আমি তাকে চুড়ি ভাঙ্গতে কতবার বলেছি কত লোভ দেখিয়েছি ; ভবি ভুলবার নয়।' কিন্তু নিরু ভবিকে আচ্ছা রকম সায়েস্তা করেছে ! নিরু একদিন আমাদের বাড়ী বেড়াতে এসে ভবিকে এক গ্লাস খাবার জল দিতে বল্লে ; ভবি এক গেলাস জল এনে দিলে ; হাত বাড়িয়ে জলের গেলাস নিতে গিয়ে নিরু তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিলে, মুখ বাঁকা করে বল্লে 'তোর হাতে জল খাব না'।—ভবি বল্লে, "বেশ দিদিমণি, আমি কি অজাত ? আমি গয়লার মেয়ে !" নিরু বল্লে, 'জাতে তুই গয়লার মেয়ে বটে, কিন্তু আচরণে তুই মেথরের অধম, বিলিতি চুড়ি হাতে দিয়ে তুই আমাকে জল দিতে এসেছিলি, তোর একটু লজ্জা হ'ল না ?"—ভবির চোখ দুটি ছল ছল করতে লাগলো, আর কিছু না বলে সে চলে গেল. তারপর জাঁতির ঘা দিয়ে চুড়ি দুগাছা ভেঙ্গে আর এক গেলাস জল নিয়ে এল। এবার জল পানে আর নিরুপমার আপত্তি হলো না ; সে আমাকে বল্লে শৈল, ওকে দুগাছা শাঁখা কিনে দিস্।'

টুনু আমার আড়াই বছরের মেয়ে, সে বলে, 'মা, আমি আঙা কাপল নোব, বিলিতি কাপল পলবো না।' সবচেয়ে মজা হয়েছে তোমার পিসিমার হরিনামের ঝোলা নিয়ে। ঝোলাটির ত সতেরো জায়গায় রিপু করা, মান্ধাতার জন্মের দুই দশ বৎসর আগে কি পরে সেই ঝোলার সৃষ্টি, তা ঠিক করা ভারি শক্ত। ঝোলাটির এক ধারে সবুজ আর একধারে লাল মখমল, তার উপর সুতো দিয়া 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণ ভরসা' মার্কা মারা। আমি বল্লাম, 'পিসিমা, তোমার হরিনামের ঝুলির উপর পর্যন্ত বিলিতি কাপড়ের নিশান উড়িবে, তোমার উপর কি নারায়ণের দয়া হবে ?'—পিসিমা তারপর না হবে বিশজনের কাছে সেই কাপড় যাচাই

করেছেন, কিন্তু কেউ বল্লে না যে কাপড়টা দেশী। তখন তিনি একদিন নদীর জলে ঝুলিটি ভাসিয়ে দিয়ে এলেন! তাঁর জন্যে একটা দেশী কাপড়ের ঝুলি যেখান থেকে পাও নিয়ে এসো। আমিই তাঁর ঝুলিটির গঙ্গাযাত্রার কারণ।

তারপর ?—তুমি ত বাড়ী আসচো ; আমার জন্যে কি আনতে হবে জান্‌তে চেয়েছ। তুমি নিজে এলেই আমার সকল আশা পূর্ণ হবে ; তবে দুই একটা বরাত না দিলে হয়ত তুমি মনে ভাবতে পার আমি অভিমান করে বসে আছি। দেখ, সেদিন ঘোষেদের সুকুমারীর ছেলের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ ছিল, সুকুমারীর মামাতো বোন কল্লোলিনী কলকাতায় থাকে, সেদিন একটা তেল দিয়ে চুল বেঁধে এসেছিল ; হঠাৎ যেন সদ্যফোটা গোলাপের মিষ্ট গন্ধে ঘরটি ভরে উঠল, বিস্তর রকম তেল দেখেচি, কিন্তু তেলের এমন মিষ্ট মোলায়েম গন্ধ আর কখন নাকে যায়নি। শুনলাম, সেটা গোলাপগন্ধি কুন্তলীনের গন্ধ! তবু তার আগের দিন বৈকালে চুল বাঁধা। কল্লোলিনীর পাশে আর একটি ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে আগে আর কখনও দেখিনি, কে অনাথ বাবু মুন্সেফ আছেন, তাঁরই মেয়ে ; নামটি বেশ,—পারুল। তার সোনালী জরির 'বন্দে মাতরম' পেড়ে কাপড থেকে একটা চমৎকার এসেন্সের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল! সেই মধুর গন্ধটিতে যেন উৎসবের আমোদ আরও জমাট বেঁধে আস্‌ছিল। তিনি ত রেগেই খুন!—বল্লে, 'কাপড়খানি ত বন্দে মাতরম পেড়ে, কিন্তু এসেন্সটা যে বিলিতি,—এক কলসী দুধে এক ফোটা গোচোনা।' পারুল হেসে বল্লে, 'গাল দেও কেন দিদি, বিলিতি এসেন্স কোন্ দুঃখে মাখবো ? স্বদেশী এসেন্স দেলখোসের নামও কখনও শোননি ?' বিনি ত অপ্রতিভের এক শেষ!—ঐ রকমের কাপড় একখান, আর কিছু কুন্তলীন ও দেলখোস আনবে।

বেলা শেষ হয়ে এসেছে, ডাকের সময় যায় যায়। কত কথা লিখিবার থাকে, সব কথা কি ছাই মনে আসে ? আর মনে এলেও কলমের মুখে আসে না। এ লোহার কলম, পুষ্পশর নয় তা মনে রেখো, অতএব এখানেই তোমাকে মুক্তি দান করা গেল। ইতি।

তোমার ভাঙ্গা ঘরের চাঁদের আলো
শৈল।
যশোমালিনী দাসী

পূজার চিঠি

শ্রীচরণেষু,

আজ ভোরবেলায় স্বপ্ন দেখ্‌ছি যেন তোমার একখানি চিঠি পেয়েছি। সেখানি যেন কত সুন্দর, তাতে যেন তুমি অনেক কথা লিখেছ, তুমি যেন আমার গৃহস্থালি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়েছ। সে চিঠিখানি খুব বড়। এমন সুখের স্বপ্ন আমার বেশীক্ষণ দেখা হল না, কেননা খোকার চিৎকারে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। তখন দেখি সূর্যের আলো এসে ঘর উজ্জ্বল করে ফেলেছে, অনেক বেলা হ'য়ে গ্যাছে দেখে তাড়াতাড়ি উঠলাম—মন কিন্তু তখনও স্বপ্নের দিকে পড়ে আছে, স্বপ্নের কথা ভাবতে ভাবতে নীচে নেমে আস্‌ছি, কি আশ্চর্য দেখ, নীচে নেমেই দেখি বিশুয়া একখানি চিঠি হাতে করে আসছে। আমায় দেখে বল্লে, "বহুমা, তোমার চিঠ্‌ঠি।" আমি চিঠি নিয়ে তাড়াতাড়ি উপরে এলুম, তোমার হাতের লেখা দেখে তখন আমার যে কি আনন্দ হ'ল—তা' কি কখন চিঠিতে লেখা যায় ? চিঠি

পড়া শেষ করে নেমে আস্‌তেই মার সঙ্গে দেখা হ্‌ল। তিনি আমাকে দেখে বললেন, "বড় বেলা হয়ে গ্যাছে বৌমা—শীগ্‌গির করে কাপড়টা কেচে এস।" আমি লজ্জিতভাবে চলে যাচ্ছিলুম, তিনি আমায় ডেকে বললেন, "বৌমা. তোমার হাতে কার চিঠি, মণি লিখেছে কি ?" তখন আমার যে কি লজ্জা হ'ল তা তুমি বুঝতেই পাচ্ছ। আমি কিছুই বলতে পাল্লুম না, মা বোধ হয় বুঝতে পাল্লেন, তিনি একটু হেসে বল্লেন, "আমার কাছে লজ্জা কি রাণীমা ?" মণি ভাল আছে ত ? সে কবে আস্‌বে ?" মাব আদরের ডাকে আমার আরও লজ্জা পেতে হ'ল। আমি কোন রকমে বলে ফেললুম, "কবে আস্‌বেন তা'ত লেখেননি, মা।" সত্যি, তুমি কবে আস্‌বে তা' কিছু লেখ্‌নি কেন ? পূজোতো কাছেই, আমি সমস্ত চিঠিটি খুঁজে তোমার আসার কথাটি খুঁজে পেলুম না। খোকা আমায় রাতদিন তুমি কবে আস্‌বে জিজ্ঞাসা করে, তার কি উত্তর আমি তাকে দিব, তা' তুমি অবশ্য লিখ। তুমি এবার এসে দেখ্‌বে আমার ঘর নূতনরূপে সজ্জিত। যে কাচের পুতুলগুলি সাজান ছিল সেগুলি আর নাই ! তার বদলে কাশীর কাঠের খেল্‌না সাজিয়ে রেখেছি। তুমি যে আমাদের পুকুরটিকে সবুজ পানায় ভর্তি দেখেছিলে সে আর তেমন নাই, এখন তাতে পরিষ্কার নির্মল জল টলটল কচ্ছে,—যদিও সে দেখ্‌তে বড়ই সুন্দর, তবু খোকার জন্যে আমার বড়ই ভয় হয়, সে যে দুরন্ত ছেলে ! তাকেতো খুব সাবধানে রেখেছি। খোকা এখন বেশ বড় হয়েছে, আর তার মুখখানি এমন সুন্দর হ'য়েছে, সে মোটেই আমার মত হয়নি, কার মত হ'য়েছে তা' তুমিই বলতে পার। আমি তা'র কচি নরম হাত দু'টি যখনই দেখি তখনই ভাবি এই হাত দু'টি চিরকাল যেন দেশের কাজ করে, চিরকাল যেন এমনি শুভ্র এমনি কোমল কোমল থাকে, তা' যেন কখন মলিন হয়ে না যায়। কল্‌কাতায় এখন স্বদেশী কেমন ? কল্‌কাতায় বোধ হয় এখন বিলিতি জিনিস কেনা উঠে গ্যাছে, সেখানকার মেয়েরা বোধ হয় বিলাসিতা একেবারে ত্যাগ করেছেন. এখানকার মেয়েরাও বোধ হয় দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্চেন, সেদিন অনেক মেয়েই বিলিতি চুড়ি ভেঙ্গে ফেলেছেন। আর পিসিমার ছোট বৌকে বিয়ের সময় বিলিতি চিরুণি দিয়েছে বলে সকলে অকল্যাণ করা হ'য়েছে বলে ভয় পেলেন। এখানে এখন সকলে বিয়েতে বিলিতি জিনিসকে অকল্যাণ করা মনে করেন দেখে আমার এমন আনন্দ হয় যে আর কি লিখব।

মা আসছেন। সকলেই তাই বল্‌ছেন, যথার্থই কি এবার মা আস্‌ছেন ? এবার যথার্থই মাকে প্রত্যেক গৃহে তাঁহার ছেলেরা আহ্বান করেছেন। আমাব যখন কোনও কাজ না থাকে, যখন আমি একলা থাকি তখন ভাবি তোমাব যেন পড়া শেষ হ'য়ে গ্যাছে, তুমি দেশের জন্য কত কাজ কোরছ, জননী জন্মভূমির সেবা কোরছ, সকলেই তোমার নাম করছে—যখন ভাবি তখন আর কিছু মনে থাকে না। আমি জানি এখনও তুমি খুব স্বদেশী, বিলিতি জিনিস ব্যবহার পর্যন্ত কর না, কিন্তু তবুও এ কল্পনাটি আমার বড় প্রিয়।

তুমি লিখেছ, আমি মোহনপুর কবে যাব ; আমি কি মাকে ফেলে কোথাও যেতে পারি ? যদিও মোহনপুর আমার বাপের বাড়ী, তবু মার কাছে আমার সব। মা এখন বুড় হ'য়ে গ্যাছেন। তিনি কি একলা থাকতে পারেন ! তুমি আর এমন কথা আমাকে লিখ না। ভগবান তাঁকে যতদিন আমার কাছে রাখবেন ততদিন আমি যেন মোহনপুর যাবার কথা মনে স্থান না দিই। তুমি অবশ্য মাকে*রোজ একখানি করিয়া চিঠি লিখবে। তুমি তো জাননা, তিনি তোমার জন্য কত ব্যস্ত, দিনে একবার করে, তোমার নাম না কল্লে থাকতে পারেন না। আমার কাছে প্রায়ই তোমার চিঠি এসেছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন, যদিও তুমি মাকে খুব বেশী চিঠি লেখ তথাপি মা যদি রোজ চিঠি না পেলে ব্যস্ত হন তবে তোমার রোজ চিঠি লেখাই

উচিত। মা এখন ভাল আছেন। মার কথা বেশী লিখলে তুমি যেমন সুখী হও, মাও তেমনি। তিনি তোমার ছেলেবেলার কথা, গল্পের কথা, খাওয়ার কথা বলতে বড় ভালবাসেন। এতক্ষণ একটি বিশেষ কথা লিখ্‌তে বড় ভুলে গেছি, তুমি কেমন আছ ? ভাল আছ তো ! তুমি কেমন আছ একথাটি লিখতে যেন ভুল না, আমি দেখি তুমি ঐটে লিখতে বড় ভুলে যাও। এবার আর তুমি কেমন আছ জানতে চাইনে, তোমাকেই স্বচক্ষে দেখতে চাই।

তুমি লিখেছ, "পূজার সময় কি আনব"। কি আনতে লিখ্‌ব ; খোকাব একটিও জামা নাই, তার জন্য দবকারী জামা কটা এনো—তার মধ্যে যেন একটুও বিলিতির স্পর্শ থাকে না। খোকাত কখন বিলাতি জিনিস ব্যবহার করেনি, তাকে আমি বিলাতি জিনিস ছুঁতে দেব না, বিদেশীর স্পর্শে তা'র পবিত্র দেহখানি কলঙ্কিত কর্ব না। মার ঠাকুরের জন্য একটি সিংহাসন এনো, তিনি তাঁর ঠাকুরকে যে ভালবাসেন, ঠাকুরের জিনিস পেলেই সন্তুষ্ট হ'বে না। যাই বল, তাঁর উপর কিন্তু আমার ভারী হিংসা হয়। মাকে যদি জিজ্ঞাসা করি, "তুমি কাকে ভালবাস ?" মা হাসেন, বলেন, "তোর ভিতরেই আমার ঠাকুর, আর আমার ঠাকুরের ভিতরেই তুই।" সে কথা আমি কিন্তু বিশ্বাস করিনে। ঠাকুরের ওপরে হিংসা থাকিলেও কিন্তু আমি তাঁকে একটু একটু ভালও বাসি। তাই তোমাকে ঠাকুরের জিনিস আন্‌তে বলছি। তুমি, আমার জন্য কুন্তলীন আনবে লিখেছ ; আমি তা' কখন ব্যবহার করিনি, কিন্তু অনেক সুখ্যাতি শুনেছি, তবে ঠাকুমার ঝির কাছে একশিশি দেলখোস্ দেখেছি, খুব সুন্দর এনো, আর রবিবাবুর কাব্যগ্রন্থের শিশুখণ্ড ও কর্মফল, এই দুইখানি বই এনো। আর তোমার চিঠি চাইনে তোমায় সশরীরেই দেখ্‌তে চাই। তুমি আমার ভালবাসা বা প্রণাম যেটা ইচ্ছা হয় নিতে পার কত কথা লিখি লিখি করে মনে আসে না। চিঠি লেখার আগে এত ভাবি তোমাকে অনেক লিখ্‌ব। কিন্তু লেখার সময় আর কিছু মনে থাকে না। সে যা হো'ক, এবার তোমায় খুব বড় করে চিঠি লিখ্‌ব। তোমার খোকাবাবু ভাল আছে।

তোমার রাণী
রমারাণী দেবী

পূজার চিঠি

দেব !

তোমার পত্র পাইলাম। তুমি আমায় দেবী সম্বোধন কেন করিয়াছ, জাননা কি উহাতে আমার বড লজ্জা করে ?

আমি তোমার চরণের দাসী মাত্র আমাকে অতটা বাড়াইয়া তুলিয়াছ তোমার নিজগুণে। অমন করিয়া দেবী বলিয়া আমাকে লজ্জা দিও না।

দুই বৎসর হইল আমার বিবাহ হইয়াছে। ইতিপূর্বে তোমায় আমায় শুধু চোখের পরিচয় ছিল। "সেই মনে পড়ে ?" তুমি যখন ছোটদাদার কাছে আসিতে আমি ছোটদাদার কাছে বসিয়া পড়িতাম, যখন তুমি ঘরে আসিতে আমার প্রতি সুদীর্ঘ প্রশান্ত নয়নে চাহিতে যখন আমি চোখ তুলিতাম তখন লজ্জায় দুজনেই চক্ষু নত করিতাম। আমি তখন ছেলেমানুষ ছিলাম না। আমি কি তখন জানিতাম যে বিধাতা আমারই জন্য এ অমূল্য রত্ন সৃজন করিয়াছেন। কত ভাগ্য যে দয়াময় আমার অদৃষ্টে এ মহাসুখ লিখেছেন। বিবাহের পূর্বে

ভাবিতাম যদি এ জন্মে তুমি আমার না হও, হে হরি পরজন্মে যেন তাঁর আপন কেহ আমায় করিও। যাহা হোক আমার শৈশবের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ বাসনা পূর্ণ হইয়াছে না জানি পর জন্মের কত তপস্যায় তোমার মত স্বামী পাইলাম।

তুমি বলিতে রাণী, আমি যখন মেসের ছাতে বসিয়া থাকিব, তখন চাঁদ উঠিবে দক্ষিণ বাতাস প্রাণ মন শীতল করিবে, নগর জনশূন্য হইবে, কলরব থামিয়া যাইবে, তখন চাঁদের পানে চাহিব, তুমিও আমাদের ক্ষুদ্র দাওয়ায় কিম্বা বাঁধান ঘাটে এমনি আমার মতন চাঁদের প্রতি চাহিয়া থাকিও, তখন আমরা দুজন বড় কাছাকাছি থাকিব। আমি কত দিন ওই চাঁদের দিকে চেয়ে বসে ভাবি হায় কত দিনে এইরূপ শুধু দূরে বসে ভাবা শেষ হবে। আমার আশা কবে মূর্তিরূপে প্রকাশিত হবে।

আজ তিনদিন হল ইন্দু শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিয়াছে। তাহার ঠাট্টার জ্বালায় অস্থির হইয়াছি। সে তোমার যে আদুরে বোন এখন সব আদর আমার নিকট হতে পোষাইয়া লইতে চাহে। বাক্সর চাবি কেড়ে চিঠি দেখিবে। কবিতা লেখ কিনা দেখাও, আমি বলি না আজ কাল লিখি না, শেষ কালে বাক্সে সব যখন দেখে তখনি ধরা পড়ি। এইরূপ সমস্ত দিন আমাদের কাড়াকাড়ি চলে।

তুমি যে বই পাঠাইয়াছ সবগুলি পড়া শেষ হইয়াছে, ইংরাজী বইও অল্পস্বল্প পড়া হয়। আমি যদি লেখাপড়া শিখিলে তুমি সুখী হও তোমাকে সুখী করিবার জন্য এ সামান্য কাজ করিতে এত অনুরোধ কেন? আমি তোমার জন্য সকলি করিতে পারি।

মা বলেন "বউমা আমার পাগল মেয়ে"। কারণ প্রত্যহ আমার নূতন হুজুক লেগে আছে, ক দিন আবার মিত্তিরদের বউদের কাছে সেলাই শিখিতে যাচ্ছি। আমার যেরূপ সুকপাল সবি ভাল পাইয়াছি জানি না কত কত পুণ্যের ফলে অমন শ্বাশুড়ী, স্বামী ও ননদ পাইয়াছি। তুমি শুনিয়া সুখী হবে যে আমি রুমাল সেলাই করিতে শিখিয়াছি। ঠাকুর জামাই এসেছিলেন তাঁহাকে ছয়খানি দিলাম। আর ছয় খানি তোমার জন্য রাখিয়াছি। তুমি আসিবার সময় নূতন বই আনিবে শুনিয়া খুব আহ্লাদ হচ্ছে। আমি বই পড়িতে ভালবাসি ইহা ছোটদাদা তোমাকে বলেছিলেন না? এবার ভগবানের কৃপায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বিদেশ যাওয়া শেষ হয়, দয়াময় হরি যেন তাহাই করেন।

তুমি লিখেছ আমার কি চাই? সত্য বলছি এখন সব আছে কিছু চাই না। ইহাতে কি দুঃখিত হলে? কাজ নাই দুঃখে কিছু নিলে যদি সুখী হও তোমায় সুখী করিতে রোজ রোজ চাহিতে পারি। আমায় ইন্দু বলছিল যে তার সব চুল উঠে যাচ্ছে আর আমারও মাঝে মাঝে বড় মাথা ধরে যদি সুবিধা হয় তা হলে এক শিশি কুন্তলীন আনিবে শুনিয়াছি ইহা বড় উপকারী। আর একটি ফরমাস আছে এক জোড়া মখমলের জুতা আনিবে, আমি সলমাচুমকীর কাজ শিখিয়াছি। এক জোড়া জুতা বুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে অবশ্য তাহা শ্রীচরণেষু হবেই। আমার প্রণাম জানিবে। জানিনা কোন্ সৌভাগ্যে তোমার মহামূল্য ভালবাসার অধিকারী হইয়াছি আমি নিতান্ত গুণহীনা। চিঠি দিও। ইতি—

সেবিকা রাণি

সন্তোষকুমারী দেবী

ত্রয়োদশ বৎসর

রাজপুত্র দুঃখহরণ

এক যে ছিল রাজা। তার ছিল এক লক্ষ্মী রাণী, রাণীর নাম পুষ্পবতী। রাজার মস্ত বড় রাজ্য হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, রাজভাণ্ডার ধনধান্যে পরিপূর্ণ। লোক, জন, সিপাই, শান্ত্রীতে রাজপুরী রম্ রম্ গম্ গম্ করতো। রাজার রাজ্যে লক্ষ্মীর দৃষ্টি, রাজার সব ছিল,—ছিল না কেবল ঘর আলো করা সোনার চাঁদ ছেলে, রাজ্যে সবাই সুখী, সুখ ছিল না কেবল রাজরাণীর মনে।

রাণীর আদেশ—রাজপুরীতে সন্ন্যাসী, ভিখারী, আতুর এলে ফিরানো হবে না। রাজপুরীতে সদাই ভিখারী সদাই অতিথি আসত। রাণী নিজে হাতে করে ভিক্ষা দিতেন।

একদিন এক দাসী এসে খবর দিল দুয়ারে একজন সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে, আস্তে ব্যস্তে রাণী পাটের শাড়ী পরে সোনার থালায় পঞ্চাশ রকম সিধা সাজিয়ে সন্ন্যাসীকে দিতে চললেন। প্রসন্ন হয়ে সন্ন্যাসী বলিলেন "মা তোমার কয় সন্তান ?" রাণীর বুকের দুঃখ উথ্‌লে উঠল। চুপে চাপে আঁচল কোণে চোখের জল মুছলেন। সঙ্গের দাসী বল্‌লে "ঠাকুর এমন কিছু ওষুধ দিন, যাতে সোনার চাঁদ রাজপুত্র হয়। রাজ্যের অন্ধকার দূর করে, মহারাজের দুঃখ দূর হয়।"

সন্তান নাই শুনে সন্ন্যাসী বল্‌লেন "মা, পুত্রহীনার হাতে আমি ভিক্ষা লই না, তুমি ভিক্ষা তুলে রাখ, রাজপুত্র জন্মালে ভিক্ষা নিয়ে যাব।"

চোখের জলে দৃষ্টি আঁধার হল, রাণী আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়লেন, হাতের সিধা ধূলায় গড়াগড়ি গেল।

রাণীর দুঃখে সন্ন্যাসী ঠাকুরের দুঃখ হল, বল্‌লেন, "মা এই শিকড় লও, স্নান করে পবিত্র মনে শিকড় বাটা খেও, ভবানীর বরপুত্র জন্মাবেন, এই লও মা বিজয় অসি, সন্তান হলে দিও।" ব'লে ছোট্ট একগাছি ছড়ি, আর একটি শিকড় দিয়ে সন্ন্যাসী ঠাকুর চলে গেলেন।

রাজার মনে আনন্দ, রাজপুরীতে সমারোহ, রাণীর বুকভরা সুখ, মুখভরা হাসি। এই সুখের উপর সুখ বাড়াইয়া সোনার পদ্মের মত এক ছেলে রাণীর কোল জুড়ল, ছেলের রূপে পুরী আলো হল।

রাজ্যে জয় জয় ধ্বনি উঠ্‌লো। রাণীর দুয়ারে ঢোল ডগর বেজে উঠ্‌ল। পুরীর দুয়ারে জয়ডঙ্কা বাজ্‌ল। রাজা রাজভাণ্ডার খুলে দিলেন, দেশে আর কাঙ্গাল গরীব থাকলো না। অনেক দুঃখের ধন তাই রাজপুত্রের নাম হল দুঃখহরণ।

২

অনেকদিন পর রাজার মৃগয়ায় যেতে ইচ্ছে হল। রাজা বড় মৃগয়া করতে ভালবাসতেন। দুঃখহরণকে কোলে পেয়ে রাজা মৃগয়ার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। অনেক দিন পরে আবার মনে হল। রাজা মৃগয়ায় যাবেন, রাজ্যময় সাজ্ সাজ্ পড়ল। সিপাই সাজ্‌ল, শান্ত্রী সাজ্‌ল ঘটা পটা করে রাজা তাঁর নয়নের মণি বুকের ধন দুঃখহরণকে ছেড়ে মৃগয়ায় গেলেন।

সারাদিন বনে বনে ফিরে, রাজা হরিণের পিছনে ছুটে গভীর বন, কত গাছ, কত গাছালী, অন্ধকার হয়ে এসেছে। কোথায় বা সিপাই, কোথায় বা শান্ত্রী, শ্রান্ত হয়ে রাজা গাছতলায়

বস্‌লেন।

বনে কে কাঁদে ? রাজা চম্‌কিয়া শুনলেন বনে যেন কে কাঁদ্‌চে, উঠে চারধার দেখে দেখ্‌লেন, বনে গাছতলায় এক পরমাসুন্দরী মেয়ে।

রাজা শুধাইলেন "কন্যে কাঁদ কেন ?"

মেয়ে উত্তর করলে, "আমি রাজকন্যা, শত্রু দেশ কেড়ে নিয়েছে, মা বাপকে বনের মধ্যে বাঘে খেয়েছে, আমি পথ হারিয়েছি।"

মেয়েটিকে রাজা রাজপুরীতে নিয়ে গেলেন।

৩

রাজা সেই বনের মেয়েকে বিয়ে করলেন। বড় রাণী ছোট রাণীকে আদর করে নিলেন। ছোট রাণীর বুকভরা হিংসা, মন ভরা জ্বালা দুঃখহরণের আদর দেখে রাগে দুঃখে জ্বলে মরে। সতীনের সুখ সতীনপোর সুখ এও কি সওয়া যায় ? ছোটরাণী একদিন রাজাকে বল্‌লেন "বড়রাণী গরবিণী রাজরাণী, আর আমি ঘুঁটেকুড়ানো দাসী ? সাতমহল প্রাসাদ আর সাত্‌শ দাসীতে উহার কি দরকার, ওই সাতমহল পুরী সাত্‌শ দাসী আমায় দাও।"

রাজা বল্‌লেন "তাও কি হয়।"

ছোটরাণী রাগে, ঘরের জিনিস ভেঙ্গেচুরে, চুল ছিঁড়ে, মাণিকের হীরা, হীরার সিঁথি দূরে ফেললেন। তাহার পরে ঘরে দুয়ার দিয়া কেঁদে কেটে রাজ্য ভাসালেন। ছোটরাণীর রাগে পুরী থর্‌ থর্‌ করে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। দাস দাসী ভয় পেল।

ছোটরাণীর কথার কি হেলন হবার যো আছে ? তখন রাজা বড়রাণীকে পুরী হতে বিদায় দিয়ে ছোটরাণীকে শান্ত করলেন। দুঃখহরণকে বুকে চেপে পুরীর লক্ষ্মী পুরী ছেড়ে ভাঙ্গা ঘরে গেলেন। সঙ্গে গেল রাণীর বাপের বাড়ীর এক বুড়ী দাসী।

৪

দুঃখিনী বড়রাণী দুঃখহরণকে বুকে চেপে সকল দুঃখ ভোলেন ; দুঃখহরণকে শুধু অন্ন দিতে, ধুলায় শোয়াইতে রাণীর বুক ফেটে যায়। হায় ! হায় ! এত বড় রাজ্যের রাজকুমার যার সোনার খাটে ফুলের মত কোমল শয্যা, যে আজ সোনার থালায় পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়া খাবে, সে কিনা শুধু অন্ন খায়, ধুলায় শোয়, রাণীর চোখ ফাটিয়া জল পড়ে। দুঃখহরণকে লুকাইয়া রাণী চোখের জল ফেলেন।

একদিন হল কি, দুঃখহরণ খেলে এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লে "মা ওই যে দূরে মস্ত পুরী, যেন আকাশে মাথা ঠেকেছে ওতে কে থাকে আমায় বল।"

রাণী চোখের জল রাখ্‌তে পার্‌লেন না। দুঃখ পেয়ে দুঃখহরণ বললে "মা তুই কাঁদিস কেন আমায় বল্‌ ?"

দুঃখহরণকে বুকে চেপে, চোখের জল মুছে রাণী বল্‌লেন "ওরে অভাগীর ছেলে, আমার দুঃখ তুই কি বুঝবি ?"

দুঃখহরণ ছাড়ে না, রাণীও বল্‌বেন না অনেক করে রাণী সকল কথা খুলে বল্‌লেন, সেই সন্ন্যাসীর কথা, বিজয় অসির কথাও বল্‌লেন। সেদিন আর দুঃখহরণের অন্ন রুচলো না, নিশিতে নিদ্রা আসে না দেখে রাণী বললেন

"কিসের দুঃখ কর তুমি দুঃখিনীর ধন
মায়ের কোলই বাছারে তোর সোনার সিংহাসন।"

মায়ের প্রবোধে দুঃখহরণের মন মান্‌লো না। চুপ করে শুয়ে রইলেন রাণীর চোখে যেই ঘুম এসেছে অম্‌নি দুঃখহরণ আশমোড়া পাশমোড়া দিয়ে উঠ্‌লেন। আতি পাতি খুঁজে অশ্বত্থ পাতায় আঙুল চিরে রক্ত দিয়ে লিখ্‌লেন যে বার বছর পরে ফিরি তো ফির্‌বো, তা না হলে আর ফির্‌বো না।"

লিখন মায়ের শিয়রে রেখে দুঃখহরণ চলে গেলেন। দুঃখহরণ তো চলে গেলেন, এদিকে স্বপ্ন দেখে রাণী ধড়মড় করে উঠে বসলেন, এধার দেখেন, ওধার দেখেন, দুঃখহরণ নাই, শিয়রে দেখেন বটপাতার লিখন। লিখন পড়ে রাণী মাটিতে আছ্‌ড়িয়ে পড়্‌লেন, চোখের জলে মাটী ভিজ্‌ল।"

৫

নিশিরাত্রি বনে লতাটি হেলে না, পাতাটি কাঁপে না। দুঃখহরণের গা ছম্‌ছম প্রাণ চম চম্‌ কর্‌তে লাগল। ভাঙ্গা ঘরে ঘুমান মায়ের কথা মনে করে চোখে জল এলো।

কতকদূর যান, আর চল্‌তে পারেন না, এক গাছতলায় বস্‌লেন। সে গাছে ছিল এক সত্যিযুগের ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর বাসা, পক্ষি পক্ষিণী ছানাদের খাবার আন্‌তে বেরিয়েছিল, ছানা কটি বাসায় কিল্‌বিল্‌ কচ্ছে। দুঃখহরণ দেখেন এক মস্ত অজগর হাঁ করে পাখীর ছানা গিলতে যাচ্ছে। দুঃখহরণ হাতের ছড়ি নিয়ে সাপের মাথায় মারলেন,—একি! একি! দেখ্‌তে দেখ্‌তে লক্‌ লক্‌ ঝক্‌ ঝক্‌ অস্ত্র বেরিয়ে সাপকে দুখানা করে ফেললে!

রাত আঁধার দেখে, পক্ষি পক্ষিণী ডানা মেলিয়ে দিয়ে সাঁ সাঁ করে খাবার নিযে বাড়ী আস্‌ছে, এসেই গাছতলায় দেখে, মস্ত এক অজগর দুখানা হয়ে পড়ে আছে। ভয়ে ডরে কাঁপতে কাঁপতে পক্ষি পক্ষিণী ছানাদের ডাক্‌তে লাগ্‌ল। মায়ের সাড়া পেয়ে ঘুমন্ত ছানারা কিচির মিচির করে করে জেগে উঠলো, মাকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি বল্‌লে "ওই যে দুখানা করা অজগর দেখ্‌তে পাচ্ছ, ও আর একটু হলে আমাদের খেয়ে ফেলেছিলো, গাছের তলায় ওই বসে আছেন মানবের সন্তান, উনি না থাক্‌লে আমাদের আজ আর দেখ্‌তে পেতে না।"

পক্ষি পক্ষিণী কি দেবে কি কর্‌বে ভেবে পায় না। তারা তাড়াতাড়ি বাসা থেকে নেমে এসে দুঃখহরণের মাথায় ডানা নেড়ে বাতাস করতে লাগলো, বন থেকে ঠোঁটে করে ফল নিয়ে এলো, পাতার ঠোঙায় জল নিয়ে এসে দুঃখহরণকে খেতে দিল।

পাখীর ছিল চারটি ছানা, দুটি ছানা নিয়ে রাজপুত্রের হাতে দিয়ে বল্লে—

"দুঃখিনীর ধন দুঃখহরণ কোন্‌ দেশে বা যাও
পক্ষিণীর এই ছানা দুটি সাথে করে নাও"

ছানা দুটিকে নিয়ে যেতে যেতে দুঃখহরণ এক গভীর অন্ধকার বনে এসে পড়্‌লেন। সে বনে রাস্তা হারিয়ে ঘুরে ঘুরে দুঃখহরণ একটা পুরানো বটগাছের গোড়ায় বসলেন। ছানা দুটি কাঁধের উপর বসেছে তারা পাখা ঝট্‌পট্‌ করে, আর চিঁ চিঁ করে ডাকে। ব্যাপার কি! চেয়ে দেখেন কিনা একটা প্রকাণ্ড বাঘ হাঁ করে তাঁর দিকে ছুটে আস্‌ছে।

তখন ঘাম ঝর্‌ঝর্‌ গায়, রাজপুত্র উঠে দাঁড়ালেন। বাঘ যেমন হাঁক করে দুঃখহরণের ঘাড়ের উপর পড়্‌বে, অমনি হাতের ছড়ি নিয়ে কৌশল করে ঠিক তার মাথার উপর মার্‌লেন। বাঘ রক্তে ভেসে, জিভ বার করে, মাটিতে পড়ে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগ্‌লো। সে বাঘ সত্যিকালের বাঘ, মা ভবানীর বাঘ, তাই মরলো না, অন্য বাঘ হলে তখুনি মরে যেত।

বাঘের কষ্ট দেখে দুঃখহরণের বড় কষ্ট হলো। সত্যিকালের পাখীর ছানা গাছ গাছালা, ওষুধ বিষুধ অনেক জানে। পাখী দুটিকে ওষুধের কথা জিজ্ঞাসা করে, বন থেকে এক রকম লতার রস এনে বাঘের গায়ে মাখিয়ে দিলেন। বাঘের গায়ের ব্যথা সেরে গেল, এক লাফে বাঘ উঠে দাঁড়িয়ে দুঃখহরণকে অনেক স্তুতি মিনতি কল্লে।

বাঘের ছিল চারটি ছানা দুটি ছানা নিয়ে এসে বল্লে—

"অচিন দেশের রাজপুত্তুর নচিন দেশে যাও
বাঘিনীর এই ছানা দুটি সাথে করে নাও।"

৬

দুঃখহরণ তো অনেক দূর যাচ্ছেন বনের আর শেষ নাই, বাঘেরা গাছ ভেঙ্গে রাস্তা করে দিচ্ছে, আর পাখীরা বন থেকে মিষ্টি মিষ্টি ফলের, আর শীতল ঝরণার জলের সন্ধান নিয়ে আস্‌ছে। অনেক করে বন পেরিয়ে দুঃখহরণ চল্‌তে লাগলেন। কত শত রাজ্য, কত নিগম নিছম পুরী, কত ঘুমন্ত রাজার দেশ পেরিয়ে দুঃখহরণ চল্লেন। দুঃখহরণ কোথায় যাচ্ছেন তার নাই ঠিক, নাই ঠিকানা, শেষকালে তেপান্তরের মাঠে এসে পড়লেন। সে মাঠেতে নাই দিক, নাই অন্ত, কেবল ধূ ধূ কচ্ছে প্রকান্ড মাঠ, সেই মাঠ পেরুতে মাস কেটে গেল বছর কেটে গেল।

শেষে এক রাজার রাজ্যের সীমানায় পড়লেন। ক্ষিদেয় টা টা কচ্ছে, তেষ্টায় ছাতি ফাট্‌ছে, দুঃখহরণ আর পথ চল্‌তে পাল্লেন না। পথের দুইধারের গাছে আম কাঁঠাল আরো কত কি ফল ফলে আছে। ঝরণায় শীতল জল কল কল শব্দ করে বইছে। দুঃখহরণ ও তাঁর সঙ্গিরা গাছের ফল আর ঝরণার জল, পেট পুরে খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হতে না হতেই সেই দেশের রাজার সাত পাইক এসে তাদের ধরে নিয়ে গেল।

৭

ফল চুরির অপরাধে, রাজার বিচারে দুঃখহরণকে, সেই দেশের রাজবাড়ীর দেবতা ছিল এক প্রকাণ্ড অজগর, তার মুখে ফেলে দেওয়া স্থির হল। আর বাঘের ছানা আর পাখী দুটোকে রাজা চিড়িয়াখানায় বন্ধ করে রাখ্‌তে হুকুম দিলেন।

লোহার শিকলে হাত বাঁধা পা বাঁধা দুঃখহরণ তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। ওমা! অর্ধেক রাত্রে বাঘের গজ্‌রানীতে, পাখীর ডাকে, দুঃখহরণের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

বাঘ খাঁচা ভেঙ্গে লোক লস্কর খেয়ে, গারদখানায় ঢুকেছে! পাখী বন থেকে নীছুটির পাতা এনে সিপাই শাস্ত্রী সকলের চোখে লাগিয়েছে। এখন বাঘ দাঁতে করে রাজপুত্রের হাতের শেকল পায়ের শেকল কেটে ফেল্লে।

রাজপুত্র খোলা পেয়ে দেখেন লোক ঘুমাচ্ছে, লস্কর ঘুমাচ্ছে, কেউ কোথাও নাই।

গারদখানা থেকে বেরিয়ে আবার রাজপুত্র চল্‌লেন। আগে আগে পাখী, পিছনে বাঘ। শেষে সাতসমুদ্র তেরো নদীর ধারে এলেন, সে সমুদ্রের ঢেউ কি! ঢেউ এসে বালির আড়ায় ভেঙ্গে পড়ে, যেন পাহাড় ভেঙ্গে পড়ছে।

অবাক হয়ে দুঃখহরণ ঢেউ দেখ্‌ছেন, এক ঢেউ এসে তাঁর ঘাড়ের উপর পড়লো জলের টানে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চল্লো।

৮

রাজপুত্র ভেসে চল্‌লেন, পাখীরা তাঁর সঙ্গে আকাশে উড়্‌লো, একবার ঢেউয়েতে ডাঙ্গার দিকে দুঃখহরণকে ঠেলে দেয়, আর বাঘের ছানারা হাঁচ্‌ড়ে পিচ্‌ড়ে ধরতে যায়. আবার অগাধ জলে টেনে নিয়ে যায়। ঢেউয়ের আছড়ানীতে রাজপুত্রের প্রাণ যায় যায়।

দুঃখহরণের হাতের ছড়ি হাতে মুঠা বাধা ছিলো, যেমন ঢেউয়ের মাথায় ঘা লাগ্‌লো আর অম্‌নি ভবানীর খাঁড়ার ঘায়ে ঢেউ দুখানা হয়ে গেল। জলের ভিতর থেকে নৌকা উঠলো,

মন মন কাঠের নৌকো পবন কাঠের বোঠে
যে ঘাটেতে বল্‌বে কুমার সেই ঘাটে নিয়ে ওঠে।

রাজপুত্র নৌকা পেয়ে নৌকায় চেপে বস্‌লেন। বাঘেরা হাঁচড়ে পিচড়ে নৌকায় এসে চেপে বস্‌লেন। পাখীরা নৌকার ছইয়ের ওপর বসলো।

নাই কুল নাই থল,
তরী করে টলমল।

চার ধারে অকূল পাথার, কেবল জল থই থই কচ্ছে। দুঃখহরণ কোথায় যে যান তার ঠিক নাই।

আকাশে মেঘ উঠ্‌লো, ঝড় এলো এলো, এখন কি হয়! পাখীদের জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "পাখী কি করি?"

পাখীরা বল্লে রাজপুত্র নৌকাকে বল,

মন মন কাঠের নৌকা পবন কাঠের বোঠে,
যে ঘাটেতে চন্দ্রাবতী সেই ঘাটে গিয়ে ওঠে।"

রাজপুত্র তাই বল্লেন, অম্‌নি ঝড়ের আগে নৌকা ছুট্‌লো। কে যেন বল্লে,—

"রাজপুত্র রাজপুত্র ভেবনাকো আর,
সাগর পারে গিয়ে হবে তোমার দুখের পার।
সাগর পারে পাবে তুমি চন্দ্র রাজার দেশ,
সেখানে গেলে হবে তোমার দেশ যাত্রার শেষ।"

দুঃখহরণ চমকে চাইলেন, একথা কে বল্লে? না—কেউ কোথাও নাই।

ঢেউয়ের আগে নৌকা ছুট্‌লো। এই ডোবে এই যায়! অবশেষে ঢেউ থাম্‌লো, জল নিথর হয়ে এলো। চন্দ্র রাজার দেশে গিয়ে নৌকা ভিড়লো। চন্দ্র রাজার দেশে সকলই আশ্চর্য। সেখানে মুক্তা দিয়ে ঘাট বাঁধানো, ঘাটের ধারে মাণিকের পাহাড়, জ্যোৎস্নাবরণ

লতাপাতায় হীরার জ্যোতি, ফুলের গাছে তারার মত ফুল ফুটেছে, দেখে শুনে দুঃখহরণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। চাঁদ দেশের লোকেরাও নতুন মানুষ দেখে অবাক হয়ে সার দিয়ে দাঁড়ালো।

কেউ বলে "তোমরা কোন দেশের লোক?"

কেউ বলে "তোমরা কোথা থেকে এলে?"

কেউ বলে "আমাদের রাজকন্যাকে কি বাঁচাতে এসেছ?"

চাঁদের দেশের লোকের মিষ্টি কথা শুনে দুঃখহরণের প্রাণ জুড়ালো, জিজ্ঞাসা করলেন "তোমাদের রাজ-কন্যার কি অসুখ?" তখন একজন বল্লে "আমাদের মহারাজার একটি মেয়ে। তিনি হলেন চন্দ্রাবতী রাজকন্যা। রাজকন্যে যখন ছিলেন তখন আমাদের দেশে অন্ধকার রাত ছিল না, সদাই জ্যোছনা থাক্‌তো। একদিন এমন জ্যোছনা হয়েছিল যে তেমন সুন্দর জ্যোছনা আর কখনো ওঠেনি। রাজকন্যা চন্দ্রাবতী সেদিন পদ্মবিলে পদ্মের শোভা দেখ্‌তে গিয়েছিলেন। পদ্মবিলে হাজার পদ্ম, তার মাঝখানে একটি শতদল ফুট্‌তো। সেই শতদলটি ভাস্‌তে ভাস্‌তে কুলের কিনারায় এলো, রাজকন্যার সাধ হলো একবার শতদলের উপর পা রাখবেন, যেমন পা দিয়েছেন, অমনি শতদলটি রাজকন্যাকে নিয়ে ডুবে গেলো। সেই অবধি সব অন্ধকার হয়ে আছে, কেবল পূর্ণিমার রাত্রে জ্যোছনা ওঠে। সেদিন শতদল পদ্ম রাজকুমারীকে নিয়ে ভেসে ওঠে। রাজার আদেশে সেদিন পদ্মবিলের ধাবে কতশত লোক ঢাক বাজায় কিন্তু রাজকন্যা চোখ খোলেন না। কত লোক পদ্ম ধরতে জলে ঝাঁপ দেয় কিন্তু কেউ সে পদ্ম ধরতে পারে না।"

আশ্চর্য কথা শুনে দুঃখহরণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এদিকে চন্দ্ররাজার দেশের লোকেবা রাজার কাছে গিয়ে বল্লে—

"মেঘের মত কেশ,
হীরা মাণিকের বেশ,
পদ্মের মত মুখ,
প্রবালের মত রাঙ্গা ঠোঁট।

কে একজন লোক দুটো বাঘ আর দুটো পাখী নিয়ে এসেছে।" রাজা তাঁকে আন্‌তে হুকুম দিলেন। রাজার হুকুমে লোক ছুট্‌লো, রাজহস্তীর পিঠে চাপিয়ে দুঃখহরণকে রাজসভায় নিয়ে গেল। চাঁদ দেশের বুড়ো রাজা খুব আদর করে বসালেন। অনেকক্ষণ ঠাউরে ঠাউরে দেখে আশ্চর্য হয়ে বললেন—

"চাঁদের কিরণ জ্যোৎস্না বরণ
সকল জনের মানস হরণ

কে তুমি দেবতা না মানুষ?"

দুঃখহরণ বল্লে "না মহারাজ, আমি মানুষ, রাজকুমারীকে দেখ্‌তে এসেছি।" রাজা খুব খুশী হয়ে বল্‌লেন, "পূর্ণিমার রাত নইলে তার দেখা পাওয়া যায় না।"

তখন দুঃখহরণ পূর্ণিমার রাতের অপেক্ষায় সেখানে রইলেন।

৯

ওমা, সেদিন রাত্রে যেমন জ্যোছনা উঠল, চাঁদ রাজ্যে এমন জ্যোছনা আর কখনও উঠেনি, জ্যোছনার স্রোতে চাঁদরাজ্য ভেসে যেতে লাগল, দুঃখহরণ রাজার অনুমতি নিয়ে কতকগুলি লোকের সঙ্গে পদ্মবিলে গেলেন। চারধারে যেন জ্যোছনা ফুল ফুটেছে, হীরের বরণ লতাপাতা, মাণিকবরণ ফুল, যেন চাঁদের আলোয় জ্বলছে। চাঁদরাজ্যেব পথ ঘাট সবই সুন্দর।

দেখেন কি,—পদ্মবিলের জল জ্যোৎস্নার আলোতে ঝক্‌ঝক্ করছে। তার চারিধারে হাজার পদ্মের মধ্যে শ্বেত শতদল ঢল ঢল কচ্ছে। তার উপরে ফুলের মত কচি পা রেখে রাজকন্যা চন্দ্রাবতী, মৃণালের মত কোমল, অশোকের মত রাঙ্গা হাতে একছড়া পদ্মমালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর জ্যোৎস্নার মত শুভ্র বরণের উপর চাঁদের আলো পড়ে আভা বেরুচ্ছে। হিঙ্গুলের মত রাঙ্গা পায়ের উপর মেঘের মত কাল কেশ লুটিয়ে পড়েছে। রাজকন্যার চক্ষু মুদ্রিত!

রাজ্যের লোক অবাক। দুঃখহরণ অবাক। অনেকক্ষণ পর দুঃখহরণ নদীর ধারে গিয়ে ডাকলেন—

"চারি ধারে জল পদ্ম কচ্ছে টলমল
মধ্যে খানে আলো করে শ্বেত শতদল
তার উপরে কেগো তুমি পরীব মত মেয়ে
মোদের কাছে এস তোমার পদ্ম-তরী বেয়ে।"

অমনি কে যেন বলে উঠ্‌ল—

"রাজপুত্র দুঃখহরণ, সকল জনের মানস হরণ,
কন্যে, কন্যে, আঁখি মেল গিয়েছে আঁধার
তোমার তরে এল পুত্র সাত সমুদ্র পার।"

অমনি রাজকন্যা সাত বছর পরে তাঁর নীল পদ্মের মত চোখ মেলে চাইলেন, অমনি শ্বেতপদ্ম টলমল করে উঠ্‌ল। তারপরে দুল্‌তে দুল্‌তে তীরের কাছে এল। রাজকন্যা পদ্ম থেকে নেমে তাঁর হাতের পদ্মের মালা গাছি দুঃখহরণের গলায় পরিয়ে দিলেন।

চারধারে জয় জয় ধ্বনি উঠলো। বুড়ো রাজরাণী ওঠেন কি পড়েন ছুটে এলেন, কন্যাকে কোলে নিলেন। দুঃখহরণকে বল্লেন "তুমি আমার রাজ্যে রাজা হয়ে চন্দ্রাবতীকে নিয়ে সুখে থাক।"

দুঃখহরণ বল্লেন—"তাও কি হয়, আমি রাজ্য ছেড়ে এসেছি সেখানে আমার বুড়ো বাপ বুড়ী মা, তাদের ফেলে কি থাক্‌তে পারি?"

১০

রাজা আর কি করেন যাত্রার সব আয়োজন করে দিলেন। চন্দ্রাবতীকে সঙ্গে নিয়ে, কত সিপাই শাস্ত্রী মণিমাণিক্য নিয়ে রাজপুত্র দুঃখহরণ দেশে চল্লেন।

ঘাটে এসে দুঃখহরণ নৌকায় চড়লেন।

মন্ মন্ কাঠের নৌকো পবন কাঠের বোঠে
যে ঘাটেতে অজগরের দেশ সেই ঘাটে গিয়ে ওঠে।

চক্ষের নিমিষে নৌকা সেই ঘাটে এলো। দুঃখহরণ দেখেন অজগর সে দেশের অর্দ্ধেক মানুষ খেয়ে উজোড় করেছে। বাকি অর্দ্ধেক দেশ ছেড়ে ভয়ে পালিয়েছে।

রাজা রাণী রাজবাটীর ভিতর ভয়ে থর্ থর্ কাঁপছেন। দুঃখহরণকে দেখে সাপ গর্জে উঠলো, যেমনি দুঃখহরণ তার মাথায় ছড়ির বাড়ী মেরেছেন, অমনি লক্‌লক্ ঝক্ ঝক্ তলোয়ার বেরিয়ে সাপকে দু'টুকরো করে ফেল্লে।

রাজ্য নিরাপদ হলো। রাজা রাজকন্যা পদ্মাবতীকে নিয়ে এসে জোড় হাত করে বল্লেন,—

"রাজপুত্র কন্যা নাও,
আমার রাজ্যে রাজা হও।"

দুঃখহরণ বল্লেন "তাও কি আমি পারি, আমার মা বাপ দেশে আছেন, তাঁদের ছেড়ে কি থাক্‌তে পারি।"

পদ্মাবতীকে বিয়ে করে রাজপুত্র দেশে চল্লেন। তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে কত নিগম নিছম পুরী পেরিয়ে দুঃখহরণ বনে সেই বটগাছের কাছে এলেন। সেখানে বুড়ো এক বাঘ এক লাফে গর্ত থেকে বেরুলো, দুঃখহরণের পা চাট্‌লে, ছেলেদের গা চাটলে। আহ্লাদে বাঘের চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল পড়্‌তে লাগলো। চন্দ্রাবতী, পদ্মাবতী বাঘের গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন।

এদিকে দুঃখহরণের দুঃখিনী মার কেঁদে কেঁদে দুই চক্ষু অন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাণী কেঁদে বুড়ী দাসীকে বল্‌লেন—

"ওরে আজ বার বছর পূর্ণ হলো,
আমার বাছা দুঃখহরণ কই এলো।"

এমন সময় কাড়া বাজলো রাজ্যে সাড়া পড়্‌লো দুঃখহরণ বাড়ী আস্‌ছেন। রাজার অস্মরণ পুত্রকে স্মরণ হলো। আগু বাড়িয়ে ছেলে বৌ ঘরে নিলেন, বড়রাণীকে পাটের শাড়ী পরিয়ে পাল্কী করে ঘরে আন্‌লেন। রাজপুরীব লক্ষ্মী রাজপুরীতে এলেন।

রাণী দুই কোলে দুই বৌ নিয়ে কাঁদেন, "ওরে আমার চক্ষু অন্ধ চাঁদমুখ দেখ্‌ব কেমন করে?"

চন্দ্রাবতী রাণীর ডান-চোখে পদ্মাবতী বা-চোখে হাত বুলালেন, রাণীর দুই চোখ ভাল হয়ে গেল।

দেখে শুনে হিংসেয় ছোটরাণী জ্বলে পুড়ে মরে গেলেন।

নির্ঝরিণী দাসী

বীরবল

১

এক যে ছিলেন রাজা, তাঁর ছিলেন সাত রাণী। সাত রাণী যেন সাতটি বোন, ঝগড়া নেই বাদ নেই, রেষারেষি নই, দ্বেষাদ্বেষী নেই। রাজার সোনার সংসার কিন্তু একটি সোনার চাঁদ ছেলে বিনে সবই খালি।

এমনি ক'রে কত দিন যায়। একদিন রাজা মৃগয়া কর্তে গেলেন। বনের মধ্যে এক হরিণের পেছনে ঘোড়া ছুটিয়ে বিজন বনে গিয়ে পড়্‌লেন, ডালপালায় অন্ধকার, সূর্যের মুখ দেখা যায় না—সেই গহন বন আলো ক'রে এক পরমাসুন্দরী কন্যে। কন্যা গাছতলায় বসে কাঁদ্‌ছেন দেখে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কার কন্যে, অরণ্যে একা বসে বসে কাঁদছো কেন ?" কন্যা বল্লে, "আমি রাজকন্যা, আমার বাপ-মাকে রাক্ষসে খেয়ে ফেলেছে। লোক লস্কর সব খেয়ে সপুরী এক সাড করেছে, তাই বনে বসে কাঁদ্‌ছি।"

রাজা কন্যার রূপ দেখে মোহিত হয়ে গেলেন, বল্লেন "চল কন্যে আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাকে রাণী কর্‌বো।" বলে, রাজা কল্লেন কি, তাকে সঙ্গে করে রাজপুরীতে নিয়ে এলেন ; নিয়ে এসে খুব ঘটা করে বিয়ে কল্লেন। যে হতে নূতন রাণী ঘরে এলেন, সেই হতে সকলি অকল্যাণ হ'তে লাগলো। হাতীশালায় হাতী মরে, ঘোড়াশালায় ঘোড়া মরে। দেশ শুখো হয়ে ক্ষেত পুড়ে যায়, বান এসে ঘরবাড়ী ভেসে যায়। রাজ্যে আর লক্ষ্মী-শ্রী থাক্‌লো না।

এখন—নূতন রাণী হচ্ছে এক রাক্ষসী, মায়া করে অপূর্ব সুন্দরী হয়ে বনে বসেছিল। রাজরাণী হয়ে দিনে দিনে রাজাকে মায়ায় ভুলিয়ে পাটরাণী হয়ে বস্‌লো, রাজা আর কোন রাণীর খোঁজই নেন না, দিন রাত রাক্ষসীরাণীর কাছেই থাকেন।

হাতীশালে হাতী কম্‌তে লাগ্‌লো, ঘোড়াশালে দিন দিন ঘোড়া কম্‌তেলাগ্‌লো, অন্ধকার রাত্রে ঘরের বাহির হ'লে যে মানুষ কোথায় যায় তার আর দেখা পাওয়া যায় না, এই সব দেখে রাজ্যের লোক থর থর কাঁপতে লাগ্‌লো—দেশে হাহাকার পড়ে গেল।

মন্ত্রী বারে বারে রাজাকে বলেন, রাজা কথা কাণে করেন না। এদিকে রাক্ষসীরাণী রোজ রাত্রে রাজাকে নিছুটি ঘুম পাড়িয়ে চরা বরা কর্‌তে বেরুতো। হাতীশালায় হাতী খেয়ে ঘোড়াশালায় ঘোড়া খেয়ে সহরে লোকের দুয়ারে দুয়ারে ফিরতো, একা মানুষ পেলেই তাকে তখনি খেয়ে ফেলে মুখ মুছে ভাল মানুষটি হয়ে ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে থাক্‌তো।

এদিকে ছোটরাণীর সন্তানের লক্ষণ হলো। "ছেলে হবে, ছেলে হবে" সকলে আনন্দ কর্‌তে লাগ্‌লো। রাক্ষসী দেখ্‌লে বড় বিপদ, একথা যদি রাজা শোনেন তবে তো বড় মুস্কিল হবে ! সে দিন রাত্রে রাক্ষসী করেছে কি—ঘোড়াশালায় ঘোড়া খেয়ে, হাতীশালায় হাতী খেয়ে একটা ঘোড়ার মাথা, আর কটোরায় করে এক কটোরা তাজা রক্ত নিয়ে রাজপুরীতে ফিরে এলো। যেখানে সোনার পালঙ্কে সাতরাণী এ ওর গায়ে হাত দিয়ে অচেতন ঘুমুচ্ছেন, সেই ঘরে গিয়ে বিছানার পাশে বস্‌লো। ঘুমন্ত রাণীদের ঠোঁটে তাজা রক্ত মাখিয়ে দিলে, ঠোঁট বেয়ে টস্‌টস্‌ করে রক্ত মাখিয়ে দিয়ে, মরা ঘোড়ার মুণ্ডটা বিছানার পাশে রাখ্‌লে, তারপর হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে এসে রাজাকে ডেকে বল্লে, "ওঠ ওঠ, তোমার রাণীদের কীর্তি দেখগে।"

রাজা তাড়াতাড়ি ধড়্মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসে বল্লেন, "অ্যাঁ, অ্যাঁ, বল্ছো কি, হয়েছে কি ?"

রাক্ষসী বল্লে, "আর হবে কি, নিত্যি নিত্যি যে ঘোড়াশালার ঘোড়া কমে হাতীশালার হাতী কমে, আমি তাই ভাবি যে কেন এমন হয়। এখন তার কারণ পেয়েছি। দেখবে এসো তোমার সাতরাণী রাক্ষসী।"

রাজা যেন নূতন রাণীর কলের পুতুল, ভয়ে থর্ থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে চল্লেন। এ মহল ও মহল সাত মহল ছাড়িয়ে শেষে রাণীদের মহলে যেখানে সাতরাণী ঘুমে অচেতন সেইখানে গিয়ে উপস্থিত। গিয়ে দেখেন, রাণীরা শুয়ে ঘুমুচ্ছেন, হাতে রক্তমাখা, ঠোঁটে কসবেয়ে তাজা রক্ত গড়াচ্ছে, পাশে একটা ঘোড়ার মাথা দেখে রাজা যেন পাথর হয়ে গেলেন। তখন রাক্ষসী বল্লে, "আমি এই দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে গেছি, সব্বাই ঘোড়ার মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে এর মধ্যে খেতে খেতেই ঘুমিয়ে পড়েছে ও মা!"

রাজা চোখে দেখ্লেন ; তবুও যেন রাজার মনে ধরে না যে রাণীরা রাক্ষসী, কিন্তু নূতন রাণী যা বল্ছে তাতে তো আর 'না' কর্বার যো নাই। রাজা বল্লেন, "এ রাক্ষসীদের নিয়ে এখন কি করি।" রাণী বল্লেন, "সাত রাক্ষসীর চোদ্দটা চোখ তুলে নিয়ে আমার কাছে এনে দাও, আর ওদের হেঁটোয় কাঁটা ওপরে কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেল।"

২

সকালবেলা সাতরাণী ঘুম থেকে উঠেছেন, আলু থালু বেশ, এমন সময় কোটাল এসে রাণীদের ধরে নিয়ে গেল। কাতার দিয়ে রাজ্যের লোক দাঁড়িয়েছে, সবাই বলে, "কি সর্বনাশ ঘরের লক্ষ্মী রাণীরা কেন রাক্ষসী হবেন ?" সাতরাণী না ভাল না মন্দ কিছু জানেন না, চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। ছোটরাণী সবচেয়ে ছেলে মানুষ, ছয়রাণী তাঁকে ছোট বোনের মত ভালবাসেন। তিনি দিদিদের মুখ চেয়ে কেঁদে উঠ্লেন। রাণীদের দশা দেখে রাক্ষসীর একটুও দয়া হল না, নিজে হাতে সাতরাণীর চোদ্দটা চোখ তুলে নিলে, রাণীরা অন্ধ হয়ে গেলেন ! নগরের বাইরে কুয়ো খোঁড়া আছে সেইখানে কোটাল সাতরাণীকে হেঁটোয় কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়ে পুত্বার জন্য নিয়ে গেল। কোটাল সাতরাণীকে চুপে চুপে গহন বনের ভিতর ছেড়ে দিয়ে এসে, কাঁটা দিয়ে কুয়ো ভরে বুঁজিয়ে ফেল্লে। রাক্ষসী রাণী ভাব্লে আমার সতীন কাঁটা উদ্ধার হ'য়ে গেল।

৩

বনের মধ্যে সাতরাণী। একে অন্ধ, বন কেমন জন্মে দেখেনি, সাতশো দাসী সেবা করে, সোনার পালঙ্কে শোন, রূপোর পালঙ্কে গা গড়ান, তাঁদের এই দুর্দশা। বাঘ গজ্রায়, ভালুক গজ্রায়, ভয়ে ছোটরাণী দুহাত দিয়ে দিদিদের জড়িয়ে ধরেন, ছয়রাণী ছোটরাণীকে মধ্যে রেখে চার পাশে ঘিরে থাকেন। সতী কন্যা দেখে বাঘ ছোঁয় না, ভালুক কাছে আসে না, দূর থেকে চলে যায়। বনের বানর গাছে উঠে ফল পেড়ে ফেলে দেয় তাই খেয়ে জীবন ধারণ করেন।

এমনি করে দিন যায়। ছোটরাণীর সন্তান হ'বার সময় হলো। গহনবন আলো করে চাঁদের মত রাজপুত্র ভূমিষ্ঠ হলেন। চোখ অন্ধ, সাতরাণী সোনার চাঁদ ছেলে চোখে দেখতে

না পেয়ে চোখের জলে ভেসে গেলেন। সাত মা সাতদিকে ঘিরে ছেলে নিয়ে বসে থাকেন, সাত মা দুধ খাওয়ান, সাত মা বুকে ক'রে রাখেন। নিশি রাত্রে সাতজনে ছেলে আগলে ব'সে থাকেন।

এমনি করে সাত অন্ধের পুত্র বীরবল মানুষ হ'তে লাগ্‌লো। এক মাস দুমাস তিনমাস করে ছ মাসে পড়লো, কত হাসে, কত খেলা করে, রাণীদের আনন্দের সীমা নাই। চোখে দেখ্‌তে পাননা, সোনার চাঁদের গায়ে হাত বুলান, মাথায় হাত বুলান।

ছেলে ক্রমে এক বছর, দু বছর করে সাত বছরের হলো, ছেলের রূপ দেখ্‌লে শত্রু ফিরে যায়। বনের ফল খান, বনের বাঘ ভালুকের সঙ্গে রাজপুত্র খেলা করেন, বাঘিনীর পিঠে চড়ে বনে বেড়ান, পশুপক্ষী সবাই রাজপুত্রের রূপেগুণে বশ।

থাকেন—সাতরাণী ভাবেন, রাজপুত্র কি চিরদিন বনবাসী হয়ে থাক্‌বে ? বিধির নির্বন্ধ ! কাঠুরে কাঠ কাট্‌তে বনে এসেছে, বীরবলকে দেখে চম্‌কে উঠে ভাব্‌লে, "বনে কি বনদেবতা দেখা দিলেন ?" বীরবল নূতন মানুষ দেখে ছুটে কাছে এলেন, দুদণ্ডে কাঠুরের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। কাঠুরে আর বীরবলকে ছেড়ে যেতে পারে না, বলে, "ভাই, আমার সঙ্গে চল, নগরে নিয়ে যাব ; কত মানুষ আছে দেখ্‌বে, কত বাড়ী ঘর, কত কি তোমায় দেখাবো।"

বীরবল বল্লেন, "তা হবে না, আমার সাত অন্ধ মা আছে, তাদের ফেলে কোথায়ও যাব না।"

কাঠুরে বাড়ী গেল, বীরবল মায়েদের কাছে গিয়ে বল্লে, "মা, আমি নগরে যাব, নগর দেখে আস্‌বো।"

শুনে সাতরাণী চম্‌কে 'ষাট্‌, ষাট' বলে ছেলের গায়ে হাত বুলুলেন, "নাবে বাছা দুঃখিনীর ধন, বনবাসী হয়ে বনেই থাক, নগরে গিয়ে কাজ নেই।"

ছেলে বায়না ধরলে, "তা হবে না, একবার গিয়ে দেখে আস্‌বো।' কি করেন, শেষ কালে সাতরাণী অনুমতি দিলেন।

৪

তার পরদিন আবার কাঠুরে সেই বনে কাঠ কাট্‌তে এল। এসেই চারধারে চায়, বীরবল কোথায় ? বীরবল ছুটে এসে বল্লেন, "কাঠুরে ভাই. কাঠুরে ভাই, মায়ের অনুমতি পেয়েছি, চল নগর দেখ্‌তে যাই।"

কাঠ কাটা হ'লে কাঠুরে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে রাজপুত্রের হাত ধরে বন থেকে বেরুল। নগরে এসে বীরবল অবাক হয়ে গেলেন। বাড়ী ঘর, লোকজন, হাট বাজার, কত কি, এদিক একবার চান, ওদিক একবার চান। পথের লোক অবাক হয়ে রাজপুত্রের মুখ দেখে। চাঁদের মত মুখ, মেঘের মত মাথাভরা কালো চুল কপালে পড়েছে, মুক্তোর মত ঘাম ঝর্‌ছে, ননীর মত গড়ন, যে দেখে তারই কোলে তুলে নিতে ইচ্ছা হয়।

রাজ অট্টালিকার কাছে এসে বীরবল জিজ্ঞাসা কল্লেন. "কাঠুরে ভাই এ কার বাড়ী ?"

কাঠুরে চুপে চুপে বল্লে, "এ রাজবাড়ী, ভাই, ওদিকে যাস্‌নে। এক নূতন রাণী এসে দেশ উচ্ছন্ন দিলে, দেশে আর গরু ছাগল থাক্‌লো না। তোর মত সুন্দর ছেলে দেখলে 'টপ্‌' করে গালে ফেলে দেবে।"

এখন রাক্ষসী রাণী সেই সময়ে ছাতে চুল শুখাচ্ছিলেন। আল্‌সে দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বীরবলকে দেখ্‌লেন, প্রাণটা ছাঁৎ করে উঠ্‌লো। চাঁদের মত এ ছেলেটি কেরে ? খড়ি পেতে

গুণে দেখ্‌লেন, "সাত সতীনের ছেলে।"

রাণী পাঁকাটি পেতে তার উপর বিছানা পেতে শুলেন, এপাশ ফেরেন মড়্‌ মড়্‌ করে পাঁকাটি ভাঙ্গে ও পাশ ফেরেন মড়্‌ মড়্‌ করে পাঁকাটি ভাঙ্গে। রাজার কাছে খবর গেল, "রাণীর বড় অসুখ, হাড়-মড়্‌মড়ি রোগ হয়েছে।"

রাজা বার দিয়ে দরবারে বসেছিলেন, রাণীর অসুখের কথা শুনে হাকুলি বিকুলি করে অন্তঃপুরে এলেন। এসে দেখেন, রাণী এ পাশ ফির্‌ছেন রাণীর হাড় মড়্‌ মড়্‌ করে ভাঙ্গছে, ও পাশ ফির্‌ছেন হাড় মড়্‌ মড়্‌ করে ভাঙ্গছে। রাজা ভেবে আকুল। এ রোগ কিসে আরাম হবে? রাণী রোগের যন্ত্রণায় কথা কইতে পারেন না, অনেক কষ্টে বল্লেন, "আমার এ রোগ বদ্যিতে আরাম কর্‌তে পারবে না। পক্ষীরাজ ঘোড়ার লোম কলায় পুরে নিয়ে খেলে এ রোগ সারে। সে ঘোড়া আর কেউ ধরতে পার্‌বে না, সাত অন্ধের পুত্র বীরবল সেই ঘোড়া ধরে আন্‌তে পার্‌বে।"

রাজ্যে ঢ্যাঁট্‌রা পড়লো, "সাত অন্ধের পুত্র বীরবল কে আছ? রাজসভায় হাজির হও।"

কাঠুরের সঙ্গে বীরবল নগর দেখ্‌ছেন, ঢ্যাঁট্‌রা শুনে বল্লেন, "আমারি নাম তো বীরবল, চল কাঠুরে দাদা, রাজসভা দেখে আসি।"

কাঠুরে রাজসভায় যাবার নামে আঁৎকে উঠ্‌লো, "নারে ভাই, অমন কাজ করিস নে।" কিন্তু কাঠুরের কথা রইলো না, বীরবল তাকে সঙ্গে করে রাজসভায় গেলেন।

৫

রাজা সিংহাসনে বসেছেন, বাঁয়ে মন্ত্রী, চার পাশে পাত্র মিত্র। বীরবল সভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বল্লেন, "আমার নাম বীরবল, মহারাজের কি হুকুম?"

সুন্দর ছেলেটি দেখে অপুত্র রাজার প্রাণ কেমন করে উঠ্‌লো, ছেলের দিকে চেয়ে চোখ ফেরাতে পারেন না। এত ছোট ছেলে, কেমন করে দুরন্ত পক্ষীরাজ ঘোড়া ধরে আন্‌বে? আদর করে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "বীরবল, তুমি কি পক্ষীরাজ ঘোড়া ধরে আন্‌তে পারবে?"

বীরবল বল্লে, "কেন পারবো না!"

রাজা ঘড়াভরা মোহর দিলেন, বীরবল সব কাঠুরের কাছে দিয়ে বল্লে, "কাঠুরে ভাই, আমার অন্ধ মায়েদের দেখো আমি পক্ষীরাজ ঘোড়া আন্‌তে যাচ্ছি।"

উত্তর মুখো চল্‌তে চল্‌তে বীরবল এক বনে এলেন। বনে এক মুনি তপস্যা কর্‌ছেন, বীরবল তাঁর ফল এনে যোগান, জল এনে যোগান। মুনি প্রসন্ন হয়ে বল্লেন, "বাবা, কি চাও?"

বীরবল বল্লেন, "পক্ষীরাজ ঘোড়া কোথায় গেলে পাব?"

"পশ্চিম দিকে যাও।"

পশ্চিম দিকে চল্লেন যেতে যেতে আর এক মুনির সঙ্গে দেখা। মুনি বল্লেন, "কি চাও?"

"পক্ষীরাজ ঘোড়া কোথায় পাব?"

"পূব্‌ দিকে যাও।"

পূব্‌দিকে গিয়ে আবার এক মুনির দেখা পেলেন। মুনি বল্লেন, "কিছু দূর গিয়ে দেখ্‌তে পাবে এক প্রকাণ্ড অজাগর আকাশ পাতাল হাঁ করে রয়েছে, সে তোমায় দেখে জিজ্ঞাসা কর্‌বে, 'কে রে?' তুমি যদি ভয় পাও তখনি খেয়ে ফেলবে। তুমি বল্‌বে, "আমি সাত সতীর পুত্র বীরবল।' সে তাই শুনে মুখ বুজবে। তারপর ভয়ঙ্কর এক নদী আছে, সাপের

পিঠে চড়ে সেই নদী পার হ'তে হবে। যদি একটু ভয় কর তবেই নদীর মধ্যে পড়ে যাবে। ওপারে গিয়ে দেখ্‌বে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছ ; সেই গাছে উঠে বসে থাক্‌বে। রাজ্যের ঘোড়া জল খেতে আস্‌বে, তার মধ্যে যে ঘোড়াটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাল চিক্ চিক্ কচ্ছে, গায়ে একগাছি সাদা লোম নেই, পায়ের ক্ষুর মাটিতে ঠেকে না, সেইটি পক্ষীরাজ ঘোড়া। সব ঘোড়া জল খেয়ে গেলে, সে ঘোড়াটি তেঁতুলগাছে গা ঘস্‌বে, তুমি অম্‌নি তার পিঠে লাফিয়ে পড়ে শক্ত করে তার ঘাড়ের চুল ধর্‌বে। ঘোড়া স্বর্গ মর্ত্য পাতাল তিন লাফ দিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, "তুই কে রে ?" তুমি বল্‌বে, 'আমি সাত সতীর পুত্র বীরবল।' তখন সে তোমায় পিঠে ক'রে নিয়ে তুমি যে দেশে উড়ে যেতে বল্‌বে সেই দেশে উড়ে যাবে।"

বীরবল তাই করলেন। কিছু দূর গিয়ে দেখেন সেই সাপ আকাশ পাতাল হাঁ করে আছে, তার জিভ্‌খানি যেন সাতশো খাঁড়া, চোখ তো চোখ নয়, যেন আগুনের ভাঁটা। বীরবল সাপ দেখে হেল্‌লেন না টল্‌লেন না। সাপ হাঁকার দিলে, "কে রে ?" সাতশো ক্রোশ ধরে যত জীবজন্তু ছিল, সবারি কানে তালা লেগে গেল। বীরবল যেই বল্লেন, "আমি সাত সতীর পুত্র বীরবল", আর সাপ একেবারে কেঁচো। শুড়্ শুড়্ করে শুয়ে পড়ে বীরবলকে পিঠে করে নদী পার করে দিলে।

নদীর মাঝে কত হাঙ্গর, কত কুমীর, সব বীরবলকে ধর্‌বার জন্যে তড়াং তড়াং করে লাফিয়ে উঠ্‌লো। সাপের তেলা পিঠ, সড় সড় করে পা সরে যায়, বীরবলের কিছু ভয় নাই। বীরবল ভাব্‌লেন, "আমি সাত সতীর পুত্র আমার আবার ভয় কিসের !"

তারপর নদীর পাড়ে উঠে তেঁতুলগাছে বসে থাক্‌লেন, পক্ষীরাজ ঘোড়া যেই তেঁতুলগাছে গা ঘস্‌ছে, অমনি বীরবল পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে বস্‌লেন। পক্ষীরাজ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তিন লাফ দিয়ে চিঁহি করে বল্লে, "কে রে তুই ?"

বীরবল বল্লেন, "সাত সতীর পুত্র বীরবল," আর ঘোড়া যেন বেড়াল ছানাটি। বীরবল বল্লেন, "পক্ষীরাজ, আমায় সেই রাজার রাজ্যে নিয়ে যাও।" পাখা মেলিয়ে পক্ষীরাজ আকাশে হন্ হন্ করে উড়ে চক্ষের পলকে সেই রাজ্যে এসে নাম্‌লো।

৬

বীরবল পক্ষীরাজ ঘোড়া এনেছে দেশে রব উঠে গেল। রাক্ষসী রাণী ভেবেছিল পক্ষীরাজ আনতে বীরবল বাঘের মুখে সাপের মুখে যাবে, কিন্তু তা হ'ল না দেখে রাক্ষসী একেবারে ভাবনায় আঁথার পাঁথার।

বীরবলের কাঠুরেদাদা সাতরাণীকে বন থেকে নগরে এনেছে। ঘড়াভরা মোহরে বাস করবার অট্টালিকা করে দিয়েছে, সেবা কর্‌বার দাস দাসী দিয়েছে। সাত অন্ধরাণী সেই অট্টালিকায় "হা বীরবল, হা বীরবল" বলে দিন কাটাচ্ছেন। বীরবলকে পেয়ে যেন আকাশের চন্দ্র হাতের মুঠোয় পেলেন। বল্লেন, "বাবা আমাদের ধনে কাজ নেই, জনে কাজ নেই, সাত অন্ধের প্রাণবধ ক'রে তুমি আর বিদেশে যেও না।"

এখন রাক্ষসী তো ভাবনায় হাবুডুবু। ভেবে চিন্তে পাঁকাটি বিছিয়ে তার ওপর বিছানা পাত্‌লে, রাণীর আবার হাড় মড়্মড়ি ব্যামোয় ধরলো, রাজার কাছে খবর গেল। রাজা এলেন। রাণী বল্লেন, "পক্ষীরাজ ঘোড়ার লোমে আমার অসুখ সার্‌লো না। বীরবল যদি পবনরাজার মেয়েকে বিয়ে ক'রে আনে, সেই কন্যে যদি আমার গায়ে হাত বুলায় তবেই আমার রোগ সেরে যাবে।"

রাজা শুনে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, কি করে হবে ? কোথায় পবনরাজার দেশ কে জানে ; বীরবলই বা কি করে তার মেয়েকে বিয়ে করে আন্‌বে। বীরবলকে ডাকিয়ে বল্লেন, "বীববল, পবনরাজার মেয়ে বিয়ে করে আনতে পারবে ?"

বীরবল বল্লে, "কেন পারবো না ?"

রাজা আবার ঘডাভরা মোহর দিলেন, বীরবল মোহর নিয়ে এসে কাঠুরের কাছে দিয়ে বল্লে, "কাঠুবে দাদা, আমাব সাত অন্ধ মা রইলেন, দেখো। আমি পবনের মেয়ে বিয়ে করে আন্‌তে যাচ্ছি।"

মার কাছে গিয়ে জনে জনে পায়ের ধূলি নিলেন, বল্লেন, "মা আমি পবনরাজার কন্যা বিয়ে করে আন্‌তে যাচ্ছি, অনুমতি দাও।"

বীরবলকে বিদায় দিতে সাত অন্ধের প্রাণ ফেটে যায়, আবার বীরবলের কথায় 'না' করতেও পারেন না। ছেলে রাজার কাছে কথা দিয়ে এসেছে তাহ'লে কথা রক্ষা হবে না। অনেক ক'রে প্রাণ স্থির করে অনুমতি দিলেন।

৭

বীরবল আবার উত্তরমুখে চল্‌তে চল্‌তে এক অরণ্যে এসে পড়লেন। দেখেন সেখানে এক গাছতলায় বীরবলের বয়সী একটি ছেলে ব'সে কাঁদ্‌ছে। বীরবল তার কাছে গিয়ে হাত ধ'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাই, তুমি কাঁদছ কেন ?" ছেলে বল্লে, "আমার বাবা আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। বল্লেন সাত অন্ধের পুত্র বীরবল পক্ষীরাজ ঘোড়া আনলে। আবার পবনের মেয়ে বিয়ে ক'রে আন্‌তে গিয়েছে, আর তুই একেবারে অকর্মা কেবল বসে বসে খাস্‌।"

বীরবল তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, "ভাই, আমার নামই বীরবল, আমি পবনরাজার মেয়ে বিয়ে ক'রে আন্‌তে যাচ্ছি, তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?"

ছেলেটি খুসী হয়ে বল্লে, "তোমার সঙ্গে আমি যাব। আমি হাতে করে একমণ গম পিষ্‌তে পারি। তোমার যদি দরকার লাগে পিষে দেব।" কিছুদূর গিয়ে বীরবল দেখেন, আবার একটি ছেলে বসে কাঁদছে। জিজ্ঞাসা কবলেন, "ভাই তুমি কাঁদছ কেন ?"

ছেলে বল্লে, "সাত অন্ধের পুত্র বীরবল পক্ষীরাজ ঘোড়া এনেছেন আবার পবনের মেয়ে বিয়ে করতে যাচ্ছেন। তাই আমার বাবা 'তোরা কিছুই পারিস্‌ নে' বলে বাড়ী থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

বীরবল বল্লেন, "তুমি কি কিছুই পার না ?" ছেলে বল্লে "আমি ঠাকুমার কাছে একমন্ত্র শিখেছি। যে বৃষ্টি সাত দিন সাত রাত থামে না, সে বৃষ্টি আমি মন্ত্র পড়ে থামাতে পারি।" বীরবল সেই ছেলেটিকে সঙ্গে নিলেন।

কিছুদুর গিয়ে বীরবল আর একটি ছেলে দেখ্‌তে পেলেন। তারও বাবা তাড়িয়ে দিয়েছে ব'লে পথে বসে বসে কাঁদ্‌ছে। বীরবল তাকেও সঙ্গে নিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি পার ?"

সে বল্লে, "আমি মায়াপুরী তৈয়ার কর্তে পারি। সে পুরী জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না। চক্ষের নিমিষে হয় আবার চক্ষের নিমিষে মিলিয়ে যায়।"

বীরবল পথে চলেন, আর জিজ্ঞাসা করেন "পবনরাজার বাড়ীর কি এই পথ ?" সবাই বলে, "উত্তরে যাও।"

যেতে যেতে পথের মধ্যে দেখেন আর একটি ছেলে পথে বসে কাঁদছে. তারও বাপ তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বীরবল তাকেও সঙ্গে নিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন. 'ভাই তুমি কি করতে পার ?"

সে বল্লে, "এক যুগ বার বছর যে জল গরম হচ্ছে আমি হাত দিলে সে জল ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

উত্তবে যেতে যেতে শেষকালে পবনরাজার বাড়ীব কাছে এসে পড়লেন। প্রকাণ্ড পাহাড় আকাশে ঠেকছে, তাব উপর পবনবাজার বাড়ী। বীববল গিয়ে জযডঙ্কায ঘা দিলেন। "কে তুমি ?" ক'রে পবনরাজাব সাতশো পেয়াদা ছুটে এল।

বীরবল বল্লেন, "রাজার কাছে খবর দাও, আমি সাত অন্ধের পুত্র বীরবল, তাঁর মেয়েকে বিয়ে কর্তে এসেছি।"

পবনরাজা একথা শুনে রাগে একেবারে আগুন হয়ে উঠলেন। এত বড আস্পর্দ্ধা! তখনি পবনরাজার হুকুমে আকাশ জুড়ে মেঘ হল, মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে লাগলো, শিল পড়তে লাগলো—সে শিল নয়তো যেন একখানা দশমণী পাথর। ঝড়ে পৃথিবী আলু থালু হয়ে গেল।

যে ছেলেটি মাযাপুরী করতে জানতো সে মন্তব পড়ে ফুঁ দিলে. তখনি এক সুন্দর পুরী তৈরী হল, পাঁচ বন্ধুতে সেই পুরীর ভিতরে গিয়ে থাকলেন, ঝড় বৃষ্টিতে তাঁদের কিছুই হল না। সাতদিন পরে, যে ঝড়বৃষ্টি থামাতে জানতো সে মন্ত্র পড়ে ঝড়বৃষ্টি থামিয়ে দিলে। চক্ষের নিমিষে মায়াপুরী উড়ে গেল, পাঁচ বন্ধু যেমন ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন তেমনি দাঁড়িয়ে আছেন!

পবনরাজা অবাক হয়ে গেলেন। সাত দিনেব বৃষ্টিতে বানে ঘব বাড়ী ভেসে গিয়েছে, আব ওই ছেলে পাঁচটি যেমন ছিল তেমনি আছে, এ ত ভারী আশ্চর্য কাণ্ড! পবনবাজা নিজে হুকুম দিয়ে বৃষ্টি নামিয়েছেন, সে বৃষ্টি ওদের হুকুমে থামলো? তবে তো ওরা যে সে লোক নয়!

পবনবাজাব হুকুমে তাঁর পেয়াদারা এসে বীরবলকে দরবারে নিয়ে গেল, চার বন্ধু, চাকব হয়ে বীরবলেব সঙ্গে গেল। বীরবলের মুখ দেখে রাজা সব ভুলে গেলেন, ভাবলেন, "এই সোনাবচাঁদ ছেলে একে যদি জামাই পাই তবে আর কি চাই!"

রাজা বল্লেন, "বীরবল তোমাকেই আমি মেয়ে দেব। কিন্তু আমাব মেয়েকে যে বিয়ে করবে তাকে হাতে করে এক মণ গম পিষে গায় কেমন জোর তার পরিচয় দিতে হবে।"

বীরবল হেসে বল্লেন, "হাতে করে এক মণ গম পেষা ও আর বেশী কথা কি? আমার ওই চাকরকে দিলে সেই পিষে দেবে।"

রাজার হুকুমে গম এল, যে হাতে করে গম পিষতে পারতো, সে তখনি এক মণ গম পিষে দিলে।

পবনরাজা বল্লেন, "আর একটা কথা আছে, আমার মেয়েকে যে বিয়ে কববে, এক যুগ বারো বছর ধরে যে জল গরম হচ্ছে তাতে নাইতে হ'বে।"

বীরবল বল্লেন, "আচ্ছা আমি নাইবো।"

বারো বচ্ছর জল টগবগ করে ফুটছে সেই জল নাইতে দিলে। যার হাতে জল ঠাণ্ডা হয় সে যেমন জলে হাত দিয়েছে অমনি জল শীতল হয়ে গেল। বীরবল সচ্ছন্দে সেই জলে নাইলেন।

পবনরাজার দেশে ঘটাপটা পড়ে গেল। প্রতিমার মত কন্যা অষ্ট অলঙ্কারে সাজিয়ে

বীরবলকে পবনরাজা কন্যাদান কর্‌লেন। পবনরাজার রাণী বীরবলকে কোলে ক'রে গালে গালে চুমো খেয়ে বল্লেন, "আমার মেয়ের কত তপস্যা ছিল তাই তোমার মত জামাই হ'ল। এ তোমারি দেশ তোমারি রাজত্ব। এইখানে তুমি রাজা হয়ে থাক।"

বীরবল বল্লেন, "মা তা হবে না। আমার সাত অন্ধ মা আমার পথ চেয়ে দিন গুণ্‌ছেন।"

তখন রাজা রাণী কন্যা সাজিয়ে দিলেন। কত হীরে মুক্তো যৌতুক দিলেন। চতুর্দোলায় কন্যা উঠ্‌লেন। পবনরাজা মেঘেদের হুকুম দিলেন, চক্ষের পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তে চতুর্দোলা দেশে এসে পৌঁছিল।

বীরবল পবনের মেয়েকে বিয়ে ক'রে সাত অন্ধ মায়ের কাছে নিয়ে এসে দিলেন, "মা গো মা, এই নাও তোমাদের দাসী এনেছি।"

রাণীরা শুনে আনন্দ কি কর্‌বেন ভেবে পান না, এ রাণী একবার বৌ কোলে করেন ও রাণী একবার বৌ কোলে নেন, বৌয়ের গালে গালে চুমো খান, আর কেঁদে বলেন, "এমন সোনার চাঁদ বৌ, চোখ নেই; চোখে দেখ্‌তে পেলাম না। এমন সোনারচাঁদ ছেলে বৌ, রাজার কপালে নেই, রাজা দেখ্‌তে পেলেন না, কোলে কর্‌তে পেলেন না।"

৮

বীরবল পবনের মেয়েকে বিয়ে করে এনেছেন শুনে রাক্ষসী হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মর্‌তে লাগ্‌লো। আবার পাঁকাটির উপর বিছানা পেতে শুয়ে এপাশ ওপাশ কর্‌তে লাগলো। রাজা খবর পেয়ে অন্তঃপুরে এলেন। রাজাকে দেখে রাক্ষসী কেঁদে বল্লে, "এবার আমার ভারী অসুখ এবার আমি বাঁচবো না।"

রাজা দেখেন, "তাই তো রাণীর চোখে কালী পড়েছে, মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছে।"

রাজা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "রাণী, কি হ'লে তুমি ভাল হবে?" রাণী বল্লেন, "সাত অন্ধের পুত্র বীরবল যদি আমার সমুদ্রপারে বাপের বাড়ীর দেশ থেকে বারোহাত কাঁকুড়ের তেরোহাত বীচি আন্‌তে পারে, সেই বীচি ঘষে খেলে আমার সব অসুখ ভাল হয়ে যাবে।"

রাজা বীরবলকে ডাকিয়ে বল্লেন, "বীরবল, সমুদ্রপারে রাণীর বাপের বাড়ীর দেশ থেকে বারোহাত কাঁকুড়ের তেরোহাত বীচি আন্‌তে পার্‌বে?"

বীরবল বল্লে, "কেন পার্‌বো না?"

রাণী তখন এক লিখন দিলেন, বীরবলকে বল্লেন, "আমার হাতের এই লিখন পেলেই তারা তোমাকে বারোহাত কাঁকুড়ের তেরোহাত বীচি দেবে। দেখ যেন এ লিখন খুলে পড় না।"

বীরবল লিখন হাত করে ঘরে গেলেন। সাত অন্ধ মাকে জনে জনে প্রণাম করে বল্লেন, "মা, বারোহাত কাঁকুড়ের তেরোহাত বীচি আন্‌তে যাব, তোমরা অনুমতি দাও।" সাতরাণী হাকুলী বিকুলী কাঁদতে লাগ্‌লেন, বল্লেন, "এর চেয়ে যে বন ভাল ছিল। কোলের বাছা, দুদিন আমাদের কোলে থাক্‌তে পায় না। দেশে কি আর বারোহাত কাঁকুড়ের তেরোহাত বীচি আন্‌বার মানুষ নাই?"

বীরবল বুঝিয়ে বল্লেন, "মা কেঁদ না, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে যাব, যাব আর আস্‌ব। বেশী দেরী হবে না।"

সকালে উঠে বীরবল যাবেন, রাত্রে ফুলের বিছানায় ঘুমাচ্ছেন, পবনের মেয়ে স্বামীর

অঙ্গে চামর করছেন। চামর কর্‌তে কর্‌তে দেখেন বীরবলের শিথানের কাছে লিখন। লিখন খুলে পড়ে দেখেন রাক্ষসী রাণী সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যে রাক্ষসের দেশ সেইখানে তাঁর মাকে চিঠি লিখ্‌ছেন। লিখেছেন, "এ আমার সতীনের ছেলে, এ যাবামাত্র একে খেয়ে ফেল্‌বে। আর কৌটায় করা যে আমার সাত সতীনের চৌদ্দটা চোখ আছে তা সমুদ্রে ফেলে দেবে।"

রাক্ষসদেশের ভাষা সবাই বুঝ্‌তে পারে না। কিন্তু পবন রাজার মেয়ে বুঝ্‌লেন। বুঝে, সে লিখন ছিঁড়ে ফেলে, নিজে এক লিখন লিখ্‌লেন। যেন রাক্ষসী তার মাকে লিখেছে, "মা, আমার এক ছেলে হয়েছে। সেই ছেলে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি, এর হাতে বারোহাত কাঁকুড়ের তেরোহাত বীচি দেবে। আর আমার সাত সতীনের চোদ্দটা চোখ যে কৌটায় আছে সে কৌটোটা দেবে।" চিঠি লিখে যেমন ছিল বীরবলের শিথানে রাখলেন।

রাত শেষ হয় হয়। তখন বীরবলের ঘুম ভাঙ্‌লো। পবন কন্যা বীরবলকে সব কথা খুলে বল্‌লেন। আর বল্‌লেন, "কৌটার সেই চোদ্দটা চোখ আমাদের সাত অন্ধ মায়ের, তুমি যদি সেই চোখ আন্‌তে পার তবে সাত অন্ধ মা আবার চক্ষু পাবেন।"

সকালে উঠে বীরবল মায়েদেব কাছে গিয়ে বল্লেন, "মা, কি করে তোমরা অন্ধ হ লে আমাকে বল।"

রাণীরা সে কথা বল্‌তে চান না, বীরবল কথা না শুনে ছাডবেন না। শেষে মেজরাণী কাঁদতে কাঁদতে সব কথা বল্লেন। মায়েদের দুঃখের কথা শুনে বীরবলের দুই চক্ষে জল পড়ে আর দুই হাতে মোছেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌লেন, "মায়েদের এ দুঃখ যদি দূর কর্‌তে পারি তবেই প্রাণ রাখ্‌বে।"

৯

বীরবল ঘোড়াশালা থেকে পক্ষীরাজ ঘোড়া নিয়ে চোখের পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে রাক্ষসের রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন। নেমে যতদূর যান কেবল মানুষের হাড়ের পাহাড় দেখতে পান। যেতে যেতে যেতে প্রকাণ্ড রাক্ষসের পুরী দেখ্‌তে পেলেন। বীরবলকে দেখে "হাঁউ মাউ খাঁউ, মান্‌ষের গন্ধ পাঁউ" করে রাক্ষস রাক্ষসী ছুটে এল। বীরবল হাতের লিখন বুড়ী রাক্ষসীর কাছে ফেলে দিলেন। লিখন পড়ে বুড়ী রাক্ষসী বল্লে, "ওরে খাস্‌নে খাস্‌নে, এ যে আমার নাতি।"

কত আদর করে, বুড়ী রাক্ষসী নাতিকে ঘরে নিয়ে গেল, পুরীর ভিতর দুর্গন্ধে বীরবলের প্রাণ যায়, কি করেন কোনও মতে পুরীর ভিতর গেলেন। বুড়ী রাক্ষসী কাছে বসিয়ে আদর করে কত কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে। বুড়ী রাক্ষসীর আর সন্দ যায় না। লোহার কড়াই খেতে দিয়ে বল্লে "আমার নাতি যদি হয় তবে লোহার কড়াই চিবিয়ে খাবে।"

বীরবল হাতের কৌশলে লোহার কড়াই কোঁচড়ে ফেলে চারটি মটর ভাজা লুকিয়ে এনেছিলেন, তাই চিবিয়ে খেলেন। তখন বুড়ী খুসী হলো।

এদিক ওদিক করে বীরবল বল্লেন, "দিদিমা, মার বড় অসুখ। বারোহাত কাঁকুড়ের তেরোহাত বীচি আর সেই কৌটোটা মা শীগ্‌গির নিয়ে যেতে বলেছেন।"

বুড়ী বল্‌লে, "দাদা, এতদিন পরে এসেছ, আজকার রাতটা থাক।"

এধার ওধার করে বীরবল দেখলেন, দাঁড়ের উপর একটি সুন্দর ময়না পাখী। বুড়ীকে বল্‌লেন, "দিদিমা ওই পাখীটি আমি নেব।" বুড়ি নাতি পেয়ে আহ্লাদে ডগ্‌ডগে। হেসে

বল্লে, "দাদা, ও পাখী কি নিতে আছে, ও যে আমাদের ষোলশো রাক্ষসীর প্রাণ-পাখী। ও পাখীটি যেদিন মরবে আমরাও সেইদিন মর্‌বো।"

বীরবল আর কিছু না বলে যেন ঘুমিয়েছেন এমনি বিছানায় শুয়ে পড়ে থাক্‌লেন। নিশিরাত্রে রাক্ষস রাক্ষসীরা যেমন চরা বরা কর্‌তে দেশ-দেশান্তরে বেরিয়ে গিয়েছে অমনি বারোহাত কাঁকুড়ের তেরোহাত বিচি, আর সেই চৌদ্দটা চোখেব কৌটা, আর সেই ময়না পাখিটি নিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে চোখের পলক্ ফেল্‌তে না ফেল্‌তে দেশে ফিরে এলেন।

তার পরদিন সকালে রাজাকে গিয়ে বারোহাত কাঁকুড়ের তেরোহাত বীচি দিলেন। রাক্ষসীর দেখে প্রাণ ধুক্‌পুক করতে লাগ্‌লো। রাক্ষসী ভাব্‌লে "হল কি ?" তখন বীরবল বল্লেন, "মহারাজ দেশের যত লোক সকলকে ডাকুন, পাত্র মিত্র নিয়ে আপনি দরবারে বসুন, রাণীমাকেও দরবারে ডাকুন, আমি আজ সকলকে এক আশ্চর্য কাণ্ড দেখাবো।"

রাজা বল্লেন, "আচ্ছা।"

রাণীর বুক ধড়্‌ফড়্ করতে লাগলো। "দেখি কি হয়" ব'লে দরবারে এলেন। বীরবল দেখলেন. দেশের যে যেখানে ছিল সব দরবারে এসেছে।

তখন বীরবল "এক যে রাজা ছিল"—বলে রাক্ষসী রাণীর আগমন হতে যা যা হয়েছিল সমস্ত কথা বলে গেলেন। শুনিয়া রাক্ষসী রাণীর মুখ চুন হয়ে গেল। দেশের লোক শুনে অবাক হ'য়ে থাক্‌লো।

তারপর বীরবল সেই ময়না পাখীটা বা'র কল্লেন। পাখীটি দেখে রাণী, "আমি ও পাখীটি নেব" বলে হাকুলী বিকুলী কব্‌তে লাগ্‌লেন। রাজা বল্লেন, "ও ছেলেমানুষ ওর পাখীটি তুমি কেড়ে নেবে ?"

বীরবল অমনি তলোয়ার দিয়ে পাখীর একটা ঠ্যাং কেটে ফেল্‌লেন। অমনি রাণীর একটা পা কেটে দুম্ করে মাটিতে পড়লো। পা নয়তো যেন একটা পাহাড় ! রাক্ষসীর মূর্তি ধরে রাণী তখন বীরবলকে ধরতে এল। বীরবল তাডাতাড়ি আর একটা ঠ্যাং কেটে ফেল্‌লেন। রাক্ষসীর আর একটা পা দুম্ করে খসে পড়লো। রাক্ষসীর চুলগুলো যেন মোটা মোটা তালগাছ, চোখ দুটো যেন দুটো আগুনের চাকা !

সুন্দরী রাণীর এই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে রাজা একেবারে মূর্চ্ছা গেলেন। রাক্ষসী হাঁ করে যাকে পায় তাকে গিল্‌তে যায় দেখে বীরবল খচ্ করে পাখীর গলাটি কেটে ফেল্লেন, আর রাক্ষসী তখন গলা কেটে মরে গেল। ষোলশো রাক্ষস রাক্ষসী যে যেখানে ছিল মরে গেল।

তখন বীরবল সমস্ত কথা খুলে বল্লেন। রাজা চতুর্দোলায় করে সাত রাণীকে আর পবনরাজার কন্যাকে রাজপুরীতে নিয়ে এলেন। বীরবল কৌটা খুলে সাতরাণীর চোদ্দটা চোখ বা'র কল্লেন। চোখগুলো পচেনি গলেনি যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে।

পবনকন্যা বারোহাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি-ঘসা জলে চোখ ধুয়ে যার চোখ যেটি ঠিক করে লাগিয়ে দিলেন, তারপর পদ্মহাত বুলুলেন। রাণীদের যেমন চোখ ছিল ঠিক তেমনি হল।

রাজা এক কোলে ছেলে নিলেন এক কোলে বউ নিলেন, সাতরাণী ছেলে বৌয়ের মুখ দেখে চক্ষু সার্থক করলেন।

বীরবলকে রাজা করে রাজা সুখ স্বচ্ছন্দে ছেলে বৌ নিয়ে রাজত্ব কর্‌তে লাগলেন।

রমারাণী দেবী

নির্ম্মল-পাটন

এক দেশে এক রাজা ছিলেন ; মস্ত রাজা,—লোক লস্কর, হাতী ঘোড়া, জমি জায়গীর,—রাজার অতুল ঐশ্বর্য্য, প্রবল প্রতাপ। রাজার রাজমহলের নিকটে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণের পরিবারের মধ্যে স্ত্রী আর একটি কন্যা। মেয়েটির নাম নির্মলা, কন্যাটি যেমন রূপবতী, তেমনি গুণবতী, আবার তেমনি বুদ্ধিমতী। গরীব ব্রাহ্মণের কতকগুলি গাভী ছিল, তাইতে দুধ দই ঘি বিক্রি করে কোন রকমে ব্রাহ্মণ পরিবারের দিন যাপন হইত। রাজার গোচারণের মাঠে ব্রাহ্মণের গাভীগুলিও চরিতে যাইত। একবার ব্রাহ্মণের অনেকগুলি গোবৎস জন্মিল, ক্রমে ক্রমে একশত আটটি বাছুর হইল। ব্রাহ্মণ অল্পদিনের মধ্যেই ধনবান হ'লেন, কুটীর ঘুচে অট্টালিকা প্রস্তুত হ'ল, ব্রাহ্মণীর গায়ে সোনারূপার গহনা হল। ব্রাহ্মণের সুখ সম্পত্তি দেখে পাড়ার হিংসুক লোকেরা হিংসায় জ্বলিতে লাগিল। একজন ধূর্ত শঠ রাজদরবারে গিয়া ব্রাহ্মণের নামে, রাজার কাছে অভিযোগ করিল, "মহারাজ ! আপনার প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের কতকগুলি গোবৎস জন্মেছে, ন্যায্য মতে তাহারা আপনারই সম্পত্তি, কেন না আপনার গোচারণের মাঠে, আপনার বলদদের সঙ্গে ব্রাহ্মণের গরুগুলি চরিতে যাইত। ব্রাহ্মণ রাজদরবারে সে কথা না জানাইয়া, আপনার সম্পত্তি ভোগ করিয়া ধনবান হইয়াছে, ব্রাহ্মণকে চোরের উপযুক্ত দণ্ড দেওয়া উচিত।" রাজা শুনিবামাত্র হুকুম দিলেন, "ব্রাহ্মণের কাছ থেকে সব গরু বাছুরগুলি কাড়িয়া লইয়া আমার গোশালায় বাঁধিয়া রাখ।" হুকুমমাত্র আজ্ঞা পালিত হইল। গরীব ব্রাহ্মণ রাজার অবিচার দেখিয়া মনের দুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন। নির্মলা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, তুমি কেন কাঁদছ ?" ব্রাহ্মণ বল্লেন, "কি বলব মা, কপাল ভেঙ্গেছে, তোমাদের এবার কি করে প্রতিপালন করব, তাই ভাবছি।" "কেন বাবা। কি হয়েছে ?" ব্রাহ্মণ কন্যাকে সব বৃত্তান্ত বল্লেন। নির্মল সকল শুনিয়া বলিল, "বাবা, তুমি আর কেঁদ না, আমি এর উপায় করছি।"

২

সন্ধ্যার সময় রাজার বাগানে, পুকুরের ধারে রাজার ছেলে পাটন বেড়াইতেছেন। রাজার একটিমাত্র ছেলে, বড় আদরের,—ছেলে যখন যা বলে, রাজা রাণী তৎক্ষণাৎ তাই করেন। এদিকে নির্মলা কতকগুলি ছেঁড়া নেকড়া হলুদে রাঙাইয়া রাজার পুষ্করিণীর ধারে গিয়া বসিল। তখন সূর্য অস্ত যায় হয়েছে, লাল টুকটুকে আকাশ, ঝিরঝিরে বাতাস, পুকুরের নীল জলে তর্ তর্ করে বইচে। আশে পাশে কদমফুলের ঝাড়,—বেল মল্লিকার গন্ধে বাগান ভুরু ভুরু করচে। নির্মল হলুদ ছোপান নেকড়াগুলি আচড়ে আচড়ে কাচতে লাগলো। পাটন বেড়াতে বেড়াতে সেই দিকে এলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, "কি গো, ব্রাহ্মণ কন্যা ! কি করচ ?" ঘাড় নীচু করিয়া নির্মল বলিল, "আমার বাবার ছেলে হয়েছে, তাই এই ময়লা নেকড়া কাচ্চি।"

হাসিয়া পাটন বলিলেন, "বাবার আবার ছেলে হয়েছে কি কথা ? বাবার কি কখন ছেলে হয় ?" নতমুখে নির্মলা বলিল, "তার আর আশ্চর্য কি ? রাজার বাড়ীর ষাঁড়দের যদি বাছুর জন্মায়, তাহলে আমার বাবার ছেলে হবে না কেন ?" পাটন সব বুঝিলেন, মহা রাগিয়া

বলিলেন, "কি আমার মুখের উপর এই জবাব ? তোমার বড় অহঙ্কার হয়েছে, তোমাকে জব্দ করছি, কালই তোমাকে বিয়ে করে রোজ পাঁচ পয়জার মারব। তবে তোমার উচিতশাস্তি হবে।" নির্মলা হাসিয়া বলিল, "বেশ কথা, তোমার ক্ষমতা থাকে, আমাকে রোজ পাঁচ পয়জার মেরো, জব্দ করো।" কুপিত হইয়া মহা অভিমানে পাটন বাড়ী গেলেন। হাসিতে হাসিতে নির্মলাও ঘরে ফিরিল।

৩

পরদিন প্রত্যূষে রাজদরবারের পাইক গিয়া ব্রাহ্মণের দ্বারে দাঁড়াইল। নিদ্রোত্থিত ব্রাহ্মণ শশব্যস্তে কম্পিত কলেবরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ ?" পাইক বলিল, "রাজার তলব হয়েছে, আজ তোমার সুপ্রভাত, এখনি চল।" ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ব্রাহ্মণ রাজদরবারে গেলেন। আবার না জানি কি বিপদ ঘটে ভাবিয়া মায়ে ঝিয়ে কাঁদিতে বসিলেন। ব্রাহ্মণ আসিবামাত্র রাজা সিংহাসন থেকে উঠে মহা সমাদরে ব্রাহ্মণকে পাশে বসালেন, সম্মানের সহিত বললেন, "আমার ছেলের ইচ্ছা,—তোমার মেয়ের সঙ্গে আজই আমার পাটনের বিবাহ দিতে হবে। তুমি আজ থেকে আমার বেয়াই হলে। তোমার সব অপরাধ মার্জনা করিলাম।" বলিয়া রাজা ব্রাহ্মণকে আদর অভ্যর্থনা করিলেন, ব্রাহ্মণের গরুগুলি সব ফিরাইয়া দিলেন, আরও বিস্তর ধন দৌলত দিয়া পুরস্কৃত করিয়া ব্রাহ্মণকে বিদায় করিলেন।

রাজ্যময় মহোৎসব পড়িয়া গেল, মহা সমারোহ। রাজপুত্রের বিবাহ, ফুল, ফল, মাছ, তরকারী, দই, ক্ষীর, মিষ্টান্ন ভারে ভারে আসিতে লাগিল। নহবৎখানায় নহবৎ বাজিয়া উঠিল। রাজ্যে আর সেদিন কেহ অভুক্ত রহিল না। সেদিন রাজ্যের একজন লোকেরও বিমর্ষ মুখ দেখা গেল না। মহা আনন্দে ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহের উদ্যোগ করিয়া কন্যাদান করিলেন। কাপড়, চকচকে ঝক ঝকে গহনায় সাজিয়া, হীরা মতির হার পরিয়া, ফুলময় গৃহে ফুলের বিছানায় বরকন্যা বাসর আলো করিয়া বসিলেন। তখন পাটন বলিলেন, "কেমন নির্মল ! তোমাকে এইবার পাঁচ পয়জার মারি ?" নির্মল উত্তর করিল, "এখন কেন মারিবে ? আগে তোমার বাড়ী যাই, তারপর মারিও।" রাজপুত্র বল্লেন, "আচ্ছা, তোমার আজকের পাঁচ পয়জার আমার খাতায় লেখা রহিল।" হাসিয়া নির্মল বলিল, "তা থাক্।"

প্রভাতে বরকন্যা বিদায় হইয়া গেল।

৪

দ্বারে আলিপনা, পীঁড়িতে আলিপনা, আম্রপল্লব, মঙ্গল ঘট, ফুলের মালায়, শঙ্খধ্বনিতে রাজপুরী আনন্দময়। রাণী আহ্লাদে পুত্রবধূ বরণ করিয়া গৃহে লইলেন। বিবাহ মহোৎসব শেষ হইল। বিশ্রামান্তে পাটন বলিলেন, "কেমন নির্মল ! এইবার তোমাকে পাঁচ পয়জার মারি ?" নির্মল বলিল, "এখনও তুমি আমাকে মারিতে পার না, আমি এখনো তোমার রোজগার খাইনি, আমার উপর তোমার জোর নাই, আমি শ্বশুরের অন্নে পালিতা, এখন আমাকে মারিবার তোমার ক্ষমতা কি ?" রোষভরে পাটন বলিলেন, "বটে, আচ্ছা আমি এখনই বাণিজ্য করতে যাব। ধন উপার্জন করে আনব, তারপর তোমাকে দেখিব, তুমি কেমন মেয়ে। বিবাহের দিন থেকে তোমার নামে রোজ পাঁচ পয়জার করিয়া লিখিতেছি, একদিন সে সমস্ত শোধ লইব।" হাসিয়া নির্মল বলিল, "বেশ, আমি তাতে রাজি আছি।"

রাজার আদুরে ছেলে, যা ধরবেন, তাই করবেন। তখনি পিতাকে গিয়া জানাইলেন, "বাবা, আমি বাণিজ্য করতে যাব, আমাকে সাত ডিঙ্গী ধন দাও।" রাজরাণী বারণ করিলেন। বিস্তর বুঝাইলেন, ছেলে ভুলিবার নয়, কথা শুনিল না। অগত্যা রাজা সাত ডিঙ্গী ধন সাজাইয়া লোক জন সঙ্গে দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছেলেকে বিদায় করিলেন।

কত দেশ রাজ্য ছাড়াইয়া রাজপুত্রের ডিঙ্গী চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে পথে এক স্থানে নদীর ধারে কতকগুলি বক দেখিতে পাইয়া পাটন একটি বক মারিলেন। দূরে একজন ধোপা বসিয়াছিল, পাটনকে বক মারিতে দেখিয়াই ধোপা আসিয়া রাজপুত্রের ডিঙ্গী ধরিয়া দাঁড়াইল। পাটন বল্লেন, "আমার ডিঙ্গী ধর কেন?" ধোপা বলিল, "তুমি বকটি মারিলে কেন? ওটি আমার বক, আমি এখানে কাপড় কাচি। ঐ বকটি আমার প্রহরায় থাকিত, বকের জন্য আমার ক্ষতি হয়েছে, তুমি আমায় এক ডিঙ্গী ধন দাও।" অগত্যা পাটন ধোপাকে এক ডিঙ্গী ধন দিলেন। আবার কিছু দূর যান, মধ্য পথে একটা এক পেয়ে খোঁড়া আসিয়া রাজপুত্রের ডিঙ্গী আটকাইল। পাটন জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন আমার ডিঙ্গী ধর?" খোঁড়া বলিল, "তোমার বাপ মৃগয়া করতে এখানে এসে আমার এক পা খোঁড়া করে দিয়ে গেছেন, তুমি এক ডিঙ্গী ধন দিয়ে আমার ক্ষতিপূরণ কর।" পাটন খোঁড়াকে এক ডিঙ্গী ধন দিলেন। তারপর আবার যেতে যেতে খানিক দূরে একটি স্ত্রীলোক এসে রাজপুত্রের ডিঙ্গী ধরিল। বিরক্ত হয়ে পাটন জিজ্ঞাসা কল্লেন, "তুমি আবার কেন ডিঙ্গী ধর?" স্ত্রীলোকটি বলিল, "তোমার বাপ এখানে এসে আমাকে বে করে গেছেন, অনেক দিন হল, উদ্দেশ করেন না, আমি খেতে পাই না, আমায় এক ডিঙ্গী ধন দাও।" পাটন অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাকেও এক ডিঙ্গী ধন দিলেন।

এই রকমে যেতে যেতে কিছুদিনের পর পাটন আর এক রাজার দেশে পৌঁছিলেন। ডিঙ্গী থেকে নেমে রাজ-ডঙ্কায় ঘা দিলেন, সে রাজ্যে প্রবেশ করতে হলে ডঙ্কায় ঘা দিতে হয়। রাজার এক পরমা সুন্দরী বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল। কন্যাপণ করেছিলেন, যে তাঁকে পাশা খেলায় হারাবে, তার গলেই বরমাল্য দেবেন। নতুবা যে হেরে যাবে, তাকে কারাগারে বন্দী করে রাখবেন। এই রকমে কত দেশের রাজপুত্র যে কারাগারে বন্দী হয়ে আছেন, তার সংখ্যা নাই। পাটন এই সব শুনে রাজকন্যার সঙ্গে পাশা খেলতে গেলেন। কন্যা রাত্রিকালে একটা বিড়ালের মাথায় প্রদীপ রাখিয়া পাশা খেলেন, বিড়াল নড়ে না, টলে না, চক্ষুর নিমেষ ফেলে না। স্থিরভাবে প্রদীপটি মাথায় লইয়া বসিয়া থাকে। সেই আশ্চর্য প্রদীপের আলোক সাহায্যে রাজকন্যা জয়লাভ করেন, পাশা খেলায় তাঁকে কেহ হারাতে পারে না। পাটন দেখিলেন পরমা সুন্দরী কন্যা,—রূপে. সাজসজ্জায়,—জাঁকজমকে ঘর আলো করিয়া বসিয়াছেন। সাদা ধব্‌ধবে বিড়ালের মাথায় সোনার প্রদীপ সুগন্ধ ছড়াইয়া জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছে।

রাজকন্যার রূপ, সাজসজ্জা দেখিয়াই পাটনের মাথা ঘুরিয়া গেল, হতবুদ্ধি হইয়া পাশা খেলিতে লাগিলেন। প্রতিবারই হারিয়া গেলেন। প্রভাতে রাজার আদেশে পাটন কারাগারে বন্দী হইলেন। তাঁহার ধন সম্পত্তি সব রাজা গ্রহণ করিলেন।

৫

এই রকমে কত বৎসর কেটে গেল। পাটনের বড় কষ্ট হ'তে লাগলো, তাঁকে কারাগারে ঘোড়ার ঘেসেড়া হ'তে হয়েছে। রাজার ছেলে,—কখনও নীচ কাজ করেন নি, রাজপুত্র যত

কষ্ট পান, ততই নির্মলের উপর তাঁর রাগ বাড়িতে থাকে। মনে ভাবেন, নির্মলের জন্যেই তাঁকে এত দুঃখ পেতে হচ্ছে। কারাগারে থাকিয়াও প্রত্যহ নির্মলের জন্য পাঁচ পয়জার লিখিয়া রাখিতেছেন, একদিনও ভুলেন নাই। দিবসের কাজকর্ম সারিয়া ক্লান্ত শরীরে রাজপুত্র যখন বিশ্রামের অবসর পান, দেশের কথা, মা বাপের আদর প্রভৃতি মনে পড়ে, রাজপুত্র দুঃখে আকুল হইয়া কাঁদিয়া ফেলেন। মনে ভাবেন, একবার দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিলে, নির্মলের উপরই এই সকল দুঃখকষ্টের প্রতিশোধ লইবেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজপুত্র অবশেষে সকল সংবাদ বিস্তারিত লিখিয়া, দুঃখকাহিনী জানাইয়া, পিতাকে একখানি পত্র লিখিলেন। এবং আর একখানি পত্রে নির্মলকে লিখিলেন যে, "আমি ভাল আছি, ধন উপার্জন করিয়া শীঘ্রই দেশে ফিরিতেছি, তুমি মার খাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিও, এত দিনের সমস্ত ঋণ শোধ করিয়া দিতে হইবে।" পত্র দুখানি তাঁহার একজন সঙ্গী—দেশের লোকের হাত দিয়া কৌশল করিয়া পাঠাইলেন।

এদিকে রাজারাণী অনেকদিন ছেলের কোন সংবাদ না পাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধপ্রায় হইয়াছেন, নির্মলও স্বামীর জন্য সদাই ব্যাকুল,—বিষণ্ণ ভাবে থাকেন। পুত্রশোকে রাজা আর রাজকার্য করিতে পারেন না, নির্মলই কোন রকমে রাজ্য চালাইতেছেন। নির্মল শ্বশুর শাশুড়ীকে দিবা রাত্রি সেবা যত্ন করেন, সান্ত্বনা দেন। এই সময়ে একদিন পাটনের পত্র দুখানি লইয়া লোক পৌঁছিল। রাজার পত্রখানি পাটন গোপনে রাজার হাতে দিবার আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা আর রাজসভায় থাকেন না। সুতরাং দুখানি পত্রই নির্মলের হাতে পড়িল। নিজের চিঠিখানি পড়িয়া নির্মলের বিষণ্ণ মুখে হাসি আসিল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া, নির্মল স্বামীকে উদ্ধার করিবার জন্য উপায় স্থির করিলেন। রাজা রাণীর নিকট কিছুদিনের নিমিত্ত বিদায় লইয়া পিত্রালয়ে আসিলেন। পিতামাতাকে স্বামীর বিপদের কথা জানাইয়া বলিলেন, "এখন কাহাকেও কিছু বলো না, স্বামীকে উদ্ধার করে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।" তারপর নির্মল সেই পত্রবাহককে সঙ্গে লইয়া, সাত ডিঙ্গী ধন সাজাইয়া, রাজপুত্রের বেশে সাজিয়া চুপি চুপি স্বামীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

৬

যে পথে পাটন গিয়াছিলেন, সেই পথেই নির্মল চলিলেন। যাইতে যাইতে পথে আবার সেই বক,—সেই ধোপা। নির্মল সেই বক মারিলেন, ধোপা অমনি এক ডিঙ্গী ধনের দাবী করিল। নির্মল বলিলেন, "ধন তোমাকে কেন দিব ? আমার ডিঙ্গীর আগায় একটি পাঁকাল মাছ বাঁধিয়া আনিয়াছিলাম আমাকে পথ দেখাইবার জন্য, তোমার বক আমার সেই মাছটি মারিয়া খাইয়া ফেলিল। তাই আমি তোমার বক মারিলাম, আগে তুমি আমার ক্ষতিপূরণ কর।" ধোপা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া পলাইল। তারপর আবার সেই খোঁড়া আসিল, সেই দাবী করিয়া ধন চাহিল। নির্মল উত্তর করিলেন, "হাঁ, সত্য বটে আমার বাপ তোমার এক পা কাটিয়া দিয়াছেন, আমি তোমার সেই ভাঙ্গা পাখানি আবার গড়িয়ে দিব বলে এসেছি, কাছে এস, তোমার ঐ পাখানি মাপ লইবার জন্য কেটে নিয়ে যাই।" খোঁড়া শুনিয়া, আর উত্তর না করিয়া সরিয়া পড়িল। তারপর যেতে যেতে আবার সেই মায়াবিনী স্ত্রীলোক আসিল, তারও সেই এক দাবী। তাকে নির্মল বলিলেন, "সত্য বটে, আমার বাপ তোমাকে বে করে ফেলে গেছেন, কিন্তু সম্প্রতি তাঁর মৃত্যু হয়েছে, আমি তাঁর পায়ের খড়ম এনেছি, তিনি ঐ খড়মের সঙ্গে তোমাকে সহমৃতা যেতে বলেচেন, অতএব এস আর দেরী কর না, এই

খড়মের সঙ্গে চিতায় যাও ।" মায়াবিনী বিপদ দেখিয়া আর কথাটা না কহিয়া ভয়ে পলাইল ।

বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে নির্মল সেই রাজার দেশে পৌঁছিলেন । রাজার ডঙ্কায় ঘা পড়িল, সংবাদ গেল এক রাজপুত্র এসেছেন, সাত ডিঙ্গী ধন লইয়া—এমন রাজপুত্র সাত ডিঙ্গীপূর্ণ ধন লইয়া এ রাজ্যে আর কেহ কখন আসেন নি । রাজা সংবাদ শুনে বুঝিলেন পথিমধ্যে তিনটি প্রবঞ্চককে এ রাজপুত্র ঠকিয়ে এসেছেন, ইনি বুদ্ধিমান বটে । রাজা নিজে গিয়ে মহা সমাদরে রাজপুত্রকে অভ্যর্থনা করে আনলেন । নির্মল রাজকন্যার পাশা খেলার বিবরণ সব লোকের কাছ থেকে খবর নিলেন । শুনিলেন, কোন উপায়ে বিড়ালের চক্ষের পল্লব পড়িলেই বিড়ালের মাথার প্রদীপ নিভে যাবে এবং রাজকন্যাও পাশায় হারিবেন । তখন নির্মল একটা ইঁদুর পুষে বস্ত্রের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে, বেশভূষা করে এক দিন রাজকন্যার সঙ্গে পাশা খেলতে গেলেন । রাজকন্যা নির্মলের ভুবনমোহন রূপ দেখে একেবারে মোহিত হয়ে গেলেন । দুজনে পাশা খেলতে বসেছেন, খেলতে খেলতে নানারকম গল্প হাস্য পরিহাসে নির্মল রাজকন্যাকে অন্যমনস্ক করবার চেষ্টা করছেন । দৈবাৎ রাজকন্যা একবার সেই অন্যমনা হইলেন, অমনি নির্মল বস্ত্রের মধ্য থেকে ইঁদুরটি বা'র করে একেবারে বিড়ালের মুখের উপর ধরিলেন । বিড়াল অমনি লাফিয়ে উঠে ইঁদুরটি ধরিয়া ফেলিল, তাহার মাথার উপর থেকে প্রদীপ পড়িয়া নিভিয়া গেল । রাজকন্যা পাশায় হারিলেন ।

রাজ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, রাজকন্যা পাশায় হারিয়াছেন, এইবার রাজকন্যার বিবাহ হইবে । নির্মলকে চারিদিকে ধন্য ধন্য করিতেছে । রাজা ভাবী জামাতাকে মহাসমাদরে যত্ন করিতেছেন । কিন্তু নির্মল এখন বিবাহ করিতে চাহেন না, তিনি রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ আগে আপনার কারাগারের বন্দীদিগকে মুক্তি দিন । আমি স্বহস্তে তাদের মুক্ত করিয়া আসিব, তবে বিবাহ করিব ।" রাজা সম্মত হইলেন, তখন নির্মল একে একে কারাগারের সব বন্দী রাজপুত্রদের মুক্ত করে পাটনের কাছে এলেন । পাটনের আকৃতি দেখিয়া নির্মলের চক্ষে জল আসিল । এ কি সেই আদরের দুলাল— সোনারচাঁদ রাজপুত্র ? পাটনের মলিন বেশ, রুগ্ন কেশ, বড় বড় নখ, ধূলামাখা অঙ্গ । লুকাইয়া দুই বিন্দু অশ্রু মুছিয়া নির্মল পাটনকে লইয়া নিজের বাসায় ফিরিয়া আসিলেন । স্বামীকে সুগন্ধি তেল মাখাইয়া ভাল করিয়া স্নান করাইলেন, রাজপুত্রের যোগ্য বেশ পরাইয়া দিলেন বলিলেন, "তোমাকে এখন আমার কাছে থাকিতে হবে ।" পাটন বল্লেন, "রাজপুত্র ! তুমি সকলকে মুক্তি দিলে । তোমার দয়ায় আমিও বাঁচিলাম, তবে আর আমাকে আটক কর কেন ? দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দাও ।' নির্মল বলিলেন, "তোমাকে আমি কিনিয়াছি, তোমাকে ছাড়িব না, আমার দেশে লইয়া যাইব, আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু হলে , আমার কাছে তোমার কোনো কষ্ট হবে না ।" কাজেই পাটনকে রাজপুত্রের কাছে থাকিতে হইল । নির্মলের যত্ন সেবায় পাটন বন্ধুকে বড় ভালবাসিলেন ।

তখনও স্ত্রীর নামে, পাটন রোজ পাঁচ পয়জার করিয়া মারিবার হিসাব লিখিতেছেন । একখানি বৃহৎ খাতা হিসাব লিখিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে । একদিন নির্মল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি রোজ খাতায় কি লেখ ?" রাজপুত্র বলিলেন, "আমার স্ত্রীকে রোজ পাঁচ পয়জার মারিবার কথা আছে, আমি যত দিন বিদেশে থাকি, মারিতে পারি না, খাতায় তাই হিসাব লিখিয়া রাখি ।" নির্মল হাসিয়া বলিলেন, "তোমার এ খাতাখানি এখন আমাকে দাও, তোমার দরকার হলে আবার তোমাকে ফিরিয়ে দেব ।" খাতাখানি নির্মল নিজের কাছে রাখিলেন ।

নির্মল আর রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে চান না । রাজা অনেক সাধ্যসাধনা করাতে শেষে

নিরুপায় হয়ে বিবাহ করিলেন। কিন্তু রাজকুমারীর সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করেন না। অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন না। নির্মল কিছুদিন পরে রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ আমি আর এখানে থাকিতে পারিব না, দেশে যাইব, আপনার যদি ইচ্ছা হয়, রাজকন্যাকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন।" রাজা তখনি সম্মত হইলেন, অৰ্দ্ধেক রাজত্ব, বিস্তর ধন রত্ন দিয়া কন্যা জামাতাকে বিদায় করিলেন। রাজকন্যা ও পাটনকে সঙ্গে লইয়া নির্মল নৌকায় উঠিলেন। দেশের নিকট পৌঁছিয়া নির্মল পাটনকে বলিলেন, "এই তোমার বাপের দেশ, রাজকন্যাকে নিয়ে তুমি তোমার বাড়ী যাও, পথে আমার একটা কাজ সারিয়া আমিও সেখানে যাব, রাজকন্যাকে যত্ন করে রেখো।" এই বলে নির্মল অৰ্দ্ধ পথে এসে নেমে গেলেন।

৭

আবার বাজপুত্রবধূবেশে নির্মল চুপি চুপি আপন পিত্রালয়ে প্রবেশ করিলেন। লোকের দ্বারা রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, রাজপুত্র দেশে ফিরিয়াছেন, চৌদ্দ ডিঙ্গী ধন লইয়া—রাজকন্যা বিবাহ করিয়া আসিয়াছেন। মুখে মুখেই শুভ সংবাদ রাজ্যময় ঘোষণা হইয়া গেল। সকলেই আনন্দে উন্মত্ত,—রাজা মৃতদেহে প্রাণ পেলেন। অনেক দিনের পর রাজ্যে আবার উৎসবের ঘটা পড়িল। রাজা পাত্র মিত্র লয়ে অৰ্দ্ধেক পথ এগিয়ে গিয়ে রাজপুত্রকে ঘরে আনলেন। রাজা রাণী কত কথা পাটনকে জিজ্ঞাসা করেন। পাটন কোন কথারই ভাল জবাব দেন না, কেবল বিমর্ষ হয়ে থাকেন। পাটন বাড়ী এসেই নির্মলকে আনিতে লোক পাঠালেন, হাসি হাসি মুখে নির্মল শ্বশুর বাড়ী এসে পাটনের সঙ্গে দেখা কল্লেন। গর্ব করে তখন পাটন বল্লেন, "কেমন নির্মল ! এইবাব তোমাকে পয়জার মারি ?" নির্মল হসিয়া বলিলেন, "হাঁ, এখন তুমি আমাকে পয়জার মারতে পার বটে। কিন্তু এই মাত্র বাড়ী এসেছ, স্নানাহার কর, একটু বিশ্রাম করে নাও। অনেক দিনের হিসাব বাকী আছে, সমস্ত গুণিয়া মারিতে অনেক সময় লাগিবে, এখনি ত পরিশোধ হবে না, আর আমারও কিছু বলিবার আছে, শুনে তারপর যত ইচ্ছা তুমি আমায় পয়জার মেরো, আমি আর বাধা দেব না।"

নির্মল নিজের সমস্ত কাহিনী আদ্যোপান্ত কাগজে লিখে এনেছিলেন, রাত্রে শয়নঘরে সেগুলি রাজপুত্রকে পড়িতে দিলেন। সমস্ত কাহিনী পাঠ করিয়া পাটন জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি যে রাজপুত্র হয়ে আমাকে উদ্ধার করে এনেছিলে তার প্রমাণ কি ?" তখন নির্মল সেই হিসাবের খাতাখানি ও রাজপুত্রের চিঠি দুখানি বাহির করিয়া দিলেন। পাটন তখন নিতানত লজ্জিত হয়ে অধোমুখে চুপ করে রইলেন।

তখন নির্মল বল্লেন, "এইবার আমাকে জুতো মার, আমি রাজী আছি।" পাটন নির্মলকে হাত ধরে, আদর করে পাশে বসিয়ে বল্লেন, "আর আমাকে লজ্জা দিও না, এখন তুমি আমাকে উল্টে পয়জার মারতে পার।"

সুশীলাবালা দেবী

কেশবতী কন্যা

১

রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালের পুত্র, সওদাগরের পুত্র, চার বন্ধু থাকেন। চার বন্ধু এক যুগ এক প্রাণ। পুঁথি পত্র নেই, শাস্ত্র শেখা নেই, চার বন্ধু রাত দিন খেলিয়া বেড়ান। চার বন্ধুর দৌরাত্ম্যে, লোকের চালে খড় থাকে না, গোয়ালে গরু ছাগল থাকে না, বাগানে গাছপালা থাকে না—বাপে কত গাল পাড়েন, মায়ের কত বুঝান, কিছুতেই কিছু না।

একদিন রাজা বার দিয়ে সভায় বসেছেন,—বাঁয়ে মন্ত্রী, পাত্র মিত্র চার পাশে। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "মন্ত্রী! বংশধর এক ছেলে, সে দিনরাত ঘোড়ায় চড়ে টহল দেবে, আর পায়রা ওড়াবে, না শিখলো রাজকার্য, না শিখলো কিছু। এখন উপায় কি করি?"

মন্ত্রী বল্লেন, "এর এক উপায় আছে। আজ রাণীমাকে বলবেন, রাজপুত্রকে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন না দিয়ে, যেন ছাই বেড়ে দেন। রাজপুত্র অভিমানী, এই রকম কল্লে তাঁর শিক্ষা হবে। আমি মন্ত্রিণীকে এই রকম করতে বোলবো।" কোটাল বল্লেন, "আমিও কোটালণীকে বোলবো।" সওদাগর বল্লেন, "আমিও সওদাগরিণীকে বোলবো।"

রাজা অন্তঃপুরে গেলেন। রাণীকে বল্লেন, "আজ ছেলেকে অন্ন না দিয়ে ছাই বেড়ে দেবে।" মায়ের প্রাণ,—তাকি পারেন? শুনে রাণী চোখের জলে বুক ভাসালেন। কি করেন, পতির আদেশ কি করে লঙ্ঘন করেন? পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত বেড়ে, এক পাশে একটু ছাই রেখে দিলেন। মন্ত্রীর কথায় মন্ত্রিণীও তাই করলেন, কোটালিনী, সওদাগরণীও তাই করলেন।

চার বন্ধু ঘোড়ায় চড়ে পঞ্চাশ ক্রোশ ঘুরে ঘুরে এলেন, গায়ে টস্ টস্ করে ঘাম ঝরছে। তারপর নদীর জলে নেমে এপার ওপার সাঁতরে, নদীর জল তোলপাড় করে নেয়ে উঠলেন।

যে যার ঘরে গেল। রাজপুত্র মাকে ডাকলেন, "মা বড় ক্ষিদে ভাত দাও।" রাণী ভাতের থালা হাতে করে, চোখে জল, বুক দুড় দুড়, "আহা বাছার ক্ষিদের অন্ন, কেমন ক'রে ছাই দেব।" কি করেন! ভাতের থালা এনে সামনে ধরে দিলেন। রাজপুত্র ভাত নিয়ে প্রথম গ্রাস মুখে তুলচেন, এমনসময়ে ছাইয়ের উপর নজর পড়লো। "মা, ও কি" মায়ের মুখের দিকে চেয়ে সব বুঝলেন। হাতের গ্রাস পাতে ফেলে অমনি উঠলেন।

"ওরে বাছা যাসনে যাসনে"—আর যাসনে! কে কার কথা শুনে? চক্ষের নিমিষে মন্ত্রীর বাড়ী গিয়ে উপস্থিত। মন্ত্রীর পুত্র খেতে বসেছে দেখি, "কি খাচ্ছিস, ছাই খাচ্ছিস?" বলে পা দিয়ে ভাতের থালা ঠেলে দিলেন। মন্ত্রীপুত্র দেখেন সত্যিই পাতের কোণে ছাই।

চার বন্ধুর কারুর সে দিন খাওয়া হল না। ছেলে মুখের অন্ন খেলে না। রাণী মন্ত্রিণী কোটালিনী সওদাগরণী কেউ সেদিন মুখে অন্ন তুলতে পারলেন না।

রাত্রে চার বন্ধু একত্র হয়ে সুখ দুঃখের কথা তুললেন। রাগে রাজপুত্রের মুখ রাঙ্গা, রাজপুত্র বল্লেন, "এদেশে আর থাকবো না। চল রাতারাতি দেশ ছেড়ে বনে চলে যাই।" রাজপুত্রের যে মত চার বন্ধুর সে মত। রাজপুত্রের যে কথা সেই কাজ। সবাই ঘুমুলে, ঘোড়াশালা থেকে ঘোড়া খুলে নিয়ে এসে চার বন্ধুতে ঘোড়া ছুট করিয়ে দিলেন।

সারারাত সারাদিন ঘোড়া ছুটালেন। সন্ধ্যার সময় এক অজগর বীজবনে এসে পড়লেন,

পায়ে পায়ে কাঁটাগাছ, লতা দিয়ে যেন গাছে গাছে শিকল বাঁধা, ঘোড়া আর চলে না। কি করেন ? ঘোড়া থেকে নামলেন, ঘোড়ার পিঠে হাত চাপড়ে চারটি লতাপাতা খেতে দিলেন। ঘুমে চোখ ঢুলে আসছে, ক্ষিদেয় পেট জ্বলে উঠেছে—কিবা খাবেন, কোথাও বা ঘুমাবেন।

এক প্রকাণ্ড আমগাছের গোড়ায় চারি বন্ধু ঘোড়া বাঁধলেন। রাজপুত্র বল্লেন, "এই আমগাছের উপর আমরা আজ শুয়ে বিশ্রাম করবো। বিজন বন, সকলে এক সঙ্গে ঘুমুনো ভাল নয়, এক এক প্রহর এক এক জন জেগে পাহারা দিতে হবে।" সকলেরই চোখ বুজে আসছে, জিজ্ঞাসা করলে "প্রথম প্রহর কে জাগবে ?" রাজপুত্র বল্লেন, "তোমরা তিনজনে এখন ঘুমাও প্রথম প্রহর আমি জাগবো।"

তিন বন্ধু নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগলেন। রাত ছম্ ছম্ করছে, মাঝে মাঝে বাঘ ডাকছে, ভালুক হুঁকার দিচ্ছে, রাজপুত্র একা জেগে বসে রইলেন।

'টুপ' করে বোঁটা খসে একটি আম পড়লো, পড়তে পড়তে ডালে এসে আটকে গেলা। গাছের ডালগুলো অমনি মাথা নেড়ে শন্‌শন্ করে ভাঙ্গা আওয়াজে বল্লে, "আম ! তুমি পড় কেন।"

আম বল্লে—

'আম পাকবে বোঁটা খসবে,
আম আর কত দিন গাছে থাকবে ?"

গাছের ডালগুলো বল্লে, "এক যুগ বার বছর গাছে রইলে আজ যে বড় পড় ? তোমার কি গুণ আছে তা বল।"

আম বল্লে, "আমায় যে খাবে সে রাজা হবে।" রাজপুত্র তাড়াতাড়ি আমটা তুলে নিলেন। নখ দিয়ে আমের খোসায় একটা মুকুট এঁকে রাখলেন।

প্রথম প্রহর রাত গেল, রাজপুত্র একাই জেগে ব'সে থাকলেন। দ্বিতীয় প্রহরে আবার একটি আম 'টুপ' ক'রে খসে এসে রাজপুত্রের কোলের কাছে ঘন পাতার মধ্যে পড়লো।

গাছের ডালগুলো অমনি মাথা নেড়ে শন্‌শন্ করে ভাঙ্গা আওয়াজে বল্লে, "আম পড় কেন ?"

"আম পাকবে বোঁটা খসবে,
আম আর কত দিন গাছে থাকবে ?"

"এক যুগ বার বছর থাকলে আজ যে বড় পড় ? তোমার কি গুণ আছে তা বল ?" আম বল্লে, "আমায় যে খাবে সে বাদশা হবে।" রাজপুত্র সে আমটিও কুড়িয়ে নিলেন। নখ দিয়ে আমের গায়ে ত্রিশূল এঁকে রাখলেন।

দ্বিতীয় প্রহর রাত গেল, রাজপুত্র জেগে বসে থাকলেন। তৃতীয় প্রহরে আবার একটি আম খসে রাজপুত্রের কোলের উপর এসে পড়লো।

আগের মত ডালের প্রশ্নে আম বল্লে, "আমায় যে খাবে তার হাঁসলে মুক্তো পড়বে কাঁদলে মাণিক পড়বে।" রাজপুত্র আমের গায়ে একটা মুক্তো এঁকে রাখলেন।

তৃতীয় প্রহর রাত গেল, রাজপুত্র একাই জেগে বসে থাকলেন। চতুর্থ প্রহরে আবার একটি আম খসে পড়লো। এবারে আম বল্লে, "আমায় যে খাবে সে বারো বছর গারদে পচ্‌বে।" সকাল হলো, বনে পাখ্ পাখালি সব ডেকে উঠলো, তিন বন্ধুর ঘুম ভাঙ্গলো।

রাজপুত্র একা জেগে আছেন দেখে এ বলতে লাগলো "আমায় কেন ভাই ডাকনি", ও বলতে লাগলো "আমায় কেন ভাই ডাকনি", "না ডেকেছি, তায় হয়েছে কি ? চল, গাছ

থেকে নেমে ওই যে পুকুর দেখা যাচ্ছে স্নান করে আসি।"

চার বন্ধুতে নাইলেন, নেয়ে উঠে ক্ষিদেয় প্রাণ যায়। তিন বন্ধুতে রাজপুত্রের মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন, "বন্ধু! ক্ষিদেয় যে প্রাণ যায়।"

রাজপুত্র হেসে তাঁর উত্তরীতে বাঁধা আমের পুঁটলি বার করে বল্লেন, "কাল চার প্রহর রাত্রে চারটি আম পেয়েছি, খুব বড় বড় আম, একটা খেলেই পেট ভরে যাবে। আমরা চার বন্ধুতে পুঁট্লি খুলে চক্ষু বুজে একটি একটি আম তুলে নেব, যেটি যার ভাগ্যে পড়ে যায়। আম খাওয়া হয়ে গেলে খোসাগুলো সব আমার কাছে দেবে।"

তখন চার বন্ধু পুঁটলি খুলে চক্ষু বুজে যে যেটি হাতের কাছে পেলেন, আম তুলে নিলেন। খোসা ছাড়িয়ে খেয়ে দেখেন, আম কি মিষ্টি যেন মধু। আটিটি এতটুকু, আম চুস্‌তে চুস্‌তে আঁটিটি শুদ্ধ কোঁৎ করে গিলে ফেল্লেন।

আম খাওয়া হলে রাজপুত্র খোসাগুলি হাতে নিয়ে দেখলেন তাঁর খোসায় মুক্তো আঁকা। মন্ত্রীপুত্রের মুকুট আঁকা, সওদাগরপুত্রের ত্রিশূল আঁকা আর কোটালপুত্রের খোসায় কিছুই আকা নাই। সেটি সেই চতুর্থ প্রহরের আম। রাজপুত্র কোটালপুত্রের মুখের দিকে চেয়ে নিশ্বাস ফেললেন।

তখন চার বন্ধুতে বনের সরু সরু পথ ধ'রে ধীরে ধীরে ঘোড়া চালাতে লাগলেন, ক্রমে এক নগরের কাছে এসে পড়লেন। রাজপুত্রের দুই রাত্রি জেগে শরীর যেন অবসন্ন হয়ে আসছিল, তিনি বল্লেন, "ভাই! আমি আর চলতে পারি না, তোমরা যদি কেউ সহরে গিয়ে কিছু খাবার জিনিস নিয়ে এস, ততক্ষণ এখানে একটু বসি।"

"খাবার জিনিস আন্‌তে কে যাবে।" মন্ত্রীপুত্র বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান, তিনি উঠে বল্লেন, "আমি যাচ্ছি, যত শীঘ্র পারি ফিরে আসব।"

কিন্তু সেই যে গেলেন আর ফিরলেন না। সে দেশের রাজা অপুত্রক মরে গিয়েছেন; রাজার পাটহস্তী ক্ষেপে বেড়াচ্ছিল, মন্ত্রীপুত্রকে দেখে, ঘোড়ার পিঠ থেকে শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে পিঠের হাওদায় বসালে। প্রজারা নূতন বাজা পেয়ে মনের আনন্দে তাঁকে ঘটাপটা করে রাজসিংহাসনে বসালে, মন্ত্রীপুত্র রাজা হয়ে বন্ধুদের কথা একেবারে ভুলে গেলেন।

এই আসে এই আসে করে, তিন বন্ধু অনেকক্ষণ পথ চেয়ে থাকলেন, শেষে যখন মন্ত্রীপুত্রের ঘোড়া খালি পিঠে ফিরে এলো তখন তিন বন্ধুরই ভারি ভাবনা হল। সওদাগরপুত্র বল্লেন, "আমি গিয়ে দেখে আসি কি হয়েছে।" কিন্তু রাজপুত্র সওদাগরপুত্রকে আবার একা পাঠাতে রাজি হলেন না, ঠিক হল তিন বন্ধুতে একত্র যাবেন। তিন বন্ধু ঘোড়া ছুটিয়ে চল্লেন, রাজপুত্র সকলের আগে, কোটালের পুত্র মাঝে, সওদাগরপুত্র সকলের পিছনে।

পথে যেতে যেতে সওদাগরপুত্র বল্লেন, "ভাই! আমার ঘোড়াটা একটু ধর, আমি একবার পুকুর পাড় থেকে আসি।"

কোটালপুত্র ঘোড়া ধরলেন, কিন্তু সওদাগরপুত্রও সেই যে গেলেন আর ফিরলেন না। এক দেশের বাদশা ম'রে গিয়েছেন, তাঁর পাটহস্তী ক্ষেপে দেশে দেশে ঘুরছিল, সওদাগরপুত্রকে দেখে, শুঁড়ে করে পিঠে তুলে নিয়ে যে দেশের হাতী সে দেশে চলে গেল।

কোটালের পুত্র এক হাতে নিজের ঘোড়ার লাগাম, এক হাতে সওদাগরপুত্রের ঘোড়ার লাগাম ধরে পথে দাঁড়িয়ে ভাবছেন, "বন্ধু এই আসে, এই আসে"—কিন্তু বন্ধু আর আসে না। এ দিকে সন্ধ্যা হয়ে এল। সেই দেশের রাজার ঘোড়াশালা থেকে ঘোড়া চুরি গিয়েছিল, সেই দেশের কোটাল চৌদ্দজন পাইক নিয়ে ঘোড়া খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঘোড়া চোর ধরতে না

পারলে, কোটালের মাথা যাবে। কোটাল দেখলে সামনে এক বিদেশী লোক, হীরা মুক্তার সাজ দেওয়া, এক ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছে, আর এক ঘোড়ার লাগাম ধরেছে। আর যায় কোথা! কোটালের হুকুমে অমনি কোটালপুত্রের হাতে দড়ি পড়লো।

এ দিকে রাজপুত্র আপনার মনে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন, অনেক দূর গিয়ে একবার পিছন ফিরে দেখলেন কেউ কোথাও নাই। ভাবলেন বুঝি দূরে পড়ে গিয়েছে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে থেকে অন্ধকার হয়ে গেল, কোথায় বা সওদাগরপুত্র আর কোথায় বা কোটালপুত্র।

তিন দিন ধরে রাজপুত্র বন্ধুদের সন্ধান করলেন কিন্তু কোনও কিনারা করতে পারলেন না। তখন মনের দুঃখে সে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন।

৩

রাজপুত্র ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন। বন্ধুদের কথা যতই মনে পড়ে ততই চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ে। আর জলের ফোঁটাগুলি জমে মুক্তো হয়ে যায়। রাজপুত্র দেখে অবাক হয়ে গেলেন। অমনি তাঁর সেই আমের কথা মনে পড়লো। পরীক্ষার জন্য 'হা হা' করে খানিকটা হাসলেন, অমনি মুখের ভিতর থেকে মাণিক পড়তে লাগলো।

রাজপুত্রের ঐশ্বর্য কড়ি কে খায়, কে পরে। এক দেশে গিয়ে মস্ত রাজপুরী গড়লেন, দাস দাসী পাত্র মিত্র কত জন এলো, রাজপুরী রম্ রম্ গম্ গম্ করতে লাগলো। এমনি ক'রে দিন যায়, বছর যায়। একদিন রাজপুত্র নদীতে স্নান কর্তে গিয়েছেন, এমন সময় একটি অভ্রের কৌটা তাঁর গায়ে এসে লাগলো। তার ভিতর একটি জবা ফুলে জড়ানো এক গাছি কাল কুচ্‌কুচে চুল। রাজপুত্র চুল নিয়ে মেপে দেখলেন, চুলগাছটি চোদ্দ হাত। রাজপুত্র তো পাগলের মতন হলেন, কারুর সঙ্গে আর আমোদ করেন না, কথা বলেন না। "চৌদ্দ হাত চুল যার, কোথায় সে কেশবতী কন্যা?" ভেবে ভেবে রাজপুত্র দিনে দিনে কালি হয়ে গেলেন।

এইরূপে রাজপুত্র যাকে পান তা'কেই 'কেশবতী রাজকন্যা'র কথা জিজ্ঞাসা করেন, কেহ কিছু বলিতে পারে না। সেই নগরে তাঁর দুই সাঙ্গাৎ জুটেছিল একদিন রাজপুত্র তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা আমায় বলে দিতে পার কোথায় গেলে চৌদ্দ হাত লম্বা যার চুল সেই কেশবতী কন্যাকে পাওয়া যায়?"

তাহারা বল্লে, "সে অনেক দূর,—

নিগমপুরী তেরো নদীর পার,
কেশবতী কন্যা রাণী তার।"

তাই তো! কেমন করে সে দেশে যাওয়া যায়? অনেক ভেবে চিন্তে, দেশে যত ছুতার ছিল সব্বাইকে নৌকা গড়ার জন্য ডাক দিলেন। এ ওর মুখের দিকে চায়, ও ওর মুখের দিকে চায়, শেষে এক যে ছিল বুড়ো ছুতোর সে বল্লে, "আমি নৌকা গড়ে দেব।"

"হেমত কাঠের নৌকা মন পবনে বায়
যে ঘাটে কেশবতী কন্যা সেই ঘাটেতে যায়"—

"এই মন্ত্র পড়ে নৌকা ছেড়ে দেবেন, কেশবতী কন্যার ঘাটে গিয়ে তাহলে নৌকা লাগিবে।"

নৌকা গড়ে এল, রাজপুত্র নৌকায় উঠ্‌লেন। রাজপুত্রের দুইজন সাঙ্গাৎ, একজন ধরলে ব'ঠে আর একজন ধরলে হাল। নৌকায় উঠে রাজপুত্র মন্ত্র পড়লেন—

"হেমত কাঠের নৌকা মন পবনে বায়
যে ঘাটে কেশবতী কন্যা সেই ঘাটেতে যায়।"

নৌকা সন্‌সন্ ক'রে ছুটলো, চোখের নিমিষে তেরো নদী পার হয়ে কেশবতী কন্যার ঘাটে গিয়ে লাগল।

ঘাটে উঠে রাজপুত্র জয়ডঙ্কা বাজালেন, ডঙ্কা শুনে রাজবাড়ী থেকে একশো দাসী ছুটে এলো। নৌকার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে—

"ডঙ্কা শুনে শঙ্কা হয়
কোথা থেকে এলে মহাশয়?"

রাজপুত্র বল্লেন, "আমি বিদেশী অতিথি, কেশবতী কন্যার সহিত সাক্ষাৎ চাই।"

দাসী বল্লে, "রাজপুত্র সে বড় কঠিন। কত রাজপুত্র গারদঘরে গিয়েছে, তুমি কি পারবে? ওই যে দেখছ কাদাবন, ওই কাদা পার হয়ে যেতে হবে, কাদায় কোমর পর্যন্ত ডুবে যাবে, কিন্তু পা ধুতে এক ছটাকের বেশি জল পাবে না। কেশবতী রাণীর সিংদরজায় শ্বেত পাথরে যদি একটু কাদার দাগ লাগে, তখনি তোমায় গারদে দেবে।"

"আচ্ছা, আর কি?"

"সিংদরজা যদি পার হতে পার, খানিক দূরে কুল কাঠের আগুন জ্বলছে, তার উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। যদি গায়ে একটি ফোস্‌কা পড়ে তখনি গারদে দেবে।"

"আচ্ছা, আর কি?"

"তারপর, রাণীর জোড়া পুকুর আছে—একটা ফটিকের পুকুর, আর একটা সত্যিকার পুকুর। সত্যিকারের পুকুর বলে যদি ফটিকের পুকুরে নাইতে নাম, তোমায় গারদে নিয়ে যাবে।"

"আচ্ছা, আর কি?"

"কেশবতী রাণী আর তাঁর ছয় সখী সাতপুরু পর্দার মধ্য দিয়ে আঙ্গুল বাড়িয়ে দেবেন,—রাণীর আঙ্গুলটি যদি ধরতে পার তবেই তাঁর দেখা পাবে।"

রাজপুত্র ভাবতে লাগলেন। বারো বচ্ছর পরে তাঁর বন্ধুদের কথা মনে পড়ে গেল।

রাজপুত্রের দুই সাঙ্গাৎ বল্লে, "সাঙ্গাৎ! আথালি পাথালি করে গায়ে তেল মাখ তেল লেগে গা হতে কাদা সরে পড়ে যাবে। আর আগুন পার হবার জন্য এক কলসী কাদা হাতে করে নিয়ে যাও।" রাজপুত্র তখন আথালি পাথালি করে তেল মেখে, কাদা ভরা কলসী হাতে নিয়ে কাদাবন পার হয়ে গেলেন, পায়ে একটুও কাদা লাগলো না, সিংদরজা পার হয়ে অগ্নিকুণ্ডের কাছে এলেন। তখন রাজপুত্র, ন্যাকড়া কাদার কলসীতে চুবিয়ে পায়ের তলা থেকে বুক পর্যন্ত জড়ালেন। জড়িয়ে আর তার উপর কাদার লেপ দিলেন। দিয়ে অগ্নিকুণ্ড পার হয়ে গেলেন। একটুও গা কি পা পুড়লো না। দাসীরা দেখে বলে, "ধন্য রাজপুত্র!" তখন পুকুরের কাছে এলেন। দাসীরা বল্লে "রাজপুত্র! গায়ে কাদা হয়েছে, পুকুরে নেমে স্নান কর।" দুটি পুকুর পাশাপাশি, দুই পুকুরে দুটি ঘাট। দুটিই একরকম। ঠিক যেন দুই পুকুরেই জল টল্‌টল্ করছে, কোন্‌টায় নাইতে নামবেন? রাজপুত্র ছোট ছোট দুইটি পাট্‌কেল কুড়িয়ে এনেছিলেন, একটা পুকুরে একটা ছুঁড়ে দিলেন, ঠং করে বেজে উঠলো

রাজপুত্র তখন আর একটিতে ছুঁড়লেন, টুপ করে শব্দ হলো। রাজপুত্র জল জেনে সেই পুকুরে নামলেন।

রাজপুত্রের স্নান হলো, দাসীরা নূতন কাপড় এনে জোগালে। রাজপুত্র কাপড় ছেড়ে, দাসীদের সঙ্গে কেশবতী রাণীর দরবারে চললেন।

দরবারে সাতটি দরজা, সাতটি দরজায় সাতপুরু করে পর্দা। কেশবতী আর তাঁর ছয় সখী এক এক পর্দার ফাঁক দিয়ে এক একটি চাঁপার কলির মতন আঙ্গুল বার করে দিলেন, আঙ্গুলে হীরার আংটী ঝকমক্ করছে। রাজপুত্র ঠাউরে ঠাউরে দেখতে লাগলেন, যে আঙ্গুলটির পাশে ভোমরা ঘুরছে, সেইটি কেশবতী বলে চেপে ধরলেন, পর্দার ভিতর থেকে কেশবতী আর তার ছয় সখী বেরিয়ে এলেন। কেশবতী কন্যা যখন এসে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর রূপে চারিদিক আলো হয়ে গেল। তাঁর ফুলের মত কোমল অঙ্গ, জোচ্ছনার মত রং, মেঘের মত কালো চুল মাটিতে লুটিয়ে যাচ্ছে। হাত দুখানি যেন পদ্মফুলের দল গায়ে পদ্মগন্ধ। কেশবতী কন্যা মধুর হাসি হেসে রাজপুত্রের গলায় মালা দিলেন, ছয় সখী উলু দিলেন। একশো দাসী শাঁখ বাজালে। তখন কন্যা বল্লেন, "রাজকুমার ! তুমি আমার স্বামী, এ রাজ্যে তুমি রাজা হলে।"

রাজপুত্র বল্লেন "তবে তোমার গারদ ঘরে যত রাজপুত্র ধ'রে রেখেছ সকলকে আগে খালাস করে দাও।"

তারপর রাজপুত্র নিজে গারদের দুয়ারে গিয়ে দাঁড়ালেন। জনে জনে মধুর কথা বলে খালাস দিতে লাগলেন। একি ! একি ! কেশবতীর গারদে মন্ত্রীপুত্র যে ! দেখে রাজপুত্র আনন্দে মূর্চ্ছা গেলেন। জ্ঞান হলে দুই বন্ধু কোলাকুলি করলেন, চোখের জলে দুজনার অঙ্গ ভেসে গেল।

ঘটা পটা করে রাজপুত্রের বিয়ে হ'লো। রাজপুত্র কেশবতী কন্যাকে বল্লেন, "রাজকন্যে, এক যুগ বারোবছর আমরা দেশ ছাড়া, না জানি মা বাপের প্রাণ আছে না আছে,—চল তোমায় নিয়ে একবার দেশে যাই।"

তখন "সাজ, সাজ", রব পড়ে গেল। ছয় সখীর হাতে রাজত্ব দিয়ে কেশবতী কন্যা শ্বশুরঘরে চল্লেন। রাজপুত্র দুঃখের দিনের দুই সাঙ্গাৎকে সঙ্গে নিলেন। "শ্বেত কাঠের নৌকা, মন পবনের বায়," পাখীর মত উড়ে চললো।

প্রথমে মন্ত্রীপুত্রের রাজ্যে এলেন। অনেক দিনের পর রাজা ফিরে এলেন। দেশে বাজনাবাদ্যির রোল উঠলো। দুয়ারে দুয়ারে, আমের পাতা, মঙ্গল কলস। মন্ত্রীপুত্র বন্ধুর দেখা পেয়েছেন, ভাণ্ডারের ধন বিলিয়ে দিলেন, কয়েদী খালাস করে দেবার হুকুম দিলেন। রাজপুত্র গারদের দুয়ারে দাঁড়িয়ে জনে জনে নূতন নূতন কাপড় দিয়ে, পথের কড়ি দিয়ে খালাস দিচ্ছেন। একি ! গারদঘরে বন্ধু কোটালপুত্র যে ! এতখানি দাড়ি এতখানি গোঁফ, গায়ে মাস নাই, পরণের কাপড়ে চিম্‌টি দিলে মাটি উঠছে, প্রাণটি কেবল ধুক্‌ধুক্ করছে। দুই বন্ধুতে কোলাকুলি করলেন। চোখের জলে অঙ্গ ভিজলো, এক যুগ বারোবছর পরে আবার তিন বন্ধু এক হলেন।

এখন তিন বন্ধু দেশে ফিরবেন। রাজপুত্র বল্লেন, "না ; চারজন এসেছি, চারজন একত্র ফিরবো, নইলে কেউ ফিরবো না।"

এইরূপ থাকেন। 'মন্ত্রিপুত্র রাজার' দেশে তিন বন্ধু একত্র থাকলেন। মন্ত্রীপুত্রের রাণী আর কেশবতী কন্যা দুজনে সই পাতালেন, তারপর দুই বন্ধু সুন্দরী কন্যা দেখে কোটালপুত্রের বিয়ে দিলেন। হেনকালে ঘটা পটা করে এক দেশের বাদশা সেপাই শান্ত্রী

নিয়ে এসে জয়ডঙ্কায় ঘা দিলেন। "সাজ, সাজ" রব উঠলো। সৈন্য সামন্ত নিয়ে তিন বন্ধু যুদ্ধ করতে বেরুলেন।

যুদ্ধে জিতে বাদশাকে ধরে নিয়ে এলেন। বাড়ী এসে দেখেন, বাদশা সেই সওদাগরপুত্র। তখন চারবন্ধু আহ্লাদে আটখানা হলেন। মনেব আনন্দে চারিজনে দেশযাত্রা করলেন। রাজপুত্র তাঁর দুই সাঙ্গাৎকে সঙ্গে নিলেন। আগে আগে ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত্রেরা চলেছেন, পিছনে দোলায় চড়ে রাণীরা চলেছেন। সঙ্গে হাতী, ঘোড়া লোক লস্কর অগুন্তি।

বার বছর ছেলেরা দেশ ছাড়া, কেঁদে কেঁদে, রাজা রাণীর, মন্ত্রী মন্ত্রীণীর, কোটাল কোটালণীর, সওদাগব সওদাগরণীর চোখ অন্ধ হ'য়েছে, এতদিন পরে হাবাধন আসছে শুনে আগুবাড়িয়ে নিলেন। বরণ করে যে যার বউ ঘরে তুল্লেন। ভাঁড়ার খুলে ধন বিলুলেন। বার বছর পরে প্রাণ শীতল হলো, সকলের মনের দুঃখ ঘুচ্‌লো।

কুঞ্জবালা দাসী

শক্তিকুমার

১

এক যে রাজা—রাজার মস্ত রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য ; উজির নাজির , লোকলস্কর ; হাতী ঘোড়া, সিপাই পাহারা। রাজার কিছুর অভাব নাই। কিন্তু এত ঐশ্বর্যেও রাজার মনে সুখ ছিল না। রাজার সন্তান হইল না। এত বড় রাজ্য কে ভোগ করিবে ?

রাজা সর্বদা দান ধ্যান করেন, পূজা পার্বণ করেন। এইভাবে কতদিন যায়। কতদিন যায়—দেবতা সন্তুষ্ট হইলেন। রাণীর সন্তান হইবে। রাজার আর আনন্দ ধরে না। দশ মাস দশ দিন যায়, রাণীর সোনার চাঁদ ছেলে হইল। রাজ্যশুদ্ধ লোক রাজপুত্রকে দেখিবার জন্য রাজপুরীতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। রাজা রাজভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন। কাঙ্গাল গরীব, অন্ধ আতুর আঁচল পুরিয়া ধন পাইল, পেট ভরিয়া খাইতে পাইল।

দিনে দিনে রাজপুত্র ফুলের মত ফোটে, চাঁদের মত বাড়ে, রূপে ঘর আলো করে। রাজা পুত্রের নাম রাখিলেন—"শক্তিকুমার।" রাজা রাজপুত্রকে ঘরের বাহির করেন না—কি জানি সূর্যের কিরণে রাজপুত্রের সোনার বরণ কালী হইয়া যায়! মানুষের দৃষ্টি রাজপুত্রের অনিষ্ট করে।

দিন যায় ক্ষণ যায় ক্রমে রাজপুত্র বড় হইয়া উঠিলেন। রাজপুত্র ঘরের মধ্যে বসিয়াই লিখেন পড়েন। রাজপুত্র এ বিদ্যা শিখেন, সে বিদ্যা শিখেন, রাজপুত্র সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেন।

২

একদিন রাজপুত্র বলিলেন, "জন্মিয়া অবধি পৃথিবীর মুখ দেখিলাম না। আমার এ ছাড়া জীবনে কাজ কি ? আমি রাজত্ব দেখবো। রাজার কাছে খবর গেল,—রাজপুত্র রাজ রাজত্ব দেখিতে চান। রাজা বলিলেন, "আচ্ছা।" ঘোড়ায় চড়িয়া রাজপুত্র রাজ্যের মধ্যে বেড়াইয়া

আসিলেন। রাজপুত্র বড়ই খুসী হইলেন।

কতদিন যায়। রাজা, রাজ করেন, রাজত্ব করেন, আছেন মহা সুখে। একদিন রাজপুত্র বলিলেন,—"বাবা আমি মৃগয়ায় যাইব।"

রাজার মুখ ভার হইল। রাণী আহার নিদ্রা ছাড়িলেন। রাজা কত বুঝাইলেন, রাজ্যশুদ্ধ লোকে কত মতে বুঝাইল, কুমারের মন ফিরিল না। শক্তিকুমার বলিলেন,—"রাজপুত্র হইয়া যদি মৃগয়ায় না গেলাম, তবে আর এ জীবন রাখিব না।" রাজপুত্র আহার নিদ্রা ছাড়িলেন।

রাজা আর কি করেন, অবশেষে অনুমতি দিলেন। সাজ সাজ পড়িয়া গেল। হাতীশালে হাতী ঘোড়াশালে ঘোড়া সাজিতে লাগিল। সিপাইরা তীরধনুক অস্ত্রশস্ত্র সাফ করিতে লাগিল। দশ হাজার লোক লস্কর লইয়া রাজপুত্র মৃগয়ায় চলিয়াছেন। রাজ্যশুদ্ধ লোক দেখিতে আসিয়াছে। অস্ত্রের ঝনঝনি, তীরধনুকের টনটনি, লোকজনের গোলমালে আটঘাট বন্ধ।

যাইতে যাইতে এক মস্ত জঙ্গলের ধারে আসিয়া সন্ধ্যা হইল। সেখানে এক বটবৃক্ষতলে লোকলস্করের মধ্যখানে রাজপুত্র সোনার পালঙ্কে বিশ্রাম করিলেন। রাজপুত্র হুকুম দিলেন,—"আমার নিদ্রা না ভাঙ্গিলে যে আমাকে জাগাইবে, তাহার গর্দান যাইবে।"

৩

সেই নিঝুম নিশুত রাত্রে, বাতাসপরী আর ঘুমপরী দুই ভগ্নী আকাশ পথ আলো করিয়া ইন্দ্রের পুরীতে নাচ করিতে রওনা হইয়াছে।

ঘুমপরী বাতাসপরীকে বলিল, "দেখ্, দিদি দেখ্! তিন পৃথিবীর ধনসৌন্দর্য নিয়া কোন দেবতা ভূতলে নামিয়াছে।"

বাতাসপরী বলিল,—"এ যে গঙ্গাধর রাজার পুত্র, 'শক্তিকুমার'।"

ঘুম পরী বলে,—"মানুষে এত রূপ দিদি! এ রাজপুত্রকে আমি না দেখিয়া যাইতে পারিব না।" ঘুম পরী নীচের দিকে নামিতে লাগিল।

বাতাসপরী আর কি করিবে? পিছে পিছে সেও নামিল। দুইজনে শক্তিকুমারের পালঙ্কের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

ঘুমপরী বলিল,—"এমন রূপ তো আর জন্মিয়া দেখি নাই দিদি! আচ্ছা! এর জুড়ি কি বিধি গড়েন নাই?"

বাতাসপরী কহিল,—"তা বি হয় রে বহিন। বিধাতার সৃষ্টি কি মিছা হইতে পারে। বিশ্বাম্বর রাজার কন্যা—তার নাম 'মণিমালা', তার রূপে জগৎ আলো। শত চাঁদের রূপ নিছনি বিধি তার রূপ গড়েছেন।"

ঘুমপরী বলিল,—"তবে দিদি! দুইজনকে আমরা মিলাইয়া দেখিব।" ঘুমপরী পালঙ্ক ধরিল।

বাতাসপরী আর কি করে? দুইজনে পালঙ্ক ধরিয়া শূন্যে উড়িল।

দেখিতে দেখিতে কত বন জঙ্গল, পাহাড় পর্বত, নদনদী পার হইয়া বাহাত্তর-বৎসরের-পারি-সমুদ্রের পরপারে মণিমালার সোনার মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মন্দির কি মন্দির! তার আট দুয়ারে আট পাহাড়া, রূপার কপাট সোনার জড়া, সোনার বাতি ঘিয়ে জ্বলে, মণিমালা সোণার পালঙ্কে আছেন শুয়ে। মণিমালা ঘুমে বিভোর।

পরীরা দুই ভগ্নী করিল কি—শক্তিকুমারকে ঘুমন্ত অবস্থায় মণিমালার ডাহিনে শোয়াইল।

ঘুমপরী বলিল,—"দিদি ! আজ আমার জনম সফল, নয়ন সার্থক।" দুইজনে অপলকে চাহিয়া রহিল। তারপরে মণিমালা ও শক্তিকুমারকে একত্র রাখিয়া দুই বোনে ইন্দ্রের সভায় চলিয়া গেল।

৪

দুইজনে অঘোরে ঘুমাইতেছে। কেহই কিছু জানে না। হঠাৎ শক্তিকুমারের একখানি হাত মণিমালার গায়ে পড়িল। মণিমালা চমকিয়া উঠিয়া দেখেন—যেন শত সূর্য উঠিয়াছে। মণিমালা দেখেন দেখেন আবার দেখেন—এ যে মানুষ ! মণিমালা ভাবেন,—"এত প্রহরী পাহারা ঠেলিয়া আমার ঘরে কে আসিল ?" শিয়রে ছিল একখানা তরোয়াল। মণিমালা করিলেন কি সেই তরোয়ালখানা শক্তিকুমারের বুকের উপর ধরিলেন।

তরোয়াল বুকের উপর রাখিতে না রাখিতে শক্তিকুমার জাগিয়া উঠিলেন। কুমার দেখেন—জ্যোৎস্না উঠেছে। সেই জ্যোৎস্নার গায় চাঁদ বসে রয়েছে। চাহিয়া চাহিযা কুমার আর নয়ন ফিরাইতে পারিলেন না। ভাবিলেন—এ আমি কোথায় আসিলাম ?

আস্তে আস্তে মণিমালা তরোয়ালখানা সরাইয়া নিলেন। মণিমালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে ? তুমি দেবতা, না মানব ?"

শক্তিকুমার বলিলেন,—

(গীত)

"আমার নিছনি নগরে ঘর,
নামে রাজা গঙ্গাধর,
আমি তাঁর পুত্র শক্তিকুমাব বটে হে।"

তখন শক্তিকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কন্যা, তোমার নাম কি ?"

মণিমালা বলিলেন,—

(গীত)

"আমার উজানি নগরে ঘর,
নামে রাজা বিশ্বাম্বর,
আমি তাঁর কন্যা মণিমালা বটে হে।"

মণিমালা বলিলেন,—"রাজপুত্র ! যখন বিধি তোমাকে মিলাইয়া দিয়াছেন, তখন তুমিই আমার স্বামী। এই নাও আমার অঙ্গুরী, এই নাও আমার মালা।" দুইজনের মালা বদল হইয়া গেল। মনের আনন্দে দুইজনে পাশা খেলিতে বসিলেন। পাশা খেলা হইয়া গেল। তারপর দুইজনে ঘুমাইয়া পড়িলেন। রাত্রি ভোর ভোর। আবার মণিমালার কক্ষে দুই পরী আসিয়া উপস্থিত। দেখে, দুইজনে অঘোরে ঘুমাইতেছে। পরীবা হাওয়ায় চলে, বাতাসে বেড়ায়, আস্তে আস্তে শক্তিকুমারকে তুলিয়া চক্ষের নিমিষে, শূন্যের উপর দিয়া, তাহার লোকজনের মধ্যখানে রাখিয়া চলিয়া গেল। মণিমালা রহিল উজানি নগরে, আর শক্তিকুমার আসিলেন তাহার লোকজনের মধ্যে।

৫

রাত্রি পোহাইয়া গেল। শক্তিকুমারের লোকজন সকলে একে একে জাগিল। কুমার উঠেন না। মৃগয়ার সময় বহিয়া যায়। রাজপুত্র নিষেধ করিয়াছেন, তাঁহাকে জাগাইতে কাহারও সাহস হয় না। কি করে? সকলে একত্রে গোলমাল করিয়া উঠিল। এই শব্দে কুমাব জাগিলেন। জাগিয়াই তো কুমারের চক্ষু স্থিব! কুমার ভাবেন,—কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিয়াছি! কোথায় মণিমালা আর কোথায় আমি!

কুমার কাঁদিয়া উঠিলেন,—

(গীত)

"আমি কি দেখিলাম কি হইল,
দিয়া বিধি হ্লে নিল, ওরে লোকজন!
আমার সদা উঠে মণিমালা মনেতে।

"আমি তার হাতের খাইয়াছি পান,
হানিছে দারুণ বাণ, ওরে লোকজন!
আমার সদা উঠে মণিমালা মনেতে।

"আমার রত্নহাবের মালা নি'ছে
তার চন্দ্রহারের মালা দি'ছে, ওরে লোকজন।
আমার সদা উঠে মণিমালা মনেতে।"

লোকজনেরা দেখে,—সর্বনাশ! কুমার তো পাগল হইয়াছেন। এখন উপায় কি? তাহারা ঠিক করিল—কুমারকে বাড়ী নিয়া যাইবে। কুমার ইহা বুঝিতে পারিয়া দৌড়িয়া বনের মধ্যে পলায়ন করিলেন।

লোকজন বন জঙ্গল উলটপালট করিয়া কত তালাস করিল, কুমারকে পাইল না। তারপব যার যার বাড়ী চলিয়া গেল। মহারাজার কাছে কিছু বলিল না।

৬

অনেক বেলা হইয়া গেল, মণিমালা উঠে না। মণিমালার সখীরা আসিয়া তাহাকে জাগাইল। মণিমালা জাগিলেন। দেখেন—কুমার নাই। মণিমালা 'শক্তিকুমার, শক্তিকুমার' করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

(গীত)

আমি কি দেখিলাম কি হইল,
দিয়া বিধি হ'রে নিল, ওগো সখী!
আমার সদা উঠে শক্তিকুমার মনেতে।

"আমার হস্তের শঙ্খ মলিন হইল,
শক্তিকুমার কোথায় রইল, ওগো সখী!
আমার সদা উঠে শক্তিকুমার মনেতে।

“আমার চন্দ্রহারের মালা নি’ছে,
তার রত্নহারের মালা দি’ছে, ওগো সখী!
আমার সদা উঠে শক্তিকুমার মনেতে।”

কুমার কুমার করিয়া মণিমালা মূৰ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সখীরা হায় হায় করিয়া রাণীর কাছে খবর পাঠাইল। রাণী আসিলেন, আসিয়া মণিমালাকে কোলে করিয়া বসিলেন। মণিমালা আঁখি মেলিলেন। মাকে দেখিয়া পুনরায় কাঁদিয়া উঠিলেন।

(গীত)

“আমি কি দেখিলাম কি হইল,
দিয়া বিধি হ’রে নিল, মাগো!
আমার সদা উঠে শক্তিকুমার মনেতে।

“আমার চন্দ্রহারের মালা নি’ছে,
তার রত্নহারের মালা দি’ছে, মাগো!
আমার সদা উঠে শক্তিকুমার মনেতে।”

মায়ে ঝিয়ের চক্ষের জলে জগৎ সংসার ভাসিয়া গেল। মা কত বুঝাইলেন, কন্যা আর কিছুতেই থামে না। মণিমালার সে রূপ নাই, সে লাবণ্য নাই, কেবল দিবানিশি কাঁদিতেছেন।

৭

শক্তিকুমার ভীষণ বনে প্রবেশ করিয়াছেন। পথ নাই, ঘাট নাই, দিনেও চক্ষে দেখা যায় না। শক্তিকুমার কেবল অবিশ্রান্ত দৌড়াইতেছেন। এই ভাবে দৌড়াইতে দৌড়াইতে বাহাত্তর-বৎসরের-পাড়ি সমুদ্রের পারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রকাণ্ড সমুদ্র—কুল নাই, কিনারা নাই। ঢেউর উপর ঢেউ, তার উপর ঢেউ। তার গর্জনের চোটে কানে তালি লাগে। শক্তিকুমার এই সমুদ্রের পার দিয়া চলিয়াছেন, লোক নাই, জন নাই। শক্তিকুমার হাঁটেন আর কাঁদেন।

(গীত)

“আমি কি ক্ষণে বাড়াইলাম পাও,
খেয়াঘাটে নাহি নাও, ওরে বিধি!
বুঝি পাটনিরে খাইল বনের বাঘে।”

শক্তিকুমার ছোটেন ছোটেন, হঠাৎ দেখেন যে খুব বড় একখান জাহাজ পাল দিয়া তর্‌তর্ করিয়া তাহার দিকে আসিতেছে। এক সদাগর বাণিজ্য করিয়া বাড়ী ফিরিতেছেন। ধনে রত্নে, জিনিসপত্রে, জাহাজ বোঝাই। শক্তিকুমার জাহাজ দেখিয়াই তাহাকে তুলিয়া নিবার জন্য ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন।

জাহাজ কিনারে লাগিতে না লাগিতে শক্তিকুমার এক লাফ দিয়া জাহাজে উঠিলেন। কুমার জাহাজে উঠিয়াই একবার যান জাহাজের এ ধারে, পুনরায় যান জাহাজের ও ধারে। মাঝিরা বলিল,—“কুমার স্থির হও।” শক্তিকুমার বলিলেন,—

(গীত)

“আমি স্থির হইতে নাহি পারি,

না দেখে সেই সুন্দরী, ও ভাই মাঝি।
আমার সদা উঠে মণিমালা মনেতে।”

মাঝি বলিল,—“কুমার আমি সেই দেশ জানি। এই বাহাত্তর-বৎসরের-পাড়ি সমুদ্রের পরপারে মণিমালার দেশ। এই জাহাজের মাস্তুলের ঠিক উপরে উঠিতে পারিলে মণিমালার মন্দিরের চূড়া দেখা যায়।” প্রকাণ্ড মাস্তুল তাহার অগ্রভাগ মেঘের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে।

শক্তিকুমার তখন মাস্তুলের উপর উঠিতে আরম্ভ করিলেন। যেই কুমার মাস্তুলের আগায় উঠিয়া এদিক ওদিক দৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, অমনি মাস্তুল ভাঙ্গিয়া সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া ডুবিয়া গেলেন।

শক্তিকুমার সতীমায়ের সন্তান, সমুদ্রের তলেই গিয়াই জোড় আসন করিয়া গঙ্গা স্তব আরম্ভ করিলেন।

(গীত)

“আমি অকারণে প্রাণে মবি,
না দেখে সেই সুন্দরী, ওমা গঙ্গে!
তুমি লও এসে আমারে কোলেতে।”

ভক্তের কাতব রোদন মায়ের কানে পৌঁছিল। কুমার যেন শুনিলেন,—“বাছা তোমার ভয় নাই. তুমি তোমার মণিমালাকে পাইবে।”

কুমার অমনি ভাসিয়া উঠিলেন। ভাসিতে ভাসিতে কুমার সমুদ্রের কিনারে আসিলেন। কুমারের মাটিতে পা লাগিল।

হাঁটিতে হাঁটিতে কুমার শেষ বেলায় লোকালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে ইহা উজানি নগর,—বিশ্বাম্বর রাজার দেশ। একটি সরোবরের তীরে বকুলতলায় বিশ্রাম করিলেন। ঐ সরোবরে গ্রামের স্ত্রীলোকেরা জল ভরিতে আসে। আজ তাহারা দেখে—যেন আকাশের চাঁদ ভূষণে পড়িয়া আছে। ঐ গ্রামের যে মালিনী সেও সকলের শেষে জল ভরিতে আসিল। মালিনী কুমারের দিকে চাহিতেই নয়ন আর ফিরাইতে পারিল না। সে শক্তিকুমারকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া অতি যত্ন করিয়া তাহাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া গেল।

৮

কুমার মালিনীর বাড়ীতে আছেন। কিছুদিন এই ভাবে যায়। কুমারের একমাত্র চিন্তা কিরূপে মণিমালার সঙ্গে দেখা হইবে। ঐ যে মালিনী, সে প্রত্যহ রাজবাড়ীতে ফুল জোগায়। সেই সঙ্গে কালীমায়ের জন্য, রাজার জন্য এবং মণিমালার জন্য তিন ছড়া মালাও দিতে হয়।

একদিন শক্তিকুমার বলিলেন,—“মাসীমা! কাল প্রাতে রাজবাড়ী যে মালা দিবে আমি তাহা গাঁথিয়া দিব।”

মালিনী বলিল,—“ইহা তো আহ্লাদের কথা।”

শক্তিকুমার তিন ছড়া মালা গাঁথিলেন। মণিমালার জন্য যে মালাছড়া গাঁথিয়াছেন তাহাতে তাহার নাম লিখিয়া দিলেন। তারপর কোন মালাগাছটি কাহাকে দিতে হইবে তাহা বলিয়া দিলেন।

পরদিন প্রাতে মালিনী ফুল এবং মালা লইয়া রাজবাড়ী গেল। কালীর মালা কালীর

মন্দিরে রাখিয়া, রাজার মালা রাজাকে দিয়া, মালিনী মণিমালার মালা লইয়া তাহার মন্দিরে গেল।

মণিমালা দেখিলেন অদ্যকার মালাছড়া অতি সুন্দর। মালাছড়া নাড়েন চাড়েন—দেখিলেন তাহাতে শক্তিকুমারের নাম লেখা। শক্তিকুমারের নাম দেখিয়াই মণিমালা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। দাসীরা চীৎকার করিয়া উঠিল। কেহ মণিমালাকে বাতাস করিতে লাগিল, কেহ নাকে মুখে জলের ছিটা দিতে লাগিল। মালিনীর তো চক্ষু স্থির ! এক পা দুই পা করিয়া আজও দৌড় কালও দৌড়। খবর পাইয়া মহারাণী দৌড়িয়া আসিলেন। অনেক শুশ্রূষার পর মণিমালার চেতন হইল।

মালিনী বাড়ী আসিল। শক্তিকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাসীমা ! সংবাদ কি ?" মালিনী বলিল,—"আর বাপু, সংবাদ। তুমি কি মালাই গাঁথিয়া দিয়াছ, মালা লইয়াই রাজকুমারী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। আমি পলাইয়া প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া আসিয়াছি।"

পরদিন মালিনী ভয়ে ভয়ে মণিমালার কক্ষে গেল। অন্য দিন মালিনীকে ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না। আজ মালিনীর আদর দেখে কে ? আজ রাজকুমারী কত কথাই জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল।

মণিমালা বলিলেন,—"মালিনী ! কাল যে মালাছড়া দিয়াছ, তাহা কে তৈয়ার করিয়া দিয়াছে ?"

মালিনী বলিল,—"আমার এক বোন্‌পো আসিয়াছে, সেই মালা ছড়া গাঁথিয়াছিল।"

রাজকুমারী বলিলেন,—"মালিনী ! তোমার বোন্‌পোকে আমাকে একবার দেখাইতে পার ?"

মালিনী,—"সে কি রাজকুমারী ? তুমি চন্দ্র সূর্যের মুখ দেখ না, কেমন করিযা তোমাকে আমার বোন্‌পোকে দেখাইব ?"

মণিমালা,—"এক প্রহর পর উদ্যানে তোমার বোন্‌পো যেন দীঘির ঘাটে আসে। আমি সেই সময় ছাদের উপর উঠিব। তবে দেখা হইবে" এই বলিয়া মালিনীকে মণিমালা গলার একছড়া হার পুরস্কার দিলেন। মালিনী শক্তিকুমারকে এই সংবাদ দিল।

শক্তিকুমার একপ্রহর বেলার পূর্বেই আসিয়া হাজির। যায়, যায়, কিছু সময় যায়। রাজকুমারী আর আসেন না। অবশেষে মণিমালা আসিলেন। শক্তিকুমার দেখেন মণিমালা, মণিমালা দেখেন শক্তিকুমার। চক্ষে চক্ষে মিলন হইয়া গেল। মণিমালা শক্তিকুমারকে একটি ফুল দেখাইলেন। তারপর আকাশের কাল মেঘের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া, একখণ্ড সূতা উড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

৯

মালিনীর বাড়ী আসিয়া শক্তিকুমাব এই সঙ্কেতের কথা মালিনীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন।

মালিনী বলিল,—"কুমার তোমাকে রাজকন্যা যাইতে বলিয়াছে। ফুল দেখাইবার অর্থ এই যে, উদ্যানের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে, মেঘের দিকে আঙ্গুল দেখাইবার অর্থ এই যে, রাত্রি অন্ধকার হইলে যাইতে হইবে। আর সূতা উড়াইয়া দিবার অর্থ এই যে দালানের উপর হইতে একছড়া দড়ি ঝুলান থাকিবে, সেই দড়ির সাহায্যে তুমি উপরে উঠিতে পারিরে।"

রাত্রি আসিল, জ্যোৎস্না অস্ত গেল। কুমার উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। কুমার মণিমালার

দালানের নিকট যাইয়া দেখেন—উপর হইতে নীচ পর্যন্ত একছড়া দড়ি ঝুলান রহিয়াছে। ঐ দড়ি অবলম্বনে কুমার মণিমালার কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

অনেক দুঃখ কষ্টের পর দুই জনের মিলন হইয়া গেল। রাজকুমারীর কি কষ্ট হইয়াছিল, এবং কুমারই বা কিরূপ কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, এই বিষয়ে অনেক কথাবার্তার পর দুইজনে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

রাত্রি পোহাইয়া গেল, মণিমালা এখনও কেন উঠে না ? বুড়ী ধাই অনেক ডাকাডাকি করিল। তারপর দুয়ার খুলিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া দেখে—রাজকুমারীর কক্ষে চোর। রাজার কাছে খবর গেল রাজা হুকুম দিলেন—"চোরকে বাঁধিয়া আনিয়া কালীর দুয়ারে বলি দাও।"

অমনি হাজার হাজার সিপাই আসিয়া শক্তিকুমারকে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া কালীর দুয়ারে লইয়া গেল।

১০

কুমার সতীর সন্তান, অমনি কালীর স্তব—আরম্ভ করিয়াছেন।

(গীত)

"আমি অকারণে প্রাণে মরি,
কোথায় গো, মা শঙ্করী!
তুমি লও এসে আমারে কোলেতে।"

"আমার অস্থি চর্ম হইল সার,
মণিমালার জন্য গেল প্রাণ, মা শঙ্করী!
ও মা তুমি এসে লও আমারে কোলেতে।"

রাজা দেখিলেন—অপূর্ব সুন্দর যুবক কেবল মণিমালা মণিমালা বলিয়া কাঁদিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে ?" শক্তিকুমার বলিলেন,—

"আমার নিছনি নগরে ঘর
নামে রাজা গঙ্গাধর, হে মহারাজ।
আমি তার পুত্র শক্তিকুমার বটে হে।"

রাজা ভাবেন—'হায়, হায়, কি সর্বনাশ করিতেছিলাম। এই তো আমার মণিমালার বর। এই শক্তিকুমারের জন্যই তো আমার মণিমালা পাগলিনী।' রাজা শক্তিকুমাবকে বলিলেন,—"কুমার! তুমি আমার মণিমালাকে বিবাহ কর।" শুভদিনে শুভলগ্নে শক্তিকুমারের সঙ্গে মণিমালার বিবাহ হইয়া গেল। রাজ্যময় উৎসবের রোল পড়িয়া গেল।

কিছুদিন যায়, কুমারের বাড়ী যাইতে ইচ্ছা হইল। মহারাজ বিশ্বাম্বর প্রকাণ্ড জাহাজ সাজসজ্জায় সাজাইয়া, মণিমুক্তায় বোঝাই দিয়া, শক্তিকুমার ও মণিমালাকে রওনা করিয়া দিলেন।

১১

এক দুই করিয়া অনেক বছর হইয়া গেল। কুমার যে মৃগয়া গিয়াছেন, আর ফিরিলেন না। রাণী যে সেই শয্যা আশ্রয় করিয়াছেন আর ওঠেন না, রাজা অন্ধপ্রায়। রাজ্য যায়

যায়।

একদিন হঠৎ বাজনা বাজিয়া উঠিল। রাজ্যের সকল লোক দৌড়িয়া আসিল। দেখে শক্তিকুমার বিবাহ করিয়া আসিয়াছেন।

রাজারাণী হারাণ রত্ন ফিরিয়া পাইয়া পুনরায় জীবন পাইলেন।

নিশিকান্ত সেনগুপ্ত

নীলপদ্ম

এক ছিলেন রাজা, রাজা একদিন অন্তঃপুরে শুয়ে রয়েছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল, শরীরে যেন কেমন অস্বোয়াস্তি বোধ হল, মনটাও কি জানি বড় খারাপ হয়ে গেল—তারপর আর কিছুতেই ঘুম এল না। তখন রাজা বাইরে সদর দোরের কাছে এসে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন। পূর্ণিমার রাত্তির, বাইরে তখন ফুটফুটে জ্যোৎস্না ফুটে রয়েছে, সেই পরিষ্কার জ্যোৎস্নার আলোয় রাজা দেখতে পেলেন কে একটি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মত সুন্দরী কন্যা সদর দরজা থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছেন। তাই দেখে আশ্চর্য হয়ে তাড়াতাড়ি সেই কন্যার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কেগা ? কোথায় যাচ্ছ !" কন্যাটি উত্তর করলে "আমি তোমার ভাগ্যলক্ষ্মী, কাল সকাল হলেই তুমি হঠাৎ অন্ধ হয়ে যাবে, আমি তাই আজ তোমার বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি।"

রাজা তাই শুনে হাত জোড় করে বল্লেন, "মা ! আপনি যদি আমায় ছেড়ে চলেই যাচ্ছেন, তবে আমি অন্ধ হয়ে আবার কি করলে আরোগ্য হ'তে পারবো, দয়া করে সেটাও বলে যান।" "একটি নীলপদ্ম এনে যদি কেউ তোমার চোখে বুলিয়ে দিতে পারে তাহলে তুমি আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে। কিন্তু পদ্মটি যদি আনতে একটুও শুকিয়ে যায়, তা হলে কোনই ফল হবে না"—এই কথা বলে ভাগ্যলক্ষ্মী অর্ন্তদ্ধান হলেন। এদিকে রাজা সেই রাত্রেই রাণী আর ছেলেদের ডেকে আনালেন। সকাল হলে তো আর কাউকে দেখতে পাবেন না, তাই ছেলেদের দেখে শুনে আশীর্বাদ করে বল্লেন "এখন আমি অন্ধ হলে তোমরা কেউ নীলপদ্ম আনতে পারবে কি না বল।"

রাজার দুই রাণী, দুয়ো, আর সুয়ো, সুয়োরানীর সাত ছেলে, আর দুয়োরানীর একটি মাত্র ছেলে ছিল। রাজা সুয়োরানী আর তার ছেলেগুলিকে খুব ভালবাসতেন, আর দুয়োরানীর ছেলেটিকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। রাজার কথায় সুয়োরানীর সাতটি ছেলেই বল্লে "আমরা নিশ্চয় নীলপদ্ম এনে আপনার চক্ষু আরোগ্য করবো।" তখন দুয়োরানীর ছেলে হীরালাল এসে হাত জোড় করে বল্লে "মহারাজ ! যদি অনুমতি দেন তবে আমিও আপনার জন্য নীলপদ্ম আনতে যাই।" মহারাজ বিরক্ত হয়ে বল্লেন "যা ! তুই নাকি আবার নীলপদ্ম আনবি।" এদিকে ভাগ্যলক্ষ্মীর কথাই ঠিক হল, রাত্রি প্রভাত হয়েছে কি অমনি রাজা একেবারে অন্ধ হয়ে গেলেন। তখন সাত রাজপুত্র লোক লস্কর নিয়ে, ধনরত্নে নৌকা বোঝাই করে নীলপদ্ম আনতে গেল। তাই দেখে হীরালাল বল্লে "মহারাজ ! আমার আর কিছুই চাই না, কেবল একটি ঘোড়া দিতে আজ্ঞা করুন, আমি সেই ঘোড়া করে নীলপদ্ম আনতে যাব।" একটা অস্থিচর্মসার আধমড়া ঘোড়া হীরালালকে দেওয়া হল। হীরালাল তখন খুব খুসী হয়ে নীলপদ্ম আনতে যাত্রা করলে।

খানিক দূর গিয়ে সুমুখে একটি সুন্দর সরোবর, আর সেই সরোবরের ধারেই একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখতে পেলে। হীরালাল বাড়ীটির মধ্যে কে আছে দেখবার জন্যে ভিতরে গেল। গিয়ে দেখে একটি ঘরে চারখানি সোনার থালায় নানান রকমের ভাল ভাল খাবার সাজান রয়েছে, হীরালালের তখন ভারি খিদে পেয়েছিল, সে একখানি থালা টেনে নিয়ে খুব পেট ভরে খাবার খেয়ে অন্য ঘরে গেল সে ঘরে এসে দেখে চারখানি সোনার রেকাবীতে পান সাজা রয়েছে। আর এক ঘরে চারখানি সুন্দর পালঙ্কে পরিষ্কার ধপ্‌ধপে নরম বিছানা পাতা রয়েছে দেখতে পেলে। অনেকটা পথ হেঁটে হীরালালের তখন বড় ঘুম পেয়েছিল, সে একটি পালঙ্কে আরাম করে শুয়ে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগলো। এখন হয়েছে কি, সেই অট্টালিকায় চারজন পরী বাস করতো, তারা রোজকার মত বাড়ী এসে খাবার খেতে গিয়ে দেখে, একভাগ খাবার নেই, এমনি করে সবই কম দেখতে পেলে। তারপর শোবার ঘরে এসে দেখলে সেখানে একজন পুরুষ ঘুমুচ্ছে। তাই দেখে পরীরা বড় আশ্চর্যি হয়ে গেল। তারা সব হীরালালকে জাগাতে গেল, কিন্তু একজন পরী বল্লে, "ঘুমন্ত প্রাণীকে জাগাতে নেই, তার চেয়ে চল আমরা আগে স্নান করে আসি, ততক্ষন লোকটি উঠুক, তারপর পরিচয় নেওয়া যাবে।"

তখন পরীরা সেই সরোবরে স্নান করতে গেল। এদিকে হীরালালের ঘুম ভাঙ্গলে পর বাইরে এসে দেখে চারজন পরী সরোবরে জলখেলা করছে। তাই দেখে হীরালালের মাথায় এক খেয়াল চাপলো, সে তখন করলে কি, পরীরা নেয়ে উঠে পরবে বলে যেসব কাপড় রেখে গিয়েছিল, সেগুলি সব ঝপ্ করে তুলে নিয়ে ভোঁ দৌড় দিলে। পরীরা তখন মহা ফাঁপরে পড়লো, তারা ভিজে কাপড়েই বা কতক্ষণ থাকবে। দায়ে পড়ে শেষে তারা হীরালালকে বল্লে, "আচ্ছা তুমি যদি আমাদের কাপড় দিয়ে যাও, তা হলে যা চাও তাই পাবে।" হীরালাল তাদের কাপড এনে দিয়ে বল্লে, "আমি আর কিছুই চাই না, কেবল এমন একটি নীলপদ্ম চাই যে, সে পদ্ম কখনও শুকোবে না।" তারপর পরীরা হীরালালকে অট্টালিকার মধ্যে আনলে, এনে তারা একখানি খুব ধারাল তলোয়ার আর এক ঘটী জল হীরালালের হাতে দিয়ে বল্লে, "দেখ এই তলোয়ার দিয়ে তুমি আমাদেব চারজনকে কেটে ফেল। তারপর আমাদের রক্ত যেখানটায় পড়বে, সেইখানে একটি নীলপদ্ম ফুটে উঠবে, সে পদ্ম কখনও শুকোবো না। তুমি পদ্মটি তুলে নিয়ে জল দিয়ে রক্ত ধুঁয়ে ফেল্লেই আমরা আবার বেঁচে উঠবো।" হীরালাল তখন সেই তলোয়ার দিয়ে চারজন পরীকেই কেটে ফেল্লে, তাদের রক্ত ভুঁয়ে পড়বামাত্রই একটি নীলপদ্ম ফুটে উঠলো। হীরালাল পদ্মটি তুলে সেই রক্তে এক ঘটী জল ঢেলে দিতেই তারা তৎক্ষণাৎ বেঁচে উঠলো। নীলপদ্ম পেয়ে হীরালাল ভারি খুসী হয়ে বল্লে, "আচ্ছা, আমি এইবার বাড়ী যাব। আমি এই নীলপদ্মটি নিয়ে গেলে তবে বাবার অসুখ সারবে।"

পরীরা তখন একটি ছোট বাঁশী এনে হীরালালকে দিয়ে বল্লে "দেখ, তুমি এই বাঁশীটি নিয়ে যাও, যদি কখনও আমাদের ডাকবার দরকার হয় তো এই বাঁশীতে তিনবার ফুঁ দিলেই আমরা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হ'ব।" এই ব'লে তাহারা হীরালালকে বিদায় দিল।

হীরালাল যেতে যেতে সেই অট্টালিকার একটা ঘরে দেখতে পেলে একটা বেড়াল একটা মস্ত কড়ায় ক'রে দুধ জাল দিচ্ছে, হাতায় করে দুধ তুলছে, কিন্তু একটুও মুখে দিচ্ছে না। হীরালাল তাই দেখে আশ্চর্যি হয়ে সেই বেড়ালের একটি ছানা, একটুখানি দুধ, আর সেই ঘরের একমুঠো মাটি নিয়ে চল্লো। খানিক দূর গিয়ে আবার দেখে সেইরকম একটি ঘরে একটা মস্ত বড় বাঘ বসে একটা হরিণকে নিয়ে নাচাচ্ছে, আদর করছে। হীরালাল সেই

বাঘের ছানা, হরিণের ছানা, আর সে ঘরের একমুঠো মাটি নিয়ে আর একটা ঘরে গেল। সেখানে দেখে না একটা বেড়াল বঁটী পেতে বসে মাছ কুটছে, হীরালাল সেই বেড়ালের ছানা, আর খানিকটা মাছ নিয়ে চল্লো।

সন্ধ্যার সময় হীরালাল একটা নদীর ধারে উপস্থিত হল, সেই নদীতে একখানি মস্ত বড় নৌকা দেখতে পেলে, সেই নৌকায় হীরালালের সাত ভাই, যারা নীলপদ্ম আনতে গিয়েছিল, তারা এতদিন মিছে সাত রাজ্যি ঘুরে এখন দেশে ফিরছিল। তারা হীরালালকে দেখেই ঠাট্টা করে বলে উঠলো "কিরে হীরু ! তোর নীলপদ্ম কই ? বড় যে বুক ফুলিয়ে নীলপদ্ম আনতে গিয়েছিলি।"

হীরালালের মনে কোন খল কপট ছিল না, সে তখন আহ্লাদে আটখানা হয়ে সেই নীলপদ্ম আর যে সব আশ্চর্যি রকম জিনিস এনেছিল ভাইয়েদেব সব দেখালে। ভাইরা তখন একেবারে বদলে গেল, যেন সে মানুষই নয়। তারা হীরালালকে কত আদর আপ্যায়িত করে নিজেদের নৌকায় নিয়ে এল। তারপর নৌকাখানি যেই মাঝ দরিয়ায় এসেছে, আর হীরালাল কথাবার্তায় একটু অন্যমনস্ক হয়েছে, অমনি তারা সাতজনে মিলে হীরালালের কাছ থেকে নীলপদ্ম আর সব জিনিস জোর করে কেড়ে নিয়ে তাকে গভীর জলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে। তারপর বাড়ী এসে তারা বাপকে বল্লে "বাবা ! আমরা নীলপদ্ম এনেছি, এই পদ্মটি আপনার চোখের উপর বুলিয়ে দিলেই আপনার চক্ষু আরোগ্য হবে। কিন্তু তার আগে সব রাজা রাজড়াদের ডেকে একটা মস্ত সভা করতে হবে, সেই সভার মধ্যে আমরা এমন সব অদ্ভুত আর আশ্চর্য কাণ্ড দেখাব, যা কখনও কেউ বয়সে দেখে নাই।" ছেলেদের কথায় বিশ্বাস করে রাজা একটা খুব বড় সভা করলেন। এদিকে রাজপুত্রেরা একটা বড় ভুল করেছিল তারা হীরালালের কাছ থেকে আর সব জিনিস কেড়ে নিয়েছিল, কিন্তু সেই মাটী, আর বাঁশীটি নিতে পারে নি। তাই তারা যখন বেড়ালকে দুধ জাল দিতে বল্লে, বেড়ালটা মাছ সাবাড় করে ফেল্লে। আবার বাঘের সুমুখে যেই হরিণকে এনেছে, অমনি বাঘ হরিণকে নাচাবে কি, সে এতবড় হাঁ করে হরিণটাকে গিলতে গেল। এইসব দেখে সভাসুদ্ধ লোক হো হো করে হেসে উঠলো। রাজপুত্রেরা তখন ভারি লজ্জিত হয়ে নীলপদ্মটি যেমন বাপের সুমুখে নিয়ে গেছে, অমনি দেখতে দেখতে পদ্মটি একেবারে শুকিয়ে গেল। রাজার অন্ধচক্ষু যেমনকার তেমনি রইল। সকলেই তখন রাজপুত্রদের ছি ছি করতে করতে যে যার বাড়ী ফিরে গেলেন। রাজার অপমানের সীমা রইল না।

এদিকে হীরালাল নদীর অগাধ জলে পড়ে ভাসতে লাগলো। ভাসতে ভাসতে খানিক দূর গিয়ে তার হঠাৎ বাঁশীর কথা মনে পড়লো। সে তখন বাঁশীটি নিয়ে তাতে তিনবার ফুঁ দিলে। অমনি তৎক্ষণাৎ চারজন পরী এসে উপস্থিত হল। তারপর তারা দুজন তো নৌকো হল, আর দুজন দাঁড় হল, হীরালাল সেই নৌকোয় করে বাড়ী ফিরে এল। এসে বাপকে বলে আবার একটা ভারি সভা করলে। তামাশা দেখবার জন্যে এবারও অনেক লোক জমা হল। হীরালাল তখন এক মুঠো মাটী ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর বেড়ালকে দুধ জাল দিতে বল্লে। বেড়ালটা অমনি ঠিক মানুষের মত বসে দিব্যি দুধ জাল দিতে লাগলো। আবার বাঘের সুমুখে হরিণকে আনতেই বাঘটা হরিণকে ধরে নাচাতে আরম্ভ করলে। তারপর বেড়ালটা সকলের সাক্ষাতে বঁটী পেতে বসে ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে মাছ কাটতে লাগলো। এই সব অদ্ভুত ব্যাপার দেখে সকলেই একেবারে অবাক হয়ে গেল। তারপর হীরালাল বাঁশীটি নিয়ে তিনবার ফুঁদিলে, অমনি চার জন পরী এসে বল্লে, "কি দরকার ?" হীরালাল বল্লে "আমার আর একটি নীলপদ্ম চাই, সে পদ্মটি আমার দাদারা নষ্ট করে ফেলেছেন।" পরীরা একটি

তলোয়ার আর এক ঘটী জল হীরালালকে দিলে, হীরালাল তখন সভাসুদ্ধ লোকের সাক্ষাতে পরীদের সেই তলোয়ার দিয়ে দুখানা করে কেটে ফেল্লে। পরীদের রক্ত যেখানটায় পড়লো, দেখতে দেখতে সেখানে একটি সুন্দর নীলপদ্ম ফুটে উঠলো। হীরালাল পদ্মটি তুলে নিয়ে সেখানে জল ঢেলে দিলে, পরীরা অমনি বেঁচে উঠে বাড়ী চলে গেল। তারপর হীরালাল পদ্মটি নিয়ে রাজার চোখের উপর একবার বুলিয়ে দিতেই রাজা তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিলাভ কবলেন। তখন সভাসুদ্ধ লোক হীরালালকে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। তাবপর রাজা সুয়োরানীর সাত ছেলেকে তাড়িয়ে দিলেন আর হীরালালকে রাজ্য দিয়ে মনের সুখে কাল কাটাতে লাগলেন।

পূর্ণশশী দেবী

সাত রাজার ধন মাণিক

এক যে রাজা, তাঁব এক রানী, এক রাজপুত্র। রাজার মস্ত বড় রাজা, হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ভাণ্ডাব ভরা মোহব, আর দেউড়ী ভবা সিপাইশান্ত্রী। রাজার আর এক জিনিস ছিল, যা সব বাজার থাকে না,—তা সাত বাজার ধন মাণিক। বাজার গুরু এক মুনি; তাঁর কাছে রাজা মাণিক পেয়েছেন।

রাজভাণ্ডাবের টাকা মোহর বছরে দু একবার রোদে পডত। একবার টাকা মোহরের সঙ্গে মাণিকও বোদে বাহিব হল, রাজপুত্র মাণিক দেখে বাযনা ধরল। রাজার এক ছেলে, বড় সোহাগেব, যা চায তাই পায়। তার আবদার পূর্ণ হতে বিলম্ব হল না।

মাণিক হাতে রাজপুত্র খেলতে লাগলেন। খেলতে খেলতে মাণিক পুকুরে পড়ে গেল। চারিদিকে গোল উঠল, রাজপুরীতে হুলুস্থূল পড়ে গেল। পুকুরে ডুবুরী নামল, জাল পড়ল, মাণিক পাওয়া গেল না। মাণিকের শোকে রাজা বড কাতর হলেন, সকলে রাজপুত্রের নিন্দা করলেন। রাজপুত্র সকলি শুনলেন, মনে বড খেদ হল প্রতিজ্ঞা করলেন, যেরূপে হোক রাজাকে মাণিক এনে দিবেন। বানী অনেক নিষেধ করলেন, কান্নাকাটি করলেন, রাজপুত্র নিষেধ মানলেন না, জেদের বশে রাজবাড়ী হতে বাহির হলেন। খুব দক্ষিণে ফুলে পাহাড়ের কাছে রাজার গুরু তপস্যা করেন—রাজপুত্র সোজা দক্ষিণ মুখে ঘোড়া ছুটালেন। কত বন, কত নদী, কত পাহাড় পার হ'য়ে কত রাজার রাজ্য ছাড়িয়ে রাজপুত্র এক বনে উপস্থিত হলেন, আর খানিক এগিয়ে এক পাহাড় সামনে পড়ল। পাহাড়ের কি শোভা! আশে পাশে বড় বড় গাছ ফুলে ভরা, গোটা পাহাড় ফুলময়, চৌদিকে ফুলের হাট। সুগন্ধে ভরপুর! এই তো ফুলে পাহাড়, বাজপুত্রের বড় আনন্দ হ'ল। রাজপুত্র এগিয়ে দেখেন, পাহাড়ের তলে এক কুটীর, আর রাজার গুরু বসে আছেন।

মুনিকে প্রণাম করে রাজপুত্র সকল কথা বললেন, তারপর জোড়হাতে মাণিক প্রার্থনা করলেন। রাজপুত্রের সাহস আর ধৈর্যে মুনি বড় প্রীত হলেন। রাজার আর রাজ্যের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করে, মাণিকের আশ্বাস দিলেন। রাজপুত্র পথের কষ্ট ভুলে গেলেন; দুইদিন মুনির কুটীরে থাকলেন। তারপর মাণিক নিয়ে বিদায় হলেন।

রাজপুত্র বাড়ী চলেছেন। কয়েকদিন বেশ পথ কাটল। এক দিন পথে এক ঠুঠোর সঙ্গে রাজপুত্রের দেখা হল। লোক ঠকান আর ধন রত্ন কেড়ে লওয়া ঠুঠোর কাজ। তার পাঁচ

ছেলে আর এক সুন্দরী মেয়ে। পাঁচ ছেলে ডাকাত। ঠুঁঠো ঠক ছেলেদের ঘাড়ে উঠে পথের ধারে যেয়ে বসত, পথিক দেখলে খড়ি পাতত, কিছু আছে সন্ধান পেলে তার নিস্তার নাই। ফলে কৌশলে আটক করত, ছেলেরা লুটে পুটে কুচি কুচি করে কেটে ফেলে দিত।

রাজপুত্রকে দেখে ঠুঁঠো ঠক খড়ি ধরল, মাণিকের কথা জানতে তার দেরী হল না। তখন তার ডাকাত ছেলেরা বাড়ী ছিল না। ঠুঁঠো বড় বিপদে পড়ল, মাণিকের লোভ ছাড়া সোজা কথা নয়—অনেক ভেবে রাজপুত্রকে ডেকে বলল,—"ওহে পথিক, দেখ আমার হাত পা নাই, আমি পঙ্গু, আমার একটু উপকার করবে কি ?" রাজপুত্র বললেন,—"আমাকে অনেক পথ যেতে হবে। আচ্ছা, তোমার কি কাজ শীঘ্র বল।"

ঠক বলল,—"তা বেশী কিছু কাজ নাই। ঐ যে পুকুর দেখছ, তার দক্ষিণ পাড়ে আমার বাড়ী। ছেলেরা বাড়ী নাই, কেবল মেয়ে আর বৌয়েরা আছে। তুমি আমার মেয়েকে বলবে যে, একটা বড় গরু পালিয়ে বাড়ীর দিকে গেল, খড়ি দেখে তা আটক করে রাখে, ছেলেরা এসে উপায় করবে।" রাজপুত্র দ্বিরুক্তি না করে ঠকের বাড়ী গিয়ে তার মেয়েকে ঠুঁঠো ঠকের কথাগুলো বললেন। ঠক কন্যা সঙ্কেত বুঝল, খড়ি ধরতে ঘরে ঢুকল। এমন সময় এক বৌ এসে রাজপুত্রকে বলল,—"কে গো যমপুরী এসেছ ? এ যে ডাকাতের বাড়ী ! প্রাণের মায়া থাকে শীঘ্র পালাও।" রাজপুত্র কেঁপে উঠলেন, এক তিলও দাঁড়ালেন না, পথে নেমে ভোঁ দৌড়।

অল্পক্ষণ পরে ঠকের পাঁচ ছেলে বাড়ী এল, তারা সকল কথা শুনল, খড়ি ধরে দেখল, তখন শিকার বেশী দূর যায়নি। তারা পরামর্শ করে চার ভাই বেহারা সেজে পাল্কী কাঁধে করল, ঠক কন্যা সিঁতিপাটী করে পাল্কীতে চড়ল, আর এক ভাই ঘোড়ায় চড়ে পাল্কীর সঙ্গে চলল।

সন্ধ্যার পর রাজপুত্র এক রাজবাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাল্কী উপস্থিত। ঘোড়া হতে নেমে ঠক বলল,—"দোহাই মহারাজ, বিচার করুন ! এই লোক আমার ভগ্নীপতী, আমাদের উপর রাগ করে পালিয়ে এসেছে। তাই আমার বোনকে সঙ্গে এনেছি। আমার বোনকে গ্রহণ করবার আদেশ করুন।" রাজপুত্র রাজার পা ধরে বললেন,—"মহারাজ রক্ষা করুন ! এরা সব ডাকাত, আমার প্রাণ নেবার জন্য এখান পর্যন্ত এসেছে।"

রাজা বিষম সমস্যায় পড়লেন।

অনেক ভেবেচিন্তে বললেন,—"তোমাদের কারো কথা বিশ্বাস করবার যো নাই। যা হোক, তোমার বোন আর এই লোক রাত্রে এক ঘরে থাকবে। যদি এই কন্যা উচ্ছিষ্ট খায় তা হলে সকল গোল মিটে যাবে।" রাজপুত্র আপত্তি করলেন, রাজা শুনলেন না।

রাজপুত্র আর ঠক কন্যার এক ঘরে স্থান হল। রাজপুত্র আহার করে বিছানায় শুলেন। ঠক কন্যা উচ্ছিষ্ট আহার করে রাজপুত্রের পদসেবা করতে লাগল। ভয়ে রাজপুত্র অস্থির,—কখন ঠক কন্যা গলায় ছোরা বসাবে। স্থির করলে, জেগে রাত কাটাবে।

রাজপুত্র পরিশ্রম আর উদ্যোগে বড় কাতর। রাত জাগার অনেক চেষ্টা করলেন, পারলেন না। একটু পরেই ঘুমে অজ্ঞান।

এক প্রহর রাত্রে হঠাৎ রাজপুত্রের ঘুম ভাঙ্গল। চোখ খুলে দেখেন ঠক কন্যার হাতে চকচকে ছোরা !

রাজপুত্র বললেন,—'ঠক কন্যা, তোমার এ কুপ্রবৃত্তি কেন ? আমার প্রাণ নিতে এত সাধ কেন ? তোমার ভায়েরা ত তোমাকে মাণিক দিবে না, কাহিনীর ব্রাহ্মণের মত আজীবন

তোমাকে অনুতাপ করতে হবে।"

ঠক কন্যা বলল, "ব্রাহ্মণকে কেন অনুতাপ করতে হয়েছিল ?"

রাজপুত্র বললেন,—"বেশ আগে ব্রাহ্মণের কাহিনী শোন, তারপর যা ভাল মনে হয় করবে।"

"কোন দেশে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ দম্পতি ছিল, বুড়ো বয়সে তাদের এক ছেলে হল। ছেলের মুখ চেয়ে তারা সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলে গেল। ব্রাহ্মণের বহুদিনের পোষা এক বেজী ছিল, বেজী ব্রাহ্মণ শিশুর চৌকী দিত। একদিন দুপুরে ব্রাহ্মণ গ্রামে এক যজমান বাড়ী পূজা করতে গেলেন, ঘরের দাবায় ছেলে শুইয়ে ব্রাহ্মণী রান্নায় ব্যস্ত। বেজী তখন কোথায় গেছিল, ঘরে এসে দেখে ছেলের বিছানায় মস্ত বড় সাপ ! বেজী ছুটে বিছানায় উঠল, সাপের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে গেল। এর মধ্যে সাপটা কখন যে ছেলের গায় ছোঁ মারল বেজী জানতে পারল না। বেজী সাপের মাথা কামড়ে ধরল, তার পর বিছানা হতে টেনে খণ্ড খণ্ড করে ফেলল। ততক্ষণ বিষের জ্বালায় ছেলে কাঁদতে লাগল, তখন বেজী বুঝতে পেরে ওষুধ আনতে ছুটল।

ছেলের কান্না ব্রাহ্মণীর কানে গেল, রান্না ছেড়ে ছুটে যেয়ে ছেলে কোলে উঠাল। ব্রাহ্মণী প্রথমটা কিছু ঠিক করতে পারল না, হঠাৎ ছেলের বিছানার উপর চোখ পড়ল, বিছানাময় রক্ত ! ব্রাহ্মণী মরা ছেলে বিছানায ফেলে মাটিতে বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল। কান্না শুনে পাড়ার লোক জমে গেল।

ততক্ষণ পূজা শেষ করে ব্রাহ্মণ বাড়ী এসে দেখল, সর্বনাশ হয়েছে, তার একমাত্র ছেলের কিসের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে। আব দেখল বিছানায় রক্ত !

ব্রাহ্মণ মনে করল বেজীই তার ছেলেকে কামড়েছে। এমন সময় বেজী মুখে ওষুধ নিয়ে এল। ব্রাহ্মণ দেখল, বেজী গা মুখ রক্তময় ! আর সন্দেহ থাকল না। ব্রাহ্মণ একটা লাঠি উচিয়ে বেজীর মাথায় দু তিন ঘা বসিয়ে দিল। বেজী ধড়ফড় করে মরে গেল, মুখের ওষুধ ছিটকে ব্রাহ্মণের পায়ে পড়ল।

ব্রাহ্মণ উঠিয়ে দেখে একটা গাছের শিকর। সকলেব দৃষ্টি শিকড়ের উপর পড়ল। তখন এক বৃদ্ধ বলল,—'ব্রাহ্মণ করলে কি ? তোমার ছেলে মরল সাপের কামড়ে। আর তুমি কিনা বেজী মেরে ফেললে। নিশ্চয় বেজী এই শিকড় তোমার ছেলের জন্য এনেছিল। যা হোক শিকড় তোমার ছেলের মুখে দাও, যদি কিল ফল হয়।'

এককজন তাড়াতাড়ি কতকটা শিকড় বেঁটে ছেলের মুখে, আর কতকটা গায়ে মাখিয়ে দিল।

শিকড়ের গুণে অল্পক্ষণের মধ্যে ছেলে ভাল হয়ে গেল। তখন ব্রাহ্মণের জ্ঞান হল। কি অন্যায় কাজ করেছে। সে অনুতাপ করতে লাগল,—'হায়, আমি না বুঝে কি করলাম।'

গল্প শুনে ঠক কন্যা ছুরিখানা রেখে রাজপুত্রের পদসেবা করতে লাগল। কিছুক্ষণ জেগে, রাজপুত্র ঘুমিয়ে পড়লেন। দুপুর রাত্রে রাজপুত্র আবার চমকে উঠলেন—চেয়ে দেখেন ঠক কন্যার হাতে ছুরি।

রাজপুত্র বললেন, "ঠক কন্যা, আমাকে হত্যা করলে তোমার ভায়েরা কি আর তোমাকে মাণিক দিবে ? তোমাকে গোয়ালার মত কেবল অনুতাপ করতে হবে।"

ঠক কন্যা জিজ্ঞাসা করল,—"গোয়ালার কি হয়েছিল তা বল।"

রাজপুত্র বলতে লাগলেন—"এক গরীব গোয়ালা ছিল, তার বড় কষ্টের সংসার। ছেলেপুলে অনেকগুলো, কিন্তু খাবার উপায় নাই। যাহোক, কোন উপায়ে তার সংসার

চলত। গোয়ালার এক হীরামন পাখী ছিল, সেটি তার বড় আদরের।

একদিন হীরামন বলল,—'দেখ, তোমার যেমন অবস্থা দেখছি, তাতে শীঘ্র সকলকে উপোষ থাকতে হবে। তোমরা যদি আমার কথা শুন, তোমাদের মার এমন দুঃখ থাকবে না।'

গোয়ালা বলল,—'কি করতে হবে বল।' হীরামন বলল,—'তোমাকে বেশী কিছু করতে হবে না। তুমি কতক খৈ আর দুখের যোগাড় কর, আর যা যা করতে হয় আমি করব।' গোয়ালার আর কিছু ছিল না, থাকার মধ্যে দু একটা গাই। তারই মধ্যে একটা গাই বিক্রী করে খৈ দুধ যোগাড় করল। তারপর হীরামনের কথামত এক বনে রেখে এল, হীরামন কয়েকদিনের বিদায় নিয়ে উড়ে গেল।

তিন দিনের দিন হীরামন ফিরে এসে গোয়ালাকে বলল,—'আমার এত পরিশ্রম বৃথা হল। জাতভায়াদের নিমন্ত্রণ করতে আমি গেলাম, ফিরে এসে দেখি বনের পাখী সব খৈ দুধ খেয়ে ফেলেছে! তাদের আর কি খাওয়াবো ? আবার যদি খৈ দিতে পার, তা হলে চেষ্টা করি। তাদের খৈ দুধ খাওয়াতে পারলে, তোমার সকল দুঃখ দূর হবে।'

গোয়ালার বড় আশা, তার কষ্ট থাকবে না। আবার একটা গাই বিক্রী করে হীরামনকে খৈ দুধ দিল, হীরামন উড়ে গেল। দুদিন পরে হীরামন ফিরে এসে গোয়ালাকে বলল,—'আমার জাতভায়েরা মনের সুখে খৈ দুধ খেয়েছে। কালকার দিন যদি তাদের রাখতে পারি বড় ভাল হয়। কিন্তু খাবার না দিলে তো তারা থাকবে না, আরো কিছু খৈ দুধ চাই।' গোয়ালা বড় বিরক্ত হল, মুখ ভার করে বলল,—'আবার খৈ দুধ চাও কেন ? তোমার কথায় চলে আমার কি লাভ হল ?'

হীরামন বলল,—'এত ব্যস্ত কেন ? আমার উপর বিশ্বাস কর. কখন তোমার ক্ষতি হবে না। একবার আমার কথা শুন, কাল তোমার এ কষ্ট থাকবে না!'

বেচারা গোয়ালা আর কি করে ? থালা বাসন যা ছিল বিক্রী করল, কিছু ধার কর্জ করল। তারপর খৈ দুধ যোগাড় করে, হীরামনের কথামত চুপি চুপি বনে রেখে এল। পরদিন গোয়ালা হীরামনের আশায় বসে আছে, আজকার কথা হীরামন বলেছে। কৈ হীরামন ত আসে না। তবে কি সমস্ত প্রতারণা ? গোয়ালা ভাবাগোণা করছে, হীরামন এসে উপস্থিত। গোয়ালা আনন্দে বলে উঠল,—'কৈ হীরামন, আমার জন্য কি এনেছ দাও।'

হীরামন বলল,—'কাল সকালে তুমি বনে যেয়ো। এত ধন পাবে তোমার কোন ভাবনা থাকবে না। আজ রাত্রের মত আমাকে বিদায় দাও, কাল বনে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

একি হল ? আবার কালকের আশা ? তবে কি সবই হীরামনের ফাঁকি ? হীরামনের কথায় আর বিশ্বাস কি ? হীরামন নিশ্চয় পালাবার চেষ্টায় আছে! তা হবে না। গোয়ালা হতাশ হয়ে গেল, তার সকল আশায় ছাই পড়ল। গোয়ালার মাথা পরম হয়ে উঠলো, রাগে গর গর করতে করতে দৌড়ে এসে হীরামনের গলা টিপে মেরে ফেলল।

খুব সকালে উঠে গোয়ালা একবার বনে গেল। যেখানে খৈ দুধ রেখেছিল সেখানে কিছু নাই, কেবল বনময় বিষ্ঠা, তার সঙ্গে সোনার টুকরা! গোয়ালা তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এল, ডালি নিয়ে যেয়ে সোনার টুকরা কুড়ুতে লাগল—এক সপ্তাহে সমস্ত সোনা ঘরে তুলল।

গোয়ালা এ কয়দিন হীরামনের কথা ভুলে গেছিল, এখন শূন্য খাঁচা দেখে মনে পড়ল রাগের বশে কি অন্যায় কাজ করেছে, তখন সে শোকে পাগল হয়ে কেবল 'হায় হীরামন! হায় হীরামন!' করতে লাগল।'

কাহিনী শেষ হল, ঠক কন্যা রাজপুত্রের পদসেবা করতে লাগল, ক্লান্ত হয়ে রাজপুত্র

ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর। রাজপুত্র অঘোরে ঘুমে। হঠাৎ জেগে দেখেন আবার ঠক কন্যাব হাতে ছুরি।

রাজপুত্র বললেন,—"ঠক কন্যা, তুমি কি সেই শিকারী রাজার মত অনুতাপ করতে চাও ?"

ঠক কন্যা বলল,—"কেন, সেই শিকারী রাজাব কি হয়েছিল ?" বাজপুত্র বলতে আরম্ভ করলেন,—

"এক যে রাজা, তাঁর এক শিকারী ঘোড়া ছিল। রাজা ঘোড়ায় চড়ে প্রত্যহ মৃগয়া করতেন। একদিন বাজা মৃগয়ায় গেলেন, এ বন সে বন করে একটা হরিণ বাহির হল। হরিণের পিছনে ছুটতে ছুটতে রাজা ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হ'য়ে জলের জন্য ব্যস্ত হলেন। এদিকে ওদিকে খুঁজে একটা ঝরণা মিলল, রাজা ঘোড়া হতে নেমে, ঝরণার ধারে গেলেন। দুই হাত দুরে জল নিয়ে, যেমন হাত মুখের কাছে আনলেন, ঘোড়া হাতে কামড় দিল, জল পড়ে গেল। রাজা ভাবলেন, ঘোড়ারও বড় পিপাসা। বাজা আবার অঞ্জলি পুরে জল নিলেন, মুখের কাছে আনতেই ঘোড়া কামড় দিল, জল পড়ে গেল। রাজা বড় বিরক্ত হলেন, কিছু বললেন না। তৃতীয বার বাজা জল নিলেন, ঘোড়া আবার ফেলে দিল। তখন রাজা রাগে দিশেহারা হ'য়ে কোষ হতে তরবাব টেনে ঘোড়ার গলায় বসিয়ে দিলেন। ঘোড়া আছড়ে মাটিতে পড়ল।

আবার বাজা জলের জন্য হাত বাড়ালেন, হঠৎ দেখলেন, একটা শিয়াল দৌড়ে এসে ঝরণার জল মুখে দিল। অমনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল,—আর উঠল না। বিস্ময়ে বাজা হতবুদ্ধি। জল আব কি পান করবেন ? এ যে বিষাক্ত জল ! ওহো, এ জন্যই কি ঘোড়া জল ফেলে দিল ?

রাজার জ্ঞান হল, কি অন্যায় তিনি করলেন ! পিপাসা ভুলে গেলেন। ঘোড়ার কাছে বসে। চোখেব জলে ভাসতে ভাসতে, 'হায ! হায !' কবতে লাগলেন।"

গল্প শুনে ঠক কন্যা বলল —"তোমাকে হত্যা কবতে আমাব একটুও ইচ্ছা নাই। কিন্তু কি কবি ? তোমাব কাছ হতে মাণিক না নিতে পারলে ভায়েরা আমাকে আস্ত রাখবে না।"

রাজপুত্র বললেন,—"তোমাব কোন ভয নাই। আমি এক রাজার ছেলে, কাছেই আমার রাজ্য। চল, এই ভোব রাত্রে আমবা দুজনে পালিয়ে যাই। বাড়ী যেয়ে আমি তোমাকে বিবাহ করব।" তাবপর দুজনে চুপি চুপি ঘর হতে বাহিব হযে পালিয়ে গেলেন।

এদিকে ভোব না হতে, ঠকেবা পাঁচ ভাই জেগে উঠল। এক ভাই বাজপুত্রকে দেখতে গিয়ে দেখে ঘর শূন্য।

সে দৌড়ে এসে তাব ভাইদেব খবব দিল। শিকাব হাত ছাড়া। এক ভাই খড়ি পাতল, রাজপুত্র তাদেব বোনকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তখন এক ভাই ঢাল তরবার বেঁধে রাজপুত্রের উদ্দেশে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল, আর সকল ভাই পিছনে ছুটল।

কিছু পথ যেয়ে ঠক কন্যা খড়ি দেখল, তার ভায়েবা পিছু নিয়েছে। ভীত হয়ে রাজপুত্রকে বলল,—"রাজকুমার, আব রক্ষা নাই ! আমার ভায়েরা এই দিকে আসছে। এক ভাই ঘোড়ায়, আর সকলে পাযে। তোমাকে দেখলে তো কেটে ফেলবে, আমারও নিস্তাব নাই।"

রাজপুত্র হতাশ না হয়ে বললেন,—"কোন ভয় নাই। আমি এই গাছে উঠি, তুমি গাছতলায় বসে কেবল কাঁদ, আব যা যা করতে হয় আমি করব।"

যেমন কথা, তেমনি কাজ। রাজপুত্র তাড়াতাড়ি এক গাছে উঠলেন, ঠক কন্যা পা ছড়িয়ে কাঁদতে লাগল। ততক্ষণ এক ভাই ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পড়ল। ঘোড়া হতে নেমে ঠক বলল,—"হাঃ হাঃ দুজনে বেশ পালিয়েছিলে না, এখন পালা দেখি। ছোঁড়াটা কোথায় গেল বল।"

ঠক কন্যা কাঁদতে কাঁদতে বলল,—"আমার কোন দোষ নাই, সেই ছোঁড়া আমাকে এখানে ধরে এনেছে। এখন তোমাকে দেখে ভয়ে এই গাছে লুকিয়েছে।"

ঠক বলল,—"সব মিছে কথা। আগে গাছে উঠে ছোঁড়াটাকে কাটি তারপর তোর পালা। এখন কান্না রেখে ঘোড়া ধর।"

ঠক কন্যা ঘোড়া ধরল, ঠক গাছে উঠল। এদিকে রাজপুত্র সকলি দেখছিলেন, যেমন ঠক উপরে উঠল, অমনি গাছ হতে নেমে পড়লেন। তারপর ঠক কন্যা আর রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে বসলেন, সন্‌সন্ ঘোড়া ছুটল। খুরের শব্দে ঠকের জ্ঞান হল, গাছ হতে নেমে দেখে, রাজপুত্র আর ঠক কন্যা ঘোড়ার উপর, ঘোড়া ছুটে যাচ্ছে। ততক্ষণ আর চার ভাই এসে পড়ল, সমস্ত শুনল। আর রাজপুত্রের অনুসরণ বৃথা, চোখের জল ফেলে তারা বাড়ী ফিরল।

যথা সময়ে রাজপুত্র বাড়ী এলেন। রাজপুত্র রাজারাণীকে প্রণাম করে, রাজার পায়ে মাণিক রেখে দিলেন, রাজপুরী আলো হল, রাজা পুত্রের মুখ চুম্বন করলেন।

রাজ্যময় ধূম পড়ল, রাজপুত্র মাণিক আর এক সুন্দরী কন্যা এনেছেন।

রাজবাড়ী নহবৎ বসল, লক্ষ ঢোলে কাঠি পড়ল। দোলা চৌদোলায় বরযাত্রা সাজল, হাতী ঘোড়ার সারি সারি, জনতার ঠেলাঠেলি, রাজধানী হাস্যময়!

আগুন পুরুত সম্মুখে, পঞ্চরত্ন মুকুট মাথায় রাজপুত্র ঠক কন্যার পাণি নিলেন। চারিদিকে উলুধ্বনি উঠল।

হেমচন্দ্র রায়

জুয়াচুরী বুদ্ধি

এক রাজা ছিলেন। রাজা একদিন সভার মাঝে বসে আছেন, এমন সময় তাঁর মাথায় কি খেয়াল চাপলো, সকলকে ডেকে বল্লেন "আচ্ছা তোমরা সকলে বল দেখি, রাজার বুদ্ধি বেশী না জুয়াচোরের বুদ্ধি বেশী।" রাজাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে তাঁর মন্ত্রী আর সভাসুদ্ধ লোক সকলেই বলে উঠলেন "মহারাজ! রাজার বুদ্ধিই বেশী।" সেই সভায় রাজার একটি জামাই বসেছিলেন তিনি তাড়াতাড়ি বল্লেন "মহারাজ! আমার বিবেচনায় বাজার চেয়ে জুয়াচোরের বুদ্ধিই বেশী।"

জামাইয়ের কথা শুনে রাজার ভারি অপমান বোধ হল, তিনি রাগে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে তখনই জামাইকে তাঁর দেশ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হুকুম দিলেন। জামাইয়ের অপরাধে নিজের কন্যা ও দৌহিত্রকেও আপনার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

দুঃখিনী রাজকন্যা ছেলেটিকে নিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করে দিনপাত করতে লাগলেন। ছেলেটির নাম বলরাম, বলরাম দিন দিন বড় হতে লাগলো। একদিন বলরাম মায়ের মুখে তার পিতার উপর মাতামহের অত্যাচারের কথা শুনে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে যে রাজার

বুদ্ধির চেয়ে যে জুয়াচোরের বুদ্ধি বেশী তা যেমন করেই হ'ক একবার রাজাকে দেখাতে হবে। তারপর একদিন মাকে কিছু না বলেই বাড়ী থেকে চল্লো। পথে যেতে যেতে দেখতে পেলে দুজন পথিক সেই দিকপানে আসছে, বলরাম তাদের দেখে তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বল্লে 'হ্যাঁ গা, তোমরা আমাকে জুয়াচুরী বিদ্যা শেখাতে পার ?" লোকদুটি ভাবলে এ ছেলেটা হয়তো নেহাৎ বোকা, নয়তো পাগল। তাদের সঙ্গে একটা মস্ত সন্দেশের হাড়ী ছিল, ফাঁকি দিয়ে সেটা বলরামের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তারা বলরামকে বল্লে "আমরা তোমায় জুয়াচুরীবিদ্যা শিখিয়ে দিতে পারি, যদি তুমি আমাদের এই হাঁড়ীটি বয়ে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চল। কিন্তু বাপু ! সাবধান ! এই হাঁড়ীটায় একটা ভারি বিষাক্ত গোখুরা সাপ আছে, যে কোন রকমে হাঁড়ীর ঢাকনী খুলে না যায়, তা হলেই তোমার প্রাণ যাবে।" জুয়াচুরীবিদ্যা শেখবার লোভে বলরাম হাঁড়ীটা মাথায় করে নিয়ে চল্লো। কিন্তু বলরাম একে ছেলেমানুষ, তায় হাঁড়ীটা এত ভারি ছিল, যে সেটা মাথায় করে খানিক দূর যেতেই বলরামের ঘাড় ব্যথা করতে লাগলো। তাই সে হাঁড়ীটা একবার কাঁধে, একবার কাঁকে করে নিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় বার বার নাড়াচাড়া পেয়ে হাঁড়ীর মুখ একটুখানি খুলে গেল, বলরাম দেখলে, তার মধ্যে সাপ নেই, তার বদলে বেশ ভাল সন্দেশ ঠাসা রয়েছে। দেখে বলরাম আর কোন মতে লোভ সামলাতে পারলে না। পথশ্রমে ক্ষিদেটাও বেশ হয়েছিল, সে তখন হাঁড়ী থেকে টপাটপ করে সন্দেশ গালে ফেলতে ফেলতে চল্লো। পথিকরা সামনেই ছিল, তাই তারা বলরামের কাণ্ড দেখতে পেলে না। যেতে যেতে খানিক পরে বলরাম একটা পোলের উপর এসে উপস্থিত, পোলের নীচে খুব গভীর জল, বলরামের হাঁড়ীর সন্দেশ তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, পেটেও আর জায়গা নেই, সে তখন কল্লে কি, হাঁড়ীটা উপর থেকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে—"বাপ্‌রে ! মারে ! খেয়ে ফেল্লেরে, এমন সর্বনেশে সাপ তো কখনও দেখিনি রে !" বলে খুব চেঁচাতে আরম্ভ করলে। তার চীৎকার শুনে পথিকদুটি ব্যাপার কি জানবার জন্যে তখনই ছুটে এল। তাদের আসতে দেখে বলরাম "মশাই গো ! গেছি গো ! সাপে খেয়ে ফেলেছে গো।" বলে আরও জোরে চীৎকার করতে লাগলো। পথিকরা বলরামের চালাকি বুঝতে পেরে বল্লে, "আচ্ছা ব্যাটা, তুই যেমন আমাদের চোখে ধুলো দিয়েছিস আমরাও তোকে তেমনি জব্দ করছি দাঁড়া।" তারপর তারা বলরামকে ধরে নিয়ে এক জমিদারের বাড়ী এসে বল্লে "মশাই, আমরা বড় গরীব, পয়সার অভাবে আজ তিন দিন অনাহারে রয়েছি, তাই আমাদের এই ছেলেটিকে বেচতে চাই, আপনি নেবেন কি ?" জমিদার বাবুর তখন একটি চাকরের বড় দরকার, আর বলরামকে চালাক চতুর গোছ দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "হ্যাঁরে ছোকরা ! তুই আমাদের বাড়ী চাকরী করবি ?"

বলরাম তৎক্ষণাৎ চাকরী করতে রাজি হয়ে গেল। জমিদার বাবু দস্তুরমত টাকা দিয়ে পথিকদের বিদায় করে দিলেন। এদিকে বলরাম জমিদার বাবুর বাড়ীর সব কাজকর্ম সেরে শু'তে গেল। পরদিন সকালবেলা উঠেই জমিদার বাবু তাঁর নূতন চাকরের ঘরে গিয়ে দেখেন যে সে তখন কাছা খুলে দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে মুসলমানদের মত নমাজ পড়ছে ! দেখেই তো জমিদার মশাইয়ের চক্ষু স্থির ! তিনি তখন চীৎকার করে উঠলেন "ওরে বাপু ! একি কাণ্ড ! তুই কি মোছলমান নাকি ?" বলরাম তার বত্রিশপাটি দাঁত বের করে একমুখ হেসে বল্লে "আজ্ঞে, মশাই আপনি ঠিক ধরেছেন, আমি মোছলমান বটে।" এবার জমিদার বাবুর মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেল। তিনি রাগে ভয়ে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে বল্লেন "বলিস কিরে ব্যাটা, কাল যে আমরা বাড়ীসুদ্ধ তোর হাতে জল খেয়েছি ! ব্যাটা পাজি ছুঁচো ! আমার সঙ্গে জোচ্চরি ! বেরো এখনি আমার বাড়ী থেকে !" বলে বলরামকে তেড়ে

মারতে এলেন, বলরাম তখন যেন কাঁদ কাঁদ হয়ে নাকিসুরে খুব চীৎকার করে বলতে আরম্ভ কল্লে "মশাই গো ! আপনি এ গরীবের উপর অনর্থক রাগ করছেন, দোহাই ধর্মের আমার এতে একটুও দোষ নাই, এসব সেই পাজি জোচ্চোর বেটাদের কারসাজি । তারাই তো আমায় অসহায় দেখে জোর করে ধরে এনে টাকার লোভে আপনার কাছে বেচে গিয়েছে। এখন আপনি আমার উপর নারাজ হন, মারুন, কাটুন, বাড়ী থেকে বার করে দিন, তাতে তো আমার কোনই আক্ষেপ নেই, আক্ষেপ এই যে আমার হাতে পড়ে আপনারা সব জাত খোয়ালেন—শেষকালে মোছলমানের হাতে জল খেলেন !"

জমিদার মশাই তখন মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন, ছোঁড়াটা যদি একথা সকলের সাক্ষাতে প্রকাশ করে ফেলে, তবেই তো তাঁকে একঘরে হয়ে থাকতে হবে । তখন আর উপায়ান্তর না দেখে জমিদার বাবু একঘরে হয়ে থাকবার ভয়ে একশোটি টাকা বলরামের হাতে গুণে দিয়ে বল্লেন "দেখ বলরাম ! তুমি বড ভাল ছোকরা দেখছি, এখন এই টাকাগুলি নিয়ে আপনার ঘরে যাও, কিন্তু সাবধান ! এসব কথা যেন কারও সাক্ষাতে ঘৃণাক্ষরেও প্রকাশ কর না !"

বলরাম তখন টাকাগুলি চাদরের খুঁটে বেঁধে মনের আনন্দে হাসতে হাসতে বিদায় হল । যেতে যেতে একটি মাঠের মধ্যে এসে উপস্থিত হল, সেখানে একটা বুনো ষাঁড় চরে বেড়াচ্ছিল । ষাঁড়টা বলরামকে দেখেই দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করে ফোঁস কেরে তেড়ে গুঁতোতে এল । বলরাম তখন খুব জোরে তার শিং চেপে ধরে ধস্তাধস্তি করতে লাগলো । এমনি করে ষাঁড়টার সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় অসাবধানে তাব চাদরের খুঁট থেকে টাকাগুলি ঝন ঝন্ করে মাটীতে সব ছড়িয়ে পড়ে গেল । ওদিকে সেই পথিক দুটি, যারা বলরামকে জমিদারের হাতে বেচে গিয়েছিল, তারা সেই টাকার শব্দ শুনতে পেয়ে, কোথা থেকে ছুটে এসে তাড়াতাড়ি টাকাগুলি কুড়োতে আরম্ভ করলে । বলরাম তখন হো হো করে হেসে বলে উঠলো 'আরে বাহবা ! আমার টাকাগুলি বুঝি তোমরা কুড়িয়ে নিচ্ছ ! আচ্ছা বেশ বেশ যত পার নাও, কুছ্ পরওয়া নাই । আমার এই ষাঁড়টি বজায় থাকলে আবার কত টাকাই হ'বে ।" পথিক দুটি একেবারে অবাক হয়ে গেল । ছোঁড়া বলে কি ? তারা একসঙ্গে বলে উঠলো "সে কি কথা ? ষাঁড়টাতে এমন কি গুণ আছে ?" বলরাম ষাঁড়টার গায়ে হাত বুলিয়ে হাসতে হাসতে বল্লে "এই ষাঁড়টি আমার ট্যাঁকশাল বিশেষ, এটি যতবার নাদ করবে, ততবার ঝমাঝম্ করে টাকা পড়বে, তাও একটি দুটী নয়, একেবারে মুটো মুটো ।" এই কথা শুনে পথিক দুটি একেবারে লোভে হতবুদ্ধি হয়ে বলরামের হাত দুখানি ধরে বলতে লাগল 'ভাই । তুমি কিছু মনে করো না, আমরা এতক্ষণ তোমার সঙ্গে তামাসা করছিলাম । এই নাও তোমার টাকা, কিন্তু ভাই এই টাকার বদলে তোমার এই ষাঁড়টি যদি আমাদের দান কর, তাহলে আমরা চিরকাল তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকব ।" তাদের খোসামোদ দেখে বলরাম খুব গম্ভীর হয়ে বল্লে "তাও কি হয় ? এই সামান্য টাকা কয়টির লোভে আমার এমন লক্ষ্মীমন্ত ষাঁড়টিকে কি আমি হাতছাড়া করতে পারি ? আমি এমন বোকা নয়, তোমরা সব আপনার পথ দেখ ।"

পথিকেরা তখন আরও চারশো টাকা বলরামের হাতে দিয়ে অনেক সাধ্য সাধনার পর ষাঁড়টার শিংগুে দড়ী বেঁধে টেনে বাড়ী নিয়ে এল । কিন্তু সেই ষাঁড়টিকে নিয়ে এসে তাদের যে কত টাকা লাভ হ'ল তা তোমরা বুঝতেই পারছ ! ক্রমাগত গুঁতুনির চোটে আর গোবরের দুর্গন্ধে অস্থির হয়ে তারা একদিন রেখেই ষাঁড়টাকে মেরে তাড়িয়ে দিলে । এদিকে বলরাম ফাঁকি দিয়ে পাঁচশো টাকা আত্মসাৎ করে এবার একেবারে সোজা তার মাতামহের রাজ্যে উপস্থিত হল । সেখানে একজন গণৎকারের বেশ ধরে খুব ভড়ং করে বেড়াতে লাগলো । এই রকমে অল্প দিনের মধ্যেই সহরময় রাষ্ট্র হয়ে পড়লো যে একজন গণৎকার এসেছে, সে

নাকি গণনা করে লোকের ভূত ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারে। এখন সেই রাজ্যের যে মন্ত্রী, তাঁর একটি কন্যা ছিল, মেয়েটির বিয়ের পরই জামাই কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে চলে যায়। এখন মেয়েটি বেশ ডাগর হয়ে উঠেছে, তাই বাবা মা'ব ভাবনার সীমা ছিল না। বলরামের নাম ডাক শুনতে পেয়ে মন্ত্রী তাঁর মেয়েটিকে দেখাবার জন্যে বলরামকে একদিন ডেকে পাঠালেন। বলরাম এসে মন্ত্রীকন্যার হাত দেখে বল্লেন "মন্ত্রী মহাশয় আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন দেখছি, আর তিন দিনের মধ্যেই আপনার জামাইটি ফিরে আসছেন। আমার গণনা কখনও নিষ্ফল হয় না, আপনারা সব নিশ্চিন্ত থাকুন।" মন্ত্রী শুনে খুব খুশী হয়ে একটি মোহর দক্ষিণা দিয়ে গণকঠাকুরকে বিদায় করলেন। এদিকে বলরাম করলে কি, তিন দিনের দিন রাত্রে খুব জাঁকজমক করে জামাই সেজে মন্ত্রীমহাশয়ের বাড়ী এসে হাজির হ'ল। একে রাত্তিরবেলা, তায় জামাই বহুকাল নিরুদ্দেশ ছিল, তাই সকলে ভাবলে সত্যই মন্ত্রীর জামাই এসেছেন। তখন বলরামের আদর অভ্যর্থনার ভারি ধূম পড়ে গেল। জামাই সেজে বলরাম খুব এক পেট চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় ভোজন ক'রে অনেক রাত্রে ঘরে শুতে গেল। গিয়ে দেখে মন্ত্রীকন্যা সেজেগুজে একগা হীরে মতীর গহনা পরে পালঙে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন। এমন সুযোগ কি ছাড়তে আছে ; বলরাম তখন তাড়াতাড়ি মন্ত্রীকন্যার গা থেকে সব গহনাগুলি খুলে নিয়ে চম্পট দিলে।

এদিকে সকালবেলা মন্ত্রীর নিরুদ্দেশ-জামাই ফিরে এসেছেন শুনে সকলে জামাই দেখতে এসে দেখে যে জামাই নেই, তখন মন্ত্রী মহাশয়ের বাড়ীতে মহা হৈ চৈ পড়ে গেল। এদিকে মন্ত্রীকন্যা, লজ্জায় মরে যান। তখন গণকঠাকুরের আবার ডাক পড়লো, বলরাম গণকঠাকুরের বেশে আবার এসে দর্শন দিলেন। মন্ত্রীমহাশয়ের বলরামের কথায় ভারি বিশ্বাস হয়েছিল, তিনি বলবামকে দেখেই দুই হাতে পা জড়িয়ে ধবলেন। বলরাম তখন খুব গম্ভীর হয়ে বল্লেন "আপনি এত ব্যস্ত হলে তো চলবে না। আপনার জামাই এসে যে আবার পালাবেন. তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। যাক আপনি সেজন্য কোনও চিন্তা করবেন না. তিনি আবার শীঘ্রই ফিরে আসছেন, এবার আর কোথাও যাবেন না। আমার গণনা কখনও মিথ্যা হতে পারে না।" মন্ত্রীমশায় বলরামের কথা এবারও বিশ্বাস করলেন। এদিকে মন্ত্রীমহাশয়ের ঘরে তাঁর বুড়ী মা ছিল, সে বুড়ী তাড়াতাড়ি গণকঠাকুরকে হাত দেখাতে এল। বলরাম বুড়ীর হাতখানি দেখেই জিব কেটে বলে উঠলো "ইঃ ! আপনার দেখছি ভারি জোর কপাল, আপনি একেবারে সশরীরে স্বর্গে গমন করবেন।" বুড়ী অবাক হয়ে বলরামের মুখপানে খানিক ফ্যাল ফ্যাল চেয়ে রইল, তারপর বল্লে "মানুষের কি আবার সশরীরে স্বর্গলাভ হয় ? তা বাবা ! তুমি মানুষ নও, দেবতা, তোমার অসাধ্য কর্ম কিছুই নেই, মনে কল্লেই সব করতে পার। এখন কেমন করে আমার সশরীরে স্বর্গলাভ হবে সেটাও বল দেখি বাবা !" বলরাম বল্লে "এই আসছে অমাবস্যায়, ঠিক রাত দুপুরে, শিবমন্দিরের পেছনে যে বাগান আছে, সেইখানে আপনি একলা যাবেন, সেখানে স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব আপনাকে দর্শন দিয়ে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যাবেন।" বুড়ীর মনে তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। সে ঠিক সেই অমাবস্যার রাত দুপুরে সেই বাগানে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এদিকে বলরাম কলুর ঘানিগাছ থেকে একটা বলদ চুরি করে সেই বলদে চেপে কতকগুলা ছাইভস্ম মেখে, মহাদেব হয়ে বুড়ীকে এসে দর্শন দিলেন। একে অমাবস্যার রাত্রি ঘোর অন্ধকার, তায় বুড়ী চোখে একটু কম দেখে, বলরামকে দেখে সে স্বয়ং মহাদেব এসে উপস্থিত হয়েছেন ভেবে ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে দণ্ডবৎ করতে লাগলো ! তখন মহাদেব বল্লে "বুড়ী ! তোর কি বর চাই বল।" বুড়ী ভক্তিতে একেবারে গদ গদ হ'য়ে হাতজোড় করে বল্লে "বাবা আমি আর

কিছুই চাই না, কেবল সশরীরে স্বর্গে যেতে চাই।"

মহাদেব তখন তথাস্তু করে বল্লেন, "আচ্ছা, আমি এখনি তোকে স্বর্গে নিয়ে যাব, কিন্তু স্বর্গে যাবার রাস্তাটা বড়ই খারাপ, একেবারে সশরীরে স্বর্গে যাওয়া তো সহজ ব্যাপার নয়। তুই বুড়ো মানুষ, এত কষ্ট কি বরদাস্ত করতে পারবি ?"

বুড়ী কাতর হয়ে বল্লে "তা আমি খুব পারব। মহাদেব বল্লেন "আচ্ছা বেশ কথা, তুই তবে চোখ বুজে আমার বলদটার ল্যাজ খুব শক্ত করে ধরে থাক, আমি তোকে স্বর্গে নিয়ে চলি। কিন্তু সাবধান, আমি যতক্ষণ না বলি, ততক্ষণ খবরদার যেন চোখ খুলিস নি, তা হলে একেবারে সোজা নরকে গিয়ে পড়বি।" বুড়ি তখন বলদের ল্যাজটা চোখ বুজে খুব শক্ত করে চেপে ধরে রইল। আর বলরাম কল্লে কি, বলদটাকে নিয়ে গিয়ে সেই কলুর ঘানিগাছে লাগিয়ে দিয়ে আপনি সরে পড়লো। এদিকে বুড়ী বেচারী চোখদুটি বুজে, বলদের ল্যাজটি দু'হাতে প্রাণপণ ধরে চৌপর রাত সেই ঘানিগাছে ঘুরছে। সে ল্যাজও ছাড়ে না আর ঘুরুনিও থামে না। এমনি করে সকাল হয়ে গেল। এমন সময় কলু এসে বুড়ীকে সেই অবস্থায় দেখে একেবারে আশ্চর্য হয়ে "এ কি কাণ্ড ! মন্ত্রী মশায়ের মা এখানে বলদের ল্যাজ ধরে এমন করে ঘুরছেন কেন ?" বলে চেঁচিয়ে উঠলো।"

কলুর কথা শুনে চোখ খুলেই তো বুড়ীর একেবারে চক্ষুস্থির। তখন কলু বুড়ীকে মন্ত্রী মহাশয়ের বাড়ী রেখে এল। তখন মন্ত্রীমশায়, এসব যে জুয়াচোরের কাণ্ড তা বুঝতে পেরে, রাজাকে গিয়ে জানালেন। মন্ত্রীর বাড়ীতে একটা জুয়াচোর এসে এমন সব অদ্ভুত কাণ্ড করে গেল, আর কেউ তাকে ধরতে পারলে না ? রাজা তখনই সেই জুয়াচোরকে ধববার জন্য চারিদিকে কড়াক্কড় পাহারা বসিয়ে দিলেন, আর রাত্তির বেলা আপনি ঘোড়সওয়ার হয়ে চারিদিকে তদারক করে বেড়াতে লাগলেন। এদিকে বলরাম সেদিন রাত্রে রাজবাড়ীর কাছেই একটা গাছতলায় সন্ন্যাসী সেজে ধুনি জ্বালিয়ে বসেছিল, রাজাকে ঘোড়ায় করে সেদিকে আসতে দেখেই সে তাড়াতাড়ি বল্লে "মহারাজ ! জুয়াচোর ধরা কি আপনার কাজ ? আপনার যে বীরের মত চেহারা, আপনাকে এমন করে খোলা তরোয়াল হাতে বেড়াতে দেখলে সে জুয়াচোর ব্যাটা কখনই ধরা দেবে না—ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং আপনি আমার পোশাক পরে এই গাছতলায় বসে লক্ষ রাখুন, আর আমি আপনার ঘোড়ায় করে পাহারা দিয়ে বেড়াই। তা হলে জুয়াচোরটা যেদিক দিয়েই আসুক না কেন ধরা পড়তেই হবে।" রাজা বলরামের কথায় কোন রকম সন্দেহ না করে, সন্ন্যাসী সেজে বসে রইলেন, আর বলরাম এদিকে রাজার পোশাক পরে ঘোড়ায় করে এসে রাজার একজন চাকরকে ডেকে বল্লে, "দেখ্ তুই একবার রাণীর কাছে যা, গিয়ে তাঁর মুক্তোর সাতনর মালা ছড়াটি আর ধনাগারের চাবি আমায় এখনি এনে দে ; যেরকম জুয়াচোরের ভয় হয়েছে। সময় থাকতে সাবধান হওয়া ভাল।" একে রাত্তির বেলা, আর বলরাম রাজার পোশাক পরেছিল, তাই চাকরটা বলরামকে চিনতে পারলে না, সে তৎক্ষণাৎ রানীর সাতনর মালা আর ধনাগারের চাবি চেয়ে এনে দিলে। বলরাম সেগুলি আত্মসাৎ করে তখনি উধাও হ'ল। এদিকে মহারাজ অনেকক্ষণ ধুনি জ্বালিয়ে জুয়াচোরকে ধরবার আশায় বসে বসে অবশেষে বিরক্ত হয়ে অন্তঃপুরে এলেন। রাজাকে সন্ন্যাসীর বেশে দেখে রাণী একেবারে আশ্চর্যি হয়ে বল্লেন, "একি ? তোমার এ দুর্গতি কে করলে ?" রাজা বল্লেন "সে কথা পরে বলছি, এখন তোমার গলার মুক্তোর মালা ছড়াটি যে দেখছি না, সেটা কোথায় রাখলে ? যে রকম জুয়াচোরের দৌরাত্ম্য হয়েছে, সাবধান করে রেখ।" রাণী তখন অবাক হয়ে গেলেন ; বল্লেন "সে কি কথা ? এই যে এখনি তুমি আমার মুক্তোর মালা আর ধনাগারের চাবি

সাবধান করে রাখবে বলে চাকরের হাতে চেয়ে পাঠালে, এখন আবার এ কি বলছো ?"

রাজা তখন একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, এ জুয়াচোর তো সামান্য নয়। রাজা পরদিন রাত্রে আরও বেশী করে পাহারার বন্দোবস্ত করলেন আর ধনাগারে যাবার পথে একটা মানুষ ধরবার ফাঁদ পেতে সেখানে মন্ত্রীকে বসিয়ে রাখলেন। এদিকে বলরাম কোথা থেকে এক রাজকন্যার বেশ ধরে এসে মন্ত্রীকে বল্লে "মন্ত্রীমশায়, আজ চোর ধরবার জন্যে যে ফাঁদ পাতা হয়েছে, বাবা আমায় তাই দেখতে বল্লেন।" মন্ত্রীমশায় ত রাজবাড়ীর মেয়েদের চেনেন না, তাই তিনি বলরামকে সত্যসত্যই রাজকন্যা মনে করে তাঁকে মানুষধরা-ফাঁদ দেখাতে নিয়ে গেলেন।

বলরাম ফাঁদ দেখে যেন অবাক হয়ে বল্লে "ওমা ! এই বুঝি ফাঁদ ? আচ্ছা এই ফাঁদে মানুষ কেমন করে পড়ে। আপনি আমায় দেখান না। মন্ত্রী মহাশয় কি করেন, রাজকন্যার কথা তো অমান্য করতে পারেন না, কাজেই তখন তিনি সেই ফাঁদে পা দিয়ে বল্লেন "চোরটা এমনি করে ফাঁদে পা দেবে"—"আর এমনি করে বুঝি আপনি ফাঁদটা বন্ধ করে দেবেন" বলেই বলরাম ফাঁদের দড়িটায় এক টান দিলে, অমনি ফাঁদের মুখটা বন্ধ হয়ে গেল। তখন বলরাম সেই ধনাগার থেকে যত পারলে ধনরত্ন নিয়ে চম্পট দিলে। পরদিন সকালে, সকলে মিলে চোর দেখতে এসে দেখলেন মন্ত্রীমশায় ফাঁদের মধ্যে পুঁটুলী পাকিয়ে পড়ে রয়েছেন। জুয়াচোরের অদ্ভুত বুদ্ধি কৌশল দেখে সকলেই একেবারে অবাক হয়ে গেল। তখন আর কোনও উপায় না দেখে রাজা নগরে ঢোল পিটিয়ে দিলেন যে "এই জুয়াচোর যেই হোক, আমার সভায় এসে দেখা করুক, আমি তার কাছে পরাজয় স্বীকার করছি।" এই না শুনে বলরাম রাজপুত্রের বেশ ধারণ করে রাজার সুমুখে এসে বল্লে "মহারাজ, আমিই সেই জুয়াচোর।" রাজা তখন বলরামের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় সে আপনার মাতামহকে নমস্কার করে বল্লে "মহারাজ ! আমি আপনার দৌহিত্র, আপনি আমার পিতাকে বিনা দোষে বিনা বিচারে শাস্তি দিয়েছিলেন, আর আমার অনাথিনী মাকেও রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এখন রাজার চেয়ে যে জুয়াচোরের বুদ্ধি বেশী তা বোধহয় খুব জানতে পেরেছেন।"

তখন রাজা বলরামের উপর ভারি সন্তুষ্ট হয়ে বলরামকে আপনার রাজ্য দান করলেন, আর কন্যাকে আবার সাত আদরে ঘরে নিয়ে এলেন।

পূর্ণশশী দেবী

১৩২৪ সন

ভিখারীর দান

পৌষ মাস যেমন চিরদিন আসে, এবারেও তেমনি প্রচুর শীত লইয়া আসিয়াছিল। কয়দিন হইতে বর্ষা পড়িয়া সেদিন সবে মাত্র বৃষ্টি থামিয়াছে ; উত্তরে বাতাস যেমন জোর, তেমনি ঠাণ্ডা। এ সময়ে বাতাসটা উত্তরে না হইয়া যদি দক্ষিণে হইত, দেশের শ্মশানের চিতাগুলা বোধহয় নির্বাপিত হইবার অবকাশ পাইত না।

সন্ধ্যা হয় হয়, ভবতারণ মাঠের পথ ধরিয়া দূরবর্তী গ্রাম হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল ; তাহার ঠাণ্ডা হাত দু'খানা শীতে নীল হইয়া গিয়াছিল, পুরাতন অর্দ্ধছিন্ন পিরান্‌টার ভিতরে অন্তঃকরণটাও বোধ হয় শীতে জমিয়া গিয়াছিল ; পায়ে শততালিযুক্ত ছিন্ন জুতাজোড়াটার

ভিতর দিয়াও পথের ঠাণ্ডা আক্রমণ করিতেছিল। চলিয়া বেড়াইলে শীত কম হয়। ভবতারণ যে খুব জোরে চলিতেছিল, তাহা নহে, বরং যতটা জোরে চলা তাহার উচিত ছিল, তদপেক্ষা আস্তেই সে চলিতেছিল। তাহার কারণ, সে বহুক্ষণ হইতেই পা দুইখানার উপর যথেষ্ট জুলুম করিয়া আসিয়াছে। মন তাহার বাড়ীর কাছে ছুটিয়া চলিলেও পা' দুইখানা ছুটিতে একেবারেই রাজি ছিল না। সহরের একটা কাজের খবর পাইয়া এক পয়সার মুড়ি ও একটা কাঁচা লঙ্কা দিয়া আহার শেষ করিয়া সে সকালে সাতটার সময়ে সেই যে বাড়ীর বাহির হইয়াছে, এখন সন্ধ্যা সাতটা—এই বার ঘণ্টার মধ্যে সে একবার ঠাণ্ডাজল খাইয়া লইয়াছে। সুতরাং সে যে কিছু খায় নাই, এমন কথাও বলা যায় না। যে কাজের জন্য গিয়াছিল, তাহা না পাইয়া নিরাশার মধ্যেও ভবিষ্যতের জন্য আশা জাগাইয়া সে এখন নিশ্চিন্ত ভাবেই বাড়ী ফিরিতেছিল। প্রায় আট সপ্তাহ সে বাড়ীতে বসিয়া আছে—এই আট সপ্তাহের মধ্যে একটি পয়সাও সে রোজগার করিতে পারে নাই। তবু একেবারে যে উপবাস যায় নাই, এইটুকুই তাহাদের পরম লাভ। কিন্তু কাল ! কাল যে কিভাবে তাহাদের দিন রাত্রি কাটিবে, সে সম্বন্ধে ভবতারণের কিছু ভাবিয়া দেখিবার ইচ্ছা হইতেছিল না, কারণ, সে ভাবনাটায় আশার আলো পড়িবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

এমন দিন গিয়াছে, যখন সে দালালী করিয়া মাসে ষাট সত্তর টাকা উপার্জন করিয়াছে। তখন তাহারা বারো টাকা বাড়ী ভাড়া দিয়া বাস করিত ; কাজ করিবার জন্য একজন ঝিও ছিল। যুদ্ধ বাধিল—দালালী কাজে আর এক পয়সাও উপার্জন হয় না, তাহার উপর ছয় মাসের ছেলেটির ডবল নিউমোনিয়া হইল। সর্বস্ব ব্যয় করিয়া ভবতারণ মৃত্যুর কবল হইতে ছেলেটিকে ছিনাইয়া লইলেও অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়া পাইল না—ছেলেটি জড়ভরতের মত পঙ্গু হইয়া গেল। তিন বৎসর ধরিয়া পিতামাতার অক্লান্ত সেবা, যত্ন, চিকিৎসাতেও বালক আর তাহার পূর্বাবস্থা ফিরিয়া পাইল না। পুত্রের চিকিৎসা ও পথ্যে ভবতারণ ঘরের ঘটীবাটীটা বিক্রি করিয়াছে, কাহারও কোনও নিষেধ-উপদেশ গ্রাহ্য করে নাই। আজ সে পথের ভিখারী, একটা পয়সাও তাহার সম্বল নাই ! শত চেষ্টাতেও কাজ যোগাড় হইল না ; এমন করিয়া আর কতদিনই বা কাটিবে !

মাঠের পথ ছাড়িয়া সে এইবার সহরের পথে আসিয়া পড়িযাছে। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে ; দোকানের আলো পথে পড়িয়া পথিকের সাহায্য করিতেছে। রাস্তা দিয়া একজন ভদ্রলোক সান্ধ্য ভ্রমণ সারিয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চতুর্দিকে "দেল্‌খোসে"র গন্ধ ছড়াইয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। ভবতারণ একবার লক্ষ্যশূন্যভাবে সেই মোটাসোটা ভদ্রলোকটির পানে চাহিয়া দেখিল। ভবতারণ তখন যন্ত্রচালিতের মতই চলিতেছিল—সে যে পথ দিয়া চলিতেছিল সে পথের দৃশ্যাবলী তাহার চোখে পড়িতেছিল না। পাশ দিয়া দু'খানা মোটর সশব্দে চলিয়া গেল। ঘড়্-ঘড়্ ছড়্-ছড়্ শব্দ করিয়া কয়েকখানা ছ্যাকড়া গাড়ীও চলিয়া গেল। পাদচারীর সংখ্যা খুব বেশী ছিল না,—কারণ, সে শীতে অত রাত্রে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য ছাড়া সখ করিয়া কেই বা পথ হাঁটিবে ! ভদ্রলোকটি ভবতারণের কৃশ দেহ বিষণ্ণ মুখের পানে চাহিয়া সহসা কি মনে করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া ভবতারণকে উদ্দেশ করিয়া ডাকিয়া কহিলেন,—"ওহে শুনচ, তোমায় দেখে মনে হচ্ছে তোমার বড় খিদে পেয়েছে ;—এই টাকাটা নিয়ে কিছু কিনে খাও গে।"

ভবতারণের নিজের কর্ণকে বিশ্বাস হইতেছিল না, তবুও সে নিজের অজ্ঞাতে যন্ত্রচালিতের মত হাত পাতিয়া টাকাটা গ্রহণ করিল। ভিক্ষা ! জীবনে আজই সে প্রথম ভিক্ষা করিল। তবু ইহার হীনতা বোধ করিবার শক্তি তাহার আজ ছিল না। ভিক্ষা না হইলে

কাল তাহারা স্ত্রী পুরুষে উপবাসী ত থাকিবেই, তাহার উপর সেই বোধশক্তিহীন জড় পুত্তলী—সেও যে অনশনে মরণাপন্ন হইবে। এ অবস্থায় মানের কান্না কাঁদিবার তাহার আর অবসর কোথায়! দাতাকে মুখ ফুটিয়া সে আশীর্বাদ করিতে পারিল না—করিবার শক্তিও তাহার ছিল না; তবু সেই অর্দ্ধ অন্ধকারে দাতা যদি তাহার মুখের দিকে চাহিতেন, তবে দেখিতে পাইতেন যে, সে মুখে কৃতজ্ঞতার যে গভীর চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার দানের সার্থকতা হইয়াছে।

দাতা কিন্তু গ্রহীতার মুখের সে করুণ কৃতজ্ঞতার ছবি লক্ষ্য করিলেন না। বাড়ী পৌঁছিবার পূর্বেই তাঁহার সে দয়ার ঝোঁকটি উবিয়া গিয়া মনে মনে একটা অনুশোচনা জাগিয়া উঠিল। পথে ভিখারীকে ভিক্ষা দিলে দরিদ্রকে আরো দরিদ্র করা হয়,—আলস্যের প্রশ্রয় দিলে মনুষ্যত্বের অবমাননা করা হয়,—এমনি সব মন্তব্য তিনি চিরদিন প্রচার করিয়াছেন; আজ সহসা চিত্তদৌর্বল্যের ফলে চিরদিনের সংস্কারের বিপরীত পথে চলিয়া কৃতকার্যের জন্য মনে মনে অনুতপ্ত হওয়ায় সারা সন্ধ্যাটা তিনি অত্যন্ত অশান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন।

ভবতারণ কিন্তু দাতার মনে কতখানি দুঃখ দিল, না বুঝিয়াই সম্পূর্ণ পরিবর্তিত নেত্রে পৃথিবীর পানে চাহিয়া দেখিল। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে চকচকে রৌপ্যখণ্ডটি তাহার চোখে অমূল্য মাণিকখণ্ডের মতই মূল্যবান বোধ হইতে লাগিল। তাহার কঠিন স্পর্শে গন্তব্য পথ যেন সুগম করিয়া দিল—ঘণ্টায় সে তিন মাইল পথ চলিতে লাগিল। তাহার ক্ষুদ্র গৃহে এই ক্ষুদ্র দ্রব্যটিই যে আজ কত আনন্দের সৃষ্টি করিবে, ভাবিতে তাহার সমস্ত দেহ পুলকে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। পথে মনহারীর দোকানে, কাপড়ের দোকানে দরজা বন্ধ হইতে ছিল, খাবারের দোকানগুলা তখন খোলা;—বাদাম তেল ও মিশ্রিত ঘিয়ে ভাজা গরম লুচি কচুরীর গন্ধ ভবতারণের ক্ষুধা বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছিল। রূপার চাকতির স্পর্শ ক্রমেই তাহার মনের গরম জুড়াইয়া জঠরানল জ্বালাইয়া তুলিতেছিল। মনে হইতেছিল, সে বুঝি টাকাকে আর সম্পূর্ণ অবস্থায় বাড়ী লইয়া যাইবার সংকল্প রক্ষা করিতে পারে না!—প্রাণপণ চেষ্টায় সে ক্ষুধাকে জয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

নির্মল শীতের আকাশে খণ্ডচন্দ্র ভাসিয়া চলিয়াছে। নক্ষত্রগুলাও জ্যোতির্ময়; কিন্তু সে শোভা দেখিবার সামর্থ্য ভবতারণের ছিল না। অবস্থা অনেকদিন হইতেই তাহাকে নীচু পানে চাহিয়া চলিতে অভ্যস্ত করিয়াছিল। লোভনীয় জিনিস না দেখিলে মনের অভাব অনেক কমিয়া যায়।

এইবার সে সহরের পথ ছাড়াইয়া তাহার বাড়ীর অপরিচ্ছন্ন গলির পথে আসিয়া পড়িল। পা' দুইখানা চলিতে চাহিতেছিল না—সে যেন মাতালের মত টলিতেছিল। সামনেই অনেকগুলা খোলার ঘর; তাহারই একখানা ঘরের দরজার কাছে আসিয়া সে দাঁড়াইল। দোর খোলাই ছিল, ডাকাডাকির প্রয়োজন হইল না। গোময়লিপ্ত ছোট উঠানটিতে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। সামনের উঁচু রকটুকু পার হইলেই একখানিমাত্র ঘর। এ ঘর ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। ঘরের অধিবাসী বোধ হয় তাহার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল,—কারণ, ভবতারণ দাওয়ায় উঠিতেই ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া নারীকণ্ঠে মৃদু আহ্বান আসিল,—"ভেতরে এস; এত রাত হ'ল?" ঘরের ভেতর ঘোর অন্ধকার; একমাত্র কাঠের জানালাটি বন্ধ আছে। কাগজ আঁটিয়া তাহার ভগ্ন অংশটুকুও শীতনিবারণোদ্দেশে ঢাকা দেওয়া হইয়াছে। ভবতারণ অন্ধকারে দেওয়ালের কাছে মাটীতে বসিয়া পড়িল এবং ধীরে ধীরে দেওয়ালে মাথা রাখিয়া হেলান দিল; মনে হইতেছিল, এখনি মূর্চ্ছা যাইবে। অন্ধকার ঘরের অপর অংশ হইতে ক্ষীণস্বরে উচ্চারিত হইল,—"কিছু পেয়েছ? কোন

সুবিধা হ'ল ?" ভবতারণ বলিল,—"চৌষট্টি পয়সা।"

সে এক টাকা না বলিয়া চৌষট্টি পয়সা কেন বলিল, তাহা সেই জানে ; খুব সম্ভবত বেশী শুনাইবে, এইটুকুই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। ক্লান্তিতে তাহার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তবে স্বরে তীব্রতার আভাগ্য ছিল না। মৃদু খস্-খস্ শব্দের সহিত ঘরে দেশলাই জ্বালিলে দেখা গেল, তৈলহীন দীপে আধখানা শলিতা পড়িয়া আছে। তবু সেই ক্ষীণালোকে দরিদ্র গৃহের সব দারিদ্র্য সুস্পষ্ট-রূপে প্রকাশ হইয়া পড়িল। ঘরের কোণে ঠাণ্ডা মাটীতে একখানা ছেঁড়া কাঁথার বিছানা। মাথার বালিশের অভাবে একখানা ছেঁড়া-চট পাকাইয়া বালিশ করা ; একখানি কাঁথায় শুইয়া ও একখানি ছেঁড়া কাঁথা ঢাকা দিয়া একটি ছোট ছেলে অকাতরে ঘুমাইতেছে। একটি কোণভাঙ্গা পাথর, একটি পিতলের গেলাস, দু'টি এনামেলের বাটী আর কয়েকটি মাটীর ভাঁড় খুরী, এই গৃহের আসবাব।

ভবতারণের স্ত্রী হেমাঙ্গিণী ময়লা, কৃশ। মুখের মধ্যে চোখ দুটি ডাগর ও উজ্জ্বল, গড়নটা কাটকাট। ভবতারণ মনে করিত, ভাল খাওয়া পরা হইলে ওই আবার সুন্দরী আখ্যালাভ করিত।

হেমাঙ্গিণী বলিল,—"একটু আগুন করব কি ? আজ খানকতক কাঠ কুড়িয়ে এনেছি, বেশ শুকনো কাঠ—" বলিয়া স্বামীর অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই সে উনানের কাছে বসিয়া কাঠ ধরাইতে আরম্ভ করিল। উনান ধরাইয়া প্রদীপটি নিভাইয়া দিল,—একসঙ্গে দুইটা অপব্যয় তাহারা বহুদিনই ছাড়িয়া দিয়াছে।

স্বামীর পানে চাহিয়া হেমাঙ্গিণী বলিল, "খোকার একটু দুধ, আর তোমার জন্যেও কিছু আন্‌লে হ'ত। সেই ত কোন্ সকালে দু'টো মুড়ি খেয়েছ ! দোকান বন্ধ হয়ে যা'বে।"

ভবতারণ উঠিয়া দাঁড়াইল, তা'রপর নিঃশব্দে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু বিধাতা যাহার প্রতি বাম, তাহার পোড়া মাছও পলাইয়া যায় ! ভবতারণের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিল। দোকানের পথে চলিতে গিয়া সে বাধা পাইয়া দাঁড়াইল। একটি আট নয় বছরের ছেলে পথে বসিয়া আকুলভাবে কাঁদিতেছিল। তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ভবতারণ বলিল,—"কি রে শ্যাম, কাঁদছিস্ কেন ?" ছেলেটি তাহার অপবিচিত নয়। বাপ-মা-মরা অনাথ বালক গ্রামেরই এক ধনবানের বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়াছিল। বালকের আশ্রয়দাতা কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠুর, উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক। শ্যাম ভবতারণের স্নেহপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমি তেলের শিশি ভেঙ্গে ফেলেছি। বাবু আমাকে মেরে ফেলবেন।"

ভবতারণ এইবার অনুভব করিল, তাহার চারিদিকে সিক্ত মৃত্তিকা ভেদ করিয়া যে স্নিগ্ধ মিষ্ট গন্ধ নির্গত হইতেছিল, তাহা ফুলের গন্ধ নহে, তাহাই ঐ হতভাগ্যের নির্য্যাতনের মূল। সে নত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কত দাম রে ?" "এক টাকা। ওগো ঠাকুর ! আমার যে একটা পয়সাও নেই। এই দেখ না কাল একটা কাঁচের গেলাস ভেঙ্গে ফেলেছিলুম ব'লে সেই ভাঙ্গা কাঁচ দিয়ে মাথায় কি রকম মেরেছেন।"

ভবতারণের দৃঢ় মুষ্টি শিথিল হইয়া তাহার হাতের ভিতরের রৌপ্যখণ্ডটি কেমন করিয়া যে বালকের হাতে পৌঁছাইল, তাহা সে নিজেই ঠিক বুঝিতে পারিল না, মৃদুস্বরে বলিল,—"আর একটা তেল কিনে নিয়ে যা।" শ্যাম দুই হাতে ভবতারণের পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া দোকানের দিকে চলিয়া গেল। আর ভবতারণ সেইখানেই বসিয়া পড়িল। "কুন্তলীনে"র ভাঙ্গা শিশিটা একবার সে হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, তা'রপর সেটা পথের পাশে ফেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে আবার বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

ঘরে কাঠের আগুন উজ্জ্বল করিয়া দিয়া হেমাঙ্গিনী স্বামীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহাকে খালি হাতে ফিরিতে দেখিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হ'ল ? দুধ পেলে না ?" ভবতারণ বলিল, "পয়সা খোয়া গেছে।" সে বলিতে সাহস করিল না যে, টাকাটা দান করিয়াছে। হেমাঙ্গিনী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"যাক—ভগবান না দিলে কোত্থেকে আসবে ! পুরুতমামা লক্ষ্মীর প্রসাদ দিয়ে গেলেন। তুমি আগে কিছু খাও, তবে খোকাকে তুলব।"

আবার সেই অনুজ্জ্বল দীপ জ্বালিয়া এক টুক্‌রা কলাপাতার উপর সে স্বামীর জন্য খাদ্যদ্রব্য সাজাইয়া দিল, দু'টি ভিজা মুগের ডাল, একটুখানি চিনি, একটুকরা ছানা, কয়েকখানি কুচা ফল।

ভবতারণ হাত জুড়িয়া উর্দ্ধনেত্রে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিল—"এ তোমার কি করুণা মা ! দিনরাত নিজের ভাবনা ভাবি ব'লে তুমি আমার ভাবনা ভাব না ; যেই নিজের কথা ভুলে গেলুম, অম্‌নি তোমায় মনে পড়ল !"

প্রতিভা দেবী

দাদা

"মায়া, মায়া, ও মায়া !" অরুণ সিঁড়ি হইতে ডাকিতে ডাকিতেই বারান্দায় উঠিল। মায়া জানালা হইতে অরুণকে গেটে দেখিয়া নীচে নামিতেছিল। সে অরুণের আহ্বানে একরকম ছুটিয়া আসিয়াই পর্দা সরাইয়া দ্বার প্রান্তে দাঁড়াইল। তাহার মুখে উল্লাস ও হাসি ফুটিয়া উঠিল। অরুণ কি বলিতে যাইতেছিল, মায়া বাধা দিয়া বলিল, "তোমার এত দেরী হলো কেন দাদা ?"

অরুণ সে কথার জবাব না দিয়া বলিয়া উঠিল, "একটা সুখবর আছে রে মায়া।" দাদার সুখবরটা শুনিবার জন্য মায়া যে একটুও ব্যগ্র হইল না, এমন নহে ; তবে সে দাদার শ্রান্তিবিবর্ণ মুখপানে চাহিয়াই সে ব্যগ্রতাটুকু অনায়াসে দমন করিয়া ফেলিল। যদিও সে বালিকা এবং এখন পর্যন্ত চতুর্দশের সীমা রেখাটিও লঙ্ঘন করিতে পারে নাই, তথাপি তাহার হৃদয়ে স্বাভাবিক সহানুভূতি ও সেবাপ্রিয়তা ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে নারীত্বের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল। সে বয়স্কা গৃহিণীর মতই গম্ভীরভাবে আদেশের সুরে বলিল, "খবর টবর পরে শোনা যাবে। শীগ্‌গির এখন কাপড় ছেড়ে এস, আমি তোমার খাবার আনছি।" সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেল। যদিও পারিবারিক আইন ছোটবোনের শাসন-ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপেই বড় ভাইকে দিয়াছে, তথাপি মায়ার কোন কথার প্রতিবাদ করার মত সাহস অরুণ কোনদিনই সঞ্চয় করিতে পারে নাই, আজিও পারিল না।

অরুণ হাত মুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া আসিয়া দেখিল, মায়া টেবিলের উপর খাবার রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অরুণ শান্ত সুবোধ বালকের মত চেয়ারখানিতে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। তখন মায়া বলিল, "এখন তোমার সুখবরটা বল ত, শুনি।"

ভরসা পাইয়া অরুণ হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, তুই আন্দাজ ক'রে বল দেখি, খবরটা কিরকম হতে পারে ?" মায়া বলিল, "আমি তা কি ক'রে বলব ?" তারপর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "বলতে পারলে কি দেবে আমায় ?"

"যা চাইবি তাই দেব।"
"একটা যূঁই-গন্ধ "কুন্তলীন" দেবে।"
"আচ্ছা, তাই দেব। এখন বল।"
"সে দিন যে বইখানার প্রশংসা করছিলে—নামটা মনে আসছে না—সেইখানা কিনে এনেছ। নয় ?" অরুণ হাসিয়া উঠিল, বলিল, "পারলিনে পারলিনে, হেরে গেলি।"
অপ্রত্যাশিত পরাজয়ে মায়া মুখ ভার করিয়া একখানা চৌকি টানিয়া বসিয়া পড়িল। অরুণের আহার শেষ হইয়াছিল। সে উঠিয়া এক হাতে মায়ার হাতখানি তুলিয়া লইয়া, অন্য হাত তাহার কাঁধের উপর রাখিয়া বলিল, "হেরেছিস ব'লে দুঃখ করতে হবে না আর, কালই "কুন্তলীন" এনে দেব। এই দেখ্, কি এনেছি।" এই বলিয়া অরুণ পকেট হইতে একটি ক্ষুদ্র চামড়ার বাক্স বাহির করিয়া খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিল। মায়া মুহূর্তে পরাজয় বেদনা ভুলিয়া জিনিষটা দেখিবার জন্য টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। চামড়ার বাক্সের মধ্যে সুন্দর একজোড়া ব্রেসলেট্। মায়া ব্রেসলেট্-জোড়াটি হাতে তুলিয়া ধরিযা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "এ এনেছ কেন ?"
"তোর জন্যে" এই বলিয়া অরুণ মায়ার হাতে ব্রেসলেট্ পরাইয়া দিতে উদ্যত হইল। মায়া দূরে সরিয়া গিয়া বলিল, "কি আমার জন্য ! আমি কি ব্রেসলেট্ চেয়েছিলাম ? আমার কাছে একবার না জিজ্ঞেস করেই এমন দামী জিনিসটা নিয়ে এলে কোন্ সাহসে ? তুমি বড় অপব্যয়ী—বড় স্বাধীন হয়ে উঠেছ। আমি ওটা কিছুতেই নেব না,—ফিরিয়ে দিয়ে এস, নয় ফেলে দাও গে।"
"তোর হাতের চুড়িগুলা পুরনো হয়ে গেছে কি না, তাই"—
"আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাইনে।"
"আমি তোর দাদা না হয়ে, তুই আমার দিদি হলে বেশ মান্‌ত। কিন্তু কি করা,—বিধাতার ভুল।"
মায়া জানালার কাছে যাইয়া সেলাই লইয়া বসিল, অগত্যা অরুণও একখানা বই খুলিয়া চোখের কাছে রাখিল। কয়েক মিনিট পরে মায়া "উহু" বলিয়া সেলাইটা কোলের উপর ফেলিয়া রাখিল। অরুণ হাতের বইখানা সশব্দে টেবিলের উপর ফেলিয়া মায়ার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে মায়া ?" মায়া আঙ্গুলে সূচ বিঁধিয়াছিল, ক্ষতমুখে একবিন্দু রক্ত। অরুণ তাড়াতাড়ি নেকড়া ভিজাইয়া ক্ষতস্থানে জড়াইয়া দিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, "এখনো জ্বালা করছে নাকি ?"
মায়া সে কথার উত্তর না দিয়া হাসিয়া উঠিল। অরুণ বলিল "হাসছিস কেন ?"
মায়া বলিল, "তুমি নাকি আমার সঙ্গে আর কথা কইবে না ?"
"তুই বারণ করলি, তাই ত ও কথা বল্লাম। আয়, তোর ট্রান্সলেশনের খাতা দেখিগে।"

২

অরুণ জননীর দূরসম্পর্কিত ভ্রাতৃকন্যা মায়া যেদিন মা-বাপ হারাইয়া প্রতিপালনার্থ অরুণের জননীর নিকট আনীত হইল, সে দিনের কথা অরুণের বেশ মনে আছে ! কিন্তু মায়ার সে সব কিছুই মনে নাই। সে তখন এতটুকু শিশু ছিল। এই মা-বাপ-হারা নিরাশ্রয় শিশুটিকে দেখিয়া অরুণের মার মাতৃ-হৃদয় অনুকম্পায় ভরিয়া গিয়াছিল, তাই তিনি সাদরে মায়াকে বুকে লইয়াছিলেন। তারপর সেই অনুকম্পা কখন যে সুগভীর মাতৃ-স্নেহে পরিণত

হইয়া গেল, তাহা তিনি নিজেও বুঝিতে পারিলেন না। তিনি প্রথমে সমান সাদরে, সমান যত্নে, অবশেষে সমান স্নেহে অরুণ ও মায়াকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। মায়া আসিবার দুই বৎসর পরে অরুণের পিতার মৃত্যু হয়। তখন অরুণের পিতামহী জীবিতা। এই 'অলক্ষণে' মেয়েটাই তাঁহার পুত্রের অকালমৃত্যুর একমাত্র কারণ, এই দৃঢ়বিশ্বাসে বৃদ্ধা মায়াকে সুনজরে দেখিতেন না। মায়ার জন্য তাঁহার বংশের একমাত্র প্রদীপ অরুণের অযত্ন হইতেছে, এই ছুতায় বধূকে লাঞ্ছনা দিতেও তিনি ত্রুটি করিতেন না। কখনও কখনও তাঁহার রুদ্ধ আক্রোশ বাঁধমুক্ত প্রবাহের মত অবোধ শিশু মায়াকেও আক্রমণ করিতে ছাড়িত না। তাহার ফলে অরুণের মার মায়ার উপর মায়া আরও বাড়িয়া গেল।

এমন করিয়া অরুণের মাতার অপরিসীম স্নেহ ও অজস্র আদরের আবেষ্টনের মধ্যে মায়া দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সে যখন উচ্চ তরল হাসিতে, উদ্দাম চাঞ্চল্যে গৃহ মুখর করিয়া তুলিত, মা তখন স্নেহ-মুগ্ধ অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেন। শুষ্ক-মুকুলটি পরম জননীর করুণা-রসে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া মা তাঁহার অন্তরের সভক্তি কৃতজ্ঞতা বিশ্বজননীকে নিবেদন করিতেন। মায়া একটু বড় হইয়া উঠিলে অরুণ তাহাকে ক্ষেপাইবার জন্য মাঝে মাঝে বলিত, "তোর চেয়ে মা আমাকে বেশী ভালবাসেন।" মায়া অবিশ্বাস ও তাচ্ছিল্যের সহিত প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিত, "ইস! মিছে কথা।" অরুণ তাহার কথার যথার্থ্য প্রতিপন্ন করিবাব জন্য এমনই দু'একটা যুক্তির অবতারণা করিত যে, মায়ার ক্ষুদ্র বুদ্ধি তাহা খণ্ডন করিবার শক্তি কিছুতেই যোগাইতে পাবিত না; তখন সে সংশয়াকুল ম্লানমুখে ছুটিয়া যাইয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "সত্যি মা, আমার চেয়ে দাদাকে বেশী ভালবাস তুমি?" মেয়ের কপালে ছড়ান কালো কালো ছোট ছোট চুলের গোছাগুলি সুবিন্যস্ত কবিতে করিতে মা বলিতেন, "কে বলেছে এমন কথা?" মেয়ে বলিত, "দাদা বলেছে।" মা তখন মেয়েকে সাদরে চুম্বনে আচ্ছন্ন কবিয়া বলিতেন, "মিছে কথা।" তখন মায়া বিজয-গর্বে বুক ফুলাইয়া দাদার পানে চাহিত।

অবশেষে একদিন লোকান্তর হইতে মায়ের আহ্বান আসিল। মা তাঁহার অন্তিম-শয্যায় অরুণ ও মায়াকে কাছে বসাইয়া অরুণকে বলিলেন, "তুই বড় হয়েছিস্, লেখাপড়া শিখেছিস্, তোর জন্যে আমার কোন ভয় বা দুঃখ নেই; কিন্তু মায়া বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ হইতে ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, তিনি কোনমতে আত্মসংবরণ করিয়া গাঢ়স্বরে বলিতে লাগিলেন, "তিনি আমায় ডাক্‌ছেন, আমাকে যেতেই হবে, কোন দুঃখ করিস নে তুই। মায়া বড় অবোধ, বড় শিশু, তাকে দেখিস। তুই-ই ওর সব, কখনো ভুলিস্‌নি।

তারপর স্নেহ-সর্বস্বা মাতা শিথিল হস্তে মায়ার হাত তুলিয়া অরুণের হাতে রাখিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু বুজিলেন।

শ্মশান হইতে ফিরিয়া অরুণ দেখিল, কাতরা বিবশা মায়া অর্দ্ধমুর্চ্ছিতার মত মেঝেয় পড়িয়া আছে। অরুণ তখন ঠিক মায়ের মত মায়াকে তুলিল। মায়ার অজস্র অশ্রুধারায় অরুণের বক্ষ প্লাবিত হইতে লাগিল, আর অরুণের অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়া মায়ার এলোচুল আর্দ্র করিয়া দিল।

কয়েক মাস পরে মায়া একদিন বলিল, "দাদা আজ গয়লা টাকা চেয়েছিল, বাক্স খুঁলে দেখলাম টাকা নেই কি হবে?"

অরুণ বলিল, "পাঁচ ছ'দিন পরে পাবে, ব'লে দাও গে।"

"মা' ত এই টাকা দিয়েই সংসার চালাতেন, কারো টাকা বাকি রাখতেন না কখনো। তুমি বেশী কি খরচ ক'রে গয়লার টাকা বাকি রাখ্‌তে চাচ্ছ, আমি জান্‌তে চাই।"

"সে কি আর আমার মনে আছে ?"

"কি মনে নেই ! এই মন নিয়ে তুমি কলেজে ছেলে পড়াও ?"

ভগিনীর ধমকে ভীত হইয়া অরুণ সংসার-খরচেব যে মৌখিক হিসাব খাড়া করিল, তাহাতে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী দেখা গেল। মায়া বলিল, "তবে তুমি টাকা ধার করেছ ?"

"না, ধার ত কবিনি।"

"তবে বেশী টাকা পেলে কোথায় ?"

"তাই ত ! আচ্ছা, এবার আমায় মাপ কর দিদি, আসছে মাসে আমি ঠিক ঠিক হিসাব রাখব।"

দাদার মিনতিতে মায়া খুসী হইতে পারিল না। অরুণ গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক, ছাত্রেরা তাহার অধ্যাপনার যথেষ্ট প্রশংসাও করিত, কিন্তু হিসাব সম্বন্ধে দাদাব প্রতি মায়ার তিলমাত্র বিশ্বাস ছিল না। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না তা হবে না। তুমি আর নিজে টাকা খরচ করতে পাবে না।"

অরুণ বলিল, "তুই নিজের হাতে খরচ নিবি ? তা হলে ত আমি বাঁচি।"

চারি মাস পরে মায়া বাক্স খুলিয়া অরুণকে দেখাইয়া সগর্বে বলিল, দেখ, আমি কত টাকা জমিয়েছি !"

অরুণ বলিল, "বেশ ! বেশ ! তোর বিয়ের সময়ে খরচ করা যাবে।"

"যাও" !

৩

রবিবারের দুপুর বেলা মায়া যখন বালিসের উপব ভিজা চুল ছড়াইয়া দিযা বুকের উপর জিওম্যাট্রিখানি রাখিয়া, দাদার বিনা সাহায্যে একটা কঠিন থিওরেম আয়ত্ত করিয়া দাদার বিস্ময়াপ্লুত কণ্ঠের প্রশংসাবাণী শুনিবার আশায় ও কল্পনায় লুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল, তখন অরুণ তাহার কাছে আসিযা বসিল, এবং তাহার এক গোছা চুল আঙ্গুলে জড়াইতে জড়াইতে বলিল, "মায়া পিসীমার চিঠি এসেছে।"

মায়া উঠিয়া বসিয়া ব্যাগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি লিখেছেন ?"

"লিখেছেন, 'বিধাতা আমায় সন্তান দেননি, একটা পুষ্যি পুত্তুর নিয়ে তোমার পিসেমশায়ের টাকাগুলি পরকে দিতে ইচ্ছে করিনে। তুমি আবার আমার বংশধর, বিশেষতঃ পিতৃ-মাতৃহীন। এ বিদেশে আর পড়ে থাকতে ইচ্ছে হয় না। তুমি যদি বল, তবে তোমাব কাছে এসে থাকি। তাতে তোমার মায়ের অভাব খানিকটা পূর্ণ হ'তে পারে, আর আমিও তোমাকে নিয়ে শেষ জীবনটা একটু শান্তিতে কাটাতে পারি।' এই রকম আরও কত কি লিখেছেন।"

"তবে তুমি ছুটী নিয়ে শীগ্‌গির পিসীমাকে আন্‌তে যাও।"

"এক মিনিটে সব ঠিক ক'রে ফেললি ? ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখ, তাঁকে আমাদের মধ্যে এনে রাখা উচিত কি না।"

মায়া কোন মতে মিনিট পাঁচেক গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া বলিল, "খুব উচিত।" অরুণ বলিল, এরই মধ্যে বিবেচনা হয়ে গেল ? তোর সব তাতেই ছেলে মান্‌ষী।" মায়া চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "আমি এখনো ছেলে মানুষটি আছি কিনা ! সেদিন তরলার ঠাকুরমা বল্লেন যে, আমি ঠিক বুড়ো গিন্নীদের মত সংসার চালাচ্ছি।" অরুণ হাসিয়া বলিল, "তাই ত ! তুই

আর এখন আমার ছোট বোন্‌টি ন'স, একেবারে ঠাকুরমা হয়ে গেছিস।"

কয়েকদিন পরে মায়া কর্তৃক সাদরে অভ্যর্থিতা হইয়া অরুণের পিসীমা বিধুমুখী অরুণের গৃহে পদার্পন করিলেন। পিসীমাটি ধনবতী। ইঁহার স্বামী পশ্চিম প্রদেশে যাইয়া স্বীয় বুদ্ধিবলে বিস্তর অর্থ উপার্জন করেন। তিনি লক্ষাধিক টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। বিধুমুখীর শ্বশুরকুলে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত কেহ ছিল না। মায়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অরুণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কে ?"

অরুণ বলিল, "ওকে আপনি ওর ছেলে-বেলায় দেখেছেন, মনে নেই বুঝি। ও আমার বোন মায়া"। বিধুমুখী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "তোর বোন ! ও ! তোর মা যে মেয়েটিকে পেলেছিল, সেইটি ?

বিধূমুখীর পদার্পণে মায়া বিশেষ রূপেই পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল কারণ, তাঁহার এতগুলা টাকার ভবিষ্যৎ মালিক তাহার দাদা।

দু'চার দিন দেখিয়া-শুনিয়া বিধুমুখী কিন্তু কোন মতেই মায়ার উপর খুসী হইয়া উঠিতে পারিলেন না। মায়ার আদুরে ভাব ও বেহায়াপ্‌ণা তাঁহার মোটেই ভাল লাগিত না। অত-বড মেয়ে, কি নির্লজ্জভাবে হাসিতে হাসিতে গল্প করিতে থাকে ! কে সে অরুণের ? মামার জ্ঞাতির মেয়ে বৈ ত নয়। সেদিন অরুণের অসুখ করিয়াছিল, মেয়েটা সারারাত্রি পাখা হাতে লইয়া তাহার শিয়রে বসিয়াই রহিল। পিসীর চেয়েও তার দরদ বেশী নাকি ? আবার অরুণের কোন কাজে মেয়েটা কাহাকেও হাত দিতে দিবে না। কাপড় জুতা ঠিক করিয়া রাখা হইতে সব কাজ সে নিজের হাতেই করিবে। অরুণ কিছু মন্দ ছেলে নয়, কিন্তু মেয়েটার জন্য যদি তাহাকে কেহ কিছু বলে ?

সেদিন অরুণের একটা ব্যবহারেও বিধুমুখী বিশেষ ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইযা উঠিলেন। অরুণ কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বেতনের টাকা মায়ার হাতে দিল। বিধুমুখী কাছেই দাঁড়াইয়াছিলেন। অমন দেড়শত টাকা তিনি নিতান্ত তুচ্ছই মনে করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারই সম্মুখে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্বের ষোলআনা অধিকার ও দাবীকে অস্বীকার করা হইল ! মাতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রের মাতৃত্বের দাবী লইয়াই তিনি এখানে আসিয়াছিলেন, তিনি অরুণকে প্রচুর পরিমাণে দিতেই আসিয়াছেন, কিছুই লইতে আসেন নাই, ইহা জানিয়াও অরুণ একটা অনুগ্রহ পালিত দুধের মেয়ের জন্য তাঁহার দাবী উপেক্ষা করিল !

একদিন মায়া বলিল, "পিসীমা, ঠাকুরের রান্না খেতে আপনার অসুবিধা হচ্ছে বোধ হয, আজ আমি আপনার জন্য রাঁধব ? মা'র কাছে আমি রান্না শিখেছি।" পিসীমা মুখ ফিরাইয়া শুষ্ক কণ্ঠে বলিলেন, "না, রান্নায় আর তোমার কাজ নেই। সূচ পশম কেতাব ছেড়ে তুমি যদি হাতে হাতা বেড়ি নাও, তা হ'লে তোমার দাদা আমায় মারতে না আসে ত ভাল।" মায়ার মনে হইল, তাহাকে রাগাইবার জন্যই কথাটা বলা হইল, তাই সে সামলাইয়া লইয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আমার দাদা তেমন জানোয়ার ন'ন।"

ক্রুদ্ধস্বরে বিধুমুখী বলিলেন, "কি রকম মেয়ে তুমি ! আমি অরুণকে জানোয়ার কখন বল্লাম ? আমার চেয়ে অরুণের জন্যে দরদ তোমার বেশী হলো ? সে কি তোমারই সব ? আমার কেউ নয ? তোমরা ইংরেজি ধরনে থাক, তোমার হাতে খেতে আমার প্রবৃত্তি হয় না, আমি স্পষ্ট কথা ভালবাসি।" মায়াও চিরকাল নির্ভীক স্পষ্ট কথাই ভালবাসিত। কিন্তু আজিকাল স্পষ্ট কথাটা তাহাকে কতখানি তৃপ্তিদান করিল, বলা যায় না।

বিধুমুখী ছয়মাস এখানে আসিয়াছেন, ইহার মধ্যে তিনি একদিনও আভাসে ইঙ্গিতে মায়াকে জানাইতে ভুলিয়া যান নাই যে, সে অনুগ্রহের পাত্রী ছাড়া এ সংসারের আর কেউ

নয়, কৃতজ্ঞতার বাঁধন ছাড়া অরুণের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক থাকিবার কথা নয়। মায়া অরুণকে এ সব কথার কিছুই বলিত না বটে, কিন্তু নির্বাকে কার্যে ও আচরণে বিধুমুখীকে জানাইতে ত্রুটি করিত না যে, অরুণের উপর তাহার দাবী ও অধিকার বিধুমুখীর চেয়ে অনেক বেশী। তাহাতে বিধুমুখী আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন।

শনিবার অরুণ আসিয়া বলিল, "পিসীমা কয়েকজন ভদ্রলোককে নেমন্তন্ন করেছি, তাঁরা কালরাত্রে এখানে খাবেন।"

বিধুমুখী সোৎসাহে বলিলেন, "বেশ ত! তোর পিসেমশায় কত সায়েব-সুবোও নেমন্তন্ন করতেন, এক একটা নেমন্তন্নে সাত আটশ টাকা খরচ হ'য়ে যেত।" বলিয়াই সজোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া একটু থামিয়া বলিলেন, "কি কি রাঁধতে হবে ব'লে দিস, আমি সব দেখে শুনে দেব।"

অরুণ বলিল, "আমি তার কি জানি? মায়াকে জিজ্ঞেস করুন, সে এসব বেশ জানে।"

উজ্জ্বল দীপালোকোদ্ভাসিত কক্ষের দীপগুলি হঠাৎ দমকা হাওয়ায় নিবিয়া গেলে কক্ষের যেরূপ অবস্থা হয়, অরুণের কথায় বিধুমুখীর মুখের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইল। অরুণ তাহা লক্ষ্য করিল না, কিন্তু মায়ার চক্ষু এড়াইতে পারিল না। পরদিন বৈকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত বিধুমুখী অসুখ বলিয়া শুইয়া রহিলেন। মায়া তাঁহাকে একটিবারও না ডাকিয়া পাচকের সাহায্যে নানান রকম খাবার তৈয়ারি করিয়া ফেলিল।

এতটুকু মেয়ের এত বড় স্পর্দ্ধা! এতটা প্রভুত্ব! কে সে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে? আজ অরুণের বৌ থাকিলে মায়ার প্রভুত্ব স্পর্দ্ধা কিছুতেই কি মাথা তুলিতে পারিত? সারারাত্রি বিধুমুখী অরুণের বিবাহের কথাই ভাবিতে লাগিলেন। প্রভাতে উঠিয়াই তিনি বলিলেন, "অরুণ, তুই কবে বিয়ে করবি? ঘরে বৌ না থাকলে ঘরের কোন শ্রীছাঁদই থাকে না।"

সহাস্যে অরুণ বলিল, "মায়া রয়েছে, আপনি এসেছেন, এতেও ঘরের শ্রীছাঁদ থাকবে না? আর অজানা অচেনা একটি ছোট্ট মেয়ে এসে?

"আমি সে কথা শুনছিনে,—বিয়ে শীগগির করতেই হবে। এইসঙ্গে মায়ারও বিয়ে দিতে হবে।"

তা কি ক'রে হবে? মা'র ইচ্ছা অনুসারে যে ছেলের সঙ্গে মায়ার সম্বন্ধ ঠিক করে রেখেছি, সে মেডিকেল কলেজে পড়ছে। পড়া শেষ না হলে সে বিয়ে করবে না, পড়া শেষ হ'তে এখনো দু'বছর বাকি।"

"সে কি! এত বড় মেয়ে আরো দু'বছর আইবুড়ো থাকবে?"

"উপায় কি? জলে ত ফেলে দেওয়া যায় না।"

অরুণের আপত্তি টিকিল না। বিধুমুখী ও মায়ার ঐকান্তিক সমবেত চেষ্টায় এবং মায়ার একান্ত জেদে অরুণকে শীঘ্রই বিবাহ করিতে হইল।

৪

অরুণের স্ত্রী উষাসুন্দরীও বয়স্থা। বিধুমুখী সেই সুন্দর দেহ কতকগুলা মূল্যবান অলঙ্কারে সাজাইয়া সুন্দরতর করিয়া তুলিলেন। নববধূর প্রতি তাঁহার আদর-যত্নের অবধি ছিল না। তিনি বিবাহের পর উষাকে বেশী দিন পিত্রালয়ে থাকিতে দিলেন না, গৃহস্থালীতে শায়েস্তা করিবার জন্য সত্বরই আনাইলেন। যেদিন উষা আসিল, সেই দিনই অরুণ তাহাকে বলিল,

"মায়া আমার সোদরা না হ'য়েও সোদরা। আমরা এক মায়ের স্তন্যে পুষ্ট। মায়া আমায় যেমন ভালবাসে, তেমন ভাল বুঝি কোন বোন কোন ভাইকে বাসতে পারে না। একথা তুমি কখনো ভুলে যেও না।"

উষা নত মুখে মৃদুস্বরে বলিল, "আমিও ঠাকুরঝিকে খুব ভালবাসব।"

অরুণ উষার আনম্র মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বনে তাহার হৃদয়ের আশ্বস্ততা প্রকাশ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। উষা মায়ার কাছে যাইয়া তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল, "তোমার দাদা বল্লেন, তুমি নাকি তাঁকে খুব ভালবাস, আমায় কি ভালবাসবে না ভাই ?"

মায়া উষাকে একেবারে জড়াইয়া ধরিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "বাসব ভাই।"

একদিন বিধুমুখী উষাকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া সংসারধর্ম সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়া উপসংহারে বলিলেন, "দেখ বৌমা, মায়ার সঙ্গে এত মেশামেশি ক'রো না. মেয়েটা মোটেই গেরস্থের ঘরের যুগ্যি নয়। তোমার ভালোর জন্যই একথা বলছি। তোমার মুখখানা আজ এত শুকনো দেখছি কেন মা ? বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে নাকি ? তা তোমায় শিগ্‌গিরই অল্পদিনের জন্যে একবার পাঠিয়ে দেব। বেলা গেছে, এস কিছু খাবে এস।"

বিধুমুখী তাড়াতাড়ি কিছু খাবার আনিয়া উষার অনিচ্ছা সত্বেও জোর করিয়া তাহার মুখে খাবার গুঁজিয়া দিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মায়ের জন্যে মন কেমন করছে বুঝি ?"

উষা সলজ্জভাবে বলিল, "আপনি ত আমাকে মায়ের মত ভালবাসেন। আপনার আদর-যত্নে মাকে ভু'লে থাকি। ভাল মন্দ ত আমি বুঝে উঠতে পারব না, আপনি আমায় শিখিয়ে দেবেন পিসীমা।" প্রীত হইয়া বিধুমুখী বলিলেন, "তা দেব বৈ কি মা।"

উষার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া মায়া বেশী বিস্মিত হইল না। পণ্ডিতগণ ধূম দেখিয়া যেরূপ বহ্নির অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারেন, মায়াও তেমনি উষার প্রতি বিধুমুখীর আদরের মাত্রাধিক্য দেখিয়া একটা কিছু অনুমান করিয়াছিল, তাই এই আকস্মিক আঘাতটা সামলাইয়া লইতে তাহাকে খুব কষ্ট পাইতে হইল না।

কয়েকদিন পর্যন্ত উষাই অরুণের সকালের চা এবং বৈকালের খাবার লইয়া আসে দেখিয়া অরুণ বলিল, "মায়া যদি নিজের হাতে আমাকে খাবার দিতে না পারে, তবে বড দুঃখিত হয়।"

উষা মুখ ভার করিয়া বলিল, "কাল থেকে ঠাকুরঝিই খাবার আনবে।"

অরুণ উষাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া আদর করিয়া বলিল, "রাগ ক'রো না উষা, মায়া আমার অনাথা ছোট বোন।"

নিমেষে মেঘ কাটিয়া গেল। উষা স্মিতমুখে বলিল, "ঠাকুরঝিই ত রোজ তোমার চা ও খাবার তৈরি করে, আমি শুধু পিসীমার কথায় তোমার কাছে নিয়ে আসি বৈ ত নয়।"

অরুণের বিবাহের পর কয়েক মাস কাটিয়া গেল।

পুরাতন ভৃত্য নিধিরামের পীড়া হওয়ায় সে কিছুদিনের জন্য বাড়ী গিয়াছে, তাহার স্থানে তিনকড়ি নিযুক্ত হইয়াছে। একদিন মায়া তিনকড়িকে ডাকিয়া তাহার নিজের কি একটা কাজ করিয়া দিতে বলিল। তিনকড়ি বলিল, "আমি মা ঠাকরুণের একটা কাজে যাচ্ছি।"

"আমি জানি, বৌদিদির কাজ তেমন জরুরী নয়। আমার কাজটাই বেশী দরকারী।"

"তা হ'তে পারে। মা ঠাকরুণের হুকুম নিয়ে আসুন, তারপর আপনার কাজে যাচ্ছি। নইলে যেতে পারব না।"

মুহূর্তে মায়ার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল, সে বলিল, "আচ্ছা, তুমি যাও।"

তিনকড়ি গমনোদ্যত হইলে, পশ্চাৎ হইতে অরুণ বলিল, "দাঁড়াও।"

বারান্দায় দাঁড়াইয়া অরুণ যে সব শুনিতেছিল, মায়া বা তিনকড়ি কেহই তাহা জানিতে পারে নাই। দু'জনেই অত্যন্ত চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল। ধীর প্রকৃতি অরুণের এমন আওয়াজ কেহ কখনও শুনে নাই। অরুণ বলিল, "তোমায় বিদায় দিলাম তিনকড়ি। মায়া, হিসাব ক'রে ওর মাইনে দিয়ে দে। ও যেন আর এক মিনিটও এখানে থাকে না।"

নত শিরে ধীরে ধীরে তিনকড়ি চলিয়া গেল। মায়া বলিল, "কি করলে দাদা ?"

বিধুমুখী আসিয়া বলিলেন, "হাঁরে অরুণ, চাকরটাকে বিদায় দিচ্ছিস কি ব'লে ?"

অরুণ সংক্ষেপে বলিল, "বড় অবাধ্য।"

বিধুমুখী বলিলেন, "যা হয়েছে, তা আমি জানি। ঐ ক্ষুদে মেয়েটার একটা কথা শুনতে একটু দেরী হয়েছে বলে ভাল চাকরটাকে বিদায় দিবি ?"

শান্ত সহজ স্বরে অরুণ বলিল, "আপনার কাছে মায়া ক্ষুদে মেয়ে হতে পারে, কিন্তু চাকরের কাছে কর্ত্রী।"

আর কিছু বলা নিষ্ফল জানিয়া রুদ্ধ আক্রোশ ও গূঢ় অভিমানে ফুলিতে ফুলিতে বিধুমুখী সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। মায়া বলিল, "তিনকড়িকে বিদায় দিও না দাদা।"

অরুণ বিস্মিত হইয়া বলিল, "তুইও একথা বলছিস ? তবে কি তুই বলতে চা'স, তোর বৌদিদি চাকরকে এমন ব্যবহার শিখিয়েছে ?"

"না, তা কেন ? বৌদিদি শেখায়নি, তবে একথাও ঠিক, তিনকড়িরও কোন দোষ নেই।"

"তবে দোষ কা'র ?"

"তোমার সব কথার জবাব আমি দিতে পারব না, তবে একথা বলছি, তিনকড়িকে তাড়িও না।"

"না, তাকে কিছুতেই রাখব না।"

"আমি রাখব তাকে, দেখি তুমি কি ক'রে বিদায় কর।"

মায়ার ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখিয়া অরুণ ভীত হইয়া উঠিল। মায়া যদি তাহাব জেদ না রাখিতে পারে, তবে হয়ত এক সঙ্গে তিনদিন উপবাস করিবে, অথবা এমনি একটা অনর্থ ঘটাইয়া বসিবে যে, অরুণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিবে। তাই সে বলিল, "তোর যা খুশী কর গে।"

মায়া হাসিয়া যা বলিল, এখন পিসীমাকে বল গে যে, আপনার ইচ্ছে হলে তিনকড়িকে রাখতে পারেন।"

"কি ! জেদ ক'রে রাখবি তুই, মিথ্যার অভিনয় করতে যাব আমি ?"

"একে মিথ্যার অভিনয় বলে না। সংসারের শান্তি স্থিতি রক্ষার জন্যে এসব করতে হবে। যাও পিসীমার কাছে, তোমার পায় পড়ি।"

সত্য সত্যই মায়া নতজানু হইয়া অরুণের দু'পা জড়াইয়া ধরিল। অরুণ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ওঠ্, ওঠ্, এই আমি পিসীমার কাছে যাচ্ছি।"

সেদিনকার বর্ষণ-রত শ্রাবণের অলস মন্থর বিষণ্ন মধ্যাহ্নটা একান্ত দীর্ঘ ও নিঃসঙ্গ বোধ হওয়ায় হাতের গল্পের বইখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া উষা মায়ার কাছে উঠিয়া আসিল। মায়া তখন চুপ করিয়া জানালার কাছে বসিয়া ছিল, তাহার একরাশি এলোচুল লইয়া আর্দ্র বাতাস খেলা করিতেছিল। উষা বলিল, "এস, খানিক তাস খেলি।"

মায়া বলিল, "তাস পাশা খেলা দাদা দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারেন না।"

"তিনি ত এখন বাড়ী নেই।"

"বল কি বৌদিদি ! তাঁর অসাক্ষাতে তাঁর অপ্রিয় কাজ করব ?"

মায়ার কথায় উষার বিলক্ষণ লজ্জিত হইবারই কথা ছিল, কিন্তু বিধুমুখী তাহা হইতে দিলেন না। তিনি কি একটা কাজে আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া উষা ও মায়ার শেষ কথাগুলি শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ঢং দেখে আর বাঁচিনে। ওসব কথায় জানাতে চায় ওর মত অরুণকে আর কেউ ভালবাসে না ! ওর সঙ্গে তুমি খেল্‌তে গেলে কেন বৌমা ? ও কি তোমায় দু 'চক্ষে দেখ্‌তে পারে নাকি ? তুমি হলে ওর—"

বিধুমুখী মধ্যপথে থামিয়া গেলেন। মায়া দুই রক্ত চক্ষু তুলিয়া এমনি একটা অনলবর্ষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল যে, তাঁহার মুখের কথা মুখের মধ্যেই আটকাইয়া রহিল।

৫

একদিন একটা ঘটনা অতর্কিত ভীষণ ভূকম্পের মত আসিয়া সব ওলট পালট করিয়া দিয়া গেল। দুপুর বেলা কাচ-ভাঙ্গার ঝন্ ঝন্ শব্দ শুনিয়া মায়া তাহার ঘরে আসিয়া দেখিল, তাহার সাধের দোয়াতটা টুকরা টুকরা হইয়া মেঝেয় পড়িয়া আছে, আর বিধুমুখীর খাস দাসী বিহ্বলের মত নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। সেই দোয়াতটা দেবতার আশীর্বাদের মত মায়া তাহার টেবিলে সাজাইয়া রাখিত, দোয়াতটা তাহার মা কলিকাতা গঙ্গাস্নান করিতে যাইয়া আনিয়া দিয়াছিলেন, মায়া বলিল, "এ কি করেছ ! এরচেয়ে যে আমাকে খুন করা ভাল ছিল।"

মায়া কখনও কাঁদিতে লাগিল, কখনও দাসীকে তাহার অসাবধানতার জন্য তিরস্কার করিতে লাগিল। দাসী যে কখন যাইয়া বিধুমুখীর কাছে নালিশ করিল এবং বিধুমুখী যে কখন আসিয়া অগ্নিমূর্তিতে সেখানে দাঁড়াইলেন, মায়া তাহা লক্ষ্য করিল না। বিধুমুখী আসিয়াই সগর্জনে বলিলেন, "আমার ভাজের দেওয়া একটা দোয়াত ভেঙ্গেছে ব'লে তুমি আমার ঝিকে এত গাল দিয়েছ কেন ?"

মায়া চোখের জল মুছিয়া নম্রস্বরে বলিল, "এখন আমায় কিছু বলবেন না, আপনার পায়ে পড়ি।" বিধুমুখী তেমনই গর্জন করিয়া বলিলেন, "না ! কিছু বলব কেন ? তুমি আমার ঝিকে গাল দিয়ে আমাকে সুদ্ধ অপমান করবে, আর আমি সয়ে থাকব, না ?"

"আমি আপনাকে অপমান করিনি, এখন আমায় জ্বালাতন করবেন না, চলে যান এখান থেকে।"

"কি, এত বড় কথা ! এত বড় আস্পর্দ্ধা ! আমি চ'লে যাব ? তুই এখনি এ বাড়ী থেকে বে'রো নইলে ঝাঁটা মেরে বের ক'রে দেব।"

মায়া তীরবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল, চক্ষু হইতে আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল, সেও বিধুমুখীর মত স্বরেই বলিল, "বে'র হ'য়ে যাও তুমি ! আমাকে বে'র হয়ে যেতে বলবার তুমি কে ?"

মায়ার ক্রোধ-কম্পিত উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া উষা ছুটিয়া আসিয়া উভয়ের মূর্তি দেখিয়া ভয়ে দুই পা পিছাইয়া গেল। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে ?"

উত্তরে বিধুমুখী যাহা বলিলেন, তাহার পৌনে ষোল আনার সঙ্গে সত্যের সম্পর্কমাত্র নাই দেখিয়া মায়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। বিধুমুখী সরোদনে বলিলেন, "আমি এ বাড়ীতে এসেছিলাম ব'লে এই ছোট লোকের মেয়েটা আমায় এমন অপমান করতে পারলে। ওকে এ বাড়ী থেকে দূর ক'রে না দিলে আমি যদি জল স্পর্শ করি তবে"—এই বলিয়া একটা ভয়ানক শপথ করিয়া নিজের ঘরে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

অরুণ কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিবামাত্রই উষা বিধুমুখীর কাছে যাহা শুনিয়াছিল, তাহা সকলই বলিল। শুনিয়া তখনই অরুণ বিধুমুখীর কক্ষ-দ্বারে গেল। অরুণের বিস্তর কাকুতি-মিনতিতে কক্ষ-দ্বার মুক্ত হইল। বিধুমুখী উষার কাছে যাহা বলিয়াছিলেন, অরুণের কাছেও তাহারই পুনরাবৃত্তি করিলেন। তারপর বন্ধ্যাত্বের উল্লেখ করিয়া এবং মৃত স্বামীকে স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া বিছানা ভিজাইতে লাগিলেন। অরুণ ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া মায়ার কাছে উঠিয়া গেল। দোয়াতের টুকরাগুলি একখানা রুমালে বাঁধিয়া আলমারীতে তুলিয়া রাখিয়া মায়া শুইয়াছিল। অরুণ জিজ্ঞাসা করিল, "তুই পিসীমাকে বাড়ী থেকে দূর হ'য়ে যেতে বলেছিস ?"

মায়া উঠিয়া উদ্ধতস্বরে মাথা উঁচু করিয়া বলিল, "হ্যাঁ বলেছি।"

"পিসীমা শোক তাপ জুড়াতে আমাদের কাছে এসেছিলেন, তাঁকে ভাল সান্ত্বনাই দেওয়া হলো। তুই যে ভিতরে ভিতরে এত উন্নতি করছিস,—তা ত আমি জানতাম না। পিসীমা আঘাত পেয়ে একটা দিব্যি করে ফেলেছেন। তোকে মামার বাড়ী পাঠিয়ে দেব, তিনি ক্ষমা না করলে তোকে আর আনছিনে।"

"আজই আমায় মামার বাড়ী পাঠিয়ে দাও।"

"তাই হবে" বলিয়া অরুণ মায়াকে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে উঠিয়া গেল।

মায়া শুধু পরণের সেমিজটি ও কাপড়খানা লইয়াই গাড়ীতে উঠিল ; সর্বদা ব্যবহারের অলঙ্কার ক'খানাও যে খুলিয়া রাখিয়া গেল, অরুণ তাহা জানিতে পারিল না।

শিশু মায়া যখন অরুণদের গৃহে আনীত হইয়াছিল, তখন তাহার মাতামহের একমাত্র বংশধর মহেন্দ্রনাথ অবিবাহিত ও খুব দরিদ্র ছিলেন।

৬

তিন চারি দিন পবে কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া অরুণ জিজ্ঞাসা করিল, "মায়ার চিঠি এসেছে, উষা ?"

উষা বলিল, "এরই মধ্যে চিঠি আসবে কি গো ?"

এরই মধ্যে ! দিন, ঘণ্টা, মিনিট কি সময়ের মাপকাঠী হ'তে পারে ? উষা খাবার লইয়া আসিয়া বলিল, "ওকি। অমন ক'রে ব'সে রইলে কেন ? কাপড় ছাড়বে না ?"

উষার কথায় চমকিত হইয়া অরুণ কাপড় ছাড়িতে উঠিয়া গেল।

মায়ার যাইবার দুই সপ্তাহ পরে অরুণ একদিন বাহিরের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। এমন সময়ে ডাক-পিয়ন আসিয়া "বাবু, চিঠি।" বলিয়া কতগুলা চিঠি ও খবরের কাগজ রাখিয়া গেল। অধীর আগ্রহে ত্রস্তহস্তে অরুণ চিঠি ক'খানা তুলিয়া লইল, কিন্তু তাহার বাঞ্ছিত হস্তাক্ষর একখানায়ও মিলিল না। একটি চির-মধুর, চির-পরিচিত হস্তাক্ষরের জন্য সে এমনি করিয়া প্রত্যহ অধীর প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। মানুষের একাগ্র কামনা, আকুল আগ্রহ যাহার জন্য পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে, তাহা এমন দুষ্প্রাপ্য হয় কেন ? ডাকের মধ্যে দু'খানা মাসিক পত্রিকা ছিল, মায়াই তাহা আগ্রহ করিয়া আনাইয়াছিল, অরুণ সে দু'খানা সযত্নে তুলিয়া রাখিয়া, চিঠিগুলা অপঠিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াই বাহিরে চলিয়া গেল।

একদিন রাত্রি নয়টার সময়ে অরুণ বাড়ী আসিয়া শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিতে যাইয়া দেখিল, বিধুমুখী জপের মালা হাতে লইয়া বারান্দায় বসিয়া আছেন। অরুণকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এই পাঁচ ছ'দিন ধরে এত রাত পর্যন্ত বাইরে কি করিস অরুণ ? এমন করতে ত

তোকে আর কখনো দেখিনি।"

"বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে একটু গল্প-স্বল্প করি, আর কি করব ? যে গরম টেকা যায় না" বলিয়াই অরুণ তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিল।

দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ এক মাস মায়া চলিয়া গিয়াছে ; সংসার বেশ অবাধ গতিতেই ছুটিয়া চলিতেছে। বিধুমুখী সর্বময়ী গৃহিণী, আর উষা আজ্ঞাপালিনী বধূ। গৃহে কোনও গোল নাই। অরুণকে বেহিসাবী বলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া আর কেহ শাসাইতে আসে না, আর কেহ তরল উচ্চহাস্যে তাহার অধ্যয়নের ব্যাঘাত করে না. প্রবন্ধ লিখিতে বসিলে আর কেহ হারমোনিয়ামের সঙ্গে কণ্ঠস্বর মিলাইয়া তাহাকে রাগাইতে চেষ্টা করে না ! অনাবশ্যক প্রশ্ন-বর্ষণে তাহাকে কাছে ধরিয়া রাখিতে চাহে না। এই এক মাসের মধ্যে অরুণ মায়াকে পাঁচখানা চিঠি লিখিয়াছে, কিন্তু একখানারও উত্তর পায় নাই। সে যখন কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িত, তখন মায়া তিন চারিদিন অন্তর অরুণকে চিঠি লিখিত। সেই বহুদিনের পুরাতন রেশমী-ফিতা-বদ্ধ সযত্ন-রক্ষিত চিঠিগুলা এই এক মাসের মধ্যে স্তব্ধ নিশীথের নির্জনতায় অরুণ কতবার পড়িয়াছে।

একদিন উষাকে ম্লানমুখে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অরুণ জিজ্ঞাসা করিল, "অসুখ করেছে নাকি তোমার ?" উষা বলিল, "না. ঠাকুরঝির জন্যে মন কেমন করছে। তুমি রাগ ক'রে তাকে পাঠিয়ে দিলে, তার প্রতিশোধ নেবার জন্যে সে আমাকে পর্যন্ত চিঠি লেখা বন্ধ করেছে।

ঠাকুরঝি পিসীমাকে দেখতে পারত না বটে। কিন্তু ত ভালবাসত।"

অরুণ দ্রুতপদে বাহিরের ঘরে আসিয়া চেয়াবের উপর বসিযা পড়িল, তাহার প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া অবিরল অশ্রুধারা তাহাকে সিক্ত করিতে লাগিল। সন্ধ্যাবেলা সে বন্ধু অতুলবাবুর বাড়ীতে বেড়াইতে গেল। অতুলবাবুর কিশোরী কন্যা আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। আশীর্বাদ করিয়া অরুণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সুশীলা, তুমি এত রোগা হ'য়ে গেছ কেন ? নিকটে অতুলবাবু ছিলেন, তিনি বলিলেন, "ও যে এতদিন শ্বশুরবাড়ীতে ছিল।"

"শ্বশুরবাড়ী গেলে কি মানুষ রোগা হয় ?"

হয় না আবার ! সহরের কলের জল খাওয়া যাদের অভ্যাস, পানাপচা পুকুরের জল তাহাদের সইবে কেন ?"

সুশীলের শ্বশুর-গৃহ মায়ার মাতুলালয়ের নিকটবর্তী।

অরুণ সেখান হইতে বাহির হইয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে খানিকটা পথে পথে ঘুরিল, তারপরে গৃহে ফিরিল।

আরও দুইটি মাস অতীত হইল।

অরুণ মায়ার ঘরে বসিয়া তাহার টেবিলের জিনিসগুলা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া আবার ঠিক গুছাইয়া রাখিতেছিল। এই সাধারণ কাজটার মধ্যে তাহার চিত্ত এত নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল যে, নিধিরামের আহ্বানে সে চমকিত হইয়া ফিরিয়া বলিল, কি চাও ?"

বাবুর অনভ্যস্থ রুক্ষস্বরে নিধিরাম ভীত হইয়া বলিল, "দিদি ঠাকরুণের মামা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

নিধিরামের কথায় অরুণ তখনই বাহিরে ছুটিয়া আসিল। আসিয়াই বলিল, "মায়ার চিঠি এনেছেন ?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না, সে চিঠি দেয়নি।" পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘরে আর কোনও

শব্দই শুনা গেল না। সেই গভীর স্তব্ধতা অরুণই প্রথম ভাঙ্গিল।

"ও! আপনি দাঁড়িয়ে আছেন? বসুন, বসুন।"

অরুণ চেয়ারখানা মহেন্দ্রনাথের দিকে ঈষৎ ঠেলিয়া দিল। মহেন্দ্রনাথ আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "আপনার শরীরটা বোধহয় ভাল নেই।"

"না, তা তেমন কোনও অসুখ নেই। মায়া কেমন আছে?" তার কি কোনও অসুখ করেছে?"

"না, সে ভালই আছে।"

"না, না, নিশ্চয়ই তার খুব বেশী অসুখ; নইলে চিঠি লেখে না কেন?"

নিজের স্বরে নিজেই খুব লজ্জিত হইয়া অরুণ খানিক চুপ করিয়া রহিল। তারপর নতমুখে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "মায়া একটু রাগী চঞ্চল অভিমানী, সে আপনাদের কোন অসুবিধায় ফেলে নাই ত?"

বলেন কি? সে ত খুব ধীর শান্ত সহিষ্ণু! এই মনে ক'রেই এতদিন বুঝি তাকে আমাদের বাড়ী দু'দিনের জন্যেও রাখতে চাননি? কিন্তু তা ত নয় আপনার মা'র শিক্ষায় ও স্নেহে সে খুব ভাল মেয়েই হয়েছে।"

"মায়া কি কোনও কাজের জন্যে আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে?"

"না, নিজের একটা কাজে এখানে এসেছিলাম, মনে করলাম, একবার দেখা ক'রে যাই। আপনার শরীর ত খুবই খারাপ দেখছি।"

"না, না, সে কথা মায়াকে বলবেন না যেন। আমার অসুখের কথা শুনলে সে খুব অস্থির হ'য়ে পড়বে।"

কিছুক্ষণ পরে মহেন্দ্রনাথ বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি চলিয়া যাইতেই অরুণ আসনে বসিয়া পড়িল। অরুণের দুই চক্ষু ছাপিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

পরদিন প্রভাতে বিধুমুখী পূজা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই অরুণ আসিয়া তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া বলিল, "পিসীমা, মায়া আমার বোন,—অবোধ, অজ্ঞান বালিকা, মা-বাপ হারা—তাকে ক্ষমা করুন।"

মুহূর্তে বিধুমুখীর প্রসন্ন স্মিতমুখ অন্ধকার হইয়া গেল—তিনি বলিলেন, "মায়া তোমার সর্বস্ব হ'তে পারে, কিন্তু আমার কেউ নয়। সে অকারণ দারুণ অপমান করেছে, আমি তাকে ক্ষমা করতে পারব না। ইচ্ছে হয়, তুমি তাকে আনতে পার, কিন্তু আমি আর তার মুখ দেখব না।"

সহরে বিধুমুখীর এক দূর সম্পর্কিত উকিল দেবর ছিলেন। বিকালে বিধুমুখী অরুণের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সেই দেবরের বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। উষা তাঁহাকে কিছুই বলিল না।

দিন পাঁচেক পরে অরুণ বলিল, "উষা, পিসীমা তাঁর দেবরের ছেলেকে দত্তক নিচ্ছেন।"

উষার হাতে সেলাই ছিল, সে সূচে সূতা পরাইতে পরাইতে বলি, "বেশ ত।"

"পিসীমার চাকর আজ এখানে এসেছিল। তার কথায় বুঝলাম, আমি যদি গিয়ে একবার বলি, পিসীমা, আসুন, মায়ার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখব না' তা হলেই ফিরে আসেন!"

"তাতে দরকার?"

"বল কি! অতগুলো টাকা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, তোমায় কি দুঃখ হয় না?"

"না, হয় না। ঠাকুরঝি আর তুমি এক মা'র কোলে বড় হয়েছ, এক সঙ্গে এতকাল রয়েছ, তাই ঠাকুরঝি তোমাকে যা বুঝতে পেরেছে, আমি তা এক বছরে এখনো পারিনি। কিন্তু এটা

বুঝেছি যে, তুমি তাকে কত ভালবাস। এই স্নেহ কি সুন্দর, মহৎ। ভাবতে আমার আনন্দ হয়। এমন সুন্দর মহৎ জিনিসটা লক্ষ কেন, কোটি টাকাতেও বেচতে পারব না। তুমি কালই ঠাকুরঝিকে লক্ষ কেন, কোটি টাকাতেও বেচতে পারব না। তুমি কালই ঠাকুরঝিকে আনতে যাও। সে যতই রাগ করুক না কেন, তুমি নিজে আনতে গেলে না এসে থাকতে পারবে না।"

অরুণ উষাকে আলিঙ্গন করিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তাই ঠিক উষা, কালই তাকে আনতে যাব। আমার অনুরোধের কাছে বিশ্বের কোনও শক্তি—কোনও আকর্ষণ মায়াকে ধরে রাখতে পারবে না।"

কমলা দত্ত

হেস্তনেস্ত

১

হেমাঙ্গিনী। এ আবার কার চিঠি এলো?

তারাপদ। বসন্তের।

হেমাঙ্গিনী। কি বলে?

তারাপদ। একজামিনের টাকা জমা দিতে হবে। তাই ১০০৲ টাকা চেয়েছে।

হেমাঙ্গিনী। একজামিনের ১০০৲ টাকা জমা! কতই দেখলুম, আরও কত দেখ্‌ব। আমার ভাই একজামিন কেন, দু জামিন পর্যন্ত দিয়েছিল; কিন্তু তাতে ত দেখেছি ১০৲ টাকা করে জমা দিতে হত। তোমায় বোঝালেও বুঝ্‌বে না; কেবল ভাই ভাই করে মরছ। আমার কথা শোন, এখনও একটা হেস্তনেস্ত কর।

তারাপদ। এ সে একজামিন নয়। এতে ৩০৲ টাকা জমা দিতে হবে; তা ছাড়া কলেজের মাইনে, মেসের খরচ, কাপড় জামা আরও কতকি সব আছে।

হেমাঙ্গিনী। তা আর আমি বুঝি না। এই সেদিন যেমন মেজ ঠাকুরপো তোমায় বুঝিয়ে দিলে, অফিসের তবিল থেকে ৮০০৲ টাকা চুরি গেছে; আর তুমিও অমনি জমি-জারাত বন্ধক রেখে টাকা পাঠিয়ে দিলে। পৈতৃক সম্পত্তি ত আর তালুক-মুলুক নয়, যে দু হাতে ওড়ালেও ফুরুবে না। আমার আর কি; আজ আছি, কাল নেই। তবে ছেলেটা যাতে পথে না বসে, তাত দেখ্‌তে হবে।

তারাপদ। ওরে ভূতো, ছোঁড়াটা বুঝি পড়াশুনা ফেলে খেল্‌তে বেরিয়েছে। সমস্তদিন খেলা, লেখা পড়ার নাম নেই।

হেমাঙ্গিনী। আমার কথায় বুঝি বেজায় ধর্‌ছে? তা তুমি যা বল আর যাই কও, এরকমটা আমি আর হতে দিচ্ছি না। পাঁচভূতে যে উড়িয়ে পুড়িয়ে দেবে, তা আমার সহ্য হবে না।

তারাপদ। হাঁ রে ভূতো, কোথায় গিয়েছিলি রে? ইস্কুলের সব পড়া হয়েছে? দেখি বই নিয়ে আয়।

হেমাঙ্গিনী। তোমার যা খুসী তাই করগে। হেজে যাক্, মজে যাক্, আমি আর কিছুতে কথা কইব না।

২

ভূতো। মা, আমি ছোট খুড়ীমার সঙ্গে নাইবো। ছোট খুড়ীমার তেলে কেমন গন্ধ।

হেমাঙ্গিনী। আর থাক, অত নবাবিতে কাজ নেই।

ছোটবৌ। তুমি না হয় দিদি, ততক্ষণ রামশরণকে বাজারের পয়সা দিয়ে এস না। আমি ভূতোকে তেল মাখিয়ে দিচ্চি।

হেমাঙ্গিনী। বেশী বাড়াবাড়িটা কিছু নয়, ছোট বৌ। তোমার আর কি, দরদ ত কিছুতেই নেই, প্রাণ খুলে নবাবি কর্‌ছ। এটার আর মাথা খাও কেন? এর যে এরপর তেল-নুনেরও পযসা জুট্‌বে না।

ছোট বৌ। আমার মাথায় চুল উঠ্‌ত বলে—

হেমাঙ্গিনী। হাঁ গো হাঁ, গেরস্তর পয়সায় সকলেরই চুল ওঠে।

ছোট বৌ। না দিদি, আমার মাথায় চুল উঠ্‌ত বলে. এবার আসবার সময়, দাদা আমায় ১ শিশি কুন্তলীন কিনে দিয়েছিলেন।

হেমাঙ্গিনী। শোন একবার কথার ছিরি। গেরস্ত ওঁকে খেতেও দেয় না, পরতেও দেয় না। উনি যা কিছু সব বাপের বাড়ী থেকে আনেন। নিমকহারাম কিনা। যার জন্যে যত কব, তার ততই মন পাওয়া ভার।

ছোট বৌ। আমি কি ঐকথা বল্‌লুম, দিদি!

হেমাঙ্গিনী। কি বল্‌লে তুমিই জান। আমি ত তোমার মত চেয়ারে বসে চব্বিশ ঘণ্টা ইংরিজিও পড়ি না ফার্‌সীও পড়ি না। তুমি যদি এখন ইংজিরি বলে থাক, কি করে বুঝব বল। ওঃ একটুতেই চোখে লালপানি দেখা গেল যে। আমি এমন কি বলেছি, যে অমনি ফোঁপাতে সুরু কর্‌লে? এখন যাও সাতখানা করে লাগাও গে। আমি মন্দ লোক, আমি ঝগড়াটে, আমার সংস্রবে থাক্‌বার দরকার কি বাপু। যে যার সে তার আলাদা হয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার কর না; কে বারণ কর্‌ছে।

৩

ছোট বৌ। মেজদি, কি কর্‌বে বল না? বড়দি রান্নাঘরে বসেছিলেন দেখে, অপরাধের মধ্যে আসি কাপড় কাচতে গিয়েছিলুম। বেড়ালে ছেলের সব দুধ খেয়ে গেছে। বড়দি আমায় যা ইচ্ছে তাই বল্‌ছেন।

মেজ বৌ। বড়দি ওরকম বলে থাকেন। আজ কাল কি কেলেঙ্কারীটাই হচ্চে তা তুই জানিস্ না। আমি পাশের ঘর থেকে সব শুন্‌তে পাই।

ছোট বৌ। কি হচ্চে দিদি?

মেজ বৌ। রোজ রাত্রে বড় ঠাকুরের সঙ্গে বড়দির ঝগড়া হচ্চে। সমস্ত রাত বড়দি বক্‌তে থাকেন, আর বড়ঠাকুর চুপটি করে শুনেন; ক্বচিৎ কখনও এক আধটা কথা কন।

ছোট বৌ। হাঁ, বড়দির আজকাল যেন কি হয়েছে। সেদিন চিনি ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে, আমায় কি বল্লেন। আমি শেষে কেঁদে ফেল্লুম। বড়দি কেন এমন কর্‌ছেন, বল না মেজদি?

মেজ বৌ। তুই ছেলে মানুষ, সে কথা বুঝবিনি। ব্যাপার যে রকম দাঁড়িয়েছে, তাতে সংসারটা যে একরকম আর থাকে বলে বোধ হয় না।

ছোট বৌ। তা হলে কি হবে মেজদি?

মেজ বৌ। হবে আমার মাথা আর মুণ্ডু। আজ ছোট ঠাকুরপোর আস্‌বার কথা আছে নয়? তোর চুল বেঁধে দিই গে চল্‌।

৪

অনিল। কি রকম একজামিন হল?

বসন্ত। হল মন্দ নয়। তবে অঙ্কটা ভাল সুবিধা কর্‌তে পারিনি। অঙ্কটায় যদি পেরিয়ে যাই, পাশ হয়ে যাব। আচ্ছা মেজদা, বড়দার এরকম উড়ু উড়ু ভাব কেন বল দেখি? বাড়ীর যেন সব হাওয়া বদলে গেছে। বড় বৌদিও আমার সঙ্গে আর ভাল করে কথা কচ্চেন না। যেন সব কি এক রকম!

অনিল। ব্যাপার বড় গুরুতর হয়ে উঠেছে, বসন্ত। বড় বৌদি চান, বিষয় ভাগ করে ভিন্ন হতে। এই হচ্ছে আসল কথা।

বসন্ত। বড়দা কি বলেন?

অনিল। বড়দা যে কি বলেন, তা ঠিক বুঝতে পারা যাচ্চে না। তবে আজকাল যে রকম অশান্তি হয়ে উঠেছে, তাতে যে তিনি একটা কিছু না বলে থাক্‌তে পারবেন, এমন বোধ হয় না। রোজ রোজ বকাবকি কাঁহাতক লোকে সহ্য কর্‌বে।

বসন্ত। তাই ত,—এমন সোনার সংসারটি মাটী হয়ে যাবে।

অনিল। তা হ'লে আর কি কচ্চি বল না। আর আমাদের এতে হাতই বা কোথায়!

বসন্ত। বড় বৌদিকে একটু বোঝাবার চেষ্টা দেখ্‌লে হয় না?

অনিল। "উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে", তাতে হিতে-বিপরীত হতে পারে।

৫

তারাপদ। বেলা প্রায় তিনটা বাজে; আর রাগ করে শুয়ে থাকে না। ওঠ, খাওয়া দাওয়া করগে যাও। তোমার জন্যে বৌয়েরা এখনও শুকিয়ে আছে।

হেমাঙ্গিনী। আমি খেলুম না খেলুম তাতে কার কি বয়ে গেল। আমার ক্ষিদে নেই আমি খাব না।

তারাপদ। রাগ করে শুকিয়ে থাক্‌লে কি হবে বল।

হেমাঙ্গিনী। কার ত কিছু ক্ষেতি করিনি। আমার ইচ্ছে নেই আমি খাব না।

তারাপদ। বলি হয়েছেটো কি?

হেমাঙ্গিনী। কিছু হোক আর চাই নাই হোক, আমার বাপের বাড়ীর কাপড়-চোপড় আমি কাকেও ব্যবহার করতে দেবো না। আর কারো চোখ-মুখ রাঙানির ধার ধারতেও পারব না। কেন, আমার সেই সাদা শালজোড়াটা গায়ে না দিলে কি ভদ্র সমাজে বস্‌তে জায়গা দেয় না। এম. এ, বি. এ, একজামিন দিলেই শালের দরকার হয় না কি? সব দিকে বাড়াবাড়িটা আমার সহ্য হবে না, বলে রাখলুম।

তারাপদ। আচ্ছা, আমি কালই এর বিহিত করছি। তুমি ওঠ, এখন খাওয়া-দাওয়া করগে যাও। চোরের উপর রাগ করে ভুঁয়ে ভাত খেলে কি হবে বল।

হেমাঙ্গিনী। আমার ক্ষিদে নেই আমি খাব না।

তারাপদ। আমি সত্যি বলছি, কালই এর বিহিত করব। তুমি ওঠ।

৬

অনিল। দাদা, ডাকছেন ?

তারাপদ। হাঁ, বসন্ত কোথায় ?

অনিল। ঐ যে আসছে।

তারাপদ। তোমরা দুজনেই এখানে বস। বিশেষ কথা আছে।

অনিল। বলুন।

তারাপদ। বলাবলি আর কি, আমাদের এক সংসারে থাকা আব চলবে না। কালই সব ভেন্ন হতে হবে।

বসন্ত। আমি বড় বৌদিকে এমন কিছু ত বলিনি। কেবল সাহিত্যসভার মিটিং-এ যাবার জন্যে শালজোড়াটা চেয়েছিলুম। বৌদি তাতে যদি কিছু রাগ করে থাকেন, আমি এখনি গিয়ে তাঁর পায়ে ধরছি। আমায় ক্ষমা করুন।

তারাপদ। এর ভিতর পায়ে ধরাধরি কিছু নেই। কালই ভেন্ন হতে হবে।

অনিল। আজ্ঞে—

তাবাপদ। আজ্ঞে নয়, যা বলি তা শোন। শুধু ভেন্ন হওয়া নয়, সঙ্গে সঙ্গে কাল বিষয় ভাগও করতে হবে। তবে আমি বলি কি, বিষয় ভাগ করতে গিযে উকীল আদালতকে পয়সা না খাইয়ে, পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোক ডেকে. আপোবে মিট্‌মাট্‌ করে নিলেই ভাল হয়।

বসন্ত। আজ্ঞে—তা শেষকালে—আমাদের ভিন্ন—

তারাপদ। হাঁ, কালে সব জিনিসেরই শেষ হয়, ভিন্ন আকারও ধারণ করে। তা চোখ ছলছল করলে হবে কি। কাল বিষয় ভাগ করতেই হবে। এখন আপোযে মিটমাট করতে রাজি আছ কি ?

অনিল। এমন কথা কেন বলছেন দাদা। আপনি যা করেন, তার উপব আমরা কখনও কথা কয়েছি কি ?

তারাপদ। বেশ কথা, তা হলে এক কাজ কর। তোমরা দুজনে গিয়ে হরি খুড়ো, মহেশ পোদ্দার, রাম ঠাকুরদা, ভোলানাথ জ্যেঠামশায় আব রমেশ রায়ের সঙ্গে দেখা করে কাল সকালে আসতে বলে এস।

অনিল। আজ্ঞে—তা—

তারাপদ। ওর ভেতর আর তা নেই। যা বল্লুম শোন। মুখ কাঁদ কাঁদ করে থাকলে, আমি কি করব।

৭

ভোলানাথ জ্যোঠামশায়। কি বাবা তারাপদ, এত দিনের পর শেষটা ভায়ে ভায়ে ভেন্ন হলে ?

তারাপদ। কি করব জ্যেঠামশায়, চিরদিন সকলের বনি-বনাও হয় না।

মহেশ পোদ্দার। এই শাস্ত্রেই ত লেখা আছে, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই। তা তারাপদ আর কি

করবে বল না।

রাম ঠাকুরদা। তা ভায়া, বিষয়-আসয় কি রকম ভাগ হবে ?

তারাপদ। আজ্ঞে, এই দলিল পত্রাদি নিন। সমস্ত সমান দুইভাগ করে দিতে হবে। যেমন নিক্তির ওজনে ভাগ হয় ঠাকুরদা। ওরে অনিল—ঘটী, বাটী, বাসন-কোসন, শাল, গরদ, কাপড়-চোপড়, চেয়ার টেবিল, আসবাবপত্র যা কিছু আছে, সব বার করে নিয়ে আয়। কিছু বাকী থাকবে না। চুল চিরে ভাগ করে দিন ঠাকুরদা।

রাম ঠাকুরদা। দুই ভাগ কিহে ভায়া ?

তারাপদ। আজ্ঞে হাঁ, দুইভাগ করা হবে।

রমেশ রায়। তোমরা তিন ভাই, দুই ভাগ করবার উদ্দেশ্য কি খুলে বল।

তারাপদ। আমি আপাততঃ দুই ভাগ করতে চাই। পরে আমার যা করবার তাই করব। শরীকদারদের এতে যদি কিছু আপত্তি থাকে বলুন।

মহেশ পোদ্দার। ওহে রমেশ, চল সরে পড়ি। এ গোলমালের মধ্যে থাকা ঠিক নয়। কে এর জন্যে আদালত ঘর করে বেড়াবে।

হরি খুড়ো। যদি শরীকদারদের কোনও আপত্তি না থাকে, তা হলে আর গোলমাল কি ?

ভোলানাথ জ্যেঠামশায়। তা বটে, আমাদের দাঁড়িয়ে থেকে ভাগ করে দিতে আর আপত্তি কি। কি বল হে অনিল, বসন্ত কি বল, দুই ভাগই হবে ?

অনিল। দাদা যা ভাল বুঝ্‌ছেন করছেন। তার উপর আমাদের আর বলবার কিছু নেই।

তারাপদ। ওরে বসন্ত, যা তোর বড় বৌদিকে ডেকে নিয়ে আয়। দাঁড়িয়ে থেকে ভাগ দেখে নিন।

* * * * *

তারাপদ। কি ঠাকুরদা, এই দুই ভাগই সাব্যস্ত হল।

রাম ঠাকুরদা। আমাদের মতে এই দুইভাগই সমান হয়েছে বলেই বোধ হয়। কি বল হে মহেশ।

মহেশ পোদ্দার। হাঁ, তা বইকি।

তারাপদ। কৈ রে বসন্ত, তোর বড় বৌদি কোথায় ?

বসন্ত। আজ্ঞে, ঐ দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে।

তারাপদ। বেশ, তা দেখ বড় বৌ, তোমার ভাগ তুমি আগে বুঝে নাও। সব সমান দুই ভাগ হয়েছে, আর আমি নিজে আর এক ভাগ, এই তিন ভাগ। এখন তুমি এই পাঁচজন ভদ্রলোকের সামনে বল, কোন ভাগ নেবে। যদি বিষয় চাও আমায় পাবে না ; আর যদি আমায় চাও বিষয় পাবে না। বল, কোন ভাগ চাও ? চলে গেলে হবে না, একটা হেস্তনেস্ত করে যাও।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উদ্ধার

১

রামীর বাবা বাঁচিয়াছিল, তথাপি রামীর মা গৃহস্থের বাড়ী চাকরানীগিরি করত। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রামীর মা সগর্বে বলিত, "ঘরগেরস্তালী ত আমার, সে মিনসে কি পারে? বসে বসে তামাক খায়, আর কাশে; আর নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। এক গাছ খড় ভেঙ্গে দু'টুকরো করে না গো! আমি মাগী হয়ে যা পারি সে মিনসে যদি তার সিকির সিকি পারতো, তাহ'লে এতদিন মজুমদারদের ছোট বৌর মত নথের 'টানা' গড়িয়ে নিতাম। অর্দেষ্টে দুঃখু আছে তাঁতির মাকুর মত একবার বাড়ী, একবার মনিব-বাড়ী এই করি, নিজের কাজও হচ্ছে না, মনিবেরও নাথি খেতে খেতে মরলাম। আমার হাতে না পড়লে এতদিন মিনসের দশায় হতো কি?

রামীর মার এই জবাব শুনিলেই বুঝিতে পারা যায়. সে যাহাদের কাজ করিত, তাহাদের হাড়ে দুর্বা না গজাইয়া ছাড়িত না। এক বৎসরে সতেরজন গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী চাকরীর আস্বাদন গ্রহণ করিয়া যে বাড়ীতে চাকরী লইয়াছে, সে বড় কঠিন স্থান! গৃহকর্ত্রী দুর্গামণি অন্দরের দরজা বন্ধ করিয়াছেন, সুতরাং রামীর মা 'ফস্' করিয়া বাড়ী ঘুরিয়া আসিবার সুযোগ না পাইয়া দশ মিনিটের কাজ এক ঘণ্টায় করে, আর বিড়-বিড় করিয়া বকে। একে ত মুখখানি ধান সিদ্ধ করা হাঁড়ির মত অত্যন্ত কালো ও গম্ভীর, তাহার ভিতর মূলোর মত সুদর্শন দন্তশ্রেণী যখন মানসিক উষ্ণতার পরিচয় জ্ঞাপন করিতে আত্ম প্রকাশ করে, তখন তাহাকে কিরূপ সুন্দরী দেখায়, তাহা যিনি নিত্যলাল কর্মকার খোদিত পুতনাবধের চিত্র না দেখিয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন না।

রামীর মার নিজের এক প্রকাণ্ড সংসার, পনের বছরের মেয়ে রামী সংসারের সকল কাজ করে। রামীর মা মনিব-বাড়ীর কাজ নষ্ট করিয়া বাড়ী আসিয়া দেখিল, তাহারজন্য কোন কাজ পড়িয়া নাই। এমনকি, গোয়ালে যে গোবরস্তূপ পড়িয়া ছিল, তাহাও সে দেওয়ালে চাপ্‌ড়ি দিয়াছে, এবং একরাশি ময়লা কাপড় ক্ষারে সিদ্ধ করিয়াছে। রামীর মা রাগ করিয়া বকিতে লাগিল, "কাজের ছিরি দেখ! ওরকম ব্যাগারে কাজ না কল্লেই হয়।" রামীর মা তাহার মনিব-গিন্নীর নিকট এই কথাটি প্রত্যহই শুনিতে পাইত। সে তাহাই কন্যার উপর প্রয়োগ করিয়া সবেগে নাক ঝাড়িতে লাগিল। নাক না ঝাড়িলে ক্রোধ তাহার নাসারন্ধ্র ত্যাগ করিত না। রামী মায়ের মুখ নাড়ায় জ্বালাতন হইয়া উঠিয়া ছিল, সে আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া বলিল, "তা তুই-ই এখন থেকে বাড়ীর কাজ করিস, আমি তোর মনিব-বাড়ী কাজ করে আস্‌বো।"—রামীর মা বলিল, "তাই তোকে পাঠাবো। তিন দিনে বাপ্ বাপ্ করে পালাবার পথ পাবিনে।"

২

রামীর মা যখন রামীর বিবাহ দিয়াছিল তখন রামীর বয়স সাত বৎসর। রামী তখন একমাথা রুক্ষু চুল একটা ফালি দিয়া বাঁধিয়া একখানা ময়লা কাপড় বগলে লইয়া তাহার মায়ের সঙ্গে মনিব-বাড়ী যাইত। এতবড় মেয়ের বিবাহ হইল না ভাবিয়া রামীর মার ক্ষুধা তিন গুণের অধিক বর্দ্ধিত হইত না, এবং কাজ করিতে করিতে আঁচল পাতিয়া শয়নমাত্র

নিদ্রাকর্ষণেও বিলম্ব হইত না ! অবশেষে সে বিস্তর চিন্তার পর ঠিক্‌রে গ্রামের মধু মণ্ডলকে সৎপাত্র জানিয়া তাহার হস্তে মেয়েটিকে সমর্পণ করিল। মধু মণ্ডলের বয়স রামীর মার বাপের বয়সের সমান ! সংসারে তাহার কেহ ছিল না। স্ত্রীটি বহুদিন পূর্বেই গা তুলিয়া ছিল, সে তাহার শ্বশুর-বাড়ী থাকিত, শ্যালকের কিছু জোত-জমা ছিল, তাহার কৃষাণী করিত। কথিত আছে তাহার শ্যালকের তেঁতুল তলায় যে ক্ষুদ্র কুটীরখানি আছে, তাহা মধুর নিজস্ব সম্পত্তি, সেই কুটীরে একটি ফুটো ঘড়া, দুখানি কাঁসার থালা,—একখানি কাঁধা ভাঙ্গা, অন্যখানি ফাটা, একজোড়া দাসড়া বলদ, এবং ঐরূপ আরও কিছু তৈজসপত্র ছিল ; সেই সম্পত্তির লোভে রামীর মা এই বৃষকাষ্ঠের সহিত রামীকে বাঁধিয়া দিল। রামীর মা বলিত, "জামাইয়ের সম্পত্তি আছে সুখে থাক্‌বে।"

রামী একবার স্বামী-গৃহে গিয়াছিল। বুড়া রামীকে বলিয়াছিল, "এত বড় জোয়ান মেয়ে মানুষ, ভাত রাঁধতে শিখিস্‌নি ?" রামীর বয়স তখন আট বৎসর। বুড়ার চেহারা ও বয়স দেখিয়া রামী একদিন ভয়ে পলাইয়া সেই পাড়ার সরকারদের ঢেঁকি-ঘরে লুকাইয়াছিল। পত্নীর এবম্বিধ ব্যবহার দেখিয়া ক্রুদ্ধ মধু মণ্ডল তাহার পৃষ্ঠে 'পাঁচন' প্রয়োগ করিয়াছিল। তাহার পর রামীর মা—আর কখনও মেয়েকে জামাইয়ের কাছে পাঠায় নাই। মধু মণ্ডল বহুবার পরিবার লইতে শ্বশুর-বাড়ী গিয়াছিল, কিন্তু রামীর মা মেয়েকে ছাড়িয়া দেয় নাই। রামীও তাহার স্বামীকে বাড়ী আসিতে দেখিলে পাড়া ছাড়িয়া পলাইত, মধু মণ্ডল দন্ত কড়মড়ি করিয়া বলিত, "একবার তোকে বাগে পেলে হয়, বাড়ী নিয়ে গিয়ে কুম্‌ড়ো বলি দেব।" রামীর মার ভয় হইল, মেয়েটাকে পাঠাইলে জামাই তাহাকে মারিয়া ফেলিবে।

সেই সময় হইতেই রামী মায়ের কাছে। —মেয়ের কথা শুনিয়া রামীর মা পরদিন রামীকে মনিববাড়ী কাজ করিতে পাঠাইয়া নিজে ধান সিদ্ধ করিতে বসিল। সে ভাবিতে লাগিল, রামীকেও, এক জায়গায় কাজে লাগাইয়া দিলে মাসিক পাঁচ টাকা উপায় হইতে পারে।

কিন্তু পরিবারওয়ালা বাসা ত সর্বদা মেলে না। যেখানে সেখানে কাজে লাগাইতে তাহার সাহস হইল না। আফগারির দারোগা সপরিবারে গ্রামে বাস করিতেছিলেন ; তাঁহার ঝির আবশ্যক হওয়ায় রামীর মা রামীকে সেখানে কাজে ভর্তি করিল। পাঁচ টাকা বেতনে রামী নূতন চাক্‌রীতে বাহাল হইয়া কল্পনা করিল, এক বৎসর চাকরী করিয়া সে যে টাকা উপার্জন করিবে, তাহা দিয়া দু'গাছা সোনার বালা পরিতে পারিবে। কিন্তু মাস কাবার হইতে না হইতে রামীর মা আসিয়া টাকাগুলি লইয়া যাইত। ইহাতে মায়ের সহিত রামীর মধ্যে মধ্যে বচসা হইত। যাহা হউক, উভয় পক্ষে আপোষ হইলে রামীর মা বৎসরান্তে রামীর জন্য রূপোর পৈঁছে প্রস্তুত করাইয়া দিল। রামী ভয়ানক রাগ করিয়া বলিল, "আমাদের গিন্নীর হাতে সোনার চুড়ি, চুড়ির কোলে ব্রেস্‌লেট, আর আমার হাতের রূপোর পৈঁছে !" দারোগা-গিন্নী সৌখিনা, বিলাসিনী ; তিনি নবযৌবনা রামীর মস্তকটি চমৎকাররূপে বর্নন করিলেন।

একদিন দারোগা-গিন্নী বলিলেন, "রামী, শ্বশুর-বাড়ী যাস্‌নে কেন ?"

রামী গৃহ মার্জনান্তে ঝাঁটায় জল ঢালিতে ঢালিতে বলিল, "সে চুলোয় যাব কি দুঃখে ?

গিন্নী বলিলেন, "মর ! শ্বশুর-বাড়ী কি চুলো হলো ?"

রামী বলিল, "চুলো তো ভাল। এ চিলু, জ্যান্তো পুড়িয়ে মারে।"

গিন্নী বলিলেন, "কখন গিয়েছিলি ?" রামী বলিল, "একবার গিয়েছিলাম, সেকি আজকের কথা, মিন্‌সে বলেছিল, হাতির মত মাগী, ভাত রাঁধতে শিখিস্‌নি ?" নুড়ো জ্বেলে দিতে হয় অমন সোয়ামীর মুখে।"

গিন্নী বলিলেন, "শুনেছি বয়স হয়েছে ; কতো বয়স ?"
রামী বলিল, "বাবার বাবার বয়েসি !" গিন্নী বলিলেন, "তবে বুঝি তোর মনে ধরেনি ?"
রামী রাগ করিয়া বলিল, আপনার কি আর কথা নেই ?"
সে পোড়ার মুখো ড্যাঁকরার নাম শুনলে আমার গায়ে ঝাঁটার বাড়ি পড়ে।"
মধু মণ্ডল শুনিতে পাইয়াছিল তাহার পরিবার চাক্‌রানীগিরি করিতেছে।
তাহার ভয়ঙ্কর রাগ হইল। সে লাঠি হাতে করিয়া শ্বশুর-বাড়ী চলিল এবং পরিবারের চুলের মুঠি ধরিয়া তাহাকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য অত্যন্ত গর্জন করিতে লাগিল। কিন্তু চুলের মুঠি দূরের কথা সে পরিবারের টিকিও দেখিতে পাইল না।

৩

রামীর মা রানীকে বাড়ী আসিতে নিষেধ করায় রামী দিবারাত্রি দারোগার অন্তঃপুরে কাটাইয়া দিল। মধু মণ্ডল লাঠি হাতে করিয়া পাড়ার মধ্যে বীরদর্প করিয়া বেড়াইতে লাগিল ; কিন্তু দারোগার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। দারোগা তাহার বীরদর্প শুনিয়া বলিয়াছিলেন, তাহার হাতে একটা গাঁজার আঁটি দিয়া তাহাকে ফৌজদারীর জাঁতায় পিসিবেন ; বীর পুরুষ হইলেও ছাতু হইবার ভয়ে মধু সে দিকে গেল না।
নানা উপায়ে কৃতকার্য হইতে না পারিয়া মধু মণ্ডল ঘরে ফিরিয়া আসিবার পর মহা উৎসাহে তাহার শ্যালকের জমিতে লাঙ্গল দিতে লাগিল। সে স্থির করিল, তাহার বলদজোড়াটা বিক্রয় করিয়া মহকুমার মোক্তারের নিকট যাইবে, এবং পরিবার লাভের প্রার্থনায় ফৌজদারী আদালতে শ্বশুরের বিরুদ্ধে এক নম্বর মামলা রুজু করিবে ; কিন্তু নানা কারণে তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল না, সংসারে কেহ নাই : সমস্তদিন লাঙ্গল ঠেলিয়া তৃতীয় প্রহর বেলায় তাতিয়া পুড়িয়া ঘরে আসিয়া মধু মণ্ডল জগৎ অন্ধকার দেখিত। ইহার উপর জন সাধারণের অর্থাৎ তাহার গ্রাম্য পাঁচজন প্রতিবেশীয় স্থূল রসিকতা ! গ্রামের সকলেই শুনিয়াছিল মধুর পরিবার সোমত্ত বয়সে পতিগৃহবাস-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া আফ্‌গারীর দারোগার দাসীবৃত্তি করিতেছে ; সে গায়ে সেমিজ পরে এবং মাথায় কুন্তলীন তেল মাখে ! ইহাতে কিছুই দোষের কথা নাই, কিন্তু যে পরের দাস্যবৃত্তি করিতে পারে, সে স্বামীর ঘর করে না কেন ? অতএব ভিতরে নিশ্চয়ই কোন গুহ্য কারণ আছে। নানা লোক নানা কারণ অনুমান করিয়া মধু মণ্ডলকে বলিল, যাহার পরিবার বদ্দিবাড়ী দাসীগিরি করে, তাহাকে এক ঘরে না কবিয়া ছাড়া ছাড়ি নাই।
মাহিষ্য 'কমিটী'র রায় শুনিয়া মধু মণ্ডল মহকুমায় শ্রীনাথ মোক্তারের সহিত দেখা করিতে চলিল, বলা বাহুল্য, এই মহকুমাতেই রামী দারোগার বাড়ী চাক্‌রানীগিরি করিত। সেই পাড়াতেই শ্রীনাথ মোক্তারের বাসা। সেদিন রবিবার, জ্যৈষ্ঠমাস, আম কাঁঠাল পাকা গরম ! শ্রীনাথ মোক্তার বেলা তিনটার পর নিদ্রা ভাঙ্গিলে তাঁহার কাছারী ঘরের বারান্দায় জলচৌকিতে বসিয়া গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে উদরের ঘামাচি গালিতে ছিলেন ; এমন সময় মধু মণ্ডল শ্রীনাথের পৈঠার উপর উঠিয়া গড় হইয়া এক প্রণাম ! মক্কেল বুঝিয়া শ্রীনাথ ঘামাচিগুলিকে নিষ্কৃতি দান করিয়া অদূরবর্তী চটের উপর মধুকে বসিতে অনুরোধ করিলেন, এবং গুড়গুড়ির মাথা হইতে নির্বাপিত প্রায় কলিকাটি নামাইয়া দিয়া বলিলেন, "তামাক খাও।" মধু কলিকাটি উভয় হস্তের মুষ্টির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া মুষ্টির রন্ধ্রপথে ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া, মুখ ফিরাইয়া এমন দুই তিন দম্‌ কসিল যে, মধুর নাক্‌ মুখ দিয়া আগ্নেয় গিরির

ধূম্রোদ্গীরণ হইতে লাগিল ! কলিকা রাখিয়া মধু তাহার দুঃখের কাহিনী মোক্তারের গোচর করিল। মোক্তার বলিলেন, "তোমার শ্বশুরের নামে মেয়ে চুরির নালিস রুজু করিতে হইবে, তোমার শ্বশুরকেই আসামী করিব। তুমি তোমার পরিবারকে ঠিক পাবে ;—তবে কিছু খরচ পত্র করতে হবে, গোটা দশেক টাকা নিয়ে কাল-পরশু আমার কাছে এসো, সব ঠিক করে দেব।—কোন চিন্তা নাই বাপু ! এ রকম মামলা আমরা হামেশাই করচি।" দশ টাকার কথা শুনিয়া মধু কিছু দমিয়া গেল। বিবাহ করিতে তাহার দশ টাকা খরচ হয় নাই, আর পরিবার দখল করিতে দশ টাকা খরচ ! ঢাকের কড়িতে মনসা বিসর্জন ! পরে আরও হয় ত কতটাকা খরচ হইবে। বিশেষতঃ, মামলার কথা, কিছুই বলা যায় না, যদি মামলায় হার হয়, তাহা হইলে হাতের পাতের দুই-ই যাবে।

সেদিন আফগারির দারোগা নন্দলাল বাবুর স্ত্রী নয়নমঞ্জরী দেবীর 'দেখন-হাসি' পারুলবালা দেবীর কন্যার বিবাহ। পারুলবালার স্বামী সত্যসখা গাঙ্গুলী মহকুমার কানুনগু। নয়নমঞ্জরী রাত্রে বিবাহ দেখিতে ও বাসর সাজাইতে যাইবেন, সেজন্য অপরাহ্ণ হইতেই সাজগোজ আরম্ভ হইয়াছে। ইতিমধ্যে তিনি তাঁহার পরিচারিকা রামীকে ডাকিয়া বলিলেন, "কানুনগুবাবুর বাসায় গিয়ে আইবুড়ো ভাতের তত্ত্বটা দিয়ে আয়।" রামী ত তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত ! দারোগা-গিন্নী বলিলেন, "আহা, তুই হচ্ছিস্ আমার দাসী। ঐরকম ছেঁড়াকালো কাপড় পরে কি বিয়ের বাড়ীতে তত্ত্ব নিয়ে যায় ? একটু মানুষের মত হয়ে যা।"

কি করিলে মানুষের মত হওয়া যায় তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া রামী চৌকাঠের কাছে, 'থ' হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন দারোগা-গিন্নী তাঁহার ট্রাঙ্ক হইতে একখানা পুরাতন ধোপদস্ত গুলবাহার সাড়ী ও একটি জ্যাকেট বাহির করিয়া রামীর সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন ; বলিলেন, "ঐগুলি পরেনে, তোর চিরুণী দিযে চুলগুলো একটু আঁচড়ে নে, মাথাটা যেন বাবুয়ের বাসা হয়ে আছে ! মাথায় একটু তেল দিস্। দাঁড়া, আমার কুন্তলীন আছে, তাই তোলা টাক্ দিচ্ছি, খাসা খোস্‌বো বেরুবে। তুই এয়োস্ত্রীমানুষ ; লজ্জা কি ? পাঁচজনে দেখে বল্‌বে 'হাঁ, বড়লোকের ঝি বটে' !"

আঠার বৎসর বয়সে একখানি ভাল কাপড় পরিতে, একটা জ্যাকেট গায়ে দিতে বা মাথায় একটু কুন্তলীন দিয়া চুল বাঁধিতে সখ না হয়,—এই বাঙ্গলাদেশে কুমারী বা সধবার মধ্যে যদি এরকম মেয়ে থাকে ত তার রমণী জন্মই বৃথা ! মনিব-ঠাক্‌রুণের প্রস্তাবে রামী অত্যন্ত খুসী হইয়া তাঁহার আদেশ পালন করিতে চলিল। সাজগোজ করিয়া আসিয়া সে দারোগা-গিন্নীর পায়ের গোড়ায় 'ঢিপ্' করিয়া একটা প্রণাম করিল। রামীর তখন শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। গিন্নী তত্ত্ব সাজাইয়া রামীর হাতে দিলেন, এবং তাহার গুলবাহার সাড়ীতে দুই এক বিন্দু 'দেলখোস্' ছড়াইয়া তাহাকে সৌরভাকুল করিলেন। রামী স্ফূর্তিভরে গিন্নীর দেখন-হাসির বাড়ী চলিল, রামী যে পথে যাইতেছিল, সেই পথ দিয়াই তাহার স্বামী মধু মণ্ডল সেই অপরাহ্নে মোক্তার বাড়ী হইতে চিন্তাকুল চিত্তে গৃহে ফিরিতেছিল, হঠাৎ রামী স্বামীর সম্মুখে পড়িয়া গেল। তখন রামীর কি অবস্থা, তাহা রসিকা পাঠিকা অনুমান করুন। সে পায়ে-পায়ে জড়াইয়া পড়িবার মত হইল, ভয়ে তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, বুকের মধ্যে ঢেঁকি পড়িতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া দিল। কিন্তু পরিবারের সাজসজ্জা ওরূপ দেখিয়া মণ্ডলের পোর অবস্থাও অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। বিদ্যাপতি পড়া থাকিলে এবং কাঁধে খোল বাঁধা থাকিলে সে মাথা নাড়িয়া টিকি দুলাইয়া তৎক্ষণাৎ সুর করিয়া গাহিয়া ফেলিত,—

অপরূপ পেখনু রামা,

* * *

হারিণী হীন হিম ধামা !

৪

উভয়ে উভয়কেই চিনিতে পারিল। মাছের মুড়া সম্মুখে দেখিলে বিড়াল যেভাবে তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, মধু মণ্ডল সেইরূপ লুব্ধ দৃষ্টিতে পত্নীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া অন্যপথে বাড়ীর দিকে চলিল। দেলখোসেব সুবাসে তাহার মনে হইতেছিল, দেবকন্যা বুঝি ছদ্মবেশে তাহাকে ছল না করিতে আসিযাছে ! সে ক্ষেপিযা উঠিল। মধু মণ্ডলের গ্রামে এক দাদাঠাকুর থাকিতেন ; সকলে তাঁহাকে 'চূড়ামণি' ঠাকুর বলিত ; কিন্তু তিনি কোন বিদ্যার চূড়ামণি তাহা কেহ জানিত না, তবে তিনি যে চতুরের চূড়ামণি ছিলেন তাহা গ্রামের কোন লোকের অজ্ঞাত ছিল না। মধু মণ্ডল বাড়ী ফিরিযা দাদাঠাকুরের সহিত পরামর্শ করিতে বসিল, এবং পরিবার লাভের জন্য শ্রীনাথ মোক্তার যে পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছিল, কথা প্রসঙ্গে তাহাও তাঁহার গোচর করিল। দাদাঠাকুর জিহ্বা ও তালুর সংস্পর্শে অস্ফুট শব্দ করিয়া বলিলেন, "রাধা মাধব ! উকিল মোক্তারের পরামর্শ কি মানুষে শোনে ! তারা আর জন্মে ছিল জোঁক, এজন্মে মক্কেলদের রক্ত চুষে খায়। পরিবাব বেহাত হয়েছে বলে ফৌজদারীতে দরখাস্ত দিবি ! বাম কহ ! এরকম কাজ কি মানুষে করে ? পরিবারটা কি তোর লাঙ্গলের বলদ যে, নাকে দড়ি দিয়ে গাড়িতে জুড়ে দুই এক 'শাঠে' তাকে বাগে আন্‌বি ? মণ্ডলের পো, ঘরের কথা নিয়ে থানা-কাছারী এক করিস্‌নে। কিছু পয়সা খরচ করতে পারিস্ ত পরিবার দখল হয়।"

মধু মণ্ডল ব্যগ্রভাবে বলিল, "কি কাজ দাদাঠাকুর ! বল, তোমার পায়ে পড়ি।

"আমার সম্বলের মধ্যে ঐ দুটো বলদ, তা বিক্রী করে টাকা জোগাড় করবো, মামলা করতে গেলেও ত টাকা খরচ হয়, না হয় তোমার ফন্দীতেই চলি।"

দাদাঠাকুর মধু মণ্ডলকে কি যুক্তি দিলেন তাহা অন্যে জানিতে পারিল না।

কিন্তু মধু বুঝিল, দাদা ঠাকুরের যুক্তি অমোঘ, তাহাতেই তাহার কার্য সিদ্ধি হইবে ; সুতরাং সে পরদিন বেতবেড়ের হাটে তাহার বলদ দুইটি বিয়াল্লিশ টাকা বার আনায় বিক্রয় করিয়া আসিল। অনন্তর দাদাঠাকুরের উপদেশে মধুর শিক্ষা আরম্ভ হইল। পল্লীগ্রামের চাষা, তাহার দাড়ি গোঁফ কোন দিনই ছিল না, তবে রাখাল রাজ গোস্বামীর শিষ্য বলিয়া তাহার মস্তকে একটি স্থূল শিখা ও গলায় তিন কণ্ঠী মোটা মালা ছিল, দীর্ঘকাল তেলে জলে পাকিয়া তাহা বার্নিশ করার মত দেখাইত। দাদাঠাকুর তাহার টিকি ও মালা উভয়ই কাটিয়া দিলেন ; এবং কোথা হইতে একশিশি কলপ আনিয়া আধ-পাকা চুলগুলি বার্নিশ করিয়া দিলেন। তাঁহার আদেশে মধু মণ্ডল মহকুমার বাজার হইতে একটি টিনের তোরঙ্গ কিনিয়া আনিল, নানা রকম জিনিসে সে তোরঙ্গটি বোঝাই করিল। দু'জোড়া বাহারে সাড়ী, একটি সেমিজ, একটি জ্যাকেট্, একবাক্স সাবান, একখানি তোয়ালে, এক শিশি কুন্তলীন, এক শিশি দেলখোস, একখানি আয়না, খান দুই চিরুণী, একটি সিন্দুর কৌটা, এক শিশি তরল আলতা, এবং এই প্রকার আরও দুই একটা জিনিস কিনিতে তাহার সর্বসমেত বাইশ টাকা সাড়ে সাতআনা খরচ হইয়া গেল। এতদ্ভিন্ন সে নিজের জন্য ধোলাই ধুতি, এক জোড়া জুতা, একটি লংক্লথের মেরজাই, নয় সিকা মূল্যের সিল্কের চাদর প্রভৃতি কিনিয়া তাহা পরিধান

পূর্বক ভোল বদল করিল ; তাহার পর একখানি গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া মহা সমারোহে শ্বশুর-বাড়ী যাত্রা করিল। রামীর মা জামাতার নূতন রূপ ও বেশভূষা দেখিয়া মোহিত হইল ; তাহার পর সে যখন জামাতৃপ্রদত্ত বাক্স খুলিয়া তত্ত্বের ঘটা দেখিল, তখন বুঝিতে পারিল তাহার জামাতার কপাল ফিরিয়াছে ! কথা প্রসঙ্গে মধু মণ্ডল প্রকাশ করিল, মা কালী তাহাকে স্বপ্ন দিয়াছিলেন, জগ্‌জগার মাঠে আকন্দতলায় এক ঘটী টাকা পোতা আছে, অমাবস্যার রাত্রে আকন্দ গাছটা খুঁড়িয়া ফেলিলেই টাকা পাওয়া যাইবে। টাকাগুলি পাওয়াতেই তাহার অদৃষ্ট ফিরিয়াছে।—রামী দেখিল তাহার স্বামী ভদ্রলোক হইয়াছে, আর তাহাকে তেমন বুড়াও দেখাইতেছে না ! বিশেষতঃ বাক্সভরা জিনিস, তাহার মনিব দারোগাবাবু, গিন্নীর মনোরঞ্জনের জন্য যাহা আনিয়া দেন,—সেমিজ, সাড়ী, আয়না, চিরুণী, কুন্তলীন, দেলখোস, সে সমস্তই তাহার স্বামী তাহার জন্য আনিযাছে। আবার বাড়ীতে টাকাও আছে। রূপার বিছে ও সোনার নথ এবার সে লইবেই।—রামী চাকরীতে ইস্তফা দিয়া পরদিন আহারাদির পর স্বামীর সহিত গাড়ী চড়িয়া শ্বশুর-বাড়ী চলিল। রামীর মার মুখে তাহার জামাতার ঐশ্বর্যের বর্ণনা শুনিতে শুনিতে পল্লী-রমণীগণের কানে তালা লাগিল।

যশোমালিনী দাসী

আশ্রিতা

শোকের তীব্র যাতনায় জর্জরিত হইয়া অশ্রুজল সম্বল করিয়া কমলা যখন দেবর-গৃহে আশ্রয় লইল তখন তিন বৎসরের কন্যা চুনী ব্যতীত তাহার দগ্ধ বুকে সান্ত্বনা দিবার আর কিছুই ছিল না। যাহা মানুষে ভাবিতে পারে না তাহাই শেষে সহ্য হয় ; দিনে দিনে কাহার অদৃশ্য মঙ্গল হস্তের সান্ত্বনা প্রলেপে শোকের প্রথম আবেগ প্রশমিত হইলে, থাকিল কেবল স্মৃতি। সংসারে কাহারও দিন পড়িয়া থাকে না, কমলারও থাকিল না।

সে আজ কয় বৎসরের কথা মোহনপুর গ্রামখানিতে পাঁচ ঘর ব্রাহ্মণ ভদ্রের বাস ছিল। গ্রামে ম্যালেরিয়ার কৃপাদৃষ্টি না পড়িলেও কলেরার জন্য বৎসর বৎসর মৃত্যুর তালিকায় ম্যালেরিয়াগ্রস্ত গ্রামের মতই খরচ দেখা যাইত। গ্রামের গয়ানাথ দত্ত জমিদার বা বড়লোক ছিলেন না ; তথাপি তাঁহার অমায়িক সরল ব্যবহারে সকলেই তাঁহাকে চিনিত ও সম্মান করিত। তাঁহার লোকান্তর হইলে ছোট পুত্র বমানাথ পরিবার লইয়া কর্মস্থানে চলিয়া গেলে বাড়ীতে থাকিল জ্যেষ্ঠপুত্র রাধানাথ ও তাহার পত্নী কমলা। হঠাৎ মৃত্যুর বন্যা গ্রামে হুঙ্কার করিয়া আসিলে সাত বৎসরের একমাত্র পুত্র সুধীর ও স্বামী রাধানাথ কমলাকে নিঃসহায়া করিয়া সেই বন্যায় ভাসিয়া গেল। গ্রামে বাস্তু ভিটা ও কয়েক বিঘা জমি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না এবং পিতৃগৃহে বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভাই, কাজেই দেবরের নিকট যাওয়া ব্যতীত কমলার আর অন্য উপায় রহিল না।

২

পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, চুণী আট বৎসরে পড়িযাছে কমলার এখন একমাত্র চিন্তা এই মেয়েটার জন্য। কত তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা তাহার জীবনের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে সমস্তই সে সহ্য ও উপেক্ষা করে ; কিন্তু যখন তার অভিমানিনী মেয়েটি সজল চক্ষে গলা জড়াইয়া

নানা প্রশ্নে আকুল করিয়া তুলে তখন সে আর চোখের জল রাখিতে পারে না।

চুণী তাহার কাকাবাবুর মেয়ে মণিমালার সমান ; মা ভিন্ন তাহার ভাল বাসিবার কেহ ছিল না। মণির বাবা আসিলে মণি ছুটিয়া যাইত, চুণীও যাইত, মণিকে লইয়া তিনি কত আদর করিতেন ; চুণী এক কোণে ম্লান দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া থাকিত, কেহ তাহাকে একবার ডাকিত না। পিতৃস্নেহ-বঞ্চিতা বালিকা একটা স্নেহের ডাকের জন্য ছুটিয়া আসিত, কেহই ক্ষুদ্র হৃদয়ের ব্যথা বুঝিত না। এ উপেক্ষা বালিকার সহিয়া গিয়াছিল ; যেদিন মণির বড় ভাই বিনয়ের পড়িবার ঘরে যাইয়া বিনা দোষে ধমক খাইয়া মার কাছে আসিয়া গলা জড়াইয়া বলিল, "বাবা ভিন্ন বুঝি কেউ ভালবাসে না, না মা ?" মা অলক্ষ্যে চক্ষের জল আঁচলে মুছিয়া বলিলেন, "বাসে বৈকি ? সবাই কি মুখে ভালবাসা দেখাতে পারে মা ?" "মনে মনে বুঝি ভালবাসে ? তবে সবাই শুধু শুধু আমাকে বকে কেন মা ? সেদিন পট্‌লার কাছে বসেছিলাম পট্‌লা আমাকে চিম্‌টি কাটলে. আমি কাঁদলাম খুব ব্যথা লেগেছিল বলেই কেঁদেছিলাম, মণি দিদি এসে পট্‌লাকে মারলে তাতে কাকাবাবু আমাকে কত বকলেন।" সেদিন সন্ধ্যা করিতে গিয়া কমলা থাকিতে পারিল না, স্বামীর মৃত্যুর পর সে কত বৎসর ধরিয়া পাষাণ প্রতিমার মত সব সহিয়াছে, বড় করিয়া কাঁদে নাই পর্যন্ত, আজ ধৈর্যেব বাধ ভাঙ্গিয়া গেল, মাটীর উপর পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আকুল হইয়া বলিল 'ঠাকুর আর কতদিন এ পরীক্ষায় আমায় রাখিবে ? যদি দুঃখ দেওয়াই তোমার ইচ্ছা তবে হাসিমুখে সহিবার শক্তি দাও।'

৩

ছয় মাস হইল উপযুক্ত বরে মণির বিবাহ হইয়া গিয়াছে। চুণী প্রায় মণির সমান, সে দুইবার শ্বশুর-বাড়ী গেল আর তাহার এ পর্যন্ত বিবাহ হইল না। ভাবিতে ভাবিতে কমলার চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে, রাত্রে নিদ্রা নাই। মাঝে মাঝে ছোট বৌয়ের নিকট সান্ত্বনা পাইত 'ভেবে আর কি হবে ! হবেই এক রকম' কিন্তু এ সান্ত্বনা তাহার ছিন্ন হৃদয়কে আরও ব্যথিত করিয়া তুলিত। তাহার দগ্ধজীবনের এক কোণে যে একটি ক্ষুদ্র লতা বাড়িয়া উঠিয়াছে যাদের সংসারে সে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছে তাদের কাছে কি সে কিছুই আশা করিতে পারে না ?

আর চুণী সে তাব মাতার মতই শান্ত ছিল। কমলা অনেক শিল্প কাজ জানিত, মাতার নিকট চুণী সমস্তই আগ্রহভরে শিখিয়াছিল। দাস দাসী ছিল, তবু সংসারের ছোট বড় কাজ কমলা কন্যাকে দিয়া করাইত, তা ছাড়া মণির ছোট ভাই খোকাকে দুধ খাওয়াইয়া কোলে করিয়া সে দিন কাটাইয়া দিত।

এবাব মণি শ্বশুর-বাড়ী হইতে আনিয়া এক শিশি কুন্তলীন ও এক শিশি দেলখোস চুণীকে দিয়াছিল সে কৃপণের ধনের মত একদিনও তাহা খরচ করে নাই ; মাঝে মাঝে খুলিয়া দেখিয়া আবার রাখিয়া দিত। সেদিন খোকাকে কোলে লইয়া শিশিটি বাহির করিয়া এক ফোঁটা দেলখোস খোকার গায়ে দিতেই খোকা হাত দুখানি বাড়াইয়া জোরে শিশি ধরিতে গেল। খোকাকে সাম্‌লাইতে গিয়া চুণীর হাত হইতে হঠাৎ শিশিটি পড়িয়া ভাঙিয়া গেল। চুণী তাড়াতাড়ি খোকাকে মাটীতে ধপ্‌ করিয়া বসাইয়া দিয়া এসেন্স তুলিতে লাগিল, ছোট

ছোট কাঁচের টুক্‌রা হাতে বিঁধিয়া কাটিয়া গেল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। খোকার মা খোকাকে দুধ খাওয়াইবার জন্য ঘরে আসিতেছিল, কান্না শুনিয়া দ্রুতপদে আসিয়া ছেলেকে তাড়াতাড়ি কোলে লইয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল "খুব মেয়ে তুই যা হোক্! তোর কাছে খোকা যেতে চায় বলে কি এমনি করেই মারতে হয়!" চুণী সহসা মুখ তুলিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল "আমি কখন মেরেছি খুড়ীমা? খোকাকে কি আমি মারি?" "হ্যাঁ হ্যাঁ চিনেছি তুমি কেমন মেয়ে" বলিয়া আর একবার ঝাঁকানি দিয়া ছেলেকে কোলে লইল। কমলা পাশেই আঁচল পাতিয়া শুইয়াছিল, খোকার কান্না তাহার কানে যায় নাই, চারুর কথা কানে যাইতেই উঠিয়া বলিল "কি চিনেছ ছোট বৌ, একটুও চেন নাই? মানুষ চেনার শক্তি তোমার নাই, মানুষকে ঘৃণা ক'রবার শক্তি তোমার আছে। ওকি খোকাকে কখনও মারে? ও যে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে।" চারু এরূপ উত্তরের প্রত্যাশা করে নাই, সহসা কমলার মুখে অপ্রত্যাশিত কথাগুলি শুনিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল, মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

বিধবা হইয়া এখানে আসার পর কমলা চারুর কথার বা ব্যবহারের একটি উত্তরও করে নাই, তাহার কেমন যেন একটা অবসাদপূর্ণ দুর্বলতা সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া থাকিত। চারু মুখে ঝগড়া করিত না কিন্তু এমনই তীব্র কথা শুনাইত যে তাহা কমলার প্রাণের ভিতর গিয়া বিঁধিত, তথাপি কোন উত্তর দিতে তাহার প্রবৃত্তি হইত না। কতদিন চুণীকে অকারণে বা সামান্য কারণে দুই-চার-কথা বলিয়াছে, তাহাতে কমলা কন্যাকেই 'তোর আক্কিল হবে কবে', 'বার বার বারণ করলেও শুনবিনে' বলিয়াই থামিয়া যাইত। সংসারের কোন কার্যে সে কমলার পরামর্শ বা সাহায্য চাহিত না, কখন যদি ডাকার দরকার হইত পাঁচ হাত তফাৎ থাকিলেও ঝিকে দিয়া ডাকাইত, অথচ প্রতিদিন সমানে সকালে তাহার রান্নার জোগাড় হইয়া যাইত। এরূপভাবে চারু দেখাইত যে তোমার কোন সাহায্যের প্রয়োজন আমার নাই অথচ অনর্থক আমি তোমার সমস্ত ভার লইয়াছি। এই স্নেহ ভালবাসার অভাবের মধ্যে তাহার মনে পড়িত সুদূর সেই গ্রামখানির কথা, সেই বেনেদের বৌ, সেই ঘোষেদের বাড়ীর সই, সেই সর্ব ঠাকুর ঝি, যাহারা অযাচিতভাবে অকৃত্রিম স্নেহধারা ঢালিয়া দিত, গ্রাম্য অশিক্ষিতা তাহারা, কিন্তু তাহাদের স্নেহ কত উচ্চে! সময় সময় চারুর চোখ-মুখ রাঙ্গান দেখিয়া কমলা অবাক হইয়া যাইত, এই কি সেই চারু! যে গলা ধরিয়া বলিত 'দিদি তুমি ম'লে আমি থাক্‌ব কি করে?' মানুষের এত পরিবর্তন! বহুদিনের সুপ্ত নারীত্ব ক্ষণের জন্য তাহার আজ জাগিয়া উঠিয়াছিল।

মানুষ যখন অতিরিক্ত দুঃখে পড়ে তখন তাহাতেই অভিভূত হয়, আবার যখন সুখে থাকে তখন দুঃখ কেমন অনুভব করিতে পারে না। কমলা অতিরিক্ত দুঃখে পড়িয়া উত্তরোত্তর আঘাত পাইয়া যতই নত হইয়া পড়িতেছিল, যতই মুখাপেক্ষী হইতেছিল চারু ততই ঘৃণার চক্ষে ছাড়া ভক্তি ভালবাসাব চক্ষে দেখিতে পারিত না। কমলা যেদিন চারুকে রূঢ় কথা বলিয়া ভাবিতে লাগিল, এতদিন সহ্য করিয়া কেনই বা বলিলাম হয়তো সে কথাই বলিবে না। কিন্তু আশ্চর্য, চারু রাগ করিল না, উপরন্তু শুনাইয়া শুনাইয়া কথা বলা একটু কমিল।

৪

সন্ধ্যা করিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিতেই 'মামীমা' বলিয়া একটি ২২/২৩ বৎসরের ছেলে আসিয়া দাঁড়াইল। কমলা তাহাকে চিনিতে পারিল না, মাথায় একটু কাপড় টানিয়া

দিয়া সরিয়া আসিলে চারু আসিল। তাহাকে প্রণাম করিয়া ছেলেটি বলিল,-"কেমন আছেন?" "কে নীরোদ, কবে এলে?"

"আমরা তিন দিন হ'ল এখানে এসেছি।" ছেলেটি চলিয়া গেলে চারু কমলার নিকট তাহার পবিচয় দিল, "কে জান দিদি? ও শশী ঘোষের দৌহিত্র। তুমি প্রথম যখন এসেছিলে, তখন ঠাকুরঝির সঙ্গে তোমার আলাপ ছিল। নীরোদ তখন ছোট। ওরা এখানে ছিল না, সম্পত্তি আর বাড়ী মোকদ্দমায় জিতে এখানে এসেছে। বিয়ে হয়েছিল, এক মাস পরেই বৌ মারা যায়। আর নাকি বিয়ে করবে না। কত বড়লোক, পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে পর্যন্ত সাধাসাধি করছে।" কি মনে করিয়া চারু সমস্ত কথা বলিয়া গেল কমলার বুঝিতে বাকী রহিল না। ছেলেটি দেখিয়া চকিতের মত একটি কথা মনে উদয় হইয়াছিল কিন্তু সে যে বামন হইয়া চাঁদে হাত! কাজেই মনের ভাবনা মনেই মিলাইয়া গেল।

কয়েক দিন ধরিয়া ভাবিতে ভাবিতে কমলা পাগলের মত হইয়া উঠিল, ছেলেটি দেখিয়া অবধি তাহার মনের নিভৃত কোণে প্রশ্ন জাগিয়া উঠিত, কেন চুণী তো কালো কুৎসিত নয়, হইতে কি পারে না? কিন্তু হায বলিবাব যে উপায় নাই; চারু আগেই বলিয়া বাখিয়াছে, পাঁচ হাজার যে পায়ে ঠেলিতেছে তাহাকে কোন মুখে একথা বলিবে?

হঠাৎ একদিন চাক আসিয়া বলিল, "এতদিনে এক ছেলেব সন্ধান হ'ল; এখন তোমাদের মত হলে হয়। ছেলে ভালই, তবে এক দোষ তার পূর্ব পক্ষের ছেলে পিলে আছে। ছেলে নিজে উকীল আব নেবেও না কিছু।" কমলা জানিত এরকম ব্যতীত ভাল পাত্রে সে মেয়ে দিতে পাবিবে না, তবুও দোজ বর, আরও ছেলেমেয়ে আছে শুনিয়া তাহার মুখ বিবর্ণ হইযা গেল; সামলাইযা লইয়া বলিল, "ছেলে-পিলে আছে তাই ভাব্‌ছি।" "এর চেয়ে কি ভাল পাওয়া যাবে" বলিয়া চারু উঠিগা গেল।

৫

সেই পাত্রে চুণীর বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। কমলা ভাবিযা চিন্তিযা মত দিয়াছে, সে জানিত এ বিবাহ না দিলে তাহার মেয়ের বিবাহ আর হইবে না। তাহাব বুক ফাটিয়া যাইতেছিল কিন্তু হায় সে যে পরাধীনা।

বিবাহেব সমস্ত ঠিক; ধূম-ধাম কিছুই নাই, বাজনা নাই আলোর বন্দোবস্ত নাই। কেবল উঠানে কলাগাছ পোঁতা হইয়াছে মাত্র। আর যাহারা বরেব সহিত আসিবে তাহাদের এক রাত্রের আহারের বন্দোবস্ত হইয়াছে। কমলার আনন্দের কিছুই নাই, হৃদয়ে উৎসাহ নাই নিরানন্দ জীবনটা তার আজ আরও নিরানন্দ লাগিতেছে। বুকের ব্যথা বুকে রাখিয়া চোখের জল চোখে রাখিয়া ম্লান মুখে কাজ করিয়া যাইতেছে মাত্র।

সেই রাত্রেই বব আসিবার কথা। বর আসিবার সময় প্রায হইয়াছে, এমন সময় খবর আসিল পাত্র হঠাৎ কাতর হইয়া পড়িয়াছে। কমলা সন্দেশের থালা ঘরে তুলিতেছিল, কথা কানে যাইতেই তাহার সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, হাত হইতে থালা পড়িয়া গেল। দিনের পর দিন মাসের পর মাস তাহার এই ভাবনাতে চলিয়া গিয়াছে, মনে করিয়াছিল সুখী না হইলেও এ চিন্তা হইতে মুক্তি পাইবে এটুকুও তাহার ভাগ্যে সহিল না। যাঁহার করুণা-ধারা হইতে কীট-পতঙ্গও বঞ্চিত নহে, তাঁহার একটু দয়া পাইবারও কি যোগ্য সে নহে! না সে আর ভাবিতে পারিবে না, আজ বিবাহ দিতেই হইবে? তাহার মনে পড়িল নীরোদের মা বেড়াইতে আসিয়া বলিয়াছিলেন, 'বেশ মেয়েটি' সমুদ্রে নিমজ্জিত ব্যক্তি যেমন

অবলম্বন পাইলেই আঁকড়াইয়া ধরে, ভাবিবার অবসর থাকে না সে জিনিস কি ! অন্ধকারে আলো দেখিতে পাইলে মানুষ যেমন আত্মহারা হইয়া উঠে, কমলা ভাবিল না, কাহারও অনুমতি লইল না আপনাকে হারাইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

জ্যোৎস্না রাত্রি নীরোদের মা প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া পুত্রের সহিত গল্প করিতেছিলেন। সহসা কমলা বিস্ময়ের অবকাশ না দিয়া তাঁহার হাত দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুসিক্ত রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "দিদি আজ আমি তোমার আশ্রিতা, অনুগ্রহের পাত্রী, তোমার দুয়ারে ভিখারিণী, শরণাগতকে রক্ষা পুণ্য। তুমি জাতি রক্ষা কর, আজ চুণীর বিবাহ বর আসে নাই, আজ বিবাহ না হলে আর হবে না। একটা বালিকার জীবন কল্যাণময় করতে তোমার নীরোদকে অনুমতি দাও, শুধু একবার বিবাহ, তার পর ইচ্ছা হয় নীরোদের বিবাহ দিও।" এই দুখিনী বিধবাকে দেখিয়া নীরোদের মাতার চক্ষে জল আসিল, কি এক স্বর্গীয় করুণায় সমস্ত হৃদয় ভরিয়া গেল, নীরোদকে ডাকিয়া বলিলেন, "নীরোদ আমি কোন দিন তোমার নিকট কিছু চাহি নাই আজ এই বিপন্না বিধবা তোমার দুয়ারে তাকে রক্ষা কর, তোমার জীবন কল্যাণময় হবে। আর মেয়েটি রূপে গুণে লক্ষ্মী।"

চুণীকে স্নান করাইয়া বসাইয়া রাখিয়াছিল, তাহার কানে গেল, কে যেন অস্ফুট স্বরে বলিতেছে, 'মেয়েটা শেষে বুড়ো বরে বিয়ে হ'তে চল্ল। চুণীর বুকখানা কেমন করিয়া উঠিল, ইহার মধ্যে নৈকষ্য কুলীন তারিণী মুখুয্যের মেয়ের ষাট বৎসরের বৃদ্ধের সহিত বিবাহ হইয়াছে, সেই চেহারা মনে করিয়া চুণী শিহরিয়া উঠিল। সারাদিনের উপবাসে ক্লান্ত হইয়া সে শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল। যখন ডাকাডাকির পর ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিল, দেখিল ঘরে অনেক লোক।

শুভ-দৃষ্টির সময় সাহস করিয়া চুণী তাকাইল না তাহার মনে তখনও সেই বৃদ্ধবরের মুখ জাগিতেছিল। সকলে বলিল, তাকাইতে হয় চুণী জোর করিয়া একবার চাহিয়া দেখিল, একি সত্য না স্বপ্ন ! সে ভারি আশ্চর্য হইয়া গেল, এ যে নীরোদ ! তাহারই বাঞ্ছিত নীরোদ ! পুরোহিত বলিল, মালা বদল কর, ফুলের মালা।

ইন্দু দেবী

উদ্দেশে

সীতা ঝরণার জলে পা ডুবাইয়া জল লইয়া খেলা করিতেছিল। অস্তমান সূর্যরশ্মি তাহার কুন্তলীন-বাসিত কোমল কৃষ্ণ কেশের উপর পড়িয়া খেলা করিতেছিল ; সুরেশ মুগ্ধনয়নে তাহাই দেখিতেছিল। শেষে বেলা যায় দেখিযা সুরেশ ডাকিল "সন্ধ্যা হয়ে এলো সীতা, বেয়ারারা অনেকক্ষণ বসে রয়েছে, বিরক্ত হবে, চল বাড়ী যাই।" সীতা উঠিল না, মুখ তুলিয়া বলিল বেশ তো, তুমি বাড়ী যাও না, আমি একটু বসে থাকি। সুরেশ তাহার হাত ধরিল "রোগা শরীরে জল ঘাঁট্‌লে আবার অসুখে পড়বে। ছেলেমানুষি ছেড়ে উঠে এস সীতা।" সীতা এক ঝাপ্‌টা জল স্বামীর মুখে চোখে ছিটাইয়া দিয়া বলিল "বেশ তো ভাগ্যবান হবে তুমি। আজকালকার বাজারে স্ত্রীলাভ একটা মস্ত লাভ।" সুরেশ রুমাল বাহির করিয়া মুখের জল মুছিল, তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে সীতার ক্ষীণ শরীরখানি উঠাইয়া লইয়া, তীরের দিকে উঠিল। সীতা ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল "আঃ কি কর, ছেড়ে দাও। এখনি কেউ দেখতে পাবে। এই দেখ, আমার সমস্ত পাথর ছড়িয়ে পড়্‌ল ! কি সুন্দর পাথর আজ কুড়িয়েছিলুম। সীতার অভিমানভরা বাক্য শুনিয়া সুরেশ হাসিয়া আবার তাহার

হারানিধি সংগ্রহে মন দিল।

মধুপুরের ছোট ঝরণাটির নির্মল জল হইতে, সূর্যের শেষ কিরণরেখাটি মুছিয়া আসিতেছিল। পর পারে জোয়ারের ক্ষেতে আট বছরের একটা উলঙ্গ সাঁওতাল বালক, অবাধ্য মহিষকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টায়, তাহাকে মানুষের মতো গালি দিতেছিল। দূরে সুন্দরীর চুলের সিঁথির মতো যে সরু পথটি মাঠের মধ্য দিয়া আসিয়া, ঝরণার জলে একবার লুকাইয়া, আবার পর পারে ক্ষীণ রেখার মধ্যে বিলীন হইগা গিয়াছে ;—সেই নির্জন পথ বাহিয়া, দিবসের কেনা-বেচা সারিয়া, সুপুষ্ট কৃষ্ণতনু সাঁওতাল রমণীগণ, শূন্যপসরা, খালি দুধের কেঁড়ে মাথায় লইয়া, অনর্গল বকিতে বকিতে দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে গমন করিয়াছিল। তাহাদের একজনের কোলের ছেলে সহসা চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল 'এ মায়ি।'

সীতা চমকিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার সমস্ত হৃদয় মথিত করিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস উঠিল। সুরেশও একবার শূন্যপানে চাহিয়া আকাশের গায়ে কাহার একটা বড় সুন্দর সুস্পষ্ট ছবি, একবার যেন দেখিয়া লইল, তারপর আস্তে আস্তে সীতাকে বুকের মধ্যে টানিয়া মৃদুস্বরে বলিল "চল সীতা বাড়ী যাই।" দু'জনের মধ্যে আর কোন কথা হইল না। দুইখানি ছবির মতো নীরবে দু'জনে তীর ছাড়িয়া মাঠে উঠিল।

২

চা ঠাণ্ডা হইয়া গেল সীতা এখনো অনুপস্থিত। টেবিলের উপর সীতার কতকগুলা দরকারি অদরকারি চিঠি, সংবাদপত্র, ইত্যাদি পড়িয়া রহিয়াছে। সুরেশ অবশেষে অস্থিরচিত্তে উঠিয়া পড়িল।

ঘরের ভিতর, মেঝেয় গালিচায় বসিয়া, কোলের উপর একখানি ফটো লইয়া, সীতা অন্যমনস্কভাবে বসিয়াছিল। চুলগুলা কপালে উড়িয়া পড়িতেছিল ; শুষ্ক জলের রেখা তখনো গণ্ডদেশে ফুটিয়া রহিয়াছে ; দৃষ্টি ছবির দিকে ছিল না,—শূন্যময়—ভাবহীন। সুরেশ সহসা প্রবেশ করিতে পারিল না। পুত্রহারা জননীর পুত্রধ্যান ভাঙাইতে সহসা তাহার সাহস হইল না। অতি সন্তর্পণে সে সীতার পশ্চাতে যাইয়া দাঁড়াইল। সীতা জানিতে পারিল না ; কিন্তু তাহার কোলের উপর সেই আট মাসের সুন্দর শিশুটি, এক মাথা কোঁকড়া চুল, ও এক গাল হাসি লইয়া, বড় বড় চোখে চাহিয়া, দুইখানি হাত বাড়াইয়া যেন সুরেশের কোলে আসিতে চাহিতেছে মনে হইল। কোলে না লইলে এখনি বুঝি দুইখানি কচি ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিয়া উঠিবে। ছবি! শুধু ছবি! 'কোথায় লুকাইয়া আছিসরে। একবার অভাগা অভাগিনীকে দেখা দিয়া যা।' সুরেশ চোখের জল চাপিতে পারিল না।

সীতা এবার ফিরিয়া চাহিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া ছবি তুলিয়া রাখিল। তারপরে স্বামীর হাত ধরিয়া, সে ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া আসিল। সে ঘরের বাতাসে, যেন তাহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

শুষ্ক হাসি হাসিয়া সীতা জিজ্ঞাসা করিল "কলকাতার খবর কি ?" সুরেশও অন্য কথা তুলিবার সুযোগ পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেল। চিঠিগুলা সীতার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, "যা আজ এক মাস ধরে চলছে। চলে এসো, আর চলে না, কাজ-কর্মের ক্ষতি হচ্চে, পসার মাটি হোল ; মাসীর শরীর খারাপ, মামা আর সংসার দেখতে পারেন না, এই আছে। দেখ না পড়ে।"

সীতা না পড়িয়া, আস্তে আস্তে একখানা চেয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ও চিঠিগুলা ?"

"মক্কেলের। ও কি, কষ্ট হচ্চে, শুয়ে পড়লে যে ?" সুরেশ লাফাইয়া সরিয়া আসিয়া, ইজিচেয়ারটা টানিয়া, জানালার কাছে সরাইয়া আনিয়া, সীতাকে ভালো করিয়া শোয়াইয়া দিল। তারপর একটি অডিকলোন ও পাখার সন্ধানে চাহিয়া দেখিল। পাশের ঘরের টয়লেট টেবিল হইতে, অডিকলোনের শিশি আনিয়া, তাড়াতাড়ি ঢালিতে খানিকটা ফেলিয়া-ছড়াইয়া, কাচের গ্লাসে কুঁজায় জল উপুড় করিয়া, পায়ের আঘাতে ছোট টিপাইটা উল্টাইয়া ফেলিয়া, পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ভিজাইতে লাগিল দেখিয়া, সীতা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল "ব্যস্ত হচ্চ কেন ? একবার বুকটা যেন কেমন করে উঠেছিল। কি করলে বল দেখি ? ছি! বড় অস্থির তুমি।"

ভৎর্সিত সুরেশ তাহার প্রত্যাখ্যাত সেবায়, অপমান বহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। সীতা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া স্বামীকে ডাকিয়া, কাছে বসাইয়া বলিল, "এক মুহূর্তে তো আমি মরে যাচ্চি না। তুমি এত ব্যস্ত হও কেন ? যাবার হলে কলকাতাতেই যেতুম। অতবড় অসুখ থেকে উঠে আর এখানে আসতুম না। ভগবান যে নিলে না। নিলে তোমার পায়ের বেড়ি ঘুচে যেতো। সত্যি সত্যি আমার জন্য সমস্ত ছেড়ে তুমি কেন এখানে রয়েচ ? পসার-প্রতিপত্তি সমস্ত যাচ্চে। মামাকে লিখে দাও বুধবার দিন আমরা বাড়ী ফিরে যাব।" সুরেশের আহত অভিমান এবার তাহার স্বরে মূর্তি গ্রহণ করিল। "আবার সীতা ? অমন যদি কর"—

বেয়ারা ডাকিল "ডাক্‌দার সাহেব আয়া।"

৩

ডাক্তার বলিতেছেন "যখন বড় ধাক্কা সামলানো গিয়েছিল, তখন আশা হবারই কথা। কিন্তু ফল উল্টা হয়ে দাঁড়াচ্চে। আজও আবার তা হোলে মূর্চ্ছা হয়েছিল। আজকে দেখে, আমারও আর তত সাহস যেন নেই। আচ্ছা সুরেশবাবু আমি যে ওঁকে প্রফুল্ল রাখতে বলেছিলুম ; সেটা কিরকম দেখেন ? উনি কি ছেলের কথা এখনো ভুলিতে পারেন নি ?" গেটের ধারে ঘন মেহেদি গাছের বেড়ার পাশে ছোট ছোট গোলাপ ফুল ফুটিয়া সেখানটা আলো করিয়াছিল। লাল কাঁকরের রাস্তাটিতে বেড়াইতে বেড়াইতে, রোগীর সম্বন্ধে বক্তব্য, রোগীর অশ্রাব্য দুই-চারিটা কথা রোগীর অভিভাবককে জানাইবার জন্য ডাক্তার সুরেশকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। অভিভাবকের বক্ষ কিন্তু বড় জোরে স্পন্দিত হইতেছিল। ডক্তারের প্রশ্নে সুরেশ কহিল "আমার যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করি। প্রফুল্লও মনে হয়, অনেক সময় ; কিন্তু সেটা বোধ হয়—" বোধ হয় কি ?" "বোধ হয় আমাকে ভুলিয়ে রাখবার জন্য। আমি যা'তে না ভাবি ; সেই চেষ্টায়ই নিজে প্রফুল্ল থাকেন, ভেতরে সমানই। কিছুই কি হবে না ডাক্তারবাবু ?" ভয় পাবেন না আপনি ; তবে হার্ট বড় দুর্বল। আপনার তো চেষ্টার ত্রুটি নেই। বিশেষ ভয়ের কারণও কিছু নেই। তবে দেখবেন, হঠাৎ কোনরকম উত্তেজনা বা অবসাদ যেন কিছুতেই না লাগে। আর প্রফুল্ল রাখতে সর্বদা চেষ্টা করবেন। আসি তা হোলে, নমস্কার।"

"নমস্কার"—ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

একটা ছোকরা ফিরিওয়ালা, মধুপুরবাসিনী এক দরিদ্রা মেসের ভৃত্য ; সে একটা বেতের বাক্সে টুকিটাকি অনেক দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া প্রায়ই বিক্রয় করিতে আসিত, আজও সে গেটের

বাহিরে সুরেশকে দেখিয়া বলিল, "কোই চিজ্ লিবেন, সাব্ ?"

তুচ্ছ হইলেও সৌখীন জিনিস স্বহস্তে ক্রয় করিতে পারিলে, যদি সীতা প্রফুল্ল থাকে ! সুরেশ সাগ্রহে ফিরিওয়ালাকে সঙ্গে লইয়া বারান্দায় আসিল। সীতাও অতি আনন্দে সেই ছাই-পাঁশ দ্রব্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। একটা বাক্সের উপরে আঁকা ছোট একটি ছেলের ছবি, সে দেখিবামাত্র তুলিয়া লইল। আরো দু'চারিটা এসেন্স, লেশ, কাচের খেলনা কিনিয়া, সুরেশ ফিরিওয়ালাকে বিদায় দিল। বাক্সেব ডালার ছবিটা তাহার মনে কাঁটার মতো বিঁধিতেছিল। সে ডাকিয়া আনিয়া হিতে বিপরীত ঘটাইল। মণ্টুর ছবি সীতা লুকাইয়া রাখে, কিন্তু এও সেই শিশুরই ছবি। সেইরকম উজ্জ্বল চক্ষু, একমাথা কোঁক্‌ড়া চুল, একমুখ হাসি! এ ছবি তো সীতা লুকাইবে না ; সম্মুখে রাখিয়া দিনরাত্রি অন্তরস্থ অনলে ইন্ধন নিক্ষেপ করিবে। অথচ মুখ ফুটিয়া বলিবারও উপায় একেবারে নাই। ডাক্তার বলিয়াছেন, 'সীতাকে প্রফুল্ল রাখিতে হইবে।'

৪

সীতাব শয্যা-ত্যাগে এখন প্রত্যহই বিলম্ব হয়, প্রত্যহই বড শীঘ্র শুইতে চায়, ডাক্তার বেশী ভয় পাইযাছেন। মধুপুরে তখন স্বাস্থ্য সুন্দব। তবু সুরেশ অন্য কোথাও যাইতে ব্যস্ত। আর একটা জিনিস, সেই ছবিওলা বাক্স। সীতা আজ সকাল হইতে তাহাকে খুঁজিয়া পায নাই। যতদূর সাধ্য, ঘুরিয়া ফেরিয়া বাক্সের অনুসন্ধান কবিল, মিলিল না। শেষে পরিশ্রান্ত ভাবে, খানিকটা চুপ করিযা বসিযা থাকিয়া বলিল "তুমি মনে কর, পশ্চিমে এলেই আর অসুখ থাকে না। লখিয়ার ছেলের আজ ৫ দিন জ্বর। পরশু থেকে কাজে আসেনি। কেবল কাল বিকালে, চারটে টাকা চেয়ে নিয়ে গেছে, ডাক্তার দেখাবে বলে। ঠিক তারই মতো, সেই এগার মাস বয়স। কালো হলে কি হয়, এমন মোটা-সোটা ছেলেটা, দেখলেই আদব করতে ইচ্ছা হয়। কেমন আছে, কে জানে ? সুরেশ সে কথা চাপা দিয়া বলিল, "আমি মনে করছি, এবার চুপ করে এক জায়গায় বসে না থেকে, দুজনে একটু ঘুরে বেড়াব। যাবে তুমি ?" ম্লান হাসি হাসিয়া সীতা বলিল "শক্তি থাকতে থাকতে নিয়ে যেতে পার তো, একবার তাজমহল দেখবার বড় ইচ্ছা করে। হয়তো আর হয়ে উঠবে না।" সুরেশ উত্তর দিল না, শুধু সপ্রেম দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া, ডাক্তারের নিষেধ বাণী, নিজের কর্তব্যজ্ঞান, সব ভুলিয়া বলিয়া উঠিল "সীতা শাজাহান, সম্রাট ছিলেন, তোমার স্বামী গরীব। কিন্তু জেনে রেখো, ভগবানের ইচ্ছা যদি অন্য রকমই হয়, আমাকে ফেলে যদি তুমি চলেই যাও, তা হলে আমার বুকের ভিতর তোমার সমাধি তাজমহলের চেয়ে শ্রেষ্ঠরত্ন মণ্ডিত হয়ে জেগে থাকবে।"

বাহিরে কে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল "এ বাবু মেরে ননকুকো লিয়ে আয় বাবু, এ মায়ি তেরা গোড় লাগি-ই-ই।" থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া সীতা বলিল, "অ্যাঁ, রাখতে পারলি না—লখিয়া ?"

সুরেশও রাখিতে পারিল না। ননকুর মৃত্যুর দিন মূর্চ্ছার পর হইতে সীতা আর শয্যা ত্যাগ করিতে পারে নাই। শুইয়া শুইয়া শুধু বাড়ী ফিরিবার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করিত। অবশেষে সুরেশ ডাক্তার সঙ্গে করিয়া বাড়ী ফিরিল। যেখানে মণ্টুকে হারাইয়াছিল। ঠিক সেইখানে, ছয় মাস পরে, মণ্টুর ছবি বুকে লইয়া মণ্টুর মাতা প্রাণত্যাগ করিল। সুরেশ কিছুতেই রাখিতে পারিল না। শুধু চাহিয়া দেখিল।

সীতাকে বিসর্জন দিয়া সুরেশ আর ঘরে টিকিতে পারিল না। ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ওকালতী ছাড়িয়া মুন্সেফীর জন্য দরখাস্ত করিল ; চাকরী লইলে, দিনগুলা তবু বিদেশেই কাটিবে।

আগ্রা স্টেশনে নামিতে পা কাঁপিতেছিল ; 'ধরমশালায়' পড়িয়া সুরেশ সারাদিন আপনাকে সামলাইল। অনেক ফিরিওয়ালা, পাথরের খেলনাওয়ালা অনেক জিনিস বেচিতে আসিয়াছিল, আজ আর সুরেশের সে সকলে একেবারেই প্রয়োজন ছিল না। সে চাহিয়াও দেখিল না।

অনেক রাত্রে মর্ম্মর বেদীর বুকে বসিয়া, সুরেশ অনেকক্ষণ আপনহারা হইয়া চাহিয়া রহিল। মর্ম্মরজাল ভেদ করিয়া যমুনার বাতাস হা'হা' করিয়া উঠিতেছিল ! সুরেশেরও বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া দীর্ঘশ্বাস হা'হা' করিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে সুরেশ সেই নির্জন কক্ষে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, তারপর মমতাজের সমাধির উপর সন্তর্পণে একটি ক্ষুদ্র বাক্স রাখিয়া, নীরবে চলিয়া আসিল।

সকালে সমাধি-রক্ষক বাক্সটি দেখিয়া, কিছু প্রাপ্তির আশায় খুলিয়া দেখিল, শুধুএকখানি ফটোগ্রাফ। নব-বিবাহিত একটি বাঙালীদম্পতি সপ্রেম সলজ্জ দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চাহিয়া আছে। আর বাক্সের উপরে একটি হাস্যোজ্জ্বল সুন্দর শিশুর মূর্ত্তি।

রক্ষক বড আশায় নিরাশ হইল।

লতিকা দেবী

অদ্ভুত মিলন

১

আমাদের প্রতিবাসী হরিমোহন বসুর বাড়ী, আমার বাল্যকালে বড়ই ভাল লাগিল। বাবার কাছে শুনিয়াছি এক সময়ে তাঁহারা বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তাহা আমি দেখি নাই। আমি জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল দেখি নাই।

আমাদের বাড়ী পল্লীগ্রামে। গ্রামে একটি এন্ট্রান্স স্কুল ছিল। হরিমোহন কাকা সেখানে হেডমাষ্টার ছিলেন। আমি স্কুলে পড়িতাম, হরিমোহন কাকা আমাকে "ভাল ছেলে" বলিয়া মনে করিতেন। রবিবারে বা ছুটীর দিনে আমাকে বাড়ীতে ডাকিয়া লইয়া অনেক বিষয় শিক্ষা দিতেন। তাঁহার পত্নী—আমার কাকীমা তিনিও আমাকে বড় ভালবাসিতেন। আমি দেখিয়াছি, তাঁহাদের বাড়ীতে দাস-দাসী বেশী নাই। কাকীমা প্রফুল্লমুখে গৃহ-কর্ম সম্পন্ন করেন ; অতিথি-অভ্যাগতদিগকে যত্ন ও পরিচর্য্যা করেন, দীন-দুঃখীদিগকে দয়া ও মমতা করেন ; মা, বলিয়া থাকেন "হরিবাবুর স্ত্রী সত্য সত্যই রমণী-রত্ন।" আমি কোন দিন তাঁহার মলিন বস্ত্র আর অপ্রসন্ন মুখ দেখি নাই।

তাঁহাদের মেয়ে নলিনীকে আমি বড় ভালবাসিতাম। তার মত সুন্দর মেয়ে বুঝি সকলেই ভালবাসে। সে বড় সুন্দর ! বড় সুন্দর ! সে চাঁদের জ্যোৎস্নার মত, গোলাপ ফুলের হাসির মত, বসন্তের বাতাসের মত, বড় সুন্দর ! বড় সুন্দর ! সে মধুসূদনের কাব্যের মত, বঙ্কিমের উপন্যাসের মত, রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের মত, বড় সুন্দর ! বড়.সুন্দর ! সে প্রত্যুষের

সাহানা বাঁশির মত, শিশুর ঘুমন্ত হাসির মত, এইচ বোসের কুন্তলীনের সৌরভের মত, সে বড় সুন্দর ! বড় সুন্দর ! সে আমার কাছে আসিলে আমি পুলকে দিশাহারা হইতাম।

এই কথা শুনিয়া তোমরা আমার অনুরাগ পূর্বরাগ প্রভৃতি ঠাওরাইতেছ সন্দেহ নাই। কিন্তু সে সব রাগ-রাগিনী ভাবিবার পূর্বে কথাটি একবার মনোযোগ করিয়া শুনিও ; যে সময়ের কথা বলিতেছি, আমি তখন তেরো বৎসরের বালক শ্রীমান সুনীলকুমার রায়চৌধুরী, স্কুলে পড়ি ; নলিনী পাঁচ বৎসরের বালিকা। সে আমার ছোট ভাই অনিলের খেলার সাথী। সে আমাকে "নীলদা" বলিয়া ডাকে, আমি তাহাকে "নেলী" বলিয়া ডাকি। আমার ছুটীর দিনে আমি তাহাকে ফুল দিয়া সাজাইতাম। কত খেলনা দিতাম। সে ছড়া বলিত, নাচিত, অনিলের সঙ্গে খেলা করিত। পল্লীগ্রামে দূর-সম্পর্কীয়, নিঃসম্পর্কীয় লোকের মধ্যেও কত আত্মীয়তা হয় ; সহরে তেমন নহে। সেখানে এক বাড়ীতে দুজন ভাড়াটীয়া থাকিলে কেহ কাহাকে চিনে না, এমনও দেখা যায়। আমাদের দিন বেশ আনন্দে কাটিতেছিল।

২

তখন ছেলেরা চতুর্দশ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারিত , আমি তাহাই দিলাম। ভগবৎকৃপায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলাম। সুতরাং চির-পরিচিতা, স্নিগ্ধ-শ্যামা স্নেহময়ী পল্লী-জননীকে ছাড়িয়া কলিকাতায় যাইতে হইল ! যাইবার সময়ে বাবা, মা, অনিল ও নলিনীর জন্য বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল ! বাবার ভয়ে কাঁদিলাম না। কিন্তু নলিনী যখন কোলের মধ্যে বসিয়া কানে কানে বলিতে লাগিল "তুমি কলিকাতায় যেও না নীলদা আমি একা থাকতে পারবো না , রথের বাজারে আমায় নিয়ে যেও" তখন আর চখের জল ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলাম না। অনিলও কাঁদিল।

আমি ধনী সন্তান , বাবা আমাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি করিয়াছিলেন। মেসের ভিতরে কত বন্ধু, কত হিংসুক পাইলাম। কেহ আদর করে, কেহ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, কেহ স্নেহ করে, কেহ রাগ করে, কেহ সুখ্যাতি করে, কেহ নিন্দা করে। আমি যথাসাধ্য পড়া-শুনা করিতাম। সেই নিরুপদ্রব, স্নেহ-মমতা-সহানুভূতিপূর্ণ বাড়ীর জন্য মনে মনে বড় কষ্ট হইত। ক্রমে সহিয়া গেল।

ছুটীর সময়ে আনন্দে বাড়ী যাইতাম। অনিলের ও নলিনীর জন্য খেলনা, ছবির বই, বাঁশি ইত্যাদি লইয়া যাইতাম। তারা দুজনে সেইসব পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইত। আমাকে লইয়া দুজনে কাড়াকাড়ি করিত। অনিল বলিত "দাদা আমার" নলিনী বলিত "নীলদা আমার" আমি দুজনকে আপ্যায়ন করিয়া শান্ত করিতাম। এইরকমে দুই বৎসর কাটিল।

ষোড়শ বৎসর বয়সে এফ. এ, পরীক্ষা দিয়া বাড়ী যাইবার সময়ে নলিনীর জন্য একখানি সুন্দর আয়না এবং অনিলের জন্য একটি খেলিবার বন্দুক কিনিয়া লইলাম। তারা দুজনে ইহা কত আনন্দে গ্রহণ করিবে, কল্পনা চক্ষে তাহাই দেখিতেছিলাম। এইটুকু বয়সে নলিনী কত পড়িতে শিখিয়াছে, সেলাই করিতে শিখিয়াছে। যতদিন ছুটীতে বাড়ী থাকিব, অনিলের সহিত নলিনীকে ভাল করিয়া পড়াইব।

কিন্তু কল্পনা যদি সব সময়ে সত্য হইত, তবে মানুষের এত দুঃখ থাকিত না।

বাড়ী গিয়া মা'কে বাবাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতে অনিল ছুটিয়া আসিল। তার দু-একটি সাথীও উপস্থিত হইল। কিন্তু নলিনী আসিল না! কেন? তার কি কোন অসুখ হইয়াছে? বুকটা গুরুগুরু কবিতে লাগিল। তার পরে অনিলকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

অনিল তাহার সোণামুখখানি খুব ম্লান করিয়া উত্তর করিল "তারা এখানে নাই ত দাদা; মামার বাড়ীতে গিয়াছে।"

আমার মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। বলিলাম "কবে গেল তারা? আবার আসিবে কবে?" ছলছল চক্ষে অনিল বলিল "না দাদা! তারা আর আসিবে না!"

কি ভয়ানক কথা! অনিল! সংসার জ্ঞানানভিজ্ঞ ক্ষুদ্র বালক। তোর দাদার বুকে তুই যে কি আঘাত দিলি, তা তুই কি করে বুঝিবি। মুখে বলিলাম "যা!" অনিল নিজপক্ষ সমর্থন করিতে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইল। সে বলিল "হ্যাঁ দাদা; কাকাবাবু, কাকীমা, নলিনী সবাই চলে গেল; কাকীমা মা'র কাছে কাঁদলেন, মা' কাঁদলেন, আর নলিনী কাঁদলে; তারা কেউ আর আসবে না; আমি জানি না বুঝি? আমিও খুব কেঁদেছিলাম" এই সময়ে মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন "তোরা নলিনীর কথা বলচিস? তারা কি আর আসবে বাবা?" আমি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া মা'র মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। মা' যাহা বলিতে লাগিলেন, তাহার মর্ম এই—নলিনীর পিতার অনেক পৈত্রিক ঋণ ছিল; তিনি তাহা শোধ দিতে পারেন নাই। সম্প্রতি মহাজনেরা মামলা করিয়া সমস্ত সম্পত্তি—বসতবাটীখানি পর্যন্ত নীলামে বিক্রয় করিয়া লইয়াছে। আমার বাবা, নলিনীর পিতাকে জমি-জমা দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া, নিজ শ্যালকের গৃহে গিয়াছিলেন। স্কুলের কার্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। অভিমানে ও ক্ষোভে তিনি জীবন্মৃত।

কিন্তু শ্যালকের গৃহে গিয়াও হরিমোহনবাবু অধিক দিন থাকেন নাই। নলিনীর মাতুল ভয়ানক কৃপণ, তাঁহার গৃহিনীও "সো পাপিষ্ঠ স্ততোধিক।" সপ্তাহ পূর্ণ হইতে না হইতেই তাঁহারা যেরকম অনাদর, অবজ্ঞা ও বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন, অভিমানী হরিমোহনবাবুর তাহা মুহূর্তমাত্র অসহ্য। তিনি আকুল চিত্তে স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

শুনিতে শুনিতে আমার চক্ষে জল আসিল! সেই মুহূর্তে আলোকময়ী পৃথিবীর উপরে যেন যবনিকা পড়িয়া গেল। হায় রে টাকা! যাহার ঘরে তুমি নাই, তাহার জন্য দয়া নাই মমতা নাই; যশ নাই, আত্মীয় নাই, কিছুই নাই। তাহার গুণে গৌরব নাই, সমাজে প্রতিপত্তি নাই, মানব-হৃদয়ে সহানুভূতি নাই! তাহার জীবন কামনার মহাশ্মশান, তাহার জীবন মরুভূমি! এ জগতে দরিদ্রকে কেন পাঠাও বিধাতা? শুনিয়াছি পুরুষকারের অভাবেই লোকে দরিদ্র হয়, আবার ত কত দেখা যায় যে পুরুষকার ব্যর্থ করিয়া অদৃষ্ট-লিপি প্রবল হয়। কি সে যে কি হয় সে সব তত্ত্ব, এ কিশোর বয়সে কে আমাকে বুঝাইবে? তবে এই ক্ষোভে আমার বুক ফাটিতেছে যে টাকার অভাবে দরিদ্রতার নির্য্যাতনে আমার সোণামুখী নলিনী স্রোতের ফুলের মত কোথায় ভাসিয়া গেল! আমি বাড়ী আসিয়াছি, এতক্ষণে সে ছুটিয়া আসিয়া আমার স্নেহের অগ্রভাগ পাইবার জন্য অনিলের সহিত কত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত; শেষে আমার বিচারে দুজনের মামলা নিষ্পত্তি হইয়া আবার ভালবাসার সমুদ্র উছলিয়া উঠিত! নেলী! তোর নীলদা যে কতদিন তোকে কত অনাদর করিয়াছে, কত

বকিয়াছে, তুই ত রাগ করিস নাই ! আজ তোর জন্য কি কষ্ট পাইতেছে একবার যদি তাহা দেখিতিস্ তবে বুঝিতে পারিতিস্ যে তোর নীলদা তোর জন্য কত ব্যগ্র হইয়াছে।" মা'র অনেক সান্ত্বনায়ও আমার চক্ষের জল থামিল না।

আবার আমরা হরিকাকার অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কোথাও উদ্দেশ পাইলাম না।

সেইবারে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইলাম। এফ. এ, পরীক্ষায়ও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম।

৪

ইহার পাঁচ বৎসর পরে যখন আমি এম. বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম, তখন আমার ছাত্রনিবাসের সহযোগী ও প্রতিযোগিগণের অনেকেই আমাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিল। অনেকে বলিল যে, "যাই বলি না কেন, সুনীল বাস্তবিক একটি ছেলে বটে ! যেমন বিদ্যা, তেমনি চরিত্র, অন্তঃকরণও অতি উদার !" ইত্যাদি। শশাঙ্ক একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল "তবে কি না সাংসারিক জ্ঞান, সামাজিক অভিজ্ঞতা—এইসব কিছু কম।

ফণী ও শরৎ গর্জিয়া উঠিয়া বলিল "সে ত হবেই ; মহাকবি কালিদাস গাছের আগায় বসে গোড়ায় কোপ দিয়েছিলেন ; মহাজ্ঞানী নিউটন বড় পায়রার জন্য বড় দরজা আর ছোট পায়রার জন্য ছোট দরজা করেছিলেন, কেমন নয় ?" সেদিন আমাকে লইয়া মেসে এইরকম একটা বিশেষ আন্দোলন চলিল।

আমাদের মেস্ কলেজ ষ্ট্রীটে। সুতরাং বৈকালিক ভ্রমণ গোলদীঘির ধারেই সম্পন্ন হয়। আজি আমার একটু সর্দির ভাব হইয়াছে তাই "আত্মানং সতত, রক্ষেৎ" মনে করিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই বাসায় ফিরিলাম।

সহসা পথেই আমার গতিরোধ হইল। সঞ্জীবনী কার্যালয়ের সম্মুখে, ফুটপাথের উপরে দেখি রামচরণ। রামচরণ হরিকাকার পুরাতন ভৃত্য। আমরা সকলে তাহাকে "রাম দা" বলিয়া ডাকিতাম। হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। বলিলাম "রাম দা !" সেও বিস্ময়ে সাগ্রহে বলিল "সুনীলবাবু নাকি ?" আমি একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বলিলাম, "কোথা থেকে এলে রাম দা ?" সে উত্তর করিল "বাবুর বাসা থেকে" আমি অধিকতর উত্তেজিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "বাবু কে ? কার বাসায় থাক ?" রামচরণ একট হাসিয়া বলি , "আমার সেই বাবু, আমার সেই হরিমোহনবাবু" আমি বলিলাম "অ্যাঁ, হরিকাকা এখানে আছেন ? তাঁর বাসা কত দূর ? তাঁরা ভাল আছেন ত ?" রামচরণ অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল "বাসা ঐ গলির ভিতরে, বেশী দূরে নয়। বাবু এতদিন আরায় ছিলেন ; এখন নলিনীর বিবাহ দেবেন, তাই মাসখানেক কলিকাতায় এসেছেন। আমি বাবুর খবর জানিতাম না গঙ্গা নাইতে এসে হঠাৎ বাবুর সঙ্গে দেখা হয় ; সেই অবধি তাঁর কাছে আছি। বাসায় আর সবাই ভাল আছে ; বাবুর বড় জ্বর হয়েছে। বিদেশ-বিভুঁই, তাই মা-ঠাক্রুণ ব্যস্ত হয়ে আমাকে ডাক্তার আনতে পাঠিয়েছেন। আমি তাই যাচ্ছি, দাদাবাবু।" রামচরণের শেষোক্ত বাক্যে আমি আমার নিজের সর্দির কথা ভুলিয়া গেলাম। বলিলাম "চল রাম দা, আমি কাকাবাবুকে দেখিব। ডাক্তারের বন্দোবস্ত আমি করিয়া দিব।" আমি রামচরণকে লইয়া বাসায় গেলাম। সেখান থেকে ষ্টেথিস্কোপ্, থার্মমিটার এবং ঘড়ি লইয়া রামচরণের সঙ্গে কাকাবাবুর বাসায় গেলাম। বাসা আমাদের মেসের অনতিদূরে।

রামচরণ কড়া নাড়িলে নলিনী আসিয়া দরজা খুলিয়া, এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

রামচরণ হাসিয়া বলিল "পালিও না দিদিমণি, ডাক্তার চিনা লোক" নলিনী তাহা বুঝিল না সে তেমনি সন্ত্রস্তেই এক পাশে দাঁড়াইল। তাহার কোলে ছোট ভাইটি ছিল। সেটি অল্প দিন পূর্বে বোধ হয় দু'তিন বৎসর পূর্বে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

নলিনী এখন বড় হইয়াছে ; সে আমাকে অপরিচিত ভদ্রলোক ভাবিয়া লজ্জা করিল। কিন্তু আমি "আমার নেলী"কে চিনিলাম। তারপর রামচরণ আমার পরিচয় দিল।

সেই রোগ-নিরানন্দ গৃহ আমাকে পাইয়া আনন্দে মুখরিত হইল। নলিনী আমার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল। শয্যাশায়ী হরিকাকা উত্তপ্ত বাহু দিয়া আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন। কাকীমা সাশ্রুনেত্রে আমার মাথায় হাত বুলাইগা কহিলেন "বেঁচে থাক বাবা, আর যে তোমাদের দেখিব, সে আশা করি নাই।" আমি গভীর মনোযোগের সহিত কাকাবাবুর জ্বর পরীক্ষা করিতে লাগিলাম।

সেই দিন হইতে প্রত্যহ কাকাবাবুর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলাম। তাঁহারা প্রথমে একটু কুণ্ঠিত হইলেও শেষে অসঙ্কোচে আমার সেবা-শুশ্রূষা গ্রহণ করিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করিলেন।

আমার ডাক্তারী শিক্ষা সার্থক মনে করিলাম।

৫

ভগবান দয়াময় ; তিনি আমার সকল যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক করিলেন। হরিকাকার রেমিনেণ্ট জ্বর চৌদ্দ দিনে নিরাময় হইল। আমার নলিনী এখন "বড়" হইবার সঙ্কোচও ত্যাগ করিয়াছে। সে তাহার "নীলদা"কে সেইরকম ভালবাসায় সেইরকম আদরে আবার গ্রহণ করিয়াছে।

সেদিন বিকালে আমি নলিনীকে বলিলাম, "নেলী ! কাল আমি বাড়ী যাব", অমনি তার হাসি—জ্যোৎস্না-মাখা চাঁদ মুখখানি যেন মেঘে ঢাকিয়া গেল। সে বলিল "আবার কবে আসবে নীল্‌দা ? শীগ্‌গির আসবে ত ?"

আমি হাসিয়া উঠিলাম। এই ত আমার সেই নেলী !

কিন্তু আমার বাড়ী যাওয়া ঘটিল না। কাকাবাবু আমাকে ডেকে বল্লেন "আমায় ত বাঁচিয়ে দিলে বাবা ; এখন তোমার বোনের বিয়ের ভাবনায় যে আমার মরণাধিক যন্ত্রণা হোচ্চে। ঐ জন্যই আমার অমন দারুণ রোগ হয়েছিল। তা' সুনীল তোমার বন্ধু-বান্ধবদের ভিতর এমন কেহ আছে কি, যে এ গরীবকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করে ?"

কথা ত খুবই সত্য। আমি নলিনীর বর দেখিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।

বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে এই কথা বলিতে শশাঙ্ক বিবাহে সম্মত হইল। আমি তাহাকে মেয়ে দেখাইলাম, তাহার বাবাকে অনেক মিনতি করিয়া স্বীকৃত করাইলাম। শশাঙ্ক "অব্যবস্থিত চেতা" বলিয়া বন্ধুদিগের মধ্যে একটু দুর্নামগ্রস্ত ; কিন্তু বি. এ, পাশ ; অবস্থা মন্দ নহে। উপায়ান্তর অভাবে তাহাকেই মনোনীত করিয়াছি।

৬

আজি আমার স্নেহ-প্রতিমানলিনীর বিবাহ। বেশী পয়সা লাগিবে না অথচ ছেলে সুপাত্র, ইহাতে কাকাবাবু ও কাকীমা বড় খুসী হইয়াছেন। ডাক্তার নরেনবাবুর নিকট হইতে তাঁহার

বাড়ীটি বিবাহার্থ চাহিয়া লইয়াছি। বাড়ী হইতে বাবাকে আনিয়াছে, কারণ হরিকাকা আজিও দুর্বল ; বাবাই কর্তৃত্ব করিবেন। উৎসাহে একটা আমি পাঁচটা হইয়া নলিনীর বিবাহে খাটিতেছে।

সকালে এক জোড়া সুন্দর ইয়ারিং আর পারফিউমার এইচ বোসের কার্যালয় হইতে এক শিশি গোলাপ গন্ধ কুন্তলীন লইয়া নলিনীকে দিলাম ; বলিলাম "নেলু ! এই তোকে বিয়ের উপহার দিলাম ; এই তেলটি মাখিলে তোর গায়ে থেকে সদ্য-স্ফুট গোলাপ গন্ধ বেরোবে।"

বড় আনন্দে বড় আগ্রহে মুখপানে চাহিয়া দেখি তাহার চক্ষে জল ! চমকিয়া বলিলাম "কি রে নেলী ?" সে অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিল "এসব কেন করিলে নীলদা ?" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম "কি করেছি ?" সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া ঢোক গিলিয়া বলিল "আমাকে এমন করে বিদায় করে দিচ্চ কেন নীলদা ? তোমাদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারবো না।"

বুকে বড় ব্যথা পাইলাম। কিন্তু পুরুষ আমি, পৌরুষ ত্যাগ করিব কি করিয়া ? হাসিয়া বলিলাম "বলিস্ কি নেলী ? আজও কি তুই সেই কচি খুকী ?"

মনটা বড় খারাপ হইল। শশাঙ্ক এ স্বর্গীয় কুসুমের মর্ম বুঝিবে ত ? সে ত খাম-খেয়ালী।

বিবাহের লগ্ন রাত্রি ৯টার সময়ে। ঘড়িতে চারিটা বাজিতেই আমরা সভা সাজান প্রভৃতি সমস্ত বন্দোবস্ত করিলাম। ফণী ও শরৎ আমার সঙ্গে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছিল।

পাঁচটার পূর্বে বাবা ডাকিলেন "সুনীল" ! আমি উত্তর দিলাম "আজ্ঞে ?" বাবা বলিলেন "কোথাকাব অভদ্র জোচ্চোরের সঙ্গে বিবহের সম্বন্ধ করেছিলে ? এখন যে ভদ্রলোকের জাতি যায় ?" আমি অবাক হইয়া বাবার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম, বাবা বলিতে লাগিলেন "এইমাত্র সংবাদ পাঠিয়েছে যে, বিবাহ এখানে না হ'য়ে অন্যত্র হোচ্চে। আলিপুর কোর্টের এক উকীলের মেয়ের বিবাহের দিন আজ ছিল, সেই পাত্রটি কাল হঠাৎ মাবা যাওয়াতে উকীল অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে তোমার শশাঙ্ককে সেখানে নিয়ে গিয়েছে, এখন উপায় কি হবে ?" ফণী গর্জিয়া বলিল, "চল সুনীল, আমরা পুলিস নিয়ে ছেলে কেড়ে আনি গিয়ে।" শরৎ বলিল "চল্ আমরা আর একটা ছেলে খুঁজে আনি গিয়ে।" আমি আকুল হইয়া বলিলাম "কি হবে বাবা ?"

বাবা ধীর অথচ গম্ভীরভাবে বলিলেন "তুমি হাত পা ধুয়ে এস। তোমাব সঙ্গেই নলিনীর বিবাহ, সময় হ'ল।"

শুভদৃষ্টির সময়ে নলিনীর হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম।

মানকুমারী বসু

চিত্র

১

দশ টাকা বৃত্তি পাইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও পরেশ লেখাপড়া ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিল। কারণ পিতৃবিয়োগে তাহার ক্ষুদ্র মস্তকে অনেকগুলি গুরু-ভার পড়িয়াছিল, তন্মধ্যে ছোট ভাই নরেশকে মানুষ করিয়া তোলা এবং ভগ্নীকে একটি সৎপাত্রে সম্প্রদান

করা এই দুইটিই প্রধান।

মুরুব্বিহীন, দরিদ্র পরেশ সাত মাস ধরিয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও একটি চাকুরী জুটাইতে পারিল না। সংসার প্রবেশের পথে প্রথম উদ্যমে ব্যর্থ হওয়াতেও পরেশ ভগ্নমনোরথ হয় নাই। বংশাভিমান, আত্মমর্যাদা প্রভৃতি সুদূরে নিক্ষেপ করিয়া সে একটি ছোট কাজে প্রবৃত্ত হইল। কলিকাতার উপকণ্ঠ হইতে মাথায় করিয়া শাক-শব্জী, পটল-বেগুন আনিয়া কলিকাতার বাজারে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। সে কোন ব্যবসায় বাদ দিত না। কখনও দালালি করিত, কখনও দোকানদারি করিত, কখনও কখনও বা ফেরি করিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী নানা সামগ্রী বেচিয়া বেড়াইত।

আত্মীয়-স্বজন বা প্রতিবেশীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে পরেশ সপ্রতিভভাবে হাস্য মুখে তাহার দিকে চাহিত, সে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইত। মনে মনে বলিত, ছোঁড়াটার কি দুর্বুদ্ধি। দশ টাকা বৃত্তির সহিত পাশ করিয়াও, লেখাপড়া না করিয়া উঞ্ছবৃত্তি আবলম্বন করিয়াছে। কি দারুণ অভাবে পরেশ মা-সরস্বতীর সহিত সম্পর্ক রহিত করিয়াছে তাহা তাহারা বুঝিয়াও বুঝিত না। কিন্তু, তাহারা কি ভাবিল না ভাবিল, পরেশ তাহা একবারও চিন্তা করিত না,—একনিষ্ঠ হইয়া সে স্বকার্য সাধন করিত। তাহার অসাধারণ একাগ্রতা ও ধৈর্যে কমলা তাহার উপর সুদৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন ; ফলে সে কারবার করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিয়াও দু'পয়সা সংস্থান করিতে লাগিল।

লক্ষ্মীর আগম বা নির্গম-পন্থা মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁহার কৃপা মূর্খকে বুদ্ধিমান করিয়া তুলে, ব্যাধিগ্রস্তকে শক্তি প্রদান করে, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করায়। সুতরাং দরিদ্র পরেশ যে একটা বড় রকমের কয়লার আফিস খুলিবে তাহাতে বিচিত্রতা কি!

২

ভগ্নীকে পাত্রস্থ না করিয়া আর রাখা যায় না। সুতরাং পরেশ অনেকগুলি ঘটক নিযুক্ত করিয়া পাত্র সন্ধান করিতে লাগিল। এদিকে কোন অভীষ্ট-সিদ্ধি উদ্দেশ্যে—পরেশের আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশিগণ তাহাকে "একঘরে" করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। কারণ, মাথায় মোট করিয়া নীচ ব্যবসায় অবলম্বনপূর্বক পরেশ জীবিকা-উপার্জন করিয়াছে। আত্মীয়দের এইরূপ হিতকামনা দেখিয়া পরেশ তাহাদের সকলের দ্বারস্থ হইল। কেহ সাক্ষাৎ করিল না, কেহ বাড়ীতে নাই বলিয়া সংবাদ পাঠাইল, কেহ বা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

এই সময়ে পরেশের ভগ্নীর জন্য একটি সুপাত্রের সন্ধান হইল। পরেশের মন পূর্বের ন্যায় আর একবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। সে ভাবিল, পাঁচজনে যাহার যাহা ইচ্ছা করুক, সে তাহাদের কথায় বা কাজে মনোনিবেশ করিবে না। পরেশ কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া গোপনে বিবাহের সমস্ত 'পাকা' করিয়া ফেলিল। বর আসিবার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত কেহ জানিল না যে, সে দিন পরেশের ভগ্নীর বিবাহ। কিন্তু কন্যা সম্প্রদানের সময় হিতৈষী আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহাদের মানে দারুণ আঘাত পড়িয়াছে। একটা বালক কি না তাহাদের উপেক্ষা করিতে চায়। তাহাদের প্রতিহিংসা-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহাদের পণ হইল। যে কোন প্রকারে হউক বিবাহ পণ্ড করিতে হইবে। এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে তাহারা বদ্ধপরিকর হইল। যে স্থানে বরকর্তা বসিয়াছিলেন পাড়ার দু'একজন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নানা অলঙ্কারে পরেশের জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে

আরম্ভ করিল। কেহ বলিল, পরেশ মাথায় করিয়া চামড়া বহিয়া মুচির দোকানে বেচিয়া আসিত, সে তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছে! গম্ভীরপ্রকৃতি, আধুনিক ভাবে শিক্ষিত বরকর্তা দেলখোস মাখা রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন—"সে তো ভাল কথা, কেবল চাকুরী চাকুরী ক'রে জীবন নষ্ট না ক'রে যদি কেহ স্বাধীন ব্যবসায় গ্রহণ ক'রে উন্নতি লাভ করিতে পারে সে তো প্রশংসার কথা। এইরকম Self made man-এর জীবন ত গৌরবময়।"

পরেশের শত্রুদের মুখ খুব ছোট হইয়া গেল—তাহারা পলায়ন করিবার পথ অন্বেষণ করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য. কন্যা-সম্প্রদানরত পরেশ বাহিরের এইসব গোলযোগের বিষয় তখন কিছুই জানিতে পারে নাই।

৩

যখন কয়লার অফিস খুব জোরে চলিতে লাগিল, একজন গ্রাজুয়েট যখন বড়বাবুর পদে নিযুক্ত হইল, তখন শত্রু-আত্মীয়েরাও মিত্র হইয়া দাঁড়াইল। কেহ ভ্রাতা. কেহ পুত্র, কেহ অন্য কাহাবও জন্য পবেশেব নিকট চাকুরীর উমেদারী করিতে আসিতে লাগিল। চাকুবী-অন্ত-প্রাণ-আত্মীযদের দুর্দশা দেখিয়া পরেশ মনে মনে একটু হাসিত এবং ভাবিত ইহাই বুঝি প্রকৃতির প্রতিশোধ।

এই সময়ে পরেশের অশেষ চেষ্টায় নরেশ ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। পরেশের আর আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। অর্থাভাবে সে নিজে লেখাপড়া কবিতে পারে নাই, এখন প্রাণ-তুল্য অনুজকে কৃতবিদ্য হইতে দেখিয়া উল্লাসে তাহার প্রাণ নাচিয়া উঠিল। অনেক বাছিয়া একটি বুনিয়াদি ঘরের সুন্দরী কন্যা দেখিয়া নরেশের বিবাহ দিল। বলা বাহুল্য, ইতিপূর্বেই একটি কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে উদ্ধাব কবিবার জন্য পরেশ স্বয়ং বিবাহ করিয়াছিল। পরেশের এখন একটি পুত্র ও একটি কন্যা।

৪

আট বৎসর অতীত হইয়াছে। পরেশের সংসার খুব সুখের হইয়া উঠিয়াছে, নরেশেরও এখন একটি পুত্র হইয়াছে। পরেশ নিজের পুত্র বিজয় অপেক্ষা বোধহয় নরেশের পুত্র অজয়কে অধিক ভালবাসিত। অজয়কে কোলে লইয়া না বেড়াইলে পরেশের বেড়ান মনঃপূত হইত না, একত্র না খাইলে আহার করিয়া তৃপ্তি হইত না।

পরেশের স্নেহের এই পার্থক্য দেখিয়া মনোরমা কোনও দিন স্বামীর নিকট অভিযোগ করে নাই বা তাহার হৃদয় কোনও শ্লেষাত্মক বাক্যবাণে বিদ্ধ করে নাই। সে স্বামীকে দেবতা বলিয়া জানিত এবং দাসীর মত তাহার পবিচর্যা করিত।

নরেশও দাদা ভিন্ন অন্য কিছু জানিত না। সে যাহা উপার্জন করিত তাহা সমস্তই দাদার হাতে আনিয়া দিত। একটা পয়সার আবশ্যক হইলেও দাদার নিকট 'হাত পাতিতে' হইত। একমাত্র নরেশের পত্নী কাত্যায়নী এই ব্যবস্থায় অত্যন্ত অসুখী ছিল। সামান্য একটা 'নাকছাবি'র আবশ্যক হইলে তাহাকে 'পরের' কাছে 'হাত পাতিতে' হইত ইহা তাহার পক্ষে অতীব লজ্জার কথা! নিজের ধন ভিক্ষা করিয়া গ্রহণ করিবার রীতি তাহার নিকট বিসদৃশ ঠেকিত, তাই মনের মধ্যে দাবানল সৃষ্টি করিয়া দিবানিশি সে তাহাতে দগ্ধ হইত।

বুদ্ধিমতী মনোরমার নিকট কাত্যায়নীর মনোভাব অগোচর ছিল না। সে স্বামীকে প্রায়ই

বলিত, ছোট বৌয়ের মনটা তত ভাল নয়। সামান্য অগ্নিকণা বিশাল সৌধ দাহন করে। তাহার মতে এ বিষয়ে যথাসম্ভব শীঘ্র একটা বিহিত না করিলে ফল বিষময় হইবে।

পরেশ কিন্তু মনোরমার কথায় বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারিত না। সে ভাবিত, নরেশ কি তাহার পর ? নরেশের পত্নী কি এমন হইবে ? তাহাব ভ্রাতা বা ভ্রাতৃজায়া তাহাকে অন্য চক্ষে দেখে, পব ভাবে, এ বিষয়টার প্রমাণ সংগ্রহ করিতেও পরেশ নিতান্ত কষ্টবোধ করিত। সে যে এত পয়সা উপার্জন করিয়াছে, কখনও ত ভাবে নাই একটা কপর্দকও তাহার নিজের। সে জানিত, তাহার উপার্জিত এক পয়সার উপরেও নরেশের সমান অধিকার।

৫

সংসারে একটা দুঃখের সূচনা হইতে না হইতে—দারুণ পরিশ্রমের ফলে পরেশের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল, ক্ষয়রোগ তাহার দেহ আশ্রয় করিল।

অর্থ থাকিলে বন্ধুর অভাব হয় না। পরেশও এখন অনেক হিতকামী বন্ধু পাইয়াছে। পরেশের ব্যাধির সমাচারে প্রত্যহ অনেকে তাহাকে দেখিতেও আসিত। কথা-প্রসঙ্গে গ্রামেব খুড়া একদিন বলিয়াছিলেন—পরেশ তুমি ত অনেক উপার্জন করেছ, ছেলে মেয়ের জন্য কি ব্যবস্থা করলে। শুনতে পাই তোমার নগদ বড় কিছু নাই। বিষয়-সম্পত্তিও সব ছড়িয়ে আছে। কিছু জীবন-বীমা আছে নাকি ?

রোগক্লিষ্ট বদনে ঈষৎ হাস্য করিয়া পরেশ বলিল—"দেখুন খুড়ো, আমার বিষয়-সম্পত্তি, জীবন-বীমা সবই ঐ—নরেশ। ওকে মানুষ করতে পেরেছি বলেই আমার মরণের দিনে আর কোন ভয় নাই।"

খুড়া অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"ছিঃ ছিঃ, ওকথা মুখে এনো না। এত বিষয়-সম্পত্তি করলে দুদিন সুখে ভোগ কর।"

মনোরমা দিবাবাত্রি স্বামীর পরিচর্যা করে। বিজয় ও অমলা সর্বদাই পিতৃসান্নিধ্যে উপস্থিত থাকিত, থাকিত না শুধু অজয়। ভুলেও সে একবার পিতৃব্যকে দেখিতে আসিত না। যে দিন কাত্যায়নী শুনিল, পরেশের যক্ষ্মা হইয়াছে সেইদিন হইতেই অজয়কে কাত্যায়নীর চোখে বন্দী থাকিতে হইল ; বালক এই কড়া-পাহারা অতিক্রম করিয়া জেঠামশায়ের কাছে আসিতে পাইত না। পূর্ব হইতেই সুচতুরা কাত্যায়নী এ বিষযে স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করিবার জন্য নরেশকে বলিয়াছিল "দেখ, অজয় যেন বড়ঠাকুরের ঘরে না যায়।"

নরেশ বলিল—কেন কি হয়েছে ?

কাত্যায়নী—তুমি যদি জেগে ঘুমোও তা হ'লে আমি কি করবো। যদি বড় ঠাকুরের কাছে যায়—তা হলে বলতে নেই—

নরেশ বলিল—যদি আমার ঐ রোগ হত তা হলেও বল অজয়কে কাছে আসতে দিতে না !

কাত্যায়নী ব্যথিতা হইয়া বলিল—তোমার কেন ঐ রোগ হতে গেল, শত্রুর হোক। কথাটা হচ্ছে উনি যে অজয়কে নিয়ে এক পাতে না খেলে তৃপ্তি পান না।

নরেশ ভাবিল কথাটা ঠিক। তাহার একটিমাত্র পুত্র। যদি কিছু হয়। সে বুদ্ধিমতী কাত্যায়নীর প্রখর বুদ্ধির প্রশংসা করিল এবং স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া অজয়কে তাহার

মামার বাটীতে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিল। নরেশ মনকে প্রবোধ দিল, এটা এমন একটা কি অন্যায় কাজ। বিশেষতঃ যক্ষ্মারোগী সহজে বোঝে না যে, তাহার জীবন প্রতি মুহূর্তে ক্ষয় হইতেছে এবং নিজের অসাবধানতার ফলে, ভীষণ রোগবীজ স্বীয় বংশে উপ্ত হইতেছে।

৬

অজয়ের বয়স এখন দশ বৎসর। সে পিতামাতার চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়াছে, আরও বুঝিয়াছে তাহার জেঠা মহাশয়ের কঠিন পীড়া। তাহাকে যখন কাত্যায়নী বলিল, "অজয় তুমি দিন কতক মামার বাড়ীতে গিয়া থাক। হাওয়া বদলালে শরীর অনেকটা ভাল হবে।" বালক অজয় তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—"আমার ত কোন অসুখ করেনি মা। জেঠা-মশাইকে না হয় মামার বাড়ীতে পাঠিয়ে দাও।"

কাত্যায়নী—পাগলামী করো না। কি ব্যায়রাম হয়েছে দেখ্‌ছ না। ও যে বড় ছোঁয়াচে রোগ।"

অজয় বলিল—"তা হ'লে বিজয় দাদা জেঠাম'শায়ের ঘরে যায় কেন ? ওঁকেও মামার বাড়ী পাঠিয়ে দাও না।"

কাত্যায়নী উকীল-স্বামীকে যুক্তিতে পরাস্ত করিয়াছিল, কিন্তু বালক-পুত্রের নিকট পরাজিত হইল! বলিল, তোমার দাদা-ম'শাই তোমাকে দেখতে চেয়েছেন সেখানে দু 'পাঁচদিন থেকেই আবার এস।"

অজয় বলিল—"দেখো মা আমি দু'দিনের বেশী সেখানে কখ্‌খনও থাক্‌বো না।"

কাত্যায়নী প্রকাশ্যে বলিল—"তাই হবে।" মনে ঠিক করিয়া রাখিল বড় ঠাকুরের হেস্ত-নেস্ত একটা না হলে অজয়কে আর আন্‌বে না।

অজয় অন্যের অলক্ষ্যে জেঠাবাবুর ঘরে গিয়া তাঁহার মুখখানি বার বার সতৃষ্ণ নয়নে দেখিল ; দেখিয়া দেখিয়া বালকের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

তাহার পর নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাঁদিতে কাঁদিতে শান্ত বালক মাতার অনুরোধ রক্ষা করিল।

৭

সেদিন পরেশের ব্যাধির প্রকোপটা কিছু বেশী। দণ্ডে দণ্ডে নাড়ী উঠিতেছে পড়িতেছে। ডাক্তারেরা বলিয়া গিয়াছেন—জোর চারি পাঁচ ঘণ্টা।

মনোরমা স্বামীর শয্যাপার্শ্বে নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতেছে। বিজয় ও অমলা পিতার অবস্থা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে, এক দণ্ডের জন্যও তাহারা কাছছাড়া হইতেছে না।

বিজয় ও অমলার মুখের দিকে চাহিয়া পরেশ বলিল—"তোমরা কাঁদছ কেন ? বাপ-মা কি কারও চিরকাল থাকে। তোমাদের অমন সোনার কাকা রয়েছে, তোমাদের ভয় কি।" এই সান্ত্বনা বাক্যে বালক-বালিকার হৃদয়ে শোক উচ্ছ্বসিত হইয়া নয়ন দিয়া দরদর বেগে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। কষ্ট অনেকটা চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়া পরেশ ডাকিল—"নরেশ।"

নরেশ বলিল—কি দাদা!

পরেশ বলিল—সেদিন আমি অজয়ের একখানা ছবি তুলেছিলুম, আমায় একবার

দেখাবে।

নরেশ লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া অশ্রুলোচনে বলিল—দাদা দাদা!

"নরেশ, ভাই আমার—" অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে একটু সংযত হইয়া পরেশ বলিল—"নরেশ, তোমরা যদি অজয়কে মামার বাড়ী না পাঠাতে আমিই তোমাদের জিদ্ করে তাকে পাঠাতুম। আমার অন্তরের কথাটি তোমরা বুঝতে পেরেছ দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। অজয় নিরাপদ স্থানে আছে জেনে আমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারব।"

* * * * *

তারপর অজয়ের ছবিখানি বুকের উপর ধরিয়া হৃদয়ের আবেগে সেইটিকে বারম্বার চুম্বন করিতে করিতে পরেশের আত্মা নশ্বর দেহ ত্যাগ করিল।

কৃষ্ণদাস চন্দ্র

অশ্রুবিন্দু

নগেনবাবু পর পর তিনটি কন্যার বিবাহ দিয়া যখন হয়রান হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার একমাত্র পুত্র বিনোদ বি. এ, পাশ করিল। নগেনবাবু তিন মেয়ের শোধ এক ছেলের উপর তুলিয়া লইবেন বলিয়া মনে মনে সঙ্কল্প আঁটিয়া বসিলেন। নানা স্থান হইতে বিনোদের বিবাহ-সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। কত আত্মীয়স্বজনের সুপারিশ পত্র, কত অনুরোধ ও উপরোধ নিত্য আসিতে লাগিল। কত অন্তরঙ্গ ব্যক্তি স্বয়ং অনুরোধ করিতে আসিলেন, কিন্তু নগেনবাবু সঙ্কল্পে অটল। তিনিও এইরূপ কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া বড়লোকের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি কে দয়া করিয়াছে? কন্যার বিবাহের জন্য তিনিও বিস্তর ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন, পুত্রের বিবাহ দিয়া সে ঋণ তাঁহাকে পরিশোধ করিতেই হইবে। এ সঙ্কল্পের নিকট কাহারও অনুরোধ-উপরোধ টিকিল না।

অবশেষে পাঁচ হাজার টাকা পণে এক ধনাঢ্য ব্যক্তির কন্যার সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ স্থির করিলেন। রজত-কাঞ্চনের মীমাংসা শেষ হইয়া গেলে নগেনবাবু স্বয়ং 'কন্যা পাকা দেখিতে' যাত্রা করিলেন।

কন্যার পিতা আধুনিক বড় মানুষ, চাকরী করিয়া অর্থশালী হইয়াছেন। তিনি বড় একটা সাহেবের হৌমের বড়বাবু, পৈত্রিক সম্পত্তির মধ্যে চালা ঘরখানি ভাঙ্গিয়া পাকা বাড়ী করিয়াছেন, কোন এক আত্মীয়কে ভিটা-ছাড়া করিয়া সেই ভিটায় পুকুর কাটাইয়াছেন, ২/৪ জন আত্মীয়-স্বজনের চাকরী করিয়া দিয়াছেন, গ্রামে তাঁহার বড় সম্মান। কন্যার বিবাহ দিতে ছুটী লইয়া দেশে আসিয়াছেন। দেশে আসিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তাঁহার এক বিধবা খুড়ীর একটি বয়স্থা কন্যারও বিবাহের প্রয়োজন। এক সঙ্গে দুইটি কাজ সম্পন্ন করিতে পারিলে খরচের বিশেষ সুবিধা হইবে ভাবিয়া নিজ গ্রামেই বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছেন। খুড়ীমার একটিমাত্র কন্যা, পয়সা খরচ করিয়া কন্যার বিবাহ দিবার সঙ্গতি তাঁহার নাই, কে তাঁহাকে দয়া করিবে? সকলেই যে নিজ স্বার্থে অন্ধ! ধনবান ভাসুর-পুত্র কাকীমার দায়ে সাহায্য করিতে স্বীকার করিয়াছেন; অবশ্য একেবারে নিঃস্বার্থভাবে তিনি এতবড় ভারটা লইতে পারেন নাই। বিধবা তাঁহার যাহা কিছু সম্বল বাস্তু-ভিটার নিজ অংশটুকু তাঁহার

ভাসুর-পুত্রকে বিক্রয় করিবেন ; তাহার বিনিময়ে তাঁহার কন্যার বিবাহের খরচ-পত্র তিনি নির্বাহ করিবেন।

বরের পিতা নগেনবাবু, কন্যার পিতা হারাণবাবুর বাড়ীতে আসিয়াছেন। পান-ভোজনের ভূরি আয়োজন। কারণ কন্যাকর্তার গৃহে বরকর্তা ; প্রজার গৃহে রাজা, খাতকের গৃহে মহাজন।

নগেনবাবুর বি. এ, পাশ করা ছেলে, কাজেই তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়াছে, অন্য একজন বরকর্তা আসিয়াছেন তিনি হারাণবাবুর কাকীমার কন্যাটি দেখিতে। সে পক্ষের বর দ্বিতীয় পক্ষের ; বয়স হইয়াছে, আদালতের পেয়াদার কাজ করে, কাজে কাজেই নগেনবাবুর নিকট সে বরকর্তার মুখ ম্লান। হারাণবাবু তাঁহার কাকীমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সম্বন্ধ হইতেই পারে না। এ যা হইয়াছে, তাহাও হারাণবাবুর নিতান্ত খাতিরে, নইলে মেয়ে এখন লয় কে ? দরিদ্রা অসহায়া বিধবা অগত্যা রাজি না হইয়া আর কি করেন ? ভগবানের কৃপামাত্র ভরসা করিয়া অনাথার একমাত্র কন্যা বিমলাকে সেই বৃদ্ধ বরে সমর্পণ করাই স্থির করিয়াছেন।

'পাকা দেখা'-র শুভলগ্ন আসিল, দুইটি কন্যাই পর পর লইয়া আসা হইল। প্রথমে হারাণবাবুর কন্যাটি আসিল, বালিকার বয়স ১২/১৩ বৎসর হইবে ; বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, বয়সানুযায়ী দেহটি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, পরণে বহুমূল্য রেশমী সাড়ী, সর্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার, রেশমী জ্যাকেটে সাঁচ্চার কাজ করা, বালিকা বস্ত্রালঙ্কারের পারিপাট্যে গরবিনী ও হাস্যময়ী ; হস্তে একখানি মূল্যবান রেশমী রুমাল, তদ্দারা ঘন ঘন বাতাস করিতেছে ; রুমালে দেলখোসের সৌগন্ধে চারিদিক ভরিয়া উঠিল। সকলেই একবাক্যে ইহার সুখ্যাতি করিলেন। বালিকা চির-বিলাসের কোলে পালিতা বলিয়া অতি কোমলা ; কিন্তু ঐশ্বর্যগর্বে অবিণীতা, চঞ্চলা ; সহরের প্রথায় সুশিক্ষিতা তত নম্র নয়, লজ্জাহীনা। অপরা সামান্য একখানি নীলাম্বরী পরিহিতা, আভরণমাত্র পরিশূন্যা, অতি ক্ষুণ্নমনা, তের বৎসরের বালিকা, শরীর বলিষ্ঠ এবং মাংসল, লাবণ্যময়, কিন্তু বয়সের সমুচিত কোমল নয় ; যেন একটু রুক্ষ, তারল্য-শূন্য, স্থিরা, অতিবিনীতা, লজ্জা-শঙ্কিতা ; বর্ষাকালের চন্দ্রের উপর মেঘচ্ছায়ার ন্যায়, তাহার মুখে দুঃখের কালিমাময় ছায়া পড়িয়া রহিয়াছে।

দুইটি কন্যা পাশাপাশি আসনে বসিল। বরকর্তারা দেখিতে লাগিলেন সকলেই নগেনবাবুকে অগ্রে আশীর্বাদ করিতে বলিলেন।

নগেনবাবু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে যেন কি এক গোল বাধিয়া গিয়াছে ; নগেনবাবু কোনকথাই বলিতেছেন না। বার বার কন্যাদ্বয়ের মুখপানে তাকাইতেছেন, আর কি ভাবিতেছেন। ভাবিয়াচিন্তিয়া অনেকক্ষণ পরে তিনি পকেট হইতে একটি গিনি বাহির করিয়া হাতে লইলেন। ঠিক সেই সময়ে বিমলার নেত্রযুগল হইতে মুক্তা ফলের ন্যায় দুই ফোঁটা অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িল। নগেনবাবুর মুখ প্রসন্ন হইল, যেন কোন বিষম সমস্যা হইতে তিনি মুক্ত হইলেন। অতিব্যস্তে উঠিয়া তিনি বিমলার হাতে স্বর্ণমুদ্রাটি গুঁজিয়া দিলেন। তাড়াতাড়ি হারাণবাবু বলিলেন ওকি করেন ও নয় এই যে বলিয়া নিজ কন্যার হাত ধরিয়া নগেনবাবুর সম্মুখে ধরিলেন। নগেনবাবু বলিলেন 'এটিরও তো বিবাহের প্রয়োজন ? হারাণবাবু বলিলেন "হাঁ ওটি আমার খুড়তুত বোন। ওরও পাত্র ঠিক হইয়াছে।"

নগেনবাবু হাসিয়া বলিলেন "আমি এইটিই নিলাম।"

হারাণ। বলেন কি ? তা কি হয় ?"

নগেন। হাতে সোনা দিয়ে ফেলেছি ; আর কি এখন ফিরে ?

হারাণ। তারপর ?

নগেন। তারপর আর কি ? শুভদিনে ছেলে পাঠিয়ে দেবো—বউ নিয়ে বাড়ী যাব।

হারাণ। কি দেখে এ মেয়ে পছন্দ করলেন ?

নগেন। দুই বিন্দু চোখের জল।

হারাণ। আর আমার পাঁচ হাজার টাকা ?

নগেন। টাকার তো আমার বিশেষ প্রয়োজন ; কিন্তু হৃদয় যে ঐ চোখের জলে ভুলে গেল !

হারাণ। নিজকন্যার হাত ধরিয়া লইয়া ঘরে গেলেন।

অপর বরকর্তা দুঃখিত মনে উঠিয়া গেলেন। নগেনবাবু বিমলার মাতার চালাঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া বলিলেন "বিয়ান আমি বাড়ী চলিলাম, সেখানে গিয়া বিবাহের খরচ পাঠাইয়া দিব। তুমি বিবাহের আয়োজন কর।" বিমলার মাতা আর কথা কহিতে পারিল না, তাঁহার চক্ষে তখন ধারা বহিতেছিল। নগেনবাবু আর দাঁড়াইলেন না। চক্ষের জল দেখিতে আর তিনি রাজি নন, দুই বিন্দু চক্ষের জলে তাঁহার পাঁচ হাজার টাকা ভাসিয়া গিয়াছে।

বিবাহের দিন নগেনবাবু মাত্র পুরোহিত সঙ্গে লইয়া ছেলের বিবাহ দিতে চলিলেন। সকলে বলিল এ কি ? এত টাকা পেয়ে লোকটা একটি পয়সাও খরচ করলে না। ছেলের মাতা শেষটা কান্নার সুর ধরিলেন। নগেনবাবু বলিলেন ওগো ওরকম কান্নায় প্রাণ গলে না। কান্নার মত কাঁদতে জান্‌লে দুই ফোঁটা চক্ষের জলে পাঁচ হাজার টাকা ভাসান যায়।

বউ ঘরে আসিলে, দেখিয়া সকলে অবাক। এ কি ? বউয়ের হাতে শুধু দু'টি শাঁখা ? এ নাকি বড়মানুষের মেয়ে। বিনোদকে গৃহিণী বলিলেন "এ কেমন বউ আন্‌লি বিনোদ ?" বিনোদ বলিল "কেন মা বউ কি মন্দ !"

মা বলিলেন "বউ ত মন্দ নয়, কিন্তু অলঙ্কার কই ?"

বিনোদ বলিল "গরিব বিধবার মেয়ে অলঙ্কার কোথা পাবে মা ?

মা। কেন এই যে শুনলাম খুব বড়লোকের মেয়ে ; টাকা দেবে পাঁচ হাজার, আর দুই হাজার টাকার অলঙ্কার।

বিনোদ। মা, এখন ঐ বউয়ের কাছে সব শোন। আমি আর বলবো না। তবে এখন আমাদের কিছু খেতে দাও।

গৃহিণীর মনের ধাঁধা ঘুচিল না। পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াও সঠিক খবর কিছু পাইলেন না। কর্তাও বাড়ীতে আসিলেন না। বিষম সমস্যা। যাহা হোক, গৃহিণী পুত্র পুত্রবধূকে জলযোগ করাইলেন। তারপর বউকে কাছে বসাইয়া বলিলেন "বলতো মা তোমার বিবাহের ব্যাপারটা কি ?" বউ প্রথমে লজ্জায় কোন কথা বলিল না ; পরে নিতান্ত জেদ করায় ব্যাপার যাহা জানিত সব খুলিয়া বলিল। শুনিয়া গৃহিণী তো অবাক ! বলিবার সময় মাঝে মাঝে বউয়ের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিতেছিল তাহা গৃহিণী লক্ষ করিলেন, ঠিক সেই সময়ে বউয়ের গণ্ড বহিয়া মুক্তাফলবৎ বিন্দু বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল ; যাহার দুই বিন্দুতে নগেনবাবুর পাঁচ হাজার টাকা ভাসিয়াছে, তাহার ধারা দেখিয়া আর কি গৃহিণী স্থির থাকিতে পারেন ? তিনি আদরে বউকে কোলে লইয়া ঘন ঘন মুখ চুম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন "যাক টাকা, লক্ষ্মী আমার ঘরে এসেছে ; বিনোদ বেঁচে থাকলে আমার টাকার ভাবনা কি।" ঠিক এই সময়ে নগেনবাবু আসিয়া বলিলেন, গিন্নী এখন আমায় ক্ষমা কর।

গৃহিনী বলিলেন "আগে একথা আমায় বল্লেই তো হতো।"

নগেন। বল্‌তাম মুখে, শুনতে কানে, প্রাণে লাগতো কি ? এখন বউমার চোখের জলের

শক্তিটা কি তা বুঝলে ?

তখন বিনোদ আসিয়া বলিল "আমি বলেছিলাম, আমি বড় মানুষের ছেলে ।" এখন দেখ আমার বাবার মত বড়মানুষ কয়টি আছে ? যে দুই বিন্দু চোখের জলে পাঁচ হাজার টাকা ভাসাইয়া দিতে পারে।

ললিতমোহন মজুমদার

আর্সনিক্

যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে আমি মেডিকেল কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি । আমি যে মেসে থাকিতাম তাহার একটা বিশেষত্ব ছিল । সেখানে অল্প খরচে যেরূপ ভাল খাওয়ার বন্দোবস্ত হইত, সহরের অন্যত্র কোথাও সেরূপ হইত কি না সন্দেহ। এই মেসে স্থানলাভ করাটা লোভনীয় ছিল বটে, কিন্তু স্থানাভাবে অনেককেই নিরাশ হইতে হইত।

মেসের কোনও স্থায়ী ম্যানেজার ছিল না। পালাক্রমে সকলকেই ম্যানেজারি করিতে হইত । আমার উপর যখন ম্যানেজাব হইবার ভার পড়িল, আমি প্রচলিত আহারাদির ব্যবস্থা একটু বদল করিবার প্রয়াস পাইলাম । কতকটা কৃতকার্যও হইলাম । চিংড়ী মাছের কট্‌লেট্, মটন চপ প্রভৃতি নিত্য নূতন নূতন আহারের ব্যবস্থা। নিত্যই রকম ফের। মাসকাবারের পূর্ব পর্যন্ত অনেকেই বলিতে লাগিলেন এ রকম ম্যানেজারি নাকি এই মেসে ইতিপূর্বে কেহ কখনও করে নাই।

আমাদের মেসে যদুবাবু নামে একটি ভদ্রলোক থাকিতেন। সান্ধ্যভোজে তিনি কোনও দিন সময়মত উপস্থিত হইতে পারিতেন না। তাঁহাকে দুইটি টিউসনি করিয়া রাত্রি দশটা এগারটার সময় ফিরিতে হইত। শীতকাল, অতরাত পর্যন্ত বামুন ঠাকুর থাকিতে রাজি হইত না। এ কারণ তাঁহার খাবার প্রত্যহই আলমারিতে রাখিয়া দেওয়া হইত। তিনি নিজেই উহা লইয়া খাইতেন।

লোকটি খুবই নিরীহ প্রকৃতির। মুখে কথা নাই বলিলেও চলে। কথায় বলে নরম মাটিতে বিড়ালে আঁচড়ায়। লোকটি ভাল মানুষ বলিয়াই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক আলমারি হইতে তাঁহার ভাগের চপ কট্‌লেট্ মাঝে মাঝে অদৃশ্য হইয়া যাইতে লাগিল। যদুবাবু উহা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেন না। তিনি ভাবিতেন কম পড়িয়াছিল বলিয়া বোধ হয় রাখা হয় নাই। শেষে এমন হইল, প্রায় প্রতি মিলেই চপ কট্‌লেট্ অদৃশ্য হইতে আরম্ভ হইল। ব্যাপারটি তুচ্ছ হইলেও তিনি আর নিশ্চেষ্ট থাকা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। কথা-প্রসঙ্গে একদিন আমাকে আনুপূর্বিক সকল বিবরণ বলিয়া ফেলিলেন। আমি ত শুনিয়াই অবাক ! আমি নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া ঠাকুরকে দিয়া রাখাইয়া দিতাম, আর তিনি পাইতেন না, ইহা বড়ই আপশোষের বিষয় ! মেসের সকলকে এ বিষয়ে জানাইলাম। ফলে তৎক্ষণাৎ একটা অনুসন্ধান-কমিটি বসিয়া গেল। কেহ চাকবদের উপর আবার কেহ বা ঠাকুরের উপর সন্দেহ করিতে লাগিল। আমি পরদিন বামুন, চাকর প্রভৃতিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলাম, তাহারাও আমার মত বিস্ময়াবিষ্ট, বলিল "বাবু আপনার সামনেই তো খাবার রেখে আমরা চলে যাই কখন আর চুরি করে খাব বলুন।" কথাটা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনায় তাহাদের আর কিছু বলা হইল না। কিন্তু আমাদের মনে স্বতঃই একটা প্রশ্ন উঠিতে লাগিল। চাকরেরা কেহ খায় না তবে খায় কে ?"

প্রশ্নটির সমাধান যতই জটিল বোধ হইতে লাগিল, কট্‌লেট্‌ চোর ধরিবার জিদও ততই বাড়িতে চলিল। মাঝে মাঝে যদুবাবু না আসা পর্যন্ত আলমারির নিকট গোপনে পাহারা দিতে লাগিলাম। যেদিন পাহার দিতাম সেদিন কোনই গোল হইত না, কিন্তু যেদিন পাহারা দেওয়া বন্ধ থাকিত, সেইদিনই যদুবাবুর আহারে কট্‌লেটের অভাব হইত। সমস্যাটি ক্রমে কঠিন বোধ হইতে লাগিল। মেসের আর আর সকলের চোর ধরিবার উৎসাহ কমিয়া গেল, কিন্তু আমি নিরুৎসাহ হইলাম না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যেমন করিয়াই হউক চোর ধরিবই ধরিব।

পুনঃ পুনঃ পাহারা দিবার পরও যখন চুরির কোন কিনারা হইল না তখন মনে মনে অন্য উপায় উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। হঠাৎ একদিন মাথায় একটা বুদ্ধিও জুটিয়া গেল।

যেদিনের কথা বলিতেছি, সেদিন আমাদের কলেজে কি উপলক্ষে ঠিক মনে নাই, থিয়েটার হইয়াছিল। তাহাতে আমারও একটা ছোটখাট 'পার্ট' ছিল। কাজেই সেদিন সন্ধ্যার পূর্বেই সামান্য জলযোগান্তে, আমার খাবার আলমারিতে রাখিয়া দিতে বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য সেদিন আমার ফিরিতে প্রায় রাত্রি বারটা বাজিয়া যায় এতক্ষণ কিছু না খাওয়ায় এবং চেঁচামেচি দৌড়ঝাঁপ প্রভৃতি করায় ক্ষুধার যথেষ্ট উদ্রেকও যে না হইয়াছিল তাহা নয়। মেসে আসিয়া দেখি সকলেই প্রায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে কেবল দুই একজন তখনও ঘরে আলো জ্বালিয়া পড়িতেছে। আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া আহারের উদ্যোগ করিলাম। খাবারের ঢাকনি খুলিয়া দেখি চপ কট্‌লেটের কিছুই নাই। দেখিয়াই ত আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। আমার তখনকার মনের অবস্থা বর্ণনাতীত। যাহা মুখে আসিল তাই বলিয়া চোরকে মনে মনে গালি দিতে লাগিলাম। এদিকে ক্ষুধারও উদ্রেক যথেষ্ট। কি করি—কোনও প্রকারে ক্ষুন্নি-বৃত্তি করিয়া সমরের নিকট গিয়া আমার দুর্দশার কথা বলিলাম। সমর আমার ঘরের পাশেই থাকে, তখনও পড়িতেছিল। আমার কথা শুনিয়া সে খুব হাসিতে লাগিল বলিল "বেশ হয়েছে, তোমার উপরেও চালাকি খেলেছে দেখে বড় খুসী হলুম। বড় বাহাদুরি করে বলতে যে, 'আমার খাবার খায় ত একবার তাকে দেখি।' এখন দেখ না।"

আমি বলিলাম "না হে না, ঠাট্টা রাখ। এরকম রোজ হলে আমাদেরই বদনাম। বড়ই লজ্জার বিষয়। এখন কি করা যায় বল দেখি।" তুমি কি কাহাকেও আলমারির কাছে যেতে দেখেছ ?"

"হাঁ কিছু পূর্বেই অমল জল খাবার জন্যে গেলাস বার করতে গিয়েছিল বটে।"

"তুমি ঠিক দেখেছ সে অমল ছাড়া আর কেউ নয় ?"

"হাঁ সে অমল ছাড়া যে আর কেউ নয় তা আমি ভাল করে বলতে পারি।"

"দাঁড়াও আজ এর একটা কিছু হেস্ত-নেস্ত করব" বলিয়া আমি সমরের ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। ঝাঁ করিয়া মাথায় এক বুদ্ধিও আসিয়া জুটিল। সবেমাত্র থিয়েটার হইতে ফিরিয়াছি। মাথা নাট্য-রস-রঙ্গে ভরপুর। আর কিছু হউক আর নাই হউক, একটা মজা করিবার খেয়াল মাথায় চাপিল।

আমি একেবারে অমলের ঘরের দিকে ছুটিলাম। বাহির হইতে দেখিতে পাইলাম সে তখনও পড়িতেছে। আমি তাহাকে কিছু বলিবার অবসর না দিয়াই তাহার ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম এবং নাট্য-ভঙ্গি-সহকারে চোখ মুখ কপালে তুলিয়া—যেন কতই ভয় পাইয়াছি এরূপভাবে "অমল, অমল, রক্ষা কর ভাই সর্বনাশ হয়েছে" বলিয়া মাটিতে বসিয়া

পড়িলাম। সে তখন বসিয়া কি লিখিতেছিল, কলম ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসিয়া বলিল "কি হয়েছে ? অমন করছ কেন ? ব্যাপার কি শীঘ্র বল !"

আমি অবসাদভরে বলিলাম "আর ভাই কি হয়েছে ? কালই দেখতে পাবে, হয় ত পুলিশ এসে তদন্ত আরম্ভ করে দিয়েছে। আমার হাতে দড়ি দিয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে জামিন দেবার বন্দোবস্ত করছে। ভাই, এ যাত্রা রক্ষা কর। কি করে বাঁচতে পারি তার উপায় বলে দাও।" সে বিশেষ উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিল "আরে কি হয়েছে আগে তাই ঠিক করে বল না। অত ভূমিকা করবার দরকার কি ? কাহাকেও খুন করেছ না চুরি করেছ, শীঘ্র বল ?"

"না ভাই চুরিও নয়, খুনও নয়। কোন্ বেচারি অনর্থক আমার মূর্খামির জন্য কাল প্রাণ হারাবে, এই ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়েছি।"

আসল কথাটা শুনিবার জন্য সে বিশেষ অধীর হইয়া উঠিতেছিল। রাগিয়া উঠিয়া বলিল "আরে বল-ই না ছাই কি হয়েছে।" আমি বলিলাম "ভাই, রোজ কট্‌লেট্ চপ কে চুরি করে খায় দেখবারজন্য আমার ভারি কৌতূহল হয়, তাই আজ আমার ভাগের খাবারে 'আর্সনিক্' মিশিয়ে রেখে গিয়েছিলুম। এখন দেখি কে সেগুলি খেয়ে বসে আছে। আহা, বেচারা খানিক পরেই হয়ত বিছানায় আড়ষ্ট হয়ে মরে পড়ে থাকবে, কেহ দেখতেও পাবে না।"

অমল এতক্ষণ কাছে বসিয়া স্থির হইয়া আমার কথাগুলি শুনিতেছিল। কথা শেষ হইবামাত্র তাহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। বলিল "অ্যাঁ, আর্সনিক্ ! বল কি ?"

আমি বলিলাম "হাঁ ভাই আর্সনিক্। আমি কালই কলেজ থেকে খানিকটা এনেছিলুম। এই আর্সনিকই আমার কাল হল দেখছি। যে খেয়েছে সেও ম'রবে ; আমাকেও মারবে। টের পেলে এখনও বাঁচাতে পারি।"

অমল আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। অতি কষ্টে মুখে কথা আনিয়া বলিল "কি করে বাঁচাবে ? ভাই এ যাত্রা আমায়—" আমি বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম "তুমি খেয়েছ নাকি ? আরে, সর্বনাশ করেছ ! এতক্ষণ বোধ হয় জিভ শুকিয়ে ভেতর দিকে টান্‌চে ? হাত পা সব অবশ হয়ে আস্‌চে নিশ্চয়ই ?" তাহার তখনকার মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। সে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "হাঁ ভাই ঠিক তাই।" আমি বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিলাম তা ত হইবারই কথা। যা হ'ক বিশেষ ভয়ের কারণ নেই, যখন এত শীঘ্র ধরা পড়েছে তখন এর একটা প্রতিকার করছি।"

এই কথা বলিয়া যেমন বাহিরে আসিতে যাইব, অমল তাড়াতাড়ি আমার হাত দুটি ধরিয়া বলিল "এমন কাজ আর কখনও করছি না—দোহাই ভাই আমার মাথাটা হেঁট করিও না।" তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার ভারি হাসি পাইতেছিল। কোনও মতে মনের ভাব গোপন করিয়া তাহাকে সস্নেহে বলিলাম "আরে ছি ছি একথা কি কাহাকেও বলতে পারি ? তুমি সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাক। কিন্তু এখন তোমায় বমি করাতে হবে, না হলে বিষ উঠবে না !"

আমি ডাক্তারি পড়ি, কাজেই আমার ব্যবস্থার উপর সে সহজেই আস্থা স্থাপন করিল, বলিল "যা ভাল বোঝ কর ভাই, আমি আর থাকতে পারছি না বড় অস্থির হয়ে পড়েছি।"

"কোনও ভয় নাই" বলিয়া তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম, ভাবিলাম যখন এত শীঘ্র কার্যোদ্ধার হইয়াছে তখন বাছাধনকে একটু জব্দ না করিলে তাহার উচিত শিক্ষা হইবে না। কাল বিলম্ব না করিয়া নিজের ঘর হইতে একটি 'স্টোভ্' আনিয়া খুব খানিকটা জল গরম করিলাম এবং তাহাতে কতকটা লবণ মিশ্রিত করিয়া তাহাকে সবটা পান করাইলাম। পান করিবামাত্র—বাহিরে যাইবারও বিলম্ব সহিল না, ঘরের ভিতরেই, যাহা খাইয়াছিল সবসুদ্ধ—এমনকি অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্যন্ত বমি করিয়া ফেলিল। বমি করিলে সহজ

শরীরেও, গলা জ্বালা হাত পা ঝিম ঝিম করা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কি হে, কি রকম বোধ করছ?"

"শরীর কেমন করছে ভাই।"

আমি বলিলাম "বিষ খেয়ে বমি করলে ঐরকমই হয়ে থাকে।" সে আর বসিতে পারিল না বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। আমি তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম "এখন একটু ঘুমাবার চেষ্টা কর। ঘুমুলে সব সেরে যাবে।"

সে রাত্রে, আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। ভাল ঘুম হইল না। কট্‌লেট্‌ চোরকে উচিত শিক্ষা দিয়াছি এই কথাটা সকলকে বলিবার জন্য ভোরের প্রতীক্ষায় বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম।

পরদিন সকাল হইতে না হইতেই সমরের নিকট গিয়া রাত্রের সকল কথা বলিলাম। সে ত শুনিয়া আনন্দে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বাহাদুরি দিতে লাগিল। কি করিয়া তাহাকে আরও অপদস্থ করা যায়, এ বিষয়ে উভয়ের অনেকক্ষণ পরামর্শ হইল। সমর বলিল চল, ও ওঠ্‌বার আগেই সকলের কাছে কথাটা প্রচার করা যাক।"

মেসের সকলে অমরের কীর্তি কথা শুনিয়া বিশেষ আশ্চর্যান্বিত হইল। সকলেই একবাক্যে তাহার চরিত্র ও প্রবৃত্তিকে ধিক্কার দিতে লাগিল এবং তাহাকে প্রহার দিয়া তাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব করিল। আমি কিন্তু আরও একটু মজা করিবার অভিপ্রায়ে, সকলকে এ বিষয় যেন কেহ কিছুই জানে না এরূপভাব দেখাইতে অনুরোধ করিলাম।

অমল শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলে, তাহার চেহারার পরিবর্তন দেখিয়া কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিল "কি হে, চোখ মুখ বসে গেছে কেন? কোন অসুখ করে নাই ত?"

"ও কিছু না, কাল ভাল ঘুম হয়নি" বলিয়া অমল সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। তাহার ভাব দেখিয়া সকলে একটু হাসিল।

আহারে বসিয়া সকলে অমলের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। কেহ বা তাহাকে "মিঃ আর্সনিক" বলিয়াও ডাকিতে লাগিল। অমল যেন কিছুই বুঝিতে পারিল না এরূপ ভাব দেখাইয়া নীরবে আহারান্তে কলেজ চলিয়া গেল। কলেজে তাহার জনৈক সহপাঠী তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া সে মহারাগত। কলেজ হইতে ফিরিয়া যত রাগ আমার উপর ঝাড়িবার জন্য ব্যস্ত হইল।

প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা মেসে, ক্রীড়া কৌতুকাদিতে বেশ একটা মজলিস্‌ জমিয়া থাকে। সে দিনও আমরা সমরের ঘরে পাশা খেলার আয়োজন করিতেছি, এমন সময় অমল তথায় আসিয়া আমায় "পাজি" "ছোটলোক" প্রভৃতি মিষ্ট বাক্যে অভিভাষণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমি ত নীরব। মনে মনে খুব খানিকটা হাসিয়া লইলাম। সমর কিন্তু সহ্য করিতে পারিল না বলিল "ওহে মিঃ আর্সনিক, বলি অত চট কেন? তুমি যখন কুন্তলীন, দেলখোস মেখে ভেড়ার শিঙের মত চুল করে টেরী কেটে রয়েছ তখন তুমি যে একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক তাতে আর সন্দেহ কি? তা না হলে কি আর এই ভদ্রলোকের খাবার চুরি করে খাও। হেমেন্দ্রবাবু ছোটলোক, ভদ্রলোকের মর্যাদা বুঝবেন কি করে? তাই তিনি চোর ধরে আবার চুরির কথা প্রকাশ করে বেড়াচ্ছেন। বলি, ভগবান কি তোমায় একটু লজ্জা-সরমও দেননি! এখন মানে মানে এই মেস থেকে সরে পড়, না হলে তোমার বরাতে অশেষ দুঃখ আছে বলে দিচ্ছি।"

অমল মেস ত্যাগ করিল বটে, কিন্তু তাহার আর্সনিক নাম আর ঘুচিল না। পথে ঘাটে সকলেই তাহাকে "আর্সনিক" বলিয়া ক্ষেপাইতে আরম্ভ করিল। শেষে এমন হইল,

'আর্সনিক' কথাটা আর বলিতে হইত না "আ—" বলিয়া গানের তান ধরিলেই অমল ক্ষেপিয়া যাইত।

নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩৩৪ সনের 'কুন্তলীন পুরস্কারে'র রচনা

"আলো— কোথায় ওরে আলো—"

এক

কাকিমার কক্ষ হইতে শিশুকণ্ঠের কাতর কান্না শুনিয়া অমলা ত্রস্ত ব্যস্তভাবে সেইদিকে অগ্রসর হইল। দালানের দক্ষিণ দিকে পৌষ-প্রাতে'র সুমিষ্ট তপ্ত রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে। কাকীমা শিশুপুত্র বাব্‌লু'র কচি হাত দু'খানি শক্ত মুঠায় ধরিয়া, চাপাগলায় তর্জন করিয়া বলিতেছেন—হ্যাঁ তোকে সোয়েটার প'রতেই হবে! নইলে খুন ক'রে ফেলব।

দস্যু শিশু বাব্‌লু উচ্চ ক্রন্দনের সঙ্গে মা-এর হাত হইতে প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে, মাথা নাড়িয়া সোয়েটার পরিধানে তার একান্ত আপত্তি জ্ঞাপন করিতেছিল। ধৈর্যচ্যুতা মা অবাধ্য পুত্রের গালে সজোরে ঘা'কতক চড় কসাইয়া দিলেন। প্রহৃত-শিশু দ্বিগুণ বেগে কাঁদিয়া উঠিল।

অমলা ব্যাকুলভাবে ছুটিযা আসিয়া কাকীমা'র হাত হইতে বাব্‌লুকে কাড়িয়া কোলে লইতে লইতে করুণ অনুযোগপূর্ণ ভর্ৎসনার স্বরে বলিল—আহা! সকালবেলা উঠতে না উঠতেই ছেলেটাকে এমন নির্দম করে' মারছো কেন কাকিমা?

—ওর সঙ্গে আর পারিনে আমি! এত বড় একগুঁয়ে দস্যি ছেলে, সেই যে জেদ্ ধরেছে—সোয়েটার পরবো না—এ' পর্যন্ত কোনও মতেই পরাতে পারলুম না।

—তা' হোক্‌গে। ছোট ছেলে ওর জ্ঞান নেই! তুমি কি ব'লে বাচ্চাটাকে এমন ক'রে মারলে? দেখ দেখি গালটা রাঙা হয়ে উঠ্‌লো!!

অমলা'র ভর্ৎসনায় ব্যথা ও ক্ষোভ ঝরিয়া পড়িল। কাকীমা হাসিয়া বলিলেন—ওরে আমিও বিয়ের আগে তোর মতন,—যা'রা ছেলে মারে তাদের উপরে রাগ ক'রতুম অম্‌নি! নিজের পেটে হ'লে বুঝতে পারবি তখন! হাড়-মাস ভাজা করে' দেয় ঐ একরত্তি একরত্তি মানুষগুলি!—বজ্জাতীতে ওরা দশটা বুড়ো-মানুষকে হারিয়ে দিতে পারে!

অমলা তখন ভাইকে বুকে লইয়া নানা প্রবোধবাক্যে ভুলাইতেছিল। কাকীমা'র দিকে অভিমান-পূর্ণ নেত্রে চাহিয়া বলিল—তা' বলে তুমি যেমন করে' এদের মারো,—আমি হ'লে জীবনেও পারতুম না!

কাকীমার মুখ চোখে কৌতুকরেখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হাস্যতরলকণ্ঠে বলিলেন—আচ্ছারে আচ্ছা দেখা যাবে! আমিও ছেলেবেলায় ঠিক অমনিই ভাবতুম। রোস্‌না—বিয়ে হোক্—ছেলে হোক্—তখন আবার বদ্‌লে যাবি!

অমলা বিদ্রোহী বাব্‌লুকে আদরে ও সস্নেহবাক্যে বশ করিয়া রাঙা সোয়েটারটি পরাইতে পরাইতে সলজ্জ স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিল—আচ্ছা দেখে নিও! আমি কখনও ছেলেদের কোনও রকম কষ্ট দেব না!

ঘরে'র এক কোণের মশারী-ঢাকা খাটের ভিতর হইতে হাস্যতরল-কণ্ঠে ডাক

আসিল—অমল !

অমলা ত্রস্তে কাকিমার দিকে তাকাইয়া লজ্জারক্তমুখে মৃদুস্বরে বলিল—কাকাবাবু ঘরে রয়েছেন ? তুমি আমায় বলোনি কাকীমা ?

কাকীমা অমলার চেয়ে বছর চার-পাঁচের বড় । উভয়ের মধ্যে সখ্য ভাবটাই অধিক । কাকাকে সম্ভ্রম করিয়া চলিলেও সখী-প্রতিম কাকিমাকে সে মোটেই লজ্জা করিত না ।

অমলে'র কাকাবাবু লেপে'র ভিতর হইতে বলিলেন—অমল ! তোর ছেলে হ'লে তাদেব কত যত্ন ক'রবি, আমায় একটু নমুনা দিয়ে যা । বেজায় মাথা ধরে' রয়েছে ।

মাথা ধরা'র অছিলায় কাকা, শীতের শীতল-প্রাতে তপ্ত-কোমল শয্যা ছাড়িয়া তখনও উঠেন নাই ।

কাকীমা সকৌতুক-হাস্যে অমলা'র দিকে চাহিলেন ।

—তুমি কাকা'র মাথা টিপে দাওগে' কাকিমা ! আমি বাব্‌লুকে নিয়ে চল্‌লুম । বলিয়া অমলা সেখান হইতে অন্তর্হিতা হইল ।

দুই

পাঁচ বৎসর পরের কথা । অমলা'র বয়স এখন উনিশ । অনেকদিন হইল তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে । ফুলের মত সুন্দর-সুন্দর ছেলে মেয়েও তার গুটি দুই তিন হইয়াছিল, কিন্তু সবাই অকালে ঝরিয়া গিয়াছে— ' এখন শুধু একটিমাত্র এক বৎসরের কন্যা আছে । তাহারও শরীর মোটেই ভাল নয়, আজন্ম-পীড়িতা ! সম্প্রতি তাব অসুখ আরও বাড়িয়াছে ।

স্বামী হেমেন্দ্রনাথ পশ্চিমে মোরাদাবাদ শহরের বড় ডাক্তার, হাসপাতালে'র প্রধান কর্তা । পশার এবং আয় ভালই । দেখিতে সুপুরুষ এবং একান্ত পত্নী-প্রেমিক ।

অমলারা থাকে শহরের অল্প তফাতে কুশী নদীর ধারে একখানি সুন্দর সাহেবী বাংলোয় । সামনে ঘন-সবুজ টেনিস্-গ্রাউন্ড্ । আশে-পাশে বিলাতী ও দেশী ফুলের গাছ এবং ক্রোটনের কেয়ারি । 'পর্যাপ্ত-পুষ্প-স্তবকাবিনম্রা' বিলাতী লতা, তার ঘন-কুসুমিত সবুজ বল্লরী বিস্তারে বাংলোর সম্মুখস্থ প্রাচীর ও উপরে রক্তবর্ণ টালি'র ঢালু-ছাদটির অর্দ্ধাংশ আবৃত করিয়াছে ।

কাল সারারাত্রি ভীষণ ঝড়বৃষ্টির পর আজ ভোরের প্রকৃতি যেন নৃত্যক্লান্তা-নটীর মত অবসন্না হইয়া এলাইয়া পড়িয়াছে । সিক্ত সবুজ-বনানীর উপরে প্রভাত-রশ্মির স্নিগ্ধ-সম্পাত্ যেন কোন্ অশ্রুমুখী তরুণী'র অধরপ্রান্তে সহসা জেগে ওঠা ক্ষীণ-হাসি'রই মত চিত্তস্পর্শী !

অমলা সেই দুর্যোগ-ঘন নিশীথের কোনও প্রহরেই কাল একবারও চক্ষু মুদিতে পারে নাই । রুগ্না কন্যার জ্বরতপ্ত ক্ষীণ তনুখানি বুকে লইয়া সমস্ত রাত্রি ভয়ে ভাবনায় আশঙ্কায় কাটাইয়াছে । শেষ-রাত্রি হইতে টেম্পারেচার কমিয়া আসা'র সঙ্গে সঙ্গে, ছটফট্ করাও ক্রমশঃ কমিয়া আসিয়া ভোরের বেলায় খুকি শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে । জাগরণ-ক্লান্তা অমলা'রও চ'খের পাতা দু'খানি ভারী হইয়া জড়াইয়া আসিতেছিল, খুকি'র ছোট্ট বিছানাটির পাশে বাহুতে মাথা রাখিয়া সে'ও ভোরের বেলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল ।

দাইয়ের ডাকাডাকিতে যখন অমলার ঘুম ভাঙিল তখন বেশ বেলা হইয়া গিয়াছে । জানালা দিয়া উত্তপ্ত রৌদ্র-কিরণ দেয়ালের গায়ে ও ঘরে'র মেঝেয় ছড়াইয়া পড়িয়াছে । অমলা উঠিয়া বসিয়া দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া চাহিয়া দেখিল—স্বামী হেমেন্দ্রনাথ ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া আছেন ।

পুলকিত দৃষ্টিতে স্বামীর পানে তাকাইয়া বিস্ময় আনন্দ বিমিশ্র কণ্ঠে অমলা প্রশ্ন

করিল—তুমি কখন্ এলে ? এর মধ্যেই ফিরলে যে !

হেমেন্দ্রনাথ হাতের 'সার্জারি কেসটি' টেবিলের উপরে রাখিতে রাখিতে বলিলেন—এই মাত্র আসছি—

—খুকুর অসুখের খবর পেয়ে বুঝি ব্যস্ত হ'য়ে চলে এলে ?

—না, সেখানকার কেস্‌টা মিটে—বলিতে বলিতে ঢোক গিলিয়া কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া হেমেন্দ্রনাথ বলিলেন—হ্যাঁ খুকি'র অসুখের খবর শুনেও মনটা বড় ব্যস্ত হ'ল তাই শীগ্‌গির চলে' এলুম।

স্বামীব এই কথা-ঘুরাইয়া-লওয়া লক্ষ্য না করিয়া অমলা চিন্তা-কাতর স্বরে বলিল—খুকু'র জ্বর তো ক্রমশঃ বাড়ছে ' মুখের ভিতর ঘায়েব জন্য ওষুধ খেতে ভারী কাঁদে ' চোখের পূঁজ পড়াও বন্ধ হয়নি—

হেমেন্দ্রনাথ নিকটস্থ একখানা চেয়াবে বসিয়া পড়িয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন—হুঁ !

—তুমি এখানে না থাকায় আমার যা ভাবনা হয়েছিল কি বল'বো ! তুমি এসেছো বাঁচলুম !

খুকি ক্ষীণ স্বরে কাঁদিয়া উঠিল। অমলা ত্রস্তভাবে গিযা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

হেমেন্দ্রনাথ ঈষৎ বিরক্ত ভাবে বলিলেন—তুমি ওকে দিন রাত্রি অত বেশী ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না। ওর সর্বাঙ্গে এক্‌জিমা হয়েছে,—বড ছোঁয়াচে !

অমলা আহত স্বরে কহিল—আমি না দেখলে কে দেখবে ? যে ক'টা দিন আছে একটু নেড়ে চেড়ে নিই ? থাকবে বলে' তো আসেনি !

শেষের দিকের কথাগুলিতে তাব গলার স্বর ভিজিযা উঠিল। হেমেন্দ্রনাথ চেয়াব হইতে উঠিয়া পডিযা ঘর হইতে বাহিব হইয়া যাইতে যাইতে শুধু বলিলেন—একটু সাবধানে থেকো !

খুকুকে আলগা ভাবে বুকে চাপিয়া মৃদু দোলা দিতে দিতে অমলা বলিল—কোথায যাচ্ছ ?

—একবার বাইরে থেকে আসছি—

—খুকিকে একটু ভুলিয়ে আমি এখুনি যাচ্ছি,—তোমার চা জলখাবার সব তৈবী ক'বে দেব। বেরিয়ে যেও না যেন !

—না আমি বাইরেই আছি—বলিতে বলিতে হেমেন্দ্রনাথ এসেন্স সৌবভে দিক সুরভিত করিয়া, তাঁর জরীপাড় ধুতির ফিন্‌ফিনে ফুল কোঁচাটি ভূমিতে লুটাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

অমলা এক দৃষ্টে সেই দিকে স্নিগ্ধ সপ্রেম নেত্রে তাকাইয়া রহিল। স্বামী দৃষ্টির অন্তরাল হইলে সে তার খুকুর শীর্ণ অধরে সন্তর্পণে একটি স্নেহগভীর চুম্বন আঁকিয়া দিয়া মৃদুস্বরে বলিল—খুকু—সোনা আমার—সর্বস্বধন !

তিন

—আর একটুখানি বোসোনা অম্‌লু !

হেমেন্দ্রনাথ স্ত্রীর ডান হাতখানি চাপিয়া ধরিলেন।

—খুকুকে যে অনেকক্ষণ ফেলে এসেছি,—

—ফেলে এসেছো কই ? তার কাছে তো দাই বয়েছে,—

ব্যথাকরুণ স্বরে অমলা বলিল—হ্যাঁগো, দাইয়ের কাছে ঐ রকম রোগা মেয়ে ফেলে কি

মা নিশ্চিন্ত থাকতে পারে ?

হেমেন্দ্রনাথ অপ্রতিভ হইয়া মিনতির সুরে বলিলেন—যাবেই তো এখুনি ! এখন সে ঘুমুচ্ছে, ততক্ষণ আমার কাছে ব'সলে কি কিছু দোষ আছে ?

স্বামীর অপ্রতিভ মুখভাব ও মিনতি-সুরের বাক্যে অমলা মনে আঘাত পাইল। সে আবার খাটের উপরে শায়িত স্বামীর কাছ ঘেঁষিয়া উঠিয়া বসিল এবং তাঁহার হাতের আঙুলগুলি আস্তে আস্তে টিপিয়া দিতে দিতে বলিল—আর বোধ হয় তোমার আঙুলের গাঁটে একটুও ব্যথা নেই না ? কোত্থেকে বাত নিয়ে এসে কী ভোগাই ভুগেছিলে বল তো গেল বছরটা ? হেমেন্দ্রনাথ অভিমানের সুরে বলিলেন—এ' বছরটাও বাত হ'লে বাঁচতুম ! তবু তোমায় একটু কাছে পেতুম ! এখন তো তোমার দেখা পাওয়ারই জো' নেই !

বাহিরে অজস্র রূপালী জ্যোৎস্না জাম-গাছগুলার উজ্জ্বল চক্‌চকে সবুজ পাতার উপরে অবিরাম পিছলাইয়া পড়িতেছিল। সমস্ত দিন অগ্নিময় 'লু' চলিয়া রাত্রে বাতাসটি অতি স্নিগ্ধতর বহিতেছিল। অমলা'র পাত্‌লা দেশী সাড়ীর কাঁধের ও মাথার কাপড়টুকু বাতাসে থর থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। হেমেন্দ্রনাথ তাঁর অনিন্দ্য সুন্দরী পত্নীর নবনীত কোমল হাতখানি ধরিয়া তাঁহার জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত মুখখানির পানে মুগ্ধনেত্রে তাকাইয়াছিলেন !

অমলা স্বামীর বিমুগ্ধ তৃষিত দৃষ্টিতে একটু সঙ্কুচিতা হইয়া উস্‌খুস্ করিয়া নড়িয়া চড়িয়া মৃদুস্বরে বলিল—হ্যাঁগা, খুকুর গায়ে যে এক্‌জিমা না গরলের মত হয়েছে সেটা একবার দেখবে ? মুখের ভিতরের ঘা'ও তো সার্‌ল না ? আজ আবাব দেখছি ডান চোখ দিয়ে কেবলি পুঁজ পড়ছে—তোমার বন্ধু ঐ বটু-ডাক্তারটি কোনও কাজেব নয বাপু !

হেমেন্দ্রনাথ গভীর ঔদাস্যভরে বলিলেন—জন্মরুগ্ন হ'লে অমনি একটা না একটা লেগেই থাকে !

কথাটায় অমলা আহতা হইলেও কুণ্ঠিতা হইয়া পড়িল বেশী। তার সন্তান যে জন্মরুগ্নই হয় এবং সে জন্য স্বামীকে যে তার অনেক অসুবিধা ভোগ কবিতে হয়, তার জন্য অমলা সর্বদাই মনে মনে নিজেকে অপরাধিনী মনে করিত।

হেমেন্দ্রনাথ এবার সাভিমান অনুযোগের সুরে বলিলেন—ওর সেবা ক'রে বাত জেগে জেগে তুমি নিজের শরীর মাটী ক'রছো অমু ! দেখ দেখি,—আগের চেয়ে কত রোগা হ'য়ে গেছ,—চোখেব কোলে যে কালি পড়েছে ! তোমার কিন্তু এই অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বিশেষ সাবধানে থাকাই উচিত !

কথাগুলি খুবই কাতব সুরে উচ্চারিত হইলেও অমলার ভাল লাগিল না। রুগ্না মৃতকল্পা কন্যার প্রতি অবহেলা করিয়া সুস্থা স্ত্রীর প্রতি হেমেন্দ্রনাথের এই অত্যধিক যত্ন তাহাকে কোনও দিনই তৃপ্ত করিতে পারিত না বরং পীড়াই দিত বেশী।

হেমেন্দ্রনাথ অমলার ক্ষুণ্ণ মুখভাব লক্ষ্য করিলেন। কথাটা ঘুরাইয়া লইবার জন্য বলিলেন—গ্রীষ্মের ছুটীতে কিশোর এবার আসবে নাকি ?

—হ্যাঁ।

—সে এলে তোমার খুকু'র সেবা যত্নের খুব সুবিধা হবে।

—হ্যাঁ, কিশোর বড ভাল ছেলে। সেবা শুশ্রূষায় তার জুড়ি মেলা ভার !

হঠাৎ হেমেন্দ্রনাথ পত্নীকে একেবারে বুকের উপরে টানিয়া লইয়া গাঢ় সোহাগ পূর্ণ স্বরে বলিলেন—ভোমার জন্যে এবার শহর থেকে একটা চমৎকার জিনিষ এনেছি। এখনই তোমায় দিতে পারি—কিন্তু আমায় তুমি কি দেবে বলো ?

অনেকক্ষণ খুকুকে দাইয়ের কাছে রাখিয়া আসায় অমলা মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া

উঠিতেছিল—ঐ সময়ে স্বামীর এইরূপ প্রেমাভিনয় তাহার একটুও ভাল লাগিল না। জোর করিয়া স্বামীর আলিঙ্গন মুক্তা হইয়া নিরুৎসুক মুখের উপরে একটু শুষ্ক হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল—আমি তোমায় কী আর দেবো বলো? এ পর্যন্ত তো শুধু শোক আর রোগের ঝঞ্ঝাটই তোমায় দিয়ে এলুম—

হেমেন্দ্রনাথ উঠিয়া মাথার বালিশের নীচে হইতে একটি ভেলভেটের সুদৃশ্য কেস্ বাহির করিয়া অমলার সম্মুখে ধরিল এবং স্প্রিংটি টিপিতেই বাক্সের ডালা খুলিয়া গিয়া ভিতরে এক ছড়া বহু মূল্য হীরক নেক্‌লেস চাঁদের আলোয় ঝল্‌ঝল্ করিয়া উঠিল।

অমলার মাথার কাপড় খুলিয়া দিয়া হার ছড়াটা তাহার কণ্ঠে পরাইয়া দিতে দিতে হেমেন্দ্রনাথ মুগ্ধ বিহ্বল-কণ্ঠে বলিলেন—এমন গলা নইলে কি এ' হারের শোভা হয়?

খুকি পাশের ঘরে কাঁদিয়া উঠিল। অমলা ত্রস্তে উঠিতে যাইতেই হেমেন্দ্রনাথ আবার তাহাকে বাহু বন্ধনে বন্দিনী করিয়া ফেলিলেন!

—ওগো—পায়ে পড়ি এখন ছেড়ে দাও—খুকু কাঁদছে—

যাবেই তো—কিন্তু আমার পাওনাটা—হেমেন্দ্রনাথ অমলাকে আবও নির্বিড় ভাবে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

পাশবদ্ধা কুরঙ্গিনীর ন্যায় অমলা কাতর ভাবে মুহূর্তেক ছট্‌ফট্ করিয়া—স্বামীর ব্যগ্র ওষ্ঠের উপরে পাওনার দাবী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চক্ষু বুজিয়া কোনও ক্রমে এক নিমেষে শোধ করিয়া দিয়া—"ছাড়ো মেয়েটা ক'কিয়ে গেল"—বলিতে বলিতে তাঁহার বাহু মুক্তা হইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

চার

আরও কয়েক বৎসর পবের কথা। হেমেন্দ্রনাথ এখন এলাহাবাদে প্র্যাকটিস করেন। অমলার সেই খুকীটি মারা গিয়াছে। তাহার মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যে যে ছেলেটিকে সে কোলে পাইয়াছিল, সে'ই এখন তার একমাত্র সম্বল। কোনও রকমে তাহাকে সে আজ চার বৎসরের করিয়া তুলিয়াছে! তাহারও শরীর মোটেই ভাল নয়। কিছুদিন ধরিয়া চোখের অসুখে প্রায় শয্যাগত হইয়া আছে! অমলার নিজের শরীরও ভাঙিয়া পড়িয়াছে! বারো মাস গলায় ঘা, জিভে ঘা, অরুচি, খাইতে পারে না। তাহার অপূর্ব রূপলাবণ্যও অনেক খানি ম্লান হইয়া পড়িয়াছে!

দুপুরবেলা অমলা সিক্ত কেশ-রাশি পিঠে এলাইয়া স্বামীর গরম পোশাকগুলি রৌদ্রে দিয়া 'ড্রেসিং রুম' সাফ করিতেছিল। পাশের ঘরে ছেলে কাঁদিয়া উঠিল—মা—

—কি বাবা? এই যে আমি—

অমলা ব্যগ্র ব্যাকুল মুখে শয়ন কক্ষে ছুটিয়া গেল।

—মা, তুমি আমার কাছ থেকে উঠে যেওনা! আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না যে—

ছেলেকে সন্তর্পণে বুকে তুলিয়া লইয়া নিবিড় স্নেহে ললাট চুম্বন করিয়া গভীরস্বরে মা বলিল—কেন বাবা? আমি তো সব সময়েই তোমার কাছে আছি!—তুমি কি আজকে আরও ঝাপ্‌সা দেখছো?

—তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তোমার মুখটা ভাল করে' দেখতে পাচ্ছি না। আমার চশমার কাঁচ দুটো পুছে দাও না মা—

অমলা ছেলের চোখ হইতে ক্ষুদ্র চশমা খানি খুলিয়া, মোটা পুরু কাঁচ দু'খানি আঁচল দিয়া

ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া, ছেলের চোখে পরাইয়া দিয়া, ব্যগ্রভাবে বলিল—এইবার আমাকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছো, না বাবা ?

বালক চক্ষু দুইটি বড় বড় করিয়া বিস্ফারিত করিয়া বলিল—কই, না তো ! বাবাকে বোলো আমার চশমাটা আবার বদ্‌লে দিতে। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না ভালো করে—বালক কাঁদিয়া উঠিল।

অমলা কাতর মুখে ছেলের মুখে চোখে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—ভয় কি বাবা ? হরিকে ডাক, তিনি তোমার চোখ ভাল করে' দেবেন !

বালক মায়ের গলাটি দুই হাতে জড়াইয়া বুকে মাথা গুঁজিয়া বলিল—তুমি আমায় ফেলে উঠে যেও না মা—

ঘরের দরজায় একটি শ্যামবর্ণা সুশ্রী যুবতী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে স্থানীয় অন্যতম বাঙালী ডাক্তার নিত্যেশচন্দ্র বসুর স্ত্রী—প্রভাবতী।

ঘরের ভিতরে আসিয়া প্রভা অমলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—রোগা ছেলে তোমার, কেন তুমি আজ পোষাক রোদে দিতে গেলে দিদি ?

—পোষাকগুলো অনেকদিন রোদে পড়েনি, ঘরখানা অনেকদিন ঝাড়া হয়নি, ধুলো জমে আছে—উনি অপরিচ্ছন্নতা সইতে পারেন না ! তাই গেছ্‌লুম একবার—

—তা' বলে ঐ ছেলেকে ফেলে উঠলে কি ক'রে ?

—কি করবো ভাই ? আমার ভাগ্যে কিশোরকে এর কাছে বসিয়ে রেখে উঠে গেছ্‌লুম ! অসুখ তো আমার কপালে বারোমাসই লেগে আছে ! ওঁর দেখা-শুনো সেবা-যত্ন কিছুই তেমন ক'রতে পারিনে !…আর এই খোকার চোখ নিয়ে কি করি বলতো দিদি ? উনি তো এত ওষুধ পত্র দিচ্ছেন,—ওঁর বন্ধু বটু ডাক্তারটিও তো কলকাতা থেকে এসে দেখে গেল,—কিন্তু বাছা'র অসুখ তো দিন দিন বেড়েই চলেছে !—

প্রভা বলিল—আমাদের এখানে যে চোখের খুব বড় একজন 'স্পেশ্যালিস্ট' রয়েছেন, ডাক্তার এল্‌, এল্‌, ডেশাই ! তাকে খোকার চোখ দেখিয়ে ছিলে কি ?

—উনি এখানকার কোনও ডাক্তারকে দেখাতে কিছুতেই রাজী হ'ন না। ওঁর ঐ একটা কেমন চিরদিনের খেয়ালের জেদ ! নিজেই ছেলেদের চিকিৎসা করেন। যদি আমি বেশী ব্যস্ত হই, একেবারে কলকাতা থেকে ওঁর বন্ধু বটু ডাক্তারকে এখানেই আনেন—তবু এদেশী ডাক্তারদের দেখাতে চান না !

—বটু ডাক্তারের নাম শুনেছি বটে,—কলকাতায় সে মস্ত ডাক্তার, বত্রিশ টাকা তার ভিজিট ! কিন্তু আমার মনে হয় ডাক্তার ডেশাইকে দেখালে, তোমার খোকার চোখ নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবে দিদি !

—দেখি,—কিশোরের সঙ্গে একবার পরামর্শ ক'রে না হয় ডেশাইকেই আনব। উনি তো আজ দিল্লীতে 'কলে' চলে গেলেন। এ ক'দিন দেখবে শুনবেই বা কে ?—

প্রভা মুখখানা ঘুরাইয়া বলিল—বেটাছেলেদের আর কী বলো ? ওঁদের তে দশ মাস পেটে ধরে ছেলেকে গড়ে তুলতে হয়নি—না খেয়ে না ঘুমিয়ে বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ ক'রতেও হয়নি—ছেলের দরদ ওঁরা কি বুঝবেন ?—

অমলা সখীর কথায় আঘাত পাইলেও প্রতিবাদ করিতে পারিল না। তাহার স্বামীর পত্নীর প্রতি যত্ন ও অনুরাগ আদর্শের মধ্যে গণনা করা যায়—কিন্তু সন্তানদের প্রতি তাহার অসীম ঔদাস্য—সে তো কোনও মতেই অস্বীকার করা চলে না।

পাঁচ

সে দিন সমস্ত রাত্রি চোখের অসহ্য যাতনায় খোকা ঘুমাইতে পারিল না। কিশোর সকালবেলায় বলিল—মাসিমা, আমি ডাক্তার আনতে চললুম। মামাবাবু দিল্লী থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত যদি তুমি অপেক্ষা ক'রতে চাও—ছেলেটা জন্মের মত হয়তো দৃষ্টিহীন হ'য়ে যাবে!

শিহরিয়া অমলা বলিল—চুপ কর বাবা! ও' কথা বলতে নেই!—তুই ডাঃ দেশাইকে আর ডাঃ নিত্যেশ বসুকে আজই ডেকে নিয়ে আয়।

মামীকে কিশোর যতটা ভালবাসিত ও শ্রদ্ধাভক্তি করিত মামাকে তাহা করিত না,—বরং মামার উপরে তার যেন বেশ একটু বিরাগই ছিল। মোরাদাবাদে মামাব চাকরী যাওয়ার পর সে আর এ পর্যন্ত মামার কাছে আসে নাই। অমলার একান্ত অনুরোধে এবার বড়দিনের ছুটীতে কলেজ বন্ধ হইলে এলাহাবাদে আসিয়াছে। এই অষ্টাদশ বর্ষীয় তরুণ ছেলেটিকে অমলা সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিত।

ডাক্তাররা যখন ছেলের চোখ পবীক্ষা করিতেছিলেন—অমলা পাশের ঘরে পর্দার আড়ালে উৎকর্ণা হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

ডাঃ ডেশাই ইংরাজীতে কথা বলিতেছিলেন,—কথাগুলি বুঝিতে না পারিলেও নিত্যেশবাবুর ও কিশোরের মেঘাচ্ছন্ন মুখভাব ও কথাবার্তার ভঙ্গী দেখিয়াই অমলা বুঝিতে পারিয়াছিল পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক নয়। তার পা' দুটি ঠক্ ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মনে মনে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীকে স্মরণ করিতে করিতে সে তাহার খোকার চোখের আরোগ্য-কামনা করিতে লাগিল।

অমলা আড়াল হইতে দেখিল—ডাঃ ডেশাই ও নিত্যেশ বসু অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে কথা কহিতেছেন এবং কিশোর ঘন-অন্ধকার মুখে অপরাধীব ন্যায় মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

খোকা অস্ফুট-ক্রন্দনস্বরে বলিল—মা'র কাছে যাব—

নিত্যেশবাবু তাহার প্রতি একবার ব্যথিত দৃষ্টিপাত করিয়া কিশোরকে বলিলেন,—আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি,—খোকাব মা'কে আসতে বলুন।...আহা! নিরপরাধ কত শিশু যে এই বকম তাদের বাপের পাপে কষ্ট পাচ্ছে! হয় অকালে মরছে—না হয় ব্যাধিগ্রস্ত শরীর নিয়ে জীবন্মৃত হয়ে থাকছে!...এরা কি মানুষ? পশুর চেয়েও অধম এবা!—নিজে চিকিৎসক হ'য়ে—নিজের দেহ এই দুরারোগ্য ব্যাধির বিষে ভরা—এ সমস্ত জেনে শুনেও—একটার পর একটা নরহত্যা—শিশুহত্যা করে চলেছে?...আপনার মামাবাবু এলে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন!

ডাক্তার ডেশাইয়ের সহিত নিত্যেশ বসু বাহির হইয়া গেলেন। পর্দর ওপাশে অমলা ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল।

পরে কিশোরকে একটির পর একটি প্রশ্ন করিয়া অমলা যখন ব্যাপারটা সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল,—তখন এক মুহূর্তেই তাহার চ'খের সম্মুখ হইতে একটি ঘন-কালো পর্দা যেন সহসা সরিয়া গিয়া—অতীতের অনেক কিছু ভীষণ উৎকট সত্য দৃষ্টিপথে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল!

মোরাদাবাদে যখন একটা স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপার উপলক্ষে হেমেন্দ্রনাথের চাকরি গেল—হেমেন্দ্রনাথ অমলাকে বুঝাইয়াছিল—বিদেশী বাঙালী এখানে এসে এত পশার

করেছে, হাসপাতালের কর্তা হয়েছে—সেই হিংসেয় হাসপাতালের লোকজনেরা 'নার্স' গুলোর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে আমার নামে এই কলঙ্ক দিচ্ছে। আমার চাকরী যাক দুঃখ নেই, কারণ, তুমি আমায় অবিশ্বাস ক'রবে না জানি।

অমলা সেদিন স্বামীর সেই অপমানে—দুঃখ ও ব্যথায় আকুল হইয়াছিল। হিংসুক দুষ্ট লোকগুলিকে মনে মনে কত অভিশাপ দিয়াছিল। কিন্তু, আজ সে ব্যাপারটা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল! এই রকম আরও কত ছোট বড় ঘটনা অমলার মনে পড়িল—যাহা তাহার চোখের সামনে নিরন্তর ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, কিন্তু সে অন্ধের চেয়েও অন্ধের মত সে দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, তার দুশ্চরিত্র কুৎসিৎ ব্যাধিগ্রস্ত স্বামীর প্রেমে মুগ্ধা হইয়া, একটির পর একটি সন্তান হত্যা করিয়া চলিয়াছে!

অমলা পক্ষাঘাত-গ্রস্তের ন্যায় স্তম্ভিত নিথর হইয়া বসিয়া রহিল। ও' ঘরে খোকা ব্যাকুল স্বরে কাঁদিতে লাগিল—মা-মা—আমার কাছে এঁসো—

অমলা উঠিতে পারিল না। কিশোর মামিমার অবস্থা বুঝিয়া নিজেই খোকাকে ভুলাইতে গেল।

অমলার চোখের সামনে সুস্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া উঠিতে লাগিল—তাহার প্রত্যেকটি সন্তানের মৃত্যু-দৃশ্য! ওঃ তিল তিল করিয়া কী যাতনাই না তারা ভোগ করিয়াছে!...অমলা শিহরিয়া উঠিল,—তাদের সেই যাতনা—সেই কষ্টের জন্য সে'ও কি দায়ী নয়?...হ্যাঁ। দায়ী বৈকি! নিশ্চয়ই দায়ী!

সে মূর্খ অশিক্ষিতা নারী—জননী হইবার উপযুক্ত দায়িত্বজ্ঞান যাহার নাই—সে জননী হইয়াছিল কী ভরসায়, কোন্ স্পর্দ্ধায়?...স্বামীর আদরে সোহাগে প্রেমে সে অন্ধা হইয়াছিল! উঃ কি ভীষণ স্বার্থপর নারী সে! এই নিরপরাধ শিশুগুলিকে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করার কি তার প্রায়শ্চিত্ত আছে?...

স্বামী যে ভালবাসেন, সে কাহাকে? অমলাকে—না অমলার যৌবন—সুন্দর নিটোল—দেহখানিকে—তার সেই অসাধারণ রূপ-লাবণ্যকে?...অমলা নিজের প্রতি তাকাইয়া ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল।

ছয়

হেমেন্দ্রনাথ দিল্লীর 'কল' হইতে প্রচুর অর্থোর্জ্জন করিয়া উৎফুল্ল চিত্তে শিশ্ দিতে দিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁর কালো রংয়ের সাহেবী পোষাকের কোটের বুকে একটা টক্‌টকে লাল মস্ত বড গোলাপ 'পিন্' করা রহিয়াছে!

হেমেন্দ্রনাথ তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য না করিয়া সহাস্য মুখে সাহেবী ভঙ্গীতে পত্নীকে আলিঙ্গনার্থে উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইলেন!

ব্যাঘ্র-ভীতা হরিণীর ন্যায় ভীতি-কাতর নেত্রে সেই দিকে তাকাইয়া বিবর্ণ মুখে একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া অমলা সে ঘর হইতে প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, খোকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিশোর তাহার চোখে আস্তে আস্তে 'হট্ কম্প্রেস' দিয়া দিতেছে। অমলা মৃতের ন্যায় রক্তশূন্য বিবর্ণ মুখে খোকার পাশে গিয়া বসিল। কিশোর মামীর মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে উঠিয়া গেল।

অমলা উন্মাদিনীর মত খোকার চোখের পুঁজ-লাগা নোংরা বোরিক তুলাগুলি মেঝে

হইতে কুড়াইয়া লইয়া নিজের চোখে ঘসিতে ঘসিতে আপন মনে বলিতে লাগিল—বাবা আমার ! তোর সঙ্গে আমিও অন্ধ হ'ব ! এত দিন ভুল ক'রে অন্ধ হয়ে থাকায় তোদের এত কষ্ট দিয়েছি—আজ সত্যিকাবের অন্ধ হব !

কিশোর তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া অমলার দিকে ব্যগ্র ভাবে অগ্রসব হইয়া বলিল—ক'রছো কি মামিমা ! পাগল হ'য়েছো নাকি ? ঐ বিষাক্ত তুলোগুলো নিয়ে নিজের চোখে লাগাচ্ছ ?—কিশোর হাত বাড়াইয়া অমলার হাতের তুলা কাড়িয়া লইতে গেল।

অমলা কিশোরের সেই প্রসারিত হাতখানি দেখিয়া সর্বদষ্টা'র ন্যায় শিহরিয়া ঘৃণাপূর্ণ নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল—ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না—তুমি, তুমি, ছেলে মেরেছো—না, না আমি,—আমিই 'মা' হ'য়ে সন্তান হত্যা করিছি। অমলা কাঁদিয়া উঠিল।

তাহার কান্না শুনিয়া খোকাও কাঁদিয়া উঠিল—মা—মা—

অমলা তাড়াতাড়ি খোকার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল—চুপ—ও' কথা বলতে নেই। বাপ মা কি কখনও সন্তানকে অন্ধ কবে দিতে পাবে ?

রাধারাণী দত্ত

॥ ১৩৩৭ সন তথা শেষ বৎসরের 'কুন্তলীন পুরস্কারে'র শেষ রচনা ॥

পুরুষস্য ভাগ্যম্

বিরাজলাল বি· এ· পাশ করিযা পল্লীগ্রামের একটা স্কুলে মাস্টারি করিতেছিল। ল' পড়িবার বাসনা ছিল না। আইনের পথ যে শতকরা নিরানব্বইজন বাঙালীর ছেলের ধ্রুব পথ, তা সে জানে ; সেই সঙ্গে সে আরো জানে, ধ্রুব-পথে ভবিষ্যৎ একান্ত অধ্রুব ; কাজেই ধ্রুব পথে অধ্রুব ভবিষাতেব সন্ধানে বাহির হওয়া সে সমীচীন বুঝিল না। সে কাজটা ঠিক adventureও নয়, ববং rash ও negligent act হইবে।

এ্যাড্‌ভেঞ্চারের দিকে বিরাজলালের একটা ঝোঁক আছে ছেলেবেলা হইতে। যখন ছোট ছিল, পিসির কাছে পক্ষীরাজ ঘোড়ার গল্প, তালপত্রে খাঁড়ার গল্প, পাতালপুরীর রাজকন্যার গল্প শুনিয়াছে ; তরুণ বয়সে কলিকাতার কলেজে পড়িতে দু-চারিখানা মাসিকপত্রে হালের বিচিত্র গল্পও পড়িয়াছে। কাজেই···। কিন্তু এগ্‌জামিনের তাড়া, দারিদ্র্য, আর মুরুব্বিহীন সংসারের ধান্দা—এমনি কারণে এ্যাডভেঞ্চারের সন্ধানে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রার সুযোগ কখনো ঘটে নাই।

আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয়—এতদিন পড়ার আড়ালে থাকায় সে অস্বচ্ছলতা কোনো বিভীষিকা জাগাইতে পারে নাই। আজ বি· এ· পাশ করিবার পর সে আড়ালে ঘুরিলে বিরাজলাল স্পষ্ট দেখিল, সামনে জীবনের পথ সাহারা মরুর মত ধূ-ধূ করিতেছে ! যতদূর লক্ষ্য হয়, ওয়েসিশের শ্যামল ছাযার চিহ্নও নাই !

দাঁড়াইয়া থাকিলেও চলে না ; কাজেই মাস্টারি লইতে হইল। কলেজে সেক্সপীয়ার শেলি পড়িবার সময় জীবনের বহু ছবি মনে জাগিত। সে ছবি প্রেম-স্নেহ-আরাম-বিরামের বিচিত্র বর্ণে রঙীন। আশ-পাশের দু-চারিটা ঘরও যে নজরে পড়ে নাই, এমন নয় ! কাজেই তার চিত্ত ঐ রঙের পিপাসায় ক্ষণে ক্ষণে আকুল হইত !

আকুল হইলেও কূলের কোন হদিশ পাইতেছিল না। বন্যা-রিলিফ, সেবামিশন,

খাদি-বিক্রয় প্রভৃতি পুণ্য ব্রত গ্রহণের কথাও মনে উদয় হইত। কিন্তু সে কাজে উত্তেজনা কৈ? তাছাড়া রঙীন ভবিষ্যতের পথ ওদিকে মোড় ফিরিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

মা বলিতেন—বি-এ পাশ করলি তো, এবার বিয়ে করে একটি টুক্‌টুকে বৌ আন্।

বিরাজ জবাব দিত,—নিজের চিন্তাতেই আকুল হয়ে আছি, এর উপর বৌ! অমন সাধ মনের কোণেও এনো না মা!

মা কহিলেন—কি যে তোর গোঁ কিছু বুঝি না। সবাই বিয়ে করচে...

বিরাজ কহিল—বিয়ে করলে দুঃখ বাড়বে বৈ ছাড়বে না।

মা কহিলেন—আমাদের শাস্তরে বলে, বৌ লক্ষ্মী...বিয়ে করলে বৌয়ের পয়ে, দেখিস্ রে তোর ভাগ্য ফিরবে।

বিরাজ কহিল—বৌ অপয় নিয়েও আসতে পারে। তোমরাই তো বলো,—বিশুমামার সব গেল তাঁর বৌয়ের পয় নেই বলে!...

মা সে কথা কানে না তুলিয়া কহিলেন—তোর যত সৃষ্টিছাড়া কথা! ভালো কথা তো কইতে শিখ্‌লি না। আমি মেয়ে দেখে ঠিক করেছিলুম। হেলুর এক শালী আছে...হেলুর শ্বশুর কোন্ আপিসে চাকরি করে...

বিরাজ কহিল—বিয়ে আমি করবো না, মা। একা বেশ আছি! আমার মনে বাসনা আছে, পৃথিবী ঘুরবো—চীন, জাপান, মায় উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু অবধি। ঘুরে জগতে একটা কীর্তি রাখবো...যে কীর্তি কেউ কোনো দিন অর্জন করতে পারেনি। রোজগার করে পয়সা আমি জমাতে চাই। সেই পয়সায় ভূ-প্রদক্ষিণ হবে।

মা কহিলেন—বড় ভালো কথা! বাড়ী-ঘর ছেড়ে টো-টো করে ঘোরা। শেষে সে দেশ থেকে একটা ম্যাথরানী কি ঝাড়ুদানী বিয়ে করে ফিরে এসো আর কি!

হাসিয়া বিরাজ কহিল,—তুমি পাগল হয়েচো মা! বিয়ে আমি করবোই না। সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করে তুলবো বিয়ে করে, এমন নিরেট আমি নই!...

সন্ধ্যায় লাইব্রেরীতে গিয়া নিত্যকার মত খবরের কাগজ টানিয়া বিরাজ চাকরি-খালির বিজ্ঞাপনের পাতায় চক্ষু বুলাইতে বসিল। দেশের নানা খবর জানার পূর্বে এ খবরেই তার বেশী অনুরাগ। কত বিজ্ঞাপনই যে নিত্য পড়ে! বিজ্ঞাপনের ধাঁচ্ তাঁর মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। ধারা একই!

—বি-এ পাশ শিক্ষক চাই। ওলকচুয়া হাই ইংলিশ স্কুল। বেতন মাসে বারো টাকা। টুইশন দু-একটি মিলিতে পারে।

—ল-এজেণ্ট চাই। বেতন মাসে পনেরো টাকা। দু'হাজার টাকা নগদ জামিন। রায় হরবল্লভ এস্টেট্; দশাননপুর।

—পাঁচটি ছেলের জন্য প্রাইভেট টিউটর চাই। বেতন মাসে পাঁচ টাকা—এক বেলার আহার অমনি মিলিবে। শিক্ষকের শরীর বলিষ্ঠ হওয়া দরকার। নিত্য সকালে-বিকালে ছেলেদের শরীর-চর্চা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হইবে। নিম্ন-ঠিকানায় আবেদন করুন।—শ্রীপতিরাম বক্সী, উকিল, হাতীমারা, জিলা ফরিদপুর।—

বিরাজ ভাবিল, পাঁচ টাকায় টিউটর চায়! পড়ানো, তার উপর আবার শরীর-চর্চা! এক বেলা আহার! ওঃ, বাসন মাজতে হবে না? ইচ্ছা হয়, মুষ্টাঘাতে গার্জেন পতিরামের অবধি শরীর দুরমুস্ করে দিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে দেশের দুর্দশা ভাবিয়া তার বুক একেবারে অন্ধকারে ভরিয়া গেল। দেশের লোকের কাছে দেশের লোকের এই তো দাম! আর বিদেশী যদি সে কথা তোলে, পিত্ত অমনি জ্বলিয়া ওঠে। রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে সে

আর একটা কাগজ উল্টাইল। এক অদ্ভুত বিজ্ঞাপন চোখে পড়িল। বিজ্ঞাপনটি ইংরাজী ভাষায়। অর্থ এই—একটি তীক্ষ্ণধী চতুর যুবার প্রয়োজন। হৃদয়-বৃত্তি-সমস্যার সমাধানে তৎপর সাহিত্য-রসিকের আবেদনই শুধু গ্রাহ্য হইবে। বেতন যথোপযুক্ত দিতে রাজী। নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন। 'কথা শিল্পী', কেয়ার-অফ্ এডিটার 'থাণ্ডার'।

বিজ্ঞাপনটি বিরাজ পাঁচ-সাতবার পড়িল! পড়িয়া, আর যারা বসিয়া কাগজ পড়িতেছিল, তাদের পানে চাহিল। তারা তখন নোয়াখালির কোন্ পুলিশ-দারোগার গোরুচুরির বিবরণ লইয়া তর্কযুদ্ধে মাতিয়াছে। শাণিত বচন-শরে পরস্পরকে জর্জরিত করিবার প্রয়াসে সব মরিয়া! চমৎকার সুযোগ! বিরাজ এ-সুযোগ উপেক্ষা করিল না, তাড়াতাড়ি বিজ্ঞাপনটুকু ছিঁড়িয়া পকেটস্থ করিয়া সরিয়া পড়িল।

সরিয়া সে আসিয়া বসিল নদীর ধারে। ও-পারে গাছ-পালায় মাথায় নিবিড় অন্ধকার। কালো জলে ছল-ছল রাগিণী! বিরাজ বসিয়া ভাবিতেছিল,—কি কাজ? কেরানীগিরি? বোধহয়, না। হৃদয়-বৃত্তির তাহাতে কি দরকার? তা ছাড়া ঐ সাহিত্য-বসিক বিশেষণ! নিশ্চয় কোন কাগজের সাব-এডিটারী! নয়তো কোনো পাকা পাব্লিশার বিলাতী নভেলের তর্জমার কাজে লোক চায়! বাড়ী ফিরিয়া কাগজ-কলম লইয়া 'থাণ্ডার' সম্পাদকেব কেয়!রে 'কথাশিল্পী' নামে সে দরখাস্ত লিখিয়া ফেলিল। পরের দিন সে দরখাস্ত ডাকে দিল।

এক সপ্তাহ পরে উত্তর আসিল।

—মহাশয়, এই পত্রসমেত যত শীঘ্র সম্ভব আমার সহিত ১৭ নং ফুলতলা রোড বহুবাজারে দেখা করিবেন। সাক্ষাতে সকল বিষয়ের আলোচনা হইবে। আপনাব গাড়ী-ভাড়া-বাবদ স্বতন্ত্র মণি-অর্ডার-যোগে পাঁচটি টাকা পাঠাইলাম। শ্রীজয়গোপাল হালদার।

আনন্দের আতিশয্যে বিরাজের চিত্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। জয়গোপাল! জয়গোপালই বটে! এই গোপালকে অবলম্বন করিয়াই জীবনের পথে তার জয়যাত্রা শুরু হোক!...

বিরাজ ডাকিল—মা—

মা রান্নাঘরে ঝোল সাঁতলাইতেছিলেন, কহিলেন,—কেন রে?

বিরাজ কহিল,—আমি চান করতে চললুম। তোমার রান্না যা হয়েছে, চট্ করে তাই ধরে দাও। এই ট্রেনে এখনি আমায় কলকাতায় যেতে হবে।

মা বিবক্তি-ভরা স্বরে কহিলেন—তুই জ্বালাস্ নে, বাপু!...

বিরাজ শিশি হইতে তেল ঢালিয়া কহিল,—চাকরি মা, চাকরি! বুঝি, প্রভুজয়—গোপালজী দয়া করলেন! দেরী নয়। এই দশটা বারোর ট্রেনেই যাবো।...

ঘড়িতে ঢং-ঢং করিয়া ন'টা বাজিল।...

কাঁধে গামছা ফেলিয়া বিরাজ চলিল পুকুরে স্নান করিতে।

দুই

বহুবাজার ১৭ নং ফুলতলা রোড খুঁজিয়া পাইতে বিলম্ব ঘটিল না। চাঁপাতলার একটু দক্ষিণে এক সরু গলি। রোড হইল কি করিয়া—তা লইয়া ঐতিহাসিক রীতিমত গবেষণা করিতে পারেন। ১৭ নম্বরে মেস। এখানে জয়গোপাল হালদারের সন্ধানও মিলিল। দোতলার ঘরে একখানা রং-চটা চেয়ারে বসিয়া আছে। বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর। সামনে ক্যাম্প-টেবিলের উপর এক তাড়া কাগজ। জয়গোপাল নিবিষ্ট মনে কি

লিখিতেছিল। ঘরের একধারে একখানা তক্তাপোষ, তার ও-পাশে একটা বেতের শেল্ফ। শেল্‌ফে রাজ্যের পুরানো ম্যাগাজিন, আর বাঙলা মাসিক-পত্র—একেবারে আণ্ডিল জমিয়া আছে।

বিরাজলাল সবিনয়ে কহিল—জয়গোপালবাবু কোন্ ঘরে থাকেন ?

বিরাজ খুশী মনে কহিল,—আমি শ্রীবিরাজলাল গঙ্গোপাধ্যায়। আপনি আসবার জন্য লিখেছিলেন··

জয়গোপাল কহিল,—ও···হ্যাঁ। বসুন ঐ তক্তাপোষে।

বিরাজ বসিল। জয়গোপাল তার পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া তাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ঘড়িওয়ালা যেমন করিয়া ঘড়ির কলকব্জা দেখে, তেমনিভাবে! বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিবার পর কহিল,—এখানকার পথ-ঘাট জানা আছে ?

বিরাজ কহিল,—বৌবাজারের তো ?

জয়গোপাল কহিল—না। কলকাতার।

বিরাজ কহিল—মোটামুটি রাস্তাগুলো জানি।

—লেকের দিকটা ?

—জানি। আমি· বি· এ· পাশ করেছি বঙ্গবাসী কলেজ থেকে। লেকের দিকে প্রায় বেড়াতে যেতুম। তখনো সব বাস্তা তৈবী হয়নি।

—গড়িয়াহাটের পথ জানা আছে ?

—গড়িয়াহাট জানি।

জয়গোপাল কিছুক্ষণ কি ভাবিল, পরে কহিল,—কাজ যা করতে হবে, তাতে বুদ্ধির দরকার। আর সে কাজ খুব গোপনীয়।

বিবাজ কহিল,—বুদ্ধিব গর্ব কবা শোভন হবে না। তবু বলতে পারি, আমি নির্বোধ নই। আর কথা গোপন রাখা ? যখন চাকরি করতে এসেছি, তখন ও আদেশ পালন করতেই হবে।

—বেশ। বলিযা জয়গোপাল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল ; তারপব কহিল,—বাঙলা সাহিত্যের চর্চা করেন ?

বিরাজ কহিল,—কিছু কিছু করি। মানে, পড়ি।

কহিল—প্রলয়কুমার হালদারের লেখা পড়েছেন ?

বিরাজ কহিল—আজ্ঞে না। তবে নাম শুনেচি। লেখা পড়া হয়নি। তার কারণ, বি· এ-তে স্যান্‌সক্রিট ছিল, তার ব্যাকরণ-সন্ধি-সমাস নিয়ে বিব্রত ছিলাম। পাশ করে দেশেই আছি। সেখানে লাইব্রেরী আছে ; তবে তাতে হালেব লেখকদের বই পাওয়া যায় না। বাঙলা সাহিত্যে আমার অনুরাগ আছে।

বিরাজকে আর একবার লক্ষ্য করিয়া জয়গোপাল কহিল—আচ্ছা, বই দেবো, পড়ে নেবেন। মানে, আমিই লেখক প্রলয়কুমার। ছোট গল্প লিখি, উপন্যাস লিখি। তবে জয়গোপাল নামে লেখা ছাপলে পাঠক-পাঠিকার চিত্ত পাছে বিরূপ হয়, এই ভেবেই প্রলয়কুমারের নামে ছাপাই।

কথাটা বলিতে বলিতে জয়গোপাল উঠিয়া একতাড়া মাসিক-পত্র আনিয়া বিরাজের সামনে রাখিয়া কহিল—পড়ে দেখবেন। অর্থাৎ কাজ করুন হাত-খরচের জন্য পঞ্চাশ টাকা পাবেন। তারপর কাজটি করে দিতে পারলে নগদ এক হাজার টাকা মিলবে। লেখাপড়া করাতে চান, স্ট্যাম্প-কাগজে ? করাতে পারেন, উকিল-খরচ আমি দেবো।

বিরাজের বুকটা ধড়াশ করিয়া উঠিল। এই তো গলির মোড়ে জীর্ণ ঘর! আর ঐ আসবাব—একখানা তক্তাপোষ, একটা টেবিল, আর ঐ পুরোনো ম্যাগাজিনের বস্তা! অথচ টাকার লম্বা বহর! ব্যাপার কি? উইল জাল? না, অমনি কোনোরকম গভীর ফন্দি আছে? ধরা পড়ার ভয়ে তাকে দিয়া সারিতে চায়?

জয়গোপাল কহিল, কাজটা কি, বলি। কিন্তু তার আগে ভালো কথা, চাকরি নিতে রাজী আছেন তো?

বিরাজ কহিল—কাজটা কি, না শুনলে—

জয়গোপাল হাসিল, হাসিয়া কহিল,—ভয় নেই। জালজচ্চুরি নয়। কাজ ভালো। তবে বুদ্ধি সাফ হওয়া চাই, মায় বাঙলা সাহিত্যে একটু জ্ঞানও সেই সঙ্গে। আপনার যখন বি· এ-তে স্যানস্‌কৃট ছিল, তখন সাহিত্য একরকম চলে যাবে। আমার বই পড়লেই up to-date হবেন। তবে কাজের কথার আগে কিছু খান। বেলা চারটে বেজেছে। বলিয়া সে হাঁকিল—সুখন—

সুখন ভৃত্য আসিল। জয়গোপাল কহিল,—এক পো লুচি, আধ পো আলুর দম, আর চার আনার রসগোল্লা চট করে নিয়ে আয় দিকিনি। মাংস? আপনি মাংস খান, নিশ্চয়?...আচ্ছা, একটু কোর্মাও অমনি আনবি। যা, চট করে। যাবি আর আসবি।

সুখন চলিয়া গেল।

জয়গোপাল কহিল—হ্যাঁ, এবার কাজের কথা বলি। আমাদের একখানা মাসিক-পত্র আছে,—"চাঁদোয়া"। সেই কাগজে আমি লিখি গল্প আর উপন্যাস। সম্পাদক আমিই।

এই অবধি বলিয়া জয়গোপাল চুপ করিল। তারপর একবার চকিতের জন্য বাইরের মুক্ত আকাশে দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া কহিল, যা বলবো, খুব গোপনীয় কথা। কখনো প্রকাশ না হয়!

বিরাজের কৌতূহল জাগিয়াছিল অপরিসীম। সে কহিল—না, প্রকাশ হবে না।

জয়গোপাল কহিল—'চাঁদোয়া' কাগজে কবিতা লিখতেন এক মহিলা। তাঁর নাম শ্রীমতী নীলিমা দেবী। চমৎকার কবিতা—নিরাশ প্রাণের নিশ্বাসে ভরপুর! আর সব কবিতায় এক সুর।...তাঁর সঙ্গে আলাপ করবো বলে পত্রাঘাত করেছিলুম।...তাঁর কবিতার স্তুতি-গান করে—অবশ্য বেনামীতে। কিন্তু কোনো জবাব পাইনি! সন্ধান নিয়ে জেনেচি, তিনি কুমারী, শিক্ষিতা এবং বয়সে তরুণী...

বিরাজের দুই চোখ বিস্ফোরিত হইয়া উঠিল। লভ?

জয়গোপাল কহিল—আমার নিজের উপর বিশ্বাস আছে প্রচুর। সাহিত্যে আমার শক্তি সামান্য নয়। এ বিশ্বাসও রাখি। আবার একদিন নোবেল প্রাইজ যদি এদেশে কেউ আনতে পারে তো সে আমিই আনবো—এই লেখার মারফৎ। বাঙলার কথা-সাহিত্যে যদি কেউ জীবন জাগিয়ে থাকে তো সে আমি, শ্রীমান প্রলয়কুমার। কথা-সাহিত্যের যজ্ঞশালায় আমার এক একটি রচনা বেরিয়ে ছোটে যেন অশ্বমেধের ঘোড়া। কার সাধ্য, তাকে পরাজয় করে? তাই আমি অপরাজেয় কথা-শিল্পী...

উত্তেজনায় জয়গোপালের চোখে আগুনের হল্কা ফুটিয়া উঠিতেছিল! কথাশিল্পী, নীলিমা দেবী এ-দুয়ে যোগ কোথায়, বিরাজ তাই ভাবিতেছিল।

জয়গোপাল কহিল,—এ আমার কথা নয়। সুবিখ্যাত ক্রিটিক শ্রীযুক্ত ব্রীড়াময়বাবু ছাপার অক্ষরে লিখে গেছেন, এ কথা। কিন্তু যাক সে কথা...আমি এই কথাশিল্পে নীলিমা দেবীর চিত্ত জয় করতে চাই। তাঁর ঠিকানা দেবো। নিজের মুখে নিজেকে প্রচার পুরুষ সমাজে

করতে পারি, কিন্তু মহিলা-সমাজে ?—ওঁদের মনের বাস্তব পরিচয় জানি না। তাই আপনাকে আমার সাহিত্য প্রচার করতে হবে। সমাজে নয় নীলিমা দেবীর কাছে। উপায়ও আমি বলে দেবো···

বিরাজ জয়গোপালের দিকে কুতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

জয়গোপাল কহিল,—আমার লেখা তাঁকে শুনিয়ে, পড়িয়ে—যেমন করে হোক, তাঁর চিত্তকে আমার প্রতি জাগ্রত উন্মুখ করে তুলতে হবে। তা হলে বিবাহে বাধা থাকবে না। এ দেশে এখনো romanticism দেখা দেয়নি। নীলিমা দেবীর বাবা সারদা লাহিড়ী পয়সাওয়ালা জমিদার। ভারী এক রোখা, কিন্তু কন্যা স্নেহে বিভোর। সম্প্রতি এই অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েচেন—মেয়ের সঙ্গে। তাই বোধ হয় নীলিমা দেবীর কবিতা আর পাই না। কাজেই···

সুখন খাবার লইয়া আসিল। জয়গোপাল কহিল—খেয়ে নিন। খেতে খেতে শুনবেন···

তাই হইল। জয়গোপাল কহিল—বুদ্ধিমান যুবা চেয়েছিলুম। ঐ স্বদেশী মন্ত্রে আপনিও দীক্ষা নিন—এবং ওঁদের সঙ্গে সহকর্মিতা সূত্রে মিশে আমার রচনার প্রতি···বুঝেচেন ? আপাততঃ হাত-খরচার জন্য পঞ্চাশ টাকা নিন। যদি আমাদের বিবাহ ঘটাতে পারেন, তাহলে হাজার টাকা পুরস্কার পাবেন।

বিরাজ দেখিল, মন্দ নয় ! চাকরি মজার বটে। রোমান্স আছে, এ্যাডভেঞ্চারও যে নাই, এমন নয় ! কিন্তু ডিটেকটিভ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের মত বিশ্রী রহস্যে ভরা। ধনী গৃহস্বামী খুন হইয়া পড়িয়া আছে—কোথাও এমন কিছু কাগজপত্র বা প্রমাণের চিহ্ন নাই, যা ধরিয়া সমস্যার সমাধান হয় !

পরক্ষণে মনে হইল, তবু সে উপন্যাসও পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদের জের টানিয়া ঘনীভূত রহস্যের অন্ধকার ভেদ করিয়া বিরাট কলেবরে ফুলিয়া ফাঁপিয়া অতিকায় হইয়া ওঠে তো ! এবং শেষের পরিচ্ছেদে দ্বারের পাশেই হত্যাকারী ধরা পড়িয়া যায় ! এও তেমনি !

জয়গোপাল কহিল,—বড়বাজারে পিকেটিংয়ের ব্যাপারে সেদিন অনেকগুলো মেয়ে ধরা পড়েন, তাঁদের মধ্যে নীলিমা দেবীও ছিলেন। শুনে আমি কোর্টে গেছলুম ; কিন্তু তাঁকে দেখতে পেলুম না। পুলিশ বললে, তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েচে সেই মানিকতলার ওধারে এক মাঠের ধারে।···

বিরাজ জয়গোপালেব পানে চাহিয়া রহিল, কোনো কথা বলিল না।

জয়গোপাল কহিল,—আজই মাথা খাটিয়ে উপায় ঠিক করে ফেলবো। আপাততঃ আমার বইগুলো পড়ে দেখুন।

তিন

নীলিমা দেবীর ঠিকানা লইয়া পরের দিন সকালে বিরাজ তাঁর বাড়ী দেখিয়া আসিল। প্রকাণ্ড বাড়ী···পুরানো ; সামনে একটু বাগান। দোতলায় তরুণী-কণ্ঠে গান চলিয়াছিল,—

ভোরের পাখী জেগে কহে
  আজ কি আশার বাণী !
ওই বাণীর সুরে ভরে নে তোর
  জীর্ণ পরাণখানি !

খাশা গলা ! কে গাহিতেছে ? নীলিমা দেবী ? কে জানে !...

বিরাজ ভাবিল, প্রলয়ের একি বিচিত্র প্রণয়-সাধনা ! কাব্যে কি উপন্যাসেও এমন দেখা যায় না ! উপন্যাসের প্লটের অস্ত্রে নারীর চিত্ত জয় করিবে ! এমন কথা তার কল্পনারও অগোচর ছিল ! তবে রাত্রে জয়গোপালের লেখা 'প্রণয়-টীকা' গল্পে এমনি অদ্ভুত কাণ্ড একটা দেখিয়াছে বটে ! কিন্তু সে গল্প। আর এ...

ফুলতলা রোডের মেসে ফিরিয়া রিপোর্ট সারিবার পর বিরাজ কহিল,—এ আমি ঠিক বুঝতে পারচি না ! তার চেয়ে আপনি ঘটক পাঠিয়ে প্রস্তাব করুন না !

জয়গোপাল কহিল,—ঘটক পাঠিয়েছিলুম মেয়ে বিবাহ করতে চায় না। বলে, দেশে স্বরাজ আসার পূর্বে ছোট সুখ, ছোট বিলাস-আরামের চিন্তাও সে মনে স্থান দেবে না। তাছাড়া বাপ পয়সাওয়ালা—হয়তো ব্যাঙ্কার পাত্র খোঁজে। কিন্তু পয়সার চেয়েও বড়-ধনে ধনী আমি, তা বোঝে না !

বিরাজের চোখের সম্মুখ হইতে চরাচর লুপ্ত হইয়া গেল। ঐ পাশের বাড়ীর ছাদ, গলির ওধারকার ফুলুরির দোকান,—সব...মস্ত একটা সাদা কাগজে সারা দুনিয়া যেন কে মুড়িয়া দিল। সেই মোড়কের উপর বড় লাল হরফে শুধু লেখা আছে...স্বরাজ !

জয়গোপালের কথায় তার চেতনা ফিরিল। জয়গোপাল কহিল,—নীলিমা দেবীর কবিতা দেখবেন ?

একখানা পুরানো 'চাঁদোয়া' খুলিয়া জয়গোপাল কহিল,—পড়ুন...

বিরাজ পড়িল,—আমার মনেব আঙিনাতে, পূর্ণিমারি চমক-রাতে আসতে বলি...

জয়গোপাল কহিল,—দুটো গল্প 'চাঁদোয়া'য় ছেপেছি। দুটোতেই নায়িকার নাম দিয়েচি, নীলিমা। সে-গল্পে ওই কবিতার ছত্রও বেমালুম পুরে দিয়েচি !

বিরাজের কাছে এ যেন কলম্বাসের আমেরিকা-আবিষ্কার ! গল্প-উপন্যাস সে পড়ে—নিছকতার রস-উপভোগের জন্য। কিন্তু তা বলিয়া এত বড় উদ্দেশ্য থাকে গল্পের পিছনে ! তার কেমন তাক লাগিয়াছিল !

বিরাজ কহিল,—কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারচি না, দুম্ করে আপনার লেখার তারিফ শুরু করি কি-ভাবে ! গিয়ে নয় সামনে দাঁড়ালুম ! আলাপও না হয় কোনো মতে হলো...

জয়গোপাল কহিল,—সেইটি ভেবে স্থির করতে হবে ! অর্থাৎ এমন একটা situation...যে, আমার গল্প ছাড়া আর কোনো বিষয়ে কথা উঠতে পারে না !

বিরাজ ভাবিল, বই লইয়াই নীলিমার কাছে উপস্থিত হইবে ! বলিবে, এই প্রলয়কুমারের লেখার ভারী পশার আজকাল ! এ কথা বলিয়া বইও নয় গছাইয়া দিবে !... কিন্তু তার পর ? কোন্ কথার ছলে আবার গিয়া ও-বাড়ীতে ঢুকিবে, সেই না মুস্কিল ! বিশেষ এ-যুগে...সাহিত্যে প্রেম যখন অচল হইতে বসিয়াছে !

বৈকালে বিরাজ আবার গমনোদ্যত হইল। জয়গোপাল কহিল,—চললেন ?

—হ্যাঁ। একটা প্ল্যান স্থির করেচি।

—কি প্ল্যান ?

—ঐ মাসিকে গল্প পড়ছিলুম। বাসের ভাড়া ভোলা। তেমনি। ওঁদের বাড়ী গিয়ে বলবো, বাসের ভাড়া নেই। পকেট কেটে চোরে ব্যাগ নিয়ে গেছে। আনা-চারেক চাই। ধার ! আবার তা শোধ দিতে যাবো ! বিরাজের দুই চোখ দীপ্ত হইয়া উঠিল !

জয়গোপাল কহিল,—মন্দ হবে না। কিন্তু অভিনয়ে খুঁত না থাকে...

বিরাজ কহিল,—পকেটটা ছিঁড়ে তবে যাবো। ছেঁড়া পকেট দেখলে...জয়গোপাল

কহিল,—চেষ্টা করে দেখুন। কিন্তু তার চেয়ে···আচ্ছা, আমিও ভেবে দেখি।

বিরাজ বাহিরে গেল।

একদালিয়া রোডে সেই বাড়ী। সন্ধ্যার অন্ধকারে ভূতেব মত দাঁড়াইয়া আছে। বাড়ীর কোনো ঘরে আলো নাই। ব্যাপার কি! সব জেলে গেল না কি! বিরাজের গা কাঁপিল।

কেহ নাই? বিরাজ দাঁড়াইল। হাতে জয়গোপালের লেখা একগাদা বই। দৃষ্টি কিন্তু বাড়ীর পানে।·· বহুক্ষণ এমনি-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। মন অধীর হয়, দেরী কিসের? পা কিন্তু সরিতে চায় না। বুকও কাঁপিয়া ওঠে!

হঠাৎ পিছনে ভোঁ-ও! মোটরেব হর্ন। বিরাজ চমকিয়া লাফাইয়া উঠিল, কিন্তু রক্ষা পাইল না। মাডগার্ডের ধাক্কা খাইয়া পডিয়া গেল।···সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর মধ্যে একটা আর্ত রব,—রোখো রোখো···

দুনিয়া আঁধারে ভরিয়া গেল। বিরাজ চক্ষু মুদিল। নিবিড-কালো অন্ধকার। তারপর যখন আবার চোখ চাহিল, তখন দেখে, ঘরের মধ্যে কোমল শয্যায শুইয়া আছে। সামনে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। ভদ্রলোকটি কহিলেন,—এই যে, চোখ চেয়েছে। ডাক্তার এলো, নীল?

মৃদু মধুর সুরে বীণা বাজিল—না, বাবা।

বিবাজ উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল।

প্রৌঢ় বলিলেন,—বসো না। শুয়ে থাকো।

বিরাজ আবার চক্ষু মুদিল। কেমন আরাম বোধ হইর্তেছিল! স্বপ্ন? বুঝি, তাই।

ডাক্তার আসিলেন; হাত-পা নাড়িয়া মুচডাইয়া মহাধূম বাধাইযা দিলেন। ব্যাণ্ডেজও বাঁধা হইল; সঙ্গে সঙ্গে আদেশ,—নড়ে হবে না।···

সকলে ডাক্তারের সঙ্গে বাহিরে গেলেন। বিরাজ আবার একা। ভাবিল, স্বপ্ন দেখাই চলিয়াছে! কিন্তু মধুর স্বপ্ন! চোখ চাহিতে ইচ্ছা হয় না! চক্ষু মুদিয়া মনকে কল্পনার পাখায় চড়াইয়া দিল! এমনি ভাসিয়া চলা··· ভারী আরামের! সারা জীবন যদি···আঃ! আবার সেই বীণার সুর কানের পাশে,—একটু দুধ খান। বিরাজ চোখ চাহিল, সামনে দেবী-মূর্তি। দেবী তরুণী, পরণে খদ্দর, ফিরোজা রঙের শাড়ী, ফুলদার···গায়ে সেই রঙেরই ব্লাউশ।

বিরাজ কহিল,—দিন।···

দুধ নয় স্বর্গের সুধা! নহিলে শরীরের সব গ্লানি এমন নিমেষে অদৃশ্য হয়!

দেবী বলিলেন,—এমন ভয় হয়েছিল! উঃ! ডাক্তারবাবু বললেন, চোট্ খুব সামান্য—শুনে তবে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। নতুন ড্রাইভারটা যেন অন্ধ!

বিরাজের বুক ছাঁৎ করিয়া উঠিল। চোট্ সামান্য! তবে এখনি বিদায় লইতে হইবে!···আবার সেই নোংরা আব-হাওয়ায়? এ বেশ লাগিতেছিল।

তরুণী কহিল—আমাদের গাড়ীর আলোটাও খারাপ হয়েছিল। আর ফটকের ধারে বড় বটগাছ থাকায় গ্যাসের আলো আসে না তো! মোদ্দা, কি করছিলেন আপনি অন্ধকারে ফটকে দাঁড়িয়ে?

বিরাজ ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। এই উচ্ছ্বসিত রূপের সামনে মনিব জয়গোপালের রচনার কথা তুলিতে লজ্জা হইতেছিল। ভারী তো লেখা!

বিরাজ কোনো কথা কহিল না।

তরুণী কহিল—শুয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন। ভালো কথা, আপনার বাড়ীর ঠিকানা? একটা খবর দি···তাঁরা কত ভাবচেন। আপনার আজ ফেরা হতে পারে না কি না···

বিরাজ একটা নিশ্বাস ফেলিল—নিরুপায়ের বেদনার্ত নিশ্বাস ! যাইতে কি সে-ই চায় ! কিন্তু—

বিরাজ কহিল,—এখানে আমার কেউ নেই। খবর কাকে দেবেন !

কথাটা বলিয়া বিরাজ তরুণীর পানে চাহিল। তরুণী তারি পানে চাহিয়াছিল—রাজ্যের করুণা মাখানো দৃষ্টি ! সে দৃষ্টির স্পর্শে বিরাজ একেবারে গলিয়া গেল।

প্রৌঢ় আসিলেন, কহিলেন—গায়ে খুব বেদনা ? ও মা নীল, দে তুই এক ডোজ আর্ণিকা। হোমিওপ্যাথি ওষুধের শক্তি অসাধারণ।

তরুণী হাসিল, কহিল,—এই ব্যথায় এক ফোঁটা আর্ণিকা কি করবে, বাবা ?

প্রৌঢ় কহিলেন,—তুই জানিস্ না মা, ওষুধের গুণ। ঐ এক ফোঁটায় বিশল্যকরণীর ফল পাওয়া যাবে।

বিরাজ কহিল—না। আমি যেতে পারবো। দুই চোখ কপালে তুলিয়া প্রৌঢ় কহিলেন—পাগল ! দু-চারদিন নড়া হবে না বাপু।

চার

সকালের হাওয়ায় হাসির বান ডাকিয়াছিল। বিরাজের ঘরেই তরুণী বসিয়া ছিলেন।

বিরাজ কহিল—আপনার নামই নীলিমা দেবী ? আপনার কবিতা চাঁদোয়ায ছাপা হয় ?

তরুণী তাচ্ছল্যের ভাবে কহিল,—রাবিশ কবিতা, লেখা ছেড়ে দিয়েচি। দেশের এই দুর্দিনে ও-সব মিথ্যা হা-হুতাশ কবিতার ছন্দে বাঁধা পাগলামি।

বিরাজ কহিল—কবিত্ব পাগলামি নয়।

নীলিমা কহিল,—তা নয় ! কিন্তু আমরা কাগজে যা ছাপি, তা পাগলামি। শুধু চাঁদ, তারা, ফুল, পাখী, চিত্তগগন, ঘন-বন···এ-সব ছাড়া দুনিয়ায় আসল বস্তু আছে—যা জানা উচিত। মানুষের মনকে রূপ-যৌবনের পূজায় সঁপে দিলে মনকে দুর্বল করা হয়। মনকে গড়া দরকার। দেশ, দরিদ্র,—আর্ত, আতুরদের সেবায় মনকে মহীয়ান করতে হবে।

কথা শুনিয়া বিরাজের তাক্ লাগিয়া গেল ! তরুণীর মন যেন স্বদেশীর অগ্নিতে প্রোজ্জ্বল যজ্ঞশালা !

তবু নিমকের কথা মনে জাগিতেছিল। মনিব জয়গোপালের নিমক ! কি ফাঁকে সে কথা তোলা যায় ?

কথায় কথায় নীলিমা কহিল,—আপনার সঙ্গে একটা বইয়ের প্যাকেট ছিল না ? আপনার অনুমতি না নিয়ে আমি প্যাকেট খুলে বইগুলো দেখেচি। প্রলয় হালদারের লেখা—ঐ চাঁদোয়ার সম্পাদক !

আশার আলোয় বিরাজের মন ঝলমল করিয়া উঠিল।

তরুণী কহিল—স্বভাব মানুষ ছাড়তে পারে না ! পড়েচি তাই। ওঁর লেখা ভালো লাগে না। নারীকে শুধু আয়ত্ত করার কথা···যেন নারী পথের ধুলায় পড়ে আছে ! পুরুষের বক্ষ ছাড়া তার যেন আর কোথাও আশ্রয় নেই ! ছিঃ ! নারীকে এ-ভাবে অপমান করার কল্পনা যারা করে, তাদের আমি অভদ্র, ইতর মনে করি ! তাদের সঙ্গ বর্জন করা উচিত।

বিরাজের বুক ধক্ করিয়া উঠিল। মনিবের লেখা পড়িয়া সে কেমন হতভম্ব হইয়াছিল···যত নায়িকা—পথে, ঘাটে নায়ক দেখিবামাত্র একেবারে পায়ের উপরে লুটাইতে চায়। বাস্তবের সঙ্গে মিল কোথায় ? এমন ব্যাপার জীবনে সে কখনো দেখে নাই ! মেসে

সে-ও থাকিত…পাশের বাড়ীর মহিলারা গানও গাহিত। সে গান সে শুনিয়াছে—কিন্তু ঐ গল্পের মত…মেসের পানে মহিলা চাহিয়া থাকে, চোখে অধীর তৃষা বা গানের সুরে প্রাণের সাধ ভাসাইয়া দেওয়া—এসব বাজে ! নীলিমার মুখে একথা শুনিয়া তার সে ভাবগুলা আবার শক্তি পাইয়া কোমর বাঁধিয়া রুখিয়া দাঁড়াইতেছিল।

বিরাজ কহিল,—প্লটের ভাবনা কি ! বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়ে আছে। মায়া-মমতা, স্নেহ-প্রীতি…নারীকে মানুষ বলে, বন্ধু বলে লেখা যায় না ? প্রিয়া ছাড়া সংসারে মা-বোন-মেয়েও তো আছে।

বিরাজ তর্কের স্রোতে ভাসিয়া চলিল। মাথা তুলিবার তার সামর্থ্য রহিল না। অপরিচিতা তরুণীর সঙ্গে জীবনে সে কখনো মেশে নাই—বিশেষ এ তরুণী আবার বুদ্ধির স্ফুলিঙ্গ ! তাছাড়া সাহিত্য লইয়া আলোচনার অবসরও তার এমন করিয়া কোনো দিন মেলে নাই।

নীলিমা কি ভাবিল, তারপর কহিল—ছুটোছুটি করচি বটে, কিন্তু একটা কথা থেকে থেকে মনে জাগচে।—কি ?

নীলিমা কহিল,—দেশের সব দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার হয়েচে। যারা অন্ন-বস্ত্রের অভাব ঘুচোবার জন্য যুদ্ধ করবে, তাদের কাছে আশা রাখি না। ঐ যুদ্ধে তারা এমন ডুবে আছে যে দেশ বলে কোনো পদার্থ আছে, এ তাদের বোধ নেই, খেয়ালও নেই। কিন্তু যারা ধনী, অর্থাৎ অন্ন-বস্ত্রের যাদের সংস্থান আছে, কিম্বা যাদের মাথায় সংসার পাহাড়ের বোঝা তুলে ধরেনি, তাদের কথা বলচি।

বিরাজ নীলিমার পানে চাহিল ! কি কথা ?

—অশিক্ষা আর কুশিক্ষা—এ দুটো দূর করা চাই। এ-কাজের ভার নিন ধনী আর সংসার-নির্লিপ্তের দল। আরাম-বিলাসে ফতুর হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। মনকে এই সব বিষয়ে সচেতন করে তোলা চাই। এ কাজগুলোর ভার যদি আমরা নিতে পারি…বাবা এ আইডিয়ায় একেবারে মেতে উঠেচেন ! বলেন,—ঠিক বলেচিস্ মা। এ কাজগুলো আমরা হাতে নি। মানুষের মনকে তৈরি কবা যাক। মন যদি একবার তৈরি হয়ে যায়, তাহলে সব কর্তব্যও স্থির করে ফেলবে সকলে। বাদানুবাদ বা বক্তৃতার দরকার থাকবে না।…

পরের দিন সকালে বিরাজ কহিল,—আমি বাড়ী যাবো। আপনাদের দয়া কখনো ভুলবো না।

নীলিমা কহিল,—'গরু মেরে জুতো দান' বলে কথা আছে না ? মোটরের ধাক্কায় আপনাকে আহত করে—এই সেবা বা আশ্রয়—এও তেমনি নয় কি ? নীলিমা হাসিল।

সে হাসি নয়, বিদ্যুৎ ! বিরাজ সে বিদ্যুতের শিখায় কাঁপিয়া উঠিল।

বিরাজ কহিল,—তা নয়। ভাগ্যে ধাক্কা খেয়েছিলুম ! মনকে তাই মস্ত শিক্ষা দেবার সুযোগ পেয়েচি। সে শিক্ষার দাম মর্মে মর্মে বুঝচি।

নীলিমা কহিল,—আপনার সে বইগুলো ?

বিরাজ কহিল,—হ্যাঁ, ও কাজটা শেষ করা চাই…

নীলিমা কহিল,—ওগুলো আপনার খুব প্রিয়সামগ্রী…না ?

বিরাজ থমকিয়া দাঁড়াইল, পরে কহিল,—তা নয়। চাকরি নিয়েচি কিনা ! প্রলয়কুমারের লেখা প্রচার করবো বলে। কি করি ? পেটের দায় ! অবস্থার উন্নতি করতে কে-না চায় বলুন ?

নীলিমা কহিল—আর কোনো কাজ পেলেন না ?

বিরাজ কোনো কথা বলিল না।

নীলিমা কহিল,—আপনার অবস্থা খুব স্বচ্ছল নয়?

স্বরে করুণার আভাস! বিরাজের চিত্ত টলিল; কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না। দারিদ্র্যের এই যে কি লজ্জা…!

এ নীরবতার অর্থ নীলিমা বুঝিল। সে কহিল—বলুন না আপনার পরিচয়। এতে লজ্জা কি! মনের দারিদ্র্যই লজ্জার বিষয়। অর্থ-দারিদ্র্যে লজ্জা থাকতে পারে না। সামর্থ্যই তো স্বচ্ছলতার একমাত্র মাপকাঠি নয়। tact, না হয় accident -অর্থ-স্বচ্ছলতার এই দুটোই মূল হেতু বলে আমি মনে করি।

বিরাজ কহিল,—আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার!

সে একটা নিশ্বাস ফেলিল।

নীলিমা কহিল—দেশেরও তাই। অন্ধকার দেশের মানুষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতে পারে না।

কথায় হেঁয়ালি! মর্ম বিরাজ ঠিক্ বুঝিল না। মুখ নত করিল।

নীলিমা কহিল—লজ্জার কথা নয়। আপনি অভাব অস্বচ্ছলতা ঘুচোবার জন্য পরের দ্বারে করুণাপ্রার্থী না হয়ে যে বই ফিরি করে বেড়াচ্ছেন, এতে আপনার মনুষ্যত্বেরই পরিচয় পাই। বেশ, ও বই আমি কিনবো…কত দাম, বলুন?

বিরাজ কুণ্ঠা বোধ করিল, কহিল—বিক্রী ঠিক নয়। তবে…

নীলিমার দৃষ্টিতে যেন একরাশ শাণিত তীর…বুঝি বিরাজের অন্তর বিদ্ধ করিবে!

বিরাজ কহিল—চাকরি নিয়েচি একজনের—এই প্রলয়কুমারের লেখা প্রচারের…

বিরাজ চাকরির সর্ত বলিয়া ফেলিল। তবে একটু ঘুরাইয়া বলিল। স্পষ্ট ভাষায় বলিতে পারিল না, যে, এই নীলিমার চিত্তকে জয়গোপালের দিকে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্যই তার সাধনা! কি করিবে? নহিলে অর্থ মিলিবে না। এই অর্থে দারিদ্র্য ঘুচিবে, ভূ-পর্যটনের ব্যয় সংগ্রহও…! শুধু অর্থের প্রেরণা নয়, এ্যাডভেঞ্চারের সখ আছে, এ-কথাও সে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিল না।

মানুষ তা পারে না। বিশেষ বয়স যদি তরুণ এবং শ্রোতা যদি রূপসী তরুণী হয়!

নীলিমা হাসিল, হাসিয়া কহিল—এ কি পণ্ডশ্রম কবচেন! সাহিত্য ছেলেখেলার বস্তু নয়। পাঠক-পাঠিকাও শিশু নয়…

বিরাজ অপ্রতিভভাবে কহিল—আমি তাহলে আসি।

নীলিমা কহিল—ও চাকরি ছেড়ে দিন। এতে মনের ঐশ্বর্য বাড়ে না। দোরে দোরে মন জোগাবার চেষ্টা—এ বিশ্রী। যাক্,—দয়া করে বইগুলি দিন আমায়। দাম এনে দি।

পাঁচ

গভীর রাত্রি। বিরাজের চোখে ঘুমের দেখা নাই। একরাশ চিন্তা ক্ষিপ্ত সৈন্যের মত মস্তিষ্ক-ক্ষেত্র চষিয়া কুচ্-কাওয়াজ শুরু করিয়া দিয়াছে, ভীষণ-বিক্রমে।

একটা কথা উঁচু মাথায় সবার উর্ধ্বে উঠিয়াছিল—সে এই নীলিমা দেবীর কথা। ইনি দেবীই! জয়গোপালের মত একটা আত্মসর্বস্ব লোকের হাতে চিত্ত সমর্পণ করিবেন! এ চিন্তা কাঁটার মত বুকে ফুটিতেছিল।

যদি ও লেখা পড়িয়া সত্যই নীলিমা দেবীর চিত্ত বিচলিত হয়? বইগুলা সরানো

চাই···পড়িতে দেওয়া ঠিক নয় ! কিন্তু কি বলিয়া চাহিবে ? সত্য কথা বলিবে ? না । তাহা হইলে লজ্জার কালিতে দুনিয়া মিষ্ কালো হইয়া যাইবে। সে কালি হইতে নিজেকে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবে না !

নিঃশব্দে ফেরত লওয়া যায় না ?···চাকরি ? নিমক ? জয়গোপালের চাকরি না হয় করিবে না । তার দেওয়া টাকা কযটা ফেরত দিবে । পয়সা-রোজগারের ক্ষেত্র বিশাল । না হয়, মাথায় মোট বহিযা খাটিবে। তা বলিয়া এমন নির্লজ্জভাবে···

ঘড়িতে দুইটা বাজিল । তার মাথার মধ্যে আগুনের স্রোত বহিতেছিল । বিরাজ জ্বালিয়া খাক্ হয়, বুঝি !

দোতলার ঘরে বইগুলা আছে···সেই টেবিলের উপর রাখিয়াছিলেন ! সেগুলা লইয়া এই রাত্রির অন্ধকারেই নিঃশব্দে সরিয়া পড়া ! মাথায় রক্ত চন্ চন্ করিয়া উঠিল ! টেবিলের উপর হইতে কাগজ লইয়া সে লিখিল,—

দেবী, ক্ষমা করিবেন । বই ফেরত লইয়া চলিলাম । দাম রাখিয়া গেলাম । বারো টাকা ছ'আনা । কাগজে মোড়া রহিল ।

আমি অমানুষ । যদি কখনো মানুষ হইতে পারি তো শ্রীচরণে এ কালিমা—কাহিনী নিবেদন করিব। কর্মক্ষেত্রের সন্ধান পাইয়াছি। মোট বহিব। দারিদ্র্যে লজ্জা নাই—বুঝিযাছি ।

অনুগত,
শ্রীবিরাজলাল

চিঠিখানা সে পড়িল। পড়িয়া বাহিরে চাহিল। চারিদিকে সুগভীর স্তব্ধতা। কানন-তরুপুঞ্জে ঝিল্লীর বাগিনী···এ রাগিনীর কি মোহ !

বিরাজ উঠিল এবং সন্তর্পিত ধীর পায়ে দোতলায় আসিল । চাবিদিক অন্ধকাবে ভরা, নীলিমার দুটি চোখ শুধু এ-অন্ধকারে বাতি জ্বালিয়া ধরিয়াছে । সেই বাতির আলোয় তার প্রাণ আলো হইয়া আছে ! আলো জ্বালার দরকার নাই !

সেই বসিবার ঘর । ওধারে টেবিলের উপরে বই আছে । আলো ? না, জ্বালিবে না ।···

টেবিলটার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সে চলিল···এই টেবিল, এই বই ! হাতড়াইয়া বই লইল । কাগজে মোড়া দাম বারো টাকা ছ'আনা টেবিলের উপর রাখিল । তারপর বইয়ের গোছা লইয়া ফিরিল ! এবাব আরো সাবধান ! হাতে জিনিস রহিয়াছে···হয়তো এ চুরি !

একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা । সেই গ্রামোফোনের টেবিল, নিশ্চয় । ওঃ ! পায়ে চোট লাগিল ; সঙ্গে সঙ্গে গ্রামোফোনটা গিয়া পড়িল মেঝের উপর···কি শব্দ ! যেন দুনিয়া ফাটিয়া গেল ! সঙ্গে সঙ্গে কলরব জাগিল,—কে ? কে ?···রামদীন্···গঙ্গা সিং···জল্‌দি আও···

রাত্রির নিবিড় অন্ধকার যেন অট্টহাস্যে জাগিয়া উঠিল ! পৃথিবী দুলিয়া কোথায় সরিয়া গেল ' বিরাজ বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া ।···বাহিরে ঐ আলো, চীৎকার । চীৎকার এই দিকেই আগাইয়া আসে ! বিরাজ চেতনা পাইয়া বইয়েব বড় আলমারির পিছনে লুকাইল ।···পরক্ষণেই ঘরে লোকজনের প্রবেশ ; এবং কোলাহল, কলরব প্রভৃতি ।

নীলিমা কহিল,—ঐ যে কাপড় দেখা যাচ্ছে···ঐ আলমারির পিছনে···

সারদা লাহিড়ী হাঁকিলেন,—রামদীন্···

প্রচণ্ড মূর্তি একেবারে বিরাজের চোখের সামনে ! কি বিভীষিকা ! ভয়ে বিরাজ চক্ষু মুদিল । কিন্তু একটা ঝড়ের বেগ সবলে তাকে টানিয়া আনিল···চেয়ারে ধাক্কা খাইযা সে ভূতলশায়ী হইল । বিরাজ আবার চক্ষু মুদিল ।

নীলিমা কহিল—আপনি… !

সারদা লাহিড়ী কহিলেন—বিরাজ ! এর মানে ?

ছল-ছল দৃষ্টিতে বিরাজ তাঁদের পানে চাহিল। মুখে স্বর ফুটিল না। শুধু করুণ দীন তার চোখের দৃষ্টি।

নীলিমা নারী, তরুণী ! সে দৃষ্টির ভাষা নীলিমা বুঝিল। তার বুকে মমতার নির্ঝর বহিল।

অগ্নিমন্ত্রে পুড়িয়া বুক তার ছাই হয় নাই !

রামদীন্ কহিল—পুলিশ বোলায়েঙ্গে, দিদিমণি ?

নীলিমা কঠিন স্বরে কহিল,—না ! তোরা যা…

ভৃত্যের দল বিদায় লইল। লাহিড়ীর কেমন দ্বিধাভরা দৃষ্টি…রাজ্যের প্রশ্ন সে দৃষ্টিতে জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে !

নীলিমা তা লক্ষ্য করিল। লক্ষ্য করিয়া বিরাজের পানে চাহিল, তার হাত ধরিয়া কহিল.—উঠুন…

মন্ত্রচালিতের মত বিরাজ উঠিল। নীলিমা কহিল—কৌচে বসুন। কি হয়েছিল, বলুন তো…

বিরাজ কাঁদিয়া ফেলিল, কাঁদিয়া কহিল—আমি চোর। আমায় পুলিশের হাতে দিন…

নীলিমা স্থির দৃষ্টিতে চকিতের জন্য চাহিল, তারপর কহিল,—কি হয়েচে, বলুন—শুনি।…তারপর…

বিরাজ কম্পিত স্খলিত স্বরে ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল, কহিল,—ঐ টাকা কটা…আর এই সে বইগুলো…

লাহিড়ীব দৃষ্টি তখনো পলকহীন !

নীলিমা কহিল—বই ফেরত নিন, তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু এ কাজটা কেন করলেন ? অসুখ শরীর, এখনো সুস্থ হন্‌নি…

বিরাজ ভাবিল, এই দেবীর সহিত ছলনা করিতে আসিযাছিল তুচ্ছ দুটো পয়সার লোভে…

বিরাজ কহিল—চিঠিতে লিখেচি সব কথা…

নীলিমা চিঠিখানা হাতে লইয়া পড়িল, পড়িয়া বিরাজের পানে চাহিল. কহিল—ওঃ ! আচ্ছা, কথা দিন, আমার অনুমতি ছাড়া যাবেন না।

বিরাজ মাথা তুলিয়া চাহিল। নীলিমার চোখে সেই দীপ্তি ! সে দীপ্তিতে তার অন্তরখানা দেখা যায় না।

বিরাজ কহিল—আপনার অনুমতি ছাড়া যাবো না।

নীলিমা লাহিড়ীকে কহিল,—তোমায় সব কথা বল্‌চি।

লাহিড়ী কহিলেন—আমি অবাক হয়ে গেছি।

নীলিমা কহিল—বিরাজবাবুর মন বড় উঁচু। কিন্তু গরীব—ভবিষ্যৎ রচনা করতে চান—পথ নির্দেশ করতে পাচ্ছেন না…

লাহিড়ী অবাক্ ! নীলিমা কহিল—আপনি শুতে যান। কথা দিয়েচেন, আমার অনুমতি না পেলে যাবেন না ! সে কথা রক্ষা করবেন।

ঘাড় নাড়িয়া বিরাজ জানাইল, তাই হবে।

ছয়

সকালে বিরাজ গুম হইয়া বসিয়াছিল বিছানার উপর। বাদাম গাছের ডালে বসিয়া একটা পাখী ডাকিতেছিল। ঘরের বাহিরে যাইতে পা ওঠে না! ভৃত্যগুলা হয়তো সত্যই ভাবিয়াছে, সে চোর...কাল রাত্রে চুরি করিতেই উপরে উঠিয়াছিল!

লাহিড়ী আসিয়া কহিলেন—তুমি রাঢ়ী শ্রেণী! না?

বিরাজ লাহিড়ীর পানে চাহিল। লাহিড়ী কহিলেন,—আমরা বারেন্দ্র, তোমার কে আছেন?

বিরাজ কহিল—মা, আর একটি ছোট বোন।

লাহিড়ী বাঙলার সামাজিক ইতিবৃত্ত বিবৃত করিয়া বলিলেন, এই রাঢ় আর বারেন্দ্র ভূমি...দুটো প্রদেশের মধ্যে এমন ব্যবধান গড়িয়া উঠিল কি করিয়া! সে ব্যবধান আজ ভাইকে ভাইয়ের পাশ হইতে কতদূরে সরাইয়া দিয়াছে!

নীলিমা কহিল—আমাদের কাজে বিরাজবাবুকে নাও বাবা। উনি শিক্ষকতাই করছিলেন তো! গ্রাজুয়েট...

লাহিড়ী কহিলেন—আমি এ কথা নিত্য ভাবি। সেই কথাই বলছিলুম,—এই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই, কিন্তু রাঢ়ী-বারেন্দ্র ব্যবধান দূর করবার কথা তো কখনো তুলি না। অথচ, এতে যাগযজ্ঞের কোনো প্রয়োজন নেই।

নীলিমা বাপের কথার অর্থ না বুঝিয়া বাপের পানে চাহিয়া রহিল।

লাহিড়ী তা লক্ষ্য করিলেন, কহিলেন—এই অহিংসা মন্ত্রের মর্মটুকু দেশের লোককে বুঝোতে আজ নারী আর পুরুষ সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। অথচ...এমনি বহু কথা তিনি বকিয়া চলিলেন।

উপসংহারে লাহিড়ী কহিলেন—বিরাজকে দেখে আমার ভারী ভালো লেগেচে। আমাদের এই কাজে ওকে যদি সঙ্গে নিতে পারি!...কিন্তু কি করে...সেই কথাই ভাবচি।...তা, বিরাজ...

বিরাজ তাঁর পানে চাহিল।

লাহিড়ী কহিলেন—দেশের ভবিষ্যতের সঙ্গে নীলিমাব ভবিষ্যৎ—ও আমায় অস্থির করে রেখেচে। কলরব—সভার মধ্য থেকে কাকে এনে তার হাতে ওর ভার দেবো, ভেবে পাচ্ছি না। কলরবের মধ্যে মানুষের আসল পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই...

নীলিমা ডাকিল—বাবা...

বাবার কথায় যেন কিসের আভাস! লজ্জায় তার স্বর বাধিয়া গেল।

লাহিড়ী কহিলেন—আমার কেবল মনে হয়, হিন্দু-মোসলেম এক করতে চাচ্ছি, অথচ তার আগে রাঢ়ী-বারেন্দ্র মেলানোর কথা কেন ওঠে না? সারা রাত ঐ চিন্তা যে কোথা থেকে আমার মাথায় প্রবল হয়ে উঠলো! সে ব্যবধান যাতে ঘুচোতে পারি, সে চেষ্টা করা উচিত, খুব উচিত। তোমাদের বুঝিয়ে দেবো...

বিরাজ অদূরে বাগানের বাতাবি গাছটার পানে চাহিয়াছিল...বেশ বড় বড় ফল। তা ছাড়া মালতীর ঝাড়ে একরাশ ফুল বর্ণে-গন্ধে কি বিচিত্র সাজিয়া উঠিয়াছে! হাওয়ার দোলায় ফুলের ঐ প্রমোদ-নৃত্য...তার মনের বর্ণেও যেন স্তবকে স্তবকে ফুলের রাশি ফুটিয়া উঠিতেছিল।

লাহিড়ী কহিলেন—তোমার মা আছেন, না? চলো, তাঁর কাছে আমরা যাই তিন জনে।

এ ভবিতব্য…নিশ্চয় । না হলে তুচ্ছ কখানা বই নিয়ে আমার বাড়ী তুমি আসবে কেন ? এসে ঐ গাড়ীর ধাক্কায়…

নীলিমার দিকে দেখাইয়া বিরাজ কহিল—জীবনের কোনো ধারণা আমার ছিল না। কোন্ পথ ঠিক পথ, তাও বুঝিনি । এঁর কথায় বুঝেচি । নিজের ভবিষ্যতের সঙ্গে দেশের ভবিষ্যতের পানেও চাওয়া চাই—ঠিক । না হলে মানুষে আর ইতর পশুতে কোনো প্রভেদ থাকে না !

লাহিড়ী কহিলেন—তাহলে নীলিমাকেই চিরদিনের জন্য তোমার পথের সঙ্গী করে নাও না ! অনেকেই এখানে আসে দেশের কাজে, নীলও তাদের সঙ্গে মেশে ; কিন্তু এত দরদ ওর কারো প্রতি দেখিনি…

তিনি নীলিমার হাত ধরিলেন । নীলিমা লজ্জায় বাঁকিয়া হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, কহিল—যাওঃ…

হাসিয়া লাহিড়ী কহিলেন—আমার যাবার সময় এগিয়েই এসেচে, মা । তাই যাবার আগে সংসারে তোমায় সুপ্রতিষ্ঠিত দেখে যেতে চাই !…আমি আসচি…একখানা চিঠি আছে কর্মী-সমিতির । পড়লুম না তো ! এমন ভুল হচ্ছে…দ্যাখো দিকিনি !…

লাহিড়ী চলিয়া গেলেন । নীলিমা ও বিরাজ দুজনেই চুপ ।

অনেকক্ষণ পরে নীলিমা কথা কহিল, বলিল,—কি ভাবচেন ?

বিরাজ কহিল—জয়গোপালবাবুর কথা । তিনি কি ভেবে আমায় চাকরি দিলেন, আর…

নীলিমা কহিল—এই ! তা তাঁর বই আর টাকাটা এ্যাডভান্স নিয়েছেন. ফিরিয়ে দিয়ে আসুন না ।

বিরাজ কহিল—কিন্তু…

হাসিয়া নীলিমা কহিল—তাঁকে বলবেন, কাব্য লিখে নারীর চিত্ত মুগ্ধ করবেন, এমন রচনা-শক্তি তাঁর নেই । তার উপর ঐ-সব লেখায় ? যাতে নারীর অপমানের সুর বাজে ? এ জ্ঞানটুকু তাঁকে দিয়ে আসবেন অন্ততঃ ।…আমাদের কাজের একটা প্ল্যানও আজ ঠিক করে ফেলতে চাই,…আসতে ভুলবেন না ।

বিরাজ নীলিমার পানে চাহিল—নীলিমার চোখে হাসির দীপ্তি !

নীলিমা কহিল,—বাবার এত ঘড়ি ঘড়ি মত বদলায় ! কোন দিন বলেন, খদ্দরেই দেশের মুক্তি ; কোনদিন বলেন, নারে, সব চাষের মাঠে জড়ো হ ! আজ আবার নতুন সুর দেখচি, রাঢ়ী-বারেন্দ্র…

সে হাসিল । বিরাজ ভাবিল, সর্বনাশ ! এ মতও যদি বদলায় !

চিঠি হাতে লাহিড়ী ঘরে ঢুকিলেন, কহিলেন,—কামাখ্যা চৌধুরীর সে বইখানা খুঁজে দে তো মা…সেই "অভঙ্গ বঙ্গের অখণ্ড জাতি"—তাতে ভারী প্রাঞ্জল ভাষায় লেখক বুঝিয়েচেন, রাঢ়ী-বারেন্দ্র একই শ্রেণীর, একই পর্যায়ের ! শুধু যাতায়াতে অসুবিধা ছিল বলেই…বুঝলে, বিরাজ ! কিন্তু আজ সে বাধা তো নেই—তবে ? রাঢ়ীকে কাছে পেয়ে সে—সুযোগ আমি…

তাঁর কথা শেষ হইবার পূর্বেই বিদ্যুতের মত নীলিমা সে ঘর হইতে সরিয়া পড়িল ।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পরিশিষ্ট

* প্রকাশকের নিবেদন
* নিয়মাবলী
* বিজ্ঞাপন
* সম্পূর্ণ সূচী

প্রকাশকের নিবেদন

বর্তমান বৎসরের প্রথমভাগে "কুন্তলীন" উল্লেখযোগ্য সর্বোৎকৃষ্ট গল্প ও কবিতার জন্য, চারিটী পুরস্কারে একশত টাকা দেওয়া হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ৩১শে শ্রাবণ, রচনা পাঠাইবার শেষ দিন ছিল। তদনুসারে "কুন্তলীন" পুরস্কারের জন্য ঐ সময়ের মধ্যে গল্প ও কবিতাতে প্রায় দুইশত রচনা আমাদেব হস্তগত হইয়াছে। পুরস্কাবেব জন্য মহিলাদিগকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি। প্রেরিত রচনার সংখ্যা এত অধিক হইবে আমরা আশা করি নাই, তাই অত্যন্ত আহ্লাদেব সহিত রচনা লেখক এবং লেখিকাদিগকে উৎসাহিত করিবার জনা আমরা প্রতিশ্রুত পুরস্কাব ব্যতীত আরও চারিটী পুরস্কারে চল্লিশ টাকা অধিক দিয়াছি।

গল্পের প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা লেখক নাম প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছানুসারে পুবস্কার ১৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ রবিবাসবিক নীতিবিদ্যালয়ে দেওয়া হইয়াছে। এবার নিয়মাবলীতে রচনাকারীর নামোল্লেখ সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিয়ম না থাকায আমরা বাধ্য হইয়া এই পুবস্কার দিলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে আমরা এরূপস্থলে পুবস্কার দিতে বাধ্য হইব না।

পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনাগুলি এই পুস্তকে প্রকাশিত হইল। পুবস্কৃত না হইলেও প্রেরিত অনেক রচনাই ভাষা এবং অন্যান্য গুণে প্রশংসার উপযুক্ত, সন্দেহ নাই। স্থানাভাববশতঃ তাহার কয়েকটিমাত্র এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইল। আবশ্যকবোধে প্রকাশিত কোন কোন রচনার স্থানবিশেষ পরিবর্তন করা হইয়াছে। প্রশংসনীয় অন্যান্য রচনার রচয়িতাদিগের নাম আমরা আহ্লাদের সহিত নিম্নে প্রকাশ করিলাম। যদি এই পুস্তক জনসাধারণের নিকট আদৃত হয়, তবে "গল্প ও কবিতার" দ্বিতীয় সংস্করণে অপ্রকাশিত কতকগুলি বচনাও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যদিও এই প্রকার পুরস্কারের দ্বারা কুন্তলীনের প্রচার করা আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য, তথাপি ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য চর্চাকারীদিগকেও যে কতক পরিমাণে উৎসাহিত করা হয়, তাহা বোধ হয়, সহৃদয় পাঠকবর্গ স্বীকার করিবেন। আগামী বারে আমরা আরও অধিক পুরস্কার দিতে পারিব বলিয়া আশা করি।

কুন্তলীন আফিস্ — নিবেদক
২৪ নং মুসলমানপাড়া লেন, — শ্রীএইচ্ বসু।
কলিকাতা

রচনাকারীদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

গল্প

শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী, শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত, শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর সেন, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রায়, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীযুক্ত বামাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রক্ষিত, শ্রীযুক্তা মোক্ষদাসুন্দরী গুপ্তা, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত রঘুনাথ জী, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু, শ্রীযুক্ত শশীকুমার হেস, শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সখানাথ দাস, শ্রীযুক্ত

হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরালাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দাস, ও শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী সেনগুপ্তা।

কবিতা

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বসু, শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচবণ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত গোপীরমণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (বিদ্যাভূষণ) বি. এ. ; শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর সেন, শ্রীযুক্তা চারুশীলা দেবী. শ্রীযুক্ত দীননাথ বাক্ছী, শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহাবী দত্ত, শ্রীযুক্তা নির্মলবালা চৌধুরী, শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ শর্মা, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্তী, শ্রীযুক্তা ব্রজেন্দ্রমোহিনী দাসী, শ্রীযুক্ত ভুবনকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায়, শ্রীযুক্ত বাইচরণ চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত রামকান্ত রায়, শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ওয়াদাদার, শ্রীযুক্তা সরলা দাস, শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র দাস।

চতুর্থ বর্ষ : ১৩০৬

প্রকাশকের নিবেদন

বিগত বৎসরের কুন্তলীন পুরস্কাবের জন্য প্রেবিত বচনার মধ্য হইতে যে কয়েকখানি পুরস্কারের উপযুক্ত হইয়াছে তাহা প্রকাশিত হইল। পুরস্কৃত রচনাব মধ্যে প্রথম আটটি পুরস্কার ভূতপূর্ব ট্রিবিউন ও বর্তমান প্রভাত সম্পাদক সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয অনুগ্রহ করিয়া নির্বাচন কবিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাব নিকট কৃতজ্ঞ আছি।

আমাদের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণ যাঁহাদের অনুগ্রহে আমরা বৎসর বৎসর এই প্রকার পুরস্কার দ্বারা সাহিত্য চর্চায় লেখক লেখিকাদিগকে কিঞ্চিৎ পবিমাণে উৎসাহিত করিতেছি এবং পুরস্কৃত গল্পগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া ভদ্রসাধারণকে উপহার দিতে সমর্থ হইতেছি, তাঁহাদের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আমাদেব প্রস্তুত কুন্তলীন দেলখোস্ ইত্যাদির ক্রেতা মাত্রেই যে এই সদনুষ্ঠানের সাহায্যকারী তাহাতে সন্দেহ নাই।

বর্তমান বৎসরের কুন্তলীন পুরস্কারের নিয়মাবলী পুস্তকের শেষভাগে প্রকাশিত হইয়াছে।

কুন্তলীন আফিস — নিবেদক
৪ঠা শ্রাবণ, ১৩০৭। — শ্রী এইচ বসু।

পঞ্চম বর্ষ ১৩০৭

প্রকাশকের নিবেদন

১৩০৭ সনের কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য প্রেরিত রচনার মধ্য হইতে যে কয়েকখানি রচনা পুরস্কৃত হইয়াছে তাহা মুদ্রিত হইল। এবারকার পুরস্কারগুলি পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া নির্বাচন করিয়া দিয়াছেন ; তজ্জন্য তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি।

আমাদের প্রস্তুত কুন্তলীন দেল্খোস ইত্যাদি সুগন্ধি দ্রব্যাদির গ্রাহকগণের অনুগ্রহেই

আমরা বৎসর বৎসর এই প্রকার পুবস্কার দ্বারা সাহিত্য-চর্চায় লেখক-লেখিকাদিগকে কিয়ৎ পরিমাণে উৎসাহিত করিতে পাবিতেছি এবং তাঁহাদেরই অনুগ্রহে পুরস্কৃত গল্পগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া ভদ্রসাধারণকে উপহার দিতে সমর্থ হইতেছি, এজন্য তাঁহাদের নিকট আমরা আমাদের আন্তবিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবিতেছি।

বর্তমান বৎসবের কুন্তলীন পুরস্কারের নিয়মাবলী পুস্তকের শেষভাগে প্রকাশিত হইয়াছে।

কুন্তলীন আফিস
১০ই আশ্বিন, ১৩০৮।

নিবেদক
শ্রী এইচ বসু।

ষষ্ঠ বর্ষ : ১৩০৮

প্রকাশকের নিবেদন

সন ১৩০৮ সনের কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য প্রেরিত বচনাগুলির মধ্যে যে কয়খানি পুবস্কৃত হইয়াছে তাহা প্রকাশিত হইল। এবারকার পুবস্কারগুলি সুবিখ্যাত "সাহিত্য" পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় অনুগ্রহ কবিযা নির্বাচন করিয়া দিয়াছেন। এ জন্য তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি।

আমাদের প্রস্তুত কুন্তলীন দেলখোস এবং সুগন্ধি দ্রব্যাদির গ্রাহকগণের অনুগ্রহেই আমবা প্রতি বৎসর এই প্রকার পুরস্কার দ্বারা লেখক লেখিকাদিগকে সাহিত্য চর্চায় কিয়ৎ পরিমাণে উৎসাহিত কবিতে পারিতেছি এবং পুরস্কৃত গল্পগুলি মুদ্রিত করিয়া ভদ্রসাধাবণকে উপহাব দিতে সমর্থ হইতেছি এজন্য তাঁহাদের প্রত্যেকেই এই সদনুষ্ঠানের সাহায্যকারী তাহাতে সন্দেহ নাই।

বর্তমান বৎসবের কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য রচনা ৩০শে পৌষের মধ্যে পৌঁছান আবশ্যক। উৎকৃষ্ট রচনার সংখ্যা অধিক হইলে আমরা পুরস্কারের সংখ্যা আহ্লাদের সহিত বাড়াইয়া দিব।

কুন্তলীন আফিস,
১৭ই ভাদ্র, ১৩০৯।

নিবেদক
শ্রী এইচ বসু।

১৩০৮ সনের
কুন্তলীন পুরস্কার
নগদ একশত টাকা।

প্রথম পুরস্কার ২৫
দ্বিতীয় পুরস্কার ২০
তৃতীয় পুরস্কার ১৫
চতুর্থ পুরস্কার ১০
পঞ্চম পুরস্কার ৫
ষষ্ঠ পুরস্কার ৫
সপ্তম পুরস্কার ৫
অষ্টম পুরস্কার ৫
নবম পুরস্কার ৫
দশম পুরস্কার ৫

সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র উপন্যাস, গল্প, বিচিত্র অথবা কৌতুকাবহ ঘটনা অথবা ডিটেক্‌টিভ কাহিনীর জন্য উপরোল্লিখিত পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। কেবলমাত্র গল্পের সৌন্দর্য কিছুমাত্র নষ্ট না করিয়া কৌশলে কুন্তলীন এবং এসেন্স দেলখোসের অবতারণা করিতে হইবে, অথচ কোন প্রকারে ইহাদের বিজ্ঞাপন বিবেচিত না হয়।

এইচ বসু
৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলকাতা

পুরস্কারের নিয়মাবলী

১। রচনা যাহাতে সাধারণ চিঠির কাগজের ১৩/১৪ পৃষ্ঠা আড়াই হাজার শব্দের অধিক না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

২। পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক যাঁহার ইচ্ছা রচনা পাঠাইতে পারেন। কিন্তু কোন পুরুষ স্ত্রীলোকের নাম দিয়া পাঠাইলে সেই রচনা পুরস্কারযোগ্য হইবে না।

৩। কোন রচনার প্রাপ্তি স্বীকার করা অথবা পুরস্কার সম্বন্ধে কোন চিঠির উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে এজন্য কেহ রিপ্লাই পোষ্টকার্ড অথবা ডাক টিকিট পাঠাইবেন না। যাঁহারা রচনার পৌঁছান সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে চাহেন তাঁহারা রেজেষ্টারী করিয়া পাঠাইবেন।

৪। পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক ও লেখিকাদিগের নাম আগামী বৈশাখ মাসের মধ্য ভাগে "সঞ্জীবনী, সময় ও প্রতিবাসী পত্রিকায়" এবং স্বতন্ত্র লিষ্টাকারে প্রকাশিত হইবে। পুরস্কৃত সমুদয় রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। অপুরস্কৃত রচনা ফেরত দেওয়া হইবে না অথবা কোন প্রকারে ব্যবহৃত হইবে না।

৫। রচনা আগামী ২৯শে পৌষের মধ্যে "কুন্তলীন অফিসে" পৌঁছান আবশ্যক। তৎপরে কাহারও রচনা গৃহীত হইবে না।

এইচ বসু
৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

কুন্তলীন

শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত সমাজে কুন্তলীন যে প্রকার প্রচলিত হইয়াছে তাহাতে কুন্তলীনের অধিক পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। বিশুদ্ধতায় উপকারিতায় ও সুগন্ধে যাবতীয় প্রচলিত কেশতৈল মধ্যে কুন্তলীন সর্বোৎকৃষ্ট, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ কুন্তলীনের বোতল অন্যান্য তৈলের বোতল অপেক্ষা অনেক বড় এবং সেই হিসাবে কুন্তলীন অনেক সুলভ এবং গৃহস্থদিগের সর্বদা ব্যবহারের বিশেষ উপযোগী।

সুবাসিত কুন্তলীন ১৲
পদ্ম গন্ধ কুন্তলীন ১৷৷০
গোলাপ গন্ধ কুন্তলীন ২৲

এক টাকা মূল্যের সুবাসিত কুন্তলীনই সর্বদা ব্যবহারের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ তৈল। ইহার সুবাস অতি মনোহর, এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী। পদ্মগন্ধ ও গোলাপগন্ধ কুন্তলীন কেবলমাত্র প্রস্ফুটিত কুসুমের সৌরভ দ্বারা সুবাসিত করা হইয়াছে। তেল কি পর্যন্ত সুগন্ধ প্রদায়ী হইতে পারে এই কুসুমগন্ধ তৈলগুলি তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। এবং দশগুণ অধিক মূল্য দিলেও ইহা অপেক্ষা প্রীতিকর ও মনোহর গন্ধ বিশিষ্ট তৈল পাইবেন না।

দেল্‌খোস

সহস্র সহস্র বিবিধ জাতীয় সুগন্ধি কুসুমের সুবাস একত্র করিয়া এই মনোহর "দেল্‌খোস" প্রস্তুত হইয়াছে। একটুখানি রুমালে ব্যবহার করিলে সুমধুর সৌরভে মনপ্রাণ বিমোহিত হইবে। যাঁহারা সর্বদা বিলাতী এসেন্স ব্যবহার করেন তাঁহাদিগকে আমরা এই স্বদেশীয় দেল্‌খোস একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। বিলাতী এসেন্স অপেক্ষা ইহার সৌরভ দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং মূল্যও সুলভ।

তাম্বুলীন

পান সুবাসিত ও সুস্বাদ করিবার জন্য অপূর্ব সামগ্রী। অতি উৎকৃষ্ট মৃগনাভি, অটো-ডি-রোজ এবং নানাবিধ উৎকৃষ্ট মশলা সংযোগে এই তাম্বুলীন প্রস্তুত হইয়াছে। অল্প পরিমাণে পানের সহিত ব্যবহার করিলে, পান অত্যন্ত সুরস এবং উপাদেয় হইবে। বিশেষতঃ মিঠাপানে তাম্বুলীন সোনায় সোহাগা, একবার মাত্র পরীক্ষা করিয়া দেখুন। তাম্বুলীন বিলাসীরা তাম্বুলীন ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত হইবেন, সন্দেহ নাই।

* বিজ্ঞাপনটি ১৩০৮ সনেব পুস্তকেব শেষে মুদ্রিত —সম্পাদক।

সপ্তম বর্ষ : ১৩০৯

১৩০৯ সনের
কুন্তলীন পুরস্কার
নগদ একশত টাকা

প্রথম পুরস্কার ২৫৲
দ্বিতীয় পুরস্কার ২০৲
তৃতীয় পুরস্কার ১৫৲
চতুর্থ পুরস্কার ১০৲
পঞ্চম পুরস্কাব ৫৲
ষষ্ঠ পুরস্কার ৫৲
সপ্তম পুরস্কার ৫৲
অষ্টম পুরস্কার ৫৲
নবম পুরস্কার ৫৲
দশম পুরস্কার ৫৲

উপযুক্ত বোধ করিলে পাঁচ টাকা মূল্যের অতিরিক্ত ২/৩টী পুরস্কার দেওয়া যাইবে। সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র উপন্যাস, গল্প, বিচিত্র অথবা কৌতুকাবহ ঘটনা অথবা ডিটেক্‌টিভ কাহিনীর জন্য উপরোল্লিখিত পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। কেবলমাত্র গল্পের সৌন্দর্য কিছুমাত্র নষ্ট না করিয়া কৌশলে কুন্তলীন এবং এসেন্স দেল্‌খোসের অবতারণা করিতে হইবে, অথচ কোন প্রকারে ইহাদের বিজ্ঞাপন বিবেচিত না হয়।

এইচ্‌ বসু,
৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পুরস্কারের নিয়মাবলী

১। রচনা যাহাতে সাধারণ চিঠির কাগজের ১৩/১৪ পৃষ্ঠা অথবা আড়াই হাজার শব্দের অধিক না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

২। পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক যাঁহার ইচ্ছা রচনা পাঠাইতে পারেন। কিন্তু কোন পুরুষ স্ত্রীলোকের নাম দিয়া পাঠাইলে সেই রচনা পুরস্কার যোগ্য হইবে না।

৩। কোন রচনার প্রাপ্তি স্বীকার করা অথবা পুরস্কার সম্বন্ধে কোন চিঠির উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে এজন্য কেহ রিপ্লাই পোষ্টকার্ড অথবা ডাক টিকিট পাঠাইবেন না। যাঁহারা রচনার পৌঁছান সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে চাহেন তাঁহারা রেজেষ্টারী করিয়া পাঠাইবেন।

৪। পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক ও লেখিকাদিগের নাম আগামী বৈশাখ মাসের মধ্য ভাগে সঞ্জীবনী, সময় ও প্রতিবাসী পত্রিকায় এবং স্বতন্ত্র লিষ্টাকারে প্রকাশিত হইবে। অপুরস্কৃত রচনা ফেরত দেওয়া হইবে না অথবা কোন প্রকারে ব্যবহৃত হইবে না।

৫। রচনা আগামী ২৯শে পৌষের মধ্যে "কুন্তলীন অফিসে" পৌঁছান আবশ্যক। তৎপরে কাহারও রচনা গৃহীত হইবে না।

এইচ্ বসু,
৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

* ১৩০৮ সনের পুস্তকের শেষে মুদ্রিত।—সম্পাদক।

প্রকাশকের নিবেদন

১৩০৯ সনের কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য প্রেরিত রচনাগুলির মধ্যে যে চতুর্দশটি রচনা পুরস্কার লাভ করিয়াছে তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। বসুমতী পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় পুরস্কৃত রচনাগুলির মধ্যে প্রথম দশটি নির্বাচন করিয়া দিয়াছেন ; এ জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

কুন্তলীন পুরস্কার-রচনাপূর্ণ এই গল্প পুস্তকখানি অন্যান্য বৎসরের পুস্তক অপেক্ষা অনেক বড় করা হইয়াছে, অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার ইহাতে গল্পসংখ্যাও অধিক আছে, এবং অতি উৎকৃষ্ট ও এদেশে দুর্লভ মূল্যবান 'এন্টিক' কাগজে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। কেবল উপহার প্রদানের জন্য যে পুস্তকের প্রকাশ, তাহা এরূপ উৎকৃষ্ট কাগজে বৃহদাকারে পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করা কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা সহজেই ধারণা করা যায়। কিন্তু এই বহুব্যয়সাধ্য কার্যে হস্তার্পণ করিতে আমরা কুণ্ঠিত হই নাই, কারণ আমাদের প্রস্তুত কুন্তলীন দেলখোস ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্যের গ্রাহকগণের অনুগ্রহেই আমরা প্রতি বৎসর এইরূপ পুরস্কার বিতরণ দ্বারা স্বদেশীয় লেখক লেখিকাগণের বঙ্গসাহিত্যের সেবায় কথঞ্চিৎ উৎসাহিত করিতে পারিতেছি এবং তাঁহাদের অনুগ্রহেই বৎসরান্তে এক এক খানি সুখপাঠ্য গল্পপুস্তক প্রকাশিত হইয়া বঙ্গদেশের পাঠক সমাজে সাহিত্যচর্চার পথ সুগম করিতেছে ; আমরা তাঁহাদের নিকট এ জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আমাদের প্রকাশিত এই গল্পপুস্তক সহস্র সহস্র স্বদেশবাসীর নিকট যেরূপ সমাদর লাভ করিয়া থাকে, তাহাতেই আমরা যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সফল মনে করি ; এবং তাঁহাদের উৎসাহেই আমরা আগামী বৎসরে পুরস্কারের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইতেছি।

এবার যে গল্পগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি গল্প কোন কোন খ্যাতনামা লেখক রচিত গল্পের অবিকল নকল! এরূপভাবে গল্প লিখিয়া পাঠাইয়া

কাহারো কোন লাভ নাই, এবং সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ নীতি কাহাকেও অবলম্বন করিতে দেখিলে বড়ই মর্মাহত হইতে হয় ; যাঁহার যেমন সাধ্য, তিনি সেইরূপই লিখিবেন, ইহাই আশা করা যায়। প্রতারণা পূর্বক পুরস্কার লাভের চেষ্টা কাহারও পক্ষে সঙ্গত নহে। ভবিষ্যতে এরূপ প্রতারণা নিবারণের অভিপ্রায়েই দুঃখের সহিত আমাদিগকে এ কথা কয়টি প্রকাশ করিতে হইল। এই পুস্তকে প্রকাশিত গল্পগুলির অংশবিশেষ পরিবর্তন বা পরিবর্জন করা হইয়াছে।

বর্তমান বৎসরের কুন্তলীন পুরস্কারের নিয়মাবলী পুস্তকের শেষভাগে সন্নিবিষ্ট হইল।

কুন্তলীন আফিস নিবেদক
১০ই ভাদ্র, ১৩১০। শ্রী এইচ্ বসু।

অষ্টম বর্ষ : ১৩১০

১৩১০ সনের
কুন্তলীন পুরস্কার। *
নগদ একশত পঞ্চাশ টাকা।

প্রথম পুরস্কার ৩০৲
দ্বিতীয় পুরস্কার ২৫৲
তৃতীয় পুরস্কার ২০৲
চতুর্থ পুরস্কার ১৫
পঞ্চম পুরস্কার ১০৲
ষষ্ঠ পুরস্কার ৫৲
সপ্তম পুরস্কার ৫৲
অষ্টম পুরস্কার ৫
নবম পুরস্কার ৫
দশম পুরস্কার ৫৲
একাদশ পুরস্কার ৫৲
দ্বাদশ পুরস্কার ৫৲
ত্রয়োদশ পুরস্কার ৫৲
চতুর্দশ পুরস্কার ৫৲
পঞ্চদশ পুরস্কার ৫

সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র উপন্যাস, গল্প, বিচিত্র অথবা কৌতুকাবহ ঘটনা অথবা ডিটেক্‌টিভ কাহিনীর কেবলমাত্র গল্পের সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র নষ্ট না করিয়া কৌশলে কুন্তলীন এবং এসেন্স দেল্‌খোসের অবতারণা করিতে হইবে, অথচ কোন প্রকারে ইহাদের বিজ্ঞাপন বিবেচিত না হয়।

এইচ বসু,
৬২ নং বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

* ১৩০৯ সনের পুস্তকের শেষে মুদ্রিত।—সম্পাদক

প্রকাশকের নিবেদন

১৩১০ সনের কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য প্রেরিত গল্পগুলির মধ্যে যে পঞ্চদশটি গল্প পুরস্কার লাভ করিয়াছে তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। বঙ্গসাহিত্যের সুপরিচিত লেখক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় বর্তমান বর্ষে গল্পগুলির স্থান নির্দেশ করিয়াছেন, এ জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

এবার পুরস্কার প্রাপ্ত গল্পগুলির মধ্যে মহিলাগণের প্রাধান্য দেখিয়া কেহ কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু পরীক্ষক মহাশয় মহিলাগণের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন পূর্বক পুরুষ লেখকগণের যোগ্যতা উপেক্ষা করিয়াছেন, কোন শিক্ষিত ও শিষ্ট পাঠকই ক্ষণকালের জন্যও তাহা মনে করিবেন না। গল্প রচনার আর্ট লেখিকাগণের গল্পে যতটা আছে, পুরুষ লেখকগণের গল্পে ততখানি নাই। অন্ততঃ কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য প্রেরিত সহস্র সহস্র পুরুষ ও মহিলাগণের প্রেরিত রচনা পাঠ করিয়া আমাদের সে ধারণা হইয়াছে। বরং মহিলাগণ অন্তঃপুরবাসিনী হইয়াও যে পুরুষ লেখকগণের সহিত প্রতিযোগিতায় এবারের পঞ্চদশটি পুরস্কারের মধ্যে দুইটি ভিন্ন সমস্তই গ্রহণ করিতে সমর্থা হইয়াছেন, ইহা আমাদেব অতীব আনন্দের বিষয়।

এবাবে পুরস্কারের জন্য সহস্রাধিক লেখক লেখিকার গল্প আমাদের হস্তগত হইয়াছিল ; তাঁহাদেব মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধিধারী হইতে লক্ষপতি রাজকুমাব পর্যন্ত সকল শ্রেণীর লেখকই ছিলেন, তাঁহাদের লেখা যে পুরস্কার লাভের যোগ্য হয় নাই, ইহাতে আমরা দুঃখিত আছি। কিন্তু তাঁহাবা অনেকেই গল্প লেখেন নাই : কেহ লিখিয়াছেন 'নন্দী-ভৃঙ্গি-সংবাদ', কেহ লিখিয়াছেন 'ইলোরা ভ্রমণ', কেহ 'ছাবপোকার আত্মকাহিনী,' বা আরব্য উপন্যাসেব গল্প রচনা কবিযা পাঠাইযাছেন ; একজন লেখক গীতা ও দর্শন লইয়া একটি সুদীর্ঘ দার্শনিক প্রবন্ধ বচনা কবিয়াছিলেন ! কোন কোন গল্পের ভাষা ভাল ; আখ্যানভাগ নৈপুণ্যের সহিত সম্বদ্ধ—কিন্তু তাহা অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণের হস্তে অসঙ্কোচে প্রদান করা যায় না। আবার কোন কোন গল্প বঙ্গভাষার উৎকৃষ্ট গল্প লেখকগণেব বহুপূর্ব লিখিত গল্পের নকলমাত্র ' বঙ্গসাহিত্যের প্রকাশিত গল্পগুলি সম্বন্ধে যাঁহার অভিজ্ঞতা নাই এরূপ কোন পরীক্ষকের হস্তে পডিলে এই সকল অপহৃত গল্প পুরস্কৃত হইবার বিশেষ আশঙ্কা ছিল।

আবার কেহ কেহ আমাদের ঠিক উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া এমন গল্পও লিখিয়াছেন যে, কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া অর্দ্ধ রাজ্য ও এক রাজকন্যা লাভ হইল, কিম্বা দেল্‌খোসের আঘ্রাণে মৃতপ্রায় রোগী উঠিয়া দৌডিতে লাগিল ! এই সকল আতিশয্যপূর্ণ অপাঠ্য কাহিনী পাঠ করা আমাদের পক্ষেও বিড়ম্বনাজনক। কেহ কেহ এত দীর্ঘ গল্প লিখিয়াছেন যে, তাহা পুস্তকের চারি ফর্মাতেও শেষ হয় না। দুই একটি উৎকৃষ্ট অথচ অতি বিস্তৃত গল্প কেবল এই কারণেই বাদ দিতে হইয়াছে এবং এই জন্যই পুরস্কৃত গল্পগুলিও অল্লাধিক পরিমাণে পরিবর্জিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে। যাঁহারা পুরস্কার না পাইয়া দুঃখিত হইয়াছেন অথবা যাঁহারা ভবিষ্যতে রচনা লিখিবেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য আমরা উপরোক্ত কথাগুলি লিখিতে বাধ্য হইলাম।

উপসংহারে যাঁহাদের অনুগ্রহে আমরা প্রতি বৎসর এইরূপ বহু ব্যয়সাধ্য ব্যাপারে হস্তার্পণ করিতে সাহসী হইতেছি—আমাদের কুন্তলীন দেল্‌খোস ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্যসমূহের সেই সকল গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণের নিকট আমরা আজ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি,

আমাদের প্রতি তাঁহাদের এই অনুগ্রহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে—ইহাই আমরা আশা করি।

বর্তমান বৎসরের কুন্তলীন পুরস্কারের নিয়মাবলী গ্রন্থশেষে সন্নিবিষ্ট হইল।

কুন্তলীন আফিস, নিবেদক

১লা ভাদ্র, ১৩১১ শ্রী এইচ্ বসু।

নবম বর্ষ : ১৩১১

১৩১১ সনের
কুন্তলীন পুরস্কার।
নগদ একশত পঞ্চাশ টাকা।

প্রথম পুরস্কাব ৩০৲
দ্বিতীয় পুরস্কার ২৫
তৃতীয় পুরস্কার ২০৲
চতুর্থ পুরস্কার ১৫
পঞ্চম পুরস্কার ১০
ষষ্ঠ পুবস্কাব ৫৲
সপ্তম পুবস্কার ৫৲
অষ্টম পুরস্কাব ৫৲
নবম পুবস্কার ৫
দশম পুবস্কার ৫৲
একাদশ পুবস্কার ৫
দ্বাদশ পুরস্কার ৫৲
ত্রয়োদশ পুরস্কাব ৫
চতুর্দশ পুরস্কার ৫
পঞ্চদশ পুরস্কার ৫৲

সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র উপন্যাস, গল্প, বিচিত্র, অথবা কৌতুকাবহ ঘটনা অথবা ডিটেক্‌টিভ কাহিনীব জন্য উপরোল্লিখিত পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। কেবলমাত্র গল্পেব সৌন্দর্য কিছুমাত্র নষ্ট না করিয়া কৌশলে কুন্তলীন এবং এসেন্স দেল্‌খোসের অবতারণা করিতে হইবে, অথচ কোন প্রকারে ইহাদের বিজ্ঞাপন বিবেচিত না হয়।

এইচ, বসু,
৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পুরস্কারের নিয়মাবলী

১। রচনা কোনক্রমে সাধারণ চিঠির কাগজের ১০/১২ পৃষ্ঠার অধিক হইবে না, কাগজের এক পিঠে লিখিতে হইবে।

২। পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক যাঁহার ইচ্ছা রচনা পাঠাইতে পারেন, কিন্তু নাম গোপন রাখিলে অথবা অন্য নামে রচনা পাঠাইলে তাহা পুরস্কৃত হইবে না। যদি কেহ প্রমাণ করিতে পারেন যে রচয়িতা স্বীয় নাম গোপন করিয়া অন্য নামে রচনা পাঠাইয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছেন, তাহা হইলে সে পুরস্কার উক্ত প্রমাণকারীকে দেওয়া হইবে।

৩। রচনার প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য কেহ রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট পাঠাইবেন না, প্রাপ্তি স্বীকার

আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে।

৪। পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক লেখিকাগণের নাম জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে প্রধান প্রধান মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় ও স্বতন্ত্র লিষ্টে প্রকাশিত হইবে। পুরস্কৃত রচনাগুলি পুস্তকাকারে ভাদ্রমাসের মধ্যে প্রকাশিত হইবে। অপুবস্কৃত বচনা ব্যবহৃত বা লেখকের হস্তে প্রত্যর্পিত হইবে না। পুবস্কার ঘোষণার এক মাস পরে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে, লেখিকাগণ কর্তৃপক্ষের বা আত্মীয়ের অনুমোদনপত্র দেখাইয়া পত্র লইবেন।

৫। রচনা আগামী ৩০শে মাঘের মধ্যে কুন্তলীন অফিসে পৌঁছান আবশ্যক ; তৎপরে কোন রচনা গৃহীত হইবে না।

এইচ, বসু,
৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দশম বর্ষ : ১৩১২

নিবেদন

দশম বর্ষেব কুন্তলীন পুবস্কাবের গল্প-পুস্তক প্রকাশিত হইল। পুরস্কার-ফল প্রকাশে এবার অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। এবার দ্বাদশ শতাধিক গল্প আমাদের হস্তগত হইযাছিল, এই জন্য গল্পগুলি পবীক্ষায় অনেক সময় লাগিযাছে।

কুন্তলীন পুরস্কাবের গল্প বচনায় আমাদের স্বদেশীয় মহিলা ও পুরুষগণেব এইরূপ আগ্রহ ও যত্ন দেখিয়া আমরা যথেষ্ট আনন্দ লাভ কবিয়াছি ; বঙ্গসাহিত্যচর্চার হিসাবেও ইহা আশার কথা। কিন্তু আমাদিগকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, ছোট গল্পের হিসাবে ইহাদের অধিকাংশ গল্পই নিতান্ত অনুপযোগী। উৎকৃষ্ট গল্পের সংখ্যা কিরূপ অল্প তাহা পাঠক পাঠিকাগণ পুস্তকখানি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। পুরস্কৃত পনেরটি গল্পই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইবে আমরা এইরূপ বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রথম দশটি গল্পের অতিরিক্ত কোন গল্প আমরা এবার প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইলাম না। এই গল্প কয়েকটির কোনটি বক্তৃতামাত্র, কোনটি শ্লীলতাবর্জিত, কোনটি বা নিতান্ত অস্বাভাবিক। এই সব কারণে এই কয়টি গল্প আমরা প্রকাশ করিয়া পুস্তকেব কলেবর বৃদ্ধির আবশ্যক মনে করিলাম না। লেখকগণকে নিরুৎসাহ করিবার জন্য আমরা একথা বলিতেছি না ; রচনা উৎকৃষ্ট ও প্রকাশযোগ্য হয়, এবং পাঠক পাঠিকাগণ পডিয়া আনন্দ লাভ করেন ইহাই আমাদের অভিপ্রায়।

কুন্তলীনের পুরস্কার গল্প-পুস্তক আমাদের দেশে যেরূপ সমাদৃত হইয়াছে, বাঙালীর অন্তঃপুরে যেমন ইহার অব্যাহত গতি তাহাতে আমরা প্রত্যাশা করি লেখক লেখিকাগণ এরূপ প্রশ্ন পাঠাইবেন যাহা আমরা আহ্লাদের সহিত আমাদের স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীগণের হস্তে প্রদান করিতে পারি।

দুঃখের সঙ্গে আর একটা কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না, পরের গল্পের ভাষা একটু আধটু বদলাইয়া তাহাতে কুন্তলীন, দেলখোসের অবতারণা করিয়া তাহাই নিজের গল্প বলিয়া চালাইবার অভ্যাস এখনও অনেকের আছে। একজন লেখক একটি 'স্বদেশী' গল্প লিখিয়াছেন তাহা বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠের স্থান বিশেষের নকল মাত্র ! এরূপ নীচাশয়তার মার্জনা নাই। গল্পের মধ্যে, গল্পের সৌন্দর্য নষ্ট না করিয়া কুন্তলীন ও দেলখোসের অবতারণা করা হয়, ইহাই আমাদের অভিপ্রায় ; কিন্তু কোন কোন লেখক গল্প

জমাইবার জন্য এই দুইটি পার্থিব পদার্থকে স্বর্গের অমৃত অপেক্ষাও বাড়াইয়া তুলিয়াছেন! কেবল মানুষের সম্বন্ধে নহে, জিনিসের সম্বন্ধে, এইরূপ স্তুতিবাদের অবতারণায় কোন সুপাঠ্য গল্প রচিত হইতে পারে না, এবং এরূপ অতিরিক্ত প্রশংসা সংবলিত গল্প পাঠ করিতে আমাদেরও সঙ্কোচ বোধ হয়। কুন্তলীন, দেলখোসের এইরূপ অতিরিক্ত প্রশংসার জন্য অনেক গল্প অপাঠ্য হইয়াছে।

যাহা হউক, পূজা আসিয়া পড়িয়াছে, এবার বঙ্গবাসী নানা কারণে বিপন্ন, পূজার অবসরে এই পুস্তকখানি যদি তাঁহাদের চিত্তরঞ্জক হয় তাহা হইলে শ্রম ও অর্থ ব্যয় সফল মনে করিব। এই গল্প-পুস্তক কুন্তলীন ও দেলখোসের প্রচারে আমাদের যতটুকুই সহায়তা করুক, পাঠক সমাজকে গল্প পাঠের নির্মল আনন্দ দানই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। যাঁহাদের অনুগ্রহে আমরা এই ব্যয়সাধ্য কার্যে প্রতি বৎসর সমর্থ হইতেছি,—আমাদের এসেন্স ও গন্ধদ্রব্যের সেই সকল ক্রেতাগণকে আজ বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

কলিকাতা,
৩০ ভাদ্র, শনিবার :
১৩১৩।

নিবেদক
শ্রী এইচ বসু।

১৩১২ সনের
কুন্তলীন পুরস্কার
নগদ একশত পঞ্চাশ টাকা

প্রথম পুরস্কার—৩০
দ্বিতীয় পুরস্কার—২৫
তৃতীয় পুরস্কার—২০
চতুর্থ পুরস্কার—১৫
পঞ্চম পুরস্কার—১০
ষষ্ঠ পুরস্কার—৫
সপ্তম পুরস্কার—৫
অষ্টম পুরস্কার—৫
নবম পুরস্কার—৫
দশম পুরস্কার—৫
একাদশ পুরস্কার—৫
দ্বাদশ পুরস্কার—৫
ত্রয়োদশ পুরস্কার—৫
চতুর্দশ পুরস্কার—৫
পঞ্চদশ পুরস্কার—৫

সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র উপন্যাস, গল্প, বিচিত্র অথবা কৌতুকাবহ ঘটনা অথবা ডিটেকটিভ কাহিনীর জন্য উপরোল্লিখিত পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। কেবলমাত্র গল্পের সৌন্দর্য কোন অংশে নষ্ট না করিয়া কৌশলে কুন্তলীন এবং এসেন্স দেলখোসের অবতারণা করিতে হইবে, অথচ কোন প্রকারে ইহাদের বিজ্ঞাপন বিবেচিত না হয়।

এইচ. বসু,
৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশকের নিবেদন

একাদশ বর্ষের কুন্তলীন পুরস্কারের গল্পগুলি প্রকাশিত হইল ; গল্পগুলি পাঠ করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণ তৃপ্তি লাভ করিলে আমাদের উদ্যম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিব।

এবারও গত বৎসরের ন্যায় পুরস্কৃত পনেরটি গল্প এই পুস্তকে প্রকাশিত হইল। গত বৎসর হইতে আমরা যে পরিমাণ অর্থ পুরস্কারে ব্যয় করিতেছি—তাহাতে বঙ্গভাষার সুলেখকগণ যাঁহারা অর্থ বিনিময়ে মাসিক পত্রাদিতে গল্প লিখিয়া থাকেন তাঁহারা অনায়াসে এই পুরস্কার গ্রহণের চেষ্টা করিতে পাবেন ; ত্রিশ টাকা পুরস্কার একটি ছোট গল্পের বিনিময়ে—অন্ততঃ বঙ্গভাষায় নিতান্ত অল্প নহে। যাঁহারা গল্পের জন্য অর্থগ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা এইরূপ ইচ্ছাপ্রকাশ করিলে আমরা তাঁহাদের গল্প আনন্দের সহিত প্রকাশ করিব এবং তাঁহার পুরস্কার তাঁহার পরবর্তী স্থানীয় লেখককে দিব। অথবা কোন সৎ কর্মে দান করিব।

পুরস্কৃত গল্পের স্থান সম্বন্ধে অল্পাধিক মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক, মতভেদ হইবার একটি বিশেষ কারণও আছে, গল্পগুলির অনেক স্থলে পরিবর্তন আবশ্যক মনে হইয়াছে। সে জন্য কোন যোগ্য ব্যক্তির হস্তে আমরা পুস্তকখানির সম্পাদনভার ন্যস্ত কবিয়াছিলাম, পরিবর্তনের ফলে কোন পরবর্তী গল্প পূর্ববর্তী গল্প অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইতে পারে। কোন কোন গল্প সুলিখিত, কিন্তু বিষয়ের দৈন্য, কল্পনার অসঙ্গতি, ঘটনার অস্পষ্টতা প্রভৃতি দোষে তাহা নিম্ন স্থান লাভ করিয়াছে।

অনেকে এমন গল্প পাঠাইয়াছেন তাহা পাঠেরও অযোগ্য, তাহাদের বিশ্বাস কিছু একটা লিখিলেই গল্প হইল, এমন সহজ কাজ আর নাই! কোন কোন লেখক লেখিকাগণের আজও পরের গল্প নকল করিয়া পাঠাইবার অভ্যাস দূর হইল না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। আবার মহিলার নাম করিয়া পুরুষেও গল্প লিখিযা পাঠাইয়াছেন, ছিঃ!

পুরস্কার প্রদান আমাদের ব্যবসায়ের একটি অঙ্গ হইলেও ইহা যে বঙ্গীয় গল্প লেখকগণের সাহিত্যালোচনার ও রচনার একটি পথ উন্মুক্ত করিয়াছে একথা আশা করি কেহ অস্বীকার করিবেন না ; আমরা প্রতি বৎসর বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহ দানেও যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সমর্থ হইতেছি, ইহা আমাদের প্রস্তুত কুন্তলীন ও গন্ধদ্রব্য সমূহের গ্রাহকগণেরই অনুগ্রহে। এজন্য তাঁহাদের নিকট আমরা আজ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবিতেছি। মহাপূজা সন্নিকটবর্তী হইয়াছে, বন্ধু বন্ধুকে. ভাই ভগিনীকে, স্বামী স্ত্রীকে এই গল্পের পুস্তকখানি হাসি মুখে উপহার দিয়া আনন্দলাভ করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

নিবেদক
শ্রী এইচ. বসু।

পুরস্কারের নিয়মাবলী।

১। রচনা কোন ক্রমে সাধারণ চিঠির কাগজের ১০/১২ পৃষ্ঠার অধিক হইবে না, কাগজের এক পিঠে লিখিতে হইবে।

২। পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক যাঁহার ইচ্ছা রচনা পাঠাইতে পারেন, কিন্তু নাম গোপন রাখিলে অথবা অন্য নামে রচনা পাঠাইলে তাহা পুরস্কৃত হইবে না। যদি কেহ প্রমাণ করিতে পারেন যে রচয়িতা স্বীয় নাম গোপন করিয়া অন্য নামে রচনা পাঠাইয়া পুরস্কার লাভ

করিয়াছেন, তাহা হইসে সে পুরস্কার উক্ত প্রমাণকারীকে দেওয়া হইবে।

৩। রচনার প্রাপ্তিস্বীকারের জন্য কেহ রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট পাঠাইবেন না, প্রাপ্তিস্বীকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে।

৪। পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক লেখিকাগণের নাম জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে প্রধান প্রধান মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় ও স্বতন্ত্র লিষ্টে প্রকাশিত হইবে। পুরস্কৃত রচনাগুলি পুস্তকাকারে ভাদ্র মাসের মধ্যে প্রকাশিত হইবে। অপুরস্কৃত রচনা ব্যবহৃত বা লেখকের হস্তে প্রত্যর্পিত হইবে না। পুরস্কার ঘোষণার এক মাস পরে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে, লেখিকাগণ কর্তৃপক্ষের বা আত্মীয়ের অনুমোদনপত্র দেখাইয়া টাকা লইবেন।

৫। রচনা আগামী ৩০শে মাঘের মধ্যে কুন্তলীন অফিসে পৌঁছান আবশ্যক ; তৎপরে কোন রচনা গৃহীত হইবে না।

এইচ বসু,
৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

* নবম বৎসর 'কুন্তলীন পুরস্কারে'র শেষে মুদ্রিত।—সম্পাদক

একাদশ বর্ষ : ১৩১৩

প্রকাশকের নিবেদন।

১৩১৩ সনের কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য প্রেরিত গল্পগুলির মধ্যে যে পঞ্চাশটি গল্প পুরস্কার লাভ করিয়াছে তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা "সাহিত্যের" সুযোগ্য সম্পাদক ও সুলেখক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এবার পুরস্কৃত গল্পগুলির স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

এবার পুরস্কৃত গল্পগুলির মধ্যে কোনও গল্প অসঙ্গতি দোষদুষ্ট ও অস্বাভাবিক হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে ; কিন্তু সুবিজ্ঞ পরীক্ষক মহাশয় যখন তাহাকে পুরস্কারের যোগ্য মনে করিয়াছেন, তখন এ সম্বন্ধে আমাদের কোনও কথা বলিবার অধিকার নাই।

এবার পুরস্কারের ফল প্রকাশে অতিরিক্ত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে ; এবার দ্বাদশ শতাধিক গল্প প্রতিযোগিতায় প্রেরিত হইয়াছিল, এতগুলি গল্প সাবধানে পাঠ করিয়া উপযুক্তগুলির রক্ষণ ও অবশিষ্টগুলির বর্জন যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। এই গল্পপুস্তকখানি লাভের জন্য বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাগণ যেরূপ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহাতে মনে হয় এই যে এক যুগ ধরিয়া আমরা গল্পপুস্তক প্রকাশে যত্ন ও অর্থব্যয় করিয়া আসিতেছি, তাহা অনর্থক হয় নাই। আমাদের চেষ্টায় পাঠক সমাজের উৎকৃষ্ট গল্পপাঠের আকাঙ্ক্ষা কিয়ৎ পরিমাণেও পরিতৃপ্ত হইয়াছে।

অত্যন্ত দুঃখের সহিত লিখিত হইতেছে, এবারও অনেক পুরুষ স্বয়ং গল্প লিখিয়া তাহা মহিলার নামে পাঠাইয়াছেন ! রমণীর হস্তাক্ষরের অন্তরালে পুরুষের রচনা প্রচ্ছন্ন থাকিলে তাহা ধরা বিশেষ কঠিন নহে। আমরা যখন স্ত্রী-পুরুষের রচনার মধ্যে কোনও পার্থক্য রাখি না, যিনিই গল্প লিখুন, যোগ্যতা অনুসারেই তাহার বিচার হয়, তখন এরূপ প্রবঞ্চনার আশ্রয়গ্রহণের আবশ্যক কি, বুঝিতে পারা যায় না। ভবিষ্যতে যদি এরূপ সন্দেহের কারণ ঘটে, তাহা হইলে এরূপ গল্প পুরস্কার যোগ্য হইলেও তাহা পুরস্কৃত হইবে না।

এ কথা বলা বাহুল্য নয় যে, আশানুরূপ উৎকৃষ্ট গল্প এখনও আমরা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পুরস্কার দানে আমাদের কৃপণতা নাই, কিন্তু পুরস্কারের তুলনায় যেরূপ নিখুঁত গল্প প্রতিযোগিতায় প্রেরিত হওয়া উচিত, তাহা না হওয়ার কারণ—গল্পলেখকগণের মনোযোগের অভাব। যে সকল গল্পলেখক পাঁচ টাকা বা দশ টাকা পারিশ্রমিকের পরিবর্তে মাসিক পত্রিকায় গল্প লিখিয়া থাকেন, তাঁহারা একটু চেষ্টা করিলেই কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য ভাল গল্প লিখিয়া পাঠাইতে পারেন। কুন্তলীন পুরস্কারের গল্প লিখিতে হইবে বলিলে এ কথা বুঝায় না যে কুন্তলীন বা এসেন্স দেলখোসের আগাগোড়া প্রশংসা করিয়া গল্পটিকে নীরস, বিকৃত বা ভারাক্রান্ত করিতে হইবে। কুন্তলীন ও এসেন্স—দেলখোসের অবতারণা দ্বারা, গল্পের স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট না করিয়াও গল্প লিখিতে পারা যায়, অনেক যোগ্য লেখকের গল্পদ্বারা পূর্বাপর ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। গৌণতঃ আমাদের ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা এইরূপ গল্পপ্রচারের উদ্দেশ্য হইলেও, মুখ্যতঃ আমরা বঙ্গীয় গল্প লেখকগণকে উৎসাহিত ও পাঠকগণকে আমোদিত করিবার জন্যই প্রতি বৎসর গল্পপুস্তক প্রকাশে বহু অর্থব্যয় করিয়া থাকি ; আমাদের উদ্দেশ্য যৎকিঞ্চিৎ সফল হইয়া থাকিলেও আমরা কৃতার্থ হইব।

আগামী বর্ষের জন্য পুরস্কারের পরিমাণ আমরা আরও বর্দ্ধিত করিলাম। গল্পের জন্য একশত টাকা, কবিতার জন্য পঞ্চাশ টাকা ও পূজার চিঠির জন্য পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। আশা করি এবার অন্যান্য বৎসরের অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট গল্প ও সরস, সুখপাঠ্য কবিতাদি প্রতিযোগিতায় প্রেরিত হইবে। কুন্তলীন পুরস্কারের নিয়মাবলী গ্রন্থশেষে সন্নিবিষ্ট হইল।

দেলখোস হাউস,
কলিকাতা.
২৮শে ভাদ্র, ১৩১৪।

নিবেদক
শ্রী এইচ বসু।

* প্রতিবিধি নিবেদন—সম্পাদক

দ্বাদশ বর্ষ : ১৩১৫

প্রকাশকের নিবেদন।

দ্বাদশ বর্ষের কুন্তলীন পুরস্কার-রচনাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এবার পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক লেখিকাগণের নামের তালিকা পূর্বে প্রকাশ না করিয়া পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হইল, আশা করি ইহাতে কাহারও কোন অসুবিধার কারণ ঘটে নাই।

এবার কবিতা ও পূজার চিঠির তুলনায় গল্পগুলি তেমন উৎকৃষ্ট হয় নাই বলিয়া মনে করি। সহস্রাধিক রচনার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর গল্পের স্থান অধিকার করিতে পারে—এরূপ গল্পের অভাব একান্ত দুঃখের বিষয় ; আরও লজ্জার বিষয় এই যে, পুরাতন মাসিক পত্রিকা, ছোটগল্পের পুস্তক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে অনেক গল্প নকল করিয়া পাঠান হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গে আর অধিক কিছু বলিব না, কারণ আগামী বর্ষে পুরস্কার সম্বন্ধে আমরা নূতন বিষয়ের অবতারণা করিলাম।

বিগত দ্বাদশবর্ষকাল আমরা বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহ বর্ধনের অভিপ্রায়ে ও বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাগণের চিত্ত বিনোদনের জন্য উৎকৃষ্ট গল্প ও ক্ষুদ্র উপন্যাসাদি প্রকাশে সহস্র সহস্র মুদ্রা অকাতরে ব্যয় করিয়াছি। এ বিষয়ে আমরাই যে প্রথম পথপ্রদর্শক একথা বোধ হয়

কেহই অস্বীকার করিবেন না ।—কিন্তু দেখিতেছি অনেক নূতন ব্যবসায়ী আমাদের প্রবর্তিত পন্থার অনুসরণ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প রচনার জন্য লেখকগণকে পুরস্কৃত করিতেছেন, আমরা যে পথে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলাম—এখন অনেকেই সেই পথে অগ্রসর—ইহা গল্পলেখকগণের পক্ষে যথেষ্ট উৎসাহ ও আমাদের পক্ষে বিশেষ আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই ।

বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টি বিধানের জন্য আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু পারিয়াছি চেষ্টার ত্রুটি করি নাই ; কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের একটি গুরুতর অভাবের কথা আমরা কোন মতেই বিস্মৃত হইতে পাবি না । কাহিনী, উপকথা বা রূপকথা নামক একশ্রেণীর গল্প বহুকাল হইতে এ দেশের নবনারীগণের চিত্তরঞ্জন করিয়া আসিয়াছে । সত্য বটে, আজ বঙ্গসাহিত্য বিপুল গল্পভারে ভারাক্রান্ত, নিত্য নূতন উপন্যাস ও গল্পপুস্তকাদি প্রকাশিত হইতেছে—কিন্তু বাঙ্গলা দেশের যাহা প্রাণের সামগ্রী, বাঙ্গলার জল ও বাঙ্গলার মাটির মত আমাদের চিত্তরঞ্জক ও অপরিহার্য—যে সকল কাহিনী ও উপকথা পুরুষপরম্পরা ধরিয়া মাতৃস্তন্যের ন্যায় শৈশবে আমাদের হৃদয়ের অব্যক্ত সুধা পরিতৃপ্ত করিয়াছে—আমাদের শিশু-হৃদয়ের নবজাগ্রত কল্পনাকে মুখরিত ও অপূর্ব পুলকালোকে সুরঞ্জিত করিয়াছে—একালে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতেছে ।—বাল্যকালে, প্রথম যৌবনে কত কর্মহীন বিরস-সন্ধ্যায় বহুজনে একত্র বসিয়া সেই সকল মধুরকাহিনী শুনিতে শুনিতে মধ্যরাত্রি অপগত হইত—এবং পৃথিবীর অন্য সকল কথা ভুলিয়া গিয়া বিচিত্র কল্পনারথে আরোহণ করিয়া যেন কোনও প্রবাসী রাজপুত্রের সহিত শত বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া অসম্ভব বিপদ হইতে অসম্ভবতর উপায়ে উদ্ধার লাভ করিয়া সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে পাহাড়ের উপর সাত মহল অট্টালিকায় উপস্থিত হইতাম, যেখানে শিয়রে মাণিকের প্রদীপ জ্বালাইযা সোনার খাটে বাজকন্যা শুইয়া থাকিত । তাহার পব কি নিবিড় বিস্ময়, কি অপূর্ব মোহময় মিলনানন্দ !—আকাশ গাঢ় কৃষ্ণমেঘে সমাচ্ছন্ন, বাহিরে অশ্রান্ত বৃষ্টির ধারা,—সেই সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদদ্বারে যে বিপুল দেহ রাক্ষসী ঘুমাইতেছিল, মনুষ্যের গন্ধে সে উঠিয়া সেই সাত মহল পুরীর মধ্যে ঝড়ের মত বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে—শুনিযা ভয়ে বিস্ময়ে আমাদের বক্ষের স্পন্দন রুদ্ধ হইত !—এ সকল উপকথা, এ সকল কাহিনী,—সেই বাক্ষস রাক্ষসী ও ভূত প্রেতের কাহিনী—সেই তালপত্রের সিপাই, পক্ষীরাজ ঘোড়া প্রভৃতির গল্প আজ যেন স্বপ্নের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে—এবং আধুনিক উৎকৃষ্ট উপন্যাসগুলি অসঙ্কোচে আমাদের বালকবালিকাগণের চিত্তের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেছে । কিন্তু এখনও এত বিপুল গল্প-উপন্যাসের মধ্যেও আমাদের এই কর্মশ্রান্ত জীবনমধ্যাহ্নে—

মনে পড়ে সুয়োরাণী দুয়োরাণীর কথা,
মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর ব্যথা,
—সেই সঙ্গে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান,
'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান ।'

—ইহা কোন ক্রমে উপেক্ষার যোগ্য নহে । সেই জন্য আমরা স্থির করিয়াছি আগামী বর্ষে প্রাচীন বাঙ্গলার এই সকল কাহিনী ও উপকথা সুন্দররূপে ছাপাইয়া সুন্দর সুন্দর চিত্র সংযোগে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিব । এজন্য বঙ্গদেশের সর্বস্থানের লেখক লেখিকাগণের সহায়তা আবশ্যক । কিন্তু আমরা বিশেষভাবে আমাদেব দেশের বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র ও ছাত্রীগণকেও অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা তাঁহাদের পিতামহী বা মাতামহীগণের নিকট এই

সকল উপকথা শুনিয়া বা গ্রামের যে সকল পল্লীবৃদ্ধ এই সকল গল্পের জাহাজ বলিলেও চলে—তাহাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া অনতিরঞ্জিত ভাষায় যথাযথভাবে লিখিয়া পাঠাইবেন। গল্পের মাধুর্য ও ঘটনাবৈচিত্র্যের উপর পুরস্কারের পরিমাণ নির্ভর করিবে। এবং যাঁহার যতগুলি গল্প উপযুক্ত বিবেচিত হইবে সেই সকল গল্পই পুরস্কৃত হইবে ; সুতরাং গল্পের পরিমাণানুসারে একজনেই চারি পাঁচ বা ততোধিক পুরস্কারও লাভ করিতে পারিবেন।

যে সকল গল্প পাঠাইতে হইবে তাহাদিগকে প্রধানতঃ আমরা সাত ভাগে বিভক্ত করিলাম,—(১) দিগ্‌দেশে যাত্রা ও নানা বিপদ হইতে উদ্ধার বিষয়ক (২) প্রণয় সম্বন্ধীয় (৩) রাক্ষস রাক্ষসী ও ভূত প্রেত সম্বন্ধীয় (৪) ঠগ ও জুয়াচোর বাটপাড় সম্বন্ধীয় (৫) বুদ্ধিকৌশলের পরিচায়ক (৬) হাস্যকৌতুকপূর্ণ (৭) বিবিধ।—এই সাত শ্রেণীর যে কোন বিষয়ে গল্প লিখিয়া পাঠাইলেই চলিবে। তবে প্রত্যেক লেখক লেখিকাকে স্বীকার করিতে হইবে তাঁহাদের প্রেরিত গল্প ইংরাজী গল্পের অনুবাদ নহে, এবং কোন পুস্তক বা পত্রিকা হইতে নকল করা নহে। অনেকের গল্প একই প্রকার হইতে পারে—কিন্তু অভিন্ন বিষয়ের গল্প যাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট হইবে তিনিই পুরস্কার পাইবেন।

বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত অন্ততঃ পঁচিশ ত্রিশটি গল্প আমরা প্রকাশ করিব। এই সকল গল্প তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে ; প্রথম শ্রেণীর গল্পগুলি প্রত্যেকে ২০্ দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্পগুলি প্রত্যেকে ১০্ ও তৃতীয় শ্রেণীর গল্পগুলি প্রত্যেকে ৫্ হিসাবে পুরস্কৃত হইবে। কোন্ শ্রেণীর কতগুলি গল্প পুরস্কৃত হইবে তাহা গল্পের যোগ্যতানুসারে পরে নির্ণীত হইবে। তবে অন্যূন দুই শত টাকা লেখক লেখিকাগণকে পুরস্কার প্রদান করা হইবে। এবং উৎকৃষ্ট গল্পের সংখ্যা যদি অধিক হয় তবে পুরস্কারের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করিবারও আমাদের ইচ্ছা রহিল।

আশা করি এইরূপে আমরা বঙ্গজননীর একটা অমূল্য সম্পত্তি বিনাশের পথ হইতে রক্ষা করিতে পারিব, তবে সকলে একটি কথা স্মরণ রাখিবেন, গল্পগুলি খাঁটি স্বদেশী হওয়া চাই—কোন গল্প বিলাতী গল্পের অনুবাদ বা ছায়ানুকরণে লিখিত বলিয়া সন্দেহ হইলে—তাহা যতই সুললিত হউক, পুরস্কৃত হইবে না। কিন্তু দেশী গল্প যদি উৎকৃষ্ট হয় তাহা হইলে সুলিখিত না হইলেও লেখক পুরস্কারে বঞ্চিত হইবেন না, তাহার ভাষা মার্জিত করিয়া প্রকাশিত করা হইবে।

দেলখোস হাউস, নিবেদক
কলিকাতা, শ্রী এইচ বসু।
২২শে ভাদ্র, ১৩১৫।

ত্রয়োদশ বর্ষ : ১৩১৬

প্রকাশকের নিবেদন।

বিগত বৎসর উৎকৃষ্ট উপকথা ও রূপকথা সংগ্রহের জন্য আমরা অন্যূন দুই শত টাকা পুরস্কার দিব বলিয়া ছিলাম। আমরা আশা করিয়াছিলাম বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট চিত্তাকর্ষক গল্প পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিতে সমর্থ হইব কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে যদিও প্রেরিত গল্পের সংখ্যা কোন মতেই কম নহে, তথাপি পুরস্কার অথবা প্রকাশের উপযুক্ত গল্প অতি সামান্যই আসিয়াছে। আমরা মাত্র নয়টি গল্প এইবার প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম এবং এই

স্বল্প সংখ্যক গল্পেরও কতকগুলি অনেক পরিবর্তন এবং সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিতে হইয়াছে।

যদিও এইবারের গল্পগুলি আমাদের আশানুরূপ হয় নাই, তথাপি ভবিষ্যতে উৎকৃষ্ট গল্প পাইব এই আশায়, আমরা আগামী বৎসরেও এইরূপ উপকথার জন্যই পুরস্কার দিব স্থির করিয়াছি। যাহাতে প্রেরিত উৎকৃষ্ট গল্পেব সংখ্যা আরও অধিক হয় সেই জন্য আমরা আগামী বৎসরের পুরস্কারের টাকা আরও এক শত বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি—বিশেষতঃ যাহাতে একজনই অনেক গল্প লিখিয়া পাঠান সেই উদ্দেশ্যে আমরা আগামীবারে যাঁহার অন্ততঃ চারটি গল্প পুরস্কৃত হইবে তাঁহাকে, সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গল্প সংগ্রহেব জন্য, ঐ গল্পগুলির নির্দিষ্ট পুরস্কার ব্যতীত, ২০৲ টাকা মূল্যের একটি অতিরিক্ত পুরস্কার দিব।

গল্পপুস্তক যে প্রকার সুচারুরূপে মুদ্রিত এবং সুন্দর চিত্রে শোভিত করিয়া পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিতে ইচ্ছা করি, এই ক্ষুদ্র পুস্তকই তাহার নমুনা। সুযোগ্য চিত্রকর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম করিয়া এই গল্পগুলির জন্য চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন এবং সুবিখ্যাত U. Roy & Sons মহোদয়গণ বিশেষ যত্ন করিয়া এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে চিত্রগুলির ব্লক প্রস্তুত করিযা দিয়াছেন—এই জন্য তাঁহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ আছি। বলা বাহুল্য যে আগামী বৎসরের পুরস্কার-পুস্তক আমরা আবও উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত এবং আরও অধিক সুরঞ্জিত চিত্রে শোভিত করিতে ইচ্ছা করি।

লেখক লেখিকাগণের প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে তাঁহারা এই বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন কাহিনীগুলি সংগ্রহে যত্নবান হইয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধনে আমাদিগকে সাহায্য করিবেন।

যদি কোনও লেখক অথবা লেখিকা রচনার জন্য টাকা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হ'ন, তবে আমরা তাঁহার উপদেশ মত পুরস্কারের টাকা যে কোন ফণ্ড অথবা আশ্রমে আহ্লাদ সহকারে পাঠাইয়া তাহা পুস্তকে স্বীকার করিব।

পুরস্কারের নিয়মাবলী পুস্তকের শেষ ভাগে সন্নিবেশিত হইল।

১লা আশ্বিন, ১৩১৭।

নিবেদক
শ্রী এইচ বসু।

১৩১৭ সনের
কুন্তলীন পুরস্কার
অনধিক তিনশত টাকা।
(বঙ্গদেশ প্রচলিত প্রাচীন উপকথা, রূপকথা কাহিনীর জন্য।)

প্রথম শ্রেণীর পুরস্কার প্রত্যেকটি	....	২০৲
দ্বিতীয় শ্রেণীর পুরস্কার প্রত্যেকটি	....	১০৲
তৃতীয় শ্রেণীর পুরস্কার প্রত্যেকটি	....	৫৲
সর্বোৎকৃষ্ট সংগ্রহের জন্য পুরস্কার প্রত্যেকটি	....	২০৲

পল্লী-বৃদ্ধ বা পল্লী-বৃদ্ধাগণের মুখে মুখে আবহমান কাল হইতে যে সকল রূপ-কথা চলিয়া আসিতেছে, ও যাহা ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে তাহাই পরিবর্তন অথবা পরিবর্ধন না করিয়া সরল ভাষায় লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

গল্পসংগ্রহের সময় যিনি যেরূপ ভাবে গল্পটি শুনিবেন যথাযথ তাহাই লিপিবদ্ধ করিবেন। অযথা ভাষা পরিমার্জিত করিয়া উপকথার ভাষার সরলতা বা স্বাভাবিকতা নষ্ট

করিবেন না। এই জাতীয় গল্পে উপন্যাসের ভাষা প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নহে। উপকথার কিয়দংশ পরিত্যাগ, পরিবর্জন বা পরিবর্তন করিয়া কিম্বা এক গ্রন্থিতে দুই তিনটি উপকথা সংলগ্ন করিয়া অসঙ্গত গল্পের সৃষ্টি করিবেন না।

লেখক লেখিকাগণ প্রত্যেকে যত ইচ্ছা তত গল্প সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে পারিবেন। পুরস্কারেব যোগ্য বিবেচিত হইলে গুণানুসারে একজনের প্রেরিত সমস্ত গল্পের জন্যই পারিতোষিক পাইবেন।

সর্বোৎকৃষ্ট গল্প সংগ্রহের জন্য একবার নূতন পারিতোষিকের সৃষ্টি হইল। যাঁহারা অন্যূন চারিটি ভাল গল্প পাঠাইবেন তাহাদের মধ্যে যাঁহার সংগ্রহ সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে তাঁহাকে গল্পগুলির যোগ্যতা অনুসারে নির্দিষ্ট পুরস্কার ব্যতীত ২০ টাকা মূল্যের একটি অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

প্রত্যেক লেখক লেখিকাকে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতে হইবে তিনি তাঁহার প্রেরিত গল্প (১) কোন বিদেশী গল্প-পুস্তক হইতে অনুবাদ করেন নাই বা (২) কোন পত্রিকা বা পুস্তক হইতে সংগ্রহ করেন নাই।

গল্পগুলির পরীক্ষাকালে ঘটনাবৈচিত্র্য ও ভাষার সরলতা ও স্বাভাবিকতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইবে, এবং তাহার উপর পুরস্কারের পরিমাণ নির্ভর করিবে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে গল্প সংগ্রহ করা আবশ্যক :—

(১) দিগ্‌দেশে যাত্রা ও নানা বিপদ হইতে উদ্ধারলাভেব গল্প।
(২) বন্ধুতা ও প্রণয়ের গল্প।
(৩) রাক্ষস ও ভূত প্রেত সম্বন্ধীয় গল্প।
(৪) ঠগ, জুয়াচোর ও বাটপাড়দের গল্প।
(৫) বুদ্ধি কৌশল পবিচাযক গল্প।
(৬)হাস্যকৌতুকময় গল্প।
(৭) বিবিধ বিচিত্র গল্প।

আগামী চৈত্র মাসের শেষ দিন মধ্য গল্পগুলি কুন্তলীন অফিসে পৌঁছান আবশ্যক তাহার পর আর কোন রচনা গৃহীত হইবে না।

বচনা আমাদিগের হস্তগত হওয়া সম্বন্ধে যাঁহারা নিঃসন্দেহ হইতে চাহেন তাঁহারা তাহা রেজেষ্ট্রী কবিয়া পাঠাইতে পারেন।

১৩২৪ সনের

কুন্তলীন পুরস্কার

নগদ একশত টাকা

প্রথম পুবস্কার ২৫
দ্বিতীয় পুরস্কার ২০
তৃতীয় পুরস্কার ১৫
চতুর্থ পুরস্কার ১০
পঞ্চম পুরস্কার ৫
ষষ্ঠ পুরস্কার ৫
সপ্তম পুরস্কার ৫
অষ্টম পুরস্কার ৫

নবম পুরস্কার ৫৲
দশম পুরস্কার ৫৲

সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র উপন্যাস, গল্প, বিচিত্র অথবা কৌতুকাবহ ঘটনা অথবা ডিটেকটিভ কাহিনীর জন্য উপরোল্লিখিত পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। কেবল মাত্র গল্পের সৌন্দর্য কিছুমাত্র নষ্ট না করিয়া কৌশলে কুন্তলীন এবং এসেন্স দেলখোসের অবতারণা করিতে হইবে, অথচ কোন প্রকারে ইহাদের বিজ্ঞাপন স্বরূপ বিবেচিত না হয়। রচনা সরস এবং কৌতূহলোদ্দীপক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পুরস্কারের নিয়মাবলী।

১। রচনা যাহাতে সাধারণ চিঠির কাগজের ১৩/১৪ পৃষ্ঠা অথবা তিন হাজার শব্দের অধিক না হয় সে বিষয়ে লেখকগণ বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। হস্তলিপি পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক।

২। পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক যাঁহার ইচ্ছা রচনা পাঠাইতে পারেন। এক জনে একের অধিক রচনা পাঠাইতে পারেন, কিন্তু একের অধিক পুরস্কার পাইবেন না।

৩। প্রকৃত নাম ও ঠিকানা গোপন করিয়া কিম্বা কোন পুরুষ স্ত্রীলোকের নাম দিয়া রচনা পাঠাইয়াছেন এরূপ সন্দেহের কারণ থাকিলে সেই রচনা পুরস্কারযোগ্য হইবে না।

৪। কোন রচনার প্রাপ্তি স্বীকার করা অথবা পরস্কার সম্বন্ধে কোন চিঠির উত্তর দেওয়া সম্ভব হইবে না। এজন্য কেহ রিপ্লাই পোস্টকার্ড অথবা ডাকটিকিট পাঠাইবেন না। যাঁহারা রচনার পৌঁছান সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে চাহেন তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক রেজেষ্টারী করিয়া পাঠাইবেন।

৫। পুরস্কৃত সমুদয় রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। অপুরস্কৃত রচনা ফেরত দেওয়া হইবে না অথবা

কোন প্রকারে ব্যবহৃত হইবে না।

৬। রচনা আগামী ৩০শে চৈত্রের মধ্যে "কুন্তলীন আফিসে" পৌঁছান আবশ্যক। তৎপরে কাহারও রচনা গৃহীত হইবে না।*

এইচ বসু, পারফিউমার,
৬১ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রী এইচ বসু
৬১ ও ৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

* ১৩২৩ সনের পুস্তকের শেষে মুদ্রিত।—সম্পাদক।

১৩২৪ সন

প্রকাশকের নিবেদন।

১৩২৪ সনের কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য প্রেরিত গল্পগুলির মধ্যে যে দশটি গল্প পুরস্কার লাভ করিযাছে তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্র "সাহিত্যের" সুযোগ্য সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এবার পুরস্কৃত গল্পগুলিব স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

এবার পুরস্কারের ফলপ্রকাশে অতিরিক্ত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে; সহস্রাধিক গল্প প্রতিযোগিতায় প্রেরিত হইয়াছিল, এবং এতগুলি গল্প সাবধানে পাঠ করিয়া উপযুক্তগুলির রক্ষণ ও অবশিষ্টগুলির বর্জনই এই বিলম্বেব কারণ।

অত্যন্ত দুঃখের সহিত লিখিতে হইতেছে যে এবার আমরা আশানুরূপ উৎকৃষ্ট গল্প পাই নাই। তদুপরি প্রায় সমস্ত গল্পেই 'কুন্তলীন' বা 'দেলখোসের' অস্বাভাবিক অবতারণা বা আগাগোড়া প্রশংসা করিয়া গল্পটিকে নীরস ও বিকৃত করা হইয়াছে।

'কুন্তলীন' ও 'এসেন্স দেলখোসের' অবতারণা দ্বারা, গল্পের স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট না করিয়াও গল্প লিখিতে পারা যায়, অনেক লেখকের গল্প দ্বারা পূর্বাপর ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

আশাকরি আগামী বর্ষে অন্যান্য বৎসরের অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট গল্প প্রেরিত হইবে। কুন্তলীন পুরস্কারের নিয়মাবলী গ্রন্থশেষে সন্নিবিষ্ট হইল।

দেলখোস-হাউস,
কলিকাতা
আশ্বিন, ১৩২৪

নিবেদক
শ্রী হিতেন্দ্রমোহন বসু

কুন্তলীন পুরস্কার-সংক্রান্ত
কিছু বিজ্ঞাপন

কুন্তলীনের ষাণ্মাসিক পুরস্কার
নগদ একশত টাকা

সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গল্পের জন্য প্রথম পুরস্কার	....	৪০৲
দ্বিতীয় স্থানীয় গল্পের জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার	....	২০৲
সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কবিতার জন্য প্রথম পুরস্কার	....	২৫৲
দ্বিতীয় স্থানীয় কবিতার জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার	....	১৫৲

এতদ্ভিন্ন উপযুক্ত বোধ করিলে, আমরা পাঁচ টাকা বা ততোধিক মূল্যের আরও কতিপয় পুরস্কার দিব।

পুরস্কারের নিয়মাবলী

কি গল্প, কি কবিতা, উভয়েতেই কুন্তলীনের উল্লেখ থাকা চাই। গল্পটি সুপাঠ্য এবং চিত্তাকর্ষক হইবে—প্রত্যক্ষভাবে কুন্তলীনের বিজ্ঞাপনবিশেষ হইলে চলিবে না। অথচ তাহাতে কুন্তলীনের কথা থাকিবে। কবিতা সম্বন্ধেও এই নিয়ম।

রচনা আগামী শ্রাবণ মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে "কুন্তলীন আফিসে" পৌঁছান আবশ্যক। ভাদ্র মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সংবাদপত্রে পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনাকারীদের নাম প্রকাশিত হইবে।

একজনের যত ইচ্ছা রচনা পাঠাইতে পারেন। কিন্তু এক ব্যক্তি একটির অধিক পুরস্কার পাইবেন না।

পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা আমরা যথেচ্ছ ব্যবহার করিব। রচনাকারী সে বিষয়ে কোনও আপত্তি করিতে পারিবেন না।

উপযুক্ত ব্যক্তিগণের হস্তে পরীক্ষার ভার ন্যস্ত হইবে, এবং তাঁহারা যাহা স্থির করিবেন, তদনুসারে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

এইরূপ পুরস্কার, পূজার পূর্বে একবার ও বর্ষশেষে একবার, এই দুইবারে, একশত টাকা হিসাবে দুইশত টাকা দেওয়া হইবে। সবিশেষ বিবরণ পত্রে জ্ঞাতব্য।

কুন্তলীন পঞ্জিকা
বিনামূল্যে বিতরিত

রঞ্জিত কাগজে রঙ্গীন কালিতে সুন্দররূপে মুদ্রিত। কাছে থাকিলে তারিখ তিথি দেখিতে আর বটতলার পাঁজী খুলিতে হইবে না। যাঁহারা এই সুদৃশ্য ও সুন্দর পঞ্জিকাখানি গৃহে রাখিতে চান, তাঁহারা কুন্তলীন আফিস হইতে বিনামূল্যে লইয়া যাইতে পারেন। মফঃস্বলবাসীরা অর্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে পাইবেন।

প্রস্তুতকারক,
এইচ, বসু।—ম্যানুফ্যাক্‌চারিং পারফিউমার।
২৪ নং মুসলমানপাড়া লেন, কলিকাতা।*

* কুন্তলীন পুরস্কারের প্রথম বিজ্ঞাপন,
দ্রষ্টব্য—'সাহিত্য', বৈশাখ ১৩০১।
অবশ্য বিজ্ঞাপনানুযায়ী এ সময়ে প্রস্তাবিত গল্পসংকলন প্রকাশিত হয় নাই।—সম্পাদক।

বরণডালা

১৩২০ সনে

কুন্তলীন উপহার

বরণডালা

শ্রী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, প্রণীত

এর সূচীপত্রে এই গল্পগুলি সংকলিত—ফুলওয়ালী, হুনরী, অক্ষয় কবচ, বিদেশীর যে খাতির, আমন্ত্রণ ও বিসর্জন, যশের পন্থা, পণরক্ষা, চাঁদির জুতা, মনের মতন, রস ও বসুই।

মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬৩।

প্রকাশকের নিবেদন।

আজ তের বৎসর হইল, প্রতি বৎসর কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় কতকগুলি করিয়া গল্প লেখাইয়া কুন্তলীনের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকদিগকে পূজার উপহার দিয়া আসিতেছিলাম। ইহার জন্য আমি অর্থব্যয়ে ও উৎকৃষ্ট গল্প সংগ্রহের আয়োজনে যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। কুন্তলীনের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকদিগকে প্রীতি-উপহার দিয়া প্রীত করা মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও আমার আর একটি গৌণ উদ্দেশ্যও ছিল—তাহা বঙ্গসাহিত্যের কথঞ্চিৎ পুষ্টিসাধন করা এবং শক্তিমান অথচ প্রচ্ছন্ন লেখক লেখিকাদিগকে সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়া সাধারণের সহিত পরিচয় সাধন করিয়া দেওয়া। গত তের বৎসরের কুন্তলীন পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্পের মধ্যে কতকগুলি গল্প যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সাহিত্যরস যে যথেষ্ট আছে, এবং তাহা বঙ্গসাহিত্যে আসন পাইবার যোগ্য তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দুই চারিজন লেখক লেখিকা ছাড়া আর কেহই বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে নিজেদের সাধনা ও সামর্থ্যের পরিচয় দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন না ; অধিকাংশ লেখক লেখিকাই সাময়িক উত্তেজনায় আবির্ভূত হইয়া পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া পড়িলেন। এইরূপ ক্ষণিক খেয়ালের সৌখীন রচনা অপেক্ষা, আমার মনে হয়, যাঁহারা সাহিত্যসাধনাই জীবনব্রত করিয়াছেন তাঁহাদের রচনার মূল্য অনেক বেশী। সেইজন্য এ বৎসর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা চারুশিল্প-সজ্জিত এই "বরণডালা" কুন্তলীনের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি। আশা করি ইহা সকলের প্রীতিপ্রদ হইবে। চারুবাবু আমার অনুরোধে এক মাসের মধ্যে দশোপচারে এই বরণডালা সজ্জিত করিয়া দিয়াছেন।

নিবেদক

২৫শে ভাদ্র, ১৩২০। শ্রী এইচ বসু।

এই প্রসঙ্গে 'ভারতী' পত্রিকার আশ্বিন ১৩২০ সংখ্যার বিজ্ঞাপনে মুদ্রিত একটি প্রকাশোত্তর বিজ্ঞাপন উদ্ধার করে দিলাম।—সম্পাদক।

নূতন বৎসরের কুন্তলীন উপহার।
প্রসিদ্ধ গল্পলেখক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত
বরণডালা

কয়েক বৎসর হইতে প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় আশানুরূপ উৎকৃষ্ট গল্প না পাওয়ায় আমাদের ইচ্ছা ছিল, কোন সুলেখক কর্তৃক লিখিত কয়েকটি ছোট গল্প অথবা একখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস আমাদের সহৃদয় গ্রাহকগণেব হস্তে অর্পণ করিব। এবার আমাদেব সেই বাসনা পূর্ণ হইল। প্রথিতযশা লেখক, প্রবাসী পত্রিকার সহকাবী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায এবারকাব নূতন কুন্তলীন উপহারের লেখক। পুস্তকেব নাম "বরণডালা"। দশটি উপাদেয় গল্পে "বরণডালা" সাজান এবং পুস্তকখানি প্রায ১৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এরূপ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকাব লিখিত এবং সুবৃহৎ পুস্তক সর্বপ্রথম আমরাই বিনামূল্যে উপহার দিতে সমর্থ হইয়াছি। প্রত্যেক গল্পের ভাবমাধুর্য, ভাষার সরলতা, বর্ণনা কৌশল ও সুমধুর পদবিন্যাস লেখকের পূর্বার্জিত সুনামের পরিচায়ক। গল্পামোদী পাঠক পাঠিকাগণ "ববণডালা" পাঠে পরিতৃপ্ত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কুন্তলীন পুরস্কারের ছাপা, কাগজ ইত্যাদি চিবকালই উচ্চাঙ্গের হইয়া থাকে, এবার আবও একটু বিশেষত্ব আছে। ফলতঃ এবাব আমবা পুস্তকখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর কবিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, এক্ষণে পাঠক পাঠিকাগণ গল্প পাঠে আনন্দিত হইলেই আমবা শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিব।

পুস্তক পাইবার উপায়।

সাধাবণ সংস্করণ—উৎকৃষ্ট মসৃণ কাগজে পরিপাটীরূপে মুদ্রিত। অনেক পুস্তকের বাজসংস্করণ এবারকার কুন্তলীন উপহারের সাধাবণ সংস্করণ অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে। এই সংস্করণেব মূল্য এক টাকা মাত্র। আমাদের প্রস্তুত কুন্তলীন, দেলখোস প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে যিনি অন্ততঃ ১ টাকা মূল্যেব জিনিষও ক্রয় করিবেন তাঁহাকে এই পুস্তক একখণ্ড এই শারদীয় পূজার সময় বিনামূল্যে উপহার দেওয়া হইবে।

বাজসংস্করণ—উৎকৃষ্ট এবং অতিরিক্ত মোটা এণ্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা ও মনোহব বাঁধাই। যাঁহারা অন্ততঃ ২ টাকা মূল্যের সুগন্ধি দ্রব্যাদি ক্রয় করিবেন। তাঁহাদিগকে এই সুন্দর পুস্তক একখণ্ড বিনামূল্যে উপহার দেওযা হইবে। এই রাজসংস্করণের মূল্য ১ ॥● টাকা ও মাশুলাদি ।/- আনা।

এইচ বসু, পারফিউমার, বৌবাজার, কলিকাতা।

॥ বিজ্ঞাপন : প্রবাসী বৈশাখ ১৩৫০, পৃ. ৮০ ॥

"পাগল করিল বঙ্গ
ধন্য কুন্তলীন"

পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্বে বাঙ্গালীব ঘরে ঘরে "কুন্তলীনের" প্রচার দেখিয়া কবি ৺রামদাস সরকার গাহিয়াছিলেন "পাগল কবিল বঙ্গ ধন্য কুন্তলীন"। সেই অবধি অসংখ্য কেশতৈলের মধ্যে স্বচ্ছ, সুনির্মল ও কমনীয় কেশতৈল "কুন্তলীন" নিজ গুণ বলে আপনার সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত ভদ্র মহোদয়গণ "কুন্তলীন"ই সর্বোকৃষ্ট কেশতৈল বলিয়া স্বীকার কবিয়াছেন। এই কাবণেই শৈশবে ও যৌবনে যাঁহারা

"কুন্তলীন" ভিন্ন অন্য কোন তৈল ব্যবহার করিতেন না, তাঁহারা প্রৌঢ়ত্বের ও বার্ধক্যের সীমানায় পদার্পণ করিয়া এখনও "কুন্তলীন" ব্যবহার করিতেছেন। অধিক কি বলিব, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বলিয়াছেন—"কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া এক মাসের মধ্যে নূতন কেশ হইয়াছে।" তাই আমরাও কবির ভাষায় বলি—

"কেশে মাখ "কুন্তলীন"।
অঙ্গবাসে "দেলখোস" ॥
পানে খাও "তাম্বুলীন"।
ধন্য হউক এইচ বোস ॥"

কুন্তলীন পুরস্কার

সম্পূর্ণ সূচী

প্রথম বর্ষ : ১৩০৩

॥ গল্প ॥

প্রথম পুরস্কার	৪০ টাকা	নিরুদ্দেশের কাহিনী	নামহীন
দ্বিতীয় পুরস্কার	২০ টাকা	পূজার বাজার	দীনেন্দ্রকুমার রায়
তৃতীয় পুরস্কার	১০ টাকা	লীলা	সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়
বিশেষ পুরস্কার	১৫ টাকা	রাজলক্ষ্মী	মানকুমারী বসু
		একতাড়া চিঠি	শ্রীম—
		নিরুপমা	কুলবালা দেবী

॥ কবিতা ॥

প্রথম পুরস্কার	২৫ টাকা	মনে পড়ে	যোগীন্দ্রনাথ সরকার
দ্বিতীয় পুরস্কার	১৫ টাকা	রূপ-তৃষ্ণা	শরচ্চন্দ্র দত্ত
তৃতীয় পুরস্কার	১০ টাকা	পুরস্কার প্রলোভন	চন্দ্রনাথ দাস
বিশেষ পুরস্কার	৫ টাকা	কলিকাল	বিধুমুখী রায়
		ফুরালো	যোগীন্দ্রনাথ সরকার
		কুন্তলীন	রসিকচন্দ্র বসু
		অভিমানিনী	যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
		কামিনীকুন্তল	শশিভূষণ মজুমদার
		বঙ্গবালা	সরমাসুন্দরী ঘোষ
		দম্পতি	রাজমোহন সেন
		নব আবিষ্কার	অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
		সই	নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
		কুন্তলীন কবিতা	নিকুঞ্জকামিনী দেবী

দ্বিতীয় বর্ষ : ১৩০৪

প্রথম পুরস্কার		পূজার চিঠি	শ্রীমতী রাধামণি দেবী

[তালিকা অসম্পূর্ণ]

তৃতীয় বর্ষ : ১৩০৫

প্রথম পুরস্কার	৩০ টাকা	বিধবা	দীনেন্দ্রকুমার রায়
দ্বিতীয় পুরস্কার	২০ টাকা	হতভাগিনী	প্রসন্নকুমার ঘোষাল
তৃতীয় পুরস্কার	১৫ টাকা	সন্ধ্যা	শশিভূষণ দত্ত
চতুর্থ পুরস্কার	১০ টাকা	হেমমালা	সুমতিবালা দেবী
পঞ্চম পুরস্কার	৫ টাকা	ফুলশয্যা	বিপিনবিহারী চক্রবর্তী
ষষ্ঠ পুরস্কার	৫ টাকা	গরলে অমৃত	বিনয়ভূষণ সরকার

সপ্তম পুরস্কার	৫ টাকা	অদৃষ্ট চক্র	মানকুমারী বসু
অষ্টম পুরস্কার	৫ টাকা	একখানিপত্র	শ্যামাচরণ সিংহ
নবম পুরস্কার	৫ টাকা	কালা গোলাপ	ব্রজকালী সুর
দশম পুরস্কার	৫ টাকা	জামাইবেটার উপাখ্যান	হরকুমারী সেন

কবিতা : ছেলেভুলানো ছড়া

	১০ টাকা	সংগ্রহ	সৌদামিনী দেবী
	৫ টাকা	"	মৃণালিনী দাসী
	৫ টাকা	"	প্রফুল্লকুমারী দেবী
	৫ টাকা	"	ক্ষান্তমণি দেবী
	৫ টাকা	"	বিন্দুবাসিনী সরকার

চতুর্থ বর্ষ : ১৩০৬

প্রথম পুরস্কার	৩০ টাকা	অদ্ভুত-হত্যা	রজনীচন্দ্র দত্ত
দ্বিতীয় পুরস্কার	২০ টাকা	অদল বদল	দীনেন্দ্রকুমার রায়
তৃতীয় পুরস্কার	১৫ টাকা	অবগুণ্ঠিতা	সুরেশচন্দ্র সাহা
চতুর্থ পুরস্কার	১০ টাকা	দুর্ভাগা	সরমা দেবী
পঞ্চম পুরস্কার	১০ টাকা	রঙ্গিয়া	কুলদাকান্ত ঘোষ
ষষ্ঠ পুরস্কার	৫ টাকা	শোভা	মানকুমারী বসু
সপ্তম পুরস্কার	৫ টাকা	গহনার বাক্স	জগদানন্দ রায়
অষ্টম পুরস্কার	৫ টাকা	রেলে চুরি	সরলাবালা দাসী
	৫ টাকা	আমার কাহিনী	সতীশচন্দ্র ঘোষ
	৫ টাকা	প্রতিশোধ	কামিনীকান্ত রায়
	৫ টাকা	বিমাতা	ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ
	৫ টাকা	সরোজিনী	অপূর্বকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
অতিরিক্ত পুরস্কার	৫ টাকা	বুদ্ধিমান রাজার স্বর্গযাত্রা	অম্বুজাসুন্দরী দাস

পঞ্চম বর্ষ : ১৩০৭

প্রথম পুরস্কার	২৫ টাকা	আমার চাকরী	সুরেন্দ্রলাল গুপ্ত
দ্বিতীয় পুরস্কার	২০ টাকা	বৈস্চন	সুরেশচন্দ্র সাহা
তৃতীয় পুরস্কার	১৫ টাকা	দীপনির্বাণ	হরিপদ গুপ্ত
চতুর্থ পুরস্কার	১০ টাকা	বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া	কামিনীকুমার সেন
পঞ্চম পুরস্কার	৫ টাকা	অদ্ভুত স্বপ্ন	এস্. কে. দেবী
ষষ্ঠ পুরস্কার	৫ টাকা	গোমতী তীরে	সরলাবালা দাসী
সপ্তম পুরস্কার	৫ টাকা	সখের ডিটেকটিভ	প্রবোধচন্দ্র রায়
অষ্টম পুরস্কার	৫ টাকা	একখানি পত্র	ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ
নবম পুরস্কার	৫ টাকা	আমার সৌভাগ্য	হেমন্তকুমারী গুপ্ত
দশম পুরস্কার	৫ টাকা	শুয়ে শুয়ে চোর ধরা	নীরোদবাসিনী ঘোষ

ষষ্ঠ বর্ষ ১৩০৮

প্রথম পুবস্কাব	২৫ টাকা	মেযে	সবোজনাথ ঘোষ
দ্বিতীয় পুবস্কাব	২০ টাকা	মেযেব বিয়ে	সবলাবালা দাসী
তৃতীয় পুবস্কাব	১৫ টাকা	দান	বাজেন্দ্রলাল আচার্য
চতুর্থ পুবস্কাব	১০ টাকা	দর্শনেব যম	বিনযভূষণ সবকার
পঞ্চম পুরস্কাব	৫ টাকা	বুঝিবাব ভুল	ক্ষীবোদকুমাব ঘোষ
ষষ্ঠ পুরস্কাব	৫ টাকা	ভালবাসাব প্রতিদান	কুসুমকুমারী বায
সপ্তম পুবস্কার	৫ টাকা	পরিণয রহস্য	বাবীন্দ্রকুমাব ঘোষ
অষ্টম পুবস্কাব	৫ টাকা	দোলপূর্ণিমা	নন্দলাল গুপ্ত
নবম পুবস্কাব	৫ টাকা	বিষম ভ্রম	যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত
দশম পুবস্কাব	৫ টাকা	প্রতিহিংসা	আশুতোষ তবফদাব
অতিবিক্ত পুবস্কাব	৫ টাকা	অদ্ভুত চুবি	হেমন্তকুমাবী গুপ্তা

সপ্তম বর্ষ ১৩০৯

প্রথম পুবস্কাব	২৫ টাকা	মন্দিব	সুবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায
দ্বিতীয় পুবস্কাব	২০ টাকা	স্মৃতিচিহ্ন	সবলাবালা দাসী
তৃতীয় পুবস্কাব	১৫ টাকা	চিকিৎসকেব গল্প	স্নেহলতা সেন
চতুর্থ পুবস্কাব	১০ টাকা	সার্থক	বিনযভূষণ সবকাব
পঞ্চম পুবস্কাব	৫ টাকা	উদোব পিণ্ডি বুদোব ঘাড়ে	বাবীন্দ্রকুমাব ঘোষ
ষষ্ঠ পুবস্কাব	৫ টাকা	নামেব ভুল	মোহিতকুমারী সিংহ
সপ্তম পুবস্কাব	৫ টাকা	উপেক্ষিতা	যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত
অষ্টম পুবস্কাব	৫ টাকা	অপবাধী	সাবিত্রীবালা দেবী
নবম পুবস্কাব	৫ টাকা	শৈলজা	আশুতোষ তবফদাব
দশম পুবস্কার	৫ টাকা	নিযতি	সুষমাসুন্দরী দাসী
অতিবিক্ত পুবস্কাব	৫ টাকা	ভুল	ইন্দিরা দেবী
ঐ	৫ টাকা	বৌদিব কাণ্ড	সৌবীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায
ঐ	৫ টাকা	প্রভা	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
ঐ	৫ টাকা	মিলন	প্রমীলা দত্ত

অষ্টম বর্ষ ১৩১০

প্রথম পুরস্কাব	৩০ টাকা	সন্ন্যাস	বিন্দুবাসিনী দাসী
দ্বিতীয় পুবস্কাব	২৫ টাকা	মুক্তি	সৌবীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায
তৃতীয় পুবস্কাব	২০ টাকা	ছুটি	ইন্দিবা দেবী
চতুর্থ পুবস্কাব	১৫ টাকা	দলিল চুবি	জগদানন্দ বায়
পঞ্চম পুবস্কাব	১০ টাকা	ভ্রান্তি	লতিকাবালা বসু
ষষ্ঠ পুবস্কাব	৫ টাবা	ঘড়ি চুবি	সবলাবালা দাসী
সপ্তম পুবস্কাব	৫ টাকা	ফটোগ্রাফ	সাবিত্রীবালা দেবী
অষ্টম পুবস্কার	৫ টাকা	আভা	পূর্ণশশী দেবী
নবম পুবস্কাব	৫ টাকা	মলিনা	অনুজা ঘোষ

দশম পুরস্কার	৫ টাকা	মিলন	চারুশীলা দেবী
একাদশ পুরস্কার	৫ টাকা	সুখস্বপ্ন	বিধুবালা দেবী
দ্বাদশ পুরস্কার	৫ টাকা	আমার ডাক্তারি	প্রতিভা দেবী
ত্রয়োদশ পুরস্কার	৫ টাকা	মণির সন্ন্যাস	নগেন্দ্রবালা বসু
চতুর্দশ পুরস্কার	৫ টাকা	অভীষ্ট মিলন	গিরিবালা ঘোষ
পঞ্চদশ পুরস্কার	৫ টাকা	ভুলভাঙা	মলিনামালা মিত্র

নবম বর্ষ : ১৩১১

প্রথম পুরস্কার	৩০ টাকা	শান্তি	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
দ্বিতীয় পুরস্কার	২৫ টাকা	দান	পূর্ণশশী দেবী
তৃতীয় পুরস্কার	২০ টাকা	চিরকুমার	অনাদিনাথ সরকার
চতুর্থ পুরস্কার	১৫ টাকা	বিধবার অদৃষ্ট	প্রমীলা দত্ত
পঞ্চম পুরস্কার	১০ টাকা	পুরস্কার	ইন্দিরা দেবী
ষষ্ঠ পুরস্কার	৫ টাকা	মুকুল	নগেন্দ্রবালা বসু
সপ্তম পুরস্কার	৫ টাকা	অভিমান	কুঞ্জবালা দাসী
অষ্টম পুরস্কার	৫ টাকা	অমৃতে গরল	হরিহব শেঠ
নবম পুরস্কার	৫ টাকা	প্রত্যাখ্যান	অনুপমা দেবী
দশম পুরস্কার	৫ টাকা	উইল	জগদানন্দ রায়
একাদশ পুরস্কার	৫ টাকা	মুক্তি	রাণী দেবী
দ্বাদশ পুরস্কার	৫ টাকা	চিঠি চুরি	যোগেশচন্দ্র মজুমদাব
ত্রয়োদশ পুরস্কার	৫ টাকা	বৌ চুরি	হেমন্তকুমারী সেনগুপ্তা
চতুর্দশ পুরস্কার	৫ টাকা	হারানিধি	গোলোকবিহারী সেন
পঞ্চদশ পুরস্কার	৫ টাকা	প্রায়শ্চিত্ত	প্রতিভা দেবী

দশম বর্ষ : ১৩১২

প্রথম পুরস্কার	৩০ টাকা	অসংযত	সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
দ্বিতীয় পুরস্কার	২৫ টাকা	সুপ্তিভঙ্গ	প্রমীলা দত্ত
তৃতীয় পুরস্কার	২০ টাকা	অন্ধের দিব্যদৃষ্টি	সরোজকুমারী দেবী
চতুর্থ পুরস্কার	১৫ টাকা	সুপ্রভাত	যোগেশচন্দ্র মজুমদার
পঞ্চম পুরস্কার	১০ টাকা	নূতন পূজা	অনুপমা দেবী
ষষ্ঠ পুরস্কার	৫ টাকা	ভ্রম	পূর্ণশশী দেবী
সপ্তম পুরস্কার	৫ টাকা	ঋণ পরিশোধ	ইন্দিরা দেবী
অষ্টম পুরস্কার	৫ টাকা	প্রীতিমুগ্ধ	নগেন্দ্রবালা বসু
নবম পুরস্কার	৫ টাকা	বিচারক	সাবিত্রীবালা দেবী
দশম পুরস্কার	৫ টাকা	শাস্তি	প্রতিভা দেবী

একাদশ বর্ষ : ১৩১৩

প্রথম পুরস্কার	৩০ টাকা	রাখীবন্ধন	যোগেশচন্দ্র মজুমদার
দ্বিতীয় পুরস্কার	২৫ টাকা	অপরাধী	যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
তৃতীয় পুরস্কার	২০ টাকা	মায়ার বন্ধন	পূর্ণশশী দেবী
চতুর্থ পুরস্কার	১৫ টাকা	উষা	ভূপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
পঞ্চম পুরস্কার	১০ টাকা	শেষ অর্ঘ্য	যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত
ষষ্ঠ পুরস্কার	৫ টাকা	পবিত্রতার সৌরভ	কুঞ্জবালা দাসী
সপ্তম পুরস্কার	৫ টাকা	বহ্বারম্ভ	ইন্দিরা দেবী
অষ্টম পুরস্কার	৫ টাকা	ছিন্নমুকুল	কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু
নবম পুরস্কার	৫ টাকা	মিলন	রাণী দেবী
দশম পুরস্কার	৫ টাকা	পরাজয়	আশালতা সেন
একাদশ পুরস্কার	৫ টাকা	পলায়ন	নিরুপমা দাসী
দ্বাদশ পুরস্কার	৫ টাকা	পুষ্পচয়ন	বিনয়ভূষণ সরকার
ত্রয়োদশ পুরস্কার	৫ টাকা	পরিচারক	অবিনাশচন্দ্র রায়
চর্তুদশ পুরস্কার	৫ টাকা	ব্রতধারণ	সুরবালা দাসী
পঞ্চদশ পুরস্কার	৫ টাকা	মালতী	নগেন্দ্রবালা বসু

দ্বাদশ বর্ষ : ১৩১৫

॥ গল্প ॥

প্রথম পুরস্কার	৩০ টাকা	উপেক্ষিতা	ভূপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
দ্বিতীয় পুরস্কার	২০ টাকা	প্রতিষ্ঠা	যতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
তৃতীয় পুরস্কার	১০ টাকা	আত্মোৎসর্গ	সুশীলা সেন
চতুর্থ পুরস্কার	১০ টাকা	তিরস্কার, না পুরস্কার ?	সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
পঞ্চম পুরস্কার	৫ টাকা	সমাজ	বিনয়ভূষণ সরকার
ষষ্ঠ পুরস্কার	৫ টাকা	নির্বোধ	যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত
সপ্তম পুরস্কার	৫ টাকা	সুধা	প্রমীলা দত্ত
অষ্টম পুরস্কার	৫ টাকা	বিলাত ফেরত	পরিমল দেবী
নবম পুরস্কার	৫ টাকা	মিলন	সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত
দশম পুরস্কার	৫ টাকা	নিয়তি	নির্ঝরিণী দেবী

॥ পূজার চিঠি ॥

প্রথম পুরস্কার	২০ টাকা	পূজার চিঠি	নিরুপমা দাসী
দ্বিতীয় পুরস্কার	১৫ টাকা	ঐ	যশোমালিনী দেবী
তৃতীয় পুরস্কার	১০ টাকা	ঐ	রমারাণী দেবী
চতুর্থ পুরস্কার	৫ টাকা	ঐ	সন্তোষকুমারী দেবী
অতিরিক্ত পুরস্কার	৫ টাকা	ঐ	মহিমাবালা দেবী
ঐ	৫ টাকা	ঐ	পূর্ণশশী দেবী

॥ কবিতা ॥

প্রথম পুরস্কার	২০ টাকা	মন্দির দ্বারে	কুঞ্জবালা দাসী
দ্বিতীয় পুরস্কার	১৫ টাকা	অভাবে	অর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ
তৃতীয় পুরস্কার	১০ টাকা	নিরাভরণা	চারুহাসিনী ঘোষ
চতুর্থ পুরস্কার	৫ টাকা	প্রভু তুমি নাই ?	বিনয়ভূষণ সরকার
অতিরিক্ত পুরস্কার	৫ টাকা	সার্থক	সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী

ত্রয়োদশ বর্ষ : ১৩১৭

প্রথম শ্রেণীর পুরস্কার	২০ টাকা	রাজপুত্র দুঃখহরণ	নির্ঝরিণী দাসী
দ্বিতীয় শ্রেণীর পুরস্কার	১০ টাকা	বীরবল	রমারাণী দেবী
ঐ	ঐ	নির্মল-পাটন	সুশীলাবালা দেবী
ঐ	ঐ	কেশবতী কন্যা	কুঞ্জবালা দাসী
ঐ	ঐ	শক্তিকুমার	নিশিকান্ত সেনগুপ্ত
ঐ	ঐ	ময়ূরপঙ্খী	পূর্ণশশী দেবী
তৃতীয় শ্রেণীর পুরস্কার	৫ টাকা	নীলপদ্ম	ঐ
ঐ	ঐ	জুয়াচুরি বুদ্ধি	ঐ
ঐ	ঐ	সাতরাজার ধন এক মাণিক	হেমচন্দ্র রায়

১৩২৪ [শেষ পুরস্কৃত-রচনা-উপহার]

প্রথম পুরস্কার	২৫ টাকা	ভিখারীর দান	প্রতিভা দেবী
দ্বিতীয় পুরস্কার	২০ টাকা	দাদা	কমলা দত্ত
তৃতীয় পুরস্কার	১৫ টাকা	হেস্তনেস্ত	জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
চতুর্থ পুরস্কার	১০ টাকা	উদ্ধার	যশোমালিনী দাসী
পঞ্চম পুরস্কার	৫ টাকা	আশ্রিতা	ইন্দু দেবী
ষষ্ঠ পুরস্কার	৫ টাকা	উদ্দেশে	লতিকা দেবী
সপ্তম পুরস্কার	৫ টাকা	অদ্ভুত মিলন	মানকুমারী বসু
অষ্টম পুরস্কার	৫ টাকা	চিত্র	কৃষ্ণদাস চন্দ্র
নবম পুরস্কার	৫ টাকা	অশ্রুবিন্দু	ললিতমোহন মজুমদার
দশম পুরস্কার	৫ টাকা	আর্সনিক	নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

* ১৩১০ সালে 'কুন্তলীন পুরস্কারে'র একটি বিশেষ খণ্ড প্রকাশিত হয়। তাতে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'কর্মফল' গল্পটি মুদ্রিত হয়।
* ১৩১৬ সালে কুন্তলীন পুরস্কার-এর এযাবৎ প্রকাশিত ১২টি খণ্ড থেকে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত ১২টি রচনা নিয়ে 'কুন্তলীন পুরস্কারে'র 'দ্বাদশ প্রথম' প্রকাশিত হয়। রচনাগুলির নাম ও লেখকের নাম বর্ণানুযায়ী মুদ্রিত তালিকা থেকে পাঠক পেতে পারবেন।
* হেমেন্দ্রমোহন বসুর মৃত্যুর (ভাদ্র ১৩২৩) পরে 'কুন্তলীন পুরস্কার'-এর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় 'সন ১৩২৩ সনের সচিত্র কুন্তলীন পুরস্কার' নামে। এটি আসলে

পূর্বে প্রকাশিত চারটি নির্বাচিত রচনার পুনর্মুদ্রণ। রচনা চারটি ছিল রবীন্দ্রনাথের 'কর্মফল', দীনেন্দ্রকুমাব রায়ের 'অদল বদল' এবং 'মন্দির দ্বারে' ও 'বুদ্ধিমান রাজার স্বর্গযাত্রা' নামে দুটি কবিতা।

অবশ্য এব আগে ১৩২০ সালে একটি বই কুন্তলীন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। তবে তার নাম ছিল 'বরণডালা'। এতে কোনো পুরস্কৃত রচনা স্থান পায়নি। এটি সম্পাদনা করেছিলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩২৪ সনের পর 'কুন্তলীন-পুরস্কার' পুনশ্চ আত্মপ্রকাশ করে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে এবং মাত্র চাব বছব প্রকাশিত হওয়ার পর চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। এই চার বছরের কোনো রচনাই 'পুবস্কৃত' ছিল না যদিও ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য 'কুন্তলীন-পুরস্কার' এই নামটি অব্যাহত ছিল। আমরা পাঠকদের গোচরার্থে এই চাব বছবের সূচীও দিলাম।

১৩৩৪

মৃত্যুবাণ — সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
স্বযম্বরা — চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
গোধূলি-লগ্নে — নরেন্দ্র দেব
আঁধারের ঘোবে — প্রেমাঙ্কুর আতর্থী
'আলো কোথা ওরে আলো' — রাধারাণী দত্ত
'মধুবেণ সমাপয়েৎ' — হেমেন্দ্রকুমার বায়
বাইজি — খগেন্দ্রনাথ মিত্র
অসতী — নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
বিরহ — এস. ওয়াজেদ আলি
মেশের বাসার — অনুকপা দেবী

১৩৩৫

স্বখাত-সলিলে — চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শাড়ী ও সেমিজ — সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
পুরুষোত্তম — নরেন্দ্র দেব
জিত্‌ল কে — তমাললতা বসু
গিবিশ — উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
প্রিয়তমার পত্র — মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
বাপকা বেটী — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
পাদবিকের পাদুকা — হেমেন্দ্রকুমার রায়

১৩৩৬

বাইজি — মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
উপসর্গ — সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
দৈবাৎ — নরেন্দ্র দেব

১৩৩৭

॥ সূচী সমাপ্ত ॥